৫ম ভাগ ফাল্গুন, ১৩১৯ সাল ১ম সংখ্যা

নূতন খাতা।

পঞ্জিকা যেরূপ চিরনূতন—পুরাতন হইতে জানে না, বৎসরান্তে ব্যবসায়ীর খাতাও সেইরূপ 'নূতনখাতা' নামে অভিহিত হইয়া থাকে—পুরাতন হইতে চাহে না। প্রতি বৎসরই 'নূতনখাতা' হইয়া থাকে। সরস্বতীর রাতুলচরণকমলসেবী সাহিত্যিকদিগের সাধনার একটা খতিয়ান নূতন বৎসরের প্রারম্ভে মাসিক সাহিত্যে 'নববর্ষে,' 'বর্ষসমাগমে,' 'সূচনা,' 'মুখবন্ধ' ইত্যাদি নামে একটা হিসাব নিকাশ মাসিকের প্রথম প্রচলনের সময় হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়া প্রথারূপে দাঁড়াইয়াছে। আর এই প্রথার প্রচলনও আমরা সঙ্গত বলিয়া মনে করি, কারণ জীবন গঠিত করিতে আদর্শ চাই—আদর্শের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কর্ত্তব্য-সাধন করিতে—আদর্শকে জীবনে কার্য্যে পরিণত করিতে [illegible] নিজস্ব করিতে পারিয়াছি কতদূর [illegible] পড়িয়াছি, তাহার একটা হিসাব-নিকাশ করা ত চাই – না করিলে জীবন-প্রবাহ অবরুদ্ধ নদের ন্যায় আবিলতাপূর্ণ হইবে—তাই বলিতেছিলাম বৎসরান্তে ব্যবসাদার যেরূপ হিসাব-নিকাশ করিয়া নবভাবে নবপ্রাণে নূতন আশা লইয়া কার্য্য-ক্ষেত্রে অগ্রসর হয়—বৎসরান্তে যখন আমরা মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম, তখন আমাদিগের জীবনে আদর্শের দিকে সমধিক আগ্রহ আশা লইয়া ব্যাকুল হৃদয়ে ছুটিতে হইবে—অমৃতের সন্ধান করিতে হইবে; সেইরূপ বৎসরান্তে সাহিত্যিকজীবনে আমাদের বড় সাধের 'মানসী' তাহার আদর্শের পথে কতদূর অগ্রসর হইল বা সে আদর্শ হইতে কত পশ্চাতে পড়িয়া রহিল, তাহা দেখিতে হইবে—রবীন্দ্রনাথের শুভাশিষ লইয়া যাহার জন্ম—বাঙ্গালার সাহিত্যিকদিগের সাধন-সলিল-সেচনে যাহার অঙ্গপুষ্টি হইতেছে—যাঁহাদিগের অক্লান্ত লালনে আজিও 'মানসী' দণ্ডায়মান রহিয়াছে—যে সকল সাহিত্য-রথদিগের আড়ম্বরে জর্জ্জরীভূত হইয়া ত্রুটী ও প্রমাদের সংশোধনের জন্য চির-উন্মুখ সেই মানসীর গতবৎসরের সাহিত্য-সাধনের একটা হিসাব-নিকাশ করা অযৌক্তিক বলিয়া মনে করি না। আর দেখিতে হইবে, গতবৎসরের সাহিত্যের প্রকৃতি হইতে, তাহার উন্নতি বা অবনতি হইতে, মানসী কতদূর গিয়া পড়িয়াছে।

বর্ষারম্ভে 'ভবিষ্যৎ' কবিতায় শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী গাহিয়াছেন—

"ক্ষুদ্র মানবের হিয়া,
দুর্ব্বল মস্তিষ্ক নিয়া,
পঙ্গু হ'য়ে পরশিতে
চেও না আকাশ;"

বাস্তবিক ইহা যে কতদূর সত্য, তাহা আর কাহাকেও বিশেষ করিয়া বলিয়া দিতে হইবে না। আমরা আমাদিগের স্বরূপ জানিতে না পারিয়া, আমাদিগের শক্তির পরিমাণ বুঝিতে না পারিয়া, পঙ্গুর গিরিলঙ্ঘনের ন্যায় অনেক সময় সফলকাম হইতে পারি না। তাই কবি বলিতেছেন—

'এ জীবন নাট্যশালা
শুধু করে যাও খেলা—'

আপনার কর্ত্তব্যসাধন করিতে হইবে; আর মানসী-পরিচালকগণ ইহাই তাঁহাদের মূলমন্ত্র করিয়া ভগবানের নাম লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছেন।

আলোচ্যবর্ষে মানসী সুন্দর সুন্দর কবিতা-কুসুম চয়ন করিয়া মালা গাঁথিয়া আমাদিগকে উপহার দিয়াছেন। সেই অনাঘ্রাত কুসুমরাজির সুগন্ধ বহুদিন বঙ্গবাসীকে আমোদিত করিয়া রাখিবে। কবিবর রবীন্দ্রনাথের বিষাদগীতি 'তবু মরিতে হবে' কবিতায় তিনি—

'শুধু ক'রে গেনু খেলা স্রোতে ভাসাইনু ভেলা
অবহেলে সারাবেলা কাটানু ভবে
তবু মরিতে হবে।'

বলিয়া দুঃখ করিয়াছেন। এ বৎসর আমরা তাঁহার নিকট হইতে আশার মোহন-বাণী শুনিতে চাই। কবিবর দেবেন্দ্রনাথের কবিতা চতুষ্টয়ের মধ্যে 'শ্যামাঙ্গী বর্ষাসুন্দরী' অনবদ্য হইয়াছে। ইহা প্রাণে এক নূতন ভাবের সঞ্চার করিয়া দেয়—আবেশে বিহ্বল করিয়া দেয়। তাঁহার উপমাগুলিও সুন্দর। তাঁহার 'মুরলীতে' তিনি মুরলীধরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন "হে স্বামিন্! তোমার এ আত্মাবধূ শ্রীচরণে পড়ুক লুটিয়া"—এ ভাব-সম্পদ বৈষ্ণব-সাহিত্য-জগতে নূতন না হইলেও, তাঁহার লিখন-ভঙ্গী হইতে বুঝা যায়, তিনি ইহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছেন। দুঃখের সহিত বলিতে হইবে 'কোন বিশ্বনিন্দুক সমালোচকের প্রতি' তাঁহার অনন্য-দুর্লভ শক্তির অপচয়ের প্রকৃষ্টনিদর্শন। কবিত্ব হিসাবে ইহা মন্দ হয় নাই। এখানে উপমাবর্ষণে তিনি কৃপণতা করেন নাই কিন্তু এরূপ ভাবের আমরা পক্ষপাতী নই। আর এক কথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না যে, এটায় ব্যক্তিগত ভাব স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছে। সুকবি সত্যেন্দ্রনাথ এবার মানসীর প্রতি কিঞ্চিৎ বিরূপ! তাঁহার 'শরতের হাওয়ায়' সহজ সরল লঘুভঙ্গিমা আছে, পদলালিত্য আছে, কিন্তু ভাবের দীনতা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। সুকবি যতীন্দ্রমোহনের 'আগমনী,' 'কাঁসাই নদীর বাঁকে' ও 'অপরাজিতা' মনোজ্ঞ হইয়াছে। সুকবি করুণানিধানের কবিতায় একটা নূতন ভাবের প্রবাহ আসিয়াছে। ধর্ম্মভাবে অনুরঞ্জিত হইয়া তাঁহার কবিতা তিনটী—'হরিদ্বারে'

'শ্রীবৃন্দাবনে' ও 'চিরসুন্দর'—বাঙ্গালীর প্রাণে কবিত্বরসের পবিত্র নির্ম্মল আনন্দ আনিয়া দেয়। ভুজঙ্গধরের 'চিন্তা' কবিতা বেশ হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার 'একলব্য' কবিতায় ভাষার অবাধগতি নাই। উদীয়মান কবি কালিদাস রায়ের ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ। তাঁহার 'কৃষকের ব্যথা,' 'পল্লীবধূ,' 'বালিকাবধূ' ভাবসম্পদে ও পদলালিত্যে হৃদয় মাতোয়ারা হইয়া পড়ে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বর্ম্মন্ মহাশয়ের 'সেতার' কবিতাটী হৃদয়ের পর্দায় বেশ একটু আঘাত দেয়। প্রবোধচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের 'পূর্ণসুন্দর' কবিতা উপভোগ করিবার সামগ্রী; মানকুমারীর "সন্ধ্যা-তারকা' মনোজ্ঞ। কবি প্রমথনাথ রায় চৌধুরীকে পুনরায় সাহিত্য-সাধনায় ব্রতী দেখিয়া আশান্বিত হইয়াছি। জড় ও চৈতন্যের কীর্ত্তন বন্দন করিয়া সুকবি প্রিয়নাথ সেন মঙ্গল আরতি করিয়াছেন। মানসী, স্বর্গগত হেমচন্দ্রের অ-পূর্ব্ব-প্রকাশিত 'হরিদ্বার' কবিতা প্রকাশ করিয়া, সকলেরই ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। এ কবিতায় কবিবরের কবিযশঃ বিন্দুমাত্র ম্লান হয় নাই। আমরা স্পর্দ্ধার সহিত বলিতে পারি, এতগুলি সুন্দর কবিতার সমাবেশ কোন মাসিক পত্রিকায় আলোচ্যবর্ষে দেখিতে পাওয়া যায় না।

গদ্য-সাহিত্য ও আলোচনায় শ্রীগৌরহরি সেন মহাশয় "কাব্যপ্রসঙ্গে' কবিবর দেবেন্দ্রনাথের কবিত্ব-সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণ করিয়াছেন ও শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র 'বঙ্গসাহিত্যে মনোমোহন' প্রবন্ধে তাঁহার সাহিত্য-সাধনের আলোচনা করিয়া আমাদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত স্বর্গগত কবি রজনীকান্তের 'কাব্যকথা' ধরিয়াছেন মাত্র। শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী মহাশয় 'নাম' প্রবন্ধে নাম-রহস্য সুন্দরভাবে বিবৃত করিয়াছেন। ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় "বাঙ্গালার শিক্ষিত সম্প্রদায় ও ছাত্রগণের স্বাস্থ্য" প্রবন্ধে যে সকল বিষয়ের অবতারণা করিয়া সুচিন্তিত প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন, তাহা যে কেবল প্রত্যেক ছাত্রের অবশ্যপাঠ্য তাহা নহে—বাঙ্গালী মাত্রেরই ইহা পাঠ করা উচিত। এরূপ শিক্ষাপ্রদ প্রবন্ধ বঙ্গদেশের গৌরব। সুলেখক সুরসিক ললিতবাবু 'সুকুমার সাহিত্যে অনুপ্রাসে' অনুপ্রাসের প্রভাব দেখাইয়াছেন। মানসীর অন্যতম সম্পাদক শ্রীফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 'অলঙ্কার ও সঞ্চয়' ও 'ফাগুনমাসের কথায়' অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য আছে। "বিজ্ঞাপনের নমুনা" উপাদেয় ও উপভোগ্য হইয়াছে। 'সমালোচনার নমুনা' অনুকৃতি হইলেও মাঝে মাঝে ব্যক্তিবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া যে লেখা হইয়াছে, তাহা বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে—আমরা এরূপ লেখার পক্ষপাতী নই। দোষ সংশোধন করিবার জন্য যতটুকু আবশ্যক, ততটুকুই ভাল—বেশী কিছুই নয়। লেখকের নাম না থাকিলেও তাঁহার লেখার মুন্সিয়ানা দেখিয়া পাকা হাত বলিয়াই বোধ হয়, তাই এই কয়টা কথা বলিলাম। বিপিনবাবুর 'গীতাঞ্জলীর' সমালোচনা পড়িয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। এরূপ নির্ভীকভাবে সত্যকথা বলিবার ক্ষমতা অনেকের নাই। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয় 'অনর্ঘ রাঘবের' অনুবাদ করিয়া আমাদের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। মোটের উপর গদ্যসাহিত্য ও আলোচনায় আশানুরূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়

নাই। প্রতিমাসে অন্ততঃ একটী করিয়া এমন সুচিন্তিত প্রবন্ধ থাকা উচিত, যাহা স্থায়ী সাহিত্যে স্থান রাখিবার দাবী করিতে পারে।

জীবন-চরিতে শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় দার্শনিক মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের জীবন সুন্দর ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় 'সুরথরাজা'র সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা বলিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় গিরিশবাবুর জীবনবৃত্তের সমালোচনা আরম্ভ করিয়া অসুস্থ হইয়া পড়ায় এক মাস উহা আর প্রকাশিত হয় নাই। আশা করি তিনি শীঘ্র নিরাময় হইয়া আরব্ধ কার্য্য শেষ করিবেন। শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় মহাপুরুষ কাঙ্গাল হরিনাথের জীবন চরিত লিখিতে বসিয়া যে সকল জ্ঞানগর্ভ কথার অবতারণা করিতেছেন, তাহার জন্য আমরা তাহার নিকট চিরঋণী থাকিব। এরূপ ভাবে জীবন চরিত লেখা বাঙ্গলায় এই প্রথম। প্রত্যেক গীতের মধ্য দিয়া তিনি সাধকের চরিত্র অঙ্কন করিতেছেন। তাঁহার জীবনের চিরসত্যগুলি তিনি তাঁহার সুধাস্রাবী সঙ্গীতের ভিতর রাখিয়া গিয়াছেন, জলধর বাবু সেগুলি লোক-লোচনের গোচরীভূত করিয়া আমাদিগের সম্মুখে একটা বিরাট্ আদর্শ চরিত্র স্থাপন করিয়াছেন। শিল্পার কলাকুশলে, লেখন-ভঙ্গীর গুণে সাধক প্রবরের জীবন সজীব হইয়া আমাদিগকে সত্যের পথে চলিতে ইঙ্গিত করিতেছে।

'অধ্যাত্মবাদ ও ভারতের দুর্দ্দশা' প্রবন্ধে জলদকান্তি ঘোষ মহাশয় দেখাইয়াছেন, আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করিতে হইলে যে বহির্বিষয়ক উন্নতি সাধিত হইতে পারে না, তাহা নহে, বরং যাহারা অন্তর্বিষয়ক উন্নতি দেখাইতে পারে, তাহারা তদনুরূপ বহির্ব্বিষয়ক উন্নতিও লাভ করিতে পারে।

এ বৎসর উল্লেখযোগ্য কোন দার্শনিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় নাই। ভ্রমণ বিষয়ক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ এ বৎসর প্রকাশিত হয় নাই; তবে ডাঃ ইন্দুমাধবমল্লিক মহাশয়ের 'কিউ গার্ডেনের' বিবরণ মন্দ হয় নাই।

ঐতিহাসিক প্রবন্ধের মধ্যে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শশাঙ্ক' চলিতেছে; ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘসিটি বেগম সুন্দর হইয়াছে। উভয় প্রবন্ধের ভাষা সুন্দর ও দুইটীতে ঐতিহাসিক তথ্যের সমাবেশ আছে। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার মহাশয় এবৎসর 'বাঙ্গালার ইতিহাসে একছত্র' ও 'মহম্মদ পুরের উপকণ্ঠ' প্রবন্ধ দিয়া আমাদিগকে ভুলাইয়াছেন। তাঁহার নিকট হইতে এই যৎকিঞ্চিৎ দানের প্রত্যাশা আমরা করি না। এ বৎসর মানসী গভীর গবেষণাপূর্ণ ঐতিহাসিক বা প্রত্নতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় কোন নূতন তথ্যের সমাচার দিতে পারেন নাই। আলোচ্যবর্ষে মাসিক সাহিত্যের মধ্যে 'সাহিত্য' এ বিষয়ে সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে। বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি হইতে প্রকাশিত গৌড়রাজমালার ভূমিকা, 'সাগরিকা' ও ভারতশিল্পের ইতিহাসে' অক্ষয় বাবু, 'বঙ্গের ভাস্কর্য্যে' পাঁচকড়ি বাবু, 'বঙ্গরাজ শ্বশুর জগদ্বিজয়ে' নগেন বাবু ও 'নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসনে' রাধাগোবিন্দ বাবু বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। তাঁহাদিগের পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের জন্য আমরা তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞ। এ

ক্ষুদ্র লেখকও 'যুগ-বিচারে কল্যন্ধ' নামক একটা ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লিখিয়াছে।

গল্পের মধ্যে প্রভাত বাবুর 'বাল্যবন্ধু' উপাদেয় হইয়াছে। বঙ্গসাহিত্যে এরূপ সুন্দর গল্পের সংখ্যা বড়ই বিরল। গল্পলেখকগণ যদি গল্পে 'আর্ট' 'আর্ট' করিয়া চীৎকার না করিয়া, তাহা যে কি বস্তু এইরূপ সুন্দর সুন্দর গল্প হইতে বুঝিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে শিক্ষালাভ করিবেন সন্দেহ নাই। এই প্রসঙ্গে গল্পলেখক মহাশয়েরা নষ্টাচার্য্য মহাশয়ের 'গল্পবধ' প্রবন্ধ পাঠ করিলেও ভাল হয়। শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথের করুণরসাত্মক 'মা ও ছেলে' আমাদের বেশ ভাল লাগিয়াছে। সুবোধ বাবুর 'সন্ধ্যা' আলো ও আঁধারের মিলনের মত সুন্দর হইয়াছে। ফকিরবাবুর 'পরাভবে'ও বিশেষত্ব আছে। খগেন্দ্র বাবুর 'ঘুমের পাহাড়' গল্প পড়িয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। হেমেন্দ্র বাবুর 'চোরের চালাকি' নভেল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত গল্পবিশেষের অনুবাদ না হইলে সুন্দর বলিতাম। শ্রীযুক্ত হরিসাধন বাবুর 'সাহাজাদা খসুরু' উপন্যাস চলিতেছে— ইহাতে মোগল সাম্রাজ্যের তদানীন্তন আভ্যন্তরিক চিত্র বেশ ফুটিয়া উঠিতেছে।

এবার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে মানসীর একটু বিশেষত্ব আছে—গর্ব্ব করিবার কথাও আছে। 'অর্থ বিজ্ঞান', 'অর্থশাস্ত্র'—উপেন্দ্রনারায়ণ বাগচী মহাশয়ের সুচিন্তিত প্রবন্ধ। শ্রীযুক্ত ভীমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 'আমাদের উদ্ভিদ রহস্য' প্রবন্ধ বেশ মনোজ্ঞ হইয়াছে। এরূপ প্রবন্ধের প্রচলনে দেশের ও দশের কল্যাণ সাধিত হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষাল মহাশয়ের ভারতীয় 'হস্তি-শাস্ত্র' উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ; হীরালাল ঘোষাল মহাশয়ের ফলিত জ্যোতিষ সুন্দর হইয়াছে। যদুনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় 'সামাজিক সমস্যা' নামে প্রবন্ধ লিখিয়া সমাজবিজ্ঞানের অনেক তথ্য উদ্ঘাটিত করিতেছেন। তিনি বিজ্ঞ সমালোচকের আসন গ্রহণ না করিয়া দর্শকের আসন গ্রহণ করিয়া সামাজিক ব্যাধিগুলির উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি এ গুলির প্রতিকার-প্রার্থী।

বিবিধ-বিষয়ক প্রবন্ধের ভিতর জলধর বাবুর 'একটী পুরাতন কথা' শুধু চিত্তাকর্ষক নয়—ভাব সঞ্চরণের (Telepathyর) দৃষ্টান্ত স্বরূপ। এ বিষয় লইয়া পাশ্চাত্য দার্শনিক পণ্ডিতমণ্ডলীর ভিতর বেশ একটু আলোচনা চলিতেছে। আসন্ন বিপদের সংবাদ চিন্তার সাহায্যে যে জানিতে পারা যায় তাহার নিদর্শন একবার আমরাও পাইয়াছিলাম। গত ১৯০০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর আমার বাল্যবন্ধু শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দাঁর জ্যেষ্ঠা সহোদরার মৃত্যু হইলে আমরা তাঁহার পিতা শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দাঁ বি, এল মহাশয়ের নিকট তেজপুরে সংবাদ পাঠাই। তিনি স্বয়ং পত্র লিখিয়া তাঁহার কন্যার মৃত্যুর দিন ও সময়, এমন কি মিনিট পর্য্যন্ত লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। অবশ্য বলিয়া রাখা উচিত, তখন আমাদের এ বিষয়ে তাদৃশ আস্থা ছিল না—বিশ্বাসই করিতাম না, আর মহেন্দ্র বাবুও ব্রাহ্ম; তিনি যে অতীন্দ্রিয় বিষয়ে বিশ্বাস করিতেন এই ঘটনার পূর্ব্বে তাঁহার নিকট কখনও শুনি নাই। এই দার্শনিক বিষয় সম্বন্ধে একটু বিশেষভাবে আলোচনা হইলে ভাল হয়। কৃষ্ণবিহারী গুপ্তের 'দশম পাদশা কা গ্রন্থ'

মন্দ হয় নাই। গৌরহরি সেন মহাশয়ের 'দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন কীর্ত্তি' প্রবন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য কথা আছে।

মানসীর চিত্রগুলি পূর্ব্বের মত চিত্তাকর্ষক। সেগুলি প্রাচীন কলাপদ্ধতির অনুসারী না হইলেও সুন্দর।

গতবৎসরের আলোচনা হইতে আমরা দেখিতে পাই, মানসীতে একটী ভিন্ন দার্শনিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে আমাদের দুঃখ করিবার কিছুই নাই। ধর্ম্ম ও দর্শন-সম্বন্ধীয় আলোচনা একাধিক মাসিক পত্রিকায় নিয়মিত রূপে আলোচিত হইয়া আসিতেছে। এক্ষণে আমাদিগের কর্ত্তব্য, আমাদের অভাব ও অভিযোগ দূর করিয়া গৃহাঙ্গণ ধনধান্যে পূর্ণ করা। অতএব অর্থাগমের সুবিধার নিয়মগুলি সাধারণ্যে প্রচারকল্পে অর্থবিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাবলী যত বেশী আলোচিত হয়, ততই দেশের মঙ্গল। আর ঐ আলোচনা-প্রসূত জ্ঞান-রাশির সাহায্যে ব্যবহারিক নিয়মে কার্য্য করিয়া আমাদের উন্নতি লাভ করিতে হইবে এবং ক্রমশঃ জগতের বাণিজ্য ব্যবসায়ের সংঘর্ষে আসিতে হইবে; কিন্তু ব্যবহারিক শিল্প-বিজ্ঞান প্রচলনের পূর্ব্বে আমাদিগের নৈতিক চরিত্রের উন্নতি করিতে হইবে। চরিত্রবান না হইলে কোন কর্ম্মে সাফল্য লাভ করা যায় না; তাই চরিত্রের আলোচনাও অবশ্য করণীয়। শরীরের উন্নতি সাধন না করিলে মনের উন্নতি সুদূর পরাহত, তাই শরীরের স্বাস্থ্যের দিকে সকলেরই লক্ষ্য রাখা উচিত। আমরা আগামী বর্ষে মানসীতে স্বাস্থ্যোন্নতি-বিষয়ক প্রবন্ধাবলীও প্রকাশিত হইতে দেখিলে সুখী হইব। আশার বিষয় বিচক্ষণ ডাক্তার চুণীলাল বসু মহাশয় এ বিষয়ে ভারতীতে "শরীর স্বাস্থ্য-বিধান" নামে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিতেছেন; ঐসকল প্রবন্ধ সকলেরই পাঠ করা উচিত। শিল্প-বিষয়ক দুই চারিটী প্রবন্ধও আগামী বর্ষে মানসীতে প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

এক্ষণে আমরা বঙ্গভাষায় প্রকাশিত পুস্তক সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিয়া উপসংহার করিব।

আলোচ্যবর্ষে ফাল্গুন হইতে মাঘ পর্য্যন্ত অন্যূন ৯২৩ খানি নূতন বাঙ্গালা পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু আলোচ্যবর্ষের মুদ্রিত বাঙ্গালা পুস্তকের সংখ্যা ১২৩৭। তন্মধ্যে যে সকল পুস্তকের নূতন সংস্করণ হইয়াছে, তাহাদের সংখ্যা ৩৩৫। এগুলির সংখ্যা, তালিকা-ভুক্ত হয় নাই। ইহাদের মধ্যে বিশুদ্ধ বাঙ্গালা, বাঙ্গালা ও সংস্কৃতে প্রকাশিত ৮২৮ খানি পুস্তকের বিষয়ভেদে শ্রেণীবিভাগ করিলে, দেখা যায়——

আলোচ্য বর্ষে,——

কলাবিদ্যায়	২৬
জীবনবৃত্তান্তে	৩৮
নাটকাদিতে	৫৭
উপন্যাসে	৮৬
ইতিহাস-ভূগোলে	৫২
সাহিত্যে	৬৩

আইনে	১০
চিকিৎসায়	৪৭
দর্শনে	১৮
কাব্য ও কবিতায়	৬৪
ধর্ম্মবিষয়ে	১৯৫
ভ্রমণ-বিবরণে	১৩
বিজ্ঞানে	১৫
বিবিধ বিষয়ে	১৫৪

মোট ৮২৮ খানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে।

খৃষ্টানদিগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম্মপুস্তকগুলি তালিকামধ্যে ধরা হয় নাই।

পূর্ব্বোক্ত বিভাগের মধ্যে——

ইতিহাস ও ভূগোলের	৫২	খানির মধ্যে	৩৪	খানি
সাহিত্যের	৫৩	„	৩৫	খানি
কাব্য ও কবিতায়	৬৪	„	২৯	খানি
বিজ্ঞান-বিষয়ক	১৫	„	১২	খানি
বিবিধ „	১৫৪	„	৭০	খানি

মোট ১৮০ খানি পুস্তক স্কুলপাঠ্য

জীবন বৃত্তান্ত - এ বিভাগের ৩৮ খানি পুস্তকের মধ্যে ৯ খানি উল্লেখযোগ্য, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ৪ খানি শিশুদিগের জন্য :—

শাক্যসিংহ ... অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
ভগীরথ ... ঐ
ঠাকুর সর্ব্বানন্দ ... নিশিকান্ত চক্রবর্ত্তী
রামলক্ষ্মণ ... ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী

এ শ্রেণীর ৩ খানি পুস্তক আমাদের বেশ ভাল লাগিয়াছে।

কর্ম্মবীর সুরেন্দ্রনাথ ... সূর্য্যকুমার ঘোষাল
নিবেদিতা ... শ্রীমতী সরলাবালা দাসী
জয়দেব ... সতীশচন্দ্র রায়

শ্রীমতী কুমুদিনী মিত্রের জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনীর অনুবাদ মন্দ হয় নয়।

নাটকাদি—এ বিভাগের ৫৭ খানি পুস্তকের মধ্যে ১৩ খানি উল্লেখযোগ্য : তন্মধ্যে নিম্নলিখিত নাটকগুলি চিত্তাকর্ষক :—

মিডিয়া ও খাঁজাহান—শ্রীক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

রূপমল্ল ... রাধিকাপ্রসাদ দত্ত
গৃহলক্ষ্মী ... গিরিশচন্দ্র ঘোষ

পরপারে	...	দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
দেবদূত (নাট্যকাব্য)	...	দেবকুমার রায় চৌধুরী

উপন্যাস ও ছোটগল্প—উপন্যাসের ভিতর ১৬খানি উল্লেখযোগ্য; তন্মধ্যে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি উপন্যাস পাঠকের কৌতূহল চরিতার্থ করিতে পারিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস :—

১। পোষ্যপুত্র	...	অনুরূপা দেবী
২। নবীনসন্ন্যাসী	...	প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
৩। মৃত্যুমিলন	...	হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
৪। নারীর ভাগ্য চিত্র	...	জনৈক মহিলা
৫। রাজা দেবীদাস	...	সত্যরঞ্জন রায়
৬। বৈষ্ণবী	...	সত্যেন্দ্রকুমার বসু

ইহাদিগের ভিতর 'পোষ্যপুত্র' ও 'নবীনসন্ন্যাসী' আমাদের বেশ ভাল লাগিয়াছে; 'নবীন সন্ন্যাসী'র গদাই পালের চরিত্র বঙ্গসাহিত্যে এক অভিনব চিত্র। প্রভাত বাবু ইহাতে তাঁহার ভূয়োদর্শন ফলে মানব চরিত্র অঙ্কনে ও মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে বেশ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।

এবৎসর ছোটগল্পের বইএর সংখ্যা খুব বাড়িয়াছে। আজকাল আমরা একরূপ গল্পখোর হইয়া পড়িয়াছি, গল্প পড়িতে আমরা খুব ভালবাসি; কিন্তু পুস্তকগুলির অধিকাংশ পাঠ করিয়া আমরা হতাশ হইয়া পড়ি। সুধীন্দ্র বাবুর 'করঙ্ক' ফকির বাবুর 'নবান্ন' ও খগেন্দ্র বাবুর 'নীলাম্বরী' পাঠ করিয়া আমরা প্রীতিলাভ করিয়াছি। এই তিনখানি ব্যতীত নিম্নলিখিত বইগুলিতে কয়েকটী করিয়া সুন্দর গল্পের সমাবেশ আছে :—

মঞ্জুরী ও তন্বী		গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
ঝাঁপি	...	মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়
নির্ম্মাল্য	...	শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী
সপ্তক	...	উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
আলেখ্য	...	ভূপেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী
ধূপছায়া	...	চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
যূথিকা	...	আমোদিনী ঘোষ
গল্প	...	দীনেশচন্দ্র সেন
চাটনী (মজার গল্প)	...	যতীন্দ্রকিশোর চৌধুরী
কাহিনী	...	গুরুদাস আদক
গল্পের বই	...	সুখলতা রাও

এতদ্ব্যতীত শিশুদিগের জন্য লিখিত নিম্নলিখিত ৩ খানি বইও সুন্দর হইয়াছে—

১। আহ্লাদে আটখানা	...	ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
২। স্বপ্নের বাতি	...	সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
৩। চারু ও হারু	...	দক্ষিণারঞ্জন মিত্র

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী

(ঙ) ইতিহাস-ভূগোল—এ বিভাগের ৫২ খানি পুস্তকের মধ্যে ১৩ খানি উল্লেখ যোগ্য ; তন্মধ্যে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলিতে জানিবার ও শিখিবার বিষয়ও অনেক নূতন তথ্যের সমাবেশ আছে। লেখক মহাশয়দিগের অনুসন্ধিৎসা ও পরিশ্রম প্রশংসার যোগ্য

১।	আস্তের গম্ভীরা	...	হরিদাস পালিত
২।	গৌড়রাজমালা	...	রমাপ্রসাদ চন্দ
৩।	গৌড়লেখমালা	...	অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়
৪।	শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত	...	অচ্যুতচরণ চৌধুরী
৫।	কাছাড়ের ইতিবৃত্ত	...	উপেন্দ্রনাথ গুহ
৬।	জগৎশেঠ	...	শ্রীনিখিলনাথ রায়
৭।	পৃথিবীর ইতিহাস (তৃতীয় ভাগ)	...	দুর্গাদাস লাহিড়ী
৮।	ঢাকার ইতিহাস (১ম খণ্ড)	...	যতীন্দ্রমোহন রায়

(চ) সাহিত্য—এ বিভাগের ৫৩ খানি পুস্তকের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের জীবন স্মৃতি ও ছিন্নপত্র, ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মুদীর দোকান, সুধীন্দ্র বাবুর 'প্রসঙ্গ' বিনয়কুমার সরকারের 'সাধনা' মুকুন্দ দেব মুখোপাধ্যায়ের 'সদালাপ' বিধুভূষণ সরকারের 'শ্রীগৌরাঙ্গ" ও সরোজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃতি" উল্লেখযোগ্য।

(ঞ) কাব্য ও কবিতা—এ বিভাগের ৬৪ খানি পুস্তকের মধ্যে নিম্নলিখিত ১৪ খানি সুন্দর হইয়াছে।

১—৭ গোলাপগুচ্ছ, পারিজাতগুচ্ছ, শেফালীগুচ্ছ, অপূর্ব্ব ব্রজাঙ্গনা, অপূর্ব্ব বীরাঙ্গনা, অপূর্ব্ব নৈবেদ্য, অপূর্ব্ব শিশুমঙ্গল—দেবেন্দ্রনাথ সেন

৮।	এষা	...	অক্ষয়কুমার বড়াল
৯।	ত্রিবেণী	...	দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
১০।	বৈতানিক	...	সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১১।	কুহু ও কেকা	...	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
১২।	উজানি—	...	কুমুদরঞ্জন মল্লিক
১৩।	ডালি	...	সৈয়দ এমদাদ আলি

(ঠ) ভ্রমণ—এ বিভাগের ১৩ খানি পুস্তকের মধ্যে নিম্নলিখিত ৪ খানি উল্লেখ যোগ্য।

১।	ইউরোপ ভ্রমণ	...	নরেন্দ্রকুমার বসু
২।	উত্তরাখণ্ড পরিক্রমা	...	সারদা প্রসাদ স্মৃতিতীর্থ বিদ্যাবিনোদ
৩।	মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী	...	কাশীক্ষেত্র
৪।	নেপালে বাঙ্গালী	...	হেমলতা দেবী

(ড) বিজ্ঞান—এ বিভাগের ১৫ খানি পুস্তকের মধ্যে নিম্নলিখিত ৪ খানি উল্লেখযোগ্য।

১। বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার—জগদানন্দ রায়
২। অর্থনীতি ... যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার
৩। অর্থশাস্ত্র (১ম কল্প) ... ঐ
৪। জাতিভেদ ... দিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য

(ঝ) দর্শন—এ বিভাগের ১৮ খানি পুস্তকের মধ্যে নিম্নলিখিত ২ খানি উল্লেখযোগ্য।

১। কালের স্রোত ... যোগেশচন্দ্র সিংহ
২। কঠোপনিষদের পদ্যানুবাদ ... যোগীন্দ্রনাথ বসু

(ট)—ধর্ম্ম এ বিভাগের ১৯৫ খানি পুস্তকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পুস্তক বড়ই বিরল—অধিকাংশই অনুবাদ বামাচরণ বসু মহাশয় 'সাধন তত্ব বিচারে' বৈষ্ণব ধর্ম্ম সাধনের গূঢ়তত্ব সরল ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন।

গত বৎসরের বঙ্গসাহিত্যের যতদূর আমরা আলোচনা করিবার সুবিধা পাইয়াছি, তাহা হইতে দেখিতে পাই সর্ব্ববিভাগেই উল্লেখযোগ্য পুস্তকের সংখ্যা মন্দ নয়; কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইবে উৎকৃষ্ট পুস্তক যাহা স্থায়ী সাহিত্যে আপনার আসন অপ্রতিহত রাখিতে পারে, এরূপ পুস্তকের সংখ্যা বিরল। সুখের বিষয় কাব্য ও ইতিহাসে আশানুরূপ সুফল পাওয়া গিয়াছে। গভীর দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, আজকালকার অধিকাংশ লেখকই ভাষার উন্নতির দিকে অবহিত নহেন, ব্যাকরণের দিকে তাঁহারা দৃকপাতই করেন না, প্রচলিত বাণানের তাঁহারা পক্ষপাতী নহেন। তাঁহাদের মতে বাণান উচ্চারণগত (Phonetic) হওয়া চাই, কিন্তু আমরা বুঝিতে পারি না প্রাদেশিক উচ্চারণ বৈলক্ষণ্যের ভিতর দিয়া বাণানের সার্ব্বজনীন সাম্য কিরূপে আসিতে পারে। ভাষা কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা লইয়া একটু আলোচনা যে হইতেছে না তাহা নহে। "ভারতী" পত্রিকায় প্রমথ বাবু সাধু ভাষা বনাম বাবু বাঙ্গালা প্রবন্ধে ভাষার গঠন সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন; অবশ্য তাহার সকল মতের যে আমরা সমর্থন করি, তাহা বলিতে পারি না; তবে এরূপ প্রবন্ধের বহুল আলোচনা আমরা দেখিতে চাই। ভাষা সম্বন্ধে একটা কথা বলিলে বোধ হয় দোষ হইবে না যে যখন আমরা সাধুভাষা ব্যবহার করিব, তখন আমাদের সংস্কৃতব্যাকরণের নিয়মাবলী অনুসরণ করা কর্ত্তব্য, আর যখন চলিত প্রাদেশিক শব্দ ব্যবহার করিব তখন তাহার নিয়মমতই চলিব। এরূপ না করিলে 'গুরুচণ্ডালী' দোষ আসিয়া পড়িবে—"শব পোড়া" মড়াদাহ' লিখিয়া বসিব। আমরা পুরাতনপন্থী—সংরক্ষণশীল বাঙ্গালী। বিদ্যাসাগর-অক্ষয়-ভূদেব-প্রবর্ত্তিত বঙ্গভাষার অঙ্গ সৌষ্ঠব ও পারিপাট্য বিধান করিয়া বঙ্কিমবাবু যে ভাষা-জননীর নবপ্রাণ সঞ্চার করিয়া,নূতন জীবনীশক্তি দিয়া জগতের সাহিত্যে বঙ্গ-সাহিত্যেরআসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, আমরা সেই ভাষার পক্ষপাতী আর সেই ভাষার স্থায়িত্ব-করে যাঁহারা সাহায্য করেন, তাঁহারাও আমাদিগের ধন্যবাদার্হ। মাইকেল মধুসূদনের জীবন-চরিত-ব্যাখ্যাতা যোগীন্দ্রবাবু, পাঁচকড়ি বাবু, রাজেন্দ্র বাবু

নিখিল বাবু ও অক্ষয় বাবুর ভাষার আমরা চিরদিনই পক্ষপাতী। আলোচ্যবর্ষে খগেন্দ্র বাবু 'নীলাম্বরী' নামে একখানি সুন্দর গল্পের বই প্রকাশ করিয়াছেন। এ পুস্তকের ভাষা পড়িয়া আমরা প্রীত হইয়াছি—প্রকৃত কবিত্বের রসাস্বাদ করিয়াছি; এবং লেখক মহাশয়কে প্রাণের সহিত ধন্যবাদ দিয়াছি। যিনি এই ভাষার উচ্ছৃঙ্খলতার দিনে ইহার বিশুদ্ধি রক্ষণে যত্ন করেন, তাঁহার লেখনীর উপর পুষ্পচন্দন বর্ষিত হউক।

এক্ষণে আমি মানসীর পরিচালকগণের পক্ষ হইতে, যাঁহাদের অদম্য উৎসাহে অক্লান্ত পরিশ্রমে—যাঁহাদের অমর লেখনীগুণে—যাঁহাদের সৎপরামর্শে মানসী উন্নতির পথে চলিতে সমর্থ হইয়াছে, তাঁহাদিগকে প্রাণের সহিত ধন্যবাদ জানাইতেছি। যে সকল সাহিত্যরথিদিগের কৃপা হইতে মানসী আজিও বঞ্চিত আছে, আশা করি এ বৎসর তাহাদের কৃপা-কটাক্ষ লাভ করিয়া মানসী আপনাকে কৃতার্থ মনে করিবে. মঙ্গলময়ের নাম স্মরণ করিয়া মানসী নূতন উদ্যমে নূতন আশা লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইল। ভগবান্ মানসীর সহায় হউন।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ.

একনিষ্ঠ সাহিত্যসেবী

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী

হাসি মুখ, অন্তরেও ভাসে হাসিরাশি,
স্নেহ-নির্ঝরিণী সেথা বহে কুলকুলে;
মিষ্ট কথা, ব্যবহার—তাও মিষ্ট অতি
হে দেবতা, এসেছ কি হেথা পথ ভুলে'?

'পরকে আপন করা' নয় উপকথা,
আপনি ত দেখায়েছ প্রমাণ তাহার,
দেশে বা বিদেশে, কত, না হয় গণন—
'দাদা' বলি' ছুটে লোক, পিছনে তোমার!

নিজ বক্ষ-রক্ত দিয়া করেছ গঠন
বিপুল সাহিত্য-কেন্দ্র, মায়ের মন্দির;
ছেঁড়া-পুথি, ইট-কাঠ নানা উপচার—
অপূর্ব্ব পূজার অর্ঘ্য এনেছ সুধীর!

দুঃখ-দৈন্য, শত কষ্ট, অভাব তাড়না—
কিছুতেই কোন দিন, দেখি নি টলিতে;
বন্ধুদের অত্যাচারে, মন্দ ব্যবহারে
কোন কথা কখনও শুনি নি বলিতে।

'সহ্য-করা' মহানীতি করিয়া পালন,
যে আদর্শ দেখায়েছ—অপূর্ব্ব উজ্জ্বল;
তিরস্কার পুরস্কার সকলি সমান,
জানি না ধর ও হৃদে কি মহান বল।

হেরি তব অপূর্ব্ব এ আদর্শ সুন্দর,
পুজিবারে হয় সাধ, নানা উপচারে;
পুষ্পিত হইয়া উঠে চিত্ত পারিজাত
শ্রীকণ্ঠ সাজাতে তব নব পুষ্পহারে।

শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

দীর্ঘায়ুরহস্য।

দীর্ঘজীবন সকলেই কামনা করেন; কিন্তু কি করিলে দীর্ঘজীবন হয়, সে কথা ঠিক বলা বড় কঠিন—অসম্ভব বলিলেও হয়। সেই কারণে আমরা যখন দেখি যে, দেশের কোন গন্যমান্য লোক আশি বৎসর অতিক্রম করিয়া একাশি বৎসরে পড়িয়াছেন, তখন তাঁহার জীবনের সকল কথা ও জীবনযাপনের রীতি নীতি প্রভৃতি বিষয় জানিবার জন্য আমাদের খুব একটা আগ্রহ জন্মায়। Fredric Harrison (ফ্রেড্রিক্ হ্যারিসন্) সাহেব সম্প্রতি ৮১ বৎসরে পদার্পণ করিয়া বেশ সুস্থ ও সবল আছেন। কি করিলে দীর্ঘায়ু হয়, সে বিষয়ে হ্যারিসন সাহেব Daily Mail পত্রিকার জনৈক প্রতিনিধির নিকট কয়েকটি কথা বলেন, আমরা নিম্নে হ্যারিসন্ সাহেবের কথা কয়টি উদ্ধৃত করিলাম।

(১ম) কখনও তামাক, মদ, কি অন্য কোন নেশার জিনিষ ব্যবহার বা গুরুপাক খাদ্য আহার করা উচিত নয়।

(২য়) আহারে উপবেশন করিয়া সম্পূর্ণ ক্ষুধা মিটিবার পূর্ব্বেই উঠিয়া পড়িবে।

(৩য়) প্রত্যহ অন্ততঃ পক্ষে দুই ঘণ্টা মুক্তবায়ুতে ভ্রমণ বিধেয়।

(৪র্থ) দিবাভাগে নিদ্রা যাইও না; রাত্রে ৮ ঘণ্টা মাত্র নিদ্রা যাইবে।

(৫ম) আপনার অবস্থাতে সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত থাকিবে; সুখ দুঃখ, ভাল মন্দ সকল অবস্থায় অবিচলিত থাকাই কর্ত্তব্য। Lord Strathcona (লর্ডষ্ট্রাথকোনা) এখন ৯২ বৎসরে পড়িয়াছেন; এত অধিক বয়স তবুও ইঁহার বেশ শক্তি সামর্থ্য বর্ত্তমান আছে। ইনিও হ্যারিসন সাহেবের প্রত্যেক কথাটিরই সমর্থন করেন। ইনি দিবসে দুই খায়ের বেশি ভোজন করেন না। অতিভোজনকে ইনি আয়ুক্ষয়ের প্রধানতম কারণ বলিয়া মনে করেন। ইঁহার খাদ্যের মধ্যে মাংস প্রায়ই থাকে না—যদি কখন থাকে, তাহা এত সামান্য যে, ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। ইনি ৭০ বৎসর পূর্ব্বে

তামাক সেবন করিতেন—তাহার পর আর কখন ভুলক্রমেও তামাক স্পর্শ করেন নাই। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্ত ছয় ঘণ্টার বেশি নিদ্রা অনাবশ্যক বলিয়া মনে করেন। Count Tolstoi (কাউণ্ট টলষ্টই) খুবই প্রাচীন হইয়াছিলেন। লোকে ইঁহাকে "Grand old man of Russia" বলিয়া বিশেষ ভক্তিশ্রদ্ধা করিত। মৃত্যুর কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে টলষ্টই রুষিয়াবাসীদের কাছে, কি করিলে দীর্ঘায়ু লাভ হয়, সে বিষয়ে কতকগুলি নিয়মের উল্লেখ করিয়াছিলেন; সেই নিয়মগুলি নিয়ে প্রদত্ত হইল;—দিনরাত সকল সময় বিশুদ্ধ বায়ুসেবন করা; প্রতিদিন নিয়মমত পরিশ্রম ও ব্যায়াম করা; প্রতিদিন স্নান করা; প্রয়োজনের অধিক কাপড়-চোপড় না পরা; প্রশস্ত খট্‌খটে ঘরে বসবাস করা; সর্ব্বদা পবিত্র থাকিতে চেষ্টা করা। এ সকল ব্যতীত তিনি আরও একটি বিষয়ের কথা বলেন। স্বাস্থ্যরক্ষা ও দীর্ঘায়ুলাভ করিবার পক্ষে সেটিও কম আবশ্যক নহে। সে বিষয়টি আর অন্য কিছু নহে, বড় বড় ভাল ভাল কাজ করিয়া আপনার জীবনকে গৌরবান্বিত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করা।

Moltke (মোল্‌ট্‌কে) ৯০ বৎসরেরও বেশি জীবিত ছিলেন। ইনি সকল বিষয়েই বিলক্ষণ মিতাচারী ছিলেন। ইনি কখনও ২৪ ঘণ্টার জন্ত গৃহকার্য্যে আবদ্ধ থাকিতেন না, শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা সকল ঋতুতেই ইঁহার দুই-ঘণ্টা কাল বাহিরে বেড়ান চাই। সম্ভ্রান্ত Chamber's Journal চেম্বার্স্‌ জার্ণাল) নামক পত্রিকায়, Mr H. O. Bruce (মিঃ এইচ, ও, ব্রুস্‌) আমেরিকার ২৪ জন শতায়ুব্যক্তির জীবনরহস্য প্রকাশ করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে ১৮জন স্ত্রীলোক, অবশিষ্ট পুরুষ। সকল দেশেই দেখিতে পাওয়া যায়, পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোক মোটের উপর বেশি দিন জীবিত থাকে। ইহার একটা প্রধান কারণ এই যে, পুরুষকে অধিকাংশ সময় উপার্জ্জনের নিমিত্ত ঘরের বাহিরে থাকিতে হয়, সেই কারণে, পুরুষের পক্ষে দৈবদুর্ঘটনা কিম্বা রোগের আক্রমনের সম্ভাবনা যতটা, অন্তঃপুরবাসিনী নারীর পক্ষে ততটা নহে। ইহা ছাড়া পুরুষকে যেমন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিতে হয়, নারীকে সাধারণতঃ সেরূপ করিতে হয় না। স্ত্রীলোকের পক্ষে দীর্ঘায়ুলাভের ইহা বড় কম সুবিধার কথা নহে। এই ২৪ জন শতায়ুব্যক্তির কেহই অবিবাহিত ছিলেন না। ব্রুস্‌ ও অন্যান্ত অনেক পণ্ডিতের ধারণা যে, বিবাহ করিলে মানুষের পরমায়ু বৃদ্ধি হয়। বিবাহের দ্বারা সাক্ষাৎ ভাবে কি করিয়া পরমায়ু বাড়ে, তা ঠিক বোঝা যায় না। তবে একথা অবশ্য স্বীকার করি, বিবাহিত জীবনে একটা সুবিধা আছে, বিবাহ করিলে মানুষের দায়িত্ব জ্ঞান হয়। পরিবার প্রতিপালনের জন্ত পরিশ্রম করিতে হয়। বিবাহিত ব্যক্তির অলসভাবে দিন কাটাইবার উপায় নাই। আলস্য যেমন আয়ুহরণ করে, এমন অন্য কিছুতে করেনা। ইহা ভিন্ন, বিবাহ করিলে দেখিবার শুনিবার যত্ন করিবার একজন লোক হয়, স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে ইহা যে সুবিধাকর, তাহাতে আর কোন সন্দেহই নাই। এই ২৪ জন ব্যক্তির মধ্যে কয়েকজন খুবই মিতাচারী ছিলেন, তাঁহারা জীবনে কখনও কোনরূপ ঔষধ সেবন করে নাই। তাঁহাদের বিশ্বাস, মিতাচারী হওয়া এবং

ঔষধ সেবন না করার জন্য এত দিন জীবিত থাকিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একটি ভদ্রমহিলা ও আর একটি "ভবঘুরে" নিষ্কর্ম্মা লোক ছিলেন। মহিলাটি দিনে তিনবার করিয়া 'বার্গাণ্ডী' মদ খাইতেন এবং ইহাই যে তাঁহার শতায়ুর একমাত্র কারণ, এমন বিশ্বাস করিতেন। ভবঘুরে লোকটি জীবনে কোন দিনই কোন নিয়ম রক্ষা করে নাই। তাঁহার বিশ্বাস সেই জন্যই সে অত দিন বাঁচিয়া থাকিতে পারিয়াছে। সকলেই বলে, এবং আমরাও তাহা স্বীকার না করি এমন নয় যে, অমিতাচার করলে স্বাস্থ্য নাশ ও পরমায়ু হ্রাস হয়। কিন্তু অমিতাচার ও মিতাচার বল্‌লে ঠিক কি বুঝায় অনেক সময় তাহা স্পষ্ট বলা যায় না। আমরা যাহাকে মিতাচার বলি, তাহা যে অমিতাচার নহে, তাহা কে বলিল? আর ঔষধ সেবন করিলেই যে স্বাস্থ্যহানি ও আয়ুক্ষয় হয়, একথা সব সময় আমরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নই। তরি যদি দৃঢ় হয়, আর যদি উহাতে কোনরূপ ফাটাকুটা না থাকে, তাহা হইলে তালি দিবার আবশ্যক করে না কিন্তু জীবন-তরিতে তালি দিবার আবশ্যক হয় বইকি! আজ কাল অকারণে ঔষধ সেবন করা একটা রোগের সামিল হইয়া পড়িয়াছে। বিজ্ঞাপনের চটকে ভুলিয়া শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল শ্রেণীর লোকই একটা না একটা ঔষধ কি তৈল ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাতে সাধারণের স্বাস্থ্যের যে কি অনিষ্ট হইতেছে. তাহা বলা যায় না। যাহারা স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করেন, তাঁহারা ভুলিয়াও যেন চিকিৎসকের বিনা অনুমতিতে কোনরূপ ঔষধ কি তৈল ব্যবহার না করেন।

মনের সহিত শরীরের নিত্য সম্বন্ধ। যাহাদের মন সর্ব্বদা অশান্ত ও বিক্ষিপ্ত থাকে, তাহাদের পক্ষে স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ুলাভ করা একরকম অসম্ভব বলিলেই হয়। এই কারণে সকলেই মনকে দুশ্চিন্তা, উদ্বিগ্নতা ও নৈরাশ্য প্রভৃতি হইতে স্বাধীন ও নির্লিপ্ত রাখিতে পরামর্শ দিয়া থাকেন। পরামর্শটা খুবই ভাল সন্দেহ নাই কিন্তু তাহা কাজে পরিণত করা যে কত কঠিন তাহা কর্ম্মশীল ব্যক্তিমাত্রই অবগত আছেন।

যৌবনে যতদিন মনের শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে, ততদিন উহাকে প্রশান্ত ও সুস্থির রাখা একরূপ অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। সেই জন্যই এক এক জনের যৌবন কালে স্বাস্থ্য মোটেই ভাল থাকেনা; কিন্তু এই সব ব্যক্তি যেমন বার্দ্ধক্যের সীমানায় উপনীত হয়, অমনি উহাদের স্বাস্থ্যের বেশ উন্নতি হইতে দেখা যায়। শিক্ষিত ব্যক্তিদের তুলনায় অশিক্ষিত দরিদ্র ব্যক্তিরা মোটের উপর অধিক দিন বাঁচিয়া থাকিতে সমর্থ হয়। ইহার প্রধান কারণ, শিক্ষিত ব্যক্তিদের যেরূপ মনের ক্ষয় হয়, ইহাদের তাহা হইতে পারে না। ইহারা সাধারণতঃ অদৃষ্টবাদী, যেমন অবস্থায় পড়ুক না কেন, তাহাতেই সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত থাকিতে পারে। ইহাদের আশা অল্প, আকাঙ্ক্ষা অল্প, উদর পূরণ হইলেই যেন ইহারা হাতে স্বর্গ পায়। শিক্ষিত ব্যক্তিরা শুধু পেট ভরিলেই তৃপ্ত হয় না, ইহাদের আরও অনেক ক্ষুধা আছে। সে গুলিও মিটানর আবশ্যক, এই কারণে অশিক্ষিত ব্যক্তিদের অপেক্ষা শিক্ষিত

ব্যক্তিদের হৃদয়ে নৈরাশ্য অধিক। ইহাতে তাঁহাদের পরমায়ু কমিয়া যায়।

একথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, দীর্ঘায়ু কিসে হয়, আর কিসে না হয়, ঠিক বলা বড় কঠিন। এ বিষয়ে অনেকবার অনেক অনুসন্ধান হইয়াছিল। ব্রিটিশ মেডিকেল্ এসোসিয়েসন (British Medical Association) এর পক্ষ হইতে Sir George Humphry (সার জর্জ হামফ্রি) একবার অনেকগুলি বৃদ্ধের জীবনী সংগ্রহ করিয়া এই সিদ্ধান্ত করেন যে, দীর্ঘায়ুলাভ করিতে হইলে মিতাচার হওয়ার একান্ত আবশ্যক বটে, কিন্তু মিতাচার অবলম্বন করিলেই যে দীর্ঘায়ু নিশ্চিত হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। দীর্ঘায়ুর আসল কারণটি সার্ হামফ্রির মতে মানুষের ভিতরকার জিনিস; সে তাহা লইয়া জন্মায়। দীর্ঘায়ু হইতে হইলে দীর্ঘায়ু পিতামাতার সন্তান হওয়া চাই। দীর্ঘায়ুতত্ত্ব Sir Henry Weber (সার হেন্‌রী ওয়েবার্) যেরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুশীলন করিয়াছেন, ডাক্তারদের মধ্যে অতটা বোধ করি আর কেহ করেন নাই। ইনি এ বিষয়ে একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। পুস্তকখানি অমূল্য রত্ন বিশেষ; সকলেরই একবার পাঠ করা উচিত। দীর্ঘায়ু যে বংশগতসূত্র বিশেষ, সার্ ওয়েবার তাহা অস্বীকার করেন না—তবে তিনি এ কথাও বলেন যে চেষ্টার দ্বারাও যে পরমায়ু না বাড়ে, এমন নয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, তিনি নিজেরই ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। পিতৃকুল মাতৃকুল উভয়কুলেই সার ওয়েবারের কেহই দীর্ঘজীবী ছিলেন না। কিন্তু চেষ্টার দ্বারা এবং স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মগুলি যথাবিহিতরূপে পালন করিয়া তিনি আজ ৮৯ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে সমর্থ হইয়াছেন। ওয়েবার বলেন, দীর্ঘায়ু বংশীয়দের ঝোঁক যেমন বেশিদিন বাঁচিবার দিকে, স্বল্পায়ু বংশীয়দের ঝোঁক তেমনি অকালমৃত্যুর দিকে। কিন্তু চেষ্টা করিলে এই ঝোঁকটা যে না ফিরাইতে পারা যায়, এমন নয়। সার ওয়েবারের পিতা, পিতামহ প্রভৃতি সন্ন্যাস (apoplexy) রোগে মারা যান; ইঁহাদের সকলেরই গাউট্ (gout) রোগ ছিল। ওয়েবারের মাতৃকুলের সকলেরই হৃদ্‌রোগ ছিল। তাঁহার মাতা, মাতামহ প্রভৃতির হৃদ্‌রোগজনিত শোথ (dropsy) রোগে মৃত্যু হয়। ছেলে বেলায় সার ওয়েবারের স্বাস্থ্য মোটেই ভাল ছিল না। তিনি এক সময় সৈনিক বিভাগে প্রবেশ লাভ করিতে চেষ্টা করেন, স্বাস্থ্যের জন্য কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কৌলিক রোগ যাহাতে তাঁহাকে না ধরিতে পারে, সার্ ওয়েবার প্রথম হইতেই সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদের সংযমের অভাব ছিল; সার ওয়েবার বিশেষভাবে সংযম অভ্যাস করিয়াছিলেন। এ ছাড়া তিনি প্রতিদিন অন্ততঃ দুঘণ্টা করিয়া মুক্ত বায়ুতে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। সার ওয়েবারের বিশ্বাস, ডাক্তারেরা চেষ্টা করিলে তাঁহাদের স্বল্পায়ুরোগীদের দীর্ঘায়ু করিয়া তুলিতে পারেন। যেরূপ ভাবে থাকিলে, বংশগত রোগের হাত এড়াইতে পারা যায়; সকলকে সে বিষয়ে উপদেশ দেওয়া আবশ্যক। আমাদের দেশের শিক্ষিত ও ধনিসম্প্রদায়ের অনেকেই নিতান্ত অসময়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন। প্রায় স্থলই, হয় মধুমেহ (diabetis) নয় সন্ন্যাস (apoplexy) রোগে

ইঁহাদের মৃত্যু ঘটিতে দেখা যায়। যে সকল নিয়ম পালন করিলে ঐ দুটি রোগ না হইতে পারে, শিক্ষিত ব্যক্তিদের সে বিষয়ে উপদেশ দেওয়া ডাক্তারমহাশয়দের একান্ত কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। সার ওয়েবার প্রাণায়াম বা breathing exercise দ্বারা বিশেষ ফল পাইয়াছেন বলেন। সার ওয়েবারের মতে অমিতাচার অপেক্ষা আয়ুক্ষয়কর আর কিছু থাকিতে পারেনা। এ কথার অবশ্য কেহই প্রতিবাদ করিতে সাহসী হন না, কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, জীবনে কখনও মিতাচার করে নাই, এমন লোককেও ৮০।৯০ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিতে দেখা যায়। Victor Hugoর পান দোষ তেমন ছিল না বটে, কিন্তু অতিভোজন দোষ বিলক্ষণই ছিল শুনিতে পাওয়া যায়। আহার সম্বন্ধে ইনি কখনও কোন নিয়মই রক্ষা করেন নি। তথাপি ইনি ৮৯ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। Theophile Gautier (থিয়োফাইল গটিয়ে) অমিতাচরণ বিষয়ে হিউগোকেও পরাভূত করিয়াছিলেন। অতিশয় গুরুপাক বিবিধ প্রকার আহার্য্য না হইলে ইঁহার আহারই হইত না। ইনি আবার তাহা এত অধিক পরিমাণে খাইতেন যে, কণ্ঠাবরোধ হইবার উপক্রম না হইলে বিরত হইতেন না। ভোজনদোষ ছাড়া ইঁহার অন্তবিধ ইন্দ্রিয় দোষও বড় কম ছিল না। ইঁহার জীবনী লেখক বলেন—৭২ বৎসর বয়সেও ইনি একাধিক রমণী সহ বাসে রজনী অতিবাহিত করিতেন। পানাহার বিষয়ে বিস্মার্কও কম অসংযমী ছিলেন না। ইনি তথাপি ৮৪ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

স্বাস্থ্য খুব ভাল হইলেই যে দীর্ঘায়ু হয়, এ কথা সব সময় বলা যায় না। Sir Benjamin Ward (সার বেঞ্জামিন্ ওয়ার্ড)এর স্বাস্থ্য খুব ভালই ছিল; দিব্য নীরোগ শরীর বলিতে যাহা বুঝায়, সেই রকম শরীর ছিল। সার বেঞ্জামিন্ ওয়ার্ড বলিতেন শতবর্ষ নীরোগ শরীরে বাঁচিয়া থাকা এমন আর শক্ত ব্যাপার কি? শরীর পালনের নিয়মাবলী মানিয়া চলিলে যে কেহ শতায়ু লাভ করিতে পারে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! ঐ কথা উচ্চারণ করার কয়েক দিবস মধ্যেই সার্ বেঞ্জামিন্ ওয়ার্ডকে পৃথিবী হইতে অবসর গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

স্বাস্থ্যরক্ষা ও দীর্ঘায়ুলাভ করিতে হইলে যে সব নিয়ম পালন করা আবশ্যক, তাহার কিছু আভাষ উপরে প্রদত্ত হইল। পুরাণে অবগত হওয়া যায় যে, সমুদ্র মন্থন কালে সুধা উঠিয়াছিল; দেবগণ সেই সুধা পান করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছিলেন। বিজ্ঞানমন্থনে সুধার মত ঐরূপ একটা কিছুর যতদিন উদ্ভব না হয়, ততদিন শরীরপালনের নিয়মগুলি রক্ষা করিয়া দীর্ঘায়ুর আশায় বসিয়া থাকা ভিন্ন, আমাদের আর অন্য কোন গতি নাই।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বাগচী

মার্জ্জনা।

(১)

সে দিন যখন ছিলে তুমি বসি'
অলস সন্ধ্যা-পবনে
বিজন কুঞ্জভবনে,
মুগ্ধ তৃষিত চকোরের মত
আমার নয়ন দুটি,
তোমার ইন্দু- মুখ পানে শুধু
যেতে চেয়েছিল ছুটি।
দেখে দেখে নাহি মিটে সাধ!
মার্জ্জনা কর মধুরহাসিনি,
নয়নের সেই অপরাধ।

(২)

সে দিন যখন একাকিনী তুমি
বীণাখানি ল'য়ে নিভৃতে—
গান গেয়েছিলে নিশীথে,—
নীরবে দাঁড়ায়ে কুটীরদুয়ারে
শুনিয়াছি সেই গান;
সঙ্গীত-সুধা- রসে ক্ষণতরে
ডুবে গিয়েছিল প্রাণ!
শুধু ক্ষণেকের পরমাদ,
মার্জ্জনা কর মঞ্জুভাষিণি
শ্রবণের সেই অপরাধ।

(৩)

সে দিন তোমার কবরীর মালা
বিচ্যুত তৃণশয়নে।
প'ড়েছিল মোর নয়নে।

সৌরভ-ভরা সেই সুকোমল
মালাখানি ল'য়ে করে,
আগ্রহে রাখি বক্ষে আমার
ল'ভেছি নিমেষ তরে
তোমার পরশ পরসাদ।
মার্জ্জনা কর মানস-বাসিনি,
বাসনার সেই অপরাধ!

(৪)

লুকাব না আজ হৃদয়ে আমার—
আমার জীবনে স্বপনে,
যত কিছু আছে গোপনে!
দেবীসম তুমি থাক অবিচল
গৌরবে চিরদিন,
আমি দূরে দূরে ভ্রমিব ভুবনে
লাঞ্ছিত দীনহীন;
শিরে লব শত পরিবাদ,
মার্জ্জনা কর হৃদিবিলাসিনি,
জীবনের যত অপরাধ!

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রধান আবিষ্কার।

প্রবন্ধের শিরোনামা দেখিয়া অনেকেই অনেক বিষয় মনে করিবেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে অনেকগুলি অত্যাশ্চর্য্য ও অভিনব আবিষ্কার হইয়াছে; সে গুলির মধ্যে কোন্‌টী যে শ্রেষ্ঠ তাহা বলা সুকঠিন। যে আবিষ্কার হইতে বহু বিষয়ের একটা কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ স্থির করা যায় এবং যাইবে আশা করা যায়, তাহাকেই প্রধান বলা যাইতে পারে। ফলাফলের দ্বারাও আবিষ্কারের দোষগুণ নির্ণীত হয়; তন্মধ্যে কতকগুলি আশুফলপ্রদ, যথা বসন্ত বীজের টীকা। আবার কতকগুলি এরূপ আছে যাহা বৈজ্ঞানিক হিসাবে এবং বুদ্ধিবৃত্তির পরিচর্য্যা হিসাবে অত্যাবশ্যক। নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আবিষ্কার এবং

গ্রহাকর্ষণের সহিত তাহার সমন্বয় বৈজ্ঞানিক হিসাবে বিশেষ প্রয়োজনীয় তথ্য। এরূপ আবিষ্কারে আমাদের সাংসারিক জীবনে কোন বিশেষ সাহায্যলাভ না হইলেও প্রাকৃতিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম নিয়ম-পর্য্যায় আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয়। মানুষের চিন্তাশক্তি অসীম নয়। ক্ষুদ্র জীব মানব যে প্রকৃতির অনন্ত রহস্যের মধ্যে সমস্ত তথ্য আবিষ্কার করিতে পারিবে এবং সকল বিষয় সহজে বুঝিতে পারিবে তাহা আশা করা যায় না। প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর মধ্যে একটা কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ নির্ণয় করা আবিষ্কারের মুখ্য উদ্দেশ্য; আবার সেই সকল নিয়মাবলীর সাহায্যে যাহাতে আমরা কোনরূপে একটু স্বচ্ছন্দতা ও সুবিধা লাভ করিতে পারি, তাহাও বৈজ্ঞানিকের একটা কাজ। আতাফলের বৃক্ষচ্যুত হওয়া এবং মাটীতে পড়া এই দুই ঘটনার মধ্যে নিয়ম স্থির করিতে যাইয়াই নিউটন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন। যেসব আবিষ্কার আমাদের সাংসারিক জীবনে কোন বিশেষ সাহায্য করে না এবং শুধু দ্রব্যগুণপরিচায়ক মাত্র, সেগুলি যে অনাবশ্যক তাহা নয়; কারণ সেগুলি অবধারণ করিয়া আমরা বুঝিতে পারি:—(১) কিরূপে অসম্ভব-সম্ভব বিচার করিয়া লইব (২) কার্য্যসিদ্ধির উপায়ের মধ্যে কোন অসম্বন্ধ ভাব আছে কিনা (৩) নূতন নূতন বিষয় কিছু দেখিতে ও বুঝিতে পারি কিনা (৪) কার্য্যসিদ্ধির কোন সহজ উপায় কিছু আছে কিনা:—

বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য, সত্যের অনুসন্ধান—প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর মধ্যে এক সাধারণ নিয়মসূত্রের আবিষ্কার। যে প্রধান আবিষ্কার অনেকগুলি প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর মধ্যে সম্বন্ধ স্থির করিয়া দেয়, তাহা অল্প পরিসরে বিশদভাবে বোঝান শক্ত। কত শতাব্দীর অনুসন্ধানের ফলে যে আমরা এরূপ কোন একটা তথ্যের সন্ধান পাই তাহা বলা কঠিন। প্রত্যেক সত্যই ক্রমশঃ আবিষ্কৃত হয় এবং বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া যে শক্তি সেই সত্যকে নূতন আকৃতি দিতে পারে তাহাই প্রতিভা।

কতকগুলি সত্য আছে যাহা আমরা এখন স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। সেগুলি যে বাস্তবিকই স্বতঃসিদ্ধ (self-evident) তাহা নয়, তবে সহজেই সেগুলি প্রমাণ করিয়া লইতে পারি। বিশেষ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান না করিলেও মোটামুটি হিসাবে তাহা কতকটা বুঝিতে পারা যায়। একটা উদাহরণ দ্বারা এ বিষয় বুঝাইতে চেষ্টা করিব। পদার্থ-সমষ্টির যে ধ্বংস নাই তাহা একটা বৈজ্ঞানিক সত্য (matter is indestructible) আমরা কোন পদার্থের সৃষ্টিও করিতে পারি না, বিনাশও করিতে পারি না; কোন

রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা আমরা তাহার হ্রাস বা বৃদ্ধি করিতে পারি না। আগুন লাগিয়া 'কাগজ পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়; এস্থলে আমরা অবশ্য বলিয়া থাকি যে কাগজ 'নষ্ট' হইয়া গেল। কিন্তু অগ্নির সাহায্যে কাগজের পদার্থগুলিও বায়ুর পরমাণুগুলির সহিত যে সংযোগ হইল তাহা ধরিয়া লইলে জানিতে পারি যে, কাগজ ও বাতাসের মধ্যে কতক 'দ্রব্য বিনিময়' হইল বটে কিন্তু তাহাদের পদার্থ-সমষ্টির কোন ক্ষতি হইল না। উত্তাপ সেই বিনিময়ে সাহায্য করিল মাত্র। ছাই ও উদ্‌গীর্ণ ধূম হইতে পুনরায় আমরা যে কাগজ প্রস্তত করিতে পারিব তাহা আশা করিতে পারি; তবে কিরূপ 'শক্তি' (উত্তাপের ন্যায়) তাহা করিতে পারিবে, তাহা এখনও আমরা জানিতে পারি নাই। অনেক সময় আমরা বুঝিতে পারিনা কিরূপে পদার্থবিনিময় হয় কিন্তু প্রত্যেক বিষয়ে যদি অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পারি, তবে বুঝিব যে, ওজনে বা সমষ্টিতে পদার্থের ধ্বংস বা সৃষ্টি করিতে পারি না।

এই প্রবন্ধে যে আবিষ্কারের কথা আমরা উল্লেখ করি তাহা এই যে পদার্থের ন্যায় শক্তিরও ধ্বংস হয় না। কাজ করিবার ক্ষমতার নাম শক্তি। কোন বাধা অতিক্রম করার নাম কার্য্য বলিতে পারা যায়। Maxwell বলেন—যে এক পদার্থসমষ্টি যদি বাহির হইতে কোনরূপ শক্তিদ্বারা অনুপ্রাণিত না হয় এবং কোনরূপ শক্তির 'অপচয়' না ঘটে, তবে তাহার বিবিধ আকৃতিপরিবর্ত্তনের শক্তিসমষ্টি সকল সময় অক্ষুণ্ণ থাকিবে। অনেকে মনে করিবেন যে আমরা শক্তি বৃদ্ধি করিতে পারি না, ইহা ভুল বিশ্বাস। অনেকে হয়ত জিজ্ঞাসা করিবেন বাষ্পীয় শকট ক্রমশঃ বর্দ্ধমান শক্তি পায় না কি? কপিকল দ্বারা কি আমরা ওজন তুলিবার অনেক সহায়তা পাই না? বারুদ পোড়াইয়া এবং বন্দুক আওয়াজ করিয়া গুলি খুব বেশী জোরে বাহির করিয়া দিতে কি পারি না? এ সকল বিষয় দেখিলে শক্তির যে সৃষ্টি নাই তাহা মনে হয় না কিন্তু প্রকৃত অনুসন্ধানে জানা যায় যে, যাহা উপর-উপর দেখিলে অসংলগ্ন বোধ হয়, তাহা বাস্তবিকই উপরি-উক্ত কথার বিরুদ্ধ নহে—এ বিষয়ের প্রকৃত অনুসন্ধান বিবৃত করিতে গেলে যাবতীয় শক্তির ও কার্য্যের পরিচয় দিতে হয়—এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহা সম্ভবপর নয়। যথাসম্ভব সাধারণ পরিচিত শক্তির বিষয় আলোচনা করিয়াই ক্ষান্ত হইতে হইবে।

ইংরাজীতে যাহাকে Energy বলে তাহাকে আমি 'শক্তি' বলিয়াছি। ইহা দ্বারা সহজেই বুঝিবেন যে "শক্তি"র দ্বারা আমি Action

এর ভাবও বুঝাইয়াছি। বাস্তবিক ইংরাজী বিজ্ঞানপুস্তকে Energy ও Action এর মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই এবং Work অথবা Action অনেক সময় Energyর পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়, যাহাকে Work বলা যায় তাহা Energyর বাহ্যবিকৃতি মাত্র। Energy অনেক সময় নিহিত থাকিতে পারে, Work তাহারই পরিদৃশ্যমান ক্রিয়া।

সাধারণতঃ আমরা ছয় রকম শক্তির পরিচয় বাহ্য জগতে দেখিয়া থাকি ;—

১। যান্ত্রিক শক্তি (Mechanical action)
২। তাপ (Heat)
৩। আলোক (Light)
৪। বিদ্যুৎ (Electricity)
৫। চুম্বক শক্তি (Magnetism)
৬। রাসায়নিক শক্তি (Chemical action)

শব্দ (Sound) বলিয়া যে কোন বিশেষ শক্তি আছে তাহা বোধ হয় না। কারণ শব্দ একটী বাতাসের ক্রিয়া বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, কাজেই ইহাকে বাতাসের যান্ত্রিক শক্তির পরিচায়ক বলা যাইতে পারে। আরও বহুবিধ বিভিন্ন শক্তি থাকিতে পারে, যাহার বিষয় আমরা এপর্য্যন্ত বিশেষ কিছু জ্ঞাত নহি। কালক্রমে কতই আবিষ্কার হইবে তাহা এখন কে বলিতে পারে ?

উপরি-উক্ত শক্তিগুলির মধ্যে একটী অন্যরূপে পরিণত হইতে পারে ; এবং সবগুলিই যেন কোন এক অপরিসীম ও অব্যক্ত শক্তির রূপান্তর মাত্র। আমরা তাহাকে ঈশ্বর দেবতা প্রভৃতি যে নামই দিই না কেন ; আমাদের জ্ঞানের সীমা ইহার বেশী যাইতে পারে না। সে যাহাই হউক, বিভিন্ন শক্তির রূপ-বিনিময় কিরূপে হইতে পারে তাহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দৃষ্টান্তের দ্বারা দেখাইলে হৃদয়ঙ্গম হইবে। বিদ্যুৎ কিভাবে যান্ত্রিক শক্তিতে পরিণত হয়, তাহা ট্রাম গাড়ীর পরিচালনা, Electric motor প্রভৃতি দেখিলে জানিতে পারা যায়। খুব সরু পিত্তলের তারের মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবেশ করাইলে তাহা ক্রমশঃ গরম হয় (বিদ্যুতের তাপে পরিণতি) এবং পরে তারটী লাল হইয়া ওঠে এবং আলো বিকীরণ করিতে থাকে (বিদ্যুতের অথবা তাপের আলোকে পরিণতি)। একটী লৌহ দণ্ডের চারিদিকে তামার তার জড়াইয়া তন্মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবেশ করাইলে দণ্ডটী চুম্বকে পরিণত হয় (বিদ্যুতের চুম্বক শক্তি) আবার যান্ত্রিক শক্তি কিরূপে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে তাহা অনেকেই দেখিয়াছেন ; ঘর্ষণে (যান্ত্রিক শক্তি) কিরূপে

তাপ ও বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় তাহা সহজেই দেখা যায়, রাসায়নিক শক্তি কিরূপে আলোক ও তাপ উৎপন্ন করে তাহা সাধারণ বাড়ীতে দেখা যায়। একটী Daniel's cell অথবা যে কোন প্রচলিত Electric cell এ দেখা যায় যে, রাসায়নিক শক্তি বিদ্যুতে পরিণত হয়। শক্তির রূপান্তর গ্রহণের এইরূপ সহস্র উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।

শক্তিসমষ্টির যে ধ্বংস নাই তাহা প্রমাণ করিতে গেলেই প্রথমে শক্তি মাপ করিবার কোন একটী নিয়মের প্রয়োজন। ইহা সহজেই বোঝা যায় যে, সর্ব্ববিধ শক্তির এক মাপ কাঠি (unit) থাকিলে চলিবে না। কারণ শক্তির আকৃতি বিভিন্ন। যেরূপে রাসায়নিক শক্তির মাপ করা যায়, ঠিক সেই ভাবে উত্তাপ বা আলোর শক্তির মাপ করা চলিবে না। সেজন্য বিশেষ বিশেষ শক্তির বিভিন্ন রূপ মাপ কাঠি দেখা যায়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যেরূপ ভাবেই কোন একটী ক্রিয়া হউক না কেন, যদি তাহাতে একরকম শক্তি আর একরকম শক্তিতে সম্পূর্ণভাবে পরিণত হয় তবে সেই শক্তিদ্বয়ের পরিমাপের মধ্যে একটা অক্ষুণ্ণ সম্বন্ধ থাকিয়া যায়। ইহা ইংরাজীতে Mechanical Equivalent বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। একটা সরল দৃষ্টান্ত দ্বারা এবিষয় বুঝাইতে চেষ্টা করিব; মনে করুন একটা খুব সরু তারকে নানারকমে বাঁকাইয়া একটী জলের টবের মধ্যে ডুবাইয়া রাখা হইয়াছে ও সেই তারের মধ্যে তড়িৎ প্রবাহিত হইতেছে; তাহা হইলে তৎসংলগ্ন জলও গরম হইয়া উঠিবে। একটী Thermometer দ্বারা জলের উত্তাপ স্থির করা যাউক। এখন, কোন প্রকারে যদি বিদ্যুতের শক্তি মাপ করিতে পারা যায়—তবে দেখা যাইবে যে, জলের উত্তাপ ও বিদ্যুতের শক্তির মধ্যে একটা অক্ষুণ্ণ সম্বন্ধ আছে। এইরূপে বিভিন্ন শক্তি বিভিন্ন মাপে ধরা পড়িবে। উত্তাপের সহিত যান্ত্রিক শক্তির যে কি সম্বন্ধ আছে তাহা Joule সাহেব কিরূপ সূক্ষ্মভাবে স্থির করিয়াছিলেন, তাহা বিশদভাবে বলা অনাবশ্যক কারণ তাহা অনেকটা Technical অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণকে কোন একখানি Physics পুস্তক দেখিতে বলি। বৈজ্ঞানিকেরা এই বিভিন্ন শক্তির পরিমাপ দ্বারা শক্তির অবিনশ্বরত্ব প্রমাণ করিয়াছেন।

ক্রমশঃ।

শ্রীকালিদাস বাগচী।

রাণী।

(জন্ম ১৩১৮ সাল ৯ই অগ্রহায়ণ। তিরোধান ১৩১৯ সাল ৬ই শ্রাবণ)

(১)

আহা! ওর নীল আঁখি দু'টি,
বুকে মোর রয়েছে যে ফুটি,
ওর মধুমাখা হাসি,
মৌন ভালবাসারাশি
জ্যোছনা অমিয়মাখা মাণিকের কুটি,
একটু ধমকে লাল,
কাঁপায় গোলাপী গাল,
ফুলায় ও সোণামুখ রাঙা ঠোঁট দু'টি,
বুকে মোর রয়েছে যে ফুটি!

(২)

কোন কিছু নাহি জানি,
কেন তুমি এলে রাণি,
কেন তুমি ফুটিলে না সোহাগের ফুল,
এ জগতে এত ভোগ্য,
হ'ল নাকি তোর যোগ্য,
তাই তুই চলে যা'স্ করি শোকাকুল?

(৩)

কোন্ দেবতার বাদে,
না জানি কি অপরাধে,
সহসা হারাই তোরে আঁচলের ধন,
তুই যে গো এক বিন্দু,
শোক কেন মহাসিন্ধু!—
এক ফোঁটা কালকূটে ভীষণ মরণ!

(৪)

সোণা মুখে চুমো খেতে,
বসেছি যে কোল পেতে,
দুধের ঝিনুক নিয়ে ছোট কাঁথা পাতি,
আদর যতন যত,
শুভাশীষ কত শত,
তুই কি নিবি না আর সে পুলকে মাতি ?

(৫)

কে দিয়েছে মুখে সুধা,
ভুলে গেছে তৃষা ক্ষুধা,
খেলাধুলা কান্নাহাসি কিছু নাহি চায়,
কি ঘুমপাড়ানী মাসী,
নয়নে বসেছে আসি,
জাগিতে দেবে না আর বুঝি এ ধরায় !

(৬)

তোমরা
শোয়াইও অতি ধীরে,
নিরালা তটিনী তীরে,
চমকি উঠে না যেন সোণা যাদুমণি,
বলিও বলিও ডেকে,
"এস গো স্বরগ থেকে,
ধর এ ঘুমন্ত মেয়ে, জগৎজননি !"

শ্রীমানকুমারী।

সমাজ-আদর্শে—প্রাচীন ও নবীন।

সবই পরিবর্ত্তনশীল। কিন্তু সেকালের পরিবর্ত্তন-স্রোতে একবারে সবটা ভাসিয়া যাইত না, কিছু থাকিত। শুনিতে পাই বৌদ্ধযুগে পরিবর্ত্তনটা কিছু বেশী হইয়াছিল। অসংখ্য বর্ণেতর জাতি প্রধান বর্ণের সঙ্গে সমকক্ষতা করিবার সুযোগ ও সুবিধা পাইয়াছিল। বুদ্ধদেবের ধর্ম্মান্দোলনের ফলেই যে এরূপ পরিবর্ত্তন সম্ভবপর হইয়াছিল, তাহা নহে। বৌদ্ধধর্ম্ম যখন রাজ-ধর্ম্মে পরিণত হয়, তখন এবং তাহার পরই ভারতবর্ষের আর্য্য গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবনে ঐ সকল পরিবর্ত্তন সম্ভব হইয়াছিল। রাজাদর্শপ্রধান ভারতীয় হিন্দুজীবনে উচ্চ রাজাদর্শই কেবল পরিবর্ত্তন আনয়নে সক্ষম। কিন্তু ইসলাম ধর্ম্ম ভারতে রাজশক্তি লাভ করিয়াও দেশের সেরূপ পরিবর্ত্তন সাধনে সক্ষম হয় নাই, যাহা বৌদ্ধ রাজধর্ম্মের দ্বারা সংসাধিত হইয়াছিল।

কিন্তু ভারতপূজ্য শঙ্করাচার্য্যের অভ্যুদয়ে ভারতবর্ষের বিদ্ধস্ত সমাজজীবন পুনরায় বিধিব্যবস্থার অধীন হইয়া নূতন ভাবে গঠিত হইয়া উঠিলেও, উহার মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে বৌদ্ধধর্ম্মের বিবিধ অনুষ্ঠান ও আচার ব্যবহার থাকিয়া গিয়াছে; অনুসন্ধান করিলে আজিও সে সকলের জের অতি সূক্ষ্মভাবে বর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া যাইবে। ইস্লামের আবির্ভাবে যে পরিবর্ত্তন-স্রোত প্রবাহিত হয়, তাহা সমাজ জীবনের মর্ম্মস্থান স্পর্শ করিতে পারে নাই সত্য, কিন্তু কিছু কিছু পরিবর্ত্তণ তবুও ঘটিয়াছিল, মহাপ্রভুর ধর্ম্মান্দোলনে তাহার অনেক অংশ বৈষ্ণবভাবে পরিণত হইয়া সমাজে থাকিয়া গিয়াছে।

কিন্তু এখনকার এই শেষ পরিবর্ত্তন বর্ত্তমানে আমাদের সমগ্র জীবনকে এরূপভাবে আক্রমন ও অভিভূত করিয়াছে যে, ইহার প্রবল পরাক্রম হইতে রক্ষা পাওয়া অতি কঠিন কথা। অনেকে হয়ত বলিবেন, রক্ষা পাওয়াটাই কি নিরাপদ? আমি বলি, অভিভূত হওয়াটাই কি নিরাপদ? এ দুইটার সামঞ্জস্য কোথায়? আমি সেই বিষয়ে সামান্য একটু আলোচনা করিতে চাই। আলোচনার উদ্দেশ্য এই যে, বর্ত্তমান সময়ে অধিকাংশ লোক দুইটি প্রধান দলে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। একদল চারিদিকের অবস্থা সংঘটন ও তন্নিবন্ধন সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের প্রাচীন উত্তম পদ্ধতিগুলি অকুণ্ঠিতচিত্তে বর্জ্জন করিয়া সর্ব্বপ্রকারে নূতনের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত, নূতনকে সাদরে বরণ করিয়া লইবার জন্য যেন পা বাড়াইয়া দাঁড়াইয়া আছেন,

সামান্য কিছু সাংসারিক পরিবর্তন সাধনের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য আদর্শের ও ভাবের অনুকরণে গৃহসজ্জা হইতে আরম্ভ করিয়া আহার বিহারে, আমোদ প্রমোদে, ক্রিয়া কলাপে ইংরাজ সাজিতেছেন। পতঙ্গ যেমন আলোকে আত্মসমর্পণ করে, ভারতবাসী ঠিক সেইরূপ আত্মবিস্মৃত হইয়া পিতৃপিতামহের শ্রাদ্ধশান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া, পূজা পার্ব্বণ হইতে আরম্ভ করিয়া, প্রণাম নমস্কারে, কথায়বার্ত্তায়, দেখাসাক্ষাতে ইংরাজ সাজিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অপর দল প্রাণপণে প্রাচীনের পোষণ ও প্রতিপালনে অন্ধের ন্যায় বদ্ধপরিকর। এই উভয় পক্ষের মিলন মিশ্রণে প্রাচীনের প্রয়োজনীয়তা রক্ষা ও নূতনের সমাগম ও তাহার সমন্বয় সাধন কে করিবে? শঙ্করাচার্য্য ত নাই, আর থাকিলেও বোধ হয় আজকালকার দিনে কেহ মানিত না, হুকা পাওয়া দূরের কথা "কল্কে পাওয়াও" কঠিন হইত।

স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় কয়েক বৎসর পূর্ব্বে রাজা রামমোহন রায়ের বাৎসরিক স্মৃতি-সভায় মহাত্মা রামমোহন রায়কে সকল দিক দিয়া বিচার করিয়া বর্ত্তমান সময়ে শঙ্করের তুল্য ব্যক্তি বলিয়া অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। সে উক্তিটি সম্যক সমীচীন হইলেও তদানীন্তন বিরুদ্ধপক্ষ সংবাদপত্রে হিন্দুপ্রধান চন্দ্রবাবুকে অযথা আক্রমণ করিয়াছিলেন। সমাজ-জীবনে উচ্চতর অধিকার ও কর্ত্তৃত্বশক্তিপরায়ণ পণ্ডিতকুলের শিরোভূষণ বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ, তখন ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যতীত অন্যান্য সর্ব্ববিধ সংস্কৃত শিক্ষায় ব্রাহ্মণেতর জাতি সকলের অধিকার দানে অগ্রসর হইলেন, সে সময়ে বর্ণেতর রাজা রাধাকান্ত দেবই সে অনুষ্ঠানে সর্ব্বপ্রথম বাধা দিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু তাঁহার শক্তিতে কুলায় নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়েরই জয় হইয়াছিল। অধিক দৃষ্টান্তের প্রয়োজন নাই। আজকালকার শাস্ত্রত্যাগী ও বুদ্ধিবাদী বঙ্গীয় জনমণ্ডলীর নিকট কোন সুবিবেচনাসম্পন্ন সঙ্গত পরিবর্ত্তন সহজে সমাজে স্থান পাইবে না, সুতরাং বর্ত্তমান সময়ের সমাজস্রোতঃ উন্মার্গগামিনী পার্ব্বত্য নদীর ন্যায় স্বেচ্ছামত পথেই চলিবে, ইহাকে জনগণের কল্যাণদায়িনী করিয়া তুলা শঙ্কর ও রামমোহনের সাধ্যের অতীত।

যাহারা সভায় ও সমাজে বক্তৃতায় ও বাক্যালাপে একপ্রকার, আর নিজ নিজ আচার আচরণের সময়ে ভিন্ন প্রকার, তাহাদিগকে সংযত ও সুপথে পরিচালিত করা কোন উচ্চ উপাদানে গঠিত মানুষেরও শক্তির অতীত। দৃষ্টান্তস্থলে রাজা স্যর রাধাকান্ত দেবের ব্যবহারেই উল্লেখ করা যাইতে পারে। ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যতীত

অন্যান্য সংস্কৃত সাহিত্যচর্চ্চায় ব্রাহ্মণেতর জাতির লোকের অধিকার অস্বীকার করিয়াও, তিনি নিজে তৎপূর্ব্বেই বলপূর্ব্বক সংস্কৃত সর্ব্ববিধ শিক্ষার অধিকার গ্রহণ করেন এবং সেই শিক্ষার ফলে পণ্ডিতমণ্ডলীর সহায়তায় শব্দকল্পদ্রুম প্রকাশ করেন। এরূপ ব্যবহার-বৈষম্য কেবল মস্তকহীন সমাজের পক্ষেই শোভা পায়। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণপদমর্য্যাদা বিস্মৃত হইয়া আত্মমর্য্যাদা বিক্রয় না করিলে, দেশের এতটা দুরবস্থা হইত না। ব্রাহ্মণ পরমুখাপেক্ষী হওয়াতেই সমাজ রসাতলগত হইতে বসিয়াছে।

আজ আর বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও একান্নবর্ত্তী পরিবার কোনও মতে দাঁড়াইতেছে না, দাঁড়াইবেও না। কায়স্থ-সমাজে কন্যাদায় একটা বিষম সঙ্কট হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সেই কায়স্থ সমাজের এক পরিবারেই উপবীত লইয়া দুই তিন দল হইয়া যাইতেছে। বিবাহ-সঙ্কট আরও জটিল ও আশঙ্কাপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। কেবল ব্রাহ্মসমাজই যে পুরাতন ভাঙ্গিয়া নূতন গড়িয়া তুলিতে পারিতেছে না, তাহা নহে, সমগ্র দেশ প্রাচীন ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছে, কিন্তু নূতন গড়িয়া তুলিবার শক্তি কাহারও নাই। যাহার যাহা ইচ্ছা করিতেছে। সমাজও দিন দিন অধিকতর দুর্ব্বল ও অসহায় হইয়া পড়িতেছে। এখন ইহার প্রতিবিধান কোথায়?

উপায় একটা মাত্র। কিছুদিন পূর্ব্বে বর্দ্ধমানের নবীন মহারাজা বিজয়চাঁদ আপ্‌তাপ বাহাদুর রাজসম্মানে সম্মানিত হইয়া নাইট উপাধি পাইলে, বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার পণ্ডিতমণ্ডলীর এক মিলিত সভায় মহারাজা বাহাদুরকে সম্মাননা করা হয়। মহারাজা নবীন হইয়াও সেই সভায় প্রবীণোচিত কয়েকটি কথা বলিয়াছিলেন। সেই কথাগুলি আমাদের নিকট অত্যন্ত মূল্যবান বলিয়া বোধ হইয়াছিল। মহারাজা বাহাদুর বলিয়াছিলেন যে, আগামী শীতকাল পর্য্যন্ত তিনি বিধাতার কৃপায় মর্ত্ত্য-জীবন যাপন করিতে পাইলে, সমগ্র বঙ্গসমাজের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণকে একটা গুরুতর কর্ত্তব্য সম্পাদনে আমন্ত্রণ করিবেন। তিনি বলিয়াছিলেন ব্রাহ্মণপণ্ডিতমণ্ডলীর সহায়তা গ্রহণ পূর্ব্বক সমাজরক্ষা করা ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম্ম। তিনি ব্রাহ্মণগণের দ্বারপাল স্বরূপ, তবে মহারাজা যেরূপ ভাবে সমাজ রক্ষা ও প্রতিপালনের সদুপায় অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিবেন, তি[illegible] সে বিষয়ে পূর্ব্ব হইতেই পণ্ডিতমণ্ডলীকে প্রস্তুত হইতে সবিনয় অনুরোধ করি[illegible] ছিলেন। তাঁহার কথার তৎপর্য্য এই যে, তিনি মনে করেন বর্ত্তমান সময়ে কেব[illegible] সেই প্রাচীনের পৃষ্ঠপোষক হইলে চলিবে না। নানা সূত্রে বর্ত্তমান বঙ্গীয় হি[illegible] সমাজ এরূপ বিভিন্ন রুচি, প্রবৃত্তির পথে

বন্ধন করা সম্ভব নহে। প্রাচীন রীতিপদ্ধতি প্রাচীনের সম্যক উপযোগী ছিল, এখন সে গুলিকে নবীনভাবে সময়ের উপযোগী করিয়া লইতে হইবে। শাস্ত্রে নাই, এরূপ অনেক আচার ব্যবহার ও ক্রিয়াকলাপ সমাজে স্থান পাইয়া গিয়াছে, সেগুলিকে নূতন ব্যবস্থায় স্বীকার করিয়া লইয়া স্থান দিতে হইবে।

পদমর্য্যাদা ও অর্থবলসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ বাজেখাতে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় না করিয়া এরূপ একটা বৃহৎ কার্য্যের সুসম্পাদনে অর্থব্যয় করিলে, ও সে অনুষ্ঠানটি সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে, অনন্ত অক্ষয় কীর্ত্তিঅর্জ্জনই তাহার উপযুক্ত পুরস্কার, অবশ্য এ কথাটা আমাদের মহারাজা বাহাদুরকে বলিয়া দিবার প্রয়োজন নাই, তিনি তাহা অবশ্যই বুঝিয়াছেন। আমরা কেবল তাঁহাকে প্রসঙ্গক্রমে তাঁহার অঙ্গীকার স্মরণ করাইয়া দিতেছি মাত্র।

ইংরাজ জাতির শুভদৃষ্টির ফলে রাজা নবকৃষ্ণ যে পরিমাণে ইংরাজ রাজধানী কলিকাতায় পুষ্টি লাভ করিয়াছিলেন, ঠিক সেই পরিমাণে সমগ্র বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণমর্য্যাদা হীনতা লাভ করিয়াছে। ক্ষত্রিয় নিজ ক্ষত্রিয়ত্ব বজায় রাখিবার চেষ্টা করিলে সেটা গৌরবেরই বিষয়। সিংহ সিংহবৃত্তি বজায় রাখিবে, ইহাই ত স্বাভাবিক। ব্যবসায় ও বাণিজ্যবুদ্ধিপরায়ণ ইংরাজের দপ্তরখানায় যে বুদ্ধির প্রয়োজন,রাজা নবকৃষ্ণের সে বুদ্ধির অভাব ছিল না,সে বুদ্ধির অন্তরালে ক্ষত্রিয়োচিত ব্রাহ্মণ-মর্য্যাদা রক্ষার উপযোগী আয়োজন বর্ত্তমান ছিল, আমরা কোন মতেই এরূপ সিদ্ধান্তের অনুমোদন করি না। এখনও দেশের নানা স্থানে অসংখ্য বর্ণসঙ্কর হিন্দুসন্তান যেখানে যতটা প্রবল, ব্রাহ্মণ সেখানে ততটাই অবনত। অশ্রেষ্ঠ সঙ্গ কখনও মানববুদ্ধির উচ্চবিকাশের বা উচ্চ কার্য্যপটুতার সহায় নহে। বঙ্গীয় কায়স্থগণ অনুসন্ধানে পূর্ব্বপুরুষ হিসাবে যে অধিকারই লাভ করুন না কেন, তাহাতে সমাজের আপত্তি হইতে পারে না। বঙ্গের এই ক্ষত্রিয়জ কায়স্থগণ উপবীত গ্রহণ করিয়া ক্ষত্রিয় সাজিলেই যে ক্ষত্রিয়ের সর্ব্ববিধ গুণবত্তা তাঁহাদের মধ্যে জাগরিত হইবে, তাহার সম্ভাবনা বড়ই অল্প, যদি তাহা হইত, তাহা হইলে ব্রাহ্মণবংশ বংশপরম্পরায় উপবীতধারী হইয়াও এতটা অধোগতি প্রাপ্ত হইত না। আর সেরূপ সবল ও গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণ বর্ত্তমান থাকিলে, বঙ্গীয় কায়স্থগণ এত সহজে গায়ের জোরে উপবীত গ্রহণ করিতে পারিতেন।

এরূপ চেষ্টার ফল আর কিছুই নহে কেবল আজ পৃথিবীর সমগ্র সভ্যসমাজের, বিশেষভাবে ইংরাজের সংস্পর্শে আসিয়া, পাশ্চাত্য শিক্ষা দীক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া

উঠিয়াছে। তাই অনেক স্থলেই আজ "ঢাল নাই তরবাল নাই, নিধিরাম, সর্দার" সাজিবার জন্য প্রাণ আকুল হইয়া উঠিয়াছে। শ্রেষ্ঠের বাহিরের সমকক্ষতা লাভ চেষ্টাই ইহার মূলে বর্ত্তমান এবং অলক্ষিত ভাবে রাজা নবকৃষ্ণ বৃত্তিই এই প্রবৃত্তির পরিচালক রূপে সমাজের অতীত স্তরে দণ্ডায়মান। ব্রাহ্মসমাজ উপবীত ত্যাগদ্বারা যে কার্য্যের সাধন চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা অসঙ্গত না হইলেও স্বদেশের ও স্বসমাজের সে সময়ের সম্পূর্ণ উপযোগী ছিল না, কিন্তু আজ বঙ্গীয় কায়স্থগণের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া বঙ্গীয় হিন্দু শঙ্করবর্ণগুলি ও ক্রমে তন্নিয়ে যখন এই উপবীত গ্রহণ প্রচলিত হইয়া যাইবে (যাহা অনিবার্য্য) তখন সমগ্র বঙ্গীয় সমাজের (সমাজ মধ্যে) অগ্রগমনের লালসার পরিসমাপ্তি হইবে। তখন সব একাকার। কারণ এ স্থলে কেহ কাহাকেও বাধা দিতে পারিবে না। সুতরাং পরোক্ষভাবে ব্রাহ্মসমাজের কাজ হইয়া যাইতেছে, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ যে যোগ্যতার উপরে অধিকারের প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন, ব্রাহ্মসমাজে তাহা বজায় থাকা একপ্রকার অসম্ভব হইয়াছে, আর আটকোটী জনপূর্ণ বঙ্গীয় সমাজে তাহার প্রতিষ্ঠা ত একবারেই অসম্ভব। সুতরাং আদর্শ হিসাবে সমগ্রদেশ প্রচুর পরিমাণে যে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। ব্যক্তিগত দৃষ্টান্তের দ্বারা এই গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসা করিতে গেলে আরও অনেক অপ্রিয় কথার আলোচনা করিতে হয়। কিন্তু সে সময় আসিতে অল্প একটু বিলম্ব আছে। পরে এই প্রাচীন ও নবীনের প্রবল সংগ্রামের ফলাফল দৃষ্টান্তের দ্বারা পূর্ণাঙ্গ পরিস্ফুটনে প্রয়াস পাইব। আমরা চিরদিনই যোগ্যতার উপর অধিকার প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী। অযোগ্য লোকে যোগ্যতার দাবী করিলেই সর্ব্বনাশ, এই সর্ব্বনাশ নিত্য নিয়ত বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের বক্ষে অনুষ্ঠিত হইতেছে।

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ছিন্নপত্র।

রবিবাবুর 'ছিন্নপত্র' পড়িলে সাধনার কথা মনে পড়ে। তখন সাধনা ও সাহিত্য বাংলার মাসিক পত্রিকার সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিল। প্রতিমাসে ঐ দুইখানি পত্রিকা আগাগোড়া পড়িত না এমন শিক্ষিত বাঙ্গালী কলিকাতায় খুব কম ছিল। ছিন্নপত্র ও জীবনস্মৃতি সে দিনের কথা স্মরণ করাইয়া দেয় কিন্তু কৌতূহল চরিতার্থ করে না। যাহা বলা হইয়াছে, তাঁহার চেয়েও আরো অনেক কথা শুনিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু এই পত্রাংশগুলি তাঁহার কাব্যজীবনের অংশবিশেষের উপর যে আলোক-রশ্মি নিক্ষেপ করিতেছে তাহার বিচিত্র সৌন্দর্য্য আমাদিগকে মুগ্ধ করে।

১৮৯৪ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারির পত্রে তিনি লিখিতেছেন "সাধনার জন্ত লিখ্‌তে লিখ্‌তে অন্তমনস্ক হয়ে যাই।" এবার তাঁহার বিলাতগমনের কিছু পূর্ব্বে একদিন তাঁহাকে সাধনার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। আমি বলিলাম "আপনার যখন সাধনা প্রকাশিত হইতেছিল, সেই সময়েই আপনার greatest intellectual expansion হইতেছিল, এই রকমটা আমার বোধ হয়।" রবিবাবু বলিলেন * "হাঁ, প্রকৃতপক্ষে তখন আমার সাধনাই ছিল। নৌকার উপরে থাকিতাম। সঙ্গে যে লোক ছিল, সে প্রত্যহ প্রত্যূষে একবাটি ডাল সিদ্ধ করিয়া আমার টেবিলের উপর ঢাকা দিয়া রাখিয়া যাইত। আমি সেই ডালটুকু খাইয়া লিখিতে বসিতাম; সমস্তদিন লিখিতাম, কোনও রূপ চিত্তবিক্ষেপ হইত না। অপরাহ্নে পাঁচটা কি সাড়ে পাঁচটার সময় খানকতক লুচি খাইতাম, তাহার পর বাহিরে 'ইজি' চেয়ারে শয়ন করিতাম; নৌকা নদীর উপরে অশ্রান্তভাবে চলিতে থাকিত। এক sittingএই পাঞ্চভৌতিক ডায়ারি, গল্প, কবিতা অনর্গল লিখিয়া যাইতাম, ক্লান্তিবোধ করিতাম না। এবার যে আবার নদীবক্ষে কয়দিন বিচরণ করিলাম, মনে হইল, যদি আমাকে সমস্ত বিষয়কর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আবার সেই রকম নদীবক্ষে ছাড়িয়া দিতে পারি, তাহা হইলে আবার বোধ হয় সাধনার যুগ ফিরাইয়া আনিতে পারি।"

১৮৮৮ সালের একখানি পত্রে রবিবাবু লিখিয়াছেন "বঙ্কিমবাবু ঊনবিংশ শতাব্দীর পোষ্যপুত্র আধুনিক বাঙালীর কথা যেখানে বলেছেন সেখানে

* আমার diary হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। লেখক।

কৃতকার্য্য হয়েছেন, কিন্তু যেখানে পুরাতন বাঙালীর কথা বল্‌তে গিয়েছেন সেখানে তাঁকে অনেক বানাতে হয়েছে। চন্দ্রশেখর প্রতাপ প্রভৃতি কতকগুলি "বড় বড় মানুষ এঁকেছেন (অর্থাৎ তাঁরা সকল দেশীয় সকল জাতীয় লোকই হতে পারতেন; তাঁদের মধ্যে জাতি এবং দেশকালের বিশেষ চিহ্ন নেই) কিন্তু বাঙালী আঁক্‌তে পারেন নি। আমাদের এই চিরপীড়িত, ধৈর্য্যশীল, স্বজনবৎসল, বাস্তুভিটাবলম্বী প্রচণ্ডকর্ম্মশীল পৃথিবীর এক নিভৃত প্রান্তবাসী শান্ত বাঙালীর কাহিনী কেউ ভাল করে বলে নি।" এই প্রসঙ্গে একদিন রবিবাবু আমাকে বলিলেন "যখন বঙ্কিমবাবুর আনন্দমঠ প্রথম প্রকাশিত হইল, চন্দ্রনাথ বাবু তৎসম্বন্ধে আমার মত জানিতে চাহিয়াছিলেন, আমিও এক বিস্তৃত সমালোচনা করিয়া পাঠাইলাম, দোষ দেখাইতে একটুও কুণ্ঠাবোধ করি নাই। শুনিয়াছি চন্দ্রনাথ বাবু সেই সমালোচনা বঙ্কিমবাবুকে দেখা-ইয়াছিলেন। আমি বলিয়াছিলাম, বঙ্কিমবাবু যেখানে individualএর চরিত্র ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন, সেইখানেই চমৎকার succeed করিয়াছেন, তাঁহার শক্তির যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন; কিন্তু যেখানে মানুষের সমষ্টি লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছেন, সেইখানেই সমস্তটা একটা পিণ্ডবৎ তাল পাকাইয়া গিয়াছে, কোনও ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যরক্ষা করিবার চেষ্টা আদৌ দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার নগেন্দ্রনাথ, কৃষ্ণকান্ত, ভ্রমর গোবিন্দলাল, সজীব স্বতন্ত্র মানুষ; কিন্তু আনন্দমঠে সমস্ত 'আনন্দ'গুলিই যেন এক রকমেরই। একটা প্রকাণ্ড ideaয় যে বিচিত্র মানবপ্রকৃতিকে revolution এর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত ও কেন্দ্রীভূত করিয়াছে, তাহাদের প্রকৃতিগত পার্থক্য, তাহাদের বিচিত্র কর্ম্মপ্রবাহ, বিচিত্র ভাবপ্রবাহ, নব-নব শক্তির উন্মেষ, যে একটা প্রকাণ্ড ideaর আবর্ত্তে পড়িয়া এক direction এ চলিয়াছে, বঙ্কিমবাবু তাহা দেখাইলেন কই? কেন তিনি তাঁহার 'আনন্দ'গুলিতে স্বাতন্ত্র্য, ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য দিলেন না? সব সন্ন্যাসীগুলিই কি এক কথা বলিবে, একরকম কাজ করিবে? একটা অত বড় revo-lutionary struggleএ তিনি কি এমনটি দেখাইতে পারিতেন না যে, কেহ organise করিতেছেন, কেহ রসদের ব্যবস্থা করিতেছেন, কেহ দীক্ষা দিতেছেন, কেহ মিস্ত্রীর কাজ করিতেছেন; যাঁহার যেটুকু ক্ষমতা তিনি তাহা এই বিপুল কার্য্যে প্রয়োগ করিতেছেন; সকলের বিচিত্র শক্তি একই কার্য্যে নিয়োজিত হইতেছে। আমার কাছে এই জন্যই ত সমস্তটা একটা

unreal phantasmagoria বলিয়া মনে হয়; জঙ্গলের মধ্যে এই ছায়াবাজির কোথাও একটু সমাজের সহিত নাড়ির সংযোগ দেখিতে পাই না। স্বীকার করি, এই সন্ন্যাসীবিদ্রোহ ঐতিহাসিক সত্য; কিন্তু সেই ভিত্তিটুকুর উপর বঙ্কিমবাবু যে romanceটি গড়িয়া তুলিলেন, কেন তিনি তাহাতে দেখাইতে চেষ্টা করিলেন না যে, কেমন করিয়া কতকগুলা লোক অল্পে অল্পে তিলে তিলে সাংসারিক সমস্ত বিচ্ছেদ ব্যবধান অপসারিত করিয়া একটা ideaয় অনুপ্রাণিত হইয়া পাশাপাশি আসিয়া দাঁড়াইল! একেবারে সমস্তটা খাড়া করিয়া আমাদের চোখের সামনে ধরিলেন। কত অত্যাচার উৎপীড়ন, কত বেদনা, কত নিস্ফল প্রয়াসের ভিতর দিয়া এই বিপ্লববীজ অঙ্কুরিত হইল, তাহার আভাষমাত্রও পাইলাম না। একেবারে বিদ্রোহের ছবি, সংসার হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। মনে রাখিবেন, আমি সাহিত্যহিসাবে সমালোচনা করিতেছি। দেবীচৌধুরাণীতেও এই দোষ দেখিতে পাই।" রবিবাবু একটু হাসিলেন। আমি বলিলাম "রাজসিংহ আপনার খুব ভাল লাগিয়াছিল; সাধনায় আপনি যে সমালোচনা করিয়াছিলেন, সেটি ত একটি খণ্ডকাব্যবিশেষ।" তিনি বলিলেন "চষামাঠের উপর দিয়া পাল্কি চড়িয়া যাইবার সময় রাজসিংহ পড়িয়াছিলাম, বড় ভাল লাগিয়াছিল; কিন্তু দুঃখের বিষয় বঙ্কিমবাবু তখন মৃত্যুশয্যায়, আমার সমালোচনা পড়িতে পান নাই; আমার কৃষ্ণচরিত্রের সমালোচনাও তাঁহার পড়া হয় নাই।"

বঙ্কিমবাবুর কথা এই ছিন্নপত্রে ও জীবনস্মৃতিতে এত অল্প বলা হইয়াছে যে, আমার diary হইতে আরো একটু উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। একদিন কথাপ্রসঙ্গে আমাকে বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "রবিবাবু, আপনি (বঙ্কিমবাবু বরাবর আমাকে আপনি বলিয়া সম্বোধন করিতেন) শশধর তর্কচূড়ামণির বক্তৃতা শুনিয়াছেন? আমি বলিলাম—'না'। তিনি বলিলেন—"শুনিবেন। তাহাতে জিনিব আছে। আপনি আমার বাড়িতে আসিবেন, এইখানেই তাঁহার কথাবার্ত্তা শুনিবার সুবিধা আপনার হইতে পারিবে।" কিন্তু শীঘ্রই এইখানেই দেখিতে পাইলাম যে বঙ্কিমবাবুর admiration বড় বেশীদিন স্থায়ী হইল না। 'কৃষ্ণচরিত্র' রচয়িতার সহিত তর্কচূড়ামণির মিলন স্থায়ী হইতে পারে না। একবার Albert Hallএ আমি তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে গিয়াছিলাম। তিনি বুঝাইতে চাহেন যে, উপনিষ-

সের ভূমার পূজায় মানবহৃদয় উদ্দীপিত হয় না। এইটি বুঝাইতে গিয়া তিনি এক গল্পের অবতারণা করিলেন। রাজার হুকুম হইল রাত্রে বিনা আগুণে টিকে ধরাইতে হইবে; আলো চাই; কোথায় আলো! ঘরের বাহিরে ফুটফুটে চাঁদের আলো; টিকে সেই আলোয় ধরাইবার চেষ্টা করা হইল, চেষ্টা ব্যর্থ হইল। রাজা আজ্ঞা করিলেন,—আরো খানিকটা অগ্রসর হইয়া যাও, দেখ দেখি টিকে ধরে কি না। এগিয়ে গিয়ে আবার টীকে ধরাইবার চেষ্টা করা হইল, চেষ্টা ব্যর্থ হইল; যতই এগিয়ে যাওয়া যায়, টিকে কিছুতেই ধরে না। তেম্নি যাহা infinityতে অবস্থিত, উপনিষদের ভূমা, সে কি কখনও মানুষের হৃদয়ে আগুন ধরাইতে পারে?—দেখুন ধর্ম্মের একটা অবস্থা আসে যখন সাধারণ লোকের বিশ্বাসগুলি আর স্বাভাবিক থাকে না, যখন সেগুলিকে জোর করিয়া তর্কে ও যুক্তিতে খাড়া করিতে চেষ্টা করা হয়; তখন মানুষ কতকটা জাগ্রত হইয়াছে, কতকটা বুঝিতে পারিয়াছে, যে প্রাণহীন আচারব্যবহারের উপর যে আঘাত আসিয়া পড়িয়াছে, সেই আঘাত হইতে তাহাকে বাঁচাইতে হইলে যুক্তিতর্কের আবশ্যক, তখন বুঝিতে হইবে সেই সকল মন্ত্রতন্ত্র আচারব্যবহার অনুষ্ঠানের দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে। সকল দেশের ইতিহাসেই এইটি প্রত্যক্ষ করা যায়।"

কিন্তু যদি সেই সকল মন্ত্রতন্ত্র আচারব্যবহার অনুষ্ঠান আমাদের আনন্দ জাগাইয়া তোলে যাহার স্পন্দন ভূমাপর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে এখনও সেগুলি প্রাণহীন হয় নাই। ১৮৯৪ সালের ৫ই অক্টোবরের পত্রে দেখি—"আজ সকালের বাতাসে অতি ঈষৎ শীতের সঞ্চার হয়েছে, একটুখানি শিউরে ওঠার মত। কাল দুর্গোৎসব; আজ তার সুন্দর সূচনা। ঘরে ঘরে দেশের লোকের মনে যখন একটা আনন্দ প্রবাহিত হচ্চে তখন তাদের সঙ্গে আমার ধর্ম্মসংস্কারের বিচ্ছেদ থাকা সত্বেও সে আনন্দ মনকে স্পর্শ করে। পর্শু দিন স—র বাড়ি যাবার সময় দেখেছিলুম রাস্তার দুধারে প্রায় বড় বড় বাড়ির দালানমাত্রেই প্রতিমা তৈরি করা হচ্চে। দেখে আমার মনে হল, দেশের ছেলেবুড়ো সকলেই দিনকয়েকের জন্যে ছেলেমানুষ হয়ে উঠে [illegible] বড় গোছের খেলায় লেগে গেছে। ভেবে দেখ্‌তে গেলে আনন্দের আ[illegible]ন মাত্রই পুতুলখেলা—অর্থাৎ তাতে আনন্দ ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্য [illegible], লাভ নেই—বাইরে থেকে দেখে মনে হয় সময় নষ্ট। কিন্তু সমস্ত দেশের লো[illegible]

মনে যাতে একটা ভাবের আন্দোলন এনে দেয় তা কি কখনো নিষ্ফল হতে পারে? সমাজের মধ্যে কত লোক আছে যারা নীরস বিষয়ী লোক—এই উৎসবে তাদেরও মন একটা সর্ব্বব্যাপী ভাবের টানে বিচলিত হয়ে সকলের সঙ্গে মিলে যায়। এমনি করে প্রতিবৎসর কিছুকালের জন্য মনের এমন একটি অনুকূল আর্দ্র অবস্থা আসে যাতে স্নেহ প্রীতি দয়া সহজে অঙ্কুরিত হতে পারে; আগমনী বিজয়ার গান, প্রিয়সম্মিলন, নহবতের সুর, শরতের রৌদ্র এবং আকাশের স্বচ্ছতা সমস্তটা মিলে মনের মধ্যে আনন্দকাব্য রচনা করে। ছেলেদের যে আনন্দ সেইটেই বিশুদ্ধ আনন্দের আদর্শ। তারা তুচ্ছ উপলক্ষকে নিয়ে নিজের মন দিয়ে ভরে তোলে, সামান্য কদাকার পুতুল নিয়ে তাকে নিজের ভাব দিয়ে সুন্দর ও প্রাণ দিয়ে সজীব করে তোলে। এই ক্ষমতাটা যে লোক বড় বয়সপর্য্যন্ত রাখ্‌তে পারে সেই ত ভাবুক। তার কাছে চারিদিকের বস্তু কেবল বস্তু নয়—কেবল দৃষ্টিগোচর বা শ্রুতিগোচর নয়, কিন্তু ভাবগোচর—তার সমস্ত সঙ্কীর্ণতা সে একটি সঙ্গীতের দ্বারা পূর্ণ করে নেয়। দেশের সমস্ত লোক ভাবুক হতেই পারে না, কিন্তু এই রকম উৎসবের সময় ভাবস্রোত অধিকাংশ লোকের মনকে অধিকার করে। তখন, যেটাকে দূরে থেকে সামান্য পুতুল বলে মনে হয়, কল্পনায় মণ্ডিত হয়ে তার সে মূর্ত্তি থাকে না।”

এখানে সাম্প্রদায়িকতা কবিহৃদয়কে আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন—সে আজ উনিশ বৎসরের কথা তখন রবিবাবু মন্ত্রতন্ত্রে আনন্দ পাইতেন, এখন অচলায়তনের দিনে তাঁহার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ১৩১৮ সালের ৭ই অগ্রহায়ণ তারিখে কথাপ্রসঙ্গে আমি তাঁহাকে বলিলাম—“আপনার অচলায়তন সম্বন্ধে রামেন্দ্রবাবু বলেন যে যাঁহারা মনে করেন যে আপনি হিন্দুয়ানিকে আক্রমন করিয়াছেন, তাঁহারা অত্যন্ত ভুল বুঝিয়াছেন। গায়ত্রী কি অন্য কোনও বৈদিক মন্ত্রের উপর কটাক্ষ করা হয় নাই; যেটাকে আঘাত করা হইয়াছে সেটা নির্ভেজাল বৌদ্ধতান্ত্রিক ব্যাপার। ঐ ভোটয় ভোটয় মন্ত্র, ঐ একজটা দেবী, ও সব হিন্দুর কোন কালেই ছিল না, ও সব বৌদ্ধতন্ত্রের অন্তর্গত; তবে যদি কেহ মনে করেন যে আমাদের হিন্দুধর্ম্মে আঘাত লাগিয়াছে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে ঐ বৌদ্ধ ক্রিয়াকলাপ হিন্দুধর্ম্মের অঙ্গীভূত হইয়া যাওয়ার দরুণ আঘাতটা হিন্দুয়ানির গায়ে গিয়া লাগিয়াছে।” রবিবাবু বলিলেন—“ঠিকই ত। আমি কি গায়ত্রীমন্ত্রকে উপহাস করিতে পারি? সে যে আমার নিজেরই মন্ত্র, আমার নিজের জিনিষ। অন্যে কি মনে করেন

বলিতে পারি না, কিন্তু আমার মনে হয় এই গায়ত্রীমন্ত্রে ভর্গবৎসাধন ভারতবর্ষের বিশেষত্ব। দেখুন, এক একজন ঋষি আজীবন তপস্যা ও কৃচ্ছ্র সাধন করিয়া তাঁহাদের সমস্ত wisdom এক একটি মন্ত্রের কয়েকটী কথায় সঞ্চিত ও সংহত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন; আমাদের সমস্ত জীবনের চেষ্টা হওয়া উচিত যে সেই মন্ত্রকে অল্পে অল্পে হৃদয়ঙ্গম করা, তাহাকে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করা, আমাদের জীবনের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া দেওয়া; তবে ত সেই মন্ত্রের সার্থকতা আমরা উপলব্ধি করিতে পারিব। আমার সমালোচকেরা গায়ত্রীমন্ত্র জপ করেন কি না জানি না; কিন্তু আমি আমার উপনয়নের সময় পিতৃদেবের নিকট যে গায়ত্রীমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলাম, সেই মন্ত্রসাধনে আমি যে কতদূর উপকৃত হইয়াছি তাহা আপনাকে কি বলিব। আমি কি সেই মন্ত্রের নিন্দা করিতে পারি!" ছিন্নপত্রে দেখিতে পাই যে এই উপনয়নের স্মৃতি তাঁহার মনে আনন্দই জাগাইয়া তোলে। ১৮৯৪ সালের ২৭ শে জুন তারিখের পত্রে দেখিতে পাই যে "যখন পৈতের নেড়া মাথা নিয়ে প্রথমবার বোলপুরের বাগানে গিয়েছিলুম" সেই কথা স্মরণ করিয়া কবি পুলকিত হইতেছেন।

শেষোক্ত চিঠিতে তিনি ছোট গল্প লেখার আনন্দের কথার উল্লেখ করিয়াছেন। "আজকাল মনে হচ্চে, যদি আমি আর কিছুই না করে ছোট ছোট গল্প লিখ্‌তে বসি তা হলে কতকটা মনের সুখে থাকি এবং কৃতকার্য্য হতে পারলে হয়ত পাঁচজন পাঠকেরও মনের সুখের কারণ হওয়া যায়। গল্প লেখবার একটা সুখ এই, যাদের কথা লিখব তারা আমার দিনরাত্রির সমস্ত অবসর একেবারে ভরে রেখে দেবে, আমার একলা মনের সঙ্গী হবে, বর্ষার সময় আমার বদ্ধঘরের সঙ্কীর্ণতা দূর করবে, এবং রৌদ্রের সময় পদ্মাতীরের উজ্জ্বল দৃশ্যের মধ্যে আমার চোখের পরে বেড়িয়ে বেড়াবে। আজ সকাল বেলায় তাই গিরিবালা নাম্নী উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ একটি ছোট অভিমানী মেয়েকে আমার কল্পনারাজ্যে অবতরণ করা গেছে।......আজ গিরিবালা অনাহূত এসে উপস্থিত হয়েছেন, কাল বড় আবশ্যকের সময় তাঁর দোদুল্যমান বেণীর সূচ্যগ্রভাগটুকুও দেখা যাবে না। কিন্তু সে কথা নিয়ে আজ আন্দোলনের দরকার নেই। শ্রীমতী গিরিবালার তিরোধান সম্ভাবনা থাকে ত থাক—আজ যখন তাঁর শুভাগমন হয়েছে তখন সেটা আনন্দের বিষয় সন্দেহ নেই।" ঠিক একটি বৎসর পরে রবিবাবু লিখিতেছেন "বসে বসে সাধনার জন্যে একটা গ লিখ্‌চি—খুবএকটু আষাঢ়ে গোছের গল্প। একটু একটু করে লিখ্‌চি এবং

বাইরের প্রকৃতির সমস্ত ছায়া আলোক বর্ণ আমার লেখার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। আমি যে সকল দৃশ্য লোক ও ঘটনা কল্পনা করচি তারই চারিদিকে এই রৌদ্র-বৃষ্টি, নদীস্রোত এবং নদীতীরের শরবন, এই বর্ষার আকাশ, এই ছায়াবেষ্টিত গ্রাম, এই জলধারাপ্রফুল্ল শস্যের ক্ষেত ঘিরে দাঁড়িয়ে তাদের সত্যে ও সৌন্দর্য্যে সজীব করে তুলচে! কিন্তু পাঠকেরা এর অর্দ্ধেক জিনিষ ও পাবে না। তারা কেবল কাটা শস্যই পায় কিন্তু শস্যক্ষেত্রের আকাশ বাতাস, শিশির এবং শ্যামলতা সমস্তই বাদ পড়ে যায়। আমার গল্পের সঙ্গে যদি এই মেঘমুক্ত বর্ষাকালের স্নিগ্ধরৌদ্ররঞ্জিত ছোট নদীটী এবং নদীর তীরটি. এই গাছের ছায়া এবং গ্রামের শান্তিটি এমনি অখণ্ডভাবে তুলে দিতে পারতুম তা হলে সবাই তার সত্যটুকু একেবারে সমগ্রভাবে একমুহূর্ত্তে বুঝে নিতে পারত। অনেকটা রস মনের মধ্যেই থেকে যায়, সবটা পাঠককে দেওয়া যায় না। যা নিজের আছে তাও পরকে দেবার ক্ষমতা বিধাতা মানুষকে সম্পূর্ণ দেন নি।"

বিধাতা কতটুকু ক্ষমতা বাংলার শ্রেষ্ঠ গল্পলেখককে দিয়াছেন, তাহার পরিমাপ করিবার প্রবৃত্তি আমার নাই। তাঁহার লেখায় "বস্তুতন্ত্রতা" প্রবল কি "মায়িকতা" প্রবল, তাহার ওজন করিবার ভার শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল ও শ্রীযুক্ত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী লইয়াছেন। আমি আপাততঃ শুধু বাহিরের স্থূল ব্যাপারটির আলোচনা করিতেছি। এক দিন কথাপ্রসঙ্গে আমি রবিবাবুকে বলিলাম,—"টেনিসনের Princess গল্পটি যেন কয়েকজন বন্ধু মুখে মুখে রচনা করিলেন। একজন আরম্ভ করিলেন; খানিকদূর অগ্রসর হইয়া তিনি আর একজনকে বলিলেন, এইবার তুমি গল্পটা চালিয়ে যাও; দ্বিতীয় ব্যক্তি থামিলে আর একজন গল্পটাকে আরো খানিকটা অগ্রসর করিয়া দিলেন; এই রকম করিয়া যেন গল্পটি রচিত হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক আগাগোড়াই কবি লিখিয়াছেন। আপনিও নাকি ঐ রকম গল্পরচনার চেষ্টা করিয়াছিলেন? তিনি বলিলেন,—"হাঁ, আমি অনেকবার চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছি, কিন্তু কখনই মনের মত হইল না। আমি আরম্ভ করিয়া দিতাম, কিন্তু বন্ধুরা গল্পটিকে এমন করিয়া দাঁড় করাইতেন যে, আমার মনে হইত সমস্তটা মাটি হইয়া গেল। দার্জ্জিলিংএ একদিন কুচবিহারের মহারাণী বলিলেন,—"আসুন, সকলে মিলিয়া একটা গল্প রচনা করা যাক্, আগে আপনি আরম্ভ করুন।" আমি আমাদের বাঙ্গালী সমাজ-ছাড়া একটা romantic গল্পের অবতারণা করিবার প্রয়াসে বলিলাম,—"আচ্ছা বেশ।" এই বলিয়া আরম্ভ

করিয়া দিলাম,—"দার্জ্জিলিংএ ক্যালকাটা রোডের ধারে ঘন কুঞ্জঝটিকার মধ্যে বসিয়া একটি হিন্দুস্থানী রমণী কাঁদিতেছে।" এই বলিয়া আমি ছাড়িয়া দিলাম। কিন্তু দেখিলাম গল্পটা অন্যের মুখে অগ্রসর হইতে চাহিল না। অগত্যা আমাকেই সমস্তটা রচনা করিয়া লইতে হইল। এই রকম করিয়া আমার "দুরাশা" গল্পটি রচিত হইয়াছে। ········কুচবিহারের মহারাণী ভূতের গল্প শুনিতে বড় ভালবাসিতেন। আমায় বলিতেন, 'আপনি নিশ্চয়ই ভূত দেখিয়াছেন, একটি ভূতের গল্প বলুন।—আমি যতই বলিতাম যে, আমি ভূত দেখি নাই, তিনি ততই মাথা নাড়িতেন; বলিতেন, 'না, কখনই না, নিশ্চয়ই আপনি ভূত দেখিয়াছেন।'—অগত্যা আমাকে একটা ভূতের গল্পের অবতারনা করিতে হইল,—ভাঙ্গা পোড়ো বাড়ি, কঙ্কালের খট্‌খট্ শব্দ, এই সমস্ত অবলম্বন করিয়া আমি মণিমালিকার গল্পটি তাঁহাকে শুনাইলাম। গল্পটি তাঁহার বড় ভাল লাগিয়াছিল। একদিন Woodlandsএ নিমন্ত্রণরক্ষা করিতে গিয়াছিলাম; নাটোরের মহারাজাও তথায় উপস্থিত ছিলেন। খাওয়া দাওয়ার পর মহারাণী বলিলেন,—রবিবাবু, এইবার আপনি একটি ভূতের গল্প বলুন, আপনি যে ভূত দেখেন নাই তা হ'তেই পারে না, আপনাকে ভূতের গল্প বলিতেই হইবে।" অগত্যা আমি বলিলাম,—"আচ্ছা তবে একটা ঘটনা বলিতে পারি; নাটোরের মহারাজা সেই ঘটনার কতকটা অবগত আছেন, তিনি এ সম্বন্ধে কতকদূর পর্য্যন্ত সাক্ষ্য দিতে পারেন। একদিন নিমন্ত্রণ-পার্টি হইতে ফিরিতে অনেক রাত হইল; নাটোরের মহারাজা বলিলেন,—"রবিবাবু, আমার গাড়ি প্রস্তুত, আসুন, আপনাকে বাড়ি পৌছাইয়া দিয়া যাইতে পারিব। অনেকদূর গিয়া আমি মহারাজার গাড়ি হইতে অবতরণ করিলাম; বলিলাম কোথায় আপনার বাড়ি, আর কোথায় জোড়াসাঁকোয় আমার বাড়ি; অত ঘুরিয়া যাওয়া আপনার পক্ষে নিশ্চয়ই অত্যন্ত অসুবিধাজনক; আমি এই খান হইতে একখানা ভাড়াটিয়া গাড়ি করিয়া বাড়ি যাইতে পারি। মহারাজার সনির্ব্বন্ধ নিষেধ আমি মানিলাম না, কিন্তু পরে অনুতাপ করিতে হইয়াছিল। ·· ···এই পর্য্যন্ত বলিয়া আমি একটু থামিলাম। মহারাণী সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তারপর?" আমি বলিলাম—একখানা মাত্র ভাড়াটীয়া গাড়ি রাস্তার চৌমাথায় দাঁড়াইয়াছিল। গাড়োয়ানকে বলিলাম, জোড়াসাঁকোয় অমুক জায়গায় আমায় লইয়া চল। সে কিছুতেই রাজি হইল না। নাটোরের মহারাজা তখন তাহা থামক দিয়া বলিলেন—ভাড়াটিয়া গাড়ির টিকিট লইয়া এখানে রহিয়াছ, নিশ্চ

যাইতে হইবে, নহিলে পুলিশের হাতে দিব। এই বলিয়া তাহার গাড়ির নম্বর নোট করিয়া লইলেন। পুলিশের ভয়ে সে রাজি হইল। আমি গাড়ির ভিতরে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলাম। মহারাজা চলিয়া গেলেন। আমি নিশ্চিন্তমনে বসিয়া রহিলাম। গাড়ি চলিতে লাগিল। খানিকক্ষণ পরে বুঝিতে পারিলাম যে, আমার পরিচিত বড় রাস্তা দিয়া গাড়ি চলিতেছে না, অপরিচিত অন্ধকার গলির ভিতর দিয়া গাড়োয়ান গাড়ি হাঁকাইয়া চলিয়াছে, কিছু বলিলাম না; ভাবিলাম, বোধ হয় সহজেই বাড়ি পৌঁছাইব। কিন্তু পথ যেন ফুরায় না। হঠাৎ বোধ হইল যেন গাড়ির মধ্যে আমি একাকী বসিয়া নহি, কে যেন আমার গা ঘেঁসিয়া বসিয়া আছে! আমি অন্ধকারে হাত বাড়াইলাম; কিছুই হাতে ঠেকিল না। আবার চুপ করিয়া বসিলাম। আবার সেই রকম যেন মনে হইতে লাগিল; মনটা যেন কেমন ছমছম করিতে লাগিল। গাড়ির পেছনে যে ছোকরা বসিয়াছিল, তাহাকে ডাকিয়া বলিলাম,—ওরে, তুই ভেতরে এসে বোস্। সে বলিল—না, বাবু আমি ভেতরে যাব না।—যতই আমি তাহাকে আহ্বান করি, ততই জোর করিয়া সে বলিতে লাগিল—না বাবু, আমি ভেতরে যাব না।—এদিকে গাড়ি একেবারে গড়ের মাঠে রেড্ রোডের নিকটে গিয়া উপস্থিত। গাড়োয়ানকে ডাকাডাকি করিলাম, কোনও ফল হইল না। সেই বিস্তৃত ময়দানে, সেই চন্দ্রালোকিত গভীর নিশীথে, গাড়ী ক্রমাগত চক্রাকারে ঘুরিতে লাগিল। আমার গা ঘেঁসিয়া কি একটা যেন জিনিষ রহিয়াছে, অনুভব করিতে পারিলাম; সবলে দুই হাত দিয়া সেটাকে ঠেলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিলাম; সহসা দেখিলাম, যেন গাড়ির ভিতরে একটা বিকট হাসি ফুটিয়া উঠিল! আমি চীৎকার করিয়া লাফাইয়া উঠিলাম; মাথা ঘুরিয়া গেল। খানিক পরে বুঝিতে পারিলাম ভোর হইয়া আসিতেছে, এবং আমাদের বাড়িরও সন্নিকটবর্ত্তী হইয়াছি। পরদিন নাটোরের মহারাজাকে রাত্রির কথা বলিলাম। তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া থানায় গেলেন। দারোগা আমাদের কাহিনী শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনাদের গাড়ির নম্বর কত? নম্বর শুনিয়া বলিল, আপনারা যদি কাল রাত্রিতে গাড়োয়ানকে ধরিয়া লইয়া থানায় আসিতেন, তাহা হইলে এত হয়রান্ হইতে হইত না। অনেকদিন হইল, একজন কেরাণী আপিস হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময় ঐ গাড়ি করিয়া গড়ের মাঠে গিয়া ঐ গাড়িতেই আত্মহত্যা করে। তদবধি রাত্রিকালে ও গাড়িতে লোক চড়িলেই ভয় পায়। গাড়োয়ানরা তাহা জানিতে পারিয়া, পাছে ঐ গাড়ির লাইসেন্স বন্ধ করিয়া দিই এই

ভয়ে পাড়োয়ানটা রাত্রে আর সওয়ার লয় না। এই পর্য্যন্ত বলিয়া থামিলাম। কুচবিহারের মহারাণী বলিলেন, "অ্যাঁ, সত্যি না কি?" আমি হাসিয়া বলিলাম—"না, মোটেই সত্য নয়; গল্প করিলাম মাত্র।" এই গল্পটি পরে নূতন করিয়া লিখিয়াছিলাম।

গল্পমাত্র, আর কিছু নহে। যাঁহাদের ইচ্ছা তাঁহারা এটিকে লইয়া নাড়া-চাড়া করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন এটি "মায়িক" না "বস্তুতন্ত্র"; আমার কাছে কিন্তু এটি শুধু গল্পহিসাবেই চরম সার্থকতা লাভ করিয়াছে। সত্য-মিথ্যার কূট তর্কের মধ্যে আমি প্রবেশ করিতেছি না; গোটা কতক স্থূল কথা লইয়াই এই প্রবন্ধ রচিত হইল। ছিন্নপত্রে কবিহৃদয়ের যে রহস্যের উপর আলোকপাত হইয়াছে, সে প্রসঙ্গ তুলিলাম না; অথচ সেইটেই ছিন্নপত্রের আসল সামগ্রী, সেইখানেই কবির যথার্থ আত্মপরিচয়, সেখানে লেশমাত্র মিথ্যা থাকিতে পারে না। তিনি লিখিতেছেন—"যেমনি কবিতা লিখ্‌তে আরম্ভ করি, অমনি আমার চিরকালের যথার্থ আপনার মধ্যে প্রবেশ করি—আমি বেশ বুঝিতে পারি এই আমার স্থান। জীবনে জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে অনেক মিথ্যাচরণ করা যায় কিন্তু কবিতায় কখনও মিথ্যা কথা বলিনে—সেই আমার জীবনের সমস্ত গভীর সত্যের একমাত্র আশ্রয়স্থান।"

শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত।

মথুরার দ্বারে।

চরণে মিনতি প্রহরি! তোমার—তাড়ায়োনা রাজপথে,
মোরা তোমাদের রাজারে দেখিতে এসেছি গোকুল হ'তে।
ঘাম ঝরে গায়, ধূলামাখা পায়, পরণে মলিন বাস,
তাই বলে' কিগো যাইতে পাবনা মোদের কানুর পাশ?
তুমিত জাননা প্রহরি; তোমার কানাই মোদের কে,
এই ধূলিমাখা বুকে মাথা রেখে মানুষ হয়েছে সে!
সে আজ নৃপতি, আমরা গোয়াল,—কথা রাখ, পায় পড়ি—
দুটী কথা [illegible]

আমাদের কানু, তার বাড়ী যেতে, তোর পায়ে সাধাসাধি!
চোখে আসে জল, মুখে আসে হাসি, তাই-ত হাসি কি কাঁদি!
দাঁড়াইয়া ঠায়, দ্বারে ধূলা পায়, কানু শুনে যদি তাহা—
আঁখি ছলছল করিবে তাহার বুকে ব্যথা পাবে আহা।
রাজার দণ্ড ধরেছে কানাই, ছেড়েছে মোহন বাঁশী,
সেই হতে তার বুঝি মুখভার, নাই খেলা ধূলা হাসি!
আহা! সে যে হায়, কতই কেঁদেছে কাতরে মোদের ছাড়ি—
অমন করিয়া দিওনাক গালি—ভ্রূকুটী করোনা দ্বারী।

কালীদহ হতে এনেছি তুলিয়া তার লাগি শতদল,
যে গাছের তলে ঘুমাত দুপুরে—সেগাছের পাকা ফল।
শাঙলীর দুধে তুলিয়া নবনী ধবলীর দুধে ক্ষীর,
এনেছি অশোকফুলে মালা গাঁথি, যমুনার কালনীর।
এনেছি পাঁচনী আর শিখিচূড়া, কোঁচান' রঙীন ধড়া,
বাঁশবন খুঁজে এনেছি বাঁশরী যতনে ছিদ্র—করা।
আর আনিয়াছি গোটা গোকুলের আশীষ, চোখের জল,
ভাঙা বুক, আর রাঙা আঁখি,—দ্বারী একবার গিয়ে বল।

বলিস্ তাহার রোপিত তরুটি আজি ফুলে আলোকরা,
কদমতলাতে আসিয়াছে জল—যমুনা দু'কূলভরা।
যা' ছিল মুকুল এখন তা' ফল, চারা—সে বেঁধেছে ঝাড়,
কেঁড়েভরা দুধ ঢালে মঙ্গলা, বাছুর হয়েছে তার।
কোথা র'বে তার রাজসভা, দ্বারী—মাথার মুকুটভার,
বুকে এসে সেবে পড়িবে ঝাঁপায়ে, শুনে যদি একবার,
নয়ন রাঙিয়ে দিওনা তাড়ায়ে প্রহরী, নিঠুর-হিয়া;
দিব ক্ষীর ননী বনফুল তোরে, একবার বল্ গিয়া।

শ্রীকালিদাস রায়।

শশাঙ্ক।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

তৈলিক অশ্ব, গর্দ্দভ ও বালককে লইয়া নগর প্রবেশের চেষ্টায় উৎথিত হইতেছিল। তাহাকে দেখিয়া দৌবারিকগণের বলবীর্য্য ফিরিয়া আসিল। সকলে নিরীহ তৈলিকের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিল, অবশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া তৈলিক তাহার পণ্যের কিয়দংশ উৎকোচ প্রদান করিয়া অব্যাহতি লাভ করিল। বালককে লইয়া তৈলিক নগরে প্রবেশ করিয়া দেখিল রাজপথ প্রায় জনশূন্য, বিপণিসমূহ রুদ্ধ। যাহারা রাজপথে চলিতেছে তাহারা যেন অত্যন্ত শঙ্কিত, অবসর পাইলেই রাজপথ পরিত্যাগ করিয়া নগরের সঙ্কীর্ণ বক্রগতি পথসমূহ অবলম্বন করিতেছে। সময়ে সময়ে বিদেশীয় সৈনিকগণ দলে দলে রাজপথ কোলাহলপূর্ণ করিতেছে, তাহাদিগকে দেখিয়া পাটলিপুত্রবাসিগণ দূরে সরিয়া যাইতেছে, উন্মুক্ত গৃহদ্বার রুদ্ধ করিতেছে। বিপণিস্বামী বিপণি-ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতেছে। তৈলিক নগরের অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইল এবং অবিলম্বে রাজপথ পরিত্যাগ করিয়া বক্র পথ অবলম্বন করিল। অন্ধকারময় পথ অবলম্বনে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া সে ব্যক্তি একটি জীর্ণ পর্ণ কুটীরের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া কপাটে আঘাত করিল। বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও যখন সে দেখিল যে কেহ কপাট খুলিল না, তখন পুনরায় আঘাত করিল। এইরূপে প্রায় দুই দণ্ডকাল অতিবাহিত হইল, বালকটি ক্লান্ত হইয়া গর্দ্দভের পৃষ্ঠে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। নগর ক্রমশঃ নিস্তব্ধ হইয়া আসিতেছিল, দিবাবসানে অন্ধকার পথে অন্ধকার গাঢ়তর হইয়া উঠিতেছিল। পথিক গত্যন্তর না দেখিয়া কপাটে সজোরে আঘাত করিতে লাগিল, কপাট খুলিয়া পড়িবার উপক্রম হইলে কুটীরাভ্যন্তর হইতে বামাকণ্ঠে আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল। সে ক্রন্দনের ভাষা ও সুর প্রকাশ করা অপরের পক্ষে অসম্ভব, কিন্তু সে ক্রন্দনের ভাবার্থ এই,—"আমার বাটীতে দস্যু আসিয়াছে, প্রতিবেশিগণ কে কোথায় আছ, আসিয়া আমাকে রক্ষা কর। রাজার ভাগিনেয়ের সঙ্গে থানেশ্বর হইতে যে সমস্ত দুর্বৃত্ত সেনা আসিয়াছে তাহারা আমাকে অসহায়া অনাথা বিধবা পাইয়া বলপ্রকাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে, তোমরা আসিয়া তাহাদিগকে বাধা প্রদান কর, নতুবা আমি মরিলাম। আমার জাতি, কুল, মান সমস্তই হইল ইত্যাদি।" প্রথম প্রথম রমণীর চীৎকার শুনিয়া দুই একজন প্রতিবে-

দ্বিতলের গবাক্ষের কিয়দংশ উন্মোচন করিয়া ব্যাপারটা কি তাহা দেখিতেছিল, তুই একজন ঈষৎ উচ্চৈঃস্বরে রমণীকে অভয় প্রদান করিয়াছিল। কিন্তু পার্শ্ববর্ত্তী গৃহ হইতে একব্যক্তি তৈলিকের বলীবর্দ্দ ও বালকের গর্দ্দভটি দেখিয়া বলিয়া উঠিল "ওরে তুই করিতেছিস কি? পথে যে মেলা ঘোড়া দেখিতে পাইতেছি, নিশ্চয়ই থানেশ্বরের অশ্বারোহী সেনা আসিয়াছে।" তাহার কথা শুনিবামাত্র পাটলিপুত্রের বীর নাগরিকগণ গবাক্ষ রুদ্ধ করিয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রস্থান করিল, রমণীর কাতরোক্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পথে আর দৃষ্টি চলে না দেখিয়া পথিক অগত্যা পদাঘাতে জীর্ণ অর্গল ভগ্ন করিয়া কুটীরে প্রবেশ করিল। রমণী তারস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, কিন্তু মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল কি না তাহা বুঝিতে পারা গেল না, কারণ পথিক, গর্দ্দভ, বৃষ ও বালককে গৃহে প্রবেশ করাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। তাহার পর আর কেহ রমণীর রোদনধ্বনি শুনিতে পায় নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পরিচারকগণ প্রভাত হইতে প্রাচীন সভামণ্ডপ পরিস্কৃত করিতেছিল। কৃষ্ণবর্ণ ব্রহ্মশিলানির্ম্মিত প্রশস্ত সভামণ্ডপ আকারে সমচতুষ্কোণ; উহার ছাদ অষ্টোত্তরশত স্তম্ভের উপরে স্থাপিত, সভাতল উজ্জ্বল মসৃণ সমচতুষ্কোণ কৃষ্ণ মর্ম্মরে আচ্ছাদিত; সভাপ্রাঙ্গনের চতুষ্পার্শ্বে হরিদ্বর্ণ প্রস্তর নির্ম্মিত, নাতিস্থূল স্তম্ভোপরি স্থাপিত রজতময় অলিন্দ। অলিন্দের শীর্ষে কারুকার্য্যময় পাষাণ চিত্র; ইহাতে মহাভারত ও রামায়ণের সমস্ত চিত্রগুলি অঙ্কিত হইয়াছে। অলিন্দের পশ্চাতে সভামণ্ডপের স্তম্ভ। সভামণ্ডপের চতুষ্পার্শ্বে পাষাণময়ী বেষ্টনী। পাটলিপুত্রে শুনিতে পাওয়া যাইত যে, প্রাচীন সম্রাটগণের রাজত্বকালে বেষ্টনীর মধ্যে দশ সহস্র অশ্বারোহী সুসজ্জিত ও শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইতে পারিত। সভামণ্ডপে অন্যূন সহস্র হস্তিদন্তনির্ম্মিত সুখাসন সজ্জিত ছিল। প্রাচীনতা ও অযত্নের জন্য দুগ্ধফেননিভ দ্বিরদরদ অত্যন্ত মলিন হইয়া গিয়াছিল। ইহাতে রাজকর্ম্মচারী ও সম্ভ্রান্ত নাগরিকগণ উপবেশন করিতেন। তখনও আর্য্যাবর্ত্তে যাবনিক প্রথানুকরণে রাজসভায় দণ্ডায়মান থাকিবার প্রথা চলিত হয় নাই। রাজা সভাগৃহে প্রবেশ করিলে সকলে আসন হইতে উত্থিত হইত এবং রাজা আদেশ করিলে স্ব স্ব আসনে পুনরায় উপবেশন

করিত। অলিন্দে দুই শ্রেণীর রজতনির্ম্মিত সুখাসন সজ্জিত ছিল, ইহাতে রাজবংশজাত ও যুবরাজপাদীয় ও কুমারপাদীয় অমাত্যগণ স্থানলাভ করিতেন। আভিজাত্য সম্প্রদায়ে প্রবেশ লাভ না করিলে অলিন্দে কেহ আসন পাইত না। মৎস্যদেশ হইতে আনীত বহুমূল্য শ্বেত মর্ম্মরপ্রস্তরনির্ম্মিত উচ্চশ্রেণীর উপরে সম্রাটের আসন স্থাপিত হইত। সভাতল হইতে হস্তদ্বয়পরিমিত উচ্চ বেদী, তাহার চতুষ্পার্শ্বে সোপানশ্রেণী, বেদীর উপরে সুবর্ণমণ্ডিত দণ্ড চতুষ্টয়ের মস্তকে স্থাপিত রজতময় চন্দ্রাতপ। পরিচারকগণ মর্ম্মরময় বেদি ধৌত করিয়া তাহার উপরে পারস্যদেশ হইতে আনীত আচ্ছাদন বিস্তৃত করিয়া তদুপরি সুবর্ণনির্ম্মিত দুইখানি সিংহাসন স্থাপন করিতেছিল। অপরাপর পরিচারকগণ চন্দ্রাতপে মুক্তার ঝালর লাগাইতেছিল, কেহ বা সিংহাসনদ্বয়ের উপরে রজতনির্ম্মিত ধবল ছত্রদ্বয় সন্নিবেশিত করিতেছিল। বেদীর এক প্রান্তে কাষ্ঠাসনে বসিয়া একজন কুমারামাত্য পরিচারকদিগকে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন।

কয়েকদিন পূর্ব্বে যে পিঙ্গলকেশ বালকটি শোণ ও গঙ্গার সঙ্গমস্থলের উপরে প্রাচীন রাজপ্রাসাদের বাতায়নে দাঁড়াইয়া জলরাশির গতি দেখিতেছিল সে সভামণ্ডপের মধ্যে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছিল। ঘুরিতে ঘুরিতে সে ক্রমে বেদির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিয়া পরিচারকবর্গ নিমেষের জন্য কার্য্য স্থগিত রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বালক জিজ্ঞাসা করিল "নূতন সিংহাসন খানা কাহার ?" একজন পরিচারক উত্তর করিল "থানেশ্বরের সম্রাটের।" বালক চমকিয়া উঠিল। তাহার সুন্দর মুখ ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল এবং হস্তদ্বয় নিকটস্থিত একখানি হস্তিদন্তনির্ম্মিত সুখাসন ধারণ করিল মুষ্টিবদ্ধে হস্তিদন্ত চূর্ণ হইয়া গেল, পরিচারকগণ ভয়ে দুই হস্ত সরিয়া দাঁড়াইল। রোষরুদ্ধকণ্ঠে বালক পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল "কি বলিলি ?" কেহ উত্তর করিল না। যে কর্ম্মচারী পরিচারকগণের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন, তিনি গোলমাল দেখিয়া বেদির নিকটে সরিয়া আসিলেন, বালককে দেখিয়া অভিবাদন করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন। বালক জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কাহার আদেশে বেদির উপরে নূতন সিংহাসন স্থাপন করাইতেছ ? কর্ম্মচারী উত্তর দিতে ইতস্ততঃ করিতেছিল, কিয়ৎক্ষণ পরে বলিল "আমি শুনিয়াছিলাম—" তাহার মুখের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বে বালক এক লম্ফে বেদিতে আরোহণ করিল ও পদাঘাতে নূতন সিংহাসনখানিকে সভাতলে দশ হস্ত দূরে নিক্ষেপ

করিল। মহাশব্দের সহিত সিংহাসন সভাতলে কৃষ্ণবর্ণ আচ্ছাদনের উপর পতিত হইয়া চূর্ণ হইয়া গেল। পরিচারকবর্গ সভামণ্ডপ হইতে পলায়ন করিল, কুমারামাত্য বালকের অবস্থা দেখিয়া পলায়নের চেষ্টা করিতেছিল, এমন সময়ে সভামণ্ডপের পশ্চাৎস্থিত হরিদ্বর্ণ যবনিকা অপসারিত হইল। জনৈক দীর্ঘকায় প্রৌঢ় যোদ্ধৃপুরুষ ও একটি ক্ষুদ্রকায় বৃদ্ধা কতকগুলি বিদেশীয় সৈনিক পরিবৃত হইয়া সভাগৃহে প্রবিষ্ট হইল। বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করিল "কিসের শব্দ হইল ?" কেহই উত্তর দিল না। কুমারামাত্য ও বালক শশাঙ্ক ব্যতীত সভাগৃহে উত্তর দিবার আর কেহ ছিল না। প্রথম ব্যক্তি নবাগতগণকে দেখিয়া এতদূর ভীত হইয়াছিল যে, তাহার উত্তর দিবার সামর্থ্য না। বালক ইচ্ছা করিয়াই উত্তর দিল না, মুখ ফিরাইয়া রহিল। বৃদ্ধা দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করিলেন। কর্ম্মচারী উত্তর দিবার চেষ্টা করিল কিন্তু তাহার মুখ হইতে অস্পষ্ট শব্দ ও প্রভূত পরিমাণ লালা নির্গত হইল। বালক তখন অবজ্ঞা ভরে মুখ ফিরাইয়া কহিল "পরিচারকেরা পিতার সিংহাসনের পার্শ্বে বেদির উপরে থানেশ্বরের রাজার সিংহাসন রাখিয়াছিল, আমি তাহা পদাঘাতে চূর্ণ করিয়া দিয়াছি" সভামণ্ডপের প্রাচীরের কঠিন পাষাণে লাগিয়া তাহা প্রতিধ্বনিত হইল। শ্রবণ মাত্র প্রৌঢ় যোদ্ধার মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল ; অনুবর্ত্তী সৈনিকগণের কোষস্থিত অসির ঝনৎকার শ্রুত হইল। কুমারামাত্য সে শব্দে চমকিয়া উঠিল ও ঊর্দ্ধশ্বাসে সভামণ্ডপ হইতে পলায়ন করিল। বৃদ্ধা তখন বেদির দিকে অগ্রসর হইয়া আসিলেন ও বালকের হস্তধারণ করিয়া তাহাকে বেদি হইতে সভাতলে লইয়া গেলেন। প্রৌঢ় তখন কোষ হইতে অসি নিষ্কাসন করিতেছিলেন, অর্দ্ধোন্মুক্ত অসি কোষেই রহিয়া গেল। অতি ব্যস্তভাবে শুভ্রবসনপরিহিত নগ্নপদ জনৈক বৃদ্ধ সভামণ্ডপে প্রবিষ্ট হইল। তাহাকে দেখিয়া বিদেশীয় সৈনিকগণও অভিবাদন করিল। আমরাও তাঁহাকে পূর্ব্বে একবার দেখিয়াছি, তিনি গুপ্তবংশীয় সম্রাট মহাসেনগুপ্ত। ৮

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রায়শ্চিত্ত।

এই যে কলিকাতা হইতে রাজধানী চলিয়া গিয়াছে, এটা তোমাদের কিম্ভূতকিমাকার স্বদেশীর অবশ্যম্ভাবী ফল। স্বদেশী করিতে গিয়া বা ... গিয়া, তোমরা যে দেশকে ছোট করিয়া তুলিতেছিলে, তাহারই ফলে, তোমরা সাম্রাজ্যের রাজধানীর মর্য্যাদা হারাইলে।

বাজারের স্বদেশীর মত বোকামির ব্যাপার বোধ করি জগতে আর কখনও হয় নাই। আমি আমার ছেলেটিকে প্রতিবেশী ছেলেদের অপেক্ষা বেশী ভালবাসি, একথা নাকি কেহ আবার ঢাক ঘাড়ে করিয়া, সেই ঢাক পিটাইয়া অলিগলি বলিয়া বেড়ায়! আরে পাগল! পাগল ভিন্ন সকলেইত তাই করে। তুমি বলিতে পার, সে কথা ঠিক, কিন্তু আমরা বিদেশী দ্রব্যের মোহে পাগলই হইয়াছিলাম; সেই পাগলামি যাই ছুটিল, তাই আহ্লাদে ঢাক বাজাইয়া নৃত্য করিতেছিলাম। বেশ কথা। যদি পাগলামিই ছুটিল, তবে আবার আপনার দেশকে ছোট করারূপ পাগলামি আসিল কেন? সত্য বটে, আমরা ক্ষুদ্রপ্রাণ বাঙ্গালি, বিশ্বপ্রেমের ধারণাই আমাদের হয় না—'বসুধৈব কুটুম্বকং' আমাদের মুখস্থ করা কথা, প্রাণের কথা নহে। তা বলিয়া আমরা কি ভারতমাতা ভুলিয়া বঙ্গমাতাতে সন্তুষ্ট থাকিতে পারি?

আমাদের বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, সঙ্গীত, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, তীর্থক্ষেত্র—সকলই ভারত লইয়া। আমাদের ইতিহাসের নাম মহাভারত, কলা-বিজ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম ভারতী। আমরা ভারতকে মনে করিলেই কি ভুলিতে পারি?

এই যে ইংরাজি শিক্ষার ফলে, একটু একটু করিয়া দেশভক্তির বীজ অঙ্কুরিত হইতেছিল সেও ত ভারতভক্তি।

অতি বালককাল হইতে সুর আমাদের কানে লাগিয়া রহিয়াছে—"কুইন্ কুইন্ হলো তোমার সোণার ইণ্ডিয়া।" সেও ত ভারতেরই কথা। তাহার পর ঠাকুরবাড়ীর সঙ্গে কাঁদিয়াছিলাম, বলিয়াছিলাম:—

মলিন মুখ-চন্দ্রমা, ভারত তোমারি।
রাত্রিদিবা ঝরিতেছে লোচন-বারি॥
চন্দ্র জিনি কান্তি—চন্দ্র জিনি কান্তি—
হেরিয়ে ভাসিতাম আনন্দে—

আজ্ এ মলিন মুখ কেমনে নেহারি।
মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি।

তাহার পর রঙ্গমঞ্চ হইতে ধ্বনিত হইল,—

দেখ গো ভারতমাতা তোমার সন্তান;
সবে অতি দীন হীন; অন্ন বিনা তনু ক্ষীণ,
হেরিলে এদের দশা বিদরিয়া যায় প্রাণ।

তাহার পর ভারতমাতার জন্য সন্তানগণের মনোবেদনা সর্ব্বত্র গীত হইতে লাগিল। হেমচন্দ্রের ভারত-সঙ্গীতে ভারত-বিলাপে দেশ ভরিয়া গেল।

মনোমোহন গায়িলেন,

দিনের দিন সবে দীন,
ভারত হয়ে পরাধীন।

আগ্রা হইতে গোবিন্দ রায় গায়িলেন

কতকাল পরে বল ভারতরে
দুখসাগর সাঁতরি পার হবে।

বাঙ্গালির বাঙ্গলা গানের সংগ্রহ হইল—নাম হইল, "ভারতীয় সঙ্গীত-মুক্তাবলী।" তাহাতে উদ্দীপনা, শোচনা, আকাঙ্ক্ষা ও প্রার্থনা নামে প্রায় শত সংখ্যক জাতীয় সঙ্গীত প্রকাশিত হইল—সে আজি প্রায় ত্রিশ বৎসরের কথা। তাহার পর প্রায় বিংশতি বৎসর কাল ঐ ভাবেই চলিতেছিল। বঙ্কিমবাবুর কমলাকান্ত ওরই মধ্যে একবার বঙ্গদর্শনে বাঙ্গালার জন্য শোক করিয়াছিল মাত্র। কিন্তু বঙ্গদর্শন যখন প্রথম হইতেই 'ভারত-কলঙ্ক' ক্ষালনের জন্য ব্যস্ত ছিল, তখন ও কথা অনেকেরই প্রাণে লাগে নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ঠাকুরবাড়ী হইতেই ভারতমাতার করুণ গীতি জাঁকাইয়া আরম্ভ হয়।

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের

মিলে সব ভারত-সন্তান,
একতান মনোপ্রাণ
গাও ভারতের যশোগান।

উদ্ধৃত করিয়া বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমবাবু অজস্র পুষ্প-চন্দন বর্ষণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ঠাকুরবাড়ীরই প্রসাদ, আবার ঠাকুরবাড়ী হইতেই বিষাদ—কবি রবীন্দ্রনাথ আমাদের স্বদেশের পরিধি কমাইয়া ভারতপ্রীতিকে বঙ্গপ্রীতিতে পর্য্যবেশিত

করিতে ইদানীং বিশেষ ব্যস্ত হইয়াছিলেন। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি জননীর শ্রীমুখ দিয়া বলাইয়াছিলেন :—

"আমি অর্জ্জুনেরে
আমি যুধিষ্ঠিরে
করিয়াছি স্তন্যদান,
এই কোলে বসি বাল্মীকি কোরেছে,
পুণ্য রামায়ণ-গান।

আবার "শোচনায়" বলিয়াছিলেন,—

ভারতের বনে পাখী গায় গান
স্বর্ণ-মেঘ মাখা ভারত বিমান,
হেতাকার লতা ফুলে ফলে ভরা
স্বর্ণ শস্যময়ী হেতাকার ধরা
প্রফুল্ল তটিনী বহিয়ে যায়।

আর রবিবাবুর "ভুবনমনোমোহিনী" গান সেও ভারতমাতাকে লক্ষ্য করিয়া রচিত।

ইহার পর, ১৯০৫ সালে নিতান্ত কুক্ষণে লর্ড কর্জ্জন বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া বঙ্গকে দ্বিখণ্ডীকৃত করিলেন, আর আমাদের রবীন্দ্রনাথ শোকে মুহ্যমান হইয়া সোণার বাংলা ধূয়া ধরিলেন। অতি পবিত্র অথচ ক্ষীণ স্বরে বলিলেন :—

বাংলার মাটী
বাংলার জল
বাংলার বায়ু
বাংলার ফল
পুণ্য হোক পুণ্য হোক।

আমরা পুরাণ' পাপী, ভারতমাতার ভিখারী সন্তান। আমরা কিন্তু সেই গরীয়সী জগজ্জননী ভারতমাতাকে ভুলিয়া নবমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিতে পারিলাম না। রবীন্দ্রনাথ ডাকযোগে আমাকে রাখীসূত্র এবং মন্ত্রসূত্র পাঠাইয়া ছিলেন। রাখী বাঁধিলাম, কিন্তু মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারিলাম না। সপ্তসিন্ধু, ব্রহ্মর্ষি, ব্রহ্মাবর্ত্ত, আর্য্যাবর্ত্ত—এ সকলই ভারতমাতার স্নেহের ও আদরের সন্তান, এখন বঙ্গদেবী ভারত-মাতার প্রাণের পুত্তলী বলিলেও চলে,

তা বলিয়া কি জগজ্জননীর মহীয়সী মূর্ত্তি প্রাণ হইতে ঠেলিয়া রাখিতে পারা যায়? তা কখন যায় না।

আজি কয়েক বৎসর হইল স্বদেশীর খুব ধুমধামের দিনে, কাঁটাল পাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের বাস্তভবনে বঙ্কিমোৎসবে সুরেন্দ্রবাবু আর একটি মহাত্মা (নাম ভুলিয়া গেলাম) আঁমাকে আহ্বান করিয়াছিলেন। আহ্বানকারীরা কিন্তু কেহই উপস্থিত ছিলেন না বোধ হয় তখন হইতেই মধ্যব্রতীগণ দেশব্রতীদের হইতে একটু পৃথক্ হইতেছিলেন। আমরা সমস্ত দিনরাত্রি উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাদের দর্শন পাই না।

তাঁহারা না থাকুন, কিন্তু কলিকাতার ও নিকটের বহুতর ভদ্র-সন্তান এবং ভট্টপল্লীর ঠাকুর মহাশয়গণ প্রভৃতি অনেক লোক একত্র হইয়াছিলেন। তখনকার দিনের একজন চাঁই ছিলেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়—তিনি এই বঙ্গমাতার নাম লইয়া বাহ্বাস্ফোটের একজন সর্দ্দার। আমার পান্সী কাঁটালপাড়ার ঘাটে লাগিল, আমার পাশে এক গলা গঙ্গাজলে উপাধ্যায় স্নান করিতেছিলেন; তাঁহাকে দেখিয়া আমি প্রথমেই প্রশ্ন করিলাম—'আপনারা বঙ্গমাতা বঙ্গমাতা করিয়া এত বাড়াবাড়ি করিয়া জগজ্জননী ভারত-মাতাকে ভুলিতে বসিয়াছেন কেন? আমরা কি কাশী, কাঞ্চী, মথুরার মায়া ভুলিয়া যাইব—? বেদ স্মৃতি পুরাণ ইত্যাদি সমস্তই ভুলিব? রাম লক্ষ্মণ ভীষ্ম দ্রোণের কথা মনেই আনিব না? সে কিরূপ patriotism (দেশভক্তি) হইবে?' ব্রহ্মবান্ধব আমার প্রশ্নে স্তব্ধ হইয়া গেলেন, ধীরে ধীরে ঘাটে উঠিলেন, আমিও উঠিতে লাগিলাম। উপাধ্যায় মাথা পুঁছিতে পুঁছিতে বলিলেন, 'আপনি বঙ্কিমোৎসবে আসিতেছেন, তিনি যে সপ্তকোটিকণ্ঠকল কলনিনাদকরালে বলিয়া গিয়াছেন, তবেই ত বাঙ্গালি হইল।' আমি বলিলাম, "সন্ন্যাসীরা বুঝিয়াছিল, ভারত-মাতার (fighting force) তরবারি ধরিবার উপযুক্ত ব্যক্তি সপ্তকোটি।" ব্রহ্মবান্ধব আবার বলিলেন "আনন্দমঠ জিনিবটা বাঙ্গালা লইয়া।" আমি বলিলাম "কে বলিল! একজন হিমালয় দেশবাসী মহাপুরুষ পরিচালক, আর বন্দেমাতরং সঙ্গীত সমগ্র ভারতের সুবোধ্য সহজ সংস্কৃতে; ইহাতেই কি বুঝা যায় না যে, সেই সঙ্গীত ভারত-মাতাকে উদ্দেশ্য করিয়া লিখিত। ব্রহ্মবান্ধব নিরুত্তর হইলেন, আমিও স্বস্তিলাভ করিলাম। বাস্তবিক ভারত-মাতার স্থলে বঙ্গমাতার স্থাপন চেষ্টা দেখিয়া আমার বড়ই অশান্তি হইয়াছিল।

আমি যে কাহারও অপেক্ষা বঙ্গদেবীকে কম ভালবাসি, একথা আমি মুখেও বলিতে পারিব না, তবে ভারতমাতাকে আমি যে শুধু ভালবাসি এমন নহে, আমি ভক্তি করি, পূজা করি। কত জন্মজন্মান্তরের পুণ্যফলে যে আমরা পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে জন্মলাভ করিয়াছি, তাহা মনেও গণনা করিতে পারি না। এই যে গঙ্গা যমুনা গোদাবরী সরস্বতী নর্ম্মদা সিন্ধু কাবেরী সপ্তসরিৎপ্লাবিতা পুণ্যভূমি, এই কাশী কাঞ্চী মায়া মথুরা প্রভৃতি সহস্র ধামশোভিত বিস্তীর্ণ ধর্ম্মক্ষেত্র, লক্ষাধিক অভ্রভেদী মঠমন্দির পরিব্যাপ্ত প্রসর ভূভাগ—অনন্ত কাল ধরিয়া যদি জননী জঠরে জন্মিতে ও মরিতে হয় তবে তাহা অপেক্ষা মানবের সদ্গতি আর কি আছে ?

তোমরা মুখে যাহাই বল, আর গান যাহাই বল, তোমরা তোমাদের কার্য্যে ভারতমাতাকেই দেশমাতা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিলে। মাদ্রাজের তাঁতিদের হাতে বোনা কাপড় পরিয়া বোম্বায়ের কলের চাদর মাথায় দিয়া আমরা রজনীকান্তের সঙ্গে বলিয়াছিলাম—

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নে রে ভাই

সে কোন্ মায়ের দেওয়া ? ভারতমাতার ত! তখন যদি ভারতমাতা জাগ্রৎ হইয়া শত সহস্র হস্তে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া না দিতেন, তবে আমাদের কি দশা হইত মনে কর দেখি! তবেই বুঝ ভারতমাতাকে তোমরা ভুলিতে বসিয়াছিলে, তিনি তোমাদিগকে ভুলা দূরে থাকুক্, তোমাদের লজ্জা নিবারণের জন্যই বিশেষ ব্যস্ত ছিলেম। একেই বলে

কুপুত্র যদিও হয় কুমাতা কখনও নয়।

মা কখন ছেলেকে ভুলিতে পারেন কি ? তিনি যে যুগযুগ ধরিয়া আমাদিগকে কোলেপীঠে করিয়া মানুষ করিয়া আসিতেছেন। কত দৈত্যদানব অসুর 'কালদ' কত যবন ম্লেচ্ছ মায়ের শ্রীঅঙ্গের উপর কত অত্যাচার করিয়াছে, রক্তপাত করিয়াছে, কৈ তিনি কখন তাঁহার সোণার কোল হইতে আমাদিগকে বিতাড়িত করিয়াছেন ? না তা কখন করেন নাই। আমরাই মাকে ছোট করিয়া পলিটিক্সে জোর দিতে যাই, কখনও মাকে বড় করিয়া cosmopolitan (বিশ্বমাতার পুত্র, হইতে চাই। আমরাই মোহবশে বিড়ম্বনা করিয়া ফেলি

তোমরাই ক্ষুদ্র পলিটিক্সে বলাধান করিবার জন্য এই অনন্তপ্রসারি অনন্তস্থায়িনী অনন্তনন্দিনী জগন্মাতাকে ভুলিতে বসিয়াছিলে, সেই পা[illegible]

প্রতিফলে, তোমরা রাজধানীর ঐহিক মর্য্যাদা হারাইয়াছ। তুমি সমগ্র ভারতকে ভুলিতে বসিয়াছিলে, ভারতের রাজশক্তির কেন্দ্রও সেই জন্য তোমার ত্রিসীমার বহির্ভাগে গিয়াছে। কথায় কথায় ভারত গবর্ণমেণ্টের শ্রুতিগোচর করিবার জন্য কলিকাতায় মহতী সভা করিতে, এখন চাল চিড়া বাঁধিয়া ইল্লি ডিল্লী গিয়া, এখান হইতেও অধিকতর অস্বাস্থ্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া তোমাকে রাজ-প্রতিনিধির দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতে হইবে! পাপের প্রায়শ্চিত্ত নয় ত কি বলিব?

যদি এই প্রায়শ্চিত্তের ক্রিয়া সম্পাদন করণার্থ পুনঃপুনঃ গয়া কাশী প্রয়াগ গমনাগমন করিয়া, সমগ্র ভারতের মহাভাব তোমার হৃদয়ে পরিস্ফুট হয়, যদি মথুরা বৃন্দাবন, প্রভাস হরিদ্বারের নিয়ত সামীপ্য লাভ করিয়া পবিত্র ভূমির পুণ্যপ্রতাপ বুঝিতে পার, যদি ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণার্জ্জুনের বিচরণক্ষেত্রের ধূলিতে ধূসরিত হইয়া মনঃপ্রাণ পবিত্র করিতে পার, তবেই জানিব প্রায়শ্চিত্ত সফল; রাজাজ্ঞা ফলবতী হইয়া বঙ্গবাসীকে আবার ভারতবাসী হইবার যোগ্য করিল। কেবল রাজনীতি রাজনীতি করিয়া উন্মত্ত হইও না। একবার ধর্ম্মের চক্ষে এই রাজধানী-পরিবর্ত্তন ব্যাপারটা দৃষ্টি কর, করিয়া ইহা ধর্ম্মসঙ্ঘের সোপান বলিয়া মনে করিয়া ধন্য হও।

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার।

প্রয়াণ-সঙ্গীত।

মরিয়া বেঁচেছি আমি! নহি ত শয়ান
অনন্ত নিদ্রার ক্রোড়ে, করেছি প্রয়াণ
নূতন জীবনে, প্রিয়, যেথা জাগরণ
ঘুমায় না কভু। অশ্রু কেন অকারণ?
জয়ী আমি আজ! হেরে নব দৃশ্য সব
নব নেত্র; নব কর্ণ শোনে নব রব।
ছিন্ন-তার বীণা, সাঙ্গ গীতের আলাপ,
ভেঙ্গেছে কল্পনা-খেলা, ঘুচেছে প্রলাপ,
কেন বলো, বন্ধু? এ যে পোহায়েছে রাতি
আর পারে,—গান গেছে গাহিতে প্রভাতি!

কুহুধ্বনি যায় যথা মধুঋতু শেষে
গাহিতে বসন্ত, নব বসন্তের দেশে।
অমৃত পোড়াতে গিয়ে শ্রান্ত শুধু চিতা,
মরিয়া অমর হয় কবি ও কবিতা।

শ্রীপ্রমথনাথ রায়চৌধুরী।

কাঙ্গাল হরিনাথ।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের নিকট কাঙ্গাল হরিনাথ প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে, তিনি ১১ই মাঘের ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে কলিকাতায় গমন করিবেন। গোস্বামী মহাশয় কুমারখালীতে কয়েকদিন অপেক্ষা করিয়াই সপরিবারে কলিকাতায় চলিয়া গেলেন; কাঙ্গাল তাঁহাদের সঙ্গে যাইতে পারিলেন না। ১১ই মাঘের বিলম্ব ছিল জন্য তিনি কয়েকদিন বাড়ীতেই থাকিলেন।

আমার ঠিক মনে পড়িতেছে না, বোধ হয় ৯ই মাঘ রাত্রির গাড়ীতে ফিকিরচাঁদের দলের কয়েকটী লোক সঙ্গে লইয়া কাঙ্গাল কলিকাতা গমন করেন, আমিও সেই দলে ছিলাম। ইহা ১২৯১ শালের কথা।

আমরা কলিকাতায় পৌছিয়া পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের বাসস্থানেই উঠিয়াছিলাম। শ্রীমান অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় তখন কলিকাতায় ছিলেন; তিনি ষ্টেসন হইতে আমাদিগের সঙ্গী হইলেন। পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পার্শ্বের গলির মধ্যে একটা বাড়ীতে তখন থাকিতেন। তখন তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক ছিলেন, সেই জন্য প্রচারকগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট গৃহে তিনি বাস করিতেন। আমরা কাঙ্গালের দলকে গোস্বামী মহাশয়ের বাসায় পৌছাইয়া দিয়া সেখান হইতে স্থানান্তরে বন্ধুগৃহে চলিয়া গেলাম।

পরদিন ১০ই মাঘ প্রাতঃকালে আমরা গোস্বামী মহাশয়ের বাসায় দেখি সেখানে অনেক লোক সমবেত হইয়াছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে দিনের প্রাতঃকালের উপাসনায় যে সমস্ত লোক সমবেত হইয়াছিলেন,

সকলেই শুনিতে পাইয়াছিলেন যে, কাঙ্গাল হরিনাথ তাঁহার বাউলের দলের কয়েকটী লোক সঙ্গে লইয়া সেখানে আছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরে কাঙ্গালের গান হইবার সম্ভাবনা ছিল না, তাহা আমরাও জানিতাম, কাঙ্গালও জানিতেন। কাঙ্গালের গান কেহ সাধারণ ব্রহ্মসমাজের পবিত্র মন্দিরে হইতে পারিবে না, তাহার কারণ বলিতে পারি না। সে যাহাই হউক, সমাজমন্দিরের প্রাতঃকালের উপাসনা শেষ হইলে অনেক ব্রাহ্ম ও অন্যান্য ভদ্রলোক গোস্বামী মহাশয়ের রাসভবনে উপস্থিত হইলেন এবং সকলেই কাঙ্গালের গান শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন গান আরম্ভ হইল। সে সময়ে যে কয়েকটী গান হইয়াছিল, তাহার সবগুলির কথা আমার স্মরণ হয় না, কেবল একটী গানের কথা আমার মনে আছে। তাহা এই—

ব্রহ্মধন কি পদার্থ, তাহার অর্থ
যে বুঝে নাই, সেই বুঝেছে।

১। বলে রে যে সব জ্ঞানী, ব্রহ্ম জানি,
জানে না সে, বলে মিছে;
যে বলে জানিনে রে জানি তাঁরে,
সেই যে তাঁর কিছু জেনেছে।

২। এই যে ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড, কত কাণ্ড
অবিশ্রান্ত ঘুরিতেছে;
এই সকল ভাণ্ডের মাঝে ব্রহ্ম আছে,
কেহ তাঁরে না দেখিছে।

৩। মানব জ্ঞান বেদ বেদান্ত, না পায় অন্ত
মন বুদ্ধি হার মেনেছে;
কাঙ্গাল কয় ব্রহ্ম যারে, দয়া করে,
ব্রহ্ম কেবল সেই জেনেছে।

এই গানের পর আরও অনেক গান হইয়াছিল। বেলা প্রায় দুইটা পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত গান চলিয়াছিল; যত লোক গান শুনিবার জন্য আগমন করিয়াছিলেন তাঁহাদের কেহই এত বেলা পর্য্যন্ত সে স্থান ত্যাগ করিতে পারেন নাই। আমাদেরও সে দিন বাসায় যাওয়া হইল না; সাধুসঙ্গেই দিন কাটিয়া গেল।

সন্ধ্যায় সময় ব্রাহ্মসমাজে যথারীতি উপাসনা হইল। তাহার পর আমরা

বাসায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলে গোস্বামী মহাশয় ও কাঙ্গাল হরিনাথ উভয়েই আমাদিগকে (অক্ষয়কে ও আমাকে) সে রাত্রি সেখানেই অতিবাহিত করিবার আদেশ করিলেন। আমরা আহারাদি শেষ করিয়া বিশ্রামের আয়োজন করিতেছি এমন সময় কাঙ্গাল বলিলেন "তোদের কি ঘুমাইবার জন্য রাখিয়াছি, আজ সমস্ত রাত্রি তোরা উৎসব করবি, তাহারই জন্য তোদের বাসায় যাইতে দিই নাই।" আমরা বুঝিলাম, সমস্ত রাত্রি এ বাড়ীতে নিদ্রাদেবীর আগমনের কোন সম্ভাবনা নাই। তখন গানের আয়োজন হইল! একটী গান সেই দিনই বাঁধা হইয়াছিল; সেইটীই প্রথমে গীত হইল। গানটী এই :—

সহেনা যাতনা আর, মা আমায় বাঁচাও বাঁচাও।

১। অসত্য এই দেহদুর্গে, আমি রয়েছি অসৎ সংসর্গে মা ;—
ত্রাণ নাই কোনরূপে, দয়া ক'রে সৎস্বরূপে লইয়া যাও।
(অসৎ হ'তে)

২। অসৎ দুর্গে ঘোর অন্ধকার, আমি, আপনি দেখিনে আপনার মা ;—
দেখ্‌ব কি আর তোমায়, ও মা আমায় জ্যোতিতে আজ লইয়া যাও।
(এই আঁধার হ'তে)

৩। স্বাধীনতা না আছে যার, ওগো সেই ত মৃত সন্তান তোমার মা ;—
রিপুর অনুগত, আমি মৃত, অমৃতেতে লইয়া যাও।
(এই মৃত্যু হ'তে)

৪। জন্মাবধি অপরাধী, রুদ্রমুখ তাই নিরবধি মা
কাঙ্গাল সদা দেখে ; মা আমাকে প্রসন্ন মুখ দেখাও দেখাও।
(তোমার শান্তি মাখা)

ব্রাহ্মসমাজে যে প্রার্থনা হইয়া থাকে "অসতো মা সদ্গময়—অসত্য হইতে আমাদিগকে সত্যেতে লইয়া যাও ইত্যাদি" উপরিলিখিত গানটী তাহাই। তবে একটু পার্থক্য আছে। উক্ত শ্লোক বা তাহার বাঙ্গলা অনুবাদে সেই পরম পুরুষের নিকট প্রার্থনা করা হইতেছে, আর কাঙ্গাল—মাতৃভক্ত কাঙ্গাল মায়ের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন।

উপরিউক্ত গানটী বড়ই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল ; গোস্বামী মহাশয় এই গান শুনিয়া এমন বিহ্বল হইয়াছিলেন যে, তিনি আর বসিয়া থাকিতে পারেন নাই, দণ্ডায়মান হইয়া "মা মা" বলিয়া চীৎকার করিয়া নৃত্য ক[illegible]

তাহার পর গান হইল———

আয় রে মন আমার সাথে, বৈদ্যনাথে,
হবে রোগের প্রতিকার।

১। তিনি যে অনাথের নাথ, হন বৈদ্যনাথ,
কাঙ্গালে তাঁর দয়া বড় ;
তাঁর দ্বারে ধরণা দিলে, তাঁয় ডাকিলে,
কোন রোগ না থাকে কার।

২। তিনি হন বড় দয়াল, ধনী কাঙ্গাল,
সকলই যে সমান তাঁর ;
তাঁরে ভাই সকাতরে ডাক্‌লে পরে,
দয়া করেন যার তার।

৩। কাঙ্গাল কয় সে বৈদ্যনাথ, অনাথের নাথ,
টাকা কড়ি লন্ না কার ;
কেবল রে ভক্তি ক'রে ডাক্‌লে পরে
রোগ হ'তে করেন উদ্ধার।

তাহার পর আরও গান হইল ; সে সকল এখন আমার স্মরণ হইতেছে না। সমস্ত রাত্রি এই ভাবে গান চলিল।

এ দিকে রাত্রি শেষ হইতে না হইতেই দলে দলে লোক ব্রাহ্মসমাজে আসিতে লাগিলেন। ১১ই মাঘের প্রাতঃকালে পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় সমাজ-মন্দিরে উপাসনা করিবেন শুনিয়া অনেকেই রাত্রি থাকিতেই মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখনও অন্ধকার আছে, তখনও কলিকাতার রাজপথের আলো নির্ব্বাপিত হয় নাই। সেই সময়েই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে খোল করতাল বাজিয়া উঠিল। সেই শব্দ পাইয়াই কাঙ্গালের দল গোস্বামী মহাশয়ের বাসভবনে গান ধরিলেন———

একবার জাগো জাগো রে দেখ না চাহিয়ে।
ঐ যে বনের পাখীগণ হইয়ে চেতন, মায়ের নাম স্মরি গেল রে চলিয়ে।

১। আশা করি বৃক্ষে বাসা বাঁধিয়াছ,
চিরদিন ভবে রবে ভাবিয়াছ,
ঐ দেখ, হ'ল প্রাতঃকাল, এল ব্যাধকাল,
কেন অকালে এ জীবন হারাও ঘুমাইয়ে।

২।　　　　মানস বিহঙ্গ কত ঘুমাইবি,
দয়াময় বল মোক্ষ ফল পাবি,
দয়াময়ের নাম, লও রে আত্মারাম,
তোর শমন-ভয় যাবে সহজে চলিয়ে।

এই গান শেষ হইলেই সকলে গাত্রোত্থান করিলেন এবং তাড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত সম্পন্ন করিয়া ব্রাহ্মসমাজে উপস্থিত হইলেন। আমরাও তাঁহাদের সঙ্গে গিয়াছিলাম। সে দিন ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় কি হইয়াছিল তাহা আমরা বলিব না, কাঙ্গাল হরিনাথ সে দিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার দিনলিপিতে তিনি এ সম্বন্ধে যে কয়েকটী কথা লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, আমরা নিম্নে তাহাই উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

কাঙ্গাল লিখিয়াছেন—"১২৯১ সালের ১১ই মাঘ কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে প্রতঃকালের আধ্যাত্মিক দৃশ্য——আনন্দময়ী মায়ের আনন্দময় দৃশ্য ধ্যানযোগে অবলোকন করিয়া আচার্য্যদেবের সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই 'মা, মা' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিয়াছিলেন। পরে বহুসংখক নরনারী তৎসঙ্গে যোগদান করিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত "মা, মা" বলিয়া ক্রন্দন করিতে থাকেন। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল 'মা, মা' শব্দে মন্দির প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে। একটী যুবক এমন উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন আরম্ভ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার ক্রন্দনে উপাসনার ব্যাঘাত হইবে মনে করিয়া তাঁহাকে মন্দিরের বাহিরে লইয়া যাওয়া হয়। এই প্রকারে সারাদিনে উৎসবের কার্য্য শেষ হইলে গভীর রজনীতে আচার্য্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় স্বীয় ভবনে যখন বিশ্রামাসন গ্রহণ করেন, তখন আমি তাঁহাকে নিবেদন করিলাম 'দেব! অদ্যকার ব্যাপার যাহা আমি দেখিয়াছি, তাহা প্রকাশ করিতে সাহস হইতেছে না; লোকে শুনিলে আমাকে উন্মাদ - বা গাঁজাখোর বলিবে।' আচার্য্যদেব হাস্য করিয়া বলিলেন 'বল, এখানে কোন অবিশ্বাসী নাই।' আমি তখন যাহা দেখিয়াছিলাম প্রকাশ করিলাম। আচার্য্যদেবের দর্শনাংশের সহিত ঐক্য হওয়ায় তিনি আনন্দ প্রকাশ করিলেন। পরে আচার্য্যদেবের পুত্র বালক যোগজীবন এবং আমার সঙ্গী আরও একটী যুবক আপন আপন দর্শন প্রকাশ করিলে আমাদের দর্শনের সহিত ঐক্য হইল। পরে আশ্রমবাসিনী কয়েকটী দেবী আসিয়া দর্শনের ভাব স্পষ্ট করিয়া বর্ণন করিলেন। আমাদের দৃশ্যের সহিত ঐক্য হওয়ার পর আচার্য্যদেব আমাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন 'অদ্য ঐরূপ ঘটিবে

আমি তাহার কিছুই বুঝিতে পারি নাই। ব্রাহ্মধর্ম্মের পদ্ধতিক্রমে উপাসনা করিতেছি, এইমাত্র আমার স্মরণ আছে। হঠাৎ তুলার মত কি যেন মন্দির-মধ্যে প্রকাশিত হইল। তাহার পর এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইয়া মহিমামণ্ডপস্থ মহিলাগণের মস্তকোপরি পতিত হইল। তাহার পর সেই জ্যোতিঃ আনন্দময়ী মা হইয়া মন্দিরের মধ্যস্থলে বিরাজ করিয়াছিলেন। অনন্তর তুলার মত জ্যোতিঃসমূহ এক একটী মূর্ত্তির ভাব পরিগ্রহ করিয়া নৃত্য ও কীর্ত্তনাদি করিতে লাগিলেন। তখন মন্দির বলিয়া কিছুমাত্র অনুভূত হয় নাই, যেন অসীম আকাশে এই অদ্ভুত দৃশ্য পরিলক্ষিত হইতেছে। ধ্যানযোগে ইহাই বুঝিতে পারিয়াছিলাম।' এখন আমার সন্দেহ ও ভ্রম দূর হইল এবং বিশ্বাস জন্মিল আমি উন্মাদ হই নাই বা কোন প্রকার মাদকদ্রব্য সেবন করিয়া ঐ প্রকার অপূর্ব্ব দৃশ্য অবলোকন করি নাই।"

উপরিউক্ত কথা কয়েকটী আমরা কাঙ্গালের স্বহস্ত-লিখিত দিন-লিপি হইতে উদ্ধৃত করিলাম। কাঙ্গালের 'ব্রহ্মাণ্ডবেদের' একস্থানেও এই কথার উল্লেখ আছে। ব্রহ্মাণ্ডবেদের' প্রথমভাগের ২৯২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে "১২৯১ সালের ১১ই মাঘ প্রাতঃকালে পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় যে সময় কলিকাতার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বেদীর কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, সেই সময়ে একটী দৃশ্য প্রকাশিত হইয়াছিল। তখন অনেকেই 'মা, মা' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়াছিলেন। এই দৃশ্যে মহম্মদ নানকের হস্ত ধরিয়া, নানক আবার অন্য ভক্তজনের সঙ্গে গলাগলি হইয়া 'একমেবাদ্বিতীয়ং' কীর্ত্তন করতঃ ভাবাবেশে নাচিয়াছিলেন; মহাত্মা রামমোহন রায়ও তথায় উপস্থিত ছিলেন।"

এই ১১ই মাঘের পর পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী আর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে উপাসনার কার্য্য করেন নাই, বলিয়া আমাদের মনে হয়। কারণ এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই আমরা জানিতে পাইয়াছিলাম যে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ লোপ হইয়াছিল; গোস্বামী মহাশয় তাহার পরেই ঢাকায় চলিয়া গিয়াছিলেন।

১১ই মাঘের পরেও কাঙ্গাল হরিনাথ দুই তিন দিন কলিকাতায় ছিলেন। একদিন পরলোকগত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের বাসভবনে কাঙ্গালের গান হইয়াছিল; সেখানেও অনেক লোক উপস্থিত ছিলেন। তাহার পরই কাঙ্গাল কলিকাতা ত্যাগ করেন।

ফিকিরচাঁদের বাউলসঙ্গীতের কথা বলিতেই এক বৎসর চলিয়া গেল

পাঠকগণেরও বোধ হয় ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিতেছে। বাউলসঙ্গীতের কথা এই স্থানেই শেষ করিলাম। অতঃপর "কাঙ্গালের ব্রহ্মাণ্ডবেদ" সম্বন্ধে আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইব।

কলিকাতা হইতে প্রত্যাগত হইয়া কাঙ্গাল হরিনাথ প্রথমে যে কয়েকটী গান লিখিয়াছিলেন, তাহারই একটী পাঠকগণকে উপহার প্রদান করিয়া এই প্রস্তাবের উপসংহার করিতেছি।

তোমায় ঘন হ'তে হোল।

তুমি যে পাতলা পাতলা থাক্‌লে কেবল, পিপাসা কি যায় হে বল।

১। ওহে, সূক্ষ্ম মেঘে দুঃখ বড়, রুক্ষ্ম শব্দমাত্র গড় গড়,
তাই বলি হও হে দড়, নইলে আশা বিফল ;
তুমি আকাশেতে বেড়াও ভেসে, আমার অমনোযোগ বাতাস এসে,
উড়ায়ে শূন্য দেখায় যে কেবল।

২। তুমি ঘন না হইলে পরে, আমি দেখ্‌তে নারি যতন ক'রে,
মনপ্রাণ কেমন করে, হৃদয় যে এলোমেলো ;
তুমি ঘন হ'য়ে ঘনঘন, প্রেমবারি কর বরিষণ,
আমার এই চাতক প্রাণ হোক শীতল।

৩। অমি শুনি, বলেন সাধকবৃন্দ, নাথ তুমি হে সচ্চিদানন্দ;
ঘন না হলে পসন্দ, কিসে আমার হয় বল ;
করি তাই কাতরে এই নিবেদন, হও হে সচ্চিৎ আনন্দ-ঘন,
দেখে ঐরূপ ধন্য হোক কাঙ্গাল।

শ্রীজলধর সেন।

গীতা-ব্যাখ্যায় প্রলাপ।

প্রলাপও যে ছাপার অক্ষরে বাহির হইতে পারে, তাহার নজীর আছে— কবি রজনীকান্তের "বাণী"। রজনীকান্ত তাঁহার সুমধুর "বাণী"কে "আলাপে," "বিলাপে" ও "প্রলাপে" এই তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। পাঠকপাঠিকারা লেখকের এই প্রলাপকে যদি আলাপ বলিয়া ধরিয়া ল'ন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে পরে বিলাপ করিতে হইবে যে, তাঁহারা লেখককে অযথাই বড় বাড়াইয়া

গীতিকার বলিতেছেন যে, দেহ ও মন হইতে পৃথক যে পদার্থ তাহাই আত্মা। বেশ কথা, মানুষ যখন মরিয়া যায় তখন দেহ পড়িয়া থাকে, মনের কার্য্যও বন্ধ হইয়া যায়; তাহা হইলে বাকি থাকে কি? সকলেই জানেন, যে মানুষ মরিয়া ভূত হয়। তবেই গীতার মতে ভূতই আত্মা।

এখন দেখা যাউক আত্মা শব্দের ব্যুৎপত্তি করিলে কি অর্থ হয়। যাহা দেখিয়া লোকে "আঁৎ"কাইয়া উঠিয়া "মা" "মা" করিতে থাকে, তাহাই আত্মা। যাঁহারা স্বচক্ষে ভূত দেখিয়াছেন তাঁহারা সাক্ষ্য দিবেন যে তাঁহারা ভূত দেখিয়া ভয়ে আঁৎকাইয়া উঠিয়া কতবার "মারে", "বাপরে" "খেলেরে" করিয়া চীৎকার করিয়াছিলেন। অতএব ব্যুৎপত্তি অর্থও সপ্রমাণ করিতেছে যে ভূতই আত্মা।

আত্মার ভূতত্ব সম্বন্ধে গীতাকার অনেক শ্লোক রচনা করিয়া গিয়াছেন। আমরা পাঠক পাঠিকার উপর কৃপাপরবশ হইয়া মাত্র দুই একটি শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহাদিগকে নিষ্কৃতি দিব। গীতাকার বলিতেছেন

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥

ইহার অর্থ হইতেছে যে, যেমন মানুষ পুরাতন বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করে, সেইরূপ আত্মা পুরাতন দেহ পরিত্যাগ করিয়া নূতন দেহ ধারণ করে। গীতাকার নিশ্চয়ই স্বচক্ষে ভূত দেখিয়া এই শ্লোকটি লিখিয়াছিলেন, কারণ ভূতের বিবিধ দেহধারণ স্বচক্ষে না দেখিলে এরূপ graphic বর্ণনা সম্ভবে না। এই দেখিলেন গ্রামের প্রান্তরে জলাশয়ের পাড়ে বৃহৎ অশ্বত্থ বৃক্ষের নিম্নে একটা প্রকাণ্ড ভূত—তালগাছের মত লম্বা, কুলোর মত পায়ের চেটোগুলা, ব্যাটবলের বলের মত তাহার চোকদুটা, শোনের দড়ির মত চুলগুলা, জালার মত পেটটা, বাঁশের মত নাকটা—দাঁড়াইয়া আছে। ইচ্ছা যে সেই স্থান দিয়া যে যাইবে তাহারই ঘাড়টি মট্‌কাইয়া রক্ত খাইবে। খানিক পরে দেখিলেন জ্যোৎস্না উঠিয়াছে, ইন্দু জলাশয়ের জলে তারকসুন্দরীগণের সহিত জলক্রীড়া করিতেছেন. ভূত মহাশয়ও অন্তর্ধান হইয়া পরমাসুন্দরী, মেমেদের মত ধবধবে শ্বেতকায়া, পেত্নীরূপ ধারণ করিয়াছেন। পরিধানে একখানি বাসি-করা সাদা কাপড়, হাতে একটা সিঁদুর চুবড়ি—পেত্নীসুন্দরী জলাশয়ের জলে আপনার মুখ দেখিতেছেন। খানিক পরে আর কিছুই নাই, সুন্দরী হঠাৎ

হাওয়ায় মিলাইয়া গিয়াছে। এমন সময় দূর হইতে একটা খট্‌ খট্‌ শব্দ শুনা গেল, যেন একটা গরু কিম্বা ঘোড়া দেখিতে বেশ নাদুস নুদুস, দুধের মত ধবধবে সাদা তার গা, শিংজোড়াও সাদা, খুর পর্য্যন্ত সাদা—হৃষ্টমনে শ্যামল তৃণদল ভক্ষণ করিতেছে। মনে করিবেন না যে এই গাভীটি সহজ গাভী, কাহারও খোঁয়াড় হইতে দড়ি ছিঁড়িয়া এত রাত্রে পলাইয়া আসিয়াছে। উনি হচ্চেন গোভূত। ভূত মহাশয় জীর্ণ মানবদেহ পরিত্যাগ করিয়া এখন গোদেহে প্রবেশ করিয়াছেন। কৈ, আর ত গাভী দেখা যায় না! এখন একবার দূরে ঐ বিস্তীর্ণ ধান্যক্ষেত্রের ওপার দিকে চেয়ে দেখুন দেখি। কি দেখিতেছেন? একটা আগুন জ্বলছে? একবার দপ্‌ করিয়া জ্বলছে, আর একবার নিবিয়া যাইতেছে,—দেখিতে পাইতেছেন কি না? ওটা হচ্চে ভূতের আলেয়া-রূপ। এসব ছাড়া ভূতের আরও নানা রূপ আছে—ব্রহ্মদত্যি, হিষ্টিরিয়া ভূত ইত্যাদি। ভূতের এই সকল রূপান্তর প্রত্যক্ষ করিয়াই গীতাকার সত্যই লিখিয়াছিলেন "বাসাংসি জীর্ণানি ইত্যাদি।"

তারপর গীতাকার আত্মা সম্বন্ধে আরও বলিতেছেন

"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রানি নৈনং দহতি পাবকং।"

ঠিক কথা—ভূত যে দেহের অতীত, উহাতে ত আর কার্ব্বন, হাইড্রোজেন, গন্ধক, ফস্ফরাস নাই যে, অগ্নিতে উহাকে দহন করিতে পারিবে? আবার ভূত জিনিষটা যখন কেবলই হাওয়া, তখন অস্ত্রে উহাকে কাটিবেন কি করিয়া? তাই সে দিবস খবরের কাগজে পড়িতেছিলাম যে কোন জমিদারবাড়ীর দরোয়ান বন্দুক ও তরবারি হস্তেই ভূতের ভয়ে সদর দরজায় মূর্চ্ছা গিয়াছিল।

আজকাল একটা বাতিক উঠিয়াছে যে সাহেবেরা কোনও কথা সমর্থন না করিলে সেটা গ্রাহ্যই হইবে না। চিরটা কাল বাঙ্গালী পরম সুখাদ্য ও সুপেয় ঘোলের পক্ষপাতী; পল্লীগ্রামের দরিদ্র অধিবাসীরা মেলেরিয়ায় ভুগিয়া ভুগিয়া এক ঘোলের জোরে অনেকে একশত বৎসরেরও উপর বাঁচিতেছেন। কিন্তু সাহেবরা যাই বলিলেন যে ঘোলে পরমায়ু বৃদ্ধি হয়, অমনি আমরা কোন্ ছার—ছোটলাট, মেজ লাট (Governor) বড়লাট পর্য্যন্ত খুবই ঘোল খাইতে লাগিলেন। সেই জন্য আত্মার ভূতত্ব এক গীতা হইতে সপ্রমাণিত করিলে চলিবে না, সাহেবেরা এ সম্বন্ধে কি বলেন তাহাও শুনা চাই।

ভূতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সাহেব বৈজ্ঞানিকগণের মতামত দেখুন। বৈজ্ঞানিকের প্রমাণের উপর ত আর কথা নাই। আমার মনে হয় বিজ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী

যেন কোন মায়াবিনী স্বর্গের অপ্সরী। অপূর্ব্ব মায়াজাল বিস্তার করিয়া আধস্বচ্ছ অশরীরী করে স্বর্গের স্বর্ণদ্বার উদ্ঘাটন করিয়া তিনি মানবকে স্বর্গের অনন্ত সৌন্দর্য্য, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র—অনন্ত জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর গতি, আবর্ত্তন, বিবর্ত্তন দেখাইয়া দিতেছেন। আবার তখনই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া জড়জগতের প্রত্যেক অণু পরমাণুর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া উহাদের সৃষ্টিস্থিতি-লয়ের অপূর্ব্ব কাহিনী মানবের গোচর করিতেছেন। মানব যখন রোগের যন্ত্রণায় ভীষণ আর্ত্তনাদ করিতে থাকে, তখন তিনি স্নেহময়ী হিন্দুরমণীর রূপ ধারণ করিয়া তাহার গাত্রে পদ্মহস্ত বুলাইয়া তাহাকে রোগমুক্ত করিতেছেন। আবার ক্ষণপরে সিংহবাহিনী মহিষমর্দ্দিনী চামুণ্ডারূপ ধারণ করিয়া ভীষণ রণ-ক্ষেত্রে আগ্নেয় অস্ত্রের দ্বারা রিপুরিনাশে মাতিয়া গিয়াছেন। তিনিই আবার দূতিকার বেশে দূরপ্রবাসী প্রিয়তমের শুভসংবাদ বিরহবিধুরা প্রণয়িনীজনের নিকট নিমেষের মধ্যে আনিয়া দিতেছেন, পরিচারিকাবেশে নিদারুণ গ্রীষ্মের সময় চঞ্চল অঞ্চলপ্রান্ত দিয়া ক্লান্ত মানবকে বীজন করিতেছেন, এবং কুলবধূর বেশে দীপাধারে আলোক জ্বালিয়া সন্ধ্যার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। দেবী! তোমার কচিৎ রুদ্র কচিৎ কমনীয় রূপের আমি একান্ত ভক্ত। আশীর্ব্বাদ কর যেন অন্তিমকাল পর্য্যন্ত তোমার এই চলচঞ্চল মাধুরীময় অনন্ত সৌন্দর্য্য অনুক্ষণ ধ্যান করিতে পারি।

বলিতেছিলাম যে আধুনিক বিজ্ঞান সপ্রমাণ করিতেছে যে ভূত আছে। ভূতের ইংরাজি পারিভাষিক শব্দ স্পিরিট (spirit)। এই স্পিরিট, বাঙ্গালীর স্পিরিট ও বোতলের স্পিরিটের ন্যায় সদাই উড়িয়া যায়। তবুও বৈজ্ঞানিকের শিবনেত্রের দিব্যদৃষ্টিতে উহা ধরা পড়িয়াছে। আমাদের দেশে লোকের বিশ্বাস যে মানুষ অপঘাতে মারা পড়িলে মরিয়া ভূত হয়; কিন্তু সাহেব বৈজ্ঞানিকেরা বলিতেছেন যে মানুষ মরিলেই ভূত হয়। যিনি সজ্ঞানে গঙ্গালাভ বা (যীশুলাভ) করিয়াছেন তিনিও মরিয়া ভূতযোনী প্রাপ্ত হন। খবরের কাগজে পড়িতে-ছিলাম যে পুণ্যশ্লোক গ্ল্যাডষ্টোন, ডিস্‌রেলি প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় ইংরাজ রাজ-নীতিজ্ঞ মহাপুরুষের স্বর্গীয় আত্মা লণ্ডনে আসিয়া ভূতের মত নাকিস্বরে আয়র্লণ্ডদেশের স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ষ্টেড সাহেবের—অতল সিন্ধুগর্ভে তাঁহার সমাধি সুখকর হউক—জুলিয়ার বোরোর (Julia's baurau) ভিতর সময় সময় নাকি বিস্তর মৃতব্যক্তির স্পিরিট কিলবিল করিয়া আসিয়া জুটিয়া থাকে এবং নাকিস্বরে তাহাদের পরিত্যক্ত মাতা, পিতা,

পত্নী প্রভৃতির সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকেন। আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, যখন সাহেবেরা বলিল যে ভূত আছে, তখনই তাহা বেদবাক্য বলিয়া মানিয়া লইলাম; কিন্তু সাহেবদের বহুপূর্ব্বে আমাদের ঠাকুরমারা যে সাহেবদের অপেক্ষা ভাল করিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া খাসা খাসা ভূতের গল্প বলিতেন তাহা কি ভুলিয়া গেলেন? তাঁহারা সকলেই স্বচক্ষে ভূত দেখিতে পাইতেন, ভূতেদের ভাষা যে বাঙ্গালা ভাষা তাহাও রিপোর্ট করিয়া গিয়াছেন, যথা "আউ মাউ কাঁউ, মানুষের গন্ধ পাঁউ" ইত্যাদি; এমন কি কিরূপ অনুনাসিক সুরে তাহারা তাঁহাদের সহিত আলাপ করিত, তাহাও অবজার্ভ করিয়া গিয়াছেন। আশা করি ভূত আবিষ্কারের ইতিহাস যখন লিখিত হইবে, তখন সাহেব বৈজ্ঞানিকগণের পূর্ব্বে আমাদের ঠাকুরমাদের দাবী অবিসংবাদীরূপে স্বীকৃত হইবে এবং সাহেবদের ও ঠাকুরমাদের গল্পমধ্যে কোনটাতে বেশী গুলিখুরি আছে, তাহা একটি তুলনামূলক তালিকাতে (Comparative table) পাশিপাশি লিপিবদ্ধ হইবে।

আশা করি এই গীতোক্ত আত্মাতত্ব পাঠ করিয়া পাঠক পাঠিকারা ভূতে বিশ্বাস করিবেন, পল্লিগ্রামের লোকেরা সন্ধ্যার পর আর "পলায়িত গাভী"র অন্বেষণে বাটীর বাহির হইবেন না, এবং শীতকালে গ্রামে ডাকাত পড়িলে ঘরের খিল আরও আচ্ছা করিয়া আঁটিয়া দিয়া লেপখানা খুব ভাল করিয়া মুড়ি দিবেন।

যোগ।

গীতায় নানারকম যোগের উপদেশ আছে, যথা জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ, ইত্যাদি। পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিরা না বুঝাইয়া এই সকল ব্যাপারের নানাপ্রকার উৎকট ব্যাখ্যা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা জানেন না যে এই সকল যোগ যোগশ্রেষ্ঠ জলযোগেরই প্রকারভেদ মাত্র। কৃষ্ণঠাকুর গীতায় জলযোগের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া পেটুক নামধারী এক অতি বিশাল শ্রেণীর মানবের পক্ষে গীতার রসাস্বাদনের ভারি সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। তা হবে নাই বা কেন?—যদি জলযোগের মহিমা কেহ সম্যক্ অবগত থাকেন তবে তিনি শ্রীকৃষ্ণ। বাল্যে গোকুলে তাঁহার জলযোগের দৌরাত্ম্যে গোপিনীগণের ননী মাখম আর হাঁড়িতে ঢাকা না দিয়া রাখিবার যো আদৌ ছিল না। এমন কি মা যশোদাকে প্রতিবেশিনীগণের অবিরত নালিশের দরুণ গোপালের জলযোগ-কণ্ডুয়নগ্রস্থ হাতদুখানি উদুখলে বাঁধিয়া রাখিতে হইয়াছিল।

আহা, জলযোগের চেয়ে কি যোগ আছে? নাম শুনিলেই চিত্ত আপনি গদগদ হইয়া আসে, জিহ্বার অগ্রে প্রচুর জলের সংযোগ হওয়াতে মৃত্তিকাতে বৃষ্টিপতনের সম্ভাবনা ঘটে। কবির ভাষায় বলিতে গেলে হয় জলযোগ "......Is blessed twice, It blesseth him that gives and him that takes" অর্থাৎ যিনি জলযোগ করান তিনিও ধন্য, আর যিনি করেন তিনি ত ধন্য বটেই।" ইঁহাদের মধ্যে ধন্যতর কে?—অবশ্য যিনি দয়া করিয়া জলযোগ পালন করেন তিনি, কারণ "Fools give feasts and wise men eat them." সেজন্য পরম বিজ্ঞ শাস্ত্রকার প্রাচীন ব্রাহ্মণগণ প্রত্যেক ক্রিয়াকাণ্ডের পর ব্রাহ্মণ-ভোজনের, অন্ততঃ পঞ্চব্রাহ্মণের জলযোগের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

রাজযোগ, ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ প্রভৃতি যোগ যে যোগশ্রেষ্ঠ জলযোগেরই প্রকারভেদ মাত্র তাহা উহাদের ব্যুৎপত্তি হইতেই উপলব্ধি হইবে। রাজযোগ, রাজাচিত জলযোগ=রাজেযোগ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মক্ষয়। আবার "ডলয়োরভেদত্বাৎ" এইরূপ একটা বৈয়াকরণিক নিয়ম অনুসারে রাজযোগ বিকল্পে রাজভোগ হইয়া থাকে। স্বামী বিবেকানন্দ রাজভোগের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া তাঁহার গ্রন্থাদিতে রাজযোগের খুব ভাল করিয়া ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন এবং সেইসঙ্গে হিন্দুধর্ম্মকে চ্ছ্যুৎমার্গ হইতে একেবারে নিষ্কৃতি দিয়া গিয়াছেন। সেইরূপ ভক্তিপূর্ব্বক জলযোগ=ভক্তিযোগ, কর্ম্ম করিতে করিতে জলযোগ কর্ম্মযোগ, জ্ঞানালোচনা করিতে করিতে জলযোগ=জ্ঞানযোগ পদ মধ্যপদলোপী কর্ম্মধারয় সমাসরূপে সিদ্ধ হইয়াছে। এই নানাপ্রকার জলযোগ যেরূপভাবেই সিদ্ধ হউক না কেন, খাইতে ভারি সুতার। একে একে উহাদের উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে।

রাজযোগ। রাজযোগ বা রাজভোগ এক শ্বশুরালয় ভিন্ন অন্য কোথাও বড় মিলিবার আশা নাই। আবার শ্বশুরবাড়ী যদি নূতন হয়, তাহা হইলে সোণায় সোহাগা। তোফা ভীমনাগের দোকানের সন্দেশ, বাগবাজারের রসগোল্লা, জনাইয়ের মনোহরা, বর্দ্ধমানের সীতাভোগ, রাজসাহীর রাঘবসাহী, মুড়াগাছার ছানার জিলাপি, তার উপর অকালের আম, আনারস, আপেল, নেস্পাতি প্রভৃতি নানাবিধ ফল, দশটা বাটিতে দুগ্ধ, দধি, ক্ষীর, পায়স, প্রভৃতি, গেলাসে গোলাপি অম্লমধুর সরবত (লেখকের ভাগ্য বড়ই মন্দ বলিয়া কোনওসময়ে এই সরবতের পরিবর্ত্তে খড়ভিজান জল মিলিয়াছিল), তাম্বুলাধারে

সুসজ্জিত তাম্বুল—থরে থরে সাজান। থালার চারিদিকে বাটীগুলির শোভাই বা কি? যেন পূর্ণচন্দ্রের চারিপাশে সাতাইশ নক্ষত্রসুন্দরী। তার উপর সুমিষ্ট সম্পর্কীয়া কয়েকটি কুটুম্বিনীর মধুর সম্ভাষণ (কখনও কখনও কর্ণের সহিত সুকোমল করের মৃদু সংস্পর্শে) শ্বশুরবাড়ীর জলযোগকে বাস্তবিকই রাজভোগ করিয়া তোলে।

আচ্ছা এইখানে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—শ্বশুরালয়ে জামাতাকে খাওয়াইবার এত ঘটা কেন! কই বাটীতে পিতামাতা ত এত খাওয়ান না। তবে কি শ্বশুর শাশুড়ী পিতামাতার চেয়ে বেশী যত্ন করিয়া থাকেন? আমার মনে হয় শ্বশুরবাটীর এই খাওয়ানর ঘটাটাতে জামাতাকে প্রত্যহ মনে করাইয়া দেওয়া হয় যে, সে পর ভিন্ন আর কিছুই নয়। তাই কথাতেও বলে

জম জামাই ভাগ্‌না,
এ তিন নয় আপনা।

চাণক্য নিশ্চয়ই ঘরজামাতা ছিলেন, তাহা না হইলে তিনি

অন্নদাতা ভয়ত্রাতা কন্যাদাতা তথৈব চ।
জানিতাচোপনেতাচ পঞ্চৈতে পিতরঃস্মৃতাঃ॥

এই শ্লোকে পঞ্চপিতার মধ্যে কন্যাদাতাকে "জানিতার" অগ্রে স্থান দিতেন না। জামাতার সহিত শ্বশুর শাশুড়ীর সম্পর্ক তাঁহাদের কন্যা লইয়া। এই বিস্তৃত খাওয়ানর আয়োজন, আমার মনে হয়, ঠিক যেন through দিয়া দরখাস্ত করা। যেমন উর্দ্ধতন সরকারী কর্ম্মচারীকে দরখাস্ত করিতে হইলে নিম্নতর কর্ম্মচারীর through দিয়া দরখাস্ত করিতে হয়, সেইরূপ (জামাতার পক্ষে উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী) কন্যার যাহাতে অযত্ন না হয়, সেই জন্যই শ্বশুর শাশুড়ী জামতার মন ভুলাইবার জন্য নানাপ্রকার খাওয়ানর আয়োজন করিয়া থাকেন। সে যাহা হউক বাড়ীর চিরপরিচিত "থোড় বড়ি খাঁড়া, আর খাঁড়া বড়ি থোড়" যখন আর মুখে ভাল না লাগে, তখন শুধু লেখক কেন, অনেকেই এক একবার শ্বশুরবাড়ীতে মুখটা ভাল করিয়া বদলাইতে গিয়া থাকেন।

ভক্তিযোগ। ভক্তির সহিত জলযোগের প্রকৃষ্ট উদাহরণ—ব্রত বা ক্রিয়া-কলাপের পর স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণভোজন। দেখিতে পাই বাটীর পাচক ব্রাহ্মণের এইরূপ ভক্তিযোগ প্রায়ই লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু আমাদের

মাষ্টারি বরাত এতই মন্দ যে, এতগুলা পাশ করিয়া বড় বড় কলেজে অধ্যাপকের কার্য্য করিলেও কোনও পুরমহিলা আমাদিগকে ডাকাইয়া জল-যোগ করাইয়া পুণ্য অর্জ্জনের বাসনা আদৌ করেন না। জাতিভেদ প্রথার ইহা অপেক্ষা কুফল আর কি হইতে পারে?

এই ভক্তিপূর্ব্বক জলযোগ করানর আর একটি মনোরম দৃষ্টান্ত হিন্দুর ঘরে ঘরে দেখিয়া নয়ন সার্থক করিয়াছি। সাবিত্রী-ব্রত উপলক্ষে যখন হিন্দু পুরমহিলা দেবতাজ্ঞানে স্বামীর পাদবন্দনা সমাপন করিয়া তাঁহাকে আন্তরিক ভক্তি ও ভালবাসার সহিত জলযোগ করান—সে দৃশ্য দেখিয়া আমি আনন্দাশ্রু সংবরণ করিতে পারি নাই। পাশ্চাত্য জগতে দেখিতে পাই যে সেখানে স্ত্রী স্বামীর সমকক্ষ হইবার চেষ্টা করিতেছেন, নারী তাঁহার স্বাভাবিক কোমলতা ও শালীনতা বিসর্জ্জন দিয়া জেলে গিয়া পুরুষের সকল ক্ষমতা অধিকার করিবার জন্য সচেষ্ট। আর ভারতের অন্তঃপুর-চারিণীরা স্বামীর সেবা করিতে পারিলেই পরম সুখী, স্বামীর পদে মস্তক রাখিয়া সিন্দুররাগমণ্ডিত কপালে ইহসংসার পরিত্যাগ করিবার বাসনাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ বাসনা। এই দুই আদর্শের মধ্যে কোন্‌টি উৎকৃষ্টতর তাহা বিচার করিতে বসি নাই। তবে এটা মনে হয় যে সীতা সাবিত্রী দময়ন্তীর পুণ্য স্মৃতিবিজড়িত ভারতে পাশ্চাত্য-জগতের এই নারী-আদর্শ আদৌ আসিতে পারিবে না। যেখানে আত্মত্যাগই মহাপুণ্য, সেখানে স্বার্থের কাম-নার স্থান কোথায়? সেখানে ভালবাসাই একমাত্র সুখ, সেখানে অধিকার লাভের বাসনা কেমন করিয়া স্থান পাইবে?

কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগ। কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগ একই বস্তু, প্রকারভেদ-মাত্র। জ্ঞান হইতেই কর্ম্মের অভ্যুদয়। আজকাল জ্ঞান ও কর্ম্ম করিবার সময় তিন প্রকার জলযোগের প্রয়োজন হইয়া থাকে। প্রথম—ইলেক্‌ট্রিক বা টানাপাখার হাওয়া সেবন, দ্বিতীয়—চা-পান, এবং তৃতীয়—তামাকু বা সিগারেট-সেবন। গরমের দিনে বড় লাট হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষুদ্র কেরাণী পর্য্যন্ত বৈদ্যুতিক পাখার হাওয়া সেবন করিতে না পাইলে কেহই কাজ করিতে পারেন না। স্কুল কলেজের ছেলেরা বৎসরে এক টাকা করিয়া "পাখা ফি" দিয়া টানাপাখার হাওয়া খাইতে খাইতে জ্ঞানার্জ্জন করিয়া থাকে। চা না হইলে আজকাল কিবা অন্তঃপুরচারিণী মহিলা, কিবা রাস্তার মুটে মজুর কাহারও কোনও কর্ম্মে আসক্তি ঘটে না। [illegible]

অম্বুজ সিগারেট না হইলে জ্ঞান বা কর্ম্ম হইবার জো আছে কি? কবি তাই তামুককে সম্বোধন করিয়া ঠিক বলিয়াছেন—

"রাজ দরবারে, কাছারী মজলিসে,
সভাসমিতিতে, বৈঠকে সালিসে,
গল্পে, এয়ারকিতে, মঠে ও মসজিদে,
তোমার সত্ত্বা ভিন্ন সকল বাতিল হয়।"

আমার ধারণা ছিল শিক্ষিত যুবকগণের মধ্য হইতে তামাকুসেবন প্রথা একপ্রকার উঠিয়া গিয়াছে। কিন্তু কলেজের হষ্টেলের পরিদর্শক মহাশয়গণের নিকট শুনিতে পাই যে ভৃত্যবর্গ টিকা ও তামাকু হস্তে সর্ব্বদাই হষ্টেলে প্রবেশ করিতে থাকে। এত তামাকু কয়েকজন ভৃত্য মিলিয়া সেবন করিত, নিশ্চয়ই তাহারা উদরাধ্মানে শীঘ্র শীঘ্র মারা পড়িত। ইহা হইতে স্বতঃই প্রমাণিত হইতেছে যে যুবকদের মধ্যে কেহ কেহ তামাকুর কালরূপের একান্ত ভক্ত। তাহারা অল্পবয়স হইতে এমনই বদভ্যাস করিয়া ফেলিয়াছে যে কবি তাহাদের পক্ষ হইতে সাফাই গাহিয়াছেন—

"বুদ্ধির গোড়ায় তোমার ধোঁয়া না পঁহুছিলে
বেরোয় নাক' মুসোবিদা, কি মুস্কিল এ!
Idiom না জাগে, ফাঁকা ফাঁকা লাগে,
হেঁয়ালী Problem এর উদ্ধার শক্ত হয়।"

হে যোগশ্রেষ্ঠ জলযোগ! তোমার মহিমা আর কত বর্ণনা করিব। কিবা দরিদ্রের পর্ণকুটিরে, কিবা রাজার প্রাসাদে, তোমার গতি অপ্রতিহত। তোমার থালা অক্ষয় হউক, গেলাস অক্ষয় হউক, বাটি অক্ষয় হউক। জানাইয়া রাখি যে এ অকৃতি লেখক তোমার পরম ভক্ত; তুমি লেখকের বন্ধুবান্ধবদিগকে সুমতি দাও যেন তাঁহারা যাহাতে তোমার সহিত লেখকের দৈনিক সাক্ষাৎকার লাভ ঘটে তাহার সুব্যবস্থা করেন। আর পাঠকপাঠিকাদিগকে যে লেখক "শুষ্কং কাষ্ঠং" সম গীতার নীরস যোগাযোগের মধ্যে সরস জলযোগের সন্ধান বলিয়া দিলেন, তাঁহার পারিশ্রমিকরূপে তাঁহারা লেখকের জন্য জলযোগের ব্যবস্থা করিবেন, না, গালিযোগের ব্যবস্থা করিবেন?

নিষ্কাম কর্ম্ম।

গীতাকার নিষ্কাম কর্ম্মের বিস্তর উপদেশ দিয়াছেন।

কবি তাহাদিগকে ঘৃণিত খল আখ্যা দিয়াছেন। আমি দেখিতেছি যে বাস্তবিক ইহাদের মানহানি করা হইয়াছে এবং ইহাদের দরখাস্ত লিখিবার শক্তি থাকিলে নিশ্চয়ই কবিকে শ্রীঘরে যাইতে হইত। যদি প্রকৃত নিষ্কামকর্ম্মী এজগতে থাকে তবে তাহারা উই আর ইঁদুর। আমার একখানা ইংরাজি ভাষায় লিখিত রসায়ন শাস্ত্রের পুস্তক অযত্নে ঘরের এককোণে পড়িয়াছিল। অনেক দিবস বাদে সেখানা কুড়াইয়া পাওয়া গেল কিন্তু দেখা গেল যে উইয়েতে উহার প্রতি পৃষ্ঠা খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিয়াছে। এখানে এই পুস্তকখানা কাটিবার কামনা কি উই মহাশয়ের মনে সমুদিত হইতে পারে। আমার অনিষ্ট করিবার তাহার কোনও অভিপ্রায় থাকিতে পারে না, কারণ আমি তাহাকে নির্ব্বিবাদে আমার ঘরের কোণে বাসা করিতে স্থান দান করিয়াছি। আমাদের দেশে যখন প্রাথমিক শিক্ষা মানব সমাজেই বাধ্যকরী হয় নাই, তখন উই মহাশয়ের মত নিম্নশ্রেণীর জন্তু যে কামনা ও লেখাপড়া শিখিয়াছেন তাহা ত বোধ হয় না। তাহার উপর যখন মনে করি যে পুস্তকখানা ইংরাজীভাষায় লিখিত ও নীরস রসায়নশাস্ত্রের পুস্তক, তখন কেমন করিয়া স্বীকার করি যে, রসায়ন শাস্ত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অধ্যয়ন করিবার জন্যই উই মহাশয় পুস্তকখানার প্রতি পত্রে প্রবেশলাভ করিয়াছিলেন? নিষ্কামধর্ম্মের এমন মহা উদার দৃষ্টান্ত আর কোথায় মিলিবে।

ইঁদুর মহাশয়ও যে একজন পরম নিষ্কামকর্ম্মী, তাহার প্রমাণ এখনই দিতেছি। আমার পিতার আমলের একজোড়া শাল ছিল। পিতৃস্মৃতির পরিচায়ক বলিয়া শালজোড়াটা আদৌ ব্যবহৃত হয় না, বাক্সেই বন্ধ থাকে। ভাদ্রমাসে রৌদ্রে দিবার জন্য শালজোড়াটা যখন বাহির করা হইল, তখন দেখা গেল যে ইঁদুরে শালজোড়াটা সুদক্ষ খলিফার মত পর্দ্দায় পর্দ্দায় কাটিয়া ফেলিয়াছে। ইঁদুর মহাশয় যদি শীতকালে শালযোড়াটা গায়ে দিবার জন্য আমার নিকট চাহিয়া লইতেন তাহা হইলে আমি অনায়াসে ঐ শালখানা তাঁহাকে দিতে পারিতাম, কারণ প্রথম শীতের তত্ত্বের দরুণ শ্বশুর মহাশয় প্রদত্ত আর একজোড়া শাল আমার ছিল। তাহা না করিয়া দারুণ শীতে কষ্টভোগ করতঃ এই সালজোড়াটা কাটিবার কোন কামনা ইঁদুর মহাশয়ের ছিল? তা নয়—ইনিও উইমহাশয়ের মত নিষ্কামকর্ম্মী।

গীতাকার বলিয়া গিয়াছেন "মা ফলেষু কদাচন।" বেশ কথা—কিন্তু কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিবেন ফলের কামনা না করিলে কর্ম্ম করিব কেন? কুমড়ার বিচি

পুঁতিব, কুমড়ার কামনা করিব না? আমের চারা পুঁতিব, টক আমের কামনা নাই করিলাম, সুমিষ্ট আম্রফলের কামনা করিব না? পুত্র ভূমিষ্ট হইলে কামনা করিব না যে সে বানর না হইয়া হাইকোর্টের জজ হয়? গরু পুষিয়াছি, কামনা করিব না যে সে অল্প খাইবে অথচ কেঁড়ে ভরিয়া দুধ দিবে? ছেলেরা কি নিষ্কামভাবে পরীক্ষা দিবে, না পাশ হইবার কামনা করিবে? তাহার উত্তরে গীতাকার বলিতেছেন যে কেবল ফলের আকাঙ্ক্ষা থাকিলে বাঞ্ছিত ফলের অপ্রাপ্তিতে "দুঃখ" আসিয়া জুটিবে। যদি পুত্রটি হাইকোর্টের জজ না হইয়া বাস্তবিকই বানর হয়, গরুটি দুধ দিবার আগেই মারা পড়ে, ছেলেরা পাশ না ফেলই হয়, তাহা হইলে ত দুঃখ রাখিবার স্থান থাকিবে না। তাই গীতাকার বলিতেছেন যে "সুখেদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ" কর্ম্মের ফলাফল সমস্ত ভগবানে অর্পণ করিয়া কর্ম্ম করিয়া যাও। তাহা হইলে সুখদুঃখের অতীত হইতে পারিবে আর যখন নিরাশার তমসাচ্ছন্ন নিবিড় অরণ্যের মধ্যে পথভ্রান্ত হইয়া ইতস্ততঃ কোথাও বাহিরের পথ খুঁজিয়া পাইবে না, তখন গীতাকারের কণ্ঠের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া তারস্বরে গাহিবে,—

ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন।
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥

তবেই দেখা গেল যে গীতাকার ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত কর্ম্মকেই "নিষ্কাম-কর্ম্ম" আখ্যা দিয়াছেন; তিনি কামনা বিসর্জ্জন দিতে বলেন নাই। কামনা করিব না?—অবশ্য নীচ ক্ষুদ্র, অযোগ্য কামনা কখনও করিব না। কামনা করিব না?—সুমহান, অভ্রভেদী, গগনস্পর্শী, পর্ব্বতপ্রমাণ কামনা করিব। কামনা করিব—দেশ ধনধান্যে পরিপূর্ণ হইয়া সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা হইয়া উঠিবে। কামনা করিব—মহাশক্তিরূপিনী অথচ স্নেহময়ী শ্রীটনেশ্বরীর অভয় অঙ্কে বসিয়া হিন্দু মুসলমান, জৈন, খৃষ্টান, একত্র মিলিয়া ভাই ভাইরূপে সোণার সংসার পাতিবে। কামনা করিব—ব্রাহ্মণ চণ্ডালকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করিবে। কামনা করিব সমস্ত অমঙ্গল মারিভয় প্লেগ, মেলেরিয়া, দুর্ভিক্ষ, জলকষ্ট দেশ হইতে চিরদিনের তরে চলিয়া যাইবে। কামনা করিব—ধনীর প্রাসাদ হইতে দরিদ্রের পর্ণকুটীর পর্য্যন্ত জ্ঞানের পবিত্র আলোকে আলোকিত হইয়া উঠিবে। আর কামনা করিব—দানে, জ্ঞানে, বিজ্ঞানে,—শৌর্য্যে, বীর্য্যে, ঐশ্বর্য্যে—সাহিত্যে, লালিত্যে, মহত্ত্বে—রাজসেবায়, ধর্ম্মসেবায়, সমাজসেবায়—ভারতভূমি পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সমকক্ষ হইয়া উঠিবে।

শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী।

রত্ন-দ্বীপ

(উপন্যাস)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রাখাল বাড়ী যাইতেছে।

রাখাল ভট্টাচার্য্য খুরুপুর ষ্টেশনের ছোট বাবু—বাড়ী বর্দ্ধমান জেলার ময়নাবতী গ্রামে। বয়স অনুমান ত্রিংশৎবর্ষ, শ্যামবর্ণ সুশ্রী স্বাস্থ্যবান যুবাপুরুষ। প্রবেশিকা পরীক্ষায় ফেল করিয়া রেলে ঢুকিয়াছিল, পাঁচ ছয় বৎসর চাকরি করিতেছে। বেতন মাত্র পঁচিশটি টাকা। তবে মাঝে মাঝে টাকাটা সিকিটা 'উপরি' যে না পাওয়া যায় এমন নহে।

রাখাল যখন ছোট ছিল, সেই সময়েই তাহার পিতৃবিয়োগ হয়। তখন তাহারা দুই ভাই। পিতার মৃত্যুর বৎসর দুই পরেই ছোট ভাইটি মারা গেল। বিধবা মাতা কষ্টেসৃষ্টে রাখালকে মানুষ করিতে লাগিলেন। গ্রাম হইতে একক্রোশ দূরে একটি মাইনর ইস্কুল আছে, সেইখানে রাখালকে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। মাইনর পাস করিয়া, চারি টাকা মাসিক বৃত্তি পাইয়া, বর্দ্ধমানে মামার বাসায় থাকিয়া রাখাল প্রবেশিকা পর্য্যন্ত পড়িয়াছিল। মামা বর্দ্ধমানের মোক্তার।

যথাসময়ে রাখালের বিবাহ হইল। তাহার শ্বশুরবাড়ী গ্রাম হইতে অধিক-দূরে নহে—তিন ক্রোশ মাত্র ব্যবধান। বধূর মুখ দেখিয়া, বৎসর দুই বিধবা বাঁচিয়া ছিলেন—পৌত্রমুখ দেখা তাঁহার ভাগ্যে আর ঘটে নাই। মাতার মৃত্যুর পর রাখাল চাকরি অন্বেষণে বাহির হয়।

খুরুপুর ষ্টেশনে রাখাল বৎসর খানেক আছে। থাকিবার জন্য সরকারী বাসা পাইয়াছে, সেটি এত ক্ষুদ্র যে বাসা বলিলেও হয়, খাঁচা বলিলেও চলে। ষ্টেশনের পানিপাঁড়ে তাহাকে দুইবেলা দুইটি রাঁধিয়া দেয়—এজন্য তাহাকে বেতন বল, বখশিস্ বল, মাসে দুইটি টাকা দিতে হয়। পাঁড়েজি "রহরকা দাল" এবং "আলুকা ভুজি" ছাড়া আর বড় কিছু রাঁধিতে জানেন না। তাহাও, দাল কোনও দিন কাঁচা থাকে, কোনও দিন ধরিয়া যায়; তরকারীতে কোনও দিন লবণ থাকে, কোনও দিন থাকে না। রাখালের বড় কষ্ট।

রাখালের স্ত্রী লীলাবতীর বয়স এখন ঊনবিংশতি বর্ষ। লোকে তাহাকে বলে, এত কষ্ট পাইতেছ, স্ত্রীকে লইয়া আস না কেন? রাখাল বলে, এইবার

আনিব। আসল কথা, তাহার স্ত্রী বিদেশে আসিয়া থাকিতে চাহে না। দুই বৎসর পূর্ব্বে রাখাল যখন জামুই ষ্টেশনে ছিল তখন অনেক সাধ্যসাধনা করিয়া স্ত্রীকে একবার লইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু দিন পনেরো থাকিয়াই লীলাবতী এমন কান্নাকাটি আরম্ভ করে যে টেলিগ্রাফ্ করিয়া শ্বশুরকে আনাইয়া, তাহাকে ফিরিয়া পাঠাইতে হয়। লীলা নিজ পিত্রালয়েই থাকে, ময়নাবতীতে বড় একটা আসে না। মা নাই, আনিবেই বা কে? বাড়ীতে এখন কেবল রাখালের এক জাঠতুতো ভাই সপরিবারে বাস করেন।

স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে প্রণয় ভালবাসার কথা রাখাল উপন্যাসেই পাঠ করে, বন্ধুবান্ধবের মুখেই গল্প শোনে—নিজজীবনে সে রসাস্বাদন কখনও করে নাই। বিবাহের পর রাখাল যখন বাড়ীতে ছিল, লীলাবতী তখন বালিকা। উভয়ের মধ্যে সর্ব্বদা দেখা সাক্ষাতের সুযোগও তখন ছিল না। তাহার পর হইতে সে বিদেশে। উমেদারীতে কিছুকাল গিয়াছিল। পাঁচ ছয় বৎসর ত চাকরিই করিতেছে। প্রতি বৎসরই অন্ততঃ একবার করিয়া—হয় ছুটি লইয়া নয় পীড়ার ভান করিয়া—রাখাল দেশে গিয়াছে। দীর্ঘকাল পরে স্বামীকে পাইলে, স্ত্রীর আহ্লাদে আত্মহারা হওয়ার কথা, লীলাবতীর তেমন ভাবটা কৈ রাখাল ত কখনও দেখে নাই। কৈ, ফিরিয়া আসিবার সময় সে কখনও ত রাখালকে বলে নাই, আর দুই দিন থাক, কিম্বা, আবার কবে আসিবে? স্বামীর প্রতি লীলাবতীর যেন কেমন একটা নির্লিপ্ত ভাব। লেখাপড়া জানে, রাখাল তাহাকে মাঝে মাঝে পত্রও লিখিয়া থাকে। রাখালের দুই তিনখানি পত্রের পর লীলা একখানি উত্তর লেখে—তাহাও অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত—তুমি কেমন আছ, আমরা ভাল আছি—এইরূপ দুই চারিটা মামুলি কথা মাত্র। রাখাল এক একবার ভাবে, এতদিন উভয়ে একত্রবাসের যথেষ্ট সুযোগ হয় নাই বলিয়াই লীলাবতীর মনে বয়সোচিত অনুরাগ সঞ্চার হয় নাই—কিছুদিন একত্র থাকিতে থাকিতেই তাঁহাদের সম্বন্ধটি স্বাভাবিক মধুরতা প্রাপ্ত হইবে।

এবার রাখাল স্ত্রীকে আনিবার উদ্যোগ করিতেছে—দিনস্থির হইয়াছে ১৭ই মাঘ। পিত্রালয়ে থাকিলে পাছে বাড়ীর লোকের কুমন্ত্রণায় আসিবার সময় বাঁকিয়া বসে, তাই তাহাকে ২রা মাঘ নিজেদের বাড়ীতে আনাইয়া রাখিয়াছে। তারিখ হিসাব করিয়া রাখাল একসপ্তাহ ছুটির দরখাস্ত করিয়াছিল, কিন্তু ছুটি মঞ্জুর হয় নাই। রেলের চাকরিতে ছুটি আবশ্যকমত প্রায়ই পাওয়া যায় না। একবার একব্যক্তি পিতার মৃত্যুর পর, বাড়ী গিয়া আত্মশ্রাদ্ধ করিবে বলিয়া ছুটি

চাহিয়াছিল, সাহেব হুকুম দিলেন, এখন ছাড়িতে পারি না, দুইমাস পরে শ্রাদ্ধ করিও। এরূপ অবস্থায়, রেলের সকল চাকর যাহা করিয়া থাকে, রাখালও তাহাই করিবে স্থির করিয়াছে। একদিন পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৬ই মাঘ সে "সিক্ রিপোর্ট" অর্থাৎ পীড়ার ভান করিয়া, সন্ধ্যার গাড়ীতে বাড়ী চলিয়া যাইবে। পরদিন স্ত্রীকে লইয়া যাত্রা করিয়া, তৎপরদিন অর্থাৎ ১৮ই মাঘ বেলা নয়টার গাড়ীতে আবার আসিয়া পেঁ ৗছিবে। ষ্টেশনমাষ্টার বাবু সম্মতি দিয়াছেন। রেলের ডাক্তার বাবুটিও অত্যন্ত সদাশয় ব্যক্তি—তিনিও সার্টিফিকেট দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

দেখিতে দেখিতে রাখালের বাড়ী যাইবার ধার্য্য দিন উপস্থিত হইল। বেলা তিনটার সময় ষ্টেশনে গিয়া সে "সিক্‌রিপোর্ট" করিল—বড়বাবু সে সংবাদ যথানিয়মে তারযোগে হেড্ আফিসে এবং ডাক্তার বাবুকে জানাইলেন। জিনিষ পত্র গুছাইয়া, বিছানা বাঁধিয়া, সন্ধ্যা ৭টার প্যাসেঞ্জারে রাখাল রওয়ানা হইবে। পানিপাঁড়ে খানকতক রুটি এবং আলু বেগুন ভাজা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিল, তাহাই রাখাল শালপাতায় জড়াইয়া তোয়ালেতে বাঁধিয়া লইল—গাড়ীতে খাইবে। সঙ্গে এক সোরাই জলও লইল। বড় বাবুর স্ত্রী পান সাজিয়া ভিজা ন্যাকড়ায় জড়াইয়া দিয়াছিলেন, গাড়ীতে উঠিবার সময় বড়বাবু তাহা রাখালের হাতে দিলেন এবং অনুরোধ করিলেন, যদি অসুবিধা না হয় তবে এক নাগরী ভাল খেজুরগুড় যেন রাখাল তাঁহার জন্য লইয়া আসে।

গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

স্ত্রী কোথায়?

রাখালের বাড়ী ময়নাবতী গ্রাম মেমারি ষ্টেশন হইতে আড়াই ক্রোশ পথ। গাড়ী হইতে নামিয়া, একজন মুটিয়ার মাথায় বিছানা ব্যাগ দিয়া, বেলা নয়টার পূর্ব্বেই রাখাল বাড়ী পৌছিল।

অঙ্গনে প্রবেশ করিয়া রাখাল দেখিল, সকলের মুখ অত্যন্ত গম্ভীর ও বিষন্ন। একটা অজ্ঞাত বিপদাশঙ্কায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ হঠাৎ শিহরিয়া উঠিল।

বউদিদি তখন গোহালের বাহিরে দাঁড়াইয়া, গাই দুহাইতেছিলেন, রাখালের কণ্ঠস্বর শুনিয়াও মুখ ফিরিয়া চাহিলেন না। দাদার কৃষ্ণা শাশুড়ী নামাবলী

গায়ে দিয়া সাজি হস্তে উঠানের প্রান্তস্থিত করবী গাছ হইতে ফুল তুলিতেছিলেন, তিনি মুখ ফিরাইয়া রাখালের পানে এক নজর মাত্র চাহিয়া, আবার স্বকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। ঝি হারাণীর মা জলের ঘড়া কাঁখে করিয়া রাখালের সম্মুখ দিয়াই চলিয়া গেল, একবার মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসাও করিল না, দাদাবাবু ভাল ত? কেবল তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রী দশমবর্ষীয়া বালিকা স্বর্ণলতা ধীরে ধীরে আসিয়া রাখালের হাতখানি ধরিয়া স্নেহভরে বলিল—"ছোটকাকা!"

রাখাল শঙ্কিতস্বরে বলিল—"খুকী, সবাই কেমন আছে?"

"ভাল আছে।"

"তোর বাবা কোথায়?"

"কি জানি।"

"কোথাও বেড়াতে গিয়েছেন না কি?"

"হ্যাঁ।"

"আমার চিঠি তোরা পেয়েছিলি?"—বলিতে বলিতে রাখাল বড় ঘরের বারান্দায় উঠিল। একবার উৎসুক হইয়া চারিদিকে নেত্রপাত করিল, যাহা খুঁজিতেছিল তাহার কোনও চিহ্ন কোথায় দেখিল না। এমন সময় তাহার বধূঠাকুরাণী আসিয়া দাঁড়াইলেন।

রাখাল তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল—"ভাল আছ বউদিদি"?

"আছি।"—বউদিদির স্বর বিষণ্ণ, চক্ষু আনত।

"আমি আজ এসে পৌছব বলে চিঠি লিখেছিলাম, সে চিঠি কি তোমরা পাওনি?"

"পেয়েছিলাম।"

"দাদা কোথায়?"

"কোথা বেরিয়েছেন।"

"ছোট খোকা ভাল আছে?"—বলিতে বলিতে রাখাল বড় ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

"ভাল আছে।"

"বড় তেষ্টা পেয়েছে বউদিদি—এক গেলাস জল দাও ত।"

"তুমি হাত পা ধুয়ে ফেল, আমি জলখাবার আনি।"—বলিয়া বধূঠাকুরাণী প্রস্থান করিলেন।

রাখাল তৎপশ্চাৎ বারান্দায় আসিয়া হস্তপদাদি প্রক্ষালন করিল

আবার ঘরে আসিয়া, তক্তপোষের উপর বসিল। উৎসুক নয়নে দ্বারের পানে চাহিয়া রহিল—তাহার মনে আশা ছিল, বউদিদি বোধ হয় লীলাবতীর হাতেই জলখাবার পাঠাইয়া দিবেন।

কিন্তু কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিতেই তাহার সে আশা ভঙ্গ হইল। বউদিদিই জলখাবার লইয়া প্রবেশ করিলেন। একটি রেকাবিতে দুইটি রসগোল্লা আর এক গেলাস জল।

স্বর্ণলতা একটি ডিবার খোলে দুইটি পান রাখিয়া চলিয়া গেল। রাখাল রসগোল্লা খাইতে লাগিল। বধূঠাকুরাণী নীরবে উদাস দৃষ্টিতে বাহিরের পানে চাহিয়া রহিলেন।

জল পান করিয়া, গেলাস নামাইয়া রাখিয়া, রাখাল বলিল—"দাদা কতক্ষণে ফিরবেন, বউদিদি?"

"কি জানি।"

"একখানা গোরুর গাড়ী এখন থেকে বলে রাখতে হবে ত? বেলা চারটার সময় রওয়ানা হতে হবে। সাহেব ছুটিত দিলে না, ব্যারাম হয়েছে বলে চলে এসেছি। এ দিকের সব গোছান আছে ত?"

বউদিদি রাখালের পানে না চাহিয়া, ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন—না। তাঁহার চক্ষুযুগল হইতে দুই ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

দেখিয়া রাখাল বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিল—"কি হয়েছে বউদিদি?"

বউদিদি নীরব।

রাখাল তখন তক্তপোষ হইতে নামিয়া, বউদিদির কাছে দাঁড়াইয়া, কম্পিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"সে কি বেঁচে নেই?"

বউদিদি রাখালের পানে না চাহিয়াই বলিলেন—"এমন কি সৌভাগ্য তার?"

"তবে? কি হয়েছে বল বউদিদি।"

"কি হয়েছে তা ত জানিনে, আজ ভোর থেকে তাকে পাওয়া যাচ্ছেনা।"

শুনিয়া রাখালের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। রুদ্ধশ্বাসে বলিল—"পাওয়া যাচ্ছেনা! বল কি? কোথা গেল?"

"ভগবান জানেন। তোমার দাদা খুঁজতে বেরিয়েছেন।" ক্ষণমাত্র চিন্তা করিয়া রাখাল বলিল "ঝগড়াঝাঁটি কিছু হয়েছিল?"

"কৈ তেমন কিছুই ত হয়নি।"

"তবু ?"

"কাল সন্ধেবেলা প্রদীপ হাতে করে রান্নাঘরে যাচ্ছিল, পথের মধ্যে প্রদীপটা হাত থেকে পড়ে গেল।"

"তুমি তাকে বক্‌লে ?"

"আমি শুধু বল্লাম, ছোট বউ, এক প্রদীপ তেল ফেলে দিলে, আসে কোথা থেকে বল দেখি ? এই টানাটানির সংসার, একটু সাবধান হয়ে চলা ফেরা করতে হয় ! এই শুধু বলেছিলাম।"

"তারপর ?"

"তারপর আর কি ? সারা সন্ধেবেলা মুখ গোঁজ করে রইল। রাত্রে ভাল করে খেলে না।"

রাখাল ভাবিল, ঘটনাটা বউদিদি যত লঘুভাবে বর্ণনা করিলেন, আসলে তত লঘুভাবে শেষ হয় নাই। বোধ হয় বউদিদি তাহাকে খুব কড়া কড়া শুনাইয়া দিয়াছেন। অভিমানিনী নিশ্চয়ই জলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে।

জিজ্ঞাসা করিল—"কাল রাত্রে সে কোথায় শুয়েছিল ?"

"ও ঘরে।"

"সেখানে আর কে শুয়েছিল ?"

"সে আর খুকী এক বিছানায় শুয়েছিল।"

"তারপর, কতক্ষণে উঠে গেল ?"

"তা ত খুকী বলতে পারে না, ছেলে মানুষ, রাত্রে শুয়েছে, একবারে সকাল বেলা ঘুম ভেঙ্গেছে। জেগে উঠে আর তাকে দেখতে পায়নি।"

"বাড়ীর কোনও দরজা সকালে উঠে খোলা পেয়েছিলে ?"

"খিড়কি দরজা খোলা পেয়েছিলাম।"

রাখাল কয়েক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া শুষ্ককণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—"বউদিদি, নিশ্চয়ই সে পুকুরে ডুবে মরেছে। আমি জেলেদের ডেকে আনি।"—বলিয়া রাখাল জুতা পরিতে লাগিল।

বউদিদি তাহার জামা চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন—"থাম থাম ঠাকুরপো। এখন গোলমাল কোরো না। যদি ডুবেই থাকে, এখন জেলে ডেকে জাল ফেলালে তাকে কি বাঁচাতে পারবে ? জলে মানুষ ডুবলে এতক্ষণ কি প্রাণ থাকে ? যদি তাই হয়ে থাকে, আজ দিনের মধ্যেই ভেসে উঠবে। তা

যদি না হয়, তা হলে প্রচার করতে হবে, তার বাপের বাড়ীর ঝি কাল রাত্রে এসেছিল, ভোরবেলা তাকে নিয়ে গেছে।"

কথাটা শুনিয়া রাখালের দেহের ভিতর দিয়া যেন বেদনার একটা বিদ্যুৎ বহিয়া গেল। সে বুঝিতে পারিল, বউদিদির কি সন্দেহ। ভাবিল, তাহা হইতেই পারে না—অসম্ভব—অসম্ভব। বলিল,—"বউদিদি, তুমি যা মনে করেছ, তা কখনই নয়। হয়, সে অভিমানে জলে ডুবে মরেছে, নয়, সে সত্যি সত্যিই বাপের বাড়ী পালিয়ে গেছে। আমি গোল করব না, কিন্তু একবার খিড়কীর পুকুরের চারিধারটা ঘুরে আসি। যদি সে ডুবে মরে থাকে তবে কোন না কোনও চিহ্ন দেখতে পাব।"—বলিয়া রাখাল বাহির হইয়া গেল।

রাখাল গিয়া পুষ্করিণীর চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইল কিন্তু কোথাও কোনও প্রকার চিহ্ন বা সন্দেহজনক কিছু দেখিল না। তখন ভাবিল, যদি ডুবিয়াই থাকে, তবে খিড়কির এ ক্ষুদ্র পুষ্করিণীতে ডুবিবে এমন কি কথা? হয়ত ডুব-জলও ইহাতে নাই। সুতরাং বাটীর অনতিদূরে সাধারণের ব্যবহার্য্য যে পুষ্করিণী আছে, সেখানে অন্বেষণ করা আবশ্যক।

কিন্তু সে পুষ্করিণীতে অন্বেষণ করিতে গিয়া বিপদ এই হইল, ক্রমাগত পরিচিত লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইতে লাগিল। "কি রাখালদা, কখন এলে?" —"কি রাখালকাকা, হঠাৎ যে?"—"রাখাল যে, বাবাজি ভাল আছত?"— ইত্যাকার প্রশ্নে পদে পদে সে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। স্নানের বেলা কেহ তৈলমর্দ্দন করিয়া গামছা কাঁধে লইয়া স্নানে যাইতেছে, কেহ স্নান সমাপন করিয়া ফিরিতেছে—সুতরাং এরূপ অবস্থায় পুষ্করিণীর চারি পাশে ঘুরিয়া বেড়ান রাখালের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। তাই সে বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া ভগ্নহৃদয়ে তক্তপোষের উপর শুইয়া পড়িল।

অল্পক্ষণ পরে, স্বর্ণলতা আসিয়া, রাখালের পাশে বসিয়া, স্নেহভরে তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লগিল। নীরবে চিন্তা করিতে করিতে রাখালেব দুই চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। এটুকু বালিকার চক্ষু এড়াইল না। কি বলিয়া কাকাকে সে সান্ত্বনা করিবে? কাকার ব্যথা কোথায় তাহাও সে বুঝিতে পারিয়াছে কিন্তু অবোধ বালিকা ত কথা জানেনা। আর কিছু ভাবিয়া না পাইয়া সে বলিল,—"কাকা, তামাক সেজে দেব?"

রাখাল সে কথায় উত্তর না দিয়া স্বীয় সজল নেত্রযুগল বালিকার পানে ফিরাইয়া বলিল,—"খুকী, তোর ছোটকাকীর কি হল?"

করুণকণ্ঠে খুকী বলিল,—"তা ত জানিনে কাকা। বোধ হয় বাপের বাড়ী চলে গেছেন।"

রাখাল আগ্রহসহকারে বলিল,—"এ্যাঁ খুকী, আমারও তাই বিশ্বাস। নিশ্চয়ই সে বাপের বাড়ী গেছে। আচ্ছা খুকী, তোরা যে বিছানায় শুয়ে ছিলি, সে বিছানায় কোনও চিঠি কি কাগজ সকালে উঠে দেখিস নি?"

"না কাকা কোনও চিঠি ত দেখিনি।"

"সে বিছানা কোথা?"

"ও ঘরেই গুটানো আছে।"

"আচ্ছা চল্ দেখি, বিছানাটা একবার ভাল করে খুঁজি।"—রাখাল শুনিয়াছিল, আত্মহত্যা করিবার বা নিরুদ্দেশ হইবার পূর্ব্বে অনেকে কারণটা চিঠিতে লিখিয়া রাখিয়া যায়।

দুইজনে তখন উঠিয়া গিয়া, বিছানার মধ্যে অনেক বিফল অনুসন্ধান করিল। বালিসগুলার ওয়াড় পর্য্যন্ত খুলিয়া দেখিল, কোথাও কিছু নাই।

ঘর হইতে বাহির হইয়া, রাখাল তখন শুধুপায়ে পাগলের মত উঠানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, বুকের ভিতরটায় যেন কে আগুন জ্বালিয়া দিয়াছে।

বউদিদি রান্নাঘরের রকে বসিয়া কুটনা কুটিতেছেন, ঝি অল্পদূরে বসিয়া ছোটখুকীকে দুধ খাওয়াইয়া দিতেছে। এ সকল দৃশ্য যেন রাখালের চক্ষে স্বপ্নের মত কায়াশূন্য প্রতিভাত হইতে লাগিল।

বারান্দায় দাঁড়াইয়া খুকী ডাকিল,—"কাকা, তামাক সেজেছি।"—কলিকাটি হাতে করিয়া খুকী ফুঁ দিতেছে।

খুকীর সান্ত্বনাপূর্ণ করুণ কণ্ঠধ্বনি রাখালের মনে পিপাসার জলের মত অনুভূত হইল। এ দুঃখের সময়, বাড়ীর আর কেহ তাহার পানে ফিরিয়াও চাহিতেছে না,—একমাত্র খুকীই তাহার ব্যথার অংশ বুক পাতিয়া লইয়াছে।

রাখাল তখন বারান্দায় উঠিয়া ভূমির উপর বসিয়া দেওয়ালে পিঠ দিয়া তামাক খাইতে আরম্ভ করিল।

কিয়ৎক্ষণ এইরূপে কাটিলে, রাখালের দাদা চটিজুতা ফট্‌ফট্ করিতে করিতে বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। তিনি রাখালের অপেক্ষা দশবছরের বড়।

ম্যালেরিয়ার প্রকোপে দেহখানি কৃশ, চক্ষু কোটরগত—দেখিলে বয়সের অপেক্ষা আরও পাঁচ সাত বৎসর অধিক বলিয়া মনে হয়।

দাদাকে দেখিয়া রাখাল হুঁকা নামাইয়া, তাঁহাকে প্রণাম করিল। কুশল প্রশ্নাদির পর, হুঁকাটি টানিতে টানিতে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"সব শুনেছ ত ?"

"শুনেছি। কোনও খোঁজ পেলেন ?"

"কিছু না। কাউকে ত মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করতে পারিনে, মুস্কিল এই হয়েছে কি না!

রাখালের বউদিদি আসিয়া দাঁড়াইলেন। সকল শুনিয়া বলিলেন—"এখন উপায় ? গ্রামে যে এখনই টী টী পড়ে যাবে!"

দাদা বলিলেন—"আমি পাড়ায় বলে এসেছি, বউমার মায়ের হঠাৎ ব্যারাম হয়েছে বলে, বসন্তপুর থেকে লোক এসে রাত থাকৃতে পাল্কী করে তাঁকে নিয়ে গেছে।"

রাখাল বলিল—"দাদা আমার বোধ হয় সত্যি সত্যিই সে সেখানে গিয়েছে।"

বউদিদি বলিলেন,—"কার সঙ্গে গেল ?"

"একলাই গিয়ে থাকৃবে। জান ত, পশ্চিম যেতে বরাবরই তার ঘোর আপত্তি। নিতে আসছি, এবার নিয়ে যাবই, সেই ভয়ে সে পালিয়ে বাপের বাড়ী গিয়েছে।"

বউদিদি বলিলেন,—"তোমার যেমন কথা! বউমানুষ, একলা, রাত্তির কাল,—এই তিন ক্রোশ পথ হেঁটে কখনও বসন্তপুর যেতে পারে ?"

রাখাল বলিল,—"মানুষটা ভারি একগুঁয়ে। জানই ত বউদিদি।

বউদিদি বিরক্তির স্বরে বলিল,—"জানিনে আবার! হাড়ে হাড়ে জানতে পেরেছি। এই পনেরো দিনেই আমার হাড় জ্বালিয়ে তুলেছিল। বলি হ্যাগা, রাখাল না হয় ছেলেমানুষ, তোমার ত বয়স হয়েছে, তোমার কি মনে হয় ছোট বউ হেঁটে একলা বাপের বাড়ী গেছে ?"

দাদা, স্ত্রীর কথার সমর্থন বা প্রতিবাদ কিছুই করিতে না পারিয়া বলিলেন,—যদি তাই গিয়ে থাকেন, তা হলেই কি কাজটা ভাল হয়েছে ? লোকে শুন্‌লে কি বল্‌বে ? ছি ছি—গেরস্তের মেয়ের কি এই ব্যবহার ?"

বউদিদি বলিলেন,—"সে কখ্‌খনো বাপের বাড়ী যায় নি, ডুবেও মরেনি। আমাদেরই ডুবিয়ে গেছে।"

দাদা গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিলেন।

রাখাল বলিল,—"খাওয়া দাওয়া করে, আমি বসন্তপুর চলে যাই। দেখি কি ব্যাপার।"

বউদিদি ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন,—"তা, গিয়ে দেখ। কিন্তু আমি বলে দিচ্ছি ঠাকুরপো, সে যদি সেখানে গিয়েই থাকে, তবে আর কখনও তাকে এ বাড়ীতে এন না। সঙ্গে করে তাকে পশ্চিম নিয়ে যেও, যেখানে খুসী নিয়ে যেও। কিন্তু এ বাড়ীতে আর যেন সে না ঢোকে। আমরা গরীব গেরস্ত মানুষ—অমন দজ্জাল মেয়েকে বউ বলে পরিচয় দিয়ে ঘরে রাখতে পারব না।"

রাখাল নীরবে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া রহিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

কোজাগর-লক্ষ্মী।

শঙ্খধবল আকাশ-গাঙে স্বচ্ছ মেঘের পালটি মেলে'
জ্যোৎস্না-তরি বেয়ে তুমি ধরার ঘাটে কে আজ এলে?
ক্ষীরোদসাগর-ছেঁচা চাঁদের টীপটি দেখি ললাটপটে,
কুমুদমালার বরণডালা লুটায় তব চরণতটে,
কাশের কোলে চামর দোলে ছত্র শোভে ছাতিমফুলে,
আসন তোমার পাতা দেখি শুক্তি-গাঁথা নদীর কূলে—
তুমি কি মা লক্ষ্মী আমার দাঁড়ালে মোর কুটীর-দ্বারে,
জ্যোৎস্না-তরি বেয়ে এসে মুক্তাধবল ধরার পারে?

কে বলে রূপ নাই দেবতার—কে বলে তাঁর মূর্ত্তি নাহি!
যে বলে সে নয়ন মেলে' আজকে রাতে দেখুক চাহি'।
দেখুক এসে অবিশ্বাসী আমার মায়ের রূপটি কিবা,
চরণে তাঁর লুটায় কিনা লক্ষ চাঁদের রৌপ্য-বিভা!

কোজাগরের লক্ষ্মী হের এলেন আজি মূর্ত্তিমতী,
চন্দনে ও আলিম্পনে অর্ঘ্য রচ' ভাগ্যবতি ;
গাঁথ মালা শুভ্র ফুলে সাজাও ডালা লাজের রাশে,
শ্বেতপাথরের থালা ভরাও নারিকেলের শুক্ল শাঁসে,
শর্করা আর ছানার যোগে ভোগের থালা পূর্ণ কর—
শঙ্খপরা গৌর হাতে ঘৃতের দীপটি তুলে' ধর,
আত্মাপরে দৃষ্টি রাখ, মনের মলা ফেল ধুয়ে—
শুভ্র প্রাণে শুক্ল বাসে প্রণাম কর চরণ ছুঁয়ে।

প্রণাম কর—উর্দ্ধে হের বিশ্বভুবন সিক্ত করে'
মায়ের আশীষ-কিরণ-ধারা মাথার পরে পড়্ছে ঝরে'
চক্ষুমনের তৃপ্তিভরা দীপ্তিমতী মূর্ত্তিখানি—
দেখরে চেয়ে অবিশ্বাসি কোজাগরের লক্ষ্মীরাণী।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

মা ও ছেলে

১

সুরবালা বিধবা হইবার পর দিনকতক বাপের বাড়ী গিয়াছিলেন, কিন্তু পিতৃকুলের কাহারো আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না, কাজেই তাঁহাকে বিলাসপুরে ফিরিতে হইল। তিনি আসিতেই পাড়ার হরিমণি ঠাকুরঝি তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন।

দুজনে অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা হইল। ঠাকুরঝি প্রতি কথার আরম্ভেই দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া চক্ষু অঞ্চলে ঢাকিতেছিলেন। চক্ষে অশ্রু ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রাণে দুঃখের ভাগ কতটা ছিল তাহা না বলাই ভাল।

ঠাকুরঝি বলিতেছিলেন—পৃথিবীতে কোথাও সুখ নাই, বিশেষতঃ মেয়েমানুষকে ত চিরকালই কাঁদিতে হয়।

এই কথাগুলি নানা উদাহরণ দিয়া তিনি সুরবালাকে প্রায় দুই ঘণ্টা ধরিয়া বুঝাইলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন "দিদি মেয়েমানুষ চিরকালই পরাধীন, এখন ছেলের মন যোগাইয়া চলিও। তাহা না হইলে আর কোনো উপায় নাই।"

কিন্তু বাড়ীর ঝি চাকর হইতে আরম্ভ করিয়া সকলেই যখন সুরবালাকে মা বলিয়া ডাকিল, নাতিনাতিনীরা যখন ঠাকুর মা বলিয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিল, তখন কাহারো মন যোগাইয়া চলিতে হইবে একথা একবারও মনে আসিল না, বরং তিনি মনে করিলেন—তিনিই গৃহের কর্ত্রী, তাঁহারি কথামত সকলে চলাফেরা করিবে।

শনিবার পুত্র নীলরতন গৃহে ফিরিল। কলিকাতায় চাকরী গ্রাম হইতে প্রত্যহ যাওয়া-আসা করা চলে না, সেই জন্য বাধ্য হইয়া তাঁহাকে মেসে থাকিতে হয়।

মা বাড়ী আসিয়াছেন দেখিয়া পুত্র যাহাতে মায়ের কোনো কষ্ট না হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে খুবই ব্যস্ত হইয়া পড়িল। মা বলিলেন "বাবা, যেমন করিয়াই হোক আমার দিন কাটিয়া যাইবে, আমার জন্য তোকে কিছুই ভাবিতে হইবে না।"

দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরের পর এই বৈধব্য সুরবালার অন্তরে শুধু যে শোকের আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছিল, তাহা নয়, এই অবস্থার পরিবর্ত্তন তাঁহার চোখের সাম্‌নে আর একটা জগৎ প্রসারিত করিয়া দিল। এতকাল সংসারের একটা নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে সর্ব্ববিষয়ে স্বামীর উপর নির্ভর করিয়া, আপনাকে তাঁহার সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে বদ্ধ রাখিয়া কখনো তিনি নিজের একটা স্বাধীন সত্ত্বাকে উপলব্ধি করিতে চান নাই, আজ সহসা আপনা হইতেই যখন তাহা পরিস্ফুট হইয়া উঠিল, তখন তিনি আপনাকে একটু নূতনভাবে চালাইতে চাহিলেন। তিনি বুঝিলেন—এখন তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে সংসারের কর্ত্রী হইতে হইবে, শুধু কর্ত্রী কেন, কর্ত্তার কাজও তাঁহাকে বাদ দিলে চলিবে না। ছেলে উপযুক্ত হইলেও তাহাকে পরামর্শ দিতে হইবে, যাহাতে সে ভাল করিয়া চলিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আগে স্বামী সব বিষয় দেখিতেন, শুধু তাঁহাকে যত্ন করিলেই সুরবালা মনে করিতেন তাঁহার সব কর্ত্তব্য শেষ হইয়াছে। এখন তিনি দেখিলেন তাঁহার কাজ অনেক, কর্ত্তব্যক্ষেত্র পূর্ব্বের মত সংকীর্ণ নয়।

নীলরতন বাড়ী আসিলে সুরবালা তাঁহার কাছে আসিয়া বসিতেন, যাহাতে সর্ব্ববিষয়ে একটা সুশৃঙ্খলতা আসিতে পারে তাহার জন্য বিশেষ যত্ন করিতেন, সংসারের প্রত্যেক কাজটি তিনি তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতেন বধূমাতা কিরণশশীর বিলাসপ্রিয়তা দেখিয়া তিনি অনেকবার তাঁহাকে বিস্তর উপদেশ দিতেন। পৌত্র ললিত যাহাতে মানুষ হইয়া উঠিতে পারে তাহার প্রতিও তাঁহার যথেষ্ট দৃষ্টি ছিল।

কিরণশশী মনে করিয়াছিলেন শ্বশুরের মৃত্যুর পর তাঁহার স্বামী হইবেন কর্ত্তা, আর তিনি নিজে হইবেন কর্ত্রী। কিন্তু মাঝখান হইতে শাশুড়ী ঠাকু-রাণী তাঁহার কর্ত্রীত্বে ভাগ বসাইলেন দেখিয়া তিনি সুস্থির হইতে পারিলেন না। এখন কাজ করিয়া, কাজ দেখাইয়া সংসারের কর্ত্রীত্ব লাভ করা ভিন্ন আর অন্য উপায় রহিল না। স্বাভাবিক আলস্য ত্যাগ করিয়া, ভাণ্ডারের চাবী লইয়া বিনাকাজে এদিক সেদিক ঘুরিয়া তিনি দেখাইতে চাহিলেন সংসার যেন তাঁহারি মুষ্টির ভিতর, সংসারে যেন তিনিই প্রধান। তারপর তিনি শাশুড়ী ঠাকুরাণীকে আপনার আজ্ঞাধীন করিয়া রাখিতে চাহিলেন। প্রথম প্রথম সংসারের নানা কাজ দেখাইয়া তিনি সুরবালাকে "মা এটা কর, সেটা কর" বলিয়া কাজ করাইয়া লইতে লাগিলেন। শাশুড়ী বধুর অভিপ্রায় না বুঝিয়া তাঁহার কথামত কাজ করিতে করিতে সহসা একদিন বুঝিতে পারিলেন, তাঁহাকে অন্যের কথামত কাজ করিয়াই চলিতে হইবে, নিজের যুক্তিমত কাজ করিবার অধিকার তাঁহার নাই।

একদিন সুরবালার শরীর অসুস্থ ছিল বলিয়া তিনি সংসারের কোনো কাজে হাত দেন নাই। সেই দিন কিরণশশী ঝিএর উপর খুব রাগিয়া বলিয়া ছিলেন "কেউ কোনো কাজ করিবেন না, এমন করিলে চলা দায়, খাইতে হইলে খাটিতে হয়।" শেষের কথাটা তিনি এমন ভাবে চীৎকার করিয়া বলিয়াছিলেন যে সুরবালার মর্ম্মে মর্ম্মে তাহা প্রবেশ করিয়াছিল।

কিন্তু এ সব তো দেখিতে গেলে চলিবে না, তাঁহাকে সব মানাইয়া লইতে হইবে, যে বিপুল কর্ম্মক্ষেত্র তাহার সম্মুখে সহসা প্রকাশ পাইয়াছে, সেখানে তাঁহাকে কাজ করিতে হইবে, বাধাবিপত্তি দেখিয়া বিমুখ হইলে তো চলিবে না।

সুরবালা পূর্ব্বের মতই কাজ করিতে লাগিলেন। সকলের প্রতি তাঁহার যে একটা অকৃত্রিম স্নেহ ছিল তাহাতে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিল, শুধু স্নেহের কাজ করিতে করিতে তিনি আপনার অজ্ঞাতে এমন একটা পদে উন্নীত হইলেন

যেখানে যথেষ্ট মানসম্ভ্রম আছে, অথচ নিজের হাতে কোনো কাজ করিতে হয় না।

কিরণশশী মনে করিলেন—শাশুড়ী ঠাকুরাণী তাঁহার উপর এক চাল চালিয়াছেন। ভাণ্ডারের চাবী ঝন্ ঝন্ করিয়া সমস্ত দিন এদিক সেদিক ছুটাছুটি করিয়াও তিনি যাহা লাভ করিতে পারেন নাই, চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলেও শাশুড়ী ঠাকুরাণীর কাছে তাহার অভাব হইবে না। তাঁহার রাগ বাড়িয়া উঠিল। সুরবালা তাহা বুঝিলেন, কিন্তু রাগিলেন না। শাশুড়ীর যাহা কর্ত্তব্য তাহার একটিও একদিন বাদ যায় নাই।

কিরণশশী যখন দেখিলেন তাঁহার একমাত্র পুত্র ললিতমোহন ঠাকুরমার কাছেই সর্ব্বদা থাকিতে চায়, তখন তিনি একদিন তাহাকে চুপি চুপি বলিয়াছিলেন "বাবা ও ডাইনীর কাছে যাইও না।" পুত্র কিন্তু মাতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছিল।

(২)

শাশুড়ী ঠাকুরাণী সংসারে প্রাধান্য লাভ করিলেন দেখিয়া কিরণশশী খুবই রাগিয়াছিলেন, তাহার উপর আবার তিনি যখন বধুকে একাজ সেকাজ করিতে আদেশ করিতে লাগিলেন, তখন আর তাঁহার ধৈর্য্য রহিল না।

একদিন শনিবার নীলরতন ঘরে ফিরিল। সেদিন কিরণশশী নানা মান-অভিমানের পর স্বামীকে বলিলেন "আমি সংসারে দাসী হইয়া থাকিতে পারিব না, আমাকে বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দাও।" নীলরতন পত্নীর কিছু অধিক বাধ্য হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার ধারণা ছিল—কিরণশশীও তাহার খুব বাধ্য, সংসারে তিনি যেমন খাটেন,এমন আর কেহ খাটে না,তাহার স্ত্রীর মত গোছানো মেয়ে মানুষ হাজারের মধ্যে একটা আছে কিনা সন্দেহ, তিনি যত সত্য কথা বলেন, তত আর কেহ বলিতে পারে না। বাড়ীতে কোনো একটা গোলযোগ হইলে সে কখনই পত্নীকে দোষী মনে করিতে পারিত না, তাহার বোধ হইত সকলে মিলিয়া এই সরলা অবলাটিকে বড়ই পীড়িত করে। কিরণশশীও এই স্বামীটিকে মুঠার মধ্যে পুরিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি যাহাই বলিতেন নীলরতন তাহাই করিত, সে বেশ বুঝিয়াছিল সহধর্ম্মিণীর কথা শুনিতে সে ধর্ম্মতঃ বাধ্য।

নীলরতন বলিল "হইয়াছে কি?" তখন কিরণশশী বলিলেন, শাশুড়ী ঠাকুরাণী তাঁহাকে দেখিতে পারেন না, ললিতকে একটু যত্ন করিলে তাঁহার গাত্রদাহ হয়।

এই সকল কথা উদাহরণের সহিত তিনি এমনভাবে গুছাইয়া বলিলেন, যে নীল-রতন তাহা শুনিয়া অবাক হইয়া গেল।

সেদিন নীলরতন মায়ের সহিত ভাল করিয়া কথা কহিল না। মা তাহাকে আহার করিতে ডাকিলেন, সংসার সম্বন্ধে দুএকটি কথাও কহিলেন, পুত্র চুপ করিয়া সব শুনিল, একটিও উত্তর দিল না। মা বলিলেন "নীলরতন তোর কি কোনো দুর্ভাবনা আছে?"

"না" বলিয়া নীলরতন আচমন করিতে উঠিল। মা বলিলেন "আজ তোকে এত অন্যমনস্ক দেখিতেছি কেন? কিছু খেলি না, এর কারণ কি?"

"কোনো কারণ নাই" বলিয়া নীলরতন শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল।

উপযুক্ত পুত্রের এইরূপ সংক্ষিপ্ত অবহেলাপূর্ণ উত্তর শুনিয়া সুরবালা একটু ব্যথিত হইলেন, তাঁহার মনে একটু অভিমানেরও সঞ্চার হইল।

কিন্তু পরদিন সব কথা ভুলিয়া তিনি পুত্রকে বলিলেন "দেখ নীলরতন, তুই ললিতকে কলিকাতায় লইয়া যা', সেখানে সে লেখাপড়া করুক, এখানে পাড়ার দুষ্ট ছেলেদের সঙ্গে সে খারাপ হইয়া যাইতেছে।"

নীলরতন বলিল "কলিকাতায় আমাকেই কে দেখে তার ঠিকানা নাই, আমি আবার ছেলেকে দেখিব!"

সুরবালা একটু রাগিয়া উত্তর করিলেন "কেন পারিবে না? সকলে নিজের ছেলেকে দেখে, তুমি পারিবে না কেন?"

নীলরতনের মেজাজটা ভাল ছিল না, তাহার উপর এই কথায় সে জ্বলিয়া উঠিল, ইচ্ছা হইল একবার সে তাহার কাজগুলা সকালবেলা তামাক সাজা হইতে রাত্রের বিছানা করা পর্য্যন্ত একনিঃশ্বাসে বলিয়া যায়। কিন্তু তাহাতে কোনো ফল হইবে না মনে করিয়া সে গম্ভীরভাবে পায়চারি করিতে করিতে একটু অবজ্ঞার স্বরে বলিল "তা যদি বুঝিতে তাহা হইলে আর ভাবনা কিসের?"

সুরবালা বলিলেন "মনে করিলেই তুমি সময় করিয়া লইতে পার।"

নীলরতন এবার আরো রাগিয়া উঠিল, বলিল "মা, তুমি কি আমায় মারিয়া ফেলিতে চাও?"

"মায়ে পোয়ে কিসের এত কথা গো" বলিয়া এই সময় হরিমণি ঠাকুরঝি গৃহে প্রবেশ করিলেন। নীলরতন বলিল "দেখতো দিদি, মা বলেন, ললিতকে কলি-কাতায় লইয়া যাও, আমার কি সময় আছে দিদি?"

"তা'ত ঠিক, তা'ত ঠিক" বলিয়া ঠাকুরঝি পা ছড়াইয়া বসিলেন। সুরবালা রাগে ও ঘৃণায় সেস্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

ঠাকুরঝি অনেকক্ষণ মাথাটি নীচু করিয়া বসিয়া রহিলেন। কিরণশশীও কিছুক্ষণ পরে ছোট ছেলেটিকে কোলে করিয়া তাঁহার পিছনে আসিয়া বসিলেন। ঠাকুরঝি তখন গ্রামের নানা কথা বলিতে সুরু করিলেন। তাহার অধিকাংশই পরনিন্দা।

এমন সময় হঠাৎ সুরবালা সেখানে আসিয়া বলিলেন "দেখ দিদি, ও সব পরের কথায় দরকার কি?"

"কেন লো, তোর হয়েছে কি?" বলিয়া ঠাকুরঝি মুখ বিকৃত করিলেন।

সুরবালা বলিলেন "ওসব কথা বলাও দোষ, শোনাও দোষ।"

"ইস, তোর গায়ে এত কেন লাগে গা?" বলিয়া ঠাকুরঝি নীলরতনের দিকে চাহিলেন। নীলরতন বলিল "ওর সঙ্গে ঝগড়া কর কেন মা?" ছেলের কয়টি কথা মাকে বড়ই লাগিল, তিনি কোনো কালে কাহারো সহিত ঝগড়া করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। ছেলে আজ তাঁহাকে কলহপ্রিয় মনে করিল কেন, তাহা তিনি কোনো মতেই ভাবিয়া উঠিতে পারিলেন না।

"পয়সা থাকিলে কি এতই অহংকার করিতে হয় দিদি?" বলিয়া ঠাকুরঝি উঠিয়া দাঁড়াইলেন; তারপর এদিক ওদিক চাহিয়া বলিলেন "না দাদা, মন কেমন করে, তাই মাঝে মাঝে দেখিতে আসি, না হয় আর আসিব না।"

এই কথা বলিয়া ঠাকুরঝি ক্ষিপ্রগতিতে চলিয়া গেলেন।

নীলরতন চুপি চুপি স্ত্রীকে বলিলেন "দেখ, মাকে যত্ন করিও।"

কিরণশশী বলিল "হঠাৎ এত মাতৃভক্ত হইয়া পড়িলে যে?"

"শুনিলে না, ঠাকুরঝি আজ বড় একটা কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছে।"

"কি কথা?"

"পরে বলিব।"

(৩)

সুরবালার এক হাজার টাকা সঞ্চিত ছিল, তাহা অনেকেই জানিত, কিন্তু কেহ কখনো তাহার উল্লেখ করে নাই। আজ হঠাৎ ঠাকুরঝি তাহার উল্লেখ করিলেন দেখিয়া তিনি বুঝিলেন তাহার কোনো একটা দুষ্ট অভিসন্ধি আছে। রাগে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ জলিয়া উঠিল।

আজ পুত্রের কথায় তিনি আপনাকে বিশেষভাবে অপমানিত বোধ করিয়াছিলেন, তাহার উপর সমস্ত দিন ঠাকুরঝির কথাটা তাঁহার অন্তরে কেবলি যাওয়া আসা করিতে লাগিল। দিনের বেলা কখনো তিনি ঘুমান নাই, আজ কিন্তু ঘুমাইয়াছিলেন। যখন তাঁহার নিদ্রা ভাঙ্গিল তখন সন্ধ্যা হয় হয়। উঠিয়া দেখিলেন—কিরণশশী তাঁহার পায়ের কাছে বসিয়া আছে। শাশুড়ী ঠাকুরাণী উঠিতেই বধু বলিলেন "মা উনোনে আগুণ পড়িয়াছে, কি রাঁধিব বল।"

সুরবালার বোধ হইল—কিরণশশী তাহাকে উপহাস করিতে আসিয়াছেন। কখনো ত তিনি এত বিনীতভাবে তাঁহার নিকট হইতে কোনো একটা অনুমতি গ্রহণ করিতে আসেন নাই। তাঁহার মান ছিল, সম্ভ্রম ছিল, সংসারের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ আসনটি তাঁহারি প্রাপ্য, তাহা হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করিয়া, ন্যায় ধর্ম্মের বুকে নির্ভীকভাবে পদাঘাত করিয়া এই শাণিত ছুরিকার মত অসহ্য উপহাস! অন্যায় কাজ করিয়া হৃদয় কি একটুও বিচলিত হয় না? লজ্জায় মুখ মলিন না হইয়া তাহাতে বিদ্রূপের হাসিটি অগ্নিকণার মত ঝলকিয়া উঠিবে? সুরবালা স্থির হইতে পারিলেন না। তাঁহার মাথা ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল।

কিরণশশী বলিলেন "মা, কি রাঁধিতে হইবে?"

সুরবালা সংক্ষেপে একটা উত্তর দিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ক্রোধে তাঁহার স্বর কাঁপিয়া উঠিল।

কিরণশশী খুব বিনীতের মত রান্নাঘরে চলিয়া গেলেন। সুরবালা চুপ করিয়া আপনার ঘরে বসিয়া রহিলেন।

কিছুক্ষণ পরে নীলরতন মায়ের নিকট আসিয়া বলিল "মা, আমি ভাবিয়া দেখিলাম ললিতকে আমার নিকট রাখাই উচিত।"

সুরবালা অধীর হইয়া উঠিলেন, তাঁহার বোধ হইল সকলে যেন পরামর্শ করিয়া তাঁহাকে উপহাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তিনি নীলরতনের কথার উত্তর দিলেন না। নীলরতন আবার বলিল "মা, আমি তাহা হইলে কালই ললিতকে লইয়া যাই।"

সুরবালা বলিলেন "তোমার যাহা ইচ্ছা হয় করিতে পার।"

নীলরতন আর কোনো কথা কহিতে সাহস করিল না। পরদিন সে ললিতকে লইয়া কলিকাতায় চলিয়া গেল।

দুপুর বেলা সুরবালা একখানি লেপ শেলাই করিতেছিলেন, এমন সময় হরিমণি ঠাকুরঝি পান চিবাইতে চিবাইতে তাঁহার নিকট আসিয়া বসিলেন।

সুরবালা বলিলেন "দিদি, আছ কেমন ? সকালে আসনি, আমার উপর রাগ করিলে ?"

"আর দিদি, তোমরা তাড়াইয়া দাও, কিন্তু আমি কি চুপ করিয়া থাকিতে পারি ?"

সুরবালা কথা কহিতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না তাঁহার মনে ঠাকুরঝির উপর একটা প্রবল রাগ ছিল। তাই ভাব প্রকাশ করিবার জন্য তাঁহার ভাষা যোগাইতে ছিল না। কিন্তু সে রাগ বেশী-ক্ষণ একভাবে রহিল না, পুত্র ও বধূর কঠোর উপহাস যখন তাঁহার মনে পড়িল ও মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তাঁহার রাগ প্রবল প্রবলতর হইতে লাগিল, তখন ঠাকুরঝির উপর যে রাগ হইয়াছিল তাহা কমিয়া গেল। সুরবালা বলিলেন "দিদি, কিছু মনে করিও না, আমি দেবতা নই, মানুষ—কাজেই তোমার প্রতি কুব্যবহার করিয়াছি।"

ঠাকুরঝি এইবার পা ছড়াইয়া বসিলেন। একটা হাই তুলিয়া তুড়ি দিতে দিতে বলিলেন "ছেলে তোর বড় অবাধ্য হইয়াছে, অমন হয়েই থাকে দিদি। এখন থেকে সব সহ্য করিয়া চল।"

এই একটা কথা সুরবালার অন্তরে একটা প্রবল ঝটিকা প্রবাহিত করিল। তিনি বুঝিলেন—তাঁহাকে এখন সহ্য [illegible] হইবে। তাঁহার কথামত কাজ কেহই করিবে না, তাঁহাকেই পরের কথা শুনিয়া চলিতে হইবে। তিনি বাড়ীর গৃহিণী নন,—দাসীমাত্র। ঠাকুরঝির কাছে সব প্রকাশ করা উচিত নয় মনে করিয়া সুরবালা বলিলেন "না, দিদি, ছেলে তো আমার কথা শোনে, আমায় যত্ন করে।"

"তা' ভাল, তোমায় যত্ন করিবেই না বা কেন ?" তুমি তো আর আমাদের মত কাঙ্গাল নও, হাতে দুপয়সা থাকিলে যত্নের ত অভাব হয় না দিদি।"

সুরবালা চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। ঠাকুরঝির কথাগুলি তাঁহার মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবেশ করিল, ভাবনার পর ভাবনার তরঙ্গে তিনি আকুল হইয়া পড়িলেন।

স্তব্ধ মধ্যাহ্নে মাঝে মাঝে বহুদূরে খেজুর গাছের উপর শকুনি চীৎকার করিতেছিল। ডোবার ধারে বটগাছের উপর দুএকটি ঘুঘু পাখী শব্দ করিতে ছিল। এমন সময় "যাই বোন, কাজ আছে" বলিয়া ঠাকুরঝি উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

দুপুরবেলা শেওলাপড়া-ঘাটে ধোপা হিস হিস করিয়া কাপড় কাচিতেছিল, উঠানের একটা তালগাছের আগায় কাঠঠোক্‌রা ঠক্ ঠক্ করিয়া একটা

একঘেয়ে শব্দ করিতেছিল, গভীর ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে সুরবালার চোখ জড়াইয়া আসিতেছিল, তিনি ঠাকুরঝি কখন চলিয়া গেলেন তাহা জানিতে পারিলেন না।

হঠাৎ তাঁহার চমক ভাঙ্গিল, তিনি গালে হাত দিয়া খানিকক্ষণ বসিয়া রহিলেন। হাত গণিয়া দেখিলেন আবার শনিবার আসিতে কত দিন বিলম্ব আছে। নীলরতন আসুক যাহা হইবার হইয়া যাক; আমার অর্থ হস্তগত করিবার জন্যই কি হঠাৎ সে এত বাধ্য হইয়া পড়িয়াছে? যাই হোক, তাহার মনের ভাবটা প্রকাশ হইয়া পড়ুক। যদি সে আমার প্রতি কুব্যবহার করে, আমি কখনই তাহার সহিত একত্রে বাস করিব না। বাস্তবিক আমিত পথের কাঙ্গাল নই!

(৪)

শনিবার নীলরতন ললিতের সহিত বাড়ী ফিরিল। ললিত ঠাকুরমার নিকট প্রথমেই ছুটিয়া আসিল, কিন্তু নীলরতন মাথা ধরিয়াছে বলিয়া আপনার কক্ষে প্রবেশ করিল। মা পুত্রের সহিত দেখা করিতে আসিলেন না।

নীলরতন পূর্ব্বে স্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া তবে মায়ের কাছে কোনো একটা কথা পাড়িত। কিরণশশীর বুদ্ধি অল্প; পাছে তিনি এমন একটা কাজ করিয়া বসেন যাহাতে তাহার উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথে বাধা পড়ে এই ভয়ে সে স্ত্রীকে গোপনে শিখাইয়া পড়াইয়া একটা কোনো কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইত। স্ত্রীর সহিত অনেকক্ষণ কথা কহিতে হইবে বলিয়াই সে মায়ের সম্মুখে বাহির হয় নাই।

সুরবালা পুত্রের কণ্ঠধ্বনি শুনিতে পাইলেন, আরো জানিলেন নীলরতন স্ত্রীকে খুব একটা শক্ত কথা বুঝাইতেছে। মাথাধরার উপর স্ত্রীর সহিত এত তর্কবিতর্ক করা বলে, কিন্তু মাকে একটা স্নেহ-সম্ভাষণ করাও কষ্টকর।

সুরবালা দেখিলেন—কিরণশশী স্বামীর জন্য আহারাদির জোগাড় করিতে আরম্ভ করিলেন, খাইতে বসিয়া নীলরতন স্ত্রীর সহিত অনেক কথা কহিতে লাগিল। মা আজ নীলরতনের কক্ষে প্রবেশ করিলেন না, ছেলেও মা বলিয়া ডাকিল না।

আহারান্তে নীলরতন পান চিবাইতে চিবাইতে একটা উদ্গার তুলিয়া ডাকিল "মা, আজ যে বড় কাছে আসিতেছ না।"

"আমি ত কাছেই আছি" বলিয়া সুরবালা তাহার সম্মুখে আসিলেন। তাঁহার মুখ ম্লান ও গম্ভীর।

নীলরতন বলিল "দেখ মা, কলিকাতায় মেসে খাবার বড় কষ্ট, তাই মনে করিয়াছি সেখানে একটা বাড়ী ভাড়া করিয়া থাকিব। ললিত কাছে থাকিবে, আর—"

"বৌমাকেও লইয়া যাইবে, এইত?"

"তুমিও যাইবে।"

সুরবালা একটু ভাবিয়া বলিলেন "এবাড়ী কি ভাড়া দিবে?"

"তবে শোনো মা, জিজ্ঞাসা করিলে ত বলি। এখানে থাকিয়া ত কোনো লাভ নাই! এ ম্যালেরিয়ার দেশ, তাই মনে করিয়াছি—এখানকার সব বিক্রয় করিয়া কলিকাতায় একটা বাড়ী কিনিব। তোমার কি মত মা?"

"কলিকাতায় খরচ বেশী।"

"আমরা ত একেবারে দীনদরিদ্র নয় মা, হোক্ না একটু খরচ বেশী, একটু সুখেত থাকিব।"

সুরবালা গম্ভীরস্বরে বলিলেন "আচ্ছা, একথার উত্তর পরে দিব।"

নীলরতন কিছুক্ষণ বাহিরে বসিয়া শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল।

সুরবালা কর্ম্মান্তে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া প্রদীপ উস্কাইয়া দিলেন। কক্ষের একপ্রান্তে একটি বিছানা পাতা ছিল, তাহার উপর বসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া তিনি কি ভাবিতে লাগিলেন। ঠাকুরঝির কথা মনে পড়িল—হাতে দুপয়সা থাকিলে যত্নের অভাব হয় না। তাঁহার বোধ হইল—নীলরতন স্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া কোনো উপায়ে তাঁহার অর্থ হস্তগত করিতে চেষ্টা করিতেছে। নীলরতন পুত্র—মায়ের কাছে যে অর্থ আছে তাহাত সে চাহিলেই পাইতে পারে, তাহার জন্য এত প্রতারণা, এত পরামর্শ কেন তাহা সুরবালা অনেক ভাবিয়াও স্থির করিতে পারিলেন না।

রাত্রি বারোটা বাজিল। সুরবালা শুইয়া পড়িলেন, কিন্তু তাঁহার নিদ্রা আসিল না। ভিটা তাঁহার আপনার; বিবাহের পর হইতেই তিনি এইখানে বাস করিয়া আসিতেছেন, এইখানেই তিনি তাঁহার সংসার আরম্ভ করিয়াছেন, এইখানেই একসময়ে তিনি গৃহিনীর কাজ না করিলেও সকলে তাঁহাকে গৃহিণী বলিয়া মানিয়াছে। এই ভিটা বিক্রয় করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি যে তাঁহার সমস্ত কর্ত্রীত্ব হারাইয়া ফেলিবেন, আপনার স্থান ছাড়িয়া আর একস্থানে নীত হইলে তিনি অপরিচিতের মত হইয়া যাইবেন, কেহ তাঁহার অপেক্ষা করিবে না, সর্ব্ববিষয়ে তাঁহাকেই পরের অপেক্ষা করিতে হইবে এই কথা ভাবিতে ভাবিতে

তিনি বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। তাঁহার বোধ হইল—পুত্রই তাঁহাকে এই অবস্থায় আনিতে চাহিতেছে, ভুলিয়া নয়, কোনো একটা সৎ অভিপ্রায়ে নয়, তাঁহাকে প্রতারণা করিয়া, তাঁহার সর্ব্ব অধিকার লোপ করিয়া, তাঁহাকে চিরজীবনের মত নিঃসহায়, অবলম্বনহীন ও পরের কৃপাপেক্ষী করিয়া, সর্ব্বস্ব চোরের মত অপহরণ করিবার জন্য। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন—কোনো মতেই তিনি স্বার্থ ভুলিবেন না, কেননা ইহারি উপর তাঁহার ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। ছেলে যেমন তাঁহাকে প্রতারণা করিতে চায়, তিনিও তেমনি তাহার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ করিয়া দিবেন। নীরব রাত্রি; বহুদূরে জঙ্গলের প্রান্তে দুএকটা কুকুরের শব্দ ভিন্ন আর কিছুই শোনা যাইতেছে না, সে নীরবতার মধ্যে সুরবালার চিন্তা গম্ভীর গম্ভীরতর হইয়া আসিল। হঠাৎ তাঁহার বোধ হইল কে যেন কথা কহিতেছে। তিনি উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিলেন, বোধ হইল—নীলরতন ও কিরণশশী এখনো কথা কহিতেছে। পুত্র ও পুত্রবধূকে অনেক ধিক্কার দিয়া তিনি ভাবিলেন এতরাত্রে তাহারা কি পরামর্শ করিতেছে ইহা শুনিতেই হইবে। তাহা না হইলে বিপদ আসন্ন। এই কথা ভাবিতে ভাবিতে তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, ধীরে ধীরে বাহিরে আসিয়া পুত্রের কক্ষদ্বারে কান পাতিয়া শুনিতে লাগিলেন।

তখন সকলেই নিদ্রিত। নীলরতন ও কিরণশশী ঘুমে আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়া আছে। আকাশে সে দিন চাঁদ ছিল না। কতকগুলা নক্ষত্র অসাধারণ ঔজ্জল্যে ভূষিত হইয়া অনেকটা আলো বিকীরণ করিতেছিল। একটা বাতাস হঠাৎ যেন ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিয়া সুপ্ত পৃথিবীর উপর মায়ের স্নেহহস্ত বুলাইয়া দিল, সুরবালা তাহার ক্ষীণ শব্দে চমকিয়া উঠিলেন।

হঠাৎ তিনি ভাবিলেন আজ তাঁহার মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটিয়াছে, তাহা না হইলে মা হইয়াও তিনি আজ পুত্র ও পুত্রবধূর শয়নকক্ষের দ্বারে কান পাতিয়া দাঁড়াইয়া আছেন কেন। মনে পড়িল নীলরতন যখন কিরণশশীকে বিবাহ করিয়া আনে, তখন গ্রামে কি এক কারণে রাষ্ট্র হইয়াছিল যে তাহাদের মনের মিল হয় নাই, তখন একবার এইরূপ রাত্রিতে তিনি এমনিভাবে পুত্রের শয়ন কক্ষের দ্বারে কাণ পাতিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, জানিতে চাহিয়াছিলেন,—বাস্তবিক গ্রামের কথা সত্য কি না। তখন মায়ের গরিমা ক্ষুণ্ণ হয় নাই, আজ তাহা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। পুত্র ও পুত্রবধূর শয়নকক্ষের দ্বারে কাণ পাতিয়া আজ তিনি মনের দুর্ব্বলতা ও নীচতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। কেহ তাহা দেখিতে পায়

নাই সত্য,কিন্তু তাহার অন্তরে যে মা অবস্থান করিতেছেন তাঁহার চক্ষু ত অন্ধ হয় নাই, সুরবালার অন্তরের মাতৃত্ব অপমানে ক্ষুব্ধ হইয়া হঠাৎ এমন প্রবল হইয়া উঠিল যে তিনি কিছুতেই তাহাকে বাধা দিতে পারিলেন না,তাঁহার সকল ক্রোধ, অভিমান কোথায় বিলীন হইয়া গেল। তিনি ভাবিলেন—আম নীচতার বশবর্ত্তী হইয়া আজ কি করিলাম!

অধোমুখে তিনি আপনার কক্ষে আসিয়া শয়ন করিলেন। হঠাৎ তাঁহার মনে হইল—তিনি আজ একটা নীচতার পরিচয় দিয়াছেন সত্য, কিন্তু নীলরতন তাঁহার প্রতি যে অন্যায় আচরণ করিতেছে তাহার ত কোনো প্রতীকার করা হইল না।

এই কথা ভাবিতে ভাবিতে বিছানার উপর বসিয়া তিনি ডাকিলেন "ঝি—ঝি"। ঝি ঘরের প্রান্তে ঘুমাইতেছিল।

ঝি উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কেন মা।"

"একবার নীলরতনকে ডাক।"

"দাদা বাবু যে ঘুমাইতেছেন, এখন যে রাত্রি অনেক।'

"তা' হো'ক, তবুও ডাক।"

ঝি উঠিয়া গেল। একটু পরে নীলরতন টলিতে টলিতে ঘরে প্রবেশ করিল। সুরবালা বলিলেন "দেখ নীলরতন, কলিকাতায় যাওয়া আমার মত নয়। এখানকার ভিটাও আমি বিক্রয় করিব না। ললিতকে লইয়া আমি এখানে থাকিব। কলিকাতায় তুমি যাইতে ইচ্ছা কর ত যাইতে পার, আমার আপত্তি নাই, কেমন, যাহা বলিলাম তাহাতে মত আছে ?"

"মায়ের কথার উপর কি ছেলে কথা কহিতে পারে ?"

"এ সব বাজে কথা ছাড়িয়া দাও, আমি টাকার পুঁটুলি নই, আমি তোমার মা; মত আছে ?"

"আছে।"

"তাহা হইলে যাইতে পার।"

নীলরতন ধীরে ধীরে বাহিরে চলিয়া গেল।

(৫)

পরদিন সকালে কলিকাতায় যাইবার জন্য কাপড় চোপড় পরিয়া নীলরতন মাকে প্রণাম করিল, বলিল "মা, তুমি যদি বল, তাহলে কলিকাতায় একাই থাকি, মেয়েদের আর লইয়া যাই না।"

মা বলিলেন "বৌমাকে লইয়া যাও, আমার তাহাতে আপত্তি নাই।"

"তোমার তাতে কোনো কষ্ট হবে না?"

"না"

বলিয়া সুরবালা স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন।

নীলরতন সেই দিনই স্ত্রীকে লইয়া কলিকাতায় রওনা হইল। ললিত ঠাকুরমার কাছেই রহিল।

গ্রামে রাষ্ট্র হইল—নীলরতন মায়ের জ্বালায় স্ত্রীকে লইয়া গৃহত্যাগ করিয়াছে। হরিমণি ঠাকুরঝি বলিলেন "পালাইয়া যাইবে কোথায়? ললিতকে কাছে রাখিয়া মাগী যে ছেলের মরণকাটি হাতে করিয়া বসিয়া আছে।"

নীলরতন মনে করিত মা পুত্রের সম্পূর্ণ অধীনে থাকিতে চান্ না—কিরণশশীও তাহাই বুঝিয়াছিল, তাহারি অনুরোধে নীলরতন কোনো উপায়ে মায়ের অর্থাদি হস্তগত করিয়া তাঁহাকে আপনার নিতান্ত অধীন করিতে প্রবৃত্ত হয়। মায়ের ভিটাটুকু বিক্রয় করিবার প্রস্তাবটা এই প্রবৃত্তি হইতেই উদ্ভূত।

সুরবালা যখন ভিটা বিক্রয় করিতে রাজী হইলেন না তখন নীলরতন মনে করিল—মাকে একা ফেলিয়া সে পুত্রকে লইয়া কলিকাতায় চলিয়া যাইবে। প্রথমে তাঁহাকে রাগানো হইবে না, সেইজন্য দিনকতক তাঁহার কথামত ললিতকে বাড়ীতে রাখিতে হইবে, কিছুদিন পরে তাহাকেও কলিকাতায় লইয়া গেলে মা একা থাকিয়া বিরক্ত হইবেন, ও ভিটা ছাড়িয়া তাঁহার নিকট আসিয়া পড়িবেন। তখন কোনো উপায়ে তাহাকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া সংসারের অধীন করিয়া রাখার সুবিধা হইবে।

গ্রামে নানা লোকে নানা কথা বলিল। সুরবালা কিন্তু দমিলেন না। তিনি ললিতকে গ্রামের স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন, বাড়ীতে প্রাইভেট টিউটার রাখিলেন। সর্ব্ববিষয়ে ললিতের উন্নতির দিকে দৃষ্টি রাখিতে লাগিলেন। ছেলেকে তিনি ভাল করিয়া শিখাইবার বন্দোবস্ত করিতে অবহেলা করিয়াছেন, তাহার কুফল ফলিয়াছে। এখন নাতিটিকে সুশিক্ষিত করিতে পারিলে সংসারের অধোগতি না হইতে পারে।

গ্রামে সকলেই তাঁহার নিন্দা করিল। তিনি কোনো দিকে দৃক্‌পাত করিলেন না। নীলরতন অনেকদিন বাড়ীর খোঁজখবর লইল না। সুরবালা মনে করিলেন—সে মাকে ভুলিয়াছে।

মাকে ভোলা শক্ত নয়—কিন্তু ছেলেকে ভুলিয়া সে কেমন করিয়া রহিয়াছে। সুরবালা ভাবিলেন—এ ভুলিয়া থাকা নয়, ইহার ভিতর একটা উদ্দেশ্য আছে। এই কথা ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার কপাল ঘামিয়া উঠিল।

দুই মাস পরে নীলরতন পত্র লিখিল—"মা, ললিতকে পাঠাইয়া দাও।" মা লিখিলেন "ললিত যাইবে না।"

পরমাসে নীলরতন মায়ের নামে কুড়ি টাকা পাঠাইয়া দিল, মা তাহা ফিরাইয়া দিলেন।

আরো দুই একখানা পত্র আসিল। সুরবালা তবুও ললিতকে পাঠাইতে রাজী হইলেন না। নীলরতন দেখিল—তাহার উদ্দেশ্য বিফল হইয়াছে। মা এখন তাহার মুখাপেক্ষী নন, তাহার সংসারের সহিত মায়ের কোনো সম্পর্ক নাই, মা এখন সঞ্চিত অর্থের উপর নির্ভর করিয়া স্বতন্ত্রভাবে ভিন্ন সংসার পাতিয়াছেন। তখন একদিন নীলরতন হঠাৎ বাড়ী আসিয়া ললিতকে লইয়া চলিয়া গেল, মাকে সে কোনো কথাই জিজ্ঞাসা করিল না। মা পুত্রের ব্যবহার দেখিলেন, কিন্তু একটিও কথা কহিলেন না।

নীলরতন মনে মনে যাহাই করুক সে যে বাহিরে এতদূর অগ্রসর হইবে তাহা সুরবালা একদিনও ভাবেন নাই। আজ তিনি ভাবিলেন—কেন এমন হইল। নীলরতন প্রকাশ্যে তাহার এত বিরোধী হইয়া দাঁড়াইল কেন। সুরবালা সমস্ত বিষয়টা আগাগোড়া ভাবিতে লাগিলেন। পুত্রের সহিত তিনি যে কলহে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহা হঠাৎ বড়ই ঘৃণিত বলিয়া বোধ হইল। পুত্র স্ত্রীর কথায় মায়ের বিরোধী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাকে তিনি ন্যায়পথে চালাইতে চেষ্টা করিতেছেন। ইহাই তো মায়ের কর্ত্তব্য। তিনি মায়ের মত কাজ করিয়াছেন, পুত্র তাঁহাকে বাধা দিয়া পশুর প্রবৃত্তি প্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু সবই কি পুত্রের দোষ? তিনিও তো পুত্রকে ভুলিয়া আপনাকে অত্যন্ত স্বাধীন মনে করিয়া সঞ্চিত অর্থের মোহে নিজেকে খুব পৃথক করিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি তো পুত্রকে মায়ের মত ক্ষমা করেন নাই। এখন তাঁহার ভাব অনেকটা সমান প্রতিদ্বন্দ্বীর মত। সুরবালা ভাবিলেন—তাঁহার অর্থ-সম্পত্তিই তাহার প্রাণে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব জাগাইয়া তুলিয়াছে। যতকাল এ ভাব বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন এ কলহের বিরাম হইবে না।

সুরবালা আরো ভাবিলেন—এ প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করিলে সব বিষয়ই শান্তিতে মিটিয়া যাইতে পারিত, পুত্রও মাকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবিবার অবকাশ পাইত না।

তিনি যে উদ্দেশ্য লইয়া স্বামীর মৃত্যুর পর সংসারে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহাও সফল হইত। অর্থই সকল অনর্থের মূল। সুরবালা স্থির করিলেন যেমন করিয়াই হোক এই অর্থ ত্যাগ করিতে হইবে। এই অর্থই পুত্রের মন হইতে মাতৃভক্তিটুকু একেবারে দূরীভূত করিয়া দিয়াছে।

এই সময় গ্রামে খুব জলকষ্ট। এই জলকষ্ট নিবারণের জন্য সুরবালা তাঁহার সঞ্চিত টাকা একটি বৃহৎ জলাশয়ের পঙ্কোদ্ধার ও উন্নতির জন্য দান করিয়া ফেলিলেন।

(৬)

কলিকাতায় থাকিয়া নীলরতন এ সংবাদ শুনিল। মাকে সে একখানিও পত্র লিখিল না।

এই সময় ললিতকে একদিন বাড়ীতে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। নীলরতন শুনিল—সে বিলাসপুরে ঠাকুরমার কাছেই গিয়াছে। ললিতকে আনিবার জন্য আর সে বিলাসপুরে যাইতে পারিল না। তাহাকে পাঠাইয়া দিবার জন্য মাকে পত্র লিখিতেও তাহার সাহস হইল না।

সুরবালা তাহার সঞ্চিত অর্থ দান করিয়া বুঝিলেন, এখন তিনি পুত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী নন। তিনি যে পুত্রের বিরোধী হইয়াছেন তাহার মূলে কোনোরূপ স্বার্থ নাই, সে বিরোধ ন্যায়, ধর্ম্ম ও মাতৃত্বের গৌরবের উপর প্রতিষ্ঠিত।

তিন মাস কাটিয়া গেল। একদিন হঠাৎ একখানা পত্র আসিল—"মা, আমার বড় অসুখ, ললিতকে পাঠাইয়া দাও।" সেই দিনই কলিকাতা হইতে প্রত্যাগত শ্যাম বসুর মুখে তিনি শুনিলেন—নীলরতন ভাল আছে। তিনি পত্র লিখিলেন—"যত অসুখই হোক, ললিত যাইবে না।" পুত্রের এই ব্যবহারে মায়ের মুখে হাসি দেখা দিল।

চতুর্থ মাসে পত্র আসিল—"মা, তোমার পুত্রবধুর বড় অসুখ, ললিতকে আনিতে পরশু লোক পাঠাইব।" মা লিখিলেন "লোক পাঠাইও না, ললিত যাইবে না।" পুত্র আজ তাঁহাকে ভয় করিয়া মিথ্যা কথা বলিতেছে দেখিয়া সুরবালা মনে মনে আনন্দিত হইলেন।

পঞ্চম মাসে পত্র আসিল "আমার শোচনীয় অবস্থা, মা ললিতকে লইয়া তুমিও এস, তাহা না হইলে বোধ হয় আর দেখা হইবে না।"

এ পত্রখানি সুরবালা কোনো মতেই অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। সকালে উঠিয়া তিনি ললিতকে বলিলেন "দেখ, নীলরতনের বড় অসুখ, একবার শ্যাম বাবুর কাছে খবর লইয়া আয় তো।" ললিত চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"না ঠাকুরমা, তাঁরা কোনো খবর জানেন না।"

সুরবালা চুপ করিয়া রহিলেন, তাঁহার মনের ভিতর কেবলি একটা সন্দেহ, একটা ভয় ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। দিনের বেলা একটার সময় তিনি ললিতকে একখানা ঠিকা গাড়ী ভাড়া করিতে বলিলেন।

ঠিকা গাড়ী আসিল, সুরবালা ললিতকে লইয়া গাড়ীতে উঠিলেন।

অনেকক্ষণ পরে গাড়ী কলিকাতার একটি দ্বিতল গৃহের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সুরবালা, ললিতকে লইয়া গৃহের সিঁড়ি দিয়া উঠিতে লাগিলেন।

একটি কক্ষে প্রবেশ করিয়া তিনি যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার বুক কাঁপিয়া লঠিল। তিনি দেখিলেন—একটি শয্যায় নীলরতন অচৈতন্যের মত পড়িয়া আছে। কিরণ[illegible] তাহাকে বাতাস করিতেছে। আজ হঠাৎ শাশুড়ীকে দেখিয়া তিনি চমকিয়া [illegible]লেন।

সুরবালা বলিলেন "[illegible] মা বস, নীলরতন আছে কেমন?"

কিরণশশী শাশুড়ীর চেয়েও একটু উচ্চ পদে থাকিতে চান, কিন্তু স্বামীর শয্যাপার্শ্বে হঠাৎ তাঁহাকে দেখিয়া তিনি আপনার লঘুতা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াই শয্যাতাগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু শাশুড়ী যখন কথা কহিল, তখন তিনি আপনার কল্পিত পদে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া খুব গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন "এখন মন্দের ভাল, একটু জাগিলেই বিকার দেখা দিবে।"

এই সময় মা মা বলিয়া নীলরতন কাঁদিয়া উঠিল। "এই যে বাবা" বলিয়া সুরবালা শশব্যস্তে পুত্রের চোখ মুছাইয়া দিলেন।

তারপর মা অনাহারে, অনিদ্রায় পুত্রের সেবা করিতে লাগিলেন। মান অপমানের দিকে তাঁহার দৃষ্টি রহিল না। সব কথা, সব ঘটনা ভুলিয়া তিনি পুত্রের মঙ্গলকামনায় অহরহ ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন, কিরণশশী কি করিতেছেন, কি ভাবিতেছেন, কোথাও তিনি তাঁহার অধীন হইয়া কাজ করিতেছেন কি না, এ সব ভাবনা ভাবিবার অবকাশ তাঁহার মোটেই রহিল না।

কিরণশশী বেশ বুঝিল, রুগ্ন পুত্রের শিয়রে মা যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন. তাহা খর্ব্ব করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু স্বামীর মারাত্মক রোগ, এ সময় কোনো প্রতীকারের উপায় যে একেবারেই নাই।

দিনকতক কাটিল। ডাক্তার বলিলেন—"ভয় অনেকটা কমিয়াছে, এখন ভগবান্ কি করেন।"

(৭)

প্রায় একমাস পরে জ্বর ছাড়িল, কিন্তু নীলরতনের দেহটিকে এত জীর্ণশীর্ণ করিয়া গেল যে আর তাহার নড়িবার ক্ষমতা রহিল না। দিনকতক পরে তাহাকে বসানো হইল, বোধ হইল যেন কোনো একটা জিনিষে দেহটিকে হেলাইয়া না রাখিলে তাহা নিঃসহায় ভাবে পড়িয়া যাইবে। তাহার প্রতি কথাটি যেন বহুকষ্টে পঞ্জরসার বুকের ভিতর হইতে বাহির হইতে লাগিল। মা তাহাকে কাছে লইয়া শিশুটির মত পালন করিতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ নীলরতন বহুকষ্টে একটু একটু চলিতে আরম্ভ করিল। কিছুদিন যাইলে সুরবালা বলিলেন "নীলরতন, চল এইবার বাড়ী যাই, এখানে জিনিসের দাম বড় বেশী, তোর চাকরী নেই, গ্রামের জলবাতাসও এখন ভাল।"

নীলরতন বলিল "হাঁ মা, তাই-ই চল।"

একটা শুভদিনে তাঁহারা সকলেই গ্রামের দিকে রওনা হইলেন।

নীলরতন যখন বাড়ী আসিল তখনো তাহার শরীর খুব দুর্ব্বল; লাঠিতে ভর দিয়া তাহাকে চলিতে হয়। রোগটা শুধু যে তাহার দেহটিকে ধ্বস্তবিধ্বস্ত করিয়াছিল তাহা নয়, তাহার অন্তরের দৃঢ় বন্ধন এমন শিথিল করিয়া দিয়াছিল, যে সামান্য একটা ভাবের আঘাতে তাহার প্রত্যেক কল্‌কব্‌জাটি সাড়া দিয়া উঠিত। কোনো একটা শব্দ হইলে সে তাহা সহিতে পারিত না। পাড়ার কোনো ছেলে কাঁদিয়া উঠিলে সে মনে একটা বেদনা অনুভব করিত। রাস্তার ধারে একটা অর্দ্ধমৃত বিড়ালকে দেখিয়া দুঃখে সে একদিন ভাল করিয়া আহার করে নাই। সন্ধ্যার পর যখন পাড়ার বৃদ্ধেরা খোল করতাল বাজাইয়া হরিসংকীর্ত্তন করিত তখন প্রায়ই তাহার চক্ষু দিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িত।

সে সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে লাঠি ধরিয়া আস্তে আস্তে একটা বটগাছের নীচে বাঁধানো বেদীর উপর উপবেশন করিত। পাখীরা মাথার উপর শিস্ দিতে দিতে এডাল হইতে ওডালে লাফাইয়া যাইত। দূরে রাস্তার উপর দুএকটা কুকুর নিঃশব্দে ছুটিয়া যাইত। পাশের জলা হইতে কৃষকের গান বাতাসে ভাসিয়া আসিত, গ্রামের লোকেরা প্রতি বুধ ও শনিবারে হাট করিয়া বাড়ী ফিরিত,—এই সব দেখিতে দেখিতে তাহার চোখে তন্দ্রার ঘোর ঘনাইয়া আসিত; তারপর সন্ধ্যার অন্ধকার যখন আকাশের পূর্ব্বসীমা হইতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইত, তখন নীলরতন লাঠি ধরিয়া আবার গৃহের দিকে ফিরিত।

শীতের পর সবেমাত্র বসন্তের বাতাস বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। অপরাহ্নের

রৌদ্র পৃথিবী ছাড়িয়া তরুশিরে আসিয়া লাগিল। এমন সময় সুরবালা ডাকিলেন "নীলরতন, তুই তালের ফোঁপর খাবি বলিয়াছিলি, অনেক তালের আঁটি আছে আয়।" একটি বাটি লইয়া মায়ের কথায় নীলরতন শিশুটির মত উঠানে একখানা কাষ্ঠখণ্ডের উপর উপবেশন করিল। মা এক একটি আঁটি কাটিয়া ফোঁপরগুলি পুত্রের বাটিতে দিতে লাগিলেন।

শীতের মারণের পর বিশ্ব জাগিয়া উঠিয়াছে। শুধু জাগিয়া উঠে নাই, তাহার প্রতি অঙ্গে হর্ষের স্পন্দন। উঠানের প্রান্তে সজিনা গাছটি ফুলে ভরিয়া উঠিয়াছে। আম্রমুকুলের সৌরভে বাতাস ভরপুর। কোথাও নিদ্রা নাই, সমস্ত গ্লানি, সমস্ত কালিমা মুছিয়া গিয়াছে। বিশ্বলক্ষ্মী আজ নূতন মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়াছেন।

এতদিন যাহা ভিন্ন ছিল আজ তাহা জোড়া লাগিয়াছে। শাখাচ্যুত লতিকাটি আজ আবার তরুকে আলিঙ্গন করিয়াছে। চারিদিকে মহামিলনের গান। দ্বন্দ্ব নাই, দ্বিধা নাই, চারিদিকে একটা শান্তির আলোক, প্রণয়ের আকর্ষণ,—মানুষের প্রাণও সেই আকর্ষণে বিশপুলকে মগ্ন।

শীর্ণ প্রৌঢ় সন্তান নিঃসহায় বালকের মত মায়ের মুখ চাহিয়া বসিয়া আছে, মা তালের আঁটি কাটিতেছেন, তাঁহার মস্তকে আবরণ নাই, রুক্ষ কেশ স্কন্ধে মুখে চোখে ছড়াইয়া পড়িতেছে,তাহার কতকগুলি সাদা কতকগুলি কালো। মাতৃত্বের মহিমা তাঁহার মুখখানিতে যে আলোক আনিয়া দিতেছিল,নীলরতন তাহা দেখিল, আবার দেখিল, আহারের কথা তাহার মনে আসিল না। তাহার বোধ হইল, সে যেন এমন একটা জায়গায় আসিয়াছে যেখানে সংসারের প্রভুত্ব নাই,যেখান হইতে সর্ব্বপ্রকার বিরোধ-কলহ অন্তর্হিত হইয়াছে, যেখানে কেবলি স্নেহপ্রেমের অনাবিল নির্ঝরের ধারা ভিন্ন আর কিছুই নাই। সন্ধ্যার ছায়া একটু একটু করিয়া নামিয়া আসিতেছিল। বোধ হইল, বিশ্ব যেন শূন্য হইয়া আসিতেছে, ক্রমশঃ যেন সমস্ত জিনিস আর দেখা যাইতেছে না। সব নীরব,সকলি অদৃশ্য,সকলি মহাশূন্যে বিলীন হইয়া যাইতেছে,গ্রাম নাই,পুষ্করিণী নাই,গৃহ নাই,গৃহিনী নাই,কিছুই নাই—আছে কেবল একটি রিক্ত নিঃসম্বল স্নেহময়ী মা—বিশ্বের সকল আলো যেন তাহার মস্তকের জোতির্ম্মণ্ডল নির্ম্মাণ করিয়াছে, আর আছে একটি জীর্ণশীর্ণ অক্ষম সন্তান, মা ছাড়া তাহাকে দেখিবার আর কেহই নাই। নীলরতন নির্ব্বাক নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া রহিল।

মা বলিলেন "কই, খাইতেছিস্ না কেন?"

নীলরতনের চক্ষু দিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

মা বিস্মিত হইয়া মাটিতে কাটারি রাখিলেন, বলিলেন "তুই কাঁদিতেছিস্ কেন ?"

নীলরতন বালকের মত কাঁদিয়া মায়ের পাদুটি জড়াইয়া ধরিল।

"কেন বাবা, কেন, কি হইয়াছে ?" বলিয়া মা উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

কোনো কথা আজ তাহার মুখে আসিল না ; কেবল একটা রুদ্ধ আবেগে হৃদয় মুহুর্মুহু কাঁপিতে লাগিল।

শ্রীসুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বনদেবী।

(১)

দ্বিরদরদখচিত—সিংহ-আসনে বসি আমি দিবানিশি,
ঘন বৃংহন স্বনে, নকীব ফুকারে কাঁপাইয়া দশদিশি ;
শিখিরপুচ্ছে সুশোভিত রাজছত্র চন্দ্র-আতপ খচিত শ্যামল পত্র
বৈতালি' পিক-বিস্তৃত অহোরাত্র, পথে পথে পাতা বৃষ্টি ;
আলোকে গীতে ও গানে রাজপুরী মম নিশিদিন হয় সৃষ্টি !

(২)

স্থাপিত তোরণদ্বারে নারিকেল ঘট, দুলিছে আম্রশাখা ;
ধান্য-দুর্ব্বাদলে নিয়ত রচিত অর্ঘ্য মিনতি-মাখা।
শত নির্ঝরে অঙ্কিত আলিপন চামর ঢুলায় চমরীরা আজীবন
চন্দন করে সৌরভ বিকীরণ, তালবীথি করে পাখা,
আশ্রম-মৃগদল দূত সম ফিরে কত-না বর্ণে আঁকা।

(৩)

বারণ-যুথ-শোভন সুচারু তোরণ মোহন পুষ্পহারে,
পটিত দিগ্‌দিগন্তে কান্ত পতাকা বিহগ-পক্ষ ভারে।
বংশ-রন্ধ্রে সমীরিত প্রেম-গীতি চরণ নিম্নে নবীন শস্প-বীথি
চন্দ্রিকা রচে' কোমল শয্যা নিতি আলো ও অন্ধকারে,
স্বপ্নে আমার হাসি ফুল হয়ে ফোটে যথা তথা চারিধারে।

(৪)

পুষ্পপরাগরেণু দিঠি সম উড়ে খুঁজিয়া খুঁজিয়া কা'রে,
সঞ্চিত গাঢ় প্রীতি পরিচয় মোর প্রকাশে গন্ধভারে ;
প্রেমগৌরবে দেহ সৌরভে ধূপ দেবতার লাগি মরিতেছে অপরূপ !
মরি লজ্জায়, যেন প্রতি লোমকূপ ফুটে কদম্বহারে,
ধূপের আত্মত্যাগে ভুলাইতে চায় আপনার ভাবনারে।

(৫)

আজ্ঞা অপেক্ষিছে অরণি-সেনানী দীপ্ত ও তেজীয়ান্,
ভস্ম করিবে শত্রু জ্বালিয়া রুদ্র দাবানল লেলিহান্ !
ঝঞ্ঝার ভেরি বাজে গম্ভীর রবে, প্রস্তর শিলা উড়ায়ে যুদ্ধ হবে—
মন্দুরা ত্যজি হ্রেষি' বাজী-রাজি সবে হবে বনে আগুয়ান্,
ইঙ্গিতে মম পাশে—মৃত্যু দাঁড়াবে ভীম বলে বলীয়ান্।

(৬)

বন্দী উরগগণ বিবর-কারায় ফেলিছে দীর্ঘশ্বাস,
নর্ত্তকী শিখিদল কলাপ মেলিয়া নাচে তারা বার'মাস !
বনপথখানি চকিত নগরপাল সভাসদ মম সুমধুর সুরসাল,
শরীররক্ষী দীর্ঘ বিশাল শাল অনলস মম পাশ—
প্রসাধনকারী মম ষড় ঋতু আসে লয়ে শোভা-সাজ রাশ।

(৭)

শক্তির ভাণ্ডার ফিরে গণ্ডার সুকঠিন দ্বাররক্ষ ;
নির্ম্মিছে মধুচক্র অক্লান্ত' শ্রমে মধুমক্ষিকা লক্ষ।
শুষ্ক পত্র সম খসে' যায় জরা, মধুযৌবনে দেহ-নবরূপ ভরা ;
শান্ত শীতল ছায়া দেয় তাপহরা কাল' মম আঁখি-পক্ষ ;
রচিত অশথতলে অতিথির তরে শ্রান্তি-বিনোদ কক্ষ।

(৮)

নভ কুঞ্জরগণ হৈমকুম্ভে করায় আমারে স্নান ;
নির্ম্মল মম সীঁথে' সন্ধ্যা উষায় সিন্দুর করে দান।
দেবতা অতিথি আসে হেথা কতজন নল দাশরথি দীন পাণ্ডবগণ
মোর বোধিতলে করেছিলা অর্জ্জন বুদ্ধ সুনির্ব্বাণ্ ;
রিক্ত সকল-হারা সকলেরে আমি সমাদরে দিই স্থান।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

নিদর্শন

বর্ত্তমান সমস্যা।

সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস যে, কথার চাইতে কাজ শ্রেষ্ঠ। এ বিশ্বাস বৈষয়িক হিসাবে সত্য এবং আধ্যাত্মিক হিসাবে মিথ্যা। মানুষমাত্রেই নৈসর্গিক প্রবৃত্তির বলে সংসার যাত্রার উপযোগী সকল কার্য্য করতে পারে; কিন্তু তার অতিরিক্ত কর্ম্ম, যার ফল একে নয়, দশে লাভ করে, তা' করবার জন্য মনোবল আবশ্যক। সমাজে সাহিত্যে যা' কিছু মহৎ কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়েছে, তার মূলে মন পদার্থটি বিদ্যমান। যা' মনে ধরা পড়ে তাই প্রথমে কথায় প্রকাশ পায়, সেই কথা অবশেষে কার্য্যরূপে পরিণত হয়, কথার সূক্ষ্ম শরীর কার্য্যরূপ স্থূল দেহ ধারণ করে। আগে দেহটি গড়ে' নিয়ে পরে তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টাটি একেবারেই বৃথা। কিন্তু আমরা রাজনীতি, সমাজ-নীতি, ধর্ম্ম, সাহিত্য, সকল ক্ষেত্রেই ইউরোপীয় সভ্যতার প্রাণের সন্ধান না করে, শুধু তার দেহটি আয়ত্ত করবার চেষ্টা করায় নিত্যই ই ভ্রষ্ট স্ততোনষ্ট হচ্ছি। প্রাণ নিজের দেহ নিজের রূপ নিজেই গড়ে নেয়। নিজের ‌ হিত প্রাণ-শক্তির বলেই বীজ ক্রমে বৃক্ষরূপ ধারণ করে। সুতরাং আমরা যদি ইউরোপীয় সভ্যতার প্রাণে প্রাণবন্ত হয়ে উঠ্‌তে পারি, তা' হলেই আমাদের সমাজ নব কলেবর ধারণ কর্‌বে। আমরা যে ইউরোপীয় সভ্যতা কথাতেও তর্জ্জমা করতে পারি নি, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই যে, আমাদের নূতন শিক্ষালব্ধ মনোভাব সকল, শিক্ষিত লোকদেরই রসনা আশ্রয় করে রয়েছে, সমগ্র জাতির মনে স্থান পায় নি। আমরা ইংরেজি ভাব ভাষায় তর্জ্জমা করতে পারিনি বলেই, আমাদের কথা দেশের লোকে বোঝে না,—বোঝে শুধু ইংরেজি-শিক্ষিত লোকে। এ দেশের জন-সাধারণের নেবার ক্ষমতা কিছু কম নয়, কিন্তু আমাদের কাছ থেকে তারা যে কিছু পায় না, তার একমাত্র কারণ আমাদের অন্যকে দেবার মত কিছু নেই—আমাদের নিজস্ব বলে' কোন পদার্থ নেই—আমরা পরের সোণা কানে দিয়ে অহঙ্কারে মাটিতে পা দিইনে। অপর পক্ষে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষদের দেবার মত ধন ছিল, তাই তাঁদের মনোভাব নিয়ে আজও সমগ্র জাতি ধনী হয়ে আছে। ঋষি-বাক্য সকল লোকমুখে এমনি সুন্দর ভাবে তর্জ্জমা হয়ে গেছে, যে তা' আর তর্জ্জমা বলে কেউ বুঝতে পারে না। এ দেশের অশিক্ষিত লোকের রচিত বাউলের গান কাউকে আর উপনিষদের ভাষায় অনুবাদ করে' বোঝাতে হয় না, অথচ একই মনোভাব ভাষান্তরে বাউলের গানে এবং উপনিষদে দেখা দেয়। আত্মা যেমন এক দেহ ত্যাগ করে' অপর দেহ গ্রহণ করলে, পূর্ব্বদেহের স্মৃতিমাত্রও রক্ষা করে না, মনোভাবও যদি তেমনি এক ভাষার দেহ ত্যাগ করে' অপর একটি দেহ অবলম্বন করে, তা হলেই সেটি যথার্থ অনূদিত হয়।

("ভারতী", মাঘ,

ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ ।

অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত এ কালের বঙ্গদেশের কোন অংশ গৌড় নাম পায় নাই। অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগেও যে গৌড় দেশ মগধের উত্তরে ছিল, এবং ঐ দেশ বঙ্গ হইতে বিশেষ ভাবে স্বতন্ত্র ছিল, তাহা কবি বাক্‌পতির "গৌড়বহ" কাব্য হইতে ধরিতে পারা যায়। মৎস্য পুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজা যুবনাশ্বের পুত্র শ্রাবস্ত গৌড়দেশে শ্রাবস্তী নগর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ঐ বর্ণনার সময়ে কোশলের উত্তরে এবং মিথিলার উত্তর-পশ্চিমে গৌড়দেশের স্থিতি ছিল। এই জন্য সার রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকরের অনুমান খুব সুসঙ্গত বলিয়া মনে হয় যে, অযোধ্যা প্রদেশের গণ্ডা নগরীর নাম প্রাচীন গৌড় নামের অপভ্রংশ। যে সারস্বত ব্রাহ্মণেরা প্রধানতঃ গৌড় ব্রাহ্মণ বলিয়া আখ্যাত, তাঁহাদের প্রাচীন স্থিতি অযোধ্যা হইতে থানেশ্বর পর্য্যন্ত প্রথমতঃ বিস্তার লাভ করিয়াছিল। প্রাচীন গৌড়দেশ হারাইয়া যে রাজবংশ তাঁহাদের নূতন রাজ্যকে গৌড় নামে অভিহিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কথা কেবল বঙ্গভুক্ত গৌড়ের ক্ষুদ্র সীমায় আলোচনা করিলে চলিবে না। এই রাজাদিগের উৎপত্তি যে গুর্জ্জর জাতি হইতে, ইতিহাসে সে কথা খুব বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিবার প্রয়োজন আছে।

("প্রবাসী," মাঘ,
শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার)।

দরিদ্রের গৌরব।

মানবজাতির সুখ সৌভাগ্য, জ্ঞান সম্ভার, সমস্তের ভিত্তি গরীবের অশ্রুবিন্দু ও রক্তবিন্দুর উপর প্রতিষ্ঠিত। মনুষ্যের হৃদয়-রাজ্যের উৎকর্ষ বিধানের জন্য গরীবের একান্ত প্রয়োজন, সুতরাং গরীব ধর্ম্মকর্ম্মের সহায়। আমরা অকৃতজ্ঞ বলিয়া, সামান্য দানে গরীবের নিকট যে মহামূল্য প্রতিদান পাই, তাহা ভাবিয়া দেখি না। তাহারা না হইলে ধনীর দিন চলে না। মেথরাণী চাকরাণী আছে বলিয়াই তুমি রাজরাণী হইতে পারিয়াছ, নতুবা যে তোমাকেই মেথরাণী চাকরাণী হইতে হইত। সমাজ সংস্থানে দরিদ্র ও দারিদ্র্যের প্রয়োজন আছে। অভাব হইতে উন্নতি এবং উন্নতি হইতে অভাব মোচনের চেষ্টা চক্রাকারে ঘুরিয়া জগৎ-শৃঙ্খলা রক্ষা করে। বীজকে বিনষ্ট করিয়া অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, সেই অঙ্কুর হইতে আবার বীজ উৎপন্ন হয়, এই বিধানেই সৃষ্টি রক্ষা পাইতেছে। দরিদ্র হইতে ধনীর সুখ, ধনীর দ্বারা দরিদ্রের দুঃখমোচনের চেষ্টা, ইহাই জগতের স্থিতি ও উন্নতির মূল। যে দরিদ্রকে দরিদ্র ভাবিয়া তুচ্ছ করে অথবা নিরাশ্রয় দরিদ্রকে উৎপীড়ন করে, সে কেবল অকৃতজ্ঞ নহে, সে দেবতা কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হয়—কেননা সে তাহার হৃদয়রাজ্য সুঠাম করিবার জন্য বিধিদত্ত উপাদানকে পদদলিত করে।

("নব্যভারত," মাঘ,
শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ)।

রথযাত্রা।

মৎস্য ও একাম্র পুরাণ হইতে চৈত্রমাসে শিবের রথযাত্রা, স্বয়ম্ভূপুরাণে চৈত্রমাসে নেপালের স্বয়ম্ভূনাথে বুদ্ধের রথযাত্রা, এবং জৈন ধর্ম্মগ্রন্থে চাতুর্ম্মাস্যের পর মার্গশীর্ষে তীর্থঙ্কর গণের রথযাত্রার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। এক্ষণে আষাঢ় মাসের শুক্লা দ্বিতীয়াতে জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা হইয়া থাকে, কিন্তু পদ্ম, বরাহ ও ভবিষ্যোত্তর পুরাণ হইতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, এক সময়ে রাসযাত্রার পূর্ব্বে কার্ত্তিক মাসে শ্রীকৃষ্ণের রথযাত্রা হইত। এই সময়েই শাক্ত সমাজে দেবীর রথযাত্রা প্রচলিত ছিল। দেবীপুরাণের উনচল্লিশ সংখ্যক অধ্যায় পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, প্রথমে রথের পূজা করিয়া, তৎপরে তন্মধ্যে মহিষাসুর-ঘাতিনী সিংহবাহিনী দুর্গা-প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করা হইত। সকল সম্প্রদায়ের রথ-যাত্রাতত্ত্ব আলোচনা করিলে আধ্যাত্মিক ও লৌকিক এই দুই দিক পাওয়া যায়। শাস্ত্রের উপদেশ এই যে আত্মাকে রথী, শরীরকে রথ, বুদ্ধিকে সারথি, মনকে প্রগ্রহ ও ইন্দ্রিয়গণকে অশ্ব বলিয়া জানিবে।

("ব্রহ্মবিদ্যা", মাঘ,
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব)।

বাল্য-স্মৃতি।

আমরা শৈশবে অনেক সময়েই বালক বেশে কাছারী বাড়ীতে সরকারের নিকট পড়িতে যাইতাম। পিতৃদেব ছুতার মিস্ত্রি দ্বারা বার স্বর ও ছত্রিশ ব্যঞ্জন বর্ণ খোদিত করিয়া অক্ষর পরিচয় করাইয়াছিলেন। পাঠশালায় যাইবার রীতি ছিল না। গ্রাম্য কালীবাড়ীর স্কুলে বালকগণ পড়িতে যাইত। আমরা প্রাতে একবার তালপাতায় লেখা শিখিতাম ও দাতা-কর্ণের উপাখ্যান প্রভৃতি পড়িতাম। তাহার পর সমস্ত সময় গৃহকার্য্য শিক্ষা করিতাম। সর্ব্বাগ্রে শিব গড়া ও দেবার্চ্চনার আয়োজন নির্ভুলভাবে শিখিতে হইত, সঙ্গে সঙ্গে রন্ধন, পরিবেষণ ও শিল্পকার্য্য শিক্ষা হইত। পাথরে ছাঁচ কাটা, শিকা তৈয়ারি, কাঁথা সিলাই, নারিকেলের চিড়ে, ধানের মালা, কঙ্কণ, নানাপ্রকার আলিপনা, শুভকার্য্যে পিঁড়ি চিত্র, পঞ্চরঙ্গের গালিচা প্রভৃতি সৌখীন শিল্প শিক্ষা দিতে, পরিপক্ক গৃহিণীরাই গুরুগিরি করিতেন। যে বালিকা শ্বশুরালয়ে গিয়া সুন্দররূপে শিব গড়িতে পারিত না, সে "ম্লেচ্ছকন্যা" নামে অভিহিতা হইত। সমারোহের বিবাহ সভায় শিল্পনিপুণা মহিলাগণ কর্তৃক পঞ্চবর্ণের বিচিত্র গালিচায় বসিতে যাইয়া যখন দলে দলে বরযাত্রী অপ্রস্তুত হইয়া হাসির তরঙ্গ তুলিতেন, তখন গৃহিণীদের প্রশংসাধ্বনিতে আসর মুখরিত হইয়া উঠিত।

("সুপ্রভাত," মাঘ,
শ্রীমতী প্রসন্নময়ীদেবী।)

ভারতীয় রসায়ন।

তান্ত্রিক যুগে ভারতের প্রাচীন রসায়নের পূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল। নাগার্জ্জুনের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া তির্য্যকপাতন, ঊর্দ্ধপাতন, অধঃপাতন, ধাতুর শোধন, জারণ, মারণ প্রভৃতি বিবিধ প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হইয়াছিল। কজ্জলী (ব্লাক সালফাইড অফ মার্কারি), রসসিন্দুর (রেড সালফাইড অফ মার্কারি), রসকর্পূর (কেলোমেল), পুটিত লৌহ (ফেরিক অক্সাইড), হরিতাল ভস্ম (আর্সেনাইট অফ পটাশ) প্রভৃতি বিবিধ যৌগিক (compound) এই সময়ে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। সর্ব্বজারণ (নাইট্রো-হাইড্রোক্লোরিক এসিড), গন্ধকাম্ল (সালফ্যুরিক এসিড) প্রভৃতি অজৈব অম্ল সেই সময়ে ঔষধার্থ সেবিত হইত। জৈব অম্লের মধ্যে এক ধান্যাম্ল (Vinogar) ভিন্ন অন্য অম্ল আবিষ্কৃত হয় নাই। কোন কোন বিষয়ে ভারতের রসায়ন জ্ঞান সমসাময়িক ইউরোপীয় রাসায়নিক জ্ঞানের অপেক্ষা উন্নত ছিল।

("ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন", পৌষ,
শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী)।

সাহিত্যে Parody.

Parody হচ্চে সাহিত্যে মুখ ভেংচান। Parody নিয়ে যে নাটক হয় না, তার কারণ দু'ঘণ্টা ধরে লোকে একটানা মুখ ভেংচে যেতে পারে না ; আর যদিও কেউ পারে ত' দর্শকের পক্ষে অসহ্য হয়ে ওঠে। হঠাৎ এক মুহূর্ত্তের জন্য দেখা দেয় বলেই এবং তার কোন মানে নেই বলেই মানুষের মুখ-ভেংচানি দেখে হাসি পায়। সুতরাং ভেংচানির মধ্যে দর্শন, বিজ্ঞান, সুনীতি, সুরুচি প্রভৃতি জিনিস পুরে দিতে গেলে ব্যাপারটা মানুষের পক্ষে রুচিকর হয় না।... মানুষ আসলে দুটি কার্য্য করতেই জানে—সে হচ্চে হাসি আর কান্না। আমরা সকলে নিজে হাসতেও জানি. কাঁদতেও জানি, কিন্তু সকলেরই কিছু আর অপরকে হাসাবার কিংবা কাঁদাবার শক্তি নাই। অবশ্য অপরকে চপেটাঘাত করে কাঁদানো কিংবা কাতুকুতু দিয়ে হাসানো, আমাদের সবারই আয়ত্ত, কিন্তু সরস্বতীর বীণার সাহায্যে কেবল দুটি চারটি লোকেই ঐ কার্য্য করতে পারেন। যাঁদের সে ভগবৎদত্ত ক্ষমতা আছে, তাঁদেরি আমরা কবি বলে মেনে নেই। কাব্যে, আমার মতে, শুধু তিনটি মাত্র রস আছে ; করুণ রস, হাস্য-রস. আর হাসি-কান্না-মিশ্রিত মধুর রস। সাহিত্যে যে কেবল আমাদের মিষ্টি হাসিই হাসতে হবে, একথা আমি মানি নে, কাব্যে বিদ্রূপের হাসিরও ন্যায্য স্থান আছে। উপহাস জিনিষটার প্রাণই হচ্চে হাসি। হাসি বাদ দিলে তার উপ্‌টুকু থাকে, কিন্তু তার রূপটুকু থাকে না। হাসতে হলেই আমরা অল্পবিস্তর দন্তবিকাশ করতে বাধ্য হই—কিন্তু দন্তবিকাশ করলেও যে সে ব্যাপারটা হাসি হয়ে ওঠে তা নয়, দাতখিঁচুনি বলেও পৃথিবীতে একটা জিনিষ আছে। সে ক্রিয়াটি যে ঠিক হাসি নয়, বরং তার উল্টো, জীবজগতে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আছে। সুতরাং উপহাস জিনিষটা সাহিত্যে চল্‌লেও কেবলমাত্র তার মুখভঙ্গীটি সাহিত্যে

চলে না। কোন জিনিষ দেখে যদি আমাদের হাসি পায়, তা হলে আমরা অপরকে হাসাতে পারি। কিন্তু কেবলমাত্র যদি রাগই হয়, তা হলে সেই মনোভাব হাসির ছদ্মবেশ পরিয়ে প্রকাশ করলে, দর্শকমণ্ডলীকে শুধু রাগাতেই পারি। "আনন্দ-বিদায়" নামক parody রচনাকালে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এই কথাটী মনে রাখলে, লোককে হাসাতে গিয়ে রাগাতেন না।

("সাহিত্য," মাঘ,
শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী)।

সাহিত্যে ধনীর আনুকূল্য।

ইংরাজী সাহিত্যের ঐতিহাসিক টেন লিখিয়াছেন, সাহিত্য ক্রমে পাঠকসম্প্রদায়ের রুচি অনুসারে গঠিত হয়। সেক্‌সপীয়ারের নাটকে সমসাময়িক ইংরাজ সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয় আছে, ভারতচন্দ্রের কাব্যে মুসলমান শাসনের অবসানকালে বাঙ্গালার বিলাসী সমাজের বিলাসের চিত্র দেখা যায়। কিন্তু সকল দেশে ও সকল সমাজেই লেখকগণের আবির্ভাব পাঠকের আবির্ভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী—রচনা পাঠক-সম্প্রদায় সংগঠিত করে। তাহার পূর্ব্বে অনেক স্থলে কমলার বরপুত্রগণ বাণীর সেবকদিগের সাহায্য করিয়াছেন। বাঙ্গালার বিদ্যাপতি হইতে ভারতচন্দ্র পর্য্যন্ত রাজসভায় থাকিয়া, রাজানুগ্রহে দারিদ্র্যদংশন মুক্ত হইয়া, কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন। মাইকেল মধুসূদন পাইকপাড়ার রাজাদিগের ও মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সাহায্য পাইয়াছিলেন। বর্দ্ধমানের মহারাজা মহাতাপচাঁদ বাহাদুর মহাভারতের ও রামায়ণের এবং সুপ্রসিদ্ধ কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাভারতের যে অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন তাহাতে এবং রাজা রাধাকান্ত দেবের শব্দকল্পদ্রুম সঙ্কলনে, এইরূপ সাহিত্যানুকূল্য প্রকাশ পাইয়াছিল। ইংরাজী সাহিত্যে জনসনের অভিধান প্রকাশ হইতে এইরূপ সাহিত্যানুকূল্যের শেষ। বাঙ্গালার যেরূপ শিক্ষাবিস্তার হইয়াছে ও বাঙ্গালার পাঠক সম্প্রদায় যেরূপ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে, তাহাতে আমরা আশা করিতে পারি, যে আমাদের সাহিত্যে আর ধনীর আনুকূল্যের প্রয়োজন নাই। কিন্তু এখনও বোধ হইতেছে বাঙ্গালা সাহিত্যে সে আনুকূল্য প্রদানের অবকাশ আছে। বাঙ্গালার ইতিহাস উদ্ধারকল্পে সমগ্র বাঙ্গালীর যে ব্যয়ভার বহন করিবার কথা, সেই ব্যয়ভার কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় বহন করিতেছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠায় কাশীমবাজারের মহারাজা বাহাদুরের ও লালগোলার রাজা বাহাদুরের সাহায্য স্মরণীয়। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বহু সাহিত্য-সেবকের আশ্রয়। ইহা বাঙ্গালীর পক্ষে কলঙ্কের কথা হইতে পারে, কিন্তু এ সত্য গোপন করিবার উপায় নাই। সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠা ও পরিপোষণে স্বর্গীয় রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের কীর্ত্তিও স্মরণীয়।

("আর্য্যাবর্ত্ত," পৌষ,
শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ)।

সাহিত্যে দুর্নীতি।

নীতি অর্থাৎ যুগবিশেষে প্রচলিত রীতির ধর্ম্মই হচ্চে মানুষকে বাঁধা; কিন্তু সাহিত্যের ধর্ম্ম হচ্ছে মানুষকে মুক্তি দেওয়া। কাযেই পরস্পরের সঙ্গে দা কুমড়োর সম্পর্ক। ধর্ম্ম ও নীতির দোহাই দিয়েই মুসলমানেরা আলেকজণ্ড্রিয়ার লাইব্রেরি ভস্মসাৎ করেছিল। নীতিরও একটা বোকামি, গোঁড়ামি এবং গুণ্ডামি আছে—ধর্ম্ম ও নীতির নামে মানুষকে মানুষ যত কষ্ট দিয়েছে, যত গর্হিত কার্য্য করেছে, এমন বোধ হয় আর কিছুরই সাহায্যে করে নি। এ যুগ অবশ্য নীতি-বীরদের বাহুবলের এক্তিয়ার হতে আমরা বেরিয়ে গেছি, কিন্তু সুনীতির গোয়েন্দারা আজও সাহিত্যকে চোখে চোখে রাখেন এবং কারও লেখায় কোন ছিদ্র পেলেই সমাজের কাছে লেখককে ধরিয়ে দিতে উৎসুক হন। কাব্যামৃত-রসাস্বাদ করা এক, কাব্যের ছিদ্রান্বেষণ করা আর। শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী কবিতার রূপকমাত্র, কারণ সে বাঁশীর ধর্ম্মই এই যে, তা "মনের আকূতি বেকত করিতে কত না সন্ধান জানে।" ছিদ্রান্বেষী নীতিধর্ম্মীদের হাতে পড়লে সে বাঁশীর ফুটোগুলো যে তাঁরা বুজিয়ে দিতে চেষ্টা করবেন, তাতে আর সন্দেহ কি? এক শ্রেণীর লোক চিরকালই এই চেষ্টা করে অকৃতকার্য্য হয়েছেন; কারণ সে ছিদ্র স্বয়ং ভগবানের হাতে করা বিঁদ, তাকে নিরেট করে দেবার ক্ষমতা মানুষের হাতে নেই।

("সাহিত্য," মাঘ,
শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী)।

শ্রীগৌরহরি সেন।

অকাল বর্ষায়।

ফাগুন প্রভাতে অসময়ে ওরে—
বাদল নেমেছে আজ;
কি জানি কি দেখে ধরণীরাণীর—
নয়নে লাগিল লাজ,—
কটিতট হ'তে করি আহরণ
আঁচলে অঙ্গ করে আবরণ,
ভরা যৌবন লেপি কেনী দিল—
মেঘপাংশুল সাজ?
ফাগুনপ্রভাতে অসময়ে কেন
বাদল নামিল আজ!

সিক্ত দোয়েল আম্রশাখায়
বসে আছে যেন আঁকা।
বসন্ত কোথা ভিজিছে কে জানে
গুটায়ে স্বর্ণপাখা।
ভুলে ডেকে উঠে পিক গেল থেমে,
শিস্ দিয়ে উড়ে ফিঙে এল নেমে,
মেঘঅঞ্জনে স্নিগ্ধনয়ন
পাপিয়া ছেড়েছে ডাকা।
বসন্ত ঝুরে মেঘপিঞ্জরে—
গুটায়ে স্বর্ণপাখা।
পাতার কুঞ্জে ঘুমায় এখনো
গোলাপ, যুথিকা, বেলা ;—
দখিনা বাতাস কহে নাই কানে
হয়েছে এত যে বেলা।
কাল এসেছিল ফাগুনসন্ধ্যা,
ফুটেছিল তাই রজনীগন্ধা,—
আজ তারে ল'য়ে বাদল বাতাস
কোরে যায় হেলাফেলা।
কে দেখে বাদলে বুক ছেপে তার
নীরবে অশ্রু ঢালা!
ফাগুন প্রভাতে অসময়ে ওরে
বাদল নামিল আজ,—
খেয়ালে ছিলাম, সহসা ধ্রুপদ
বাজিল প্রাণের মাঝ।
এই বিশ্বের কারখানা মাঝে
ছুটির ঘণ্টা মেঘে মেঘে বাজে ;
ছুটি, আজ ছুটি! চিরন্তরে কিরে
বন্দ হইল কাজ!
অসময়ে ওই আশার অতীত
বাদল নামিল আজ।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

রাণী গুম্ফা—উদয়গিরি—উড়িষ্যা।   ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে গৃহীত।
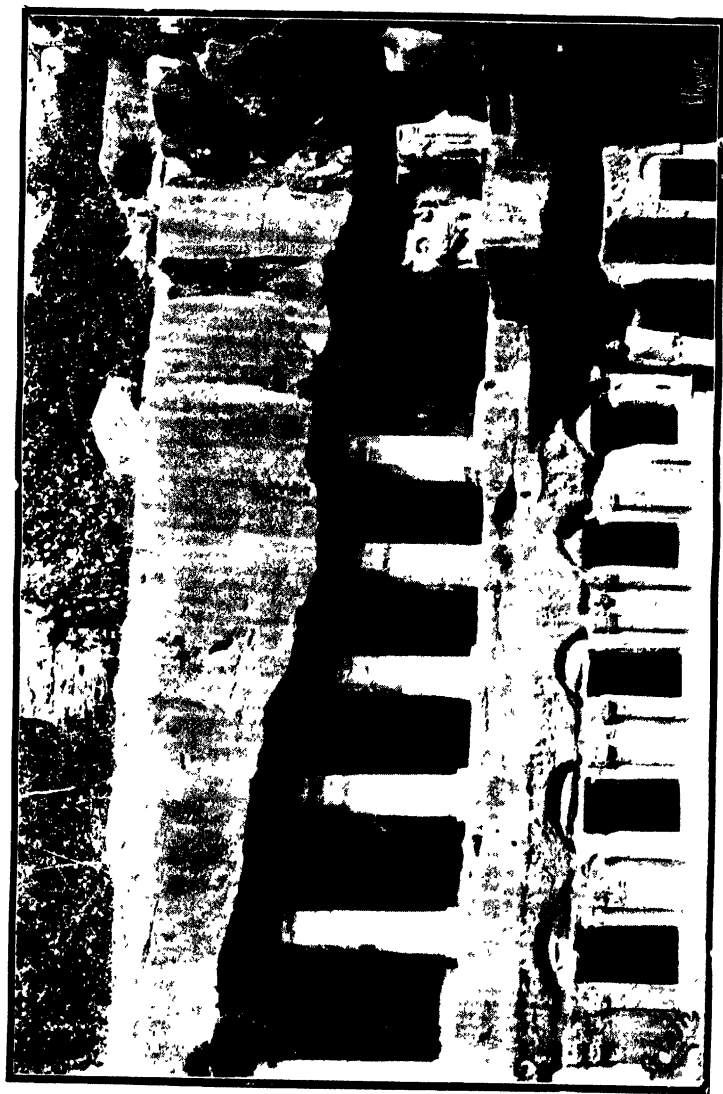
মানসী

৫ম বর্ষ চৈত্র, ১৩১৯ ২য় সংখ্যা

ভারতশিল্পের বর্ণপরিচয়।

(১)

ভারতশিল্পের "বর্ণপরিচয়" হারাইয়া গিয়াছে। যাহা আছে, তাহা "চারুপাঠ" ;—সুন্দর, কিন্তু অনির্ব্বচনীয়ের আধার। ইতিহাস না থাকায়, তাহার ক্রম-বিকাশের পরিচয় লাভের উপায় নাই। যাহা আছে, তাহা কাহার পরিণতি? তাহার রহস্যভেদ করা অসম্ভব। তথাপি ভারত-শিল্পের সৌন্দর্য্য-মোহ ধীরে ধীরে সভ্যসমাজকে মন্ত্রমুগ্ধ করিতেছে। যাহারা এক সময়ে কেবল উপহাস করিত তাহারাও উপাসনা করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

"সৌন্দর্য্য, সৌন্দর্য্য।"

বন্ধু বলিলেন,—"সৌন্দর্য্য সৌন্দর্য্য।"

"যাহারা সৌন্দর্য্যের প্রকৃত উপাসক, তাহারা ইতিহাস ধরিয়া, সন তারিখ গণিয়া, সৌন্দর্য্য-সম্ভোগ করিবার জন্য অপেক্ষা করে না। আকাশ কত সুন্দর। মেঘমুক্ত সুনীল গগনের পূর্ণচন্দ্র কত সুন্দর। প্রভাত-শিশিরের মুক্তাধারা-বিধৌত দুর্ব্বাদল কত সুন্দর। জগতে যাহা কিছু সুন্দর, তাহার একটিরও ক্রম-বিকাশের ইতিহাস জানি না। জানি না বলিয়া, সৌন্দর্য্য সম্ভোগের বাধা হয় কি? ভারত-শিল্পের পক্ষে বাধা হইবে কেন?"

বন্ধু যখন এই সকল তর্ক তুলিয়া ব্যতিব্যস্ত করেন, তখন তাঁহাকে বুঝাইবার উপযুক্ত ভাষা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আহা! আহা! মরি! মরি!

করা সহজ। কিন্তু তাহা অনেক স্থলেই অজ্ঞতার নামান্তর মাত্র,—না বুঝিয়া বুঝিবার ভাণ করা,—সেরূপ সমালোচনা সমালোচককে বা সমালোচ্য বস্তুকে—কাহাকেও প্রকৃত গৌরব দান করিতে পারে না। সহজ বলিয়াই সর্ব্বত্র তাহার এত ছড়াছড়ি। বন্ধু তাহা স্বীকার করেন না।

প্রকৃতির মধ্যে হয়ত কোন কিছুই অসুন্দর নাই। পদবিদলিত বালুকাকণা, তাহাও হয়ত কত-সুন্দর। কিন্তু কখন? আমরা যখন চিরসুন্দরকে দেখিতে পারি,—

"তখনই ভুবন হয় সুধাময়।"

তাহার পূর্ব্বে,—সুন্দর এবং কুৎসিৎ নামক দুইটি পদার্থের প্রতীয়মান চির-পার্থক্য একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায় না; কাণা ছেলেকে "পদ্মলোচন" বলিয়া আলিঙ্গন করিবার মত উদারতা জন্মগ্রহণ করে না।

আমরা যখন মানব-শিল্পের অন্তরালে মানবহৃদয়কে দেখিতে শিখিব,—সে হৃদয়ের অন্তস্তল-নিহিত চিরতৃষাতুর সৌন্দর্য্য-পিপাসার পরিচয় লাভ করিতে পারিব,—তখন হয়ত সকল শিল্পের পরিস্ফুট-অপরিস্ফুট সকল নিদর্শনকেই এক অখণ্ড সৌন্দর্য্যের অশ্রান্ত আত্মবিকাশ-চেষ্টা বলিয়া, তাহার মর্য্যাদা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব। তখন হয়ত আহা! আহা! মরি! মরির মধ্যেই সকল সমালোচনা ডুবিয়া পড়িতে পারিবে।

"কিন্তু তাহার পূর্ব্বে?"

সকল শিল্পেই দুইটি সৌন্দর্য্য,—দুই শ্রেণীর দুই প্রকারের ব্যক্তাব্যক্তের অভিব্যক্তি। একটি যে কেহ দেখে,—যে কেহ দেখিতে পারে,—যে কেহ অনুভব করিয়া অনুভূতি ফুরাইয়া ফেলিতে পারে। আর একটি দেখিতে হইলে, তত সহজে দেখার কাজ শেষ হইতে পারে না। যে যুগের শিল্প, সেই যুগের মানুষকে জানিতে হয়,—তাহার ধ্যানধারণা, আশা-আকাঙ্খা, কিরূপ ছিল, তাহারও পরিচয় গ্রহণ করিতে হয়। কারণ, সকল শিল্পই মানুষের আত্ম-বিকাশচেষ্টার অসম্পূর্ণ অভিব্যক্তি। তাহার মধ্যে "ব্যক্ত" অপেক্ষা "অব্যক্ত" সৌন্দর্য্যই অধিক। সে সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে না পারিলে, সৌন্দর্য্য-সম্ভোগ লালসা সম্পূর্ণরূপে চরিতার্থ হয় না। আকাঙ্খা থাকিয়া যায়,—অতৃপ্তি থাকিয়া যায়,—যে যবনিকা অপসারিত হইবার নয়, তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া, দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া, ক্ষুণ্ণ মনে ফিরিয়া আসিতে হয়। ইতিহাসের অভাব প্রকৃত অভাব বলিয়াই অনুভূত হয়।

যাহারা 'পীরামিড' রচনা করিয়াছিল, তাহাদের যে যৎসামান্য পরিচয় আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতেই তাহাদের রচনাগুলি কত না গৌরব লাভ করিয়াছে। তাহা আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে, 'পীরামিড' সুন্দর ছিল, বৃহৎ ছিল,—সৌন্দর্য্য-গাম্ভীর্য্যের অপূর্ব্ব সমাবেশে পৃথিবীর আশ্চর্য্য পদার্থ বলিয়াও পরিচিত ছিল। কিন্তু তখন তাহার পাথরগুলা কথা কহিত না,—পাথরের ভিতর হইতে মানবহৃদয়ে কোমলতার কমনীয় স্পর্শসুখ জাগাইয়া তুলিতে পারিত না। তখন তাহা বিস্ময়ের বিষয় ছিল;—এখন তাহা প্রীতিবিমণ্ডিত পবিত্রতার আধার।

খণ্ডাচলে যাও। দুই হাজার বৎসরের পূর্ব্বকালের মানুষের পরিচয় না জানা থাকিলে, গুহাগুলির সকল সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে পারিবে। গুহার মধ্যে এখনও সেকালের মানব-হৃদয়ের তপ্তশ্বাস অনুভব করিতে পারিবে। বুঝিতে পারিবে,—তাহারা মরে নাই। যাহারা এমন গুহা রচনা করিয়াছিল, তাহারা মরিতে পারে না, তাহারা শিল্পের মধ্যে চিরজীবি হইয়া রহিয়াছে। তাহাদের আশা,—তাহাদের আকাঙ্খাই,—গুহারূপ ধারণ করিয়া রহিয়াছে। তাহাদের সভ্যতার মূলসূত্র প্রত্যেক রেখাপাতে চিরাঙ্কিত হইয়া, মানব-সভ্যতার গৌরব ঘোষণা করিতেছে। যাহা আছে, তাহার মধ্যেই, যাহা নাই, যাহা ছিল, তাহার অব্যক্ত সৌন্দর্য্য পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে। ইতিহাস ভিন্ন, কে তাহার রহস্যভেদ করিবে?

এবার আমরা যখন খণ্ডাচলে, তখন একটা বাঘ বড় উপদ্রব করিয়াছিল। সে গুহার মধ্যে রজনী যাপন করিয়া, গুহাটিকে দুর্গন্ধময় করিয়াছিল। এক রাত্রির গুহাবাসের আরামটুকু উপভোগ করিয়া, প্রভাতে আমাদের বিজয় বাহিনীর সমাগম-শঙ্কায়, অপরাধীর মত পলায়ন করিয়া, লতাগুল্মে আত্মগোপন করিতেছিল। বাঘ শিল্প-সৌন্দর্য্য উপভোগ করে নাই,—আরামটুকুই উপভোগ করিয়াছিল। আমরাও অনেক সময়ে তাহার অধিক কিছুই করি না। শিল্প সৌন্দর্য্যের আরামটুকু উপভোগ করিতে বেশী কিছু জানাশুনার দরকার হয় না।

যাহারা পাহাড় কাটিয়া, এই সকল গুহা রচনা করিয়াছিল, তাহারা শিল্প-সৌন্দর্য্যের নিদর্শন রাখিয়া যাইবে বলিয়া রচনা-শ্রম স্বীকার করে নাই। তাহারা আপন প্রয়োজন-সাধনের উদ্দেশ্যে যাহা করিয়াছিল, তাহার ফল সুন্দর হইয়া

হইলে, যে আত্মপ্রসাদ উপচিত হইয়াছিল, তাহা যেন এখনও গুহাতলে যোগা-সনে উপবিষ্ট রহিয়াছে!

ইহা না জানিয়া, যাহারা উদ্ধত মস্তকে গুহাদ্বারে দাঁড়াইয়া, কৃপাকটাক্ষে অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করিয়াছে, তাহারাই নাসিকা-কুঞ্চিত করিয়া, লিখিয়া গিয়াছে,—"কি ছোট্ট কামরা গা;—ইহার মধ্যে কেমন করিয়া 'মানুষ' বাস করিত?" ইহার মধ্যে সম্ভোগ-লালসাপূর্ণ ঔদ্ধত্য বাস করিত না,—সে কথাটি জানাইয়া দিবার প্রয়োজন আছে। তাহার অভাবে, ইহার সৌন্দর্য্য অনেকটা খাটো হইয়া পড়ে। ইতিহাস ভিন্ন, কে তাহা জানাইয়া দিবে?

যাহার নাম "রাণী-গুম্ফা", তাহা একটি অবরোধশূন্য অন্তঃপুর। মধ্যস্থলে প্রাঙ্গণ। তাহার তিন দিকে দ্বিতল গুহাপ্রকোষ্ঠাবলী। তাহা এমন সুকৌশলে পূর্ব্বাস্তে সংস্থাপিত,—প্রভাত হইতে সায়াহ্ন পর্য্যন্ত, আলো ও ছায়া পর্য্যায়ক্রমে তাহার শিল্প-শোভাকে কত নূতন নূতন সৌন্দর্য্য-গাম্ভীর্য্যে বিমণ্ডিত করিয়া, তাহাকে চিরপরিবর্ত্তনশীল মেঘমালার অনির্ব্বচনীয় শোভার ন্যায় অসীমত্ব দান করিয়াছে! যদি দেখিতে চাও,—প্রভাত হইতে সায়াহ্ন পর্য্যন্ত নির্নিমেষ-নয়নে চাহিয়া দেখ,—কেমন অলোকসামান্য অসীম সৌন্দর্য্যসাগরের অনিন্দ্য সুন্দর চিত্রপট। যাহারা ইহা রচনা করিয়াছিল, তাহাদের হাতে গুহার আয়তন সীমাবদ্ধ হইলেও, রচনাকৌশল সীমাশূন্য উদারহৃদয়ের পরিচয় প্রদান করিয়া, মানবমন সসীম হইতে অসীমে আকর্ষণ করিতেছে।

যাহারা গুহা রচনা করিয়াছিল, তাহাদের বাহুবল ছিল,—শাসনকৌশল ছিল,—ঐশ্বর্য্যবলেরও অভাব ছিল না। পাষাণে গঠিত দ্বারপালগণের অস্ত্রে শস্ত্রে বসনে ভূষণে, তাহাদের গতিহীন স্থিতিভঙ্গীতে তাহার যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। দ্বারের উপরে যে কারুকার্য্য এখন নীরবে মলিনমুখে কালের করাল কবলের অনিবার্য্য ধ্বংসলীলার পরিচয় প্রদান করিতেছে, তাহাতেও জয়পরাজয়ের চির পুরাতন শক্তি-সামর্থ্য দৃঢ়মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে।

তথাপি গুহাগুলির ভাব কেমন স্বতন্ত্র,—কেমন আত্মনিষ্ঠ,—কেমন প্রগল্ভতাশূন্য,—শান্তিশোভার আধার! সকল গৌরবের উপর আত্মজয়ের গৌরব বড় বলিয়া পরিচিত ছিল বলিয়াই, রচনা-লালিত্য এমন কমনীয়,—শৌর্য্যবীর্য্য-ঐশ্বর্য্য-মুখরতা এমন সুসংযত। সে কালের মানব-সমাজের ঐতিহাসিক সমাচার জ্ঞাত হইয়া, তাহাদের পাদপদ্মপূত পার্ব্বত্যপথে এই সকল গুহাদ্বারে উপনীত হইবামাত্র, আপনা হইতেই বলিতে ইচ্ছা হয়,—

"নমো অরিহন্তাণম্। নমো সব সিধানম্।"

অর্হৎগণকে নমস্কার। সকল সিদ্ধপুরুষকে নমস্কার। তোমরা যুগে যুগে মানবসমাজের নমস্কার গ্রহণ কর। সর্ব্বসত্বরাশির [সকল জীবজগতের] অনুত্তর [শ্রেষ্ঠ] জ্ঞান প্রাপ্তি হউক বলিয়া আশীর্ব্বাদ কর,—ধরাধাম হইতে সকল ক্ষুদ্রতা দূরীভূত হউক।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

অস্পৃশ্য প্রসঙ্গ।

হিন্দুসমাজে যে সকল জাতি অস্পৃশ্য বলিয়া পরিচিত তাহাদিগের সামাজিক রীতিনীতি ও ধর্ম্মবিষয়ক সংস্কারাদি আমাদিগের নিকট অজ্ঞাত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অধুনা অধঃপতিত জাতিগণের উন্নতিসাধনের নিমিত্ত নানারূপ সাধু প্রস্তাব করা হইতেছে। এই প্রস্তাবগুলি কার্য্যে পরিণত করিতে গেলে তত্তৎ জাতিগণের সামাজিক বিধিব্যবস্থা ও আচারাদি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক, নতুবা কেবল বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া উহাদিগের বহু শতাব্দীব্যাপী জড়তা অপনয়ন করা সহজসাধ্য হইবে না। সমাজনীতি বিষয়ক আলোচনা অনেকে নিষ্ফল বলিয়া মনে করেন। অর্থশাস্ত্রাদির ন্যায় কার্য্যকরী নহে বলিয়া অনেকে এই সকল আলোচনাকে অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকেন, কিন্তু বিভিন্ন জাতির সামাজিক নিয়মাদির সহিত অর্থশাস্ত্রের কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তাহা আর আধুনিক অর্থনীতিবেত্তাগণের নিকট অপরিচিত নহে। জাতিভেদের অনিবার্য্য ফলস্বরূপ ভারতীয় অর্থনীতির যে সকল বিশেষত্ব আছে তাহা প্রতীচ্য বিদ্যাভিমানী ব্যক্তিগণ অনেকেই ভালরূপ চিন্তা করিয়া দেখেন না। এ সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গকে বর্ত্তমান বৎসরের মডার্ণ রিভিউ পত্রে প্রকাশিত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 'Caste in Indian Economic' (ভারতবর্ষীয় অর্থশাস্ত্রে জাতিভেদের স্থান) নামক গবেষণাপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রবন্ধটি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। সামান্য বিবেচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে আমাদিগের সামাজিক প্রথাগুলি সমূলে উচ্ছিন্ন

See Modern Review 1912. p. p. 128.

না হইলে ইউরোপের ন্যায় সকল প্রকার ব্যবসায়ে অবাধ প্রতিদ্বন্দ্বিতা অস্ম-দেশে কোন মতেই প্রচলিত হইতে পারে না। শুধু অর্থনীতি কেন, সমাজ তত্ত্বের সহিত ইতিহাস ও রাজনীতিরও সম্বন্ধ বড় কম নহে। মাননীয় রিজলী মহোদয় তাঁহার ভারতীয় সমাজতত্ত্ব বিষয়ক সুবৃহৎ গ্রন্থের মুখবন্ধে শাসক সম্প্রদায়ের সমাজনীতিবিষয়ক অভিজ্ঞতায় প্রয়োজন কি তাহা স্পষ্টাক্ষরে বুঝাইয়া দিয়াছেন। এ বিষয়ে অবহিত না হইলে প্রাচ্যদেশে শান্তিরক্ষা, দুর্ভিক্ষদমন কিছুই সুসম্পন্ন হইতে পারে না। অনেক স্থলে গবর্ণমেণ্টকে ঠেকিয়া শিখিতে হইয়াছে। এখন দুর্ভিক্ষ-প্রশমনের ব্যবস্থা করিতে হইলে রাজপুরুষেরা উড়িষ্যায় "ছত্রখাই" জাতির ন্যায় আর কোনও অভিনব জাতির উৎপত্তি না হয় সে বিষয়ে সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন। ইংরাজরাজের সুশাসনে "তস্করতা" যে বাক্যরূপেই বিরাজ করিবার উপক্রম করিয়াছে তাহা দস্যুবৃত্তি পরায়ণ শঠধর্ম্মী জাতিগণের (Criminal tribes & Castes) সমাজতত্ত্বের সম্যক আলোচনার সহিত যে একবারেই সম্পর্কশূন্য এ কথা কে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে ?

রিজলী যথার্থই বলিয়াছেন যে জরীপ ও জমাবন্দীর ব্যবস্থার ন্যায় জাতি-তত্ত্বের আলোচনাও শাসনকর্ত্তৃগণের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। সেদিন মহা-মহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ডোম ও হাড়ীদিগের মধ্যে প্রচলিত ধর্ম্মপূজায় বৌদ্ধ "হীনযান" সম্প্রদায়ের শূন্যবাদের স্পষ্ট পরিচয় পাইয়াছেন। তাম্রবলয়ধারী "ধর্ম্ম ঘরিয়া" যোগীগণের পুরাকালে সামাজিক প্রতিষ্ঠা কিরূপ ছিল তাহা জাতিতত্ত্ববিষয়ক অনুসন্ধানফলেই নির্ণীত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চজাতির সামাজিক ইতিহাসের অভাব নাই, কিন্তু দীন অস্পৃশ্যের হীন কথা লইয়া কেহই আলোচনা করিতে ভালবাসে না। ইউরোপখণ্ডে দেখিতে পাই যে ঔপন্যাসিকগণও সমাজের নিম্নস্তরের এমন কি যাযাবর জিপ্সী জাতিরও যথাযথ চিত্র অঙ্কণে প্রয়াস পাইয়া থাকেন কিন্তু ভারতের সৌখিন গ্রন্থকারগণ যে কখনও কোনও গল্প বা উপন্যাসের পাত্ররূপে কোন মেথর বা ডোমের কথা অবতারণা করিয়াছেন তাহাও শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। যাঁহারা রডিয়ার্ড কিপ্লিংএর ভারতবিদ্বেষদুষ্ট কাহিনী ও উপন্যাসাদি পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা উক্ত একদেশদর্শী গ্রন্থকারের অতিরঞ্জিত চিত্রগুলিতে যে সামাজিক সূক্ষ্মদর্শিতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় এ কথা অস্বীকার করিতে পারিবেন না। বিন্ধ্যেশ্বরী মেথর মেথরাণী ভ্রমে এক অজ্ঞাত কুল-

শীলা রমণীর পাণিপীড়ন করিয়া কিরূপ বিপদে পতিত হইয়াছিল তাহা "Vengeance of Lalbeg" * (লালবেগের প্রতিহিংসা) নামক গল্পের পাঠকগণের নিকট অবিদিত নহে। মেথরের ন্যায় নিকৃষ্ট জাতির ভিতরেও যে উপনীত ভেদাভেদ আছে এ কথা আমরা অনেকেই অবগত নহি। বস্তুতঃ আজ কাল সমাজসংস্কারবিষয়ক বহু প্রচেষ্টাসত্ত্বেও আমরা এই সকল জাতি সম্বন্ধে উদাসীন, এমন কি উহাদিগের শাখাপ্রশাখার অস্তিত্বসম্বন্ধেও সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। মিউনিসিপালিটির মেথরদিগের মধ্যে প্রায়শঃ ধর্ম্মঘট উপস্থিত হইয়া আবর্জ্জনাদি পরিষ্কারের ব্যাঘাত না জন্মিলে মেথর জাতিও যে এই বিরাট সমাজদেহেরই অঙ্গীভূত এ কথা বোধ হয় নগরবাসীগণের মধ্যে অনেকেই বিস্মৃত হইয়া যান। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে এই সকল জাতির প্রতি অবস্থাপন্ন গ্রামস্থ ভদ্রলোকগণ যে আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন, তাহা আজি কালিকার দিনে বড়ই বিরল। আমার কোনও শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক বন্ধুর নিকট শুনিয়াছি যে তাঁহার পিতা ক্রিয়াকর্ম্ম উপলক্ষে যে নিমন্ত্রণ করিতেন স্বগ্রাম বাসী ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতির ন্যায় ডোম চণ্ডালাদিও তাহা হইতে বাদ পড়িত না। পল্লীগ্রামে এ প্রথা কিয়ৎ পরিমাণে বিদ্যমান আছে বটে কিন্তু সহরে ইহার অস্তিত্বের চিহ্নমাত্রও পাওয়া যায় না। একটি মাত্র স্বল্পায়তন প্রবন্ধে বঙ্গদেশের যাবতীয় অস্পৃশ্য জাতিসমূহের পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে না। সে জন্য আমরা ধারাবাহিক ভাবে ভিন্ন ভিন্ন জাতি বা উপজাতিগুলির সামাজিক ও ধর্ম্মবিষয়ক আচার ব্যবহার আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে মেথরের কার্য্যে নিযুক্ত যে সকল লোক দেখিতে পাওয়া যায় তাহারা হেলা, হাড়ী, লাল বেগী, হালাল খোর প্রভৃতি কোনও না কোনও জাতি বা উপ-বিভাগের অন্তর্গত। অদ্য মানসীর পাঠকবর্গকে হেলা জাতির মেথরগণের কিঞ্চিৎ জানাইবার অভিলাষ আছে।

হেলা।

কলিকাতা, চব্বিশপরগণা, ঢাকা, বাখরগঞ্জ, ফরিদপুর, নদীয়া প্রভৃতি জেলার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে হেলাজাতীয় মেথর দেখা যায়। ইহারা সাধারণতঃ মিউনিসিপালিটির অধীনে কার্য্য করিয়া থাকে। ইহাদের আদিম নিবাস যুক্তপ্রদেশ। আমরা কুষ্টিয়া ও কুমারখালী নিবাসী কয়েকজন হেলার নিকট

* Kipling's Smith Administation.

অবগত হইয়াছিলাম যে ইহাদিগের আদিম নিবাস যুক্তপ্রদেশের কাণপুর জেলায়। এরূপ হেলাও অনেক দেখা গিয়া থাকে যাহারা বঙ্গদেশে সুদীর্ঘ কাল বাস করার জন্য তাহাদিগের আদিম নিবাসের সঠিক সংবাদ দিতে অসমর্থ। আজ কাল কলিকাতায় হেলা জাতীয় ব্যক্তিগণের সংখ্যা এরূপ অধিক হইয়াছে যে বঙ্গদেশীয় হেলারা কলিকাতাকেই তাহাদের স্বজাতির কেন্দ্রস্থল বলিয়া মনে করে।

অনেকের এরূপ ধারণা আছে যে হেলা, হালালখোর ও খরগপুরিয়া হাড়ীদের মধ্যে কোনও রূপ প্রভেদ নাই। সাধারণতঃ "হালালখোর" বলিলে মুসলমান জাতীয় মেথরদিগকেই বুঝিয়া থাকে কিন্তু অর্দ্ধ হিন্দুভাবাপন্ন হালালখোরের সংখ্যাও যে নিতান্ত কম এরূপ নহে। হালাল—শাস্ত্রানুমোদিত, খোর্দ্দান—খাওয়া, অর্থাৎ যাহারা শাস্ত্রানুমোদিত আহার্য্য গ্রহণ করে সুতরাং হালালখোর শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতেই বুঝা যাইতেছে যে প্রকৃতপক্ষে উহা কেবল মুসললমান মেথরগণেরই প্রতি প্রযোজ্য, কারণ মুসলমানেরাই ভক্ষাভক্ষ্য সম্বন্ধে "হালাল" ও "হারাম" শব্দদ্বয় প্রয়োগ করিয়া থাকেন। অনেক স্থলে হাড়ী, ভাঙ্গী, হেলা, হালালখোর প্রভৃতি নামগুলি সাধারণ মেথরবাচক শব্দরূপে ব্যবহৃত হওয়ায় বোধ হয় এই ভ্রান্তসংস্কারের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। সে যাহা হউক হেলাদিগের মধ্যে এরূপ কতকগুলি কৌতুহলোদ্দীপক সামাজিক নিয়ম প্রচলিত আছে যাহার দ্বারা ইহাদিগকে অন্যান্য মেথর জাতি হইতে সহজেই চিনিয়া লওয়া যায়। হেলারা কোন মতেই কুক্কুর স্পর্শ করে না—করিলে ইহাদিগকে জাতিচ্যুত হইতে হয়। এইরূপ নিষেধ প্রথা অনেকটা স্যাণ্ডউইচ দ্বীপবাসী অসভ্যগণের "টাপু" বা "টাবু" (taboo) প্রথার অনুরূপ। কোনও কোনও স্থলে দেখা যায় যে "টোটেম" (totem) বা আদিপুরুষ জ্ঞাপক জান্তব চিহ্নের সহিত এই সকল নিষেধবিধির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। "ঘোড়া" গোত্রের হাড়ীরা অশ্বপালন ও পরিচর্য্যাসংক্রান্ত কোনও রূপ কার্য্য গ্রহণ করে না এবং "শাল" বা "শৈল" গোত্রের হাড়ীরা "শাল" মৎস্য ভক্ষণ করে না। আমরা কিন্তু হেলাদিগের মধ্যে "কুক্কুর" বা তদনুরূপ কোনও টোটেম নিদর্শক গোত্র প্রচলিত থাকার কথা শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না; সুতরাং ইহাদিগের কুক্কুর বর্জ্জন যে গোত্রমূলক এ কথা নিঃসন্দেহে উল্লেখ করা যাইতে পারে না। এ পর্য্যন্ত অনুসন্ধানে যতদূর জানিতে পারিয়াছি তাহা হইতে বোধ হয় যে এ প্রথার কঠোরতা ক্রমেই শিথিল হইয়া আসিতেছে।

এখন সকল ক্ষেত্রেই কুকুর স্পর্শ করিলেই যে জাতিচ্যুত হইতে হয় এমত নহে। প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ কিঞ্চিৎ জরিমানা দিলেই সকল আপদ কাটিয়া যায়। একজন অর্দ্ধবয়স্ক হেলার মুখে শুনিয়াছিলাম যে পোষা কুকুর স্পর্শ করাই দোষাবহ, বিশেষতঃ সে গুলির গলায় যদি "কলার" বা দড়ি বাঁধা থাকে। রাস্তাঘাটে ইতস্ততঃ ভ্রমণশীল অপানিত (pariah) কুকুর স্পর্শ করিলে কোনও রূপ দোষ বর্ত্তে না। হেলারা কদাপি কুকুর বিড়ালের মৃতদেহ স্পর্শ করে না। ইহাদিগের আর একটি বিশেষত্ব এই যে অন্যান্য অস্পৃশ্য জাতির ন্যায় এই জাতীয় ব্যক্তিগণ অপর কোন উচ্চবর্ণের এমন কি ব্রাহ্মণেরও উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করে না।

হেলাগণের মধ্যে শাক্ত ও বৈষ্ণব দুই সম্প্রদায়ই আছে। ইহারা সকলেই মদ্যপান করিয়া থাকে। কুক্কুট ও শূকরমাংস অধিকাংশ স্থলেই সুখাদ্যরূপে পরিচিত। খুব অল্পসংখ্যক হেলাই এই সকল নিষিদ্ধ মাংস গ্রহণ করে না সুতরাং আহারের বিধিনিষেধ হইতে কে শাক্ত, কে বৈষ্ণব তাহা ঠিক করা সুকঠিন। উপাস্য দেবতাগণের নাম জিজ্ঞাসা করিলে ইহারা সাধারণতঃ ভগবান, নারায়ণ ও কালী এই তিন নামই উল্লেখ করিয়া থাকে। প্রথমোক্ত নাম দুইটি যে প্রকৃতপক্ষে বিভিন্নভাবাচক নহে, তাহা ইহাদিগের সম্যক বোধ হইয়াছে কিনা বলা যায় না। "হোলী" ও "দেওয়ালী" ইহাদিগের দুইটী প্রধান পর্ব্ব। সময় বিশেষে ইহারা "পীর"দিগেরও পূজা অর্চ্চনা করিয়া থাকে। পরিবারের মধ্যে কেহ ভুতাবিষ্ট হইলে ইহারা "গাজী" ও "সৈয়দ" পীরদিগের শরণাপন্ন হয়। মাটিতে গোধূমচূর্ণ ছড়াইয়া একটা চৌকা অঙ্কিত করা হয়। ওঝা এই চৌকার মধ্যে শালপাতের উপর উপবিষ্ট হইয়া ভূত ঝাড়াইয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যে সমাজশাসনের বেশ সুবন্দোবস্ত আছে। সাধারণতঃ ইহারা দুই জন মাত্র সামাজিক কর্ম্মচারী নিয়োজিত করিয়া থাকে—(১) চৌধুরী (২) ছড়িবর্দ্দার। চৌধুরী স্বজাতীয়গণের নিকট হইতে নিজ পদমর্য্যাদাজ্ঞাপক একটি পাগড়ী উপহার পাইয়া থাকেন, সকল প্রকার সামাজিক ব্যাপারেই চৌধুরীর বাক্য অলঙ্ঘনীয়। ছড়িবর্দ্দার সাধারণতঃ চৌধুরীরই হুকুম তামিল করিতে নিযুক্ত থাকে। এতদ্ব্যতীত সে শালিস ও নিমন্ত্রণাদির সংবাদও সমাজ মধ্যে জ্ঞাপন করিয়া থাকে। উদ্বাহক্রিয়ায় জাতির সর্দ্দার বা চৌধুরীই পুরোহিতের কার্য্য করে, কেবল শুভদিন নির্দ্ধারণের জন্য ব্রাহ্মণের প্রয়োজন হইয়া থাকে। শুনিতে পাই উপযুক্ত অর্থ পাইলে উত্তর পশ্চিম দেশীয় ব্রাহ্মণেরা হেলাদিগের বিবাহে মন্ত্রপাঠ করাইয়া থাকে।

বালিকাদিগের বিবাহের কোন নির্দ্দিষ্ট বয়স নাই। শৈশবে বিবাহ সামাজিক প্রথাবিরুদ্ধ নহে এবং গৃহে অবিবাহিতা বয়স্থা কন্যা থাকিলেও উহা দূষণীয় বলিয়া বিবেচিত হয় না। তারা, মন্দোদরী প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয়া সতীগণের পদাঙ্ক অনুসরণে, এতজ্জাতীয়া কোনও রমণী পরলোকগত স্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে বিবাহ করিলে, স্বজাতিগণের মধ্যে কদাপি নিন্দিতা হয় না। কোনও হেলা জাতীয়া স্ত্রীলোক পিতৃগৃহ হইতে গৃহত্যাগিনী হইলে তাহার পিতাকে অর্থ-দণ্ড দিতে হয় এবং স্বামীগৃহ হইতে বাহির হইলে স্বামীর নিকট এইরূপ জরিমানা আদায় করা হইয়া থাকে। এইরূপ গৃহত্যাগিনী স্ত্রীলোকের প্রণয়ীকেও অর্থ-দণ্ডে দণ্ডিত ও সমাজচ্যুত করা হয়। সে তাহার অপরাধের জন্য ভোজ দিতে স্বীকৃত হইলে সমাজে পুনরায় গৃহীত হইতে পারে। স্বামীর ক্লীবত্বে স্ত্রী-লোকের পত্যন্তর গ্রহণের অধিকার আছে। * এরূপ স্থলে দ্বিতীয় পতি স্বজাতির পঞ্চাইতের নিকট দণ্ডস্বরূপ কিঞ্চিৎ অর্থ দান করে এবং তাহার স্ত্রীর পূর্ব্বস্বামীর সন্তোষসাধনের জন্য তাহাকেও অল্পাধিক "কাঞ্চন মূল্য" প্রদান করে। বলা বাহুল্য এরূপ ঘটনা কদাচিৎ ঘটিয়া থাকে। ইহাদিগের অশৌচ দশদিনব্যাপী। দশ দিন গত হইলে ক্ষৌরকার্য্য হইয়া থাকে। অশৌচান্তে উত্তরপশ্চিমদেশীয় নরসুন্দরেরাই ইহাদিগের ক্ষৌরকার্য্য করিয়া থাকে। ইহারা সাধারণতঃ মৃতদেহ প্রোথিত করে। ইহাদিগের "তিজা" বা "ত্রিজা" এবং "বর্ষী" নামক দুইটি প্রেতকার্য্য সম্বন্ধীয় প্রথা আছে। "বর্ষী" আমাদিগের বাৎসরিক শ্রাদ্ধের বা সপিণ্ডকরণের অনুরূপ। ইহা মৃত্যুর এক বৎসরান্তে অনুষ্ঠিত হয়। সে দিন নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে দধি, মিষ্টান্ন, মাংস প্রভৃতি সহযোগে অন্নব্যঞ্জনাদি ভোজন করান হইয়া থাকে। মৃত্যুর তিনদিন পরেই "তিজা" অনুষ্ঠান। সে দিন মৃতব্যক্তির আত্মীয়েরা কেবল কলাই দাইল ও অন্ন গ্রহণ করে।

মল ও আবর্জ্জনাদি পরিষ্কার করাই হেলাদিগের জাতি-ব্যবসায়। ইহাদিগের মধ্যে অনেকে রসনচৌকিও বাজাইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত বাঁশফোর ডোমদিগের ন্যায় ইহারা কুলা, চালনী প্রভৃতি প্রস্তুত করে। ইহাদিগের

* এ অবস্থা যে পরাশরের অনুমোদিত তাহা বোধ হয় পাঠকগণের অবিদিত নহে—

"নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে ॥

স্ত্রীলোকেরা পুরুষগণের ন্যায় কর্ম্মিষ্ঠ। কোনও কোনও শ্রেণীর নীচজাতীয়া স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় হেলা-রমণীগণ অর্থলোভে পবিত্র দাম্পত্য-বন্ধনের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করে না।

শ্রীগুরুদাস সরকার

গীত শেষ।

দেখিতাম তার হাসি,
উপচিত প্রেমরাশি,
চেয়ে-চেয়ে তার পানে ভরিত না মন!
সে রহিত পাশে বসি',
লইয়া লেখনী, মসি,
কি লিখিব, ভুলিতাম দেখি চন্দ্রানন,
কোথায় কল্পনা আর বাস্তব-স্বপন!

"কি লিখেছ, দেখি দেখি,
কারে প্রেমপত্র?—একি!
প্রিয়তমে, প্রাণাধিকে,—একি সম্বোধন?"
না-না, প্রেমপত্র নয়,
কেন তব এ সংশয়?
"ধৈর্য্য নাহি পড়িবার?" কর প্রত্যর্পণ।
কবির কল্পনা এ যে—রোষ অকারণ!

করিয়াছ খণ্ড খণ্ড,
আর কিবা দিবে দণ্ড?
এইবার—সপত্নীর হ'ল সপিণ্ডন।
ছি ছি তুমি মিছা রোষে,
কি করিলে বিনা দোষে,
একি নির্ব্বিকার ক্রোধ,—কঠোর শাসন!
"অবিশ্বাস!"—লিখিব না, করিলাম পণ।

সে দ্বন্দ্ব নাহিক আর,
কে করিবে মুখ ভার,
ছিঁড়ে দিবে খাতা-পত্র না মানি বারণ ?
কাব্যরচনায় মাতি,
জাগি যদি সারা রাতি,
কেহ ত সাধে না আর করিতে শয়ন ;
গলদেশে বাহুলতা করে না বেষ্টন !

এবে দীর্ঘ অবসর,
বাঁধি কল্পনার ঘর,
চেয়ে আছি শূন্যমনে, নাহিক বন্ধন !
এত শোভা, এত আলো,
আমার না লাগে ভালো,
এমন ফুলের গন্ধ, কূজন গুঞ্জন—
কিছুই আমার মন করে না হরণ।

সুখ-দুখ নাহি বোধ,
গেছে যেন জন্মশোধ,
নাহি সে বিরহ, আর নাহি সে মিলন,
গেছে প্রেম তারি সনে
শ্মশানে, জাগিছে মনে
ছিন্ন-ফুলমালা, ডোর রয়েছে নগন ;
নিবেছে প্রাণের আলো,—আঁধার ভুবন !

নাহি সে হৃদয়ে প্রীতি,
প্রাণে আর নাহি গীতি,
সে দেবতা নাহি আর, শূন্য সিংহাসন !
কাব্য ছিল যার ভাষে,
সুধা ছিল যার হাসে,
সে আজি কোথায়, বৃথা করি অন্বেষণ ;
কবিত্ব, কল্পনা শেষ—শূন্য এ জীবন।

শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়

ভক্তিযোগ—শ্রীচৈতন্যদেব।

মৃদুকলনাদিনী মন্থরগামিনী বাসন্তী-পদ্মাবতীর এখন আর সে জীর্ণা শীর্ণা ক্ষীণমধ্যা মূর্ত্তি নাই, নবীন বর্ষার নবোচ্ছ্বাসে মাতিয়া সুধীরা ব্রীড়াবনতমুখী শিবসুন্দরী এক্ষণে মহাকল্লোলিনী উন্মাদিনী চণ্ডিকামূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। ভরাভাদরের স্বাদ পাইয়া যৌবনমদিরায় উচ্ছ্বসিতা রূপগর্ব্বিতার ন্যায় কাহাকে হাসাইয়া, কাহাকে কাঁদাইয়া, কাহাকে বা মজাইয়া, অট্টহাসির লহর তুলিয়া পদ্মাবতী প্রিয়সঙ্গমে চলিয়াছেন—প্রেমবন্যায় দুকূল ভাঙ্গিয়া দিগ্‌দিগন্ত ভাসিয়া যাইতেছে। বীণাপাণির বরপুত্র কল্পনাদেবীর প্রিয়তম বঁধু রবীন্দ্রনাথ পদ্মাবক্ষে একখানি বজরার ছাদের উপরে, তাঁহার পলকবিহীন চক্ষু এবং স্থাণুবৎ স্থিরদেহ দেখিয়া বোধ হইতেছে—কবি কোন অপার্থিব রাজ্যে চলিয়া গিয়াছেন, আমি বিস্মাকুব হইয়া তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া আছি, আর সঙ্গদোষে আকাশ পাতাল ভাবিতেছি। বজরাখানি পদ্মামধ্যে সুদৃঢ় শৃঙ্খলে আবদ্ধ। তরতর করিয়া খরস্রোতা বিদ্যুৎবেগে ছুটিয়াছে, কুটাখানি পড়িলেও যেন দুই টুক্‌রা হইয়া যাইবে। কত শস্যশ্যামল শস্যক্ষেত্র, কত তৃণাচ্ছাদিত নববাসগৃহ, কত উন্মূলিত বৃক্ষরাজি, কত জীবনশূন্য জীবদেহ, কত আরোহীবিহীন নৌকা, উদ্দাম স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে; মহাকালভামিনী রঙ্গিনীর তরঙ্গভঙ্গে কেহ ডুবিতেছে, কেহ ভাসিতেছে, কেহ নাচিয়া নাচিয়া ছুটিয়াছে, কেহ কেহ বা চক্রাকারে ঘুরিতেছে। অদূরে মহাভীমনাদী ঘূর্ণাবর্ত্ত—যেন শ্মশানচারিণী চণ্ডিকা শত ভৈরবীসঙ্গে মিলিয়া তাণ্ডবনৃত্য করিতেছেন, আর উৎকট আনন্দে অট্টহাসির ঝঙ্কার তুলিয়া ত্রিভুবন বিকম্পিত করিতেছেন। উন্মাদিনী নাচিতে নাচিতে কখনও শত হস্ত উচ্চে উঠিতেছেন, আবার কখনও বা শত হস্ত রসাতলাভিমুখে ছুটিতেছেন। প্রেমোন্মাদিনীর এই মহা বিভীষিকাময়ী লীলা দেখা দূরে থাকুক ভাবিলেই হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। ইহাই কি জীবের অদৃষ্টকালচক্র? কালবশে কর্ম্মস্রোতে বাহিত হইয়া স্থাবর জঙ্গম সকলেই কি ঐ নিয়তির দিকে চলিতেছে? কাহার হাতে পড়িয়া জীব কৃষ্ণপরতন্ত্রতা ভুলিয়াছে, নিজের স্বতন্ত্রতাও হারাইয়াছে, তাই জীব অন্ধের ন্যায় দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া ধ্বংসের কবলে যাইতেছে। এই প্রবল কালস্রোতের প্রতিকূলতাচরণ করিবার শক্তি মায়া-

আসিয়া নৌকাখানির উপর ভাঙ্গিয়া পড়িল ; মুহূর্ত্তে নৌকাখানি তলাইয়া গেল, বুঝিলাম দুই নৌকায় পা দিলে তাহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

এই মহাঘোর দুর্ব্বিপাকের আর্ত্তনাদের মধ্যে হঠাৎ দূরশ্রুত আনন্দ-সঙ্গীত আসিয়া চিত্তকে আকৃষ্ট করিল। পূর্ণনির্ভরতাব্যঞ্জক স্বরে কে গাহিতেছে "তুমি হে ভরসা মম অকুল পাথারে, আর কেহ নাহি যে বিপদ ভয় বারে।" দেখিতে দেখিতে তর তর করিয়া একখানি মস্তকবিহীন জীর্ণ তরণী স্রোতের প্রতিকূলে চলিয়া আসিতেছে। ম্যালেরিয়াগ্রস্ত স্ফীতোদর কর্ণধার বিপদভয়-বারণ প্রভুর উপর সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়া শান্তি-সুখে ঐ গান গাহিতেছে। কৃপাময়ের কৃপাস্রোতে নৌকাখানি চালিত হইতেছে। পদ্মার খরস্রোতের মধ্যেও একটা উজান স্রোত আছে, তাহাকে "রায় ভাটা" বলে। জীর্ণ তরণীর শীর্ণ নাবিক সেই "রায় ভাটা" পাইয়াছেন। বুঝিলাম যে হাত পা ছাড়িয়া সটান হইয়া প্রভুর কৃপার উপর নির্ভর করিতে পারে, প্রপন্নশরণ দুর্ব্বলের বল শ্রীহরি তাহাকে নিশ্চয়ই আশ্রয় দেন ; কিন্তু প্রপন্ন অর্থাৎ প্রকৃষ্টভাবে শ্রীচরণে পতিত হওয়া চাই। শাস্ত্রেও দেখিতে পাই—

সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম॥
কৃষ্ণ তোমার হও যদি বোলে একবার।
মায়াবন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তারে করে পার॥

শ্রীচরিতামৃত।

আমি চমকিয়া উঠিলাম, অহো কি অদ্ভুত! ইহাই ত পঙ্গুর গিরি-উল্লঙ্ঘন। যেখানে শত হস্তীর শক্তি বিধ্বস্ত ও নির্জ্জীত, সেখানে ক্ষুদ্র মূষিক জয়যুক্ত হইল। ভগবদ্‌কৃপার কি মহীয়সী শক্তি, কি অপূর্ব্ব মহিমা! শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত শ্লোক আজ বিশ্বাস না করিয়া পারিলাম না—

মূকং করোতি বাচালম্ পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং।
যৎ কৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবং॥

যাঁহার কৃপায় পঙ্গু গিরি উল্লঙ্ঘন করিতেছে, বোবা বেদগান করিতেছে, আমি সেই পরমানন্দ মাধবকে বন্দনা করি॥

আমার মনপ্রাণ যখন কৃষ্ণকৃপা, মহিমায় ভরিয়া আছে, তখন একখানি ক্ষুদ্র পাইলট্ ষ্টীমার সন্ সন্ করিয়া চলিয়া গেল। তদুপরি একজন দড়ি দিয়া জল মাপিতেছে, আর হাঁকিতেছে "এক বাম্ দোবিলেস্" পিছে পিছে ধূমোদ্গীরণ

করিতে করিতে প্রকাণ্ড ষ্টীমার দ্রুতবেগে জল কাটিয়া চলিয়াছে, তার সঙ্গে শিকল দিয়া আর একখানি নৌকা বাঁধা। সে নৌকাখানি নিরুদ্বেগে হেলিতে দুলিতে নাচিতে নাচিতে ঘোটকীর পশ্চাতে শাবকের ন্যায় ছুটিয়াছে, ভাগ্যবান্ কর্ণধার পরমানন্দে গাইতেছেন—

"কররে ভাই সাধু সঙ্গ তোর উথলিবে প্রেমতরঙ্গ।
দূরে যাবে বাধাবিঘ্ন সাধুসঙ্গ ছেড়নারে॥"

বুঝিলাম উত্তাল তরঙ্গায়িত সমুদ্রমধ্যে ইহাই শান্তির অবস্থা। আরো বুঝিলাম ভক্তকৃপা আরো বলীয়সী, সর্ব্বানর্থের মধ্যে থাকিয়া শান্তি পাইতে হইলে সাধু সঙ্গই একমাত্র অবলম্বন।

তুলায়াম লবেনাপি ন স্বর্গং না পুনর্ভবম্।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত—

যখন হরিদাসগণের সহিত যৎকিঞ্চিৎ কাল সঙ্গই স্বর্গাপবর্গের সহিত তুলনা করা যাইতে পারেনা তখন মরণশীল মানবগণের তুচ্ছ রাজ্যাদির যে তুলনাই হয় না তাহা আর কি বলিব?

ক্ষণিকের জন্য আমার অন্তর্দৃষ্টি যেন খুলিয়া গেল, আত্মচিন্তায় আমাকে উদ্বেলিত করিয়া তুলিল। মৃত্যুসংসারসাগর হইতে উদ্ধারের উপায় কি? আমি ত অতি দুর্ব্বল, প্রতিকূল স্রোত অতিক্রম করিবার কোন সাধ্য নাই, তবে আমার গতি কি হইবে? কাহার শরণ লইব? ভগবৎকৃপায় "কৃষ্ণকৃপার" কথা মনে পড়িল। তিনিই ত পন্থা বলিয়া দিয়াছেন

দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মমমায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তিতে॥

হে দুর্ব্বল কলিহত জীব, গুণময়ী আমার মায়া দৈবীশক্তিসম্পন্না, তাহার সহিত কেবলমাত্র পুরুষকার লইয়া লড়াই করিলে শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইবে মাত্র, সেই মায়াসমুদ্র অতিক্রম করা অতি দুরূহ, তবে অসম্ভব নহে। উহার একমাত্র উপায় একেবারে প্রসন্ন হইয়া আমার আশ্রয় গ্রহণ করা, তদ্ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই নাই নাই।

বেশ বুঝিলাম আমার মতন দুর্ব্বল জীবের কান্নাকাটি ভিন্ন কেবল পুরুষকার আশ্রয়ে কোন ফল নাই। আমি মায়াবদ্ধ শক্তিহীন কলিহত জীব কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞানমার্গ অবলম্বন আমার পক্ষে সমীচীন নহে।

কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয় প্রধান।
ভক্তিমুখ নিরীক্ষক কর্ম্মযোগ জ্ঞান॥

শ্রেয়ঃ স্মৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো ক্লিশ্যন্তি যে কেবল বোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌক্লেশলএবশিষ্যতেনান্যদ্ যথাস্থুলতুষাবঘাতিনাং॥

শ্রীভাগবত ১০।১৪।৪

হে প্রভো! সর্ব্ববিধ পুরুষার্থের স্মরণরূপা তোমার ভক্তিতে অতিশয় অনাদর করিয়া যাহারা কেবল জ্ঞান লাভার্থ ক্লেশ করে তাহারা স্থূল তুষাবঘাতীর ন্যায় কিছুমাত্র লাভ না করিয়া কেবল ক্লেশমাত্রই প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

তখন তপন মিশ্রের কথা মনে পড়িল, সেই অখিল শাস্ত্রবিদ্ মহাপণ্ডিত আমার মত একদিন এই ঘোর সমস্যায় পড়িয়া ত্রিভুবন দেখিয়াছিলেন। তপন পূর্ব্ববঙ্গবাসী বৈদিক ব্রাহ্মণ, আজীবন শাস্ত্রচর্চ্চা করিয়াছেন, কিন্তু বেদবেদান্ত পুরাণেতিহাস আলোড়ন করিয়াও সাধ্যসাধনতত্ত্ব কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না। কোন্ পন্থা যুগপৎ শ্রেয় ও প্রেয়, তাহা ঠিক্ করিতে না পারিয়া ত্রিবেণীর ত্রিস্রোতে পতিত কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় কেবল ঘুরিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বদেশে বিপ্র নাম মিশ্র তপন।
নিশ্চয় করিতে নারে সাধ্য সাধন॥
বহু শাস্ত্রে বহু বাক্যে চিত্তভ্রম হয়।
সাধ্যসাধনতত্ত্ব না হয় নিশ্চয়॥

শ্রীচরিতামৃত।

আকুল হইয়া তপন সদ্‌গুরু অনুসন্ধানে ছুটিলেন; বহু অনুসন্ধানে সিন্ধু নদের পুণ্য তীরে এক বেদজ্ঞ প্রাচীন ঋষির দর্শন পাইলেন, ঋষি তাহাকে ভগবদ্‌বাক্য স্মরণ করাইয়া দিলেন—

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যামি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥

গীতা ১২।৮

(হে অর্জ্জুন) তুমি মন ও বুদ্ধি আমাতে স্থিরতর কর তাহা হইলে দেহান্তে আমাতে অভেদভাবে স্থিতি করিবে তাহাতে সংশয় নাই।

মিশ্র কৃতার্থ হইয়া ধ্যানাশ্রয় করিলেন বটে, কিন্তু মিশ্রের ভাগ্য কৃতার্থ হইলেন না। একটু পরে সেই ঋষিসত্তম জিজ্ঞাসা করিলেন "হে বিপ্র তোমার

দেখ্‌ছি বয়স বেশী হইয়াছে; তুমি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ বটে ত? মিশ্রের মুখ শুকাইয়া গেল, তিনি মুখ নিচু করিয়া বলিলেন "না প্রভু আমি কৃতদার এবং পুত্রবান্। তখন সেই জ্ঞানমূর্ত্তি মহাপুরুষ সাক্ষাতে বলিলেন "বৎস, তুমি কর্ম্মক্ষেত্রে যাও, কর্ম্মযোগাশ্রয় করগে, স্খলিতপাদের ধ্যানে অধিকার নাই।" হতাশ হইয়া তপন কুরুক্ষেত্র পুণ্যতীর্থে আসিলেন কিন্তু বহু চেষ্টাতেও কোন মহাত্মার দর্শন লাভ ঘটিল না; যখন ভগ্নহৃদয়ে ফিরিতেছেন সেই সময় এক মহাতাপস মূর্ত্তির সহিত তপনের সাক্ষাৎ হইল। মিশ্র তাঁহার চরণে পতিত হইয়া স্বাভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন, তিনি মেঘমন্দ্র স্বরে বলিলেন "বৎস, বৃথা ক্লেশ পাইও না, অধুনা কর্ম্মমণি রুদ্ধপ্রায়। দেশকালপাত্রের যেরূপ অবস্থা তাহাতে এ পন্থা এখনকার জীবনের আর অবলম্বনীয় নহে বিশেষতঃ এ পন্থা নিরাপদ নহে; যথাশাস্ত্র সেবিত না হওয়ায় আগমতন্ত্রোক্ত মন্ত্রাদি বীর্য্যবিহীন হইয়া পড়িতেছে, পরন্তু মন্ত্র জাগ্রত না হওয়ায় তাহা সাধকেরই অপচয়ের কারণ হইতেছে, শক্তিসম্পন্ন যাজ্ঞিকেরও নিতান্ত অভাব, যাজ্ঞিক দ্রব্যাদির মিলিবার উপায় নাই, সুতরাং যজ্ঞাদি ক্রিয়াকর্ম্ম হইবার আর উপায় নাই, দিন দিন উহা আরো দুষ্কর হইয়া পড়িবে। বৎস, তুমি এই পথে কাশীধামে যাও, তথায় মহাযোগীন্দ্র বিশ্বেশ্বর আছেন, তিনি তোমার মনোরথ পূর্ণ করিবেন।" তপন কালবিলম্ব না করিয়া কাশীধামে আসিলেন, যোগী দণ্ডী সন্ন্যাসীগণের সঙ্গ পাইলেন। তাঁহাদের উপদেশমত প্রাণায়ামাদি যোগাঙ্গ আরম্ভ করিলেন, কিন্তু পাকা বাঁস ভাঙ্গিতে চায় তবু নমিতে চায় না। পরিণতবয়স্ক মিশ্রের পক্ষে যোগাভ্যাস অতি দুষ্কর বোধ হইল। আবার যখন তিনি শুনিলেন যে কোনরূপ অনিয়ম বা বিশৃঙ্খলা ঘটিলে যোগ ভঙ্গ হইয়া কঠিন পীড়া বা মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিতে পারে, তখনই মিশ্রের যোগের আশা ফুরাইল। তিনি অনন্যোপায় হইয়া বিশ্বেশ্বরের শ্রীচরণে সটান হইয়া পড়িলেন, "প্রভো আর ত ঘুরিতে পারি না, হয় তুমি কৃপা কর, নচেৎ তোমার সম্মুখে পুণ্যতোয়া জাহ্নবী সলিলে এই ব্যর্থ জীবনের অবসান করিব।" একদিন গেল, কোন সাড়া মিলিল না, দুইদিনেও মিলিল না, ব্রাহ্মণ নাছোড়, অন্নজল ছাড়িয়া পড়িয়াই আছেন, তৃতীয় দিবস রজনীতে মিশ্রের ভাগ্য প্রসন্ন হইল—

স্বপ্নে এক বিপ্র কহে শুনহ তপন।
নিমাই পণ্ডিত পাশে করহ গমন॥
তেঁহো তোমার সাধ্য সাধন কহিবে নিশ্চয়।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তেঁহো নাহিক সংশয়॥

শ্রীচরিতামৃত।

তপনের নিদ্রাভঙ্গ হইল, আনন্দাবেশে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ পুলকে পূর্ণ হইল, দরদরধারে ভক্তিবারি বহিতে লাগিল, সাষ্টাঙ্গে বিশ্বেশ্বরকে প্রণিপাত করিয়া বাহির হইলেন কিন্তু ৺কাশীক্ষেত্র ছাড়িতে না ছাড়িতে আবার চিত্ত-বিভ্রম আরম্ভ হইল। সংশয়াত্মিকা বুদ্ধি পূর্ব্ববিশ্বাসকে টলাইয়া দিল। নানা বিচার বিতর্ক আসিল। বিবিধ শাস্ত্রদর্শী তপনের প্রথমেই স্বপ্নদর্শনটা মস্তিষ্কবিক্ষেপ বলিয়া সিদ্ধান্ত হইল। নিমাই পণ্ডিতকে না দেখিলেও তিনি তাঁহার যথেষ্ট খবর রাখেন, নিমাই তাঁহার সগোত্র জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র, নিমাই পাণ্ডিত্যাভিমানী মহাদাম্ভিক যুবক, ধর্ম্মকর্ম্ম, যোগ, তপশ্চরণ কিছুই নাই পরন্তু তাঁহারই মত গৃহী ও কৃতদার। বেদোপনিষদাদি পড়িয়া তপন একজন টোলের পণ্ডিতকে "সাক্ষাৎ ঈশ্বর" বলিয়া স্বীকার করিবেন? ইহাতে তপনের মন আদৌ রাজি হইল না বরং অহং জাগিয়া উঠিল "নিমাইও পণ্ডিত আমিও পণ্ডিত।" আবার অনুকুল শাস্ত্রযুক্তিও যথেষ্ট মিলিল, কলিতে বিষ্ণুর অবতার নাই তাই বিষ্ণুর নাম হইয়াছে "ত্রিযুগ"। তপনের মন একেবারে ফিরিয়া বসিল, তিনি নবদ্বীপের পথ ছাড়িয়া বাড়ীর পথ ধরিলেন। বিফল পথশ্রমে মন আরো অবসন্ন হইয়া পড়িল। তিনি গৃহে গিয়া "ভগবান্ যা কর" বলিয়া পড়িয়া রহিলেন। বৃক্ষস্বামী না পাড়িতে চাহিলেও ফল সুপক্ক হইলে যথাসময়ে আপনিই পড়িবে। কৃষ্ণকৃপাও সেইরূপ, আমরা লইতে না চাহিলেও কৃপামৃত যথাসময়ে সঞ্চারিত হইবেই হইবে। তপনের ভাগ্যে আজ তাহাই হইল। চকোরের নিকট চন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তপন নবদ্বীপে গেলেন না, কিন্তু নবদ্বীপচন্দ্র তপনের নিকট উপস্থিত হইলেন। শচীর দুলাল এখন রসময় মূর্ত্তি জগাই মাধাই ত্রাতা সঙ্কীর্ত্তন বিহারী শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর নহেন বা কলিপাবনাবতার ন্যাসীবর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নহেন। এখন তিনি মহাতার্কিক বিদ্বৎশিরোমণি নিমাই পণ্ডিত। তবে ফল্গু নদীর ন্যায় পাণ্ডিত্যের আবরণ মধ্যে প্রেম প্রবাহিত হইতেছে। ভক্তের টানে আসিতে হইতেছে তাই বিদ্যাপ্রচার উপলক্ষ করিয়া একেবারে প্রভু তপনের বাড়ীর নিকট সমুপস্থিত হইলেন। প্রফুল্লিত পদ্মবনের লোভে যেমন মধুকর ছুটিতে থাকে, চারিদিক্ হইতে বিদ্যার্থীরা সেইরূপে ছুটিতে লাগিল—

বিদ্যার প্রভাব দেখি চমৎকার চিতে।
শত শত পড়ুয়া আসি লাগিল পড়িতে॥

শ্রীচরিতামৃত।

বৈষ্ণব মহাজনেরা শ্রীচৈতন্যদেবকে ভক্তভগবানমিলিত বিগ্রহ বলেন, ভক্তাবরণ মধ্যে ভগবান্ সুতরাং আইস পাঠক অগ্রে আমরা তাঁহার ভক্ত চিত্রেরই আলোচনা করি ; উহা আরো মধুর আরো সুন্দর। তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া যখন প্রাচ্য দর্শনাদি শাস্ত্রবিদ্ পেন মিশ্রই মানেন নাই তখন পাশ্চাত্য বিজ্ঞানাদি পড়িয়া আমরা সহজে ধরা দিব কি জন্য ?

দিগ্বিজয়ী মহামল্ল আসিয়াছে শুনিলে যেমন অন্য মল্ল তাহাকে প্রকাশ্যে হউক বা অপ্রকাশ্যে হউক না দেখিয়া থাকিতে পারে না, আমাদের পণ্ডিত তপন মিশ্রের ও তাহাই হইল ; তিনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত নিমাইকে দেখিতে চলিলেন। দেবগণবেষ্টিত আখণ্ডলের ন্যায় শিষ্যমণ্ডলীমধ্যাবস্থিত সূর্য্যসমদ্যুতি মহাজ্যোতি-র্ম্ময় অপরূপ শ্রীগৌরাঙ্গমূর্ত্তিতে নয়ন দিয়াই তপন নয়ন মজিলেন আবার না চাহিতেই কৃপামৃত লাভ হইল। শ্রীকর প্রসারিত করিয়া প্রভু শিষ্য-মণ্ডলীকে বুঝাইতেছেন—

> ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্য ধর্ম্ম উদ্ধব।
> ন স্বাধ্যায় স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তি র্মমোর্জ্জিত।

হে উদ্ধব, মদ্বিষয়ক দৃঢ়া ভক্তি যদ্রূপ আমাকে বশীভূত করে, অষ্টাঙ্গযোগ সাংখ্যযোগ, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা এবং সন্ন্যাসও আমাকে তদ্রূপ বশীভূত করিতে পারে না।

এই শ্লোকের অদ্ভুত ব্যাখ্যা শুনিয়া মহাপণ্ডিত তপন মিশ্র একেবারে বিস্মিত। বাঞ্ছাকল্পতরু আর কাহাকে বলে ? যাহার জন্য তপন সপ্তসমুদ্র সেচন করিলেন তাহাই বিনা আয়াসে প্রাপ্ত হইলেন, আর লুকাইয়া থাকিতে পারিলেন না—আনন্দে কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীচরণে পতিত হইলেন—

> দণ্ডবৎ করি ধরে বহুবিধ স্তুতি।
> দৈন্য করি কহে নিজ পূর্ব্ব দুর্ম্মতি ॥
> সাধ্য সাধন শ্রেষ্ঠ কৈল নিবেদন।
> প্রভু উপদেশ কৈল নাম সঙ্কীর্ত্তন ॥

মিশ্র বিস্মিত হইয়া নিমাইয়ের মুখের দিকে কেবল চাহিয়া রহিলেন। মন বুঝিয়া প্রভু বলিলেন "পণ্ডিত সাধু শাস্ত্র বাক্যে বিশ্বাস হারাইও না। বিষ্ণু পুরাণের কথা শুন—

> ধ্যান্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈ ত্রেতায়াং দ্বাপরে ঽর্চ্চয়ন্।
> যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্ত্য কেশবম্ ॥

সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞ, এবং দ্বাপরে অর্চ্চন করতঃ যাহা পাওয়া যায়, কলিযুগে কেবল কেশবের নাম করিয়াই তৎসমুদয় পাওয়া যায়।

আর তিন যুগে ধ্যানাদিতে যেই ফল হয়।
কলিযুগে কৃষ্ণ নামে সেই ফল পায়॥

বর্ষারম্ভে ধান্য বপন এবং শীতারম্ভে চৈতালি শস্য বপনের উপযুক্ত কাল; তুমি শীতকালে ধান্য বপন করিলে তাহা বাঁচাইতে পারিবে না, বহু চেষ্টায় গাছ হইলেও ফল ধরিবে না, ফল দেখা গেলেও তাহাতে সুপুষ্ট বীজ পাইবে না, সুতরাং কালমহিমা উপেক্ষনীয় নহে। উহা সেই সর্ব্বনিয়ন্তা শ্রীভগবানেরই বিধান। জ্ঞেয় অজ্ঞেয়, দৃষ্ট অদৃষ্ট নানাবিধ অবস্থা আলোচনা করিয়া যাহা জীবের কল্যাণপ্রদ সর্ব্বাঙ্গমঙ্গল ও মঙ্গলময় তাহারই ব্যবস্থা করিয়াছেন। হে ভাগ্যবান্ বিপ্র— "

ঈশ্বর ভজন অতি দুর্গম অপার।
যুগধর্ম্ম স্থাপিয়াছে করি পরচার॥
চারিযুগে চারি ধর্ম্ম রাখি ক্ষিতি তলে।
স্বধর্ম্ম স্থাপিয়া প্রভু নিজ স্থানে চলে॥
কলিযুগ ধর্ম্ম হয় নাম সঙ্কীর্ত্তন।
সর্ব্বানর্থ দূর হয় প্রেমের কারণ॥
অতএব কলিযুগে নাম যজ্ঞ সার
আর কোন ধর্ম্ম কৈলে নাহি পায় পার॥
রাত্রি দিন নাম লয় খাইতে শুইতে।
তাহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে॥
শুন মিশ্র! কলিযুগে নাহি তপ যজ্ঞ।
যেই জন ভজে কৃষ্ণ তার মহাভাগ্য॥
অতএব গৃহে তুমি কৃষ্ণ ভজ গিয়া।
কুটিনাটি পরিহরি একান্ত হইয়া॥

শ্রীচৈতন্যভাগবত।

তপনের মন দ্রবীভূত হইয়াছে কিন্তু তবুও তিনি শাস্ত্রবিদ্ তাই সহজে ছাড়িতেছেন না—নাম হইতে মায়াবন্ধ কিরূপে ঘুচিবে ঠিক্ বুঝিলাম না? প্রভু হাসিয়া বলিলেন "নাম নামী অভেদ, যেই নাম সেই কৃষ্ণ।"

কৃষ্ণরূপ সূর্য্যের উদয়ারম্ভেই মায়ান্ধকার পলাইতে থাকে।"

কৃষ্ণ সূর্য্য সম মায়া হয় অন্ধকার।
যাঁহা কৃষ্ণ তাঁহা নাহি মায়ার অধিকার॥ শ্রীচরিতামৃত

শাস্ত্র সিদ্ধান্তেও শুনু—

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্য রস বিগ্রহঃ
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽ ভিন্নত্বান্নাম্ নাম্নিনোঃ॥

নাম ও নামী অভেদ জন্য চৈতন্যরসময়মূর্ত্তি সর্ব্বশক্তিপূর্ণ মায়ান্ধশূন্য এবং নিত্য মুক্ত চিন্তামণির ন্যায় সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ শ্রীকৃষ্ণই নামরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন।

মিশ্র, ঈশ্বর তত্ত্ব অতি দুজ্ঞেয় ; সব ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, নামের যে কি অচিন্ত্য শক্তি তাহা নাম গ্রহণ করিতে করিতে নিজেই বুঝিবে। বলিয়া কেহ বুঝাইতে পারে না। সংশয় ত্যাগ করিয়া নাম জপিতে আরম্ভ কর ইহাতে কাশীকাঞ্চী যাইতে হইবে না, যাগযজ্ঞ লাগিবে না, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ আবশ্যক হইবে না, কেবল একনিষ্ঠ হইয়া প্রভুচরণ ধ্যান করিয়া প্রসন্ন হই—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

নামগুলি সব সম্বোধন বাচক। প্রভুর কৃপার দিকে তাকাইয়া কেবল তাঁহাকে সকাতরে ডাকিতে থাকিবে, তিনি তোমাকে নিশ্চয় উদ্ধার করিবেন—তুমি প্রভুর প্রতিজ্ঞা ভুলিতেছ কেন ? কর্ম্মযোগ জ্ঞান সর্ব্বসাধন বলিয়া শেষে বলিতেছেন হে অর্জ্জুন, সকল গুহ্যের মধ্যে সাতিশয় গুহ্যতম এবং সর্ব্বশাস্ত্রের সারভূত গীতাশাস্ত্রের সারভূতা কথা তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর, তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় এই নিমিত্ত তোমার হিত বলিতেছি—

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ় মিতি ততো বক্ষ্যামিতে হিতং॥

শেষে ভক্তিযোগের কথা বলিলেন—

মন্মনা ভব মদ্ভক্ত মদ্‌যাজী মাং নমাস্কুরু।
মামে বৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

হে অর্জ্জুন ! তুমি আমাতে মন অর্পণ কর, আমার ভক্ত হও, আমার অর্চ্চনে নিরত হও এবং আমাকে দণ্ডবৎ প্রণাম কর। তুমি আমার প্রিয় ভক্ত অতএব তোমার শপথ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তুমি নিশ্চয় আমাকে পাইবে।

তপনের মনের অন্ধকার বিদূরিত হইয়া গিয়াছে সেই শ্রীমুখোদগীর্ণ বচন সুধা পানে তিনি মুগ্ধ হইয়াছেন—তপন প্রভুর চরণে দণ্ডের ন্যায় পতিত হইয়াছেন

প্রভুর শ্রীমুখে শিক্ষা শুনি বিপ্রবর।
পুনঃ পুনঃ প্রণাম করয়ে বহুতর॥

শ্রীচরণ স্পর্শ করিতেই মিশ্রের অজ্ঞানকলুষ একেবারে গিয়াছে, আনন্দে তিনি অধীর হইয়াছেন, তিনি প্রভুসঙ্গ ছাড়িতে চাহেন না তাই কাতরে বলিতেছেন—

মিশ্র কহে আজ্ঞা হয় আমি সঙ্গে আসি।
প্রভু কহে তুমি শীঘ্র যাও বারাণসী॥

প্রভু বলিলেন বিশ্বেশ্বরই তোমার বস্তোদেশী গুরু। তিনিই তোমাকে কৃপা করিয়া ভক্তিযোগ মিলাইলেন। তুমি তাঁহার শ্রীচরণে যাইয়া একমনে নাম জপ করিতে থাক, সব সাধ্যসাধনতত্ত্ব ক্রমে বিকসিত হইবে, তথায় আমার সহিতও মিলন হইবে।

সাধিতে সাধিতে নাম প্রেমাঙ্কুর হবে।
সাধ্য সাধন তত্ত্ব জানিবা সে তবে॥
তথাহি আমার সঙ্গে হইবে মিলন।
এত বলি প্রভু তারে দিলা আলিঙ্গন॥ চৈঃ ভাঃ

যাহা কিছু অবশেষ ছিল, এই কৃপালিঙ্গন দ্বারা তাহা সঞ্চারিত হওয়ায় প্রেমানন্দে ব্রাহ্মণ বিবশ হইলেন।

পাইয়া বৈকুণ্ঠ-নায়কের আলিঙ্গন।
পরানন্দ সুখ পাইল ব্রাহ্মণ তখন॥

তপন স্বপ্নের কথা কাহাকেও বলেন নাই; প্রভুর মুখে তাহার আভাস শুনিয়া তপন আরো বিস্মিত হইলেন; তখন প্রভুর চরণে সে গুপ্তকথা খুলিয়া বলিলেন—

বিদায় সময়ে প্রভুর চরণ ধরিয়া
স্বস্বপ্ন বৃত্তান্ত কহে গোপনে বসিয়া॥
হাসি প্রভু কহে সত্য যে হয় উচিত।
আর কারে না কহিবা এ সব চরিত॥

স্বপ্ন এত দিনে ফলিল, মিশ্র সর্ব্বসাধনসার ভক্তিযোগ অবলম্বন করিলেন, হরিনামমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের নিকট হইতে নামদীক্ষা প্রাপ্ত হইয়া পুণ্যধাম

চিত্রগৃহাভিমুখিনী।

K. V. Seyne & Bros.

৺কাশীক্ষেত্রে যাইয়া বিশ্বেশ্বরের শ্রীচরণে বসিয়া কায়মনপ্রাণে সেই হরিনাম মহামন্ত্র সাধন করিতে লাগিলেন।

তথাহি পদ্যাবল্যাং লক্ষ্মণধৃত শ্রীধরস্বামীকৃতশ্লোকঃ।—

অংহঃ সংহরদখিলং সকৃদুদয়াদেব সকললোকস্য।
তরণিরিব তিমিরজলধিং জয়তি জগন্মঙ্গল হরের্নাম॥

সূর্য্য যেমন অন্ধকাররাশিকে বিনষ্ট করিয়া উদিত হয় তদ্রূপ হরিনাম একবার মাত্র উদিত হইয়াই সকল লোকের সর্ব্ববিধ পাপ বিনাশ করিয়া জগতের সর্ব্ববিধ মঙ্গল উৎপাদন করিয়া সর্ব্বোপরি বিরাজ করেন।

শ্রীবামাচরণ বসু।

শশাঙ্ক

তাঁহাকে দেখিয়া বৃদ্ধা ঈষৎ হাস্য করিল, প্রৌঢ়ের মস্তক ইষৎ অবনত হইল, বৃদ্ধ কিন্তু সকরুণ দৃষ্টিতে বৃদ্ধার প্রতি চাহিয়াছিল। ভাবে বোধ হইল বৃদ্ধের আন্তরিক ইচ্ছা বিনয় করিয়া প্রৌঢ় ও বৃদ্ধাকে বালকের অপরাধ ক্ষমা করিতে বলেন; কিন্তু শত শত বর্ষের সম্রাজ্যগর্ব্ব আসিয়া তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ করিতেছিল। হাসিয়া বৃদ্ধা কহিল "ভাই, শশাঙ্কর কথা কিন্তু বলিও না, প্রভাকর কি এতই পাগল যে বালকের কার্য্যে বুদ্ধি হারাইবে। প্রৌঢ় তখন অবনতমস্তকে দন্তে দন্তে ঘর্ষন করিতেছিলেন। বৃদ্ধার পরিচ্ছদ দেখিয়া বোধ হয় যে তিনি পঞ্চনদ-তীরবাসিনী। এখনও পাঞ্জাবে রমণীগণ সেইরূপ পরিচ্ছদ ব্যবহার করিয়া থাকেন। কপিসা ও গান্ধারবাসিনী রমণীগণের পরিধেয়ের ন্যায় যে পরিচ্ছদ রমণীসুলভ কোমলতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। দূর হইতে স্ত্রী পুরুষ নির্ণয় করিবার উপায় নাই, কিন্তু পর্ব্বত বেষ্টিত বন্ধুর উপত্যকাসমূহের অধিবাসিনী-গণের পক্ষে তদপেক্ষা উপযুক্ত পরিধেয় আর কিছুই হইতে পারে না। বৃদ্ধার কেশসমূহ শুভ্র হইয়া গিয়াছে, গণ্ডের চর্ম্ম ঝুলিয়া পড়িয়াছে, পরিধানে চুড়িদার পায়জামা, অঙ্গরক্ষক, মস্তকে শুভ্র উষ্ণীষ, পৃষ্ঠে শুভ্র কেশ চড়াইয়া পড়িয়াছে, শীর্ণ পদদ্বয় পাদুকাসম্বদ্ধ। তিনি সম্রাট মহাসেন গুপ্তের সহোদরা স্থানীশ্বরের মহারাজা আদিত্যবর্দ্ধনের বিধবা মহিষী মহাদেবী মহাসেন গুপ্তা।

তাঁহার সহচর প্রৌঢ় আদিত্যবর্দ্ধনের জ্যেষ্ঠ পুত্র ও থানেশ্বরের রাজবংশের প্রথম সম্রাট প্রভাকর বর্দ্ধন। আদিত্যবর্দ্ধন যখন জীবিত ছিলেন তখন হইতেই মহাসেন গুপ্তা স্বামীর নামে থানেশ্বর রাজ্য শাসন করিতেন। প্রভাকর বর্দ্ধন যখন থানেশ্বরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত তখনও মহাদেবী সিংহাসনের পশ্চাতে যবনিকার অন্তরালে থাকিয়া পুত্রের নামে লৌহদণ্ড হস্তে রাজকর্ম্ম পরিচালনা করিতেন, অশীতি বর্ষ বয়ঃক্রমেও থানেশ্বরে তাঁহার ক্ষমতা অপ্রাতিহত ছিল। আর্য্যাবর্ত্তে সকলেই জানিত যে সিংহাসনোপবিষ্ট সম্রাট উপাধিধারী পঞ্চনদের উদ্ধারকর্ত্তা হূণ, আভীর ও গুর্জ্জরের শমনস্বরূপ প্রভাকরবর্দ্ধন মহাদেবীর ক্রীড়া পুত্তলিকামাত্র। তাঁহারই পরামর্শে থানেশ্বরের এবং তাহার সহিত উত্তরাপথের রাজচক্র পরিচালিত হইত।

হাসিতে হাসিতে পিতৃস্বসা ভ্রাতুষ্পুত্র ও তনয়ের হস্ত ধারণ করিয়া সভাগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, ধীরে ধীরে অবনতমস্তকে বৃদ্ধ সম্রাট তাহাদিগের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন। একে একে পরিচারকবর্গ প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিল, ভগ্ন সিংহাসন অপসারিত হইল, সভামণ্ডপ সুসজ্জিত হইল, বেদীর উপরে সম্রাট ব্যতীত আর কাহারও আসন রহিল না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিপনীতে বসিয়া ঘোর মসীবর্ণা পরিণতবয়স্কা একটি রমণী তণ্ডুল, লবণ, তৈল, ঘৃত প্রভৃতির সহিত হাস্ত বিক্রয় করিতেছিল। জনাকীর্ণ পাটলিপুত্র নগরে তণ্ডুলাদির ন্যায় তাহার হাস্যের ও ক্রেতার অভাব ছিল না। বিপনীর মধ্যে আমাদিগের পূর্ব্বপরিচিত সৈনিক বসিয়াছিল এবং বিক্রীত হাস্যের পরিমাণের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেছিল। বালকটি বিপনীর সম্মুখের রাজপথে ধূলি ধূসরিত অসিত বর্ণ অপর কতকগুলি বালকবালিকার সহিত ক্রীড় করিতেছিল। এমন সময়ে একজন দীর্ঘাকার গৌরবর্ণ পুরুষ তণ্ডুল ও ঘৃত ক্রয় করিবার জন্য বিপনীতে প্রবেশ করিল। ঘৃত ও চাউলের সহিত রমণী অনেক পণ্যই বিক্রয় করিয়া ফেলিল। আগন্তুক ক্রয়বিক্রয় শেষ করিয়া যখন বস্ত্রাঞ্চলে চাউল, ডাল, লবণ, কাষ্ঠ ইত্যাদি বন্ধন শেষ করিল তখন দেখিল যে সমস্ত দ্রব্যগুলি বহন করিয়া লইয়া যাওয়া একজনের পক্ষে সম্ভব নহে। তাহা দেখিয়া সদয়হৃদয়া বিপনীস্বামিণী তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য আসন ত্যাগ করিয়া উঠিল।

তখন তৈলিক গৃহ হইতে নির্গত হইল এবং আগন্তুককে স্পষ্ট বুঝাইয়া

দিল যে তাহার দ্রব্যাদি লইয়া যাইবার জন্য সে নিজে যাইতে প্রস্তুত আছে অথবা তাহার পুত্রকে পাঠাইতে পারে, কিন্তু সে কোন মতেই তাহার পত্নীকে অপরিচিত ব্যক্তির সহিত গৃহত্যাগ করিতে দিতে প্রস্তুত নহে। বাকবিতণ্ডা ক্রমশঃ মল্ল যুদ্ধে পরিণত হইবার উপক্রম হইলে রমণী উভয়ের মধ্যে পড়িয়া বিবাদ মিটাইয়া দিল, স্থির হইল যে বালক আগন্তুকের সহিত তাহার দ্রব্যাদি লইয়া যাইবে। বালক ধীরে ধীরে ভার মস্তকে লইয়া আগন্তুকের অনুসরণ করিতেছিল। আগন্তুক কিন্তু সুদীর্ঘ পাদক্ষেপে পথ অতিক্রম করিতেছিল এবং মধ্যে মধ্যে ফিরিয়া দেখিতেছিল বালক কতদূর আসিল, এক একবার বালককে না দেখিতে পাইয়া তাহার অন্বেষণে ফিরিয়া আসিতেছিল। আগন্তুক যে পথ দিয়া চলিতেছিল সে পথ ক্রমে নগর ছাড়াইয়া নদীতীর অবলম্বন করিয়া বিস্তৃত হইয়াছিল। তাহার উভয় পার্শ্বে বৃক্ষশ্রেণী ছায়া বিস্তার করিয়াছিল; এক পার্শ্বে শুভ্র বালুকাময় গঙ্গা-সৈকত ও অপর পার্শ্বে শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তর। বহুদূরে বালুকাক্ষেত্রের উত্তর সীমায় ক্ষীণকায়া ভাগীরথীর জল-রেখা দেখা যাইতেছিল! অন্য সময়ে সে পথে প্রভাত ও সন্ধ্যার সময় ব্যতীত জন সমাগম দেখা যায় না, আজ কিন্তু কোন বিশেষ কারণে সে পথে বিলক্ষণ জনতা হইয়াছে। বালক ভিড়ের মধ্যে প্রায়ই হারাইয়া যাইতেছিল এবং আগন্তুক বহুকষ্টে তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতেছিল। পথের দক্ষিণপার্শ্বে বহুসংখ্যক লোক একত্রিত হইয়াছিল, তাহাদিগকে দেখিলে বোধ হয় যে তাহারা যুদ্ধ ব্যবসায়ী। প্রান্তরের মধ্যে শিবির স্থাপিত হইয়াছিল, শিবিরের সম্মুখে সৈনিকগণ নানাবিধ কার্য্যে লিপ্ত ছিল, তাহাদের অধিকাংশই রন্ধনে ও আহারে ব্যস্ত ছিল, কেহ কেহ বা নিত্যকর্ম্ম সমাধা করিয়া বৃক্ষচ্ছায়ায় নিদ্রা যাইতেছিল। পথের উত্তরপার্শ্বে বৃক্ষশ্রেণীর নিম্নে সারি সারি অশ্ব দাঁড়াইয়া ছিল এবং তাহাদিগের সম্মুখে স্তূপীকৃত অশ্বসজ্জা, বর্শা, তরবারি ও ধনুষ্ঠান অশ্বারোহিগণের ব্যবসায়ের পরিচয় দিতেছিল। পথের উভয়পার্শ্বে সমান্তরালে বিদেশীয় যোদ্ধৃগণ সজ্জিত হইয়া শান্তিরক্ষার নিযুক্ত ছিল। দলে দলে সৈনিকগণ নদী হইতে স্নান করিয়া আসিতেছিল, গর্দ্দভের পৃষ্ঠে লৌহ কলস্ চাপাইয়া বাহকগণ অশ্ব ও অশ্বারোহিগণের পানীয় জল আনয়ন করিতেছিল। পথে শকট ও রথের জন্য পদাতিক চলিতে পারিতেছিল না। শকটশ্রেণী নগর হইতে অশ্ব ও অশ্বারোহীর আহার্য্য বহন করিয়া আসিতেছিল ও যথাস্থানে ভার নামাইয়া দিয়া পুনরায় নগরে ফিরিয়া যাইতেছিল। সময়ে সময়ে

অশ্বারোহী সৈন্য পরিবৃত্ত হইয়া শকটশ্রেণী শিবির মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল, ভার নামাইয়া দিয়া তাহারাও ফিরিয়া যাইতেছিল। নগর হইতে এক ক্রোশ দূরে একটি-বৃহৎ অশ্বত্থবৃক্ষের ছায়ায় কতকগুলি লোক বসিয়া গল্প করিতেছিল, তাহাদিগের সম্মুখে কতকগুলি বর্শা স্তূপীকৃত হইয়াছিল এবং একপার্শ্বে ভূমি শয্যায় একটি বালিকা বা রমণী পতিত ছিল। তাহার হস্তদ্বয় চর্ম্ম-রজ্জু বদ্ধ এবং পদদ্বয় রজ্জুদ্বারা ভূমিতে প্রোথিত কীলকের সহিত আবদ্ধ ছিল। সে সময়ে সময়ে মস্তক উত্তোলন করিয়া জনতার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিল এবং কিয়ৎক্ষণ পরে হতাশ হইয়া পুনরায় ভূমি-শয্যা গ্রহণ করিতেছিল। যাহারা বৃক্ষতলে বসিয়াছিল উহাদিগকে দেখিলে বোধ হয় যে তাহারা বিদেশীয় এবং পঞ্চনদবাসী। তাহাদিগের মধ্যে একজন সময়ে সময়ে চর্ম্মপাত্র হইতে মদ্যপান করিতেছিল এবং সঙ্গীদিগকে দিতেছিল কিন্তু তাহারা কেহই বালিকার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিল না। বালক আগন্তুকের ভার বহিয়া লইয়া সেই বৃক্ষতলে আসিয়া দাঁড়াইল, ভার নামাইয়া একটু বসিল, ক্ষণেক এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিল, তখন বালিকা এক দৃষ্টিতে পথের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল, নানাবর্ণের পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া বাদ্যধ্বনির সহিত মগধের পদাতিক সেনা তখন পথ দিয়া যাইতেছিল। বালকের ভার পড়িয়া রহিল, সে ধীরে ধীরে বালিকার দিকে অগ্রসর হইয়া গেল, নিকটে গিয়া ডাকিল "দিদি" আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া বালিকা মুখ ফিরাইল, বালক ঝাঁপাইয়া তাহার কণ্ঠলগ্ন হইল। তখন ভ্রাতা ভগ্নী দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ হইয়া নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছিল। বিদেশীয় সৈনিকগণ কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিল যে তাহাদিগের একজন বন্দী দুইজন হইয়া গিয়াছে, তখন যে ব্যক্তি মদ্য ঢালিয়া দিতেছিল সে বিস্মিত হইয়া বন্দিনীর নিকট উঠিয়া আসিল, ক্ষণেক কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল তাহার পর বলিয়া উঠিল "তুই এটাকে আবার কোথা হইতে জুটাইলি"? বালিকা ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে উত্তর করিল "ও আমার ভাই"। তখন কর্কশকণ্ঠে বিদেশীয় বলিয়া উঠিল "তোর ভাইটাই এখানে হবে টবে না, ওটাকে এখনই চলিয়া যাইতে বল"। তাহার কথা শুনিয়া বালিকা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, বালক ও তাহার সহিত সুর মিশাইল। সৈনিক রাগত হইয়া তাহার হস্তাকর্ষণ করিলে সে আরও চেঁচাইয়া উঠিল "ওগো দিদিগো আমি তোমাকে ছাড়িয়া যাইব না"। দুই একজন করিয়া লোক জমা হইতে লাগিল। একজন জিজ্ঞাসা করিল "কি হইয়াছে"? আর একজন বলিল "উহাদের মারিতেছে

কেন"? তৃতীয় ব্যক্তি চতুর্থকে কহিল "দেখ মেয়েটিকে কি রকম করিয়া বাঁধিয়াছে"? দেখিতে দেখিতে একজন শান্তিরক্ষক আসিয়া উপস্থিত হইল, সে জিজ্ঞাসা করিল "কি হইয়াছে"? তখন একসঙ্গে দশজন তাহার প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রারম্ভ করিল "মদ খাইয়া এই কয়জন বিদেশীয় বালিকাকে মারিতেছিল, তাহার ভাই আসিয়া তাহাকে বাঁচাইতেছিল"। ভ্রাতার আকার দেখিয়া শান্তিরক্ষক হাসিয়া উঠিল। সৈনিককে জিজ্ঞাসা করায় সে উত্তর দিল বালিকা তাহার বন্দী। সে পথ হইতে তাহাকে ধরিয়া আনিয়াছে। বালক কে তাহা সে জানে না। সে কাহাকেও মারে নাই। আমাদিগের পূর্ব্ব পরিচিত আগন্তুক অনেক্ষণ বালককে অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতেছিল, বৃক্ষতলে জাতনা দেখিয়া সেও সেইদিকে অগ্রসর হইল। অনেকক্ষণ ধরিয়া লোকের ভিড়ের চারি পাশে ঘুরিয়া যখন কিছু দেখিতে পাইল না, তখন ধীরে ধীরে লোক ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। ভিতরে আসিয়া সর্ব্ব প্রথমে নিজের দ্রব্য সম্ভার ভূমিতে পড়িয়া আছে দেখিতে পাইল, অগ্রসর হইয়া দেখিল তৈলেকের পুত্র বালিকার ক্রোড় বসিয়া আছে। বালককে জিজ্ঞাসা করিল "তুই যে বড় এখানে বসিয়া আছিস"? সে আগন্তুককে দেখিয়া পুনরায় কাঁদিয়া উঠিল এবং বলিল "আমি দিদিকে ছাড়িয়া যাইব না।"

প্রাণের কামনা।

আজি মোর মন পিঞ্জর টুটি' কোথায় ছুটিয়া চলে ?
মুরছি' উতলা পবন যেথায় পড়িছে দীঘির জলে !
　　প্রদোষ-আলোক কাঁপে তরু' পরে,
　　কলস ভরিয়া চলে বধূ ঘরে,
বকুল লভিছে মধুর মরণ পড়ি' চরণের তলে ;
তৃষিত হৃদয় ডুবিবারে চায় দীঘির শীতল জলে !
কাশের কুসুম করে ঝল্ মল্ তটিনীর তীরে তীরে,
কল্পনা মোর কত পথ বাহি' সেথায় আজিকে ফিরে ;
　　খেয়া তরী-খানি করে আনাগোনা,
　　আমি শুধু বসে আছি উন্মনা,
মেঘের তরীতে কে এসেছে নামি' দূর পাহাড়ের শিরে ?

প্রাণের আকুল বাসনা ফিরিছে তটিনীর তীরে তীরে !
পরাণ আমার জাগে আজি যেথা দোয়েল উঠিছে ডাকি,
রজনী-আঁধার কোথা যাবে ভাবে গাছের আড়ালে থাকি ;
কখন কি ভাবে মু'খানি তুলিয়া ?
পূর্ব্ব-আশার জানালা খুলিয়া
রক্তরঙীণ্ ওড়্না উড়ায়ে ঊষারাণী মেলে আঁখি,
জাগে প্রাণ যেথা প্রভাত-সভায় দোয়েল উঠিছে ডাকি !
ধানের ভিতর দিয়ে পথখানি গেছে কোথা কেবা জানে,
পথের ধুলায় লুটাইছে হিয়া, আঁখি চেয়ে দূর পানে !
চারি দিকে শুধু শ্যাম-উল্লাস,
গগন ভরিয়া উঠে মৃদু বাস,
একি আলো চোখে—একি সঙ্গীত পশিছে গো মোর কানে ?
কোথা হ'তে এই অজানা পুলক জাগিছে আমার প্রাণে !

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ সিংহ।

জাপানের ধর্ম্ম।

জাপানী ধর্ম্ম নানা শ্রেণীতে বিভক্ত এবং তাঁহাদের প্রত্যেকের আচার পদ্ধতি বিভিন্ন। এই কারণেই পুরাকলে সমগ্র জাপানীদের আচার ব্যবহার এক প্রকার ছিল না। তবে আধুনিক জাপানীদের অধিকাংশেরই আচার এবং ব্যবহার একই প্রকারের।

বৌদ্ধধর্ম্ম জাপানে কিরূপ প্রবল ছিল তাহা পুরাতন মন্দিরগুলি দেখিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। সহর এবং পল্লীগ্রামের সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম জায়গায় বৌদ্ধমন্দির গুলি অবস্থিত এবং উহাদের অধিকাংশই আয়তনে ও জাঁকজমকে রাজভবন অপেক্ষা সুন্দর। ধর্ম্মভাব জাপহৃদয়কে এরূপ ভাবে অধিকার করিলেও জাপানীরা দেশকে প্রথমস্থান দিয়া ধর্ম্মকে তাহার পরে স্থান দিয়া থাকেন। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি জাপানীদের অনুরাগ দেখিয়া জনৈক ইউরোপীয় ভ্রমণকারী অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া একজন সুপ্রসিদ্ধ জাপানী পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "মহাশয়, যদি বুদ্ধদেব স্বয়ং সেনাপতি হইয়া জাপান আক্রমণ

করেন, তাহা হইলে আপনারা কি করেন?" প্রত্যুত্তরে পুরোহিত মহাশয় বলিলেন—"বুদ্ধদেবের শিরশ্ছেদন করিয়া জন্ম ভূমির পূজা দিই"।

এস্থলে বুদ্ধদেবের জন্ম সম্বন্ধে জাপানাদের কিরূপ বিশ্বাস তাহা বলা আবশ্যক। ইহাদের মতে বুদ্ধদেব খৃষ্টপূর্ব্ব ১০২৭ অব্দে ৮ই এপ্রেল মাসে মায়াদেবীর দক্ষিণ কক্ষ ভেদ করিয়া বাহির হইয়াছিলেন্। জাপানীরা আজও পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর বুদ্ধদেবের জন্মোৎসব করিয়া থাকেন। এই সময়ে Tsulsujh "ৎস্যুৎস্যুজি" (অর্থাৎ Rhododendror indicum) নামক ফুলের তোড়া বাঁধিয়া উহা বংশাগ্রে সংলগ্ন করা হয়, এবং উক্ত বংশখানি গৃহের ছাদের উপর লট্‌কাইয়া রাখা হয়। "ৎস্যুৎস্যুজি" ফুলের তোড়া এত উচ্চে রাখিবার মর্ম্ম এই যে বুদ্ধদেবের মাতা গর্ভাবস্থায় ঐ পুষ্প চয়ন করিবার জন্য যেমন হস্ত প্রসারণ করিয়াছিলেন, বুদ্ধদেব অমনি তাঁহার দক্ষিণপার্শ্ব ভেদ করিয়া বাহির হইয়াছিলেন। এই প্রবাদটীর সত্যতা আমাকে অনেক জাপানীই জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলেন।

শিণ্টো এবং বৌদ্ধমন্দিরের পার্থক্য কি? শিণ্টোমন্দির বাহ্যাড়ম্বর শূন্য। বৌদ্ধমন্দির ইহার ঠিক বিপরীত। মন্দির সুসজ্জিত করিবার জন্য যত প্রকারের উপাদান আছে বৌদ্ধমন্দিরে তাহা সমস্তই দৃষ্ট হয়। এমন একটী বৌদ্ধমন্দির নাই যেখানে বহু মূল্য প্রস্তর কিংবা ধাতু না আছে।

শিণ্টো মন্দিরের সম্মুখে একটী কটক আছে। জাপানীতে উহাকে 'তো-রি' বলে। মন্দিরদ্বারের দুপার্শ্বে দুইখানি বৃক্ষ কাণ্ড সোজা ভাবে পুঁতিয়া উহাদের উপর আর একখানি বৃক্ষকাণ্ড সংরক্ষিত হয়। এই বৃক্ষকাণ্ড গুলি স্বাভাবিক অবস্থাতেই থাকে। সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিবার জন্য ইহাদিগকে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন করা হয় না। মন্দিরের ভিতর কোনও উপাস্য দেবতার মূর্ত্তি কিংবা অন্য কিছুই নাই। কেবল মাত্র সম্মুখস্থ দেওয়ালে একখানি বৃহৎ স্বচ্ছ দর্পণ বিলম্বিত থাকে। এই দর্পণে দর্শকবৃন্দের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিফলিত হইলে তাঁহারা স্ব স্ব হৃদয়ের স্বচ্ছতা বুঝিতে পারেন। স্বদেশভক্ত যে মহাত্মার সম্মানার্থে মন্দির নির্ম্মিত হয়, উপাসকগণ তাঁহাকে ভূমির উৎপন্ন ফসল এবং বস্ত্রাদি ভক্তিউপহার দিয়া থাকেন। মন্দিরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে উপাসকগণ এক বৃহৎ ঘণ্টা বাজাইয়া তথাকার অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে আহ্বান করিয়া ২।৩ বার করতালি দেন। পরে অতি ভক্তি সহকারে প্রণত হইয়া মন্ত্র পাঠ করিতে থাকেন।

শিণ্টো মন্দির নির্ম্মাণ করিতে লৌহাদি ধাতু অতি কমই ব্যবহার হয়। উহার পুরোহিতগণ উৎসবের সময় যাহা পরিচ্ছদ পরিধান করিলেও অন্য সময়ে

সাধারণ জাপানী পোষাক পরিয়া থাকেন? পূর্ব্বে ইহার মাথায় চুল প্রায়ই কাটিতেন না। কিন্তু যাঁহারা কাটিতেন তাঁহারা মস্তকের চতুর্দ্দিক কাটিয়া ফেলিয়া মধ্য স্থলে লম্বা চুলরাখিতেন।

শারীরিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাই শিণ্টো ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ। শিণ্টো ধর্ম্মমতে ক্ষত, পীড়া, মৃত্যু প্রভৃতিকে অশুচি বলিয়া গণ্য করা হয়। পূর্ব্বে মৃত্যু এবং প্রসবের জন্য বহির্ব্বাটীতে এক পর্ণকুটীর প্রস্তুত করা হইত। এবং সন্তান প্রসবের পর কিংবা মুমূর্ষ রোগীর মৃত্যুর পর উহা পোড়াইয়া ফেলা হইত। অবশ্য এ সমস্ত নিয়ম আর আজকাল পালন করা হয় না।

বৌদ্ধমন্দিরের ভিতর অতি প্রশস্ত এবং নানাবিধ সরঞ্জামে পরিপাটী রূপে সুসজ্জিত। ইহার কাষ্টনির্ম্মিত বৃহৎ বৃহৎ স্তম্ভগুলি সুবর্ণ মণ্ডিত। ছাদ বৃন্ত ও পত্রসমেত একটী হীরকখচিত পদ্মপুষ্প চিত্রিত। মন্দিরের ঠিক কেন্দ্র স্থলে বেদী। এখানে বুদ্ধদেবের সহিত আরও অনেক দেবদেবীর মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। অনেকগুলি * হিন্দুদেবতা ও এইখানে স্থান পাইয়াছেন। তন্মধ্যে ইন্দ্র, শিব, এবং সরস্বতীই উল্লেখযোগ্য? মন্দিরে প্রবেশ করিয়া কিয়দ্দূর যাইলেই সম্মুখে এক হৃদয়গ্রাহী চিত্র। এখানে রত্নময় পর্ব্বতের পাদদেশে সুবর্ণহ্রদে কতকগুলি পক্ষবিশিষ্ট পরী সন্তরণ করিতেছে। উহার তীরে স্বর্গীয় বিহঙ্গমগণ দর্শকবৃন্দকে ইঙ্গিতে স্বর্গঐশ্বর্য্য দেখাইতেছে। ইহার পার্শ্বেই আর একটী চিত্র আছে, তাহাতে মানুষ অসুর, প্রেত, এবং নরকের অন্যান্য জন্তুর মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। স্বর্গ এবং নরকের পার্থক্য দেখাইবার জন্যই বোধ হয় এই দুইটী চিত্র অঙ্কিত করা হয়।

* বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে নিম্নলিখিত হিন্দুদেবগণ জাপানে প্রচলিত হইয়াছেন। বন্‌তেন্ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ; সাতেন্ অর্থাৎ অগ্নি; আইসক্ অর্থাৎ ইন্দ্র; এম্‌মা অর্থাৎ যম; শোদেন্ অর্থাৎ গণেশ; কিচিজোতেন্ অর্থৎ লক্ষ্মী; তাহীগেনহুই অর্থাৎ কার্ত্তিকের; এবং খারিতেই মো অর্থাৎ কালী; ইত্যাদি। জাপানীরা উল্লিখিত দেবদেবীর মূর্ত্তি গড়িয়া গৃহে গৃহে পূজা না করিলেও বৌদ্ধমন্দিরে প্রায়ই উহাদের মূর্ত্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে।

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ।

কাঙ্গাল হরিনাথ।

(দ্বিতীয় খণ্ড)

ব্রহ্মাণ্ড-বেদ।

এইবার হইতে আমরা কাঙ্গাল হরিনাথের অতুল কীর্ত্তি কাঙ্গালের 'ব্রহ্মাণ্ড-বেদের' কথা বলিব। কিন্তু সেই কথা বলিবার পূর্ব্বে কাঙ্গালের সম্বন্ধে আর একটী কথা বলা প্রয়োজন মনে করিতেছি।

আমি এতদিন ধরিয়া কেবল কাঙ্গালের বাউল-সঙ্গীতের কথা বলিয়াছি। ইহা হইতে কেহ যেন মনে না করেন যে, কাঙ্গাল শুধু বাউল-সঙ্গীতই লিখিয়াছিলেন। ব্রহ্মসঙ্গীত, জাতীয়সঙ্গীত, ঐতিহাসিক সঙ্গীত, কালীকীর্ত্তন, কৃষ্ণকীর্ত্তন প্রভৃতি সম্বন্ধে তিনি অসংখ্য গান লিখিয়াছেন। তিনি যে সময়ের মানুষ ছিলেন তখন আমাদের দেশে 'কবির' বড় আদর ছিল। কাঙ্গাল হরিনাথ অনেক কবির দলে ওস্তাদী করিয়াছিলেন। সে সময়ে দাশরথি রায়ের পাঁচালী গানের খ্যাতি বাঙ্গালাদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল; কাঙ্গাল হরিনাথও কয়েকখানি পাঁচালী রচনা করিয়াছিলেন; সেই সকল পাঁচালী আমাদের অঞ্চলে এবং পূর্ব্বদেশে গীত হইত এবং সে সময়ের উৎকৃষ্ট গায়ক মহাশয়েরা ও পণ্ডিতগণ একবাক্যে কাঙ্গাল হরিনাথকে দাশরথি রায়ের সমকক্ষ ব্যক্তি বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তবে কাঙ্গাল হরিনাথের পাঁচালীর মধ্যে অশ্লীল কিছুই ছিল না, থাকিবার যো ছিল না। কি পাঁচালী, কি যাত্রা, কি কবি, যে বিষয়ে কাঙ্গাল হরিনাথ গান লিখিয়াছেন, তাহার মধ্যে কোথাও অশ্লীলতার নামমাত্রও ছিল না। আমি মানসী পত্রে কাঙ্গালের সেই অসংখ্য গানের পরিচয় দিবার সুযোগ পাইলাম না; তাহা করিতে গেলে মানসীর জীবনের আরও এক বৎসর, কি তাহারও অধিক সময় কাঙ্গালের গানের কথাতেই কাটিয়া যাইত। কাঙ্গাল হরিনাথের জীবনীর প্রথম অংশ অতি সত্বর গ্রন্থকারে প্রকাশিত হইবে। মানসী পত্রে যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল, তদ্ব্যতীত কাঙ্গালের অন্যান্য-বিষয়িণী গানের বিবরণ ও অনেকগুলি নূতন গান সেই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইতেছে। কাঙ্গালের গানগুলির সম্যক পরিচয় সেই গ্রন্থেই দিবার চেষ্টা করিয়াছি। সাধক রামপ্রসাদ বলিয়াছিলেন "লাখ উকিল করে'ছি খাড়া," আমরা কাঙ্গাল হরিনাথ সম্বন্ধেও বলিতে পারি, তিনিও "লাখ উকিল" খাড়া করিয়াছিলেন——

তাঁহার রচিত গানের সংখ্যা লাখের কাছাকাছিই হইবে। কাঙ্গালের গানের সম্বন্ধে এই স্থানে আর অধিক বলিব না; এক্ষণে তাঁহার "ব্রহ্মাণ্ড-বেদের"ই পরিচয় প্রদানের চেষ্টা করিব।

কিন্তু কথাটা এখনই স্পষ্ট করিয়া বলিয়া রাখা ভাল। আমি বিনয় প্রকাশ করিতেছি না, খাঁটি সত্য কথা বলিতেছি, কাঙ্গাল হরিনাথের গানের পরিচয় আমি শুধু দুই চারিটাই গান লিপিবদ্ধ করিয়া দিয়াছি; তাহার সম্বন্ধে কোন আলোচনা করা আমার সামর্থ্যে কুলায় নাই। গানের সম্বন্ধেই যখন এমন হইয়াছে, তখন ব্রহ্মাণ্ডবেদ লইয়া আমি যে অকুল পাথারে পড়িব, তাহার আর অনুমাত্রও সন্দেহ নাই।

আমি যে কি কারণে এমন সঙ্কোচের সহিত এমন মৃদুপদবিক্ষেপে এই পবিত্র ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেছি তাহা নিম্নোদ্ধৃত "প্রকাশকের নিবেদন" হইতেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন। কাঙ্গালের "ব্রহ্মাণ্ডবেদ" গ্রন্থ যখন খণ্ডাকারে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়, তখন প্রথম খণ্ডের আরম্ভে প্রকাশক মহাশয় নিবেদন করিয়াছিলেন যে "ভক্তবৎসল ভগবান যখনই কোন ভক্তহৃদয়ে আত্ম-তত্ত্বের বিকাশ করিয়া ভক্তকে কৃতার্থ করেন, তখনই তিনি ভক্তের সেই হৃদয়োদ্যানে প্রস্ফুটিত তত্ত্ব-কুসুমের সৌন্দর্য্য-সৌরভ জগজ্জনের হিতার্থে বিতরণ করিবার নিমিত্ত তাহার প্রচারশক্তিও ভক্তহৃদয়ে প্রদান করিয়া থাকেন। ব্রহ্মাণ্ডবেদের প্রচারক কাঙ্গাল ভগবদ্দত্ত সেই শক্তির বলেই নিজের কঠোর সাধনালব্ধ হৃদয়স্থ ব্রহ্মতত্ত্বের আনন্দ জগতে বিতরণ করিবার জন্য এই ব্রহ্মাণ্ড-বেদের প্রচার করিয়াছেন। ভগবানের আত্মতত্ত্ব প্রচার শক্তির প্রেরণাই যে, তাঁহার ব্রহ্মাণ্ডবেদ প্রকাশের কারণ ইহা কাঙ্গাল স্বয়ংই প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন——

"বাস্তবিক, এই তত্ত্বটী যখন আমরা লিপিবদ্ধ করিতেছিলাম, তখন আমরা ক্ষিপ্তবৎ ব্যবহার করিতে ত্রুটী করি নাই। কখন কি লিখিয়াছি, মাথা মুণ্ড বলিয়া লেখনীকে বিশ্রামাসনে বসাইয়াছি, কখন পাগলের মত হাসিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছি, কখন এক একটী তত্ত্বের আনন্দস্রোতে ভাসিয়া আপনাকে ভুলিয়া গিয়াছে। আসন পড়িয়া আছে, উপাসনা নাই, আহারীয় প্রস্তুত, ক্ষুধা ও ভোজনে স্পৃহা নাই, দিনরাত্রি কোন্ দিক দিয়া যাইতেছে, সে জ্ঞান নাই, বন্ধু বান্ধব উপস্থিত হইলে সম্ভাষণ নাই,—কেবল লিখিতেছি।"

জগতে দুই শ্রেণীর সাধক দুই প্রকারে সিদ্ধ হইয়া থাকেন। একশ্রেণী—

শাস্ত্রোক্ত গুরুর উপদেশে ব্রহ্মতত্ত্বে দীক্ষিত হইয়া সদ্‌গুরুর কৃপায় ব্রহ্মতত্ত্ব ধারণার সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মাণ্ড-তত্ত্ব ধারণায় সিদ্ধ হন ; অপর শ্রেণী—পূর্ব্বজন্মের সুকৃতিফলে অগ্রে নিজেই ব্রহ্মাণ্ড-তত্ত্ব সূক্ষ্মরূপে আলোচনা করিয়া পরে সদগুরুর নির্দ্দেশানুসারে ব্রহ্মতত্ত্বে উপনীত হইয়া পরমানন্দ সম্ভোগ করেন। ব্রহ্মাণ্ড-বেদ প্রচারক কাঙ্গাল শেষোক্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত সাধক। তাই, তিনি যেরূপে ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্বে সমাহিত হইয়া ক্রমে ব্রহ্মতত্ত্বে উপনীত হইয়াছিলেন,ব্রহ্মাণ্ডবেদে তাহারই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রচারিত গ্রন্থের নাম "ব্রহ্মাণ্ডবেদ" হইবারও তাহাই একমাত্র কারণ। যে গ্রন্থ পাঠ করিলে ব্রহ্মাণ্ডস্থ প্রত্যেক পদার্থের অন্তস্তত্ত্ব হইতে ব্রহ্মতত্ত্বের বেদ অর্থাৎ জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহাই ব্রহ্মাণ্ডবেদ।

ব্রহ্মাণ্ডবেদের প্রথমে এই পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব হইতে সেই অপরিদৃশ্য ব্রহ্মতত্ত্বের অস্তিত্ব সংস্থাপন এবং সেই নির্গুণ ব্রহ্মপদার্থে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, মমতা প্রভৃতির সত্তা ও সচ্চিদানন্দ স্বরূপত্রয়ের সরল গভীর তত্ত্বব্যাখ্যা প্রভৃতি অতি সুন্দর ও স্পষ্টরূপে প্রকটিত হইয়াছে। তাহার পর ক্রমে বটবৃক্ষের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বীজ হইতে কাণ্ড শাখা প্রশাখা ইত্যাদির বিস্তৃতির ন্যায় ব্রহ্মতত্ত্বের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অবস্থা হইতে পরতঃপর স্থূলাবস্থায় পরিণতিতত্ত্ব যেরূপ অপূর্ব্বভাবে বিন্যস্ত হইয়াছে, সাধনতত্ত্বপিপাসু নিজে পাঠ করিয়া অনুভব না করিলে অন্যের কথায় বা লেখায় তাহা ব্যক্ত হইবার নহে।

ব্রহ্মাংশ জীবের ব্রহ্মতত্ত্বে আত্মমজ্জন করিতে হইলে যোগ, জ্ঞান, ভক্তির যে কোন পথে যেরূপে অগ্রসর হইতে হইবে, গিরিরাজের কৈলাসধামে শিবশক্তি—উমা মহেশ্বরের সন্নিধানে উপস্থিতি প্রসঙ্গে তাহা অতি সুন্দরভাবে লিখিত হইয়াছে। সংযম, ধ্যান, ধারণা, সমাধি ইত্যাদি সাধনার অঙ্গ সমূহ ; সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, আদি গুণসমূহের আধিক্যভেদে জীবের প্রকৃতিভেদ, সাকার নিরাকারতত্ত্বের মধুর সম্মিলন ইত্যাদি নানাভাবরসাত্মক তত্ত্বের বিস্তৃত ব্যাখ্যা সাধনোন্মুখ সাধকগণের সম্বন্ধে যথার্থই পথিপ্রদর্শক শিক্ষাগুরুরূপে কার্য্য করিতেছে। সংসারের ক্ষণস্থায়ী ঐশ্বর্য্যসুখে নিস্পৃহ হইয়া যাঁহারা ব্রহ্মৈশ্বর্য্যের অতুল আনন্দের অভাবে যথার্থই কাঙ্গাল সাজিয়াছেন, তাঁহারা কাঙ্গালের ব্রহ্মতত্ত্বামৃতপূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডবেদে অতুল আনন্দ, পরমা প্রীতি, ব্রহ্মরসাস্বাদে প্রভূত তৃপ্তিলাভ করিতে পারিবেন, সন্দেহ নাই।

কাঙ্গাল সংসারের চক্ষে কাঙ্গাল হইয়া কুটীরে বাস করিলেও তাঁহার ব্রহ্মাণ্ড-বেদোদ্যানের বিস্তৃতি নিতান্ত অল্প নহে। তিনি সুবৃহৎ ছয়খণ্ড ব্রহ্মাণ্ড-

এই আমিত্ব সম্বন্ধে কাঙ্গালের আরও দুইটী গান আছে। তাহা যেমন সরল, তেমনই সুন্দর। ব্রহ্মাণ্ডবেদের প্রথমেই যে আত্মজ্ঞানের অভাস আছে, এই গান দুইটী তাহারই উদ্দীপক। আমরা নিম্নে সেই দুইটী গানই উদ্ধৃত করিলাম।

প্রথম গান।

আমি ব'লে করে বড়াই সবে মনে।
আমি যে কি, তা কি আমি জানে।

১। আমি কর্ম্ম করি ভাই, আমি আনি খাই,
আমি চ'লে বেড়াই সর্ব্বস্থানে ;
আবার জিজ্ঞাসিলে আমি, আমি বলি আমি,
বেঁচে আছি আমি প্রাণে প্রাণে। (আমি আমারে কয়)

২। ওরে, আমি দুঃখ সই, আমি সুখী হই,
আমি কথা কই আমি জানে ;
এ কি চমৎকার ধাঁধা, আমি নিজে আঁধা,
আমি কিন্তু ভাই, আমি দেখিনে। (আমি ব'লে মরি)

৩। ওরে, কাঙ্গাল বলে হায়, যে জন আমির গোড়ায়,
আমি আমি বলায় সর্ব্বজনে ;
তারে না জানিলে ভাই, কার সাধ্য নাই,
আমি হ'য়ে আমি, আমি চেনে। (ভূতের ঘরে ব'সে)

দ্বিতীয় গান।

ও তুমি কি খেলা খেলিছ ভবে, কে তা বুঝবে ভেবে।
কে তা বুঝবে ভেবে হায়, বুঝবে ভেবে অনুভবে।

১। আমি আমি বলি আমি, আমি কি বুঝিলে আমি ;
আমি কে, তা বুঝলে আমি হায়, তুমি কে তা বুঝতাম ভবে।

১। আমি আমি বলি আমি, আমি কি বুঝিনে আমি ;
'আমি কে, তা বুঝলে আমি হায়, তুমি কে তা বুঝতে তবে !

২। মাটীর ঘরে থেকে আমি, ভাবছি একঘর মানুষ আমি ;
এই মত কি থাকবে আমি হায়, এঘর ছেড়ে যাব যবে।

৩। এ জগৎ ভাবি যে সময়, আমি যে ধূলিকণাও নয় ;
দীন হীন কাঙ্গাল কয় হায়, কিসের অহঙ্কার তবে।

এই আমিজ্ঞান বা আত্মতত্ত্বই সাধনার প্রথম সোপান। কাঙ্গাল অতি সহজ ভাষায় তাঁহার অনুপম গীতে এই আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই ব্রহ্মাণ্ডবেদের আরম্ভ। এই আত্মতত্ত্ব হইতে সাধক কেমন করিয়া ক্রমে ক্রমে সাধনের উচ্চস্তরে যান, তাহার কথা এই গ্রন্থে ও কাঙ্গালের গানের নানাস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। আমি হইতে কেমন করিয়া তুমি, তার পর তিনি, তারপর এই পরিদৃশ্যমান জগৎ, তারপর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এক হইয়া যায়, নিম্নলিখিত গানে তাহার আভাস পাওয়া যায়।

অপরূপ মহিমায় রে।
ভুবন ভুলায় আমার জীবন ভুলায় রে।

১। অরূপীর রূপ এসে, যখন রে হৃদাকাশে,
মহিমা পরকাশে আনন্দ প্রভায় রে;
ওরে, গগনে গগনে তখন, আনন্দময় তারা তপন,
ভেসে যায় এ তিন ভুবন আনন্দধারায় রে।

২। তারা চাঁদ আলো করে, জগতে আঁধার হরে
অরূপের স্বরূপ হেরে হৃদয়-আঁধার যায় রে;
যখন রে সেই রূপরসে, ওরে আপন স্বরূপ যায় রে মিশে,
তখন আর পাইনে দিশে, আমি যে কোথায় রে।

৩। ত্রিভুবন আছে যাঁতে, তাঁরে দেখি আমাতে,
আমার আমিত্ব আবার তাঁতে যে মিশায় রে;
ওরে, ভুলে যাইরে অন্য সব, জপমন্ত্র কেবল বাসুদেব,
মা-ধব মাধব প্রভাব হিয়ায় রে।

৪। তিনি নাই বলে যারা, এ হৃদয় মাঝে তারা,
একবার রে এসে ত্বরা দেখে যাক্ তাঁহায় রে;
ওরে, একবার দেখ্‌তে পেলে তাঁরে, তিনি নাই আর বল্‌বে নারে,
ভেসে দুই নয়ন-নীরে বিকাবে তাঁর পায় রে।

৫। কি ধন আর আছে ঘরে, আমি কি দিব তাঁরে,
আমি কেবল আমার ঘরে ছিলাম, দিলাম তাঁয় রে;
ওরে, অন্য উপায় নাহি হেরি, আমি যে আমিত্ব হরি,
দিয়ে রে নয়ন-বারি চরণ ধোয়াই রে।

৬। অরূপীর রূপের রেখা, একবার যে পায়রে দেখা,
সে জানে মধুমাখা কত যে তাঁহায় রে ;
সে যে মত্ত হ'য়ে মধুপানে, ভ্রমণ করে পাগল প্রাণে,
কাঙ্গালের কতদিনে সে দিন হবে, হায় রে।

শ্রীজলধর সেন।

জন্মভূমি

তব দীপটি জ্বালে সূর্য্যশশী
পদ চুম্বে জলধি,
মৃদুমন্দে মধুছন্দে
নিতি পদ বন্দে জগতী !
জলদ জালে—কচকলাপ—
তারকাহারে খচিত
আঁচল রাঙা, ধানের শীষে,—
দুকুল চারু রচিত।

তুমি অযুত সুত যুত স্নাত
গঙ্গা পূত সলিলে
তালবীথিকা বীজনরত
সুরভি ভরা অনিলে।
দাসের মত ছয়টি ঋতু
অবধানে ও আদেশে
বিহগগণে ঘোষিছে তব
কীর্ত্তি দেশে বিদেশে।

তব তুচ্ছ তৃণে গুচ্ছে রচা'
মলিন ধূলি শিথানে
নীরব বীণা ঝঙ্কারিল
কবির করে কি গানে—

মঞ্জরিল শুষ্ক লতা
গুঞ্জরিল বিহগে,
ক্রৌঞ্চসহ ক্রৌঞ্চী গেল
অমর মন-স্বরগে।

ওগো, পাইল প্রাণ কাব্য কত
পুণ্য-গাথা ধর্ম্ম
তোমার গেহে সে কোন যুগে
ভাবিতে ভরে মর্ম্ম!
অট্টালিকা ছিলনা এত
তাড়িতালোক দৃপ্ত,
কুটির ভরা রত্ন ছিল
অশেষ মহাদীপ্ত!

হেথা আছিল ঋষি অমর ত্যাগী—
মগ্ন ধ্যানে নিয়ত,
রাজ্য প্রজা পালিত রাজা
পিতৃস্নেহে নিরত;
চাতুরী ছলা মানুষগুলা
জানিত নাক' বিন্দু,
রমণী ছিল দেবীর পীঠে
বিমল সুখ ইন্দু।

ওগো, এই সে ধূলি—কতনা বীর
রক্তে রাঙা পড়িয়া,
এই সে ভূমি, যেথায় লোকে
বাঁচিয়া থাকে মরিয়া;
এই সে দেশ আমার, ওগো—
জন্মভূমি—স্বর্গ!
যাহার তরে আজিকে কবি
রচিল গীত-অর্ঘ্য।

শ্রী বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

বঙ্গভাষায় বিজ্ঞানচর্চ্চা।

আজ আমরা এক যুগসন্ধিস্থলে উপনীত হইয়াছি। এখন সমস্ত দেশের মধ্যে প্রকৃত শিক্ষাবিস্তারের জন্য একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। চতুর্দ্দিকে নব নব বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া জগতের জ্ঞানসম্ভার ভারতবাসীর নিকট বিতরণের আয়োজন চলিতেছে। কাজেই এ সময় আমাদের একটু ধীরভাবে চিন্তা করিতে হইবে, ঠিক কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে আমাদের শিক্ষাপ্রণালী অচিরে সুফল প্রসব করিতে পারে।

প্রথম কথা উঠিতেছে এই যে, কোন্ ভাষার সাহায্যে শিক্ষাদান-কার্য্য প্রধানতঃ সম্পাদিত হইবে। হিন্দি প্রভৃতি অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষার প্রচলন সম্বন্ধে যাহাই হউক না কেন, বাংলা ভাষা সম্বন্ধে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বর্ত্তমান কালে এই ভাষা যেরূপ পরিপুষ্ট ও সৌষ্ঠব-সম্পন্ন হইয়াছে, তাহাতে ইহার সাহায্যে উচ্চ অঙ্গের শিক্ষাদান অনায়াসে চলিতে পারে। এই কথাটী তলাইয়া বুঝিতে গেলে বঙ্গদেশে ইংরাজিশিক্ষার প্রচলন ও বঙ্গভাষার ক্রমোন্নতির ইতিহাস পর্য্যালোচন করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে সংক্ষেপে কয়েকটী কথা বলিতেছি।

এদেশে রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে ইংরেজি শিক্ষার সূচনা। সে সময় আমাদের দূরদর্শী পূর্ব্বপুরুষগণ বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন, যে ভাবে আবহমান-কাল আমরা চলিয়া আসিতেছি সেভাবে থাকিলে আর চলিবে না। মহাত্মা রামমোহন অখণ্ডনীয় যুক্তিপূর্ণ একখানি পত্রে তদানীন্তন বড়লাট লর্ড আমহর্ষ্টকে জানাইয়াছিলেন, ইংরাজ গবর্মেণ্ট যদি ভারতে শিক্ষাবিস্তারের জন্য অর্থব্যয় করেন, তবে সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করিয়া কতকগুলি "টুলো" পণ্ডিতের সৃষ্টি করিলে কোনও উপকার না হইয়া বরং অপকার হইবে। এই কারণে তিনি আবেদন করিলেন যে, 'যাহাতে গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, শারীরবিদ্যা, প্রভৃতি মহোপকারী বিজ্ঞানসমূহের চর্চ্চা এদেশে প্রবর্ত্তিত হয়, গবর্মেণ্ট যেন তাহারই ব্যবস্থা করেন। ১৮১৭ হইতে ১৮৩০ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত শিক্ষাবিষয়ে যে আন্দোলন চলিয়াছিল, তাহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় তৎকালীন সামাজিক নেতৃগণ ও ইংরাজ রাজপুরুষগণ একযোগে চেষ্টা করিয়া ইংরাজি ভাষার সাহায্যে পাশ্চাত্য জ্ঞান প্রচারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাহাতে যে দেশের অশেষ কল্যাণ সংসাধিত হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য।

সেই সময় হইতে প্রায় ৮০।৯০ বৎসর ধরিয়া ইংরাজি ভাষা অবলম্বনে শিক্ষা-দান চলিয়া আসিতেছে। ইহা ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। প্রথমতঃ আমাদের গদ্য-সাহিত্য ছিল না বলিলেও হয়। রাজা রামমোহন রায় ও শ্রীরামপুরের মিশনরিগণকে বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের প্রবর্ত্তক বলা যাইতে পারে। কাজেই সে সময় আমাদের জ্ঞানতৃষ্ণার পরিতৃপ্তির জন্য ইংরাজি-সাহিত্যের আশ্রয় গ্রহণ অনিবার্য্য ছিল। তাই অধ্যাপকশ্রেষ্ঠ ডিরেজিওর সময় হইতে একদিকে বেকন্, লক, হিউম, এডাম স্মিথ প্রভৃতি দার্শনিকগণ ও অপর দিকে সেক্সপিয়র, মিল্টন, বাইরণ, শেলি প্রভৃতি কবিগণ আমাদের চিন্তারাজ্য অধিকার করিয়াছেন। আর বিজ্ঞানের ত কথাই নাই। নিউটন, ফ্যারাডে, কেলভিন, ডারউইন, স্পেন্সার, হাক্সলি প্রভৃতি যেমন ইউরোপীয়দিগের উপর সেইরূপ আমাদের উপরও আধিপত্য ও প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন। আমরা ইংরাজি-সাহিত্যে অনুপ্রাণিত হইয়া গিয়াছি। ইংরাজি-সাহিত্যের নিকট আমাদের বর্ত্তমান বঙ্গভাষা যে বহুপরিমাণে ঋণী, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার বিশেষ অবকাশ আছে বলিয়া মনে হয় না।

কিন্তু সুখের বিষয়, ইংরাজিশিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশবাসি-গণের মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ হ্রাস না পাইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। রাজা রামমোহনের পর বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ প্রতিভাশালী লেখকগণ বিদেশীয় ভাষা বর্জ্জন পূর্ব্বক দেশীয় ভাষার সেবায় জীবন উৎসর্গ করিলেন। এই সকল ক্ষমতাবান ব্যক্তি যে কোনও দেশে যে কোনও ভাষায় লেখনী-চালনা করিলে সেই দেশ ও সেই ভাষাকে গৌরবমণ্ডিত করিতেন সন্দেহ নাই। ইহাঁদের সাধনার ফলে আজ বাংলা ভাষা ভারতের যাব-তীয় প্রাদেশিক ভাষার মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। হিন্দী,মারাঠী প্রভৃতি ভাষা বোধ হয় বাংলা ভাষার ৫০ বৎসর পিছনে পড়িয়া আছে। সম্প্রতি কয়েক-জন দেশহিতৈষী মারাঠী ও হিন্দুস্থানী লেখক, বাংলা ভাষার উৎকৃষ্ট গ্রন্থ সমূহ নিজ নিজ ভাষায় অনুবাদ করিয়া আপনাদিগের ভাষার পুষ্টিসাধন করিতেছেন। ইহা বাঙালীর সামান্য গৌরবের কথা নহে। অল্পকালের মধ্যে বাঙালী তাহার মাতৃভাষার যেরূপ উন্নতিবিধান করিয়াছে তাহা ভাবিলে আর তাহাকে অকর্ম্মণ্য বলা চলে না। এক বিষয়ে যাহারা এতটা শক্তির পরিচয় দিয়াছে অপর বিষয়েও যদি তাহারা তাহাদের ঐকান্তিক সামর্থ্য প্রয়োগ করে, তাহা হইলে বিশ্বের বিদ্বৎসমাজে যে তাহারা একেবারেই উপেক্ষণীয় ও অনাদরণীয় হইবে, এরূপ আমার মনে হয় না।

কিন্তু এই স্থলে আমাকে দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইতেছে যে বাংলা ভাষার একটী বড় ত্রুটী পরিলক্ষিত হইতেছে। ইংরাজি, জর্ম্ম্যান প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ ভাষায় যথেষ্ট পরিমাণে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ রচিত হইয়াছে এবং হইতেছে, কিন্তু বাংলায় তাহার সম্পূর্ণ অভাব। কাব্য, উপন্যাস, ইতিহাস, রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, প্রভৃতি বিষয়ে বাংলায় অনেক সুন্দর সুন্দর পুস্তক থাকিলেও পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক বিষয়ে উল্লেখযোগ্য পুস্তক নাই বলিলেই হয়। এই জন্য বলিতে হইবে আমাদের ভাষার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হয় নাই। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে বঙ্গভাষার গতি দেখিয়া এ বিষয়ে যতটুকু আশা করা গিয়াছিল পরবর্ত্তীকালে তাহাও বিসর্জ্জন করিতে হইয়াছিল। তখন যেমন একদিকে বিদ্যাসাগর সাধারণ গদ্য-সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে ব্রতী হইয়াছিলেন, অপরদিকে সেই সময়েই অক্ষয়কুমার ও রাজেন্দ্রলাল বৈজ্ঞানিক-সাহিত্যের সৃষ্টি ও পুষ্টি বিধানের নিমিত্ত আপনাদের প্রাণপণশক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন। সে সময়ের তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা ও বিবিধার্থ-সংগ্রহ, নানা উপাদেয় বৈজ্ঞানিক-সন্দর্ভে সুশোভিত থাকিত। তাহা দেখিয়া কাহার না আশা হইত যে কালক্রমে বঙ্গ-ভাষা বৈজ্ঞানিক-সাহিত্য-সম্পদে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠভাষাসমূহের সমকক্ষ হইবে। কিন্তু সে আশা ফলবতী হইল না। অক্ষয়কুমার ও রাজেন্দ্রলাল যখন বৃদ্ধবয়সে রোগের যাতনায় অর্দ্ধমৃত অবস্থায় জীবন যাপন করিতেছিলেন সেই সময়েই—তাঁহাদের জীবনকালেই—তাঁহারা দেখিতে পাইলেন বাংলাভাষায় আর বিজ্ঞানালোচনা প্রসার লাভ করিতেছে না। এমন কি যে বঙ্গদর্শন আমা-দের জাতীয়-সাহিত্যে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিল, তাহাতেও বৈজ্ঞানিক সাহি-ত্যের গৌরব সম্যক রক্ষিত হয় নাই।

এখন এই যে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানালোচনা অগ্রসর হইল না, ইহার কারণ কি? প্রধান কারণ দেশে বিজ্ঞানশিক্ষার অভাব। যদিও অসামান্য মনস্বী রামমোহন বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রচলন হইবে এই আশাতেই ইংরাজীশিক্ষার সপক্ষে মত দিয়াছিলেন, তথাপি আমাদের দেশে ইংরাজি দর্শন ও সাহিত্যই প্রধানতঃ শিখান হইত, প্রকৃত প্রস্তাবে বিজ্ঞান-শিক্ষা এই সে দিন মাত্র আরম্ভ হইয়াছে। দেশের লোকও কোনদিন বিজ্ঞান-শিক্ষার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে নাই। বিজ্ঞান লইয়া তাহারা করিবে কি? সত্য বটে বিজ্ঞানের সাহায্যে নানা কলকারখানার প্রতিষ্ঠা করা যায়, কিন্তু ব্যবসা বাণিজ্যের সহিত ত বাঙ্গালীর ফারখৎ। বাঙ্গালী

ওকালতী ও কেরাণীগিরি করিবে। কাজেই যেদিন আদালত ও আফিস হইতে পারসি উঠিয়া গিয়া ইংরাজির চলন হইল সেইদিন হইতে বাঙালী এই কটমট বিদেশী ভাষাটিকে আয়ত্ত করিবার জন্য প্রাণপণ করিল। যখন দেখা গেল বিশ্ব-বিদ্যালয়ের "ছাপ"-ওয়ালা লোকের বড় কাট্‌তি, তখন দলে দলে লোকে সেই "ছাপটীর" জন্য ঝুঁকিয়া পড়িল। ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। সকল দেশেই জীবিকার সহিত যে বিদ্যার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক লোকে তাহারই আদর করিয়া থাকে। এদেশে বৈজ্ঞানিকের কাট্‌তি ছিল না, কাজেই বিজ্ঞান-শিক্ষার জন্য লোকের আম-দানী হইল না। অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয় যে, আইন আদালত ও সরকারি আফিস স্থাপনের পর ভূবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, ত্রিকোণমিতি প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক বিষয়ে এ দেশের সংবাদ সংগ্রহের জন্য যে সকল সরকারী বিভাগের সৃষ্টি হইল, সে সকল বিভাগেও দেশবাসিগণকে প্রবেশাধিকার দেওয়া হইল না। কাজেই বৈজ্ঞা-নিকের জীবিকার্জ্জনের কোন পন্থাই পরিদৃষ্ট হইল না। তাই বাঙালা সাতসমুদ্র তেরনদী পার হইয়া, অনেকে পৈত্রিক যথাসর্ব্বস্ব খোয়াইয়া বিলাত যাইতে আরম্ভ করিলেন বটে; কিন্তু যে কিসের নিমিত্ত?—কি জ্ঞান অর্জ্জনের জন্য?—কি বিদ্যালাভের জন্য?—বিদ্যালাভই কি তাঁহাদের অভিপ্রেত ছিল? জ্ঞানার্জ্জনের স্পৃহাই কি তাঁহাদিগকে বিদেশে তাড়াইয়া লইয়া গিয়াছিল? তাহা নহে। মাতার সেই দুলালগণ, জননীর অঞ্চল ত্যাগ করিয়া বিদেশে বিভূমিতে ছুটিয়া গিয়াছিলেন অর্থকরী বিদ্যা অর্জ্জন করিতে, সিবিল সার্ব্বিস পাশ করিয়া, ও ব্যারিষ্টার হইয়া আপনাদিগকে রজতখণ্ডের রাজা করিবার অভিপ্রায়ে—বিজ্ঞান-শিক্ষার জন্য নহে। অবশ্য তাঁহাদের দ্বারা যে বঙ্গভাষার ও বঙ্গভূমির উপকার সাধিত হয় নাই, একথা বলিতেছি না। আজকাল কেহ কেহ বিজ্ঞান-শিক্ষার জন্য বিলাত যাইতেছেন বটে, কিন্তু তাঁহারাও দেশে আসিয়া কোনও কলকারখানা স্থাপন করিতে পারিতেছেন না এবং ভগ্নহৃদয় হইয়া পড়িতেছেন। সত্য বটে বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞানশাস্ত্রে উপাধি দিতেছেন কিন্তু উপযোগী কর্ম্মের অভাবে আমাদের এই সকল বি, এস সি ও এম, এস সির মধ্যে শতকরা ৯৯ জন আইন বিদ্যালয়ের শোভা বর্দ্ধন করিতেছেন। যে দিন দেশে ব্যবসা বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়া বৈজ্ঞানিকের কর্ম্মক্ষেত্র প্রস্তুত হইবে, ও বৈজ্ঞানিক বিভাগসমূহে ভারতবাসীদের প্রবেশাধিকার হইবে, সেইদিন হইতে বিজ্ঞানের যথোচিত আদর হইবে। তখনই এমন একদল লোক জন্মগ্রহণ করিবেন যাঁহারা বিজ্ঞান-চর্চ্চায় জীবন উৎসর্গ করিবেন। তাঁহারা যে সকল

তত্ত্ব উদ্ঘাটিত করিবেন তাহার সারাংশ মাতৃভাষার সাহায্যে প্রচার করিলে তবে বৈজ্ঞানিক-সাহিত্যের পরিপুষ্টি সাধিত হইবে।

হার্ব্বাট স্পেনসার স্বীয় শিক্ষা-সম্বন্ধীয় গ্রন্থে, ইংলণ্ডের সাধারণ লোকের শিক্ষার জন্য কোন্ কোন্ বিষয়ের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন, তদ্বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বৈজ্ঞানিক শিক্ষার সপক্ষে যে তর্কপ্রণালীর অবতারণা করিয়াছেন তাহা ভারতবর্ষের—বিশেষতঃ বঙ্গদেশের শিক্ষা সম্বন্ধেও সম্পূর্ণরূপে খাটে। বঙ্গদেশে সাধারণের জন্য কি প্রকার জ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজন তাহা নির্ণয় করিবার জন্য অধিক বিতণ্ডার আবশ্যক নাই। মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা প্রথম প্রয়োজন সুস্থ সবল নীরোগ দেহে জীবনযাপন করা। তৎপরে যাহাতে শারীরিক ও মানসিক সৌন্দর্য্যের বিকাশ হয়, তদুপযোগী শিল্প শিক্ষা করা। স্পেন্সার দেখাইয়াছেন যে, বিজ্ঞান শিক্ষাই মানুষের প্রথম প্রয়োজন। কাব্য ও ললিত-কলার শিক্ষা পরে প্রয়োজন। কি নিয়মে বৃক্ষলতাসমূহ ফল ও ফুল প্রদান করে, কি নিয়মে ভূমির উর্ব্বরতা শক্তির হ্রাসবৃদ্ধি হয়, কি প্রণালীতে দেশের রাস্তা, খাল, জলাশয়, বাগান, নগর, গ্রাম ও গৃহসমূহ নির্ম্মিত হইলে দেশ স্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে, বাঙ্গালা দেশের খনিজ ও উদ্ভিজ্জজাত উপাদানসমূহ কোথায় এবং কিরূপ ভাবে অবস্থিত রহিয়াছে, কিরূপ উপায়েই বা তাহাদের সংযোগ-বিয়োগের ফলে দেশের ধনবৃদ্ধি হইয়া পরোক্ষভাবে দেশের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে পারে, এবং কি উপায়েই বা রেল ইঞ্জিন ও অন্যান্য কলসমূহ নির্ম্মিত ও পরিচালিত হয়, তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞান যাহাতে দেশমধ্যে বিশেষভাবে প্রচারিত হয়, তাহাই দেশের সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় শিক্ষা।

বঙ্গদেশে একাল পর্য্যন্ত ইংরাজী ভাষার সাহায্যেই বিজ্ঞান-শিক্ষা হইয়া আসিয়াছে। এক্ষণে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাহাতে বাঙ্গালাভাষায় বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রচলন হয় তদ্বিষয়ে আন্দোলন করিবার সময় আসিয়াছে। বিজ্ঞানের শিক্ষা স্বয়ং প্রকৃতির নিকট হইতেই শিক্ষালাভ। উহা মাতৃভাষাতেই হওয়া উচিত। একটা বিদেশীয় ভাষার কবলে উহাকে আবদ্ধ রাখা উচিত নহে।

বাঙ্গালাদেশে যে বিজ্ঞানশিক্ষা সম্যক ফলদায়ক হয় নাই তাহার দুইটী কারণ:—

প্রথমতঃ, গবর্ণমেন্টের বিবিধ বৈজ্ঞানিক-বিভাগে দেশীয়দিগের প্রায়

প্রবেশাধিকার ছিল না। কাজেই সুবিধার অভাবে তাহাদের শিক্ষা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই।

দ্বিতীয়তঃ, ইংরাজী-ভাষার সাহায্যে শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থাতেও বিজ্ঞান-শিক্ষার বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। এদেশের লক্ষ লোকের মধ্যে মাত্র দশ জন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করে। তাহাদের মধ্যেও বোধ হয় চারি আনা আন্দাজ অর্থাৎ লাখের মধ্যে ২৷৷০ জনের বেশী বিজ্ঞানের ধার ধারে না। কাজেই অবশিষ্ট অগণ্য লোকের পক্ষে বিজ্ঞানের দ্বার রুদ্ধ করা হইয়াছে বাঙ্গালা দেশে যদি বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চ্চা হইত তাহা হইলে এতদিনে বিজ্ঞান-সম্বন্ধে কত ভাল ভাল পুস্তক লিখিত হইত। সেই সকল পুস্তকের সাহায্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ব্যতীত আরও অনেক লোকে বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে পারিত। ইংলণ্ডে বিজ্ঞানের উন্নতি বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকের অপেক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরের লোকের দ্বারাই অধিক হইয়াছে। যদি ইংলণ্ডে সমুদায় বিজ্ঞানচর্চ্চা জাপানী-ভাষায় হইত তাহা হইলে সেখানে কি ফ্যারাডে বা ডেভি জন্মিতে পারিত ?

যাঁহারা ইংরাজী ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়া বিজ্ঞান শিক্ষা করেন তাঁহাদের ক্ষতি সামান্য নহে। স্পেন্সার ইংরাজছাত্রের সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, বাঙ্গালীছাত্রের ইংরাজীশিক্ষা সম্বন্ধেও সে কথা বলা যায়। ইংরাজী-শিক্ষার্থী বাঙ্গালী ছাত্রকে বাল্যকাল হইতেই কতকগুলা শব্দের উচ্চারণ ও বানান অতি কৃত্রিমভাবে কণ্ঠস্থ করিতে হয়। ঐ শিক্ষার সময় তাহার বিচারশক্তি কিম্বা পর্য্যবেক্ষণশক্তির বিকাশ করিবার কোনও সুযোগই হয় না, শুধু স্মৃতিবদ্ধ করিবার শক্তিই বৃদ্ধি পায়। প্রকৃত বিজ্ঞান-শিক্ষার্থী ছাত্রকে প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে—বিচার করিতে হইবে। প্রমাণের দ্বারা কোন বিষয় সত্য বলিয়া অবধারিত হইলে বিজ্ঞান-শিক্ষার্থী ছাত্র তাহা গ্রহণ করিবে। কিন্তু ভাষাশিক্ষার্থীকে পুস্তকের কথা ও শিক্ষকের বাক্যকে প্রতি পদেই বিনাবিচারে মানিয়া লইতে হইবে। ইহাতে বোঝা যাইতেছে যে, ভাষা-শিক্ষার সময়ে মানসিক চিন্তা যে প্রণালী-গত হয়, বিজ্ঞান-শিক্ষার জন্য প্রায় তাহার বিপরীত চিন্তা-প্রণালীর প্রয়োজন। এই কারণে যে সকল ভারতীয় ছাত্রের বাল্যকাল ভাষাশিক্ষাতেই অতি-বাহিত হয়, পরবর্ত্তীকালে তাহারা মৌলিক গবেষণায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে সমর্থ হয় না। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, জাপানী ছাত্রগণকেও ত

বিদেশীয় ভাষায় বিজ্ঞানাদি চর্চ্চা করিতে হয়। ইহার উত্তরে এই বলা যায় যে, জাপানীরা আজিও মৌলিক গবেষণায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে পারে নাই। আর জাপানীদের বিদেশীয় ভাষা শিক্ষা বাঙ্গালীদের ইংরাজী শিক্ষা অপেক্ষা অনেক সহজ। তাহারা ইংরাজী ভাষার উচ্চারণ ও Idiom এর বিশুদ্ধিরক্ষার জন্য আদৌ ব্যস্ত নহে। শুধু ইংরাজী ও জার্ম্মান ভাষায় লিখিত পুস্তক পড়িয়া তাহার অর্থ পরিগ্রহ করিতে পারিলেই তাহারা যথেষ্ট মনে করে।

ইংরাজীভাষায় খুব ভালরূপে ব্যুৎপত্তিলাভ করিবার চেষ্টা আমাদের পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র। আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন, ইংরাজী ভাষা কখনও ইংরাজের মত আয়ত্ত করিতে পারিব না। মাইকেল, কাশীপ্রসাদ ঘোষ ও বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি এই চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের "The captive Lady, The Shair ও "Rajmohan's wife" এখন কয়জনই বা পড়ে, এবং কয়জনেই বা ইহাদের নাম জানেন। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই নেশা শীঘ্র ছুটিয়া গেল। বাগ্‌দেবী শ্রীমধুসূদনকে স্বপ্নে বলিলেন—

"ওরে বাছা! মাতৃকোষে রতনের রাজী,
এ ভিখারী দশা তবে কেন তোর আজি।

এবং কবি বড় দুঃখে গাহিয়াছিলেন :—

হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন
তা সবে (অবোধ আমি) অবহেলা করি
পরধনলোভে মত্ত।

শ্রীমধুসূদন মাতৃভাষার সেবক হইয়া অমরত্ব লাভ করিলেন, কাশীপ্রসাদ নিধুবাবুর ঢংএর যে সঙ্গীত রচনা করিলেন তাহাই কেবল টিকিয়া গেল। আর বঙ্কিমচন্দ্রের ত কথাই নাই।

যদি সক্রেটিস, প্লেটো, এরিষ্টটল প্রভৃতি দার্শনিকদিগের মতবাদ গ্রীক ভাষা শিক্ষা করিয়া জানিতে হইত, তাহা হইলে ইউরোপের শিক্ষিত লোকের মধ্যে শতকরা কয়জন লোক সে দিকে অগ্রসর হইতেন? যদি হিব্রু শিখিয়া বাইবেল পড়িতে হইত তবে পৃথিবীর লক্ষলোকের মধ্যে কয়জনমাত্র তদ্বিষয়ে সফলকাম হইতেন? আমাদের দেশেও যদি সংস্কৃত না পড়িয়া রামায়ণ ও মহাভারত পড়িবার সম্ভাবনা না থাকিত, তবে দেশের কি দারুণ দুর্গতিই না হইত। শিক্ষিত জাপানী ও জর্ম্মানগণের অনেকেই ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজী উচ্চারণ করেন, তাঁহাদের ইংরাজী

৺ জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।
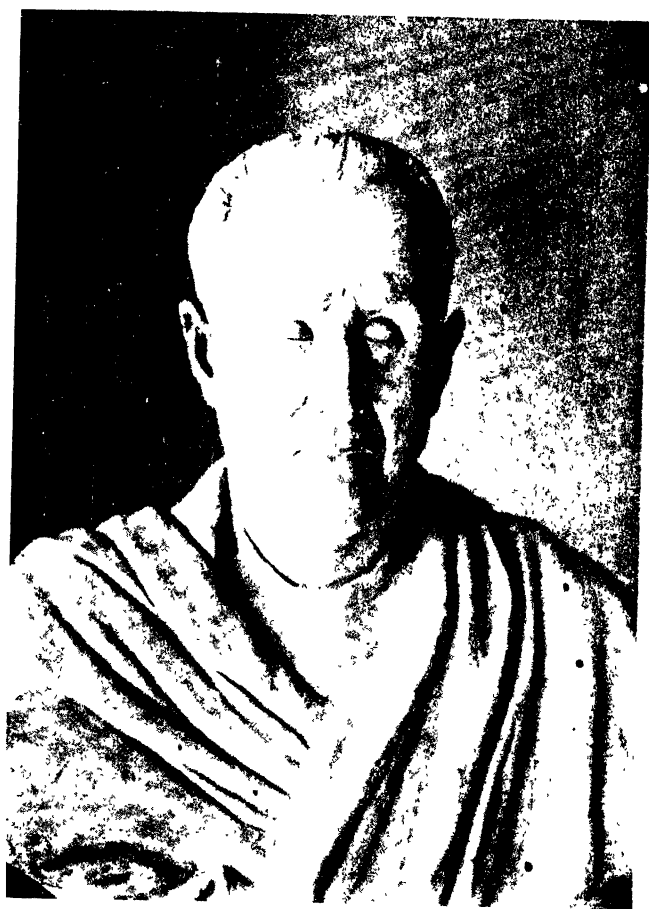
[শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুমতি অনুসারে।]

ভাষার উচ্চারণ ইংরাজদের ফরাসীভাষার উচ্চারণের ন্যায় অদ্ভুত ও হাস্যোদ্দীপক। কিন্তু তাহাতে কিছু আসে যায় না। জাপানী যেটুকু ইংরাজী জানেন তাহাতেই তাঁহারা ইংরাজী গ্রন্থের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারেন, এবং আবশ্যকমত ইংরাজীতে কিছু কিছু কথাবার্ত্তাও কহিতে পারেন। আমি নিজের কথাই বলিতেছি :— রসায়ন চর্চার অনুরোধে আমাকে জর্ম্মান ও ফ্রেঞ্চ গ্রন্থ অহরহ অধ্যয়ন করিতে হয়। এই সকল গ্রন্থ বুঝিতে আমার কোনও অসুবিধা হয় না। যদি রাসায়নিক গ্রন্থ ছাড়া অন্য গ্রন্থ পড়িতে হয় তাহা হইলেই আমার মহাসঙ্কট উপস্থিত হয়।

ইংরাজ বা জর্ম্মানের পক্ষে ফরাসী বা গ্রীক শিখিতে যে কষ্ট, আমাদের পক্ষে ইংরাজী শিখিতে তদপেক্ষাও অধিক কষ্ট। কারণ ফরাসী, গ্রীক, ও ইংরাজী প্রভৃতি ভাষায় অনেক শব্দ এক এবং ভাষার রীতিও অনেকটা এক। ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডে সিভিল সার্ভিসের জন্য এককালে পরীক্ষাগ্রহণ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইলে, সিভিলসার্ভিস ভারতবাসীর দ্বারা ভরিয়া যাইবে বলিয়া যে সকল ইংরাজ আপত্তি করিয়াছেন তাঁহাদের আপত্তি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, পরন্তু হাস্যজনক। ইংরাজ ছাত্রগণ স্বজাতীয় ভাষায় অর্জ্জিত জ্ঞানের সাহায্যে পরীক্ষা দিবে, আর ভারতবাসীগণকে বিদেশীয় ভাষা শিখিয়া সেই ভাষায় পরীক্ষা দিতে হইবে। ইংরাজ ছাত্রগণের এইরূপ একটা প্রধান সুবিধা থাকা সত্ত্বেও যে তাহারা দলে দলে ভারতীয় পরীক্ষার্থীগণের দ্বারা পরাভূত হইবে এরূপ ভাবনা কেবল রহস্যজনক।

বর্ত্তমানকালে ইংরাজী শিক্ষার জন্য আমাদিগকে যে উচ্চ মূল্য দিতে হয় তাহা ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। বয়স ছয় বৎসর হইতে না হইতেই আমরা শিশুর হস্তে First Book of Reading প্রদান করি; এবং আট বৎসর বয়সের সময় Third Book পড়াই। অতঃপর ক্রমান্বয়ে উচ্চ ক্লাসের সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে grammar, composition, phrases, idioms, homonyms, Row's Hints প্রভৃতি আসিয়া বালকগণের স্কন্ধে চাপিয়া বসে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে আবার গণিত, ভূগোল, ইতিহাস, সংস্কৃত ত আছেই। এই তরুণ বয়সেই বালকগণ এক ইংরাজীর বোঝা বহন করিতে করিতেই ওষ্ঠাগত-প্রাণ হইয়া পড়ে। Matriculation পাশ করিয়া যাহারা I S c. পড়িতে চায়, তাহাদেরও নিস্কৃতি নাই; পর্ব্বতপ্রমাণ ইংরাজী সাহিত্যের বোঝা তাহাদিগকে ম্রিয়মাণ ও বিহ্বল করিয়া ফেলে। I S C., ক্লাসের পক্ষে এই চাপ সত্যসত্যই অসহনীয় হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের আবার ঐ ইংরাজীর উপর

Mathematics, Physics, Chemistry, Botany বা Physiology এবং তাহাদের Practical আছে। কাজেই অনেক সময় কলেজে দশটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত প্রায় অবিরাম ক্লাসের পর ক্লাস চলিতে থাকে। ইহার ফলে জীর্ণদেহ, ভগ্নস্বাস্থ্য ও ক্ষীণদৃষ্টি যুবকের দলে দেশ ছাইয়া ফেলিতেছে। আমরা প্রকৃত প্রস্তাবে ইহাদিগকে তিল তিল করিয়া হত্যা করিতেছি। আমার মতে IS C. course হইতে ইংরাজী একবারেই তুলিয়া দেওয়া উচিত; এবং প্রবেশিকা পরীক্ষার গণিত, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত পুস্তক অবলম্বনে শিক্ষা দেওয়া উচিত। আমার মোট কথা এই যে, ইংরাজীভাষা Second Language হওয়া উচিত। Shall ও will এর প্রভেদ ও appropriate prepositionএর পার্থক্য নিরূপণে যে সময় ও শক্তির অপচয় হয় তাহা অন্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে নিয়োগ করা উচিত। যাহা হউক সম্প্রতি প্রকাশচন্দ্র সিংহ প্রণীত "তর্কবিজ্ঞান"কে আই, এ পরীক্ষার পাঠ্যতালিকাভুক্ত করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ যথেষ্ঠ উদারতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

আর একটী কথা বলিয়া অদ্যকার বক্তব্য শেষ করিব। পৃথিবীর অপরাপর জাতিগণ কি প্রকারে আপনাদের ভাষার উন্নতি বিধান করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহা আমাদিগকে ভাবিয়া দেখিতে হইবে। প্রথমে রুশিয়ার কথা ধরা যাক। রুশিয়ার ভাষা অনার্য্য ভাষা; সংস্কৃত, গ্রীক প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ আর্য্যভাষাসমূহের সহিত উহার কোনও সম্পর্ক নাই, সেই জন্য রুশিয়ান ভাষা শব্দসম্পদে বড়ই দীনা। বেশি দিনের কথা নহে, চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে রুশিয়ানগণ মাতৃভাষার প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করিতেন। তাঁহারা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ফরাসী ভাষার ব্যবহার করিতেন এবং বিজ্ঞানচর্চ্চার জন্য প্রধানতঃ জর্ম্মান ভাষা অবলম্বন করিতেন। এমন কি মেণ্ডেলয়েফ-প্রমুখ মনীষিবর্গ জর্ম্মান বৈজ্ঞানিক সাময়িক পত্রিকায় আপনাদের গবেষণার ফল সমূহ প্রকাশিত করিতেন। কিন্তু তাঁহারা অল্পদিনের মধ্যেই হৃদয়ঙ্গম করিলেন যে, মাতৃভাষার সাহায্যে বিজ্ঞান প্রচার না করিলে দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইবে না। এইজন্য মেণ্ডেলিয়েফ তাঁহার অমূল্য রসায়ন শাস্ত্রের গ্রন্থ রুশিয়ান ভাষায় লিখিলেন; তাহার পর হইতে রুশিয়ান বৈজ্ঞানিকগণ যাবতীয় মৌলিক গবেষণা মাতৃভাষায় প্রচার করিয়া আসিতেছেন।

এসিয়া খণ্ডে যে জাতি পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন,

আমাদের যে তাঁহাদেরই পথ অনুসরণ করা উচিত সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? জাপানি ভাষা এখনও সম্পূর্ণ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই, সেই জন্য জাপানীরা উচ্চঅঙ্গের মৌলিক গবেষণা ইংরাজি ও জর্ম্মান ভাষায় প্রচার করেন; কিন্তু তাঁহারা প্রাথমিক শিক্ষা, এমন কি কলেজের লেক্‌চার পর্য্যন্ত জাপানী ভাষায় দিতেছেন। জাপানীরা বেশ বুঝিয়াছেন যে, বিদেশীয় ভাষা অবলম্বন-পূর্ব্বক বিজ্ঞানচর্চ্চা প্রথমতঃ অপরিহার্য্য বটে, কিন্তু ক্রমে ক্রমে দেশীয় ভাষাতেই বিজ্ঞানচর্চ্চা সমধিক বাঞ্ছনীয়। আশার কথা, হাওয়া ফিরিয়াছে। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ এ বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান-গ্রন্থ প্রচারের কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট পরিষৎকে মাসিক এক শত টাকা দানের যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা অবলম্বন করিয়া মহানুভব তারকনাথের আদর্শে এবং দেশীয় বিদ্যোৎসাহী ধনকুবেরদিগের সাহায্যে যদি একটী বিজ্ঞান-প্রচার-ভাণ্ডার গঠিত হইয়া উঠে, তাহা হইলে দেশের একটী গুরুতর অভাব মোচন হয়। ইংলণ্ড ও আমেরিকায় ধনকুবের এণ্ড্রু কার্ণেগি প্রদত্ত বৃত্তির সাহায্যে শত শত যুবক অনন্যমনা ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া বিজ্ঞান-সেবায় ও গবেষণায় ব্রতী হইয়াছেন। আমাদের দেশেও এইরূপ ব্যবস্থার বোধ হয় সময় আসিয়াছে।

দেশীয় ভাষায় বিজ্ঞানচর্চ্চা করিলে দেশের জনসাধারণের যে কত উপকার হইবে তাহা কি আর অধিক করিয়া বুঝাইতে হইবে? আমাদের দেশ ত ভীষণ অজ্ঞানতিমিরে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। আমরা আজকাল গ্রাজুয়েটের সংখ্যা দেখিয়া ভয় পাই। বাঙালী চাকুরীজীবী বলিয়াই এই ভয় হয়; অর্থাৎ আমরা সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনস্তম্ভে গ্রাজুয়েটের বাজার-দর দেখিয়া বিচার করি। কিন্তু যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ যুবকের সংখ্যা দেশে জ্ঞানবিস্তারের মাপকাঠি বলিয়া ধরি, তবে হৃদয়ে গভীর নিরাশার সঞ্চার হয়। গত সপ্তাহে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কনভোকেশ'ন প্রায় দেড় হাজার গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা প্রাপ্ত হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকাভুক্ত জনসংখ্যা প্রায় আটকোটী হইবে। অতএব দেখা যাইতেছে লাখকরা ২ জনেরও কম গ্রাজুয়েট হইতেছে। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়, আমাদের দেশের অবস্থা কি শোচনীয়।

তোমরা ইংরাজিতে বিজ্ঞানালোচনা করিবে, প্রথমে ভাব দেখি তোমার দেশবাসীর মধ্যে কয়জন ইংরাজি বুঝিবে। অথচ সামান্য বৈজ্ঞানিক তথ্য-গুলি না জানা থাকায় লোকে কত কষ্টভোগ করিতেছে। ম্যালেরিয়া ও মশকে কি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, পতঙ্গ কি প্রকারে শস্য ধ্বংস করে, রেশমকীটের

কোন্ কোন্ ব্যাধি হয় এবং কিরূপে তাহা নিবারণ করা যায়, * সারের প্রকারভেদের সহিত চাষের কি সম্বন্ধ, এবং সামাজিক রীতিনীতির উপর সামাজিক উন্নতি কতখানি নির্ভর করে, এই সকল অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ের বৈজ্ঞানিক আলোচনা যদি দেশের লোকের নিকট সুপ্রাপ্য হয় তাহা হইলে অনেক উপকার হয়। আনন্দের বিষয়, কয়েকজন কৃতবিদ্য ব্যক্তি সম্প্রাত উল্লিখিত বিষয় সম্বন্ধে পুস্তক ও প্রবন্ধাদি প্রণয়নে যত্নবান হইয়াছেন; তাঁহারা দেশের ও দশের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন, সেকথা বলাই নিষ্প্রয়োজন। এই সকল বার্ত্তা যদি ঘরে ঘরে, আমাদের গৃহলক্ষ্মীদের নিকট পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিতে হয়, যদি "ঘাটে, পাটে বাটে, মাঠে," এই সকল বিষয়ের আলোচনা দেখিতে চান, তাহা হইলে মাতৃভাষার শরণাপন্ন হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই। বালক ও বৃদ্ধ, পুরুষ ও নারী, সকলে প্রাণপণে মাতৃভাষার সেবা করুন, তাহা হইলে আপনারা এই কর্ম্মভূমি, জন্মভূমি ভারতবর্ষের উপযুক্ত সন্তান বলিয়া পরিচয় দিতে পারিবেন—তাহা হইলে ভগবানের আশীর্ব্বাদে আমাদের জননী জন্মভূমিকে তাঁহার প্রাচীন রত্নসিংহাসনে পুনরধিষ্ঠিতা দেখিতে পাইব। †

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়।

নিদর্শন।

আমেরিকার চিঠি।

আজ রবিবার। গির্জার ঘণ্টা বাজিতেছে। সকালে চোখ মেলিয়াই দেখিলাম বরফে সমস্ত সাদা হইয়া গিয়াছে। বাড়িগুলির কালো রঙের ঢালু ছাদ এই বিশ্বব্যাপী সাদার আবির্ভাবকে বুক পাতিয়া দিয়া বলিতেছে "অধ আঁচরে বস!" মানুষের চলাচলের রাস্তায় ধূলাকাদার রাজত্ব একেবারে ঘুচাইয়া দিয়া, শুভ্রতার নিশ্চল ধারা যেন শতধা হইয়া বহিয়া চলিয়াছে। পাখীরা ডাক বন্ধ করিয়াছে, আকাশে কোথাও কোন শব্দ নাই। বরফ উড়িয়া উড়িয়া পড়িতেছে, কিন্তু তাহার পদশব্দের কিছুমাত্র শোনা যায় না। স্বর্গলোকের নিভৃত আশ্রম হইতে নিঃশব্দতা মর্ত্ত্যে নামিয়া আসিতেছেন; তাঁহার ঘর্ঘর নিনাদিত রথ নাই; মাতলি তাঁহার মত্ত ঘোড়াকে বিদ্যুতের কশাঘাতে হাঁকাইয়া আনিতেছে না; ইনি নামিতেছেন

* এইস্থলে দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে সুবিখ্যাত লুই পাস্তুর তাঁহার উদ্ভাবিত পশ্বাদির টীকাদ্বারা রোগচিকিৎসা প্রণালী আবিষ্কার করিয়া এক ফ্রান্স দেশেই বার্ষিক প্রায় ৪২00000 টাকা ব্যয়সংক্ষেপ করিয়াছেন।

† চট্টগ্রাম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত।

হংসের সাদা পাখা মেলিয়া দিল, অতি কোমল তাহার সঞ্চার, অতি অবাধ তাহার গতি; কোথাও তাহার সংঘর্ষ নাই, কিছুকেই সে কিছুমাত্র আঘাত করে না। সূর্য্য আবৃত, আলোকের প্রখরতা নাই; কিন্তু সমস্ত পৃথিবী হইতে একটি অপ্রগল্ভ দীপ্তি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে, এই জ্যোতি যেন শান্তি এবং নম্রতায় সুসম্বৃত, ইহার অবগুণ্ঠনই ইহার প্রকাশ।

অদ্যকার প্রভাতের এই অতলস্পর্শ শুভ্রতার মধ্যে আমি আমার অন্তরাত্মাকে অবগাহন করাইতেছি। বড় কঠিন এই স্নান। নিজেকে যে একেবারে শিশুর মত নগ্ন করিয়া দিতে হইবে এবং ডুবিতে ডুবিতে একেবারে কিছুই যে বাকি থাকিবে না। ঊর্দ্ধে শুভ্র, অধঃাতে শুভ্র, সম্মুখে শুভ্র, পশ্চাতে শুভ্র, আরম্ভে শুভ্র, অন্তে শুভ্র—শিব এব কেবলম্, সমস্ত দেহমনকে শুভ্রের মধ্যে নিঃশেষে নিবিষ্ট করিয়া দিয়া নমস্কার—নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ।

বার্দ্ধক্যের কান্তি যে কি মহৎ, কি গম্ভীর সুন্দর আমি তাহাই দেখিতেছি। যত কিছু বৈচিত্র্য সমস্ত ধীরে ধীরে নিঃশব্দে ঢাকা পড়িয়া গেল, অনবচ্ছিন্ন একের শুভ্রতা সমস্তকেই আপনার আড়ালে টানিয়া লইল।...আমার মনে হইতেছে যেন তাপসিনী গৌরী তাঁহার বসন্ত পুষ্পাবরণ ত্যাগ করিয়া শুভ্রবেশে শিবের শুভ্রমূর্ত্তি ধ্যান করিতেছেন। যে কামনা আগুন লাগায়, যে কামনা বিচ্ছেদ ঘটায়, তাহাকে তিনি ক্ষয় করিয়া ফেলিতেছেন। সেই অগ্নিদগ্ধ কামনার সমস্ত কালিমা একটু একটু করিয়া বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে, যতদূর দেখা যায় একেবারে সাদায় সাদা হইয়া গেল, শিবের সহিত মিলনে কোথাও আর বাধা রহিল না।

("তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা," ফাল্গুন,
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)।

সামাজিক বিপর্য্যয়।

বহুকাল ধরিয়া য়ুরোপ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের (Individualism) জয়ডঙ্কা বাজাইয়াছে, এখন তাহার ফল দাঁড়াইয়াছে নারীবিদ্রোহ। বিলাতের সাফ্রেজেট রমণীরা রণচণ্ডী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, সমাজ-প্রাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়া, পুরুষকে আহ্বান করিয়া বলিতেছে যুদ্ধং দেহি। পাশ্চাত্য ভামিনী নৃ-জাতিকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে—বংশ তোমার নামে পরিচিত হইবে আমার নামে হইবে না কেন? সমাজকে ও রাষ্ট্রশক্তিকে স্থায়ী করিতে হইলে আমার মাতৃত্ব যদি এতই আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে, তবে তজ্জন্য সমাজ কিম্বা রাজা কিছু স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করেন কি? বিবাহবন্ধনচ্ছেদের ব্যবস্থা পুরুষের পক্ষে একরূপ ও নারীর পক্ষে অন্যরূপ কেন? পারিপার্শ্বিক ও সামাজিক অবস্থার সঙ্গে আমাদের সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতে হইবে একথা কেন মানিব?......পাশ্চাত্য দেশে, বিশেষতঃ ইংলণ্ডে, অর্থবল ও পেশীবল মুখোমুখি করিয়া দাঁড়াইয়াছে, ধনী-সম্প্রদায়ের সহিত মিস্ত্রি-মজুরদিগের অহিনকুল সম্বন্ধ বাধিয়াছে। সমস্ত নেশনটা মিস্ত্রি-মজুরে পরিণত হইয়াছে। তাহারা সমস্ত দিন কলকারখানায় খাটিয়া, সন্ধ্যার পর ক্লাবে বা থিয়েটারে গিয়া আমোদ পাইতে চেষ্টা করে। তাহাদের জীবনে সামাজিক আনন্দে গা ভাসাইবার উপায় নাই—ইংলণ্ডের পল্লীজীবন হইতে Village

Dance, May Pole, Folksong প্রভৃতি অদৃশ্য হইতেছে। শ্রমজীবিদের পেশীবল কল-কারখানার মারফতে তাহাদের প্রভুসম্প্রদায়ের স্বর্ণগিনিতে রূপান্তরিত হইতেছে। Industrialism অর্থাৎ কলকারখানার দাপটে Communal life অর্থাৎ সমাজ পিষিয়া গিয়াছে। য়ুরোপ এখন ভোগের ঝোঁকে পাগল হইয়া ছুটিতেছে; ত্যাগের কথা, করুণার বাণী তাহার কর্ণে আর প্রবেশ লাভ করে না।

ধনী ও নির্ধনের এই বিরোধ, পুরুষ ও নারীর এই বিকট রেষারেষি, ভারতবর্ষীয় সমাজে কোনও কালে ছিল না। কিন্তু ধীরে ধীরে আমাদের সামাজিক বিপর্য্যয় ঘটিতেছে। আমাদের বড় বড় সহরে সমাজের ক্রিয়াশক্তি কোনও কাজেই লাগিতেছে না। পাশ্চাত্য প্রভাবে আমাদের সমাজে ধনী ও নির্ধন বলিয়া দুইটি নূতন জাতি সৃষ্ট হইতেছে।

("বিজয়া", ফাল্গুন,
শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত)।

উড়িষ্যার পুরাকীর্ত্তি।

ভারতবর্ষের পুরাকীর্ত্তির তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবামাত্র, ধারাবাহিকতার অভাব লক্ষ্য করিয়া, অনেকেই তথ্যানুসন্ধানে বীতরাগ হইয়া পড়েন। যে দেশ মানব সভ্যতার বহু পুরাতন লীলাভূমি, বহুযুগের বহু বিপ্লবের চিতাভস্মাচ্ছন্ন মহাশ্মশান, তাহাতে পুরাকীর্ত্তির ধারাবাহিক নিদর্শন সহসা আবিষ্কৃত হইবার সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। একশ্রেণীর পুরাকীর্ত্তি প্রাচীন যুগের সাক্ষ্যদান করে; আর একশ্রেণীর পুরাকীর্ত্তি মধ্যযুগের সাক্ষ্য দান করে;—কিন্তু এই উভয়যুগের মধ্যবর্ত্তীকালের সহিত ধারাবাহিকতা দেখাইয়া দিতে পারে, এরূপ পুরাকীর্ত্তির সন্ধান লাভ করা যায় না; তাহা কালক্রমে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। প্রাচীন যুগের কীর্ত্তি-বিজ্ঞাপক যে সকল নিদর্শন এখনও বর্ত্তমান আছে, তাহাকে বহুযুগের সাধনার পরিণত ফল বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। খণ্ডাচল উড়িষ্যার পুরাতন শিল্প নিদর্শনের অখণ্ড গৌরবাচল। এই দ্বিধা-বিভক্ত অচল-কলেবর এখন খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি নামে পরিচিত। উভয়খণ্ডেই বহুসংখ্যক পুরাতন গুহা বিদ্যমান বলিয়া, ঐ দুই স্থান গুহাবলীর অবস্থানভূমি বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। সুবিস্তৃত সমতলক্ষেত্রের মধ্যস্থলে অবস্থিত এই অনুন্নত শৈলনিবাস বহুযুগের বহুসংখ্যক সাধক-সম্প্রদায়ের পবিত্র পদরেণুসংস্পর্শে চিরপবিত্র হইয়া রহিয়াছে। এই সকল গুহা কিছুদিন লোকসমাজে অপরিচিত হইয়া পড়িয়াছিল; খণ্ডাচলে বৌদ্ধ ও জৈন উভয় সম্প্রদায়েরই কীর্ত্তিচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। যে গুহার মধ্যে জৈন তীর্থঙ্করগণের সলাঞ্ছন শ্রীমূর্ত্তিনিচয় বর্ত্তমান আছে, সেই গুহার বাহিরে ও ভিতরে অনেকগুলি শক্তিমূর্ত্তিও বর্ত্তমান আছে। তীর্থঙ্করগণের ও শক্তিনিচয়ের শ্রীমূর্ত্তি মধ্যযুগের ভাস্কর্য্য-প্রথার পরিচয় প্রদান করিতেছে। তৎকালে একদিকে তান্ত্রিক মত, অন্যদিকে মহাযান সম্প্রদায়ের তান্ত্রিকতাপূর্ণ বৌদ্ধমত যে ভাবে মূর্ত্তি রচনায় অভিব্যক্ত হইয়াছিল, জৈনগণের উপাস্য তীর্থঙ্করগণেরও সেই ভাবের নিজ নিজ শক্তির পৃথক মূর্ত্তি রচিত হইয়াছিল। ঐ

সকল জৈন শক্তিমূর্ত্তি ও তান্ত্রিক শক্তিমূর্ত্তি যে একই শ্রেণীর, এক প্রকারের বীজ-সম্ভূত. এবং একই প্রকার আরাধনা-প্রণালীর অন্তর্গত, খণ্ডগিরিতে মূর্ত্তিশিল্পে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

("সাহিত্য," ফাল্গুন,
শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়)।

বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ।

আমরা চন্দ্রের একদিকই চিরকাল দেখিতে পাই; অপর দিক পাই না। চন্দ্রের উপরিভাগে অনেকগুলি পর্ব্বতশ্রেণী, আগ্নেয় গিরি ও গুহা আছে। নিশাকরের লাইবনিজ্ ও ডরফেল নামক পর্ব্বতশৃঙ্গ কিয়দূন পঁচিশ হাজার ফুট উচ্চ। উহার এপিনাইন পর্ব্বতশ্রেণী চারি শত বাট মাইল বিস্তৃত। আমরা শশীর যে দিক দেখিতে পাই তাহাতে এক জন গ্রীক জ্যোতির্ব্বিদ প্রায় ত্রিশ সহস্র আগ্নেয়গিরির মুখ, গণনা করিয়াছেন। টাইকো নামক আগ্নেয়গিরির মুখগহ্বরের ব্যাস প্রায় তিপ্পান্ন মাইল। রিটা নামক আগ্নেয়গিরির সন্নিকটে যে উপত্যকা দৃষ্ট হয় তাহা এক শত সাতাশী মাইল লম্বা ও দশ মাইল চওড়া। চন্দ্রের চতুর্দ্দিকে প্রায় দশ মাইল বায়ুমণ্ডল আছে। বায়ুমণ্ডলের স্বল্পতা হেতু দিবাভাগে চন্দ্রে সূর্য্যের রশ্মি অসহ্য গরম এবং রাত্রিকালে অতিশয় ঠাণ্ডা। চন্দ্রে দিবাভাগই গ্রীষ্মকাল ও রাত্রি শীতকাল—অন্য ঋতু নাই। পৃথিবীতে চব্বিশ ঘণ্টায় এক দিন, চন্দ্রে আমাদের প্রায় সাড়ে উনত্রিশ দিনে অর্থাৎ ৭০৯ ঘণ্টায় এক দিন। পৃথিবীতে সূর্য্যাস্ত হইতে প্রায় বার ঘণ্টা লাগে চন্দ্রে সূর্য্যাস্ত হইতে প্রায় পনের দিন লাগে। রাত্রিও ঐরূপ পনের দিন ব্যাপী। পৃথিবীর বৎসর ৩৬৫ দিনে, চন্দ্রের বৎসর ৩৪৬ দিনে।

("সাহিত্য-সংহিতা," মাঘ,
শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ সরকার)।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়।

"সন্ধ্যা" সম্পাদক স্বর্গীয় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ভিন্ন ভিন্ন মানব-সমাজকে এক একটি স্বতন্ত্র, বিশিষ্ট জীবের মতন মনে করিতেন বলিয়া বোধ হয়। Social Organism বা সমাজ-জীব—আধুনিক বিদেশীয় সমাজ-বিজ্ঞানের এই পরিচিত পরিভাষাটি তাঁর মুখে কখনও শুনিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। কিন্তু তাঁর কথাবার্ত্তায় তিনি যে এই আধুনিক সমাজতত্ত্বটিকে দৃঢ় করিয়া ধরিয়াছিলেন ইহা খুবই বুঝিয়াছিলাম আর প্রত্যেক সমাজকে এইরূপ বিশিষ্ট জীবধর্ম্মী বলিয়া মনে করিতেন বলিয়াই, সকল সমাজেরই ভাল ও মন্দের মধ্যে যে একটা অতি নিগূঢ় অঙ্গাঙ্গী যোগ আছে, একথাও তিনি বলিতেন। এই জন্যই বিলাতী সমাজের মন্দটিকে ছাড়িয়া শুদ্ধ ভালটিকে গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে যেরূপ নিতান্ত অসাধ্য, সেইরূপ আমাদের সমাজের ভালটুকুকে নিঁখুতভাবে রক্ষা করিয়া, কেবল তার মন্দটুকুকে

একান্তভাব পরিহার করাও একান্ত অসম্ভব। জীবদেহে যখন প্রাণশক্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তখন তাহার অন্তরস্থ রোগের বীজাণু সকল প্রবল হইয়া অশেষ উৎপাত ও অমঙ্গল ঘটাইতে আরম্ভ করে, প্রাণীর সুস্থ ও সবল অবস্থায় তারা নির্জীব ও অপকার সাধনে অক্ষম হইয়া পড়িয়া থাকে, এ কথা যেমন সত্য, সমাজ মধ্যে যখন প্রাণশক্তি সতেজ ও সবল থাকে তখন সমাজের রীতি-নীতি ও শাসন-সংস্কারের ভালটুকুই প্রবল হইয়া রহে এবং তাহার মন্দ টুকু হতবল ও হীনতেজ হইয়া অপকার সাধনে অক্ষম হইয়া পড়ে, ইহাও তেমনি সত্য। সুতরাং সমাজের প্রাণশক্তিকে জাগাইয়া তোলাই সমাজ সংস্কারের প্রধান ও মুখ্য কর্ম্ম। উপাধ্যায় এই কারণেই সর্ব্বাগ্রে ও সর্ব্বপ্রযত্নে, স্বদেশী সমাজের প্রাণে শক্তি সঞ্চার করিবার জন্য ব্যগ্র ছিলেন; বাহির হইতে উত্তেজক ঔষধ দিয়া, সমাজ দেহের ভিন্ন ভিন্ন স্থানীয় উপদ্রব সকলকে প্রশমিত করিবার জন্য, হাতুড়ে চিকিৎসার আশ্রয় গ্রহণ করিতে চাহেন নাই। ...প্রকৃতিগত শ্রদ্ধাশীলতা হইতে এক প্রকারের রক্ষণশীলতা জন্মিয়া থাকে। এই জাতীয় রক্ষণশীলতা উপাধ্যায়ের মধ্যে বেশই ছিল। প্রোটেষ্টাণ্ট খৃষ্টান সম্প্রদায়ে ব্যক্তিত্বাভিমানী অনধীনতার ভাব অত্যন্ত প্রবল বলিয়া, সমাজানুগত্য নাই বলিলেই হয়; কিন্তু রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টীয় সঙ্ঘে, শাস্ত্র ও গুরু উভয়ের প্রাধান্য-মর্য্যাদা সমভাবে রক্ষিত হইয়া, ব্যক্তিত্বাভিমানী অনধীনতা অশান্ত সংযত হইয়াছে। প্রকৃতিগত শ্রদ্ধাশীলতার প্রেরণায় উপাধ্যায় রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টীয় সঙ্ঘের আশ্রয় লইয়াছিলেন।

("বঙ্গদর্শন", মাঘ,
শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল)।

সুখবাদ ও দুঃখবাদ।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে অধ্যাপক ম্যাক্‌সমূলার একটি প্রবন্ধ পড়িয়াছিলেন—তাহার নাম ছিল "শুভ্র চক্ষু ও কৃষ্ণ চক্ষু" (Bright Eye and Dark Eye)। ঐ প্রবন্ধে তিনি প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছিলেন যে, জগতের প্রতি আমরা যে চক্ষুতে দৃষ্টিপাত করি, জগৎ সেইরূপই আমাদের নিকট বোধ হয়। শুভ্র চক্ষুর দ্বারা জগৎ দেখিলে তাহা শুভ্র, স্বচ্ছ, শুভ, সুখদ মনে হয়—এই প্রকার জগৎ দেখার নাম সুখবাদ বা Optimism। কৃষ্ণচক্ষু দিয়া জগৎ দেখিলে তাহা আবিল, পঙ্কিল, অশুভ, দুঃখদ মনে হয়—এইরূপ জগৎ দেখার নাম দুঃখবাদ বা Pessimism। ম্যাক্‌সমূলারের এই মত অসঙ্গত নহে। জগতের অনাবৃত নগ্ন মূর্ত্তি সাধারণ মানুষের চক্ষে প্রতিভাত হয় না। আমরা সাধারণতঃ মনের চস্‌মা দিয়া জগৎ দেখি—ঐ চস্‌মা রঙ্গিন কাচে রচিত। চস্‌মার গুণে বা দোষে জগতের রূপান্তর হয়।

("ব্রহ্মবিদ্যা," ফাল্গুন
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

শ্রীগৌরহরি সেন।

রত্ন-দীপ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

এমন স্ত্রী লইয়া কি হইবে?

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল রাখাল এইরূপ মুহ্যমান হইয়া বসিয়া থাকিবার পর তাহার বউদিদি আসিয়া বলিলেন—"ঠাকুরপো, যদি বসন্তপুর যেতে হয় তবে স্নান করে খেয়ে বেরিয়ে পড়, বসে বসে ভাবলে কি হবে? বেলা ত কম হয়নি।"

একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া রাখাল উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল—"তেল কোথায়?"

"তেলের বাটি ঐ কুলুঙ্গিতে রয়েছে"—বলিয়া বউদিদি আবার রান্নাঘরের দিকে গেলেন।

ব্যাগ খুলিয়া রাখাল তাহার গামছাখানি বাহির করিল। মাথায় কিঞ্চিৎ তৈলমর্দ্দন করিয়া, গামছাখানি কাঁধে ফেলিয়া উঠানে নামিতেই সদর দরজা হইতে শব্দ আসিল—"দাদাঠাকুর বাড়ী আছেন?"

রাখালের দাদা উঠানে আমগাছতলায় মোড়া পাতিয়া বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন; বলিলেন—"কে ও?"

"আমি—বছিরদ্দি শেখ।"

"কেন?"

"দরজা খোলেন—একটা জরুরি কথা আছে।"

বছিরদ্দি, গ্রামের চৌকিদার। তাহার "জরুরি কথা" কি, জানিবার জন্য মুহূর্ত্তের মধ্যে বাড়ীসুদ্ধ লোক চঞ্চল হইয়া উঠিল। রাখালও দাঁড়াইল।

দাদা তাড়াতাড়ি গিয়া দরজা খুলিয়া দিয়া বলিলেন—"এস বছিরদ্দি এস—খবর কি?"

প্রৌঢ়বয়স্ক, উন্নতকায় বলিষ্ঠদেহ বছিরদ্দি চৌকিদার, মাথায় নীল পাগড়ি, হস্তে এক প্রকাণ্ড লাঠি, অঙ্গনমধ্যে প্রবেশ করিয়া দাঁড়াইল। বাটীর স্ত্রীলোকেরা একটু অন্তরে দাঁড়াইয়া উৎকর্ণ হইয়া রহিল।

বছিরদ্দি বলিল—"দাদাঠাকুর, আপনাদের ছোট বউকে কাল রাতে কি তোমার বাপের বাড়ী পেঠিয়েছেন?"

দাদা বলিলেন—"হ্যাঁ—কেন?"

"তবে সে মাগী ঠিকই বলেছেলো। কাল দাদাঠাকুর, এক প্রহর রাত বাকী থাকতে আমি রোঁদ দিতে বেরিয়েছিনু। দিব্যি ফুটফুটে চাঁদনী রাত। যখন গেরাম ছেড়িয়ে পেরায় কোশখানেক পথ গেছি,. গাজনতলার সরহদ্দের কাছাকাছি পৌঁছেছি, তখন দেখি যে রাস্তা দিয়ে দুইঝনা বিটিছাওয়া যাচ্ছে। একঝন বেওয়া, একঝন সর্‌ধবা। যে বেওয়া সে বুড়ী, যে সর্‌ধবা সে মুখে ঘোমটা দিয়ে ছেলো, বয়সটা ঠাওর পেনু না। অত রাতে, মাঠের পথে দুইঝন বিটিছাওয়া, সাথে কেউ মরদ নেই, দেখে আমার মনে কেমন সন্দ হল। তাই বন্নু—এত রাতে কে যায়?—হাঁক দিতেই তারা থম্‌কে দাঁড়াল। কাছে গিয়ে জিগাস কন্নু—কে তোরা?—কোথা যাস্?—যে বেওয়া, সে বল্লে—ওগো আমরা যাচ্ছি গাজনতলা।—জিগাস কনু—গাজনতলা কার বাড়ী যাস্?—বল্লে—ভস্‌চাযিা বাড়ী। আমি বন্নু—ভস্‌চাযিা বাড়ী? গাজনতলায় ত ভস্‌চাযিা কেউ নেই।—মাগী চুপ করে রইল। তাই দেখে দাদাঠাকুর, সন্দটা আমার মনে আরও দেড়ো হল। জিগাস কন্নু—কে তোরা, কোথা যাচ্ছিস্, সত্যি বল, নইলে ধরে থানায় নিয়ে যাব। আমার নাম বছিরদ্দি শেখ চৌকিদার।—এই না বলে দাদাঠাকুর, হাত পাঁচ ছয় পিছু হটে, এই নাঠিটে মাথার উপর তুলে বন্ বন্ করে ঘোরাতে নাগনু। মাগী তখন কাঁপতে কাঁপতে বল্লে—দোহাই বাবা চৌকিদার, আমাদের মের না। আমরা চোর নই ছেঁচড় নই। আমি সৈরভির মা, বাড়ী বসন্তপুর। বসন্তপুরে এই বউটির বাপের বাড়ী কিনা, কেষ্টদাস ঘোষাল এর বাপ। বউটিকে বাপের বাড়ী নিয়ে যাচ্ছি। আমি বন্নু—তবে যে বল্লি গাজনতলায় ভস্‌চাযিা বাড়ী যাব?—সে বল্লে—না বাবা ভুলে বলেছি। ময়নাবতীর ভস্‌চাযিা বাড়ী থেকে আসছি। এ সেই বাড়ীর ছোট বউ।—এই কথা শুনে তাদের ছেড়ে দিনু। কিন্তু মনের সন্দটা কিছুতেই গেল না দাদাঠাকুর, তাই বাড়ী ফিরে ভাবনু, যাই, দাদাঠাকুরকেই জিগাস করে আসি। মাগী যা বল্লে ঠিক ত দাদাঠাকুর?"

দাদা গম্ভীরভাবে বলিলেন—"ঠিক বলেছে।"

"আচ্ছা তবে আসি। সেলাম দাদাঠাকুর।"

চৌকিদার চলিয়া গেলে, বাড়ীর লোকের মন হইতে যেন একটা বিষম বোঝা নামিয়া গেল। ছোটবউ তবে পিত্রালয়েই গিয়াছে। পলাইয়া গেলেও, যাহা আশঙ্কা ছিল তাহার তুলনায় শতগুণে সহস্রগুণে ভাল। সৈরভির মা এ বাটীর বিশেষ পরিচিত—পূর্ব্বে কতবার আসিয়াছে। আর কোনও ভয় নাই।

লোকে একটু নিন্দা করিবে—তা করুক। যে নিন্দার উপক্রম হইয়া উঠিয়াছিল, ভগবান তাহা হইতে রক্ষা করিয়াছেন। সকলে যেন নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। রাখালেরও দুর্ভাবনা দূর হইয়া মনটা বেশ খুসী হইয়া উঠিল।

দাদা কিন্তু রাগ করিতে লাগিলেন। বলিলেন—"ছি ছি কেলেঙ্কারি কেলেঙ্কারি! দেখ দেখি একবার কাণ্ডখানা! বাপের বাড়ীই যদি যেতে হয়, আমাদের বলে কয়ে গেলেই ত হত। আমরা বাড়ীসুদ্ধ লোক এতক্ষণ চোখে যে সর্ষের ফুল দেখ্‌ছিলাম! আর কিছু নয়, বউমা নিশ্চয়ই কাঁদাকাটা করে মাকে চিঠি লিখেছিলেন—এরা ত আমায় যেতে দেবে না, চুপি চুপি সৈরভির মাকে পাঠিয়ে দিও, আমি চুপি চুপি তার সঙ্গে পালিয়ে যাব। বউমা না হয় ছেলে মানুষ—বুদ্ধি নেই। তাঁর মা ত ছেলেমানুষ নন, বুড়ো হয়েছেন—তাঁর এ আক্কেল হল না যে ও রকম করে আমার মেয়ে যদি রাত্রে পালিয়ে আসে ত লোকে বল্‌বে কি? ছি ছি কেলেঙ্কারি কেলেঙ্কারি!"

রাখাল স্নান করিতে গেল। এখন প্রায় দ্বিপ্রহর—স্নানের ঘাটে আর লোকজন নাই। রাখাল অনেকক্ষণ ধরিয়া স্নান করিল। স্নান করিতে লাগিল—আর ভাবিতে লাগিল।

চৌকিদারের কথিত বৃত্তান্ত শুনিয়া রাখালের মনে প্রথমটা যে আনন্দের লহরী উঠিয়াছিল, তাহা অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। প্রথমটা, সেটা পরিত্রাণের আনন্দ। মুখে সে যাহাই বলুক, যে সন্দেহ বউদিদির মনে প্রবেশ করিয়াছিল, সেই বিষম সন্দেহ সর্পের মত রাখালের মনকেও দংশন করিয়াছিল। তাহার [illegible] একটা জীবনব্যাপী লজ্জা ও অপমানের হস্ত হইতে অব্যাহতি-[illegible]। এখন স্নান করিতে করিতে আবার তাহার মনে অল্পে অল্পে [illegible] লাগিল। এই স্ত্রী! এই স্ত্রীর স্নেহ ভালবাসা! পাছে স্বামীর সঙ্গে [illegible] হয়, তাই পলায়ন! এমন করিয়া দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া পলায়ন, এমন স্ত্রী লইয়া কি হইবে? জোর করিয়া ধরিয়া বাঁধিয়া লইয়া [illegible] হইবে? এমন স্ত্রী হইতে সাংসারিক সুখের আশা দুরাশা মাত্র। একবার দেখা করিবার জন্যও অপেক্ষা করিল না? না হয় সঙ্গে নাই যাইত। [illegible] পর, একবার দেখাটা হইলে ক্ষতি ছিল কি?—ক্রোধে, অভিমানে রাখাল [illegible] মধ্যে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। ভাবিতে লাগিল, দূর হউক, শ্বশুরবাড়ী যাইব না, তাহার সঙ্গে আর কোনও সম্পর্কই রাখিব না। [illegible] বিবাহ করিব। এই সকল কথা চিন্তা করিতে করিতে স্নান সারিয়া রাখাল [illegible] ফিরিয়া আসিল।

আহারাদির পর শয্যায় শয়ন করিয়া রাখাল ভাবিতে লাগিল, আজ ত আর খুক্রুপুরে ফিরিয়া যাওয়া হয় না—কল্য বৈকালের গাড়ীতে যাইবে। পুনরায় বিবাহ করিবে, সে ইতিমধ্যে একপ্রকার স্থিরই করিয়া ফেলিয়াছে। ভাবিল, তথাপি লীলাবতীর সঙ্গে একবার শেষ কথাটা হওয়া উচিত। আজ বসন্তপুরে গিয়া তাহার সহিত খোলাখুলি কথাবার্ত্তা কহিবে। বলিবে—"আর পাঁচজনের স্ত্রী যেমন, তুমিও যদি সেইরূপ আমার স্ত্রী হইতে সম্মত হও—তবে আমার সঙ্গে চল। যদি তোমার অনিচ্ছা থাকে, তবে আমাকে স্পষ্ট করিয়া আজ জবাব দাও—আমি অন্যত্র বিবাহ করিয়া সংসারধর্ম্ম করি।"

রাখাল ঘড়ি খুলিয়া দেখিল, বেলা তখন দুইটা। উঠিয়া কাপড় পরিয়া ছাতা ও ব্যাগটি মাত্র হাতে করিয়া, পদব্রজে শ্বশুরালয় যাত্রা করিল।

যখন সে দরজার বাহির হইতেছে তখন স্বর্ণলতা কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাতটি ধরিয়া বলিল—"কাকা!"

"কি স্বর্ণ?"

"আমার একটি কথা রাখবে?"

রাখাল একটু বিস্মিত হইয়া বলিল—"কি কথা স্বর্ণ? বল, রাখব।"

"কাকা—কাকীমাকে বেশী বোকো না।—বকবে?"

এই দুঃখের সময়ও একটু মুচকি হাসিয়া রাখাল বলিল—"আচ্ছা, বেশী বক্‌ব না।"

শুনিয়া বালিকার মুখখানি প্রফুল্ল হইল। আদরের স্বরে বলিল—"কবে আসবে কাকা?"

"কাল আসব মা!"—বলিয়া রাখাল সস্নেহে তাহার চিবুকাগ্রভাগ স্পর্শ করিয়া, পথে নামিয়া পড়িল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

শ্বশুরালয়ে।

বসন্তপুর গ্রামখানি ক্ষুদ্র হইলেও শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন। বাবু সারদাচরণ রায় ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ এই গ্রামের এবং পার্শ্ববর্ত্তী কয়েকখানি গ্রামের পত্তনিদার—কিন্তু সাধারণতঃ লোকে ইহাঁদের জমিদারই বলিয়া থাকে। রাখালের শ্বশুর কৃষ্ণদাস ঘোষালও সম্পন্ন ব্যক্তি এবং জমিদার পরিবারের সহিত বন্ধুত্ব কুটম্বিতাসূত্রে আবদ্ধ।

সেদিন অপরাহ্নে, দিবানিদ্রা সমাপন করিয়া, কৃষ্ণদাস বাবু বৈঠকখানায় আসিয়া তক্তপোষের উপর বসিয়াছেন। ডাকপিয়ন আসিয়া একখানি বাঙ্গলা সংবাদপত্র ও দুইখানি পত্র দিয়া গেল। পত্রগুলি পাঠ করিতেছেন এমন সময় প্রতিবেশী মুখুর্য্যে মহাশয় খড়ম পায়ে দিয়া খট্ খট্ করিতে করিতে বারান্দায় উঠিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন—"কাগজ এল ?"

কৃষ্ণদাস বাবু বলিলেন—"হ্যাঁ, এসেছে। আসুন।" মুখুর্য্যে মহাশয় তক্তপোষে উপবেশন করিয়া, কাগজখানি কোলে তুলিয়া লইলেন। পিরাণের পকেট হইতে চশমা বাহির করিয়া, কোঁচার কাপড়ে কাচ দুইখানি বেশ করিয়া পরিষ্কার করিলেন। তখন চশমাটি চোখে লাগাইয়া, কাগজখানি খুলিয়া অত্যন্ত মনোযোগের সহিত পাঠ আরম্ভ করিলেন।

বাঙ্গলা সংবাদপত্রের এরূপ বুভুক্ষু পাঠক, এ অঞ্চলে আর দ্বিতীয় নাই। প্রতি শনিবারে তীর্থের কাকের ন্যায় ইনি কৃষ্ণদাস বাবুর কাগজখানির জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন। শনি ও রবি এই দুই দিনে, সমস্ত কাগজখানি সায় বিজ্ঞাপন, তন্ন তন্ন করিয়া পাঠ করিয়া ফেলেন। স্মরণশক্তিও ইঁহার অসাধারণ। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে কবে কোন্ সহরে আগুন লাগিয়া কত লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়া গিয়াছিল, বলিয়া দিতে পারেন। উপস্থিত, ইনি রুষজাপান যুদ্ধসংবাদে মশ্‌গুল হইয়া আছেন। প্রতি সপ্তাহের যুদ্ধসংবাদ তাঁহার নখদর্পণে। শুধুই কি তাই? সমরকৌশলের ইনি একজন উৎকৃষ্ট সমালোচক। পাঠ করিতে করিতে উভয় পক্ষের সৈন্যসংস্থান, কাগজ পেন্সিল লইয়া আঁকিতে বসিয়া যান। কোনও পক্ষ কোনও যুদ্ধে পরাজিত হইলে, কি ভ্রমের জন্য পরাজয়টি ঘটিয়াছে, তাহার একটা সূক্ষ্ম সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলেন। কাগজে আঁকিয়া বলেন—"হায় হায় হায়—জেনেরাল অমুক যদি এই রকম না করে এই রকম করত— তা হলে কি এ যুদ্ধে ওদের হার হয়?—কি ভুলটাই করেছে! এটুকু বুদ্ধি নেই—বেটা জেনেরালগিরি করতে এসেছিল্?"

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল মনে মনে পাঠ করিবার পর মুখুর্য্যে মহাশয় বলিলেন—"যুদ্ধসংবাদটা পড়ব নাকি?"

কৃষ্ণদাস বাবু যুদ্ধসংবাদ পড়িয়া সব কথা ভাল বুঝিতে পারেন না—তাই তাঁহাকে প্রতি শনিবারে বুঝাইবার ভার মুখুর্য্যে মহাশয় স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন।

কৃষ্ণদাস বাবু বলিলেন—"পড়ুন।"

মুখুর্য্যে মহাশয় তখন অত্যন্ত ধীরে ধীরে যুদ্ধসংবাদ পড়িতে লাগিলেন। মাঝে

মাঝে কাগজখানি নামাইয়া, টীকাটিপ্পনি করিয়া কৃষ্ণদাস বাবুকে ব্যাপারটা বুঝাইতে লাগিলেন। এমন সময় শুষ্কমুখ, ঘর্ম্মাক্তকলেবর, ধূলিধূসসিত রাখাল ব্যাগ হাতে করিয়া আসিয়া সেখানে দাঁড়াইল।

হঠাৎ জামাতাকে এ অবস্থায় দেখিয়া কৃষ্ণদাস বাবু একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—"বাবা রাখাল এসেছো ? এস এস, বস। বাড়ীর সব ভাল ত ?"

"আজ্ঞা হঁ্যা"—বলিয়া রাখাল ব্যাগটি নামাইয়া, ছাতাটি রাখিয়া, শ্বশুরকে প্রণাম করিল।

"বস বাবা বস। জুতো খুলে ফেল। ওরে, পা ধোবার জল নিয়ে আয়। ইস্—ভারি ঘেমে উঠেছ যে! হেঁটে এলে ?"

"আজ্ঞা হঁ্যা।"

"খুস্রুপুর থেকে কবে এসেছ ?"

"আজ সকালেই এসে পৌছেছি।"

"ওরে, বাড়ীর ভিতর খবর দে, রাখাল এসেছেন। তা বাবা, এসেছ তবু দেখাটা হল। আজই না লীলাকে খুস্রুপুরে নিয়ে যাবার দিনস্থির করেছিলে ?"

"আজ্ঞা হঁ্যা।"

"তবে ? আজ যাওয়া হল না ?"

"আজ্ঞা না—কাল যাব।"

"বেশ বেশ। তা বাবা, যদি আমাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতেই এলে, লীলাকেও সঙ্গে করে আন্‌তে হয়। তার গর্ভধারিণী আজও দুঃখ করছিলেন, বলছিলেন, আহা বাছা আমার আজ পশ্চিমে চলে যাবে, আবার কতদিনে আসবে তারও ঠিক নেই,যাবার সময় একটিবার বাছাকে দেখতেও পেলাম না!"

এই কথা শুনিয়া রাখালের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। তাহার নাসিকা কর্ণ দিয়া আগুন ছুটিতে লাগিল। মাথা ঝিম্ ঝিম্ করিয়া উঠিল—চক্ষে যেন সকলই অন্ধকার হইয়া আসিল। তখন সংজ্ঞা হারাইয়া, সেই তক্তপোষ হইতে সশব্দে মেঝের উপর পড়িয়া গেল।

"কি হল ? কি হল ?"—বলিয়া তাহার শ্বশুর চীৎকার করিয়া উঠিলেন। একজন ছুটিয়া গিয়া অন্তঃপুরে সংবাদ দিল। বাড়ীর মধ্যে হইতে লোকজন ছুটিয়া আসিল। "জল আন্" "পাখা আন্"—বলিয়া একটা খুব সোরগোল পড়িয়া গেল। একজন রাখালের কোটের বোতাম খুলিতে লাগিল, একজন তাহার মুখে জলের ঝাপটা দিতে লাগিল, একজন মুখুর্য্যে মহাশয়ের হস্ত হইতে সংবাদ-পত্রখানা কাড়িয়া লইয়া, রাখালের মাথার কাছে বাতাস করিতে লাগিল। রাখালের শাশুড়ী অন্তঃপুরের দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দিগ্বিদিক্ কোনও বাধা না মানিয়া, বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া, রাখালের মস্তক কোলে তুলিয়া লইয়া বসিলেন এবং তাহার মুখের দিকে সজল নেত্রে চাহিয়া কম্পিতস্বরে বারম্বার বলিতে লাগিলেন—"হে মধুসূদন, হে হরি, দোহাই বাবা, সাত দোহাই তোমার,—বাছাকে আমার ভাল করে দাও।"

একজন ডাক্তার নিকটেই থাকিতেন—একজন তাঁহাকে সংবাদ দিতে

ছুটিয়াছিল। ডাক্তার বাবু তাড়াতাড়ি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হয়েছে?"

কৃষ্ণদাস বাবু সংক্ষেপে ব্যাপারটা বর্ণনা করিলেন।

ডাক্তার বাবু বলিলেন—"ও কি করছেন? মুখে জল ছিটচ্ছেন কেন?"—বলিয়া তিনি মেঝের উপর ঝুঁকিয়া, রাখালের নাসিকা টিপিয়া ধরিয়া তাহার নিঃশ্বাস রোধ করিয়া দিলেন। বলিলেন—"একজন ওর ছুই কাণে ছুটো আঙুল ভরে দাও, একজন ওর হাত ছুখানা চেপে ধর, একজন পা ছুখানা চেপে ধব—এখনি জ্ঞান হবে।"

ডাক্তার বাবু যাহা যাহা বলিলেন, তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদিত হইল।

এক মিনিটের মধ্যে ফলও দর্শিল। সবলে অঙ্গচালনা করিবার বৃথা চেষ্টা করিয়া, রাখাল চক্ষু মেলিল। ডাক্তার বাবু তখন তাহার নাসিকা হইতে হস্ত অপসৃত করিলেন।

রাখাল যেন বিস্মিতভাবে চারিদিকে চাহিতে লাগিল।

কৃষ্ণদাস বাবু বলিলেন—"কেমন আছ বাবা? একটু ভাল বোধ হচ্চে?"

ক্ষীণস্বরে রাখাল বলিল—"কি হয়েছে?"

কৃষ্ণদাস বাবু আবার বলিলেন—"কেমন আছ?"

"ভাল আছি।"

"বস্‌তে পারবে? উঠে বস দেখি।"

রাখাল উঠিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। তাহার দেহ যেন ছয়মাসের রোগীর মত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। দুইজনে ধরাধরি করিয়া তাহাকে উঠাইয়া তক্তপোষের উপর শোয়াইয়া দিল।

তাহার জামা কাপড় জলে ভিজিয়া গিয়াছিল। একজন পাখার বাতাস করিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে রাখাল বলিল—"শীত করছে।"

পাখা বন্ধ হইল। কৃষ্ণদাস বাবু বলিলেন—"এই রৌদ্রে এতখানি পথ হেঁটে এসে, সর্দ্দিগর্ম্মি হয়েছে।"

দিদি শাশুড়ী বলিলেন—"কেন দাদা এমন কর্ম্ম করলে? একখানা গোরুর গাড়ী ভাড়া করে আসতে হয়! সুখী শরীর—পথ চলা মোটে অভ্যেস নেই, সইবে কেন?"

মুখুর্য্যে মহাশয় বলিলেন—"আর এখানে কেন? বাড়ীর মধ্যে নিয়ে গিয়ে, কাপড় জামা ছাড়িয়ে দিয়ে, বাবাজিকে শুইয়ে দাও।"—যুদ্ধের মাঝখানে এইরূপ অভাবনীয় বাধা উপস্থিত হওয়াতে, মুখুর্য্যে মহাশয় অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িয়াছিলেন। ধৈর্য্যরক্ষা তাঁহার পক্ষে উত্তরোত্তর কঠিন হইয়া উঠিতেছিল।

ডাক্তার বাবুও সেই পরামর্শ দিয়া, বিদায় গ্রহণ করিলেন।

রাখাল তখন অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়াছিল। দুই দিকে দুইজনে ধরিয়া তাহাকে অন্তঃপুরে লইয়া গেল। কৃষ্ণদাস বাবুও সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিলেন।

মুখুর্য্যে মহাশয় একা বসিয়া তখন যুদ্ধসংবাদে মনোনিবেশ করিলেন। দুই

চারি ছত্র পড়িতেই, পদশব্দ শুনিয়া বাহিরে চাহিয়া দেখিলেন—রামজীবন রায় আসিতেছেন। ইনি জমিদার মহাশয়ের একজন প্রধান কর্ম্মচারী—একটু দূর সম্পর্কও আছে।

রামজীবন প্রবেশ করিয়া বলিলেন—"ঘোষাল মশায় কোথা ?"

"এই বাড়ীর ভিতর গেলেন। জামাইটি এসেছিল, এসেই অসুখ হয়ে পড়েছে।"—বলিয়া সকল বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে কৃষ্ণদাস বাবুও বাহির হইয়া আসিলেন। রাখাল কেমন আছে, উভয়ে জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন—"গা-টা ক্রমেই গরম হয়ে উঠছে। বোধ হয় জ্বর হবে।"

দুই একটা কথার পর কৃষ্ণদাস বাবু বলিলেন—"হ্যাঁ জীবন, নবীনের কোনও খবর পেলে ?"

নবীন, জমিদার বাবুর সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা। গত রাত্রি হইতে হঠাৎ সে নিরুদ্দেশ। চারিদিকে অনুসন্ধান চলিতেছিল।

রামজীবন বলিলেন—"কোথা গেছেন কিছুই ত বোঝা যাচ্ছে না। তবে আমরা এইটুকু সন্ধান পেয়েছি, কাল রাত দুপুরের পর, তাঁকে আর দুলেদের সৈরভির মাকে, একজন গাজনতলার হাটের কাছ দিয়ে যেতে দেখেছে। তাই শুনে আমরা সৈরভির মাকে ডাকিয়ে আজ জিজ্ঞাসাবাদ করলাম। কিন্তু সে ত ছোটবাবুর সঙ্গে যাওয়ার কথা স্বীকারই করে না। 'বল্লে করিমগঞ্জে তার এক বোন্‌পো আছে, তার ভারি ব্যারাম শুনে কাল রাত্রে তাকে দেখতে গিয়েছিল, আজ ভোরে ফিরে এসেছে। করিমগঞ্জ যেতে হলে গাজনতলার কাছ দিয়েই যেতে হয় বটে। যা হোক চারিদিকে অনেক লোক পাঠানো হয়েছে, দেখা যাক্ কোনও সন্ধান পাওয়া যায় কি না। বাড়ীতে ত গিন্নী-মা ভারি কাঁদাকাটি আরম্ভ করেছেন।"

কৃষ্ণদাস বাবু বলিলেন—"তিনি ত কাঁদাকাটি করবেনই। আমাদের বাড়ীর এরা, শুনে অবধি কেবল হায় হায় করছে। ভাল খবরটি পেলেই পাঁচসিকের হরিরলুট দেবে মানৎ করেছে। বাড়ীতে সর্ব্বদা আসত যেত, গিন্নী তাকে ছেলের মতই দেখেন—দূর সম্পর্ক হলে কি হয় ? কোথায় গেল ছোকরা—কি দুর্ব্বুদ্ধি হল ! এখন প্রাণে প্রাণে বেঁচে থাকলেই মঙ্গল।"

এইরূপ কথোপকথনে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। বন্ধুগণকে বিদায় দিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া কৃষ্ণদাস বাবু দেখিলেন, জ্বরঘোরে রাখাল অচেতন হইয়া পড়িয়াছে।

ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

রাজকুমারী

(টেনিসনের Lady Clara *Vere de Vere* হইতে)

রাজকুমারি, রাজার মেয়ে! হাজার তুমি মান্য পাও
আমি তোমার খ্যাতির নহি ভক্ত;
তুমি শুধু খেলার ছলে পরের মনটি জিন্‌তে চাও
প্রেমের পায়ে না হয়ে অনুরক্ত!
মেলিয়াছিলে আমার 'পরে কুহকভরা মুগ্ধ চোখ,
জানিয়া তাই সরিয়াছিনু বাহিরে,
রাজকুমারি, বংশ তব লক্ষ খ্যাতিযুক্ত হোক্‌,
আমি ত কভু তোমারে নাহি চাহিরে।

রাজকুমারি, রাজার মেয়ে! মহতী তব মহিমা—
জানি গো তব উচ্চ কুলগর্ব্ব,
নিজে যে রহে নিজের নাম—নিজের গুণগরিমা,
তাহার কাছে নিখিল খ্যাতি খর্ব্ব!
হৃদয় মোর বিরহে তব ভাঙিবে কভু ভেবোনা আর—
এ হৃদি আরো খাঁটি ধনের সন্ধানি;
তরুণী যদি সরলা হয়, অনেক বেশী মূল্য তার,
অযুত মান চরণে তার বন্দিনী।

রাজকুমারি, রাজঝিয়ারি! যশের খ্যাতি সব দিয়ে
বাছিয়া লহ হীন কোন ভক্ত;
দিন-দুনিয়া মালেক হ'লেও তবু আমার মন নিয়ে
অমন মনে হয়না অনুরক্ত!
বাস্‌তে ভাল জানি কিনা, তুমি শুধু জান্‌তে চাও—
উত্তরে তার ঘৃণাই আমার বল্‌তে হয়,
পাথর-গাথা মোটা তোমার থামের মাথার সিংহটাও
আমার চেয়ে তোমার প্রতি শক্ত নয়!

রাজকুমারি, রাজদুলালি! হাজার মানের সিঁদুকটি!
আজকে ফিরে' অনেক কথাই হয় স্মরণ—
তিনটি বছর পেরোইনিক, ওপাড়ার ঐ যুবকটি

মদির তব কটাক্ষটি, মধুর তোমার কণ্ঠস্বর,
মোহন তব মন ভুলাবার মন্ত্রটি,
কণ্ঠে তাহার দাগটি কিসের—কোথায় হ'তে মৃত্যুশর—
চেয়েছিলে বারেক তুমি জানতে কি ?

রাজকুমারি, রাজঝিয়ারি! শ্রদ্ধা রাখ অন্তরে,
উর্দ্ধপানে চেয়ে দেখ মেঘধারে—
তোমার আমার—সবার পূর্ব্বপুরুষ যিনি, তিনিই যে
হাসেন তব বনিয়াদির আব্দারে!
যাহোক তাহোক, শোন আমার সরল মনের অহঙ্কার,
মহত্ব—সে থাকে নিজের অন্তরে,
হৃদয়ে যার দয়া থাকে, মুকুট চেয়ে মূল্য তার,
সরল নিষ্ঠা খ্যাতির সেরা মন্ত্র রে।

রাজকুমারি, রাজার মেয়ে! দৃঢ় আমার বিশ্বাস এ
প্রাসাদশিরে ক্লেশের তব অন্ত নাই;
গরবী ও আঁখির জ্যোতি নিব্‌ছে প্রতি নিশ্বাসে,
পুষ্প-শেজে লুট্‌ছ দারুণ যন্ত্রণায়!
স্বাস্থ্যে ভরা রূপটি তব বাক্স ভরা বিত্তেতে—
অজানা কোন্ নিত্য-ব্যাধি সঙ্গিনী;
কেমন্ করে' সময় কাটে, চিন্তা সদা চিত্তেতে,
তাইতে অমন বিলাস-রঙে রঙ্গিনী!

রাজকুমারি, রাজকুমারি! শুন্‌ছ বসে' খ্যাতির ঢেউ—
সময় যদি কোন মতেই কাট্‌ছে না!
বিস্তৃত এ রাজ্যে তব দরিদ্র কি নাইক কেউ,
দ্বারে তোমার ভিক্ষুকও কি যুটছে না ?
অনাথ ছেলে—তাদের ডেকে যত্নভরে শিক্ষা দাও,
অনাথ মেয়ে—গৃহকর্ম্ম শিখাও তায়;
পরমেশের পরমপদে নারী-হৃদয় ভিক্ষা চাও
পরাণ নিয়ে খেলা হ'তে লও বিদায়।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

চট্টগ্রাম সাহিত্য-সম্মিলনে নিবেদন

মাননীয় মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর আহ্বানে যখন কাশিমবাজারে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন আহূত হয়, তখন উপস্থিত সাহিত্যসেবিগণের অনুরোধে ও অনুমতিক্রমে এই সম্মিলনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রবন্ধপাঠের ভার আমার উপর পড়িয়াছিল। আমার বিশেষ আনন্দ এই যে, মুখ্যতঃ সেই উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া এই কয় বৎসর এই সাহিত্য-সম্মিলন ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়াছেন এবং আমিও সেই উদ্দেশ্য অনুসারে এই সম্মিলনের গঠন ও পরিচালন কার্য্যে আমার ক্ষুদ্র শক্তি যথাসাধ্য অর্পণ করিয়া আসিয়াছি। আজ শারীরিক অবসাদ আমাকে সাহিত্য-সম্মিলনে যোগ দিতে দিল না এবং চট্টগ্রামে সমবেত সাহিত্যসেবিগণের সঙ্গলাভে অসমর্থ করিল। ঘটনাক্রমে বঙ্গসাহিত্যের অনুরক্ত ভক্ত এবং সাহিত্য-সম্মিলনের প্রাণস্বরূপ মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রও অদ্যকার সম্মিলনে উপস্থিত হইতে পারেন নাই এবং সম্মিলনের গঠন পরিচালনা কার্য্যে যিনি আমার প্রধান সহায় ছিলেন সেই ব্যোমকেশ মুস্তফীও আজ আমারই মত ভগ্ন দেহ লইয়া আপনাদের সঙ্গলাভে বঞ্চিত হইয়াছেন।

জগন্মাতার ছিন্নাঙ্গ সম্পর্কে যে চট্টগ্রাম প্রদেশ সমস্ত ভারতবাসীর মহাপীঠ, দেবদেব চন্দ্রশেখরের অপ্রসাদ ব্যতীত সেই তীর্থের রজ শিরে ধরিবার সুযোগলাভে বঞ্চিত হওয়ার আর কি হেতু থাকিতে পারে? বিধাতৃ-বিধানের উপর পরিতাপে কাহারও অধিকার নাই; দৈব অপ্রসাদকে মহাপ্রসাদ রূপে শিরোধার্য্য করিয়াই আমার ন্যায় ক্ষুদ্র মানব সান্ত্বনালাভে বাধ্য আছে, কিন্তু কতিপয় কারণে আমার ক্ষোভের মাত্রা এত অধিক হইয়াছে যে, তাহা ব্যক্তিগত হইলেও আমি আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতে সাহসী হইতেছি। আপনারা আমাকে ক্ষমা করিবেন। ভারতের মহাকবি বলিয়াছেন—

"যদধ্যাসিতমর্হদ্ভি স্তদ্ধি তীর্থং প্রচক্ষতে।" মহৎলোকের আসনভূমি তীর্থ-স্বরূপ। বাঙ্গালার সাহিত্যক্ষেত্রে যাঁহারা আমার গুরুস্থানীয় এবং যাঁহারা আমার সহায় ও সহকারী মিত্রস্থানীয়, সেই মহাশয়গণের পদার্পণে চট্টগ্রাম এই কয়দিনের জন্য তীর্থে পরিণত হইয়াছে। যে সকল কবি ও মনীষী পূর্ব্বে বা পরে চট্টগ্রাম অলঙ্কৃত করিয়াছেন বা করিতেছেন, তাঁহাদের সকলের নাম উচ্চারণ আমার পক্ষে সম্ভবপর নহে, কিন্তু একটি নাম উচ্চারণের স্পৃহা আমি কিছুতেই দমন করিতে পারিতেছি না। স্বর্গগত কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের সম্পর্কলাভে চট্টগ্রাম বাঙ্গালার সাহিত্যভক্তদিগের সকলের পক্ষেই তীর্থস্বরূপ হইয়াছে। আজিকার এই শুভ

যাঁহারা চট্টগ্রামে তীর্থযাত্রী, তাঁহাদের সাহচার্য্য লাভে বঞ্চিত হইয়া আমি ক্ষুব্ধ ও পরিতপ্ত। আমার ক্ষোভের আর একটা প্রবল হেতু আছে। গত বৎসর হুগলী নগরে বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলনের অধিবেশনে যিনি হুগলীর পক্ষ হইতে বঙ্গের সাহিত্যসেবকগণের অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, তিনিই আজ আমাদের সৌভাগ্যক্রমে চট্টগ্রামের এই ষষ্ঠ অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া সম্মিলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। গত বৎসর তিনি আমাকে তাঁহার সাহিত্যশিষ্য বলিয়া পরিচিত করিয়া সভাস্থলে প্রকাশ্যভাবে গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন। তাঁহার মনে আছে কি না জানি না, কিন্তু এই স্থলে একটি ক্ষুদ্র পুরাতন ইতিহাস তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিবার প্রলোভন আমি সংবরণ করিতে পারিতেছি না। আটাইশ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহারই প্রকাশিত "নবজীবন" পত্রিকায় বাঙ্গালী সাহিত্যে আমার হাতে খড়ি হইয়াছিল। আমার তখন পঠদ্দশা। ছাপার হরপে নিজের রচনা প্রকাশিত দেখিবার প্রবল চাপল্য আমি দমন করিতে পারি নাই; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের হস্ত মাসে মাসে যে পত্রিকার জন্য অলঙ্কার রচনা করিত, সেই পত্রিকায় নিজের মসীঅঙ্কিত নাম জাহির করিতে চপল বালক যারপরনাই শঙ্কা বোধ করিয়াছিল। নবজীবনে আমার প্রথম রচনা ও পরবর্ত্তী আরও কয়টি রচনা আমি বেনামিতে পাঠাইয়াছিলাম। আমার প্রথম রচনা নবজীবনে বাহির হইয়াছিল বটে, কিন্তু প্রকাশের পর দেখিতে পাইলাম যে, নবজীবনের সম্পাদক প্রবন্ধটিকে নির্দ্দয়ভাবে কাটিয়া ছাঁটিয়া ক্ষতবিক্ষত করিয়া উহার স্ফীত কলেবর শীর্ণ করিয়া দিয়াছেন। মনে বুঝিলাম যে, সম্মুখে উপস্থিত থাকিলে আমার পৃষ্ঠদেশ নিশ্চিতই আমার সাহিত্যগুরুর নিকট বেত্রাঘাতের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইত। যাহা হউক, সেই হাতে খড়ির দিনে গুরু মহাশয় কর্ত্তৃক পরোক্ষপ্রেরিত বেত্রাঘাত আমার পরবর্ত্তী সাহিত্যিক জীবনে সংযম-সাধনায় সাহায্য করিয়াছে। সেদিনের সেই সংযম শিক্ষা না ঘটিলে, আমার পরবর্ত্তী সাহিত্যিক জীবন উচ্ছৃঙ্খল হইতে পারিত, ইহা আমি প্রতিনিয়ত স্মরণ করিয়া থাকি। বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলনের প্রথম অধিবেশনে তাঁহাকে উপস্থিত না দেখিয়া আমার হৃদয়ের বেদনা মৎপঠিত প্রবন্ধমধ্যে ব্যক্ত করিতে আমি বাধ্য হইয়াছিলাম। আজি তিনি চট্টগ্রাম সম্মিলনে বঙ্গসাহিত্যের গুরুর আসনে সমাসীন হইয়া এক হস্তে বেত্রসঞ্চালন ও অন্যহস্তে অভয়মুদ্রা প্রদর্শন করিবেন। আমি চিরানুগত শিষ্যরূপে তাঁহার অনুগমনের অবকাশ পাইলাম না। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ধ্বজবাহক কিঙ্কররূপে আমি এপর্য্যন্ত বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিলাম, বঙ্গীয়-সাহিত্য

পরিষদের ধুরবহন কার্য্য আমার অপেক্ষা সহস্রশঃ যোগ্যতর ব্যক্তির বৃষস্কন্ধে আরোপণ করিয়া আমি নিশ্চিন্ত আছি। সাহিত্য-পরিষদের অকৃত্রিম বন্ধু শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয় পরিষদের পক্ষ হইতে সম্মিলনে উপস্থিত হইয়া পরিষদের প্রীতি সম্ভাষণ বিজ্ঞাপন করিবেন। সাহিত্য-সম্মিলনের সহিত সাহিত্য-পরিষদের প্রীতি-সম্পর্ক যাহাতে চিরস্থায়ী ও অক্ষুণ্ণ হয়, এইরূপ আশ্বাস ও সাহস পাইয়াছি। আমি এবার সম্মিলনের পরিচর্য্যাকর্ম্মে অংশভাগী হইতে পারিলাম না; তজ্জন্য বিনীতভাবে আপনাদের নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতেছি। এই ভিক্ষার সহিতই আমি সাহিত্য-সম্মিলনের নিকট এবৎসরের জন্য—অথবা ভবিতব্যবিধানে হয়ত চিরদিনের জন্য বিদায় লইতেছি।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

পরীক্ষা-বিভীষিকা

(রবীন্দ্রনাথের বর্ষামঙ্গল অনুসরণে)

(১)

ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব দাপটে,
ছাত্রকুলের কেশপাশ ধরি' সাপটে,
রৌরবকেতু গৌরবে করে বহি'রে—
আসে পরীক্ষা অই রে!
ভীম গর্জ্জনে অন্তরাত্মা শিহরে,
যুবকবৃন্দ 'ঝড়ো' কাক সম বিহরে!
আসে রে বুদ্ধি-হারিকা,
সংসার-দ্বারে পাষাণ-দুর্গ-পরিখা!

(২)

কোথা তোরা ওগো তরুণী জায়ার স্বামীরা,
ওগো কৌতুকী বহুযৌতুক-কামীরা,
বিবাহে বাজাতে চাহ যদি জগঝম্প,
সবে দাও আজি লম্ফ।
আন জীবনের সকল মন্ত্র-তন্ত্র,
নানাবিধ তালে বাজুক্ কণ্ঠ যন্ত্র;
পরীক্ষাপাশ কাঙালী—
পর-চরণের চাকুরীর দাস বাঙালী!

(১০)

না, না—পরীক্ষা উড়ান' চলে না হাসিয়া,
তপের সাধনা স্থির বীরাসনে বসিয়া,
স্নেহ ভালবাসা ভোগ সুখ শত বিকারে,
নির্ম্মম রূঢ় অচল অটল থাকা রে!
কণ্ঠ জড়িত সাপের খোলস-লতাতে—
পাখীতে কুলায় বাঁধিবে কেশের জটাতে,
তবু জপ কর মন্ত্র অটল শান্ত ;
—তবে কোনরূপে ফাঁড়াটা অতিক্রান্ত!

(১১)

ঐ আসে তবে হৃদয়ক্ষেত্র কর্ষি',
শ্রাবণধারায় মূষলের মত বরষি',
নিয়ে আসে শেষে 'বণিক-সুতের দুরাশা'—
আকাশ-কুসুম 'ট্যাণ্টালাসের পিপাসা'!
নানা কলেজের ছেলেরা সেনেটে মিলিয়া,
ধ্বনিয়া তুলিবে নানারূপ কলকলিয়া,
হাসিয়া কাঁদিয়া নাচিয়া কুঁদিয়া খসিয়া,
কেহ বা হাসিল করিয়া, কেহ বা ফাঁসিয়া!

(১২)

ঐ আসে ঐ পিশাচী লেলিহ-রসনা,
বাজাও ঢক্কা, করহ ডঙ্কা-ঘোষণা,
পূজার অর্ঘ্য আন হে মগজ-মজ্জা,
আকালিক জরা, নাড়ী-ভুঁড়ি আদি সজ্জা!
হাড়ীকাঠগুলি সিঁদুরে রাখ গো রাঙায়ে,
হৃদয়-শোনিতে দাও পদযুগ ধোয়ায়ে,
এক হাতে বর আনে আর হাতে খড়্গ—
দেখায়ে রক্ত-সিন্ধু পারের স্বর্গ।

শ্রীকালিদাস রায়

উদম্বরা-মহোষধ

মানসী

৫ম ভাগ বৈশাখ, ১৩২০ সাল ৩য় সংখ্যা

ময়নামতীর পুঁথি।

ইহা একখানি অতিসুন্দর প্রাচীন পুঁথি। বিজ্ঞবর গ্রিয়ারসন্ সাহেব কর্ত্তৃক এসিয়াটিক সোস্যাইটির জারন্যালে প্রকাশিত "মাণিকচাঁদের গীতি", দুর্ল্লভ মল্লিক-কৃত "গোবিন্দচন্দ্র গীত", সাহিত্যপরিষদে প্রকাশিত "ময়নামতীর গান", শেখ ফায়জুল্লা কৃত "গোর্খ-বিজয়" আর সমালোচ্য পুঁথি প্রায় একই বিষয়ে লিখিত। মাণিকচাঁদ ও ময়নামতীর পুত্র গোবিন্দচন্দ্র নামান্তরে গোপীচাঁদ রাজার সন্ন্যাস-যাত্রা ইহার প্রতিপাদ্য বিষয়। এই পুঁথিখানি শীঘ্রই "পরিষদে" প্রকাশ করিবার বাসনা আছে। এই জন্য ইহার প্রতিপাদ্য বিষয়ে এখানে আর বেশী কিছু বলিলাম না।

ভবানীদাস নামক জনৈক কবি ইহার রচয়িতা। গ্রন্থের স্থানে স্থানে এই রকম ভণিতা আছে:—

"সুন হে রসিক জন একচিত্ত মন।
কহেন ভবানি দাসে অপূর্ব্ব কথন॥"

এতদ্ভিন্ন কবির আর কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। পুঁথিতে এমন কতকগুলি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, যাহা অদ্যাপি চট্টগ্রামে অল্প বিস্তর প্রচলিত আছে।

পুঁথিখানি অত্যন্ত প্রাচীন। ইহার কাগজ নিতান্ত জীর্ণ শীর্ণ, যেন তাম্র-কূট পত্র। প্রতিলিপিখানি অন্ততঃ দুইশত বৎসরের কম প্রাচীন বোধ হয় না। দুঃখের বিষয় পুঁথিখানি আদ্যন্ত খণ্ডিত। কাগজের দুই পিঠে লেখা। আরম্ভে ১ম পত্র নাই এবং ২৪শ পত্রের পর পুঁথি খণ্ডিত হইয়াছে। পুঁথির কতদূর বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, ঠিক জানিবার উপায় নাই। তবে শুনিয়াছি, ইহার পর পুঁথি আর বড় বেশী ছিল না।

পুঁথির ভাষা নিতান্ত সরল ও অনাড়ম্বর,—ঠিক গ্রাম্য কবির উপযুক্ত। সমগ্র পুঁথিখানি পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে বিরচিত হইয়াছে; কিন্তু ত্রিপদী ছন্দ

ঠিক নিয়মানুযায়ী হয় নাই। আমাদের বোধ হয়, ত্রিপদী ছন্দে লিখিত অংশ-গুলি প্রক্ষিপ্ত রচনা। রচনার নমুনা স্বরূপ একস্থান হইতে নিম্নে কতকটা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

"মৈনামতি বোলে রাজা কিছু নহে সার।
দুই চৌক্ষু মুন্দি দেখ দুনিয়া আন্ধার॥
ইষ্ট মিত্র বাপ ভাই কেহ নহে সার।
পুত্র কৈন্যা সঙ্গে রাজা না জাবে তোমার॥
কায়া মায়া সব ছাড়ি বলে ধরি নিব।
এমন সুন্দর তনু থাকেত মিশিব॥
ধন জন দেখিআ আপনা বোল তারে।
এ তনু আপনা নহে লৈয়া ফির জারে॥
কোন কর্ম্ম হেতু রাজা দেহ কৈলা পাত।
কি বুলি জোয়াব দিবা স্বামির সাক্ষাত॥
আসিতে লেঙ্গটা রাজা জাইতে জাবা শূন্য।
সঙ্গে করি নিয়া জাবে পাপ আর পুণ্য॥

এই গ্রন্থে অনেকগুলি মুসলমানী শব্দ ও কয়েকটি বৈষ্ণবকবিতার অংশ বিশেষ ধুয়া স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, পুঁথিখানি দেশে বৈষ্ণবপ্রভাব বদ্ধমূল হওয়ার পরে রচিত হইয়াছে। "মানিকচাদের গীতির" ভাষার সহিত স্থানে স্থানে ইহার ভাষা ও ভাবগত সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। মাননীয় শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় এতদ্বিষয়ক গ্রন্থগুলিকে কোন এক প্রাচীন গীতির বিশুদ্ধ সংস্করণ বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন। এই বিষয়ে আমরাও তাঁহার সহিত ঐকমত্য পোষণ করি।

দুর্ভাগ্যক্রমে মান্যবর গ্রিয়ারসন সাহেবের প্রকাশিত "মাণিকচাদের গীত" আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। অপর পুঁথিগুলি দেখিয়াছি বটে কিন্তু কোন পুঁথিতেই সমালোচ্য পুঁথির মত এত অধিক ঐতিহাসিক কথা দেখিয়াছি মনে হয় না। তা ছাড়া দেশের তাৎকালীন আচার ব্যবহার ও পোষাক পরিচ্ছদ প্রভৃতি সম্বন্ধে ইহাতে অনেক নূতন তথ্য আছে। এই হিসাবে পুঁথিখানিকে আমরা অত্যন্ত মূল্যবান মনে করি।

এই পুঁথি আবিষ্কৃত হওয়ায় আর একটা নূতন সংবাদ পাওয়া গেল। এত দিন উত্তরবঙ্গই মাণিকচাদ, ময়নামতী ও গোবিন্দচন্দ্র রাজার লীলাক্ষেত্র ছিল

বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছিল। এই পুঁথি হইতে আমরা পূর্ব্ববঙ্গের সুদূর প্রান্ত চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত তাঁহাদের কর্ম্মক্ষেত্রের বিস্তার দেখিতে পাই। ক্রমে সে কথা বলিতেছি।

ত্রিপুরা জেলায় মেহারকুল পরগণায় "ময়নামতী" বলিয়া একটা স্থান আছে। এস্থানের নানাবিধ ছিট-কাপড় এতদ্দেশে বিশেষ প্রসিদ্ধ। তাহা সাধারণতঃ "ময়নামতীর ছিট" বলিয়া বিখ্যাত। লোকের বিশ্বাস, তিলকচাঁদের কন্যা ও মাণিকচাঁদের স্ত্রী ময়নামতী পরম সিদ্ধা ছিলেন এবং তিনি লালমাই পাহাড়ের সংলগ্ন বর্ত্তমান ময়নামতী নামক স্থানে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। এই জন্য তাঁহার নামানুসারে ঐ স্থানের নাম "ময়নামতী" হইয়াছে। পূর্ব্বে ময়নামতী বলিয়া কোন স্থান ছিল না। বর্ত্তমান ময়নামতী যে স্থানে অবস্থিত, তাহা পূর্ব্বে লালমাই পাহাড়েরই অন্তর্গত ছিল। (লালমাই আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের একটা ষ্টেসন বটে) রাণী ময়নামতীর আমল হইতেই উহার এই নাম হইয়াছে। কোনও সুপ্রসিদ্ধ ভৌগোলিক লিখিয়াছেন,—"এখানে বিস্তর ময়নাপাখী পাওয়া যাইত বলিয়া ইহার নাম ময়নামতী হইয়াছে।" বস্তুতঃ তাঁহার এই অনুমান নিতান্তই অসার। এস্থলে বলিয়া রাখা ভাল, স্থানীয় প্রাচীন দলিল পত্রাদিতে এই স্থানের নাম "মৈনামতী" রূপে লিখিত আছে। বর্ত্তমানেও উহা ঐভাবে লিখিত হইয়া থাকে।

প্রাচীন লোকদের ধারণা, রাণী ময়নামতীর চারি জায়গায় চারিটি রাজবাটী ছিল; তৎ যথা :—

১ম বাড়ী—তরফে ওরফে কৌলিন্য নগরে (সম্ভবতঃ রঙ্গপুরে), ২য় বাড়ী—চট্টগ্রামে, ৩য় বাড়ী—বিক্রমপুরে এবং ৪র্থ বা সর্ব্বশেষ বাড়ী—মেহারকুল পরগণার ময়নামতী নামক স্থানে। সমালোচ্য পুঁথিতেও আমরা উক্ত জনপ্রবাদের সমর্থন দেখিতে পাই। নিম্নোদ্ধৃত অংশে রাজা গোবিন্দচন্দ্রের রাজবৈভব ও উক্ত প্রবাদবাক্যের সত্যতা সম্বন্ধে কতকটা নিদর্শন মিলিবে :—

(১) মেহারকুল বেরি ছিল মুলিবাসের বেরা।
গ্রিহস্তের পরিধান সোণার পাছরা ॥ *

---

* এই 'পাছড়া' শব্দের ব্যবহার মাণিক চাঁদের গীতিতে ও পরিদৃষ্ট হয়।

'ঘরেন বান্দি নাহি পিন্ধে পাটের পাছড়া।'

'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' উদ্ধৃত এই চরণটি প্রকৃত পাঠ বলিয়া বোধ হয় না। আমাদের মতে উহার এরূপ পাঠ হইবে :—

"ঘিনে বান্দি নাহি রিন্ধে পাটের পাছড়া।"

ইহার অর্থ,—অন্যের কথা কি বলিব, বান্দী (দাসী) ও ঘৃণায় পাটের পাছড়া পরিধান করে না।

(২) আমি রাজা যুগি হোবে তারে য়দিক নাই।
এ সুখ সম্পদ আমি এড়িমু কার ঠাই॥
কার কাছে এরি জাইব হংস রাজ ঘোড়া।
কার ঠাঞি এড়ি জাইমু গাএর খাঁসা জোরা

*   *   *   *

গাঙ্গেত এরিয়া জাবে বত্তিশ কাহোন নাও।
পুরি মৈদ্ধেএরি জাবে তুমি হেন মাও॥
কিল ঘরে এরি জাবে আশি হাজার হাতি।
বিদেশে গমন কৈলে কে ধরিবে ছাতি॥
আস্তবিনা এ এরি জাবে নয় লাখ ঘোড়া।
জোর মন্দিরে এরি জাবে শাহেমানি দোলা॥
পুরি মধ্যে এরি জাবে পঞ্চ পাত্রবর।
পান জোগানি এড়ি জাবে উনশত নফর॥
শেঁত বান্দা এরি জাবে হারিয়া ছোহর। (?)
অদুনা পদুনা এরি জাবে কার ঘর॥
বাতানে এড়িয়া জাবে সত্তর কায়ন বেত।
গোএগাইলে এরিয়া জাবে গাঁই বারশত॥
এহি সব এরি জাবে আপনে জানিয়া।
নএয়া নগর এরি জাবে উনশত বানিয়া॥
বাপের মিরাশ এড়ি জাইমু গৈরব সহর।
দাদার মিরাশ এরি জাবে কামলাক নগর॥
তুমি মাএর জত বাড়ি কলিকা নগর।
আমি বাড়ি বান্ধিয়াছি মেহারকুল সহর॥
চল্লিশ রাজাএ কর দেএ আমার গোচর।
আমা হোতে কোন জন আছএ ডাঙ্গর॥
সাজ সাজ কর্ব্বি রাজা দিল এক ডাক।
এক ডাকে সাজি আইল বাসত্তের লাখ॥
হস্তি ঘোড়া সাজে য়ার মোহা মোহা বির।
সাজিল য়পার সৈন্য আঠার উজির॥

বাশষ্টী উজির সাজে চৌশষ্ট সিকদার।
হস্তে ঢাল সৈন্য সাজে বিরাশি হাজার॥

লোকে বলে, মৈনামতীকে কেন্দ্র করিয়া রাণী ময়নামতী ইহার চতুর্দ্দিকে ঊনশত রাজবাটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। "ঊনশত রাজার বাড়ী" বলিয়া স্থানীয় লোকদের মনে যে ধারণা আছে, তাহা সম্ভবতঃ রাণী ময়নামতীর ঊনশত রাজবাটী ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই বাটীর চতুঃসীমা এইরূপ :—উত্তরে দেবপুর ইত্যাদি গ্রাম, দক্ষিণে চণ্ডীমুড়া প্রকাশ চন্দ্রনাথ ও সীতাকুণ্ড, পূর্ব্বে গোমতী নদী এবং পশ্চিমে পাটীকারা ও গঙ্গামণ্ডল পরগণা। এই চৌহদ্দি মধ্যস্থ ভূখণ্ডের বহুস্থানে ও পাহাড়াদিতে অদ্যাপি অট্টালিকাদির অনেক ভগ্নাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়।

ত্রিপুরা জেলায় নবিনগর একটা প্রসিদ্ধ মহকুমা। প্রাগুক্ত অংশে উল্লিখিত নয়ানগর এই নবিনগর কিনা, আলোচনার বিষয় বটে। গোবিন্দচন্দ্রের পিতা মাণিকচাঁদের মিরাশ (বাটী) "গৈরব সহর" কোথায়, অবধারণ করিতে পারিলাম না। তাঁহার দাদা বা পিতামহের মিরাশ "কামলাক সহর" সম্ভবতঃ কুমিল্লা সহরকে বলা হইয়াছে। কুমিল্লার অপর নাম কমলাঙ্ক হইতে কামলাক শব্দের উৎপত্তি হওয়া আশ্চর্য্য নহে। তাঁহার মায়ের মিরাশ কলিকানগর কি তরফের দেশ ওরফে কৌলীন্য নগর বা রঙ্গপুর? প্রাগুদ্ধৃত অংশ হইতে দেখা যায়, রাজা গোবিন্দচন্দ্র মেহারকুল সহরে বাড়া করিয়াছিলেন।* পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, মেহারকুল ত্রিপুরা জেলায় একটা পরগণার নাম এবং ময়নামতী উক্ত পরগণায় অবস্থিত। ময়নামতীর চতুঃসীমা এই :—পূর্ব্বে সাগরদীঘির † পূর্ব্বে গোমতী নদী পর্য্যন্ত, পশ্চিমে জুমুর ও সাহা দৌলৎপুর, উত্তরে দেবপুর ইত্যাদি গ্রাম এবং দক্ষিণে সাহা দৌলৎপুর ও ঘোষনগর। দুর্ল্লভমল্লিকের

---

* মাণিকচাঁদ কোথাকার রাজা ছিলেন, এখনও কেহ নিশ্চিতরূপে স্থির করিতে পারেন নাই। এই পুথি হইতে জানা গেল, তৎপুত্র গোবিন্দচন্দ্র মেহারকুলের রাজা ছিলেন। পুথির আর এক স্থলে নিম্নোদ্ধৃত বাক্যটি পাওয়া যায়।

খেনেক রহ বসুমতি খেনেক রহ তুমি।
মেহারকুলের রাজারে পরিক্ষা দেখাই আমি॥

† সমালোচ্য পুথিতেও ই এসাগর দীঘির উল্লেখ দেখা যায় :—

উলুর কচুরা তোমার গলাএ বান্ধিয়া।
সাগর দিঘির মধ্যে স্নান কর গিয়া॥

গোবিন্দচন্দ্র গীত নামক গ্রন্থে দেখা যায়, সুবর্ণচন্দ্র মহারাজা ধাড়িচন্দ্র পিতা। তার পুত্র মাণিকচন্দ্র (শুন তার কথা)॥" উক্ত গ্রন্থে ময়নামতী ও গোবিন্দচন্দ্রের রাজধানী পাটীকানগরে অবস্থিত ও গোবিন্দচন্দ্রের রাজ্য ষোল দণ্ডের পথ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে। পাঠকগণ দেখিবেন, পূর্ব্বে ঊনশত রাজার বাটীর যে চতুঃসীমা দেওয়া গিয়াছে, তাহাতে এক পাটীকারা গ্রামের নাম রহিয়াছে। পাটীকা ‡ ও পাটীকারা শব্দদ্বয়ের সৌসাদৃশ্য যেন উহাদের একত্বই সূচিত করিতেছে। উক্ত চৌহদ্দিতে দেখা যায়, ঊনশত রাজার বাটী দক্ষিণে চণ্ডীমুড়া প্রকাশ চন্দ্রনাথ ও সীতাকুণ্ড পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইহা হইতে রাণী ময়নামতী চট্টগ্রামে বাটী থাকার প্রবাদের সত্যতা প্রতিপন্ন হইতেছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে (কোথায় মনে পড়ে না) পড়িয়াছিলাম, আমাদের শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর বলিয়াছেন, গোবিন্দচন্দ্র রাজা চট্টগ্রামে রাজত্ব করিয়াছিলেন। সমালোচ্য পুঁথিতেও এই কথার আভাষ পাওয়া যায়, যথা :—

অব্রেথা হৈল সিদ্ধা খেতীর উপর।
এক নাম রাখি জাবে মেহারকুল সহর॥
আদ্ধ মাটী আছে কিছু মেহার কুল নগরে।
নিজ মাটী আছে কিন্তু বিক্রমপুর সহরে॥
আর য়াছে আইধ্য মাটী তরপের দেশ।
চাটীগ্রাম পূর্ব্ব মাটী জানিবা বিশেষ॥
তবে হস্তে ধরি গোর্খে রথে তুলি লৈল।
রথখান কুদাইয়া বিক্রমপুরে নিল॥
যুগি ঘাঠ করি নাথে ঘাট বানাইল।
সেই ঘাঠে স্নান করি পাপ বিনাশিল॥

প্রাগুদ্ধৃত অংশটি ঠিক বুঝিতে না পারিলেও তাহা হইতে এই বুঝিতে পারা যায় যে, ময়নামতী রাণী ত্রিপুরা জেলার মেহারকুল, বিক্রমপুর, তরফের দেশ (রঙ্গপুরে ?) ও চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। আমরা এই বিষয়ে কোন সমীচান্ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারিয়া ঐতিহাসিকদের উপর তাহার মীমাংসার ভার ন্যস্ত করিলাম।

‡ সেখ ফাসজুল্লা কৃত 'গোর্খ বিজয়ে' ও পাটীকা নগরের উল্লেখ আছে

রাজা গোবিন্দচন্দ্র চারি বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্ত্রীগণের নাম এই :—অদুনা, পদুনা, রত্নমালা বা কাঞ্চাসোণা, কাঞ্চনমালা বা পদ্মমালা। গোবিন্দচন্দ্রের বিবাহ সম্বন্ধে এই পুঁথিতে নিম্নলিখিত কথাগুলি পাওয়া যায় :—

এক বিভা করাইলা অদুনা পদুনা।
সে সব সোন্দরী জানে আমার বেদনা॥
আর বিভা করাইলা থাণ্ডাএ জিনিয়া।
আর বিভা করাইলা উরয়া রাজার মা এরা॥
দশ দিন লড়াই কৈল উড়য়া রাজার সনে।
চৌদ্দ বোড়ি মানস্ত কাটিলাম এক দিনে॥
চৌদ্দ পোয়ন মানস্ত কাটি শাত শত লস্কর।
হস্তি ঘোড়া কাটিলাম তিশট্টি হাজার॥
জুধ্যেতে হারিয়া নির্প গেল পলাইয়া।
তার বেটি বিভা কৈলাম মহিম * জিনিয়া॥

এই উড়য়া রাজা কে, তাহা ঐতিহাসিকের গবেষণার বিষয় বটে।

অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় এই পুঁথিতেও মীননাথ, গোর্খনাথ, কানুকা ও হাড়িপা নামক চারিজন সিদ্ধার উল্লেখ আছে। রাজা গোবিন্দচন্দ্র হাড়িপা সিদ্ধার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। ময়নামতী গোর্খনাথের (গোরক্ষ নাথের) শিষ্যা ছিলেন। এই পুঁথিতে তাঁহাদের সম্বন্ধে এই বিবরণ পাওয়া যায় :—

চারি সিদ্ধাএ শাপ পাইল দুর্গা দেবির পাশে।
মিননাথ চলি গেল কদলির দেশে॥
গোর্খনাথ চলি গেল ব্রাহ্মণের ঘরে।
কানুকা পাইল শাপ ড়াড়ার শহরে॥
হাড়িপাএ পাইল শাপ তোমা সেবিবার।
তে কারণে হিন্য কর্ম্ম করে তোমার ঘর॥

উপরে উল্লিখিত "কদলীর দেশ" কোথায়, তাহা আজও নির্ণীত হয় নাই। ড়াড়ার সহরই বা কোথায়? পরিষদে প্রকাশিত "ময়নামতীর গানে" এবং সেখ ফয়েজুল্লাকৃত "গোর্খ-বিজয়ে"ও কদলী সহরের উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়।

* মহিম যুদ্ধ।

মাণিকচাঁদের পিতার নাম কি ছিল, তাহা আজও অবিসংবাদিতরূপে নির্ণীত হয় নাই। দুর্লভ মল্লিকের মতে মহারাজ সুবর্ণচন্দ্র মাণিকচাঁদের পিতা ছিলেন। কাহারও মতে মাণিকচাঁদ পালবংশীয় মহীপালের পুত্র ছিলেন। এই মাণিক চাঁদেরই পুত্র গোবিন্দচন্দ্র। গোবিন্দ্রচন্দ্রের অপর নাম গোপীচাঁদ, তাহা সমালোচ্য পুঁথি হইতেই জানা যায়। গোবিন্দচন্দ্রের পুত্রাদি ছিল কি না, বলা যায় না। তবে এই পুঁথি হইতে তাঁহার এক ভ্রাতার নাম অবগত হওয়া যায়:—

এহি গালি দিল তাকে নির্ব্বংশ বুলিয়া।
গুপিচান্দের বংশ নাহি ভুবন ঘুরিয়া॥

*　　*　　*

*　　*　　*

বড় ভাই য়াছে মোর মুদাইতাম্ভরি (?)।
তার ঠাঞি সমর্পিব এ চারি সুন্দরী॥

"মাণিকচাঁদের গীতি"তে তাঁহার আমলে কড়ি দ্বারা রাজকর আদায়ের কথা লিখিত আছে। এই পুঁথিতেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

তৎসম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত পংক্তি কয়টি দ্রষ্টব্য:—

দেড় বুড়ি কৌড়ি ছিল কাণি খেতের কর।
চৌদ্দ বুড়ি কৌড়ি ছিল টাকার মোহর॥
দশ টাকা বাড়ি খাইত দেড় বুড়ি দিত।
বার মাস ভরিয়া বচ্ছরের খাজনা নিত॥
তোমার বাপের সৈত্য তুমি লৈলা লাড়ি।
খেতে পিছে দাড়ি লৈলা এক পোণ কৌড়ি॥

এই পুঁথি হইতে জানা যায় যে, তৎকালে লক্ষ্মীবিলাস, মেঘনাল ও খিরবলি নামক শাড়ি, রামলক্ষ্মণ নামক শঙ্খ ও মদনকৌড়ি নামক কর্ণাভরণ প্রচলিত ছিল এবং উক্তরূপ শাড়ি প্রভৃতিও কড়ি মূল্যে বিক্রীত হইত। যথা:—

(১) পিন্ধিবারে দিলা প্রভু মেগনাল শাড়ি।
জেই শাড়ির মূল্য ছিল বাইশ কাহোন কৌড়ি॥
(২) অদুনাএ পিন্ধে কাপড় মেঘনাল শাড়ি।
সেই শাড়ির মূল্য ছিল বাইশ লাখ কৌড়ি॥

প্রবাদ আছে, রাণী ময়নামতী আত্মীয় পরিজন সহ সুড়ঙ্গ পথে পাতাল গমন করিয়া তথায় কপিল মুনির আশ্রমে বাস করিতে থাকেন। যে সুড়ঙ্গ পথে ময়নামতী পাতাল গমন করিয়াছিলেন বলিয়া লোকের ধারণা, তাহার চিহ্ন অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। সাকার-উপাসকগণ উক্ত সুড়ঙ্গের উপরে দুগ্ধ কলা ইত্যাদি দিয়া এখনও পূজা করিয়া থাকে।

প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে ময়নামতীতে স্বাধীন ত্রিপুরার মহারাজ বাহাদুরের এক বাঙ্গালা আছে। উহা "ময়নামতীর বাঙ্গালা" নামে প্রসিদ্ধ। যেই ভিটীর উপর উক্ত বাঙ্গলা অবস্থিত, তাহা অতি পূর্ব্বের,—মহারাজ বাহাদুরের নির্ম্মিত নহে। ভিটীটা ইষ্টক-রচিত। এই ভিটীর চতুর্দ্দিকে বর্গ-ক্ষেত্রাকার একটি বিস্তীর্ণ মাঠ আছে। এখন তাহার স্থানে স্থানে মহারাজ বাহাদুরের নানাবিধ পুষ্পোদ্যান শোভা পাইতেছে। সমস্ত ময়দানটাই ইষ্টকরাশি দ্বারা গ্রথিত। অনেকে অনুমান করেন, এখানে রাণী ময়নামতীর কেল্লা ছিল। সুড়ঙ্গপথে রাণীর পাতাল প্রবেশের কথায় আস্থা স্থাপন করিতে না পারিলেও উহা যে কেল্লায় প্রবেশের গুপ্তপথ ছিল, তাহাতে অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। প্রায় এক শতাব্দী পূর্ব্বে কুমিল্লা হইতে কয়েকজন ইয়োরোপীয় রাজপুরুষ পুত্রকন্যাদি সমভিব্যাহারে ময়নামতীর বাঙ্গালায় বেড়াইতে গিয়াছিলেন। সেই সময় জনৈক সাহেবের একটি ছেলে সুড়ঙ্গপথে কতকদূর নীচে পড়িয়া গিয়া বিশেষরূপে আহত হয়। উক্ত ঘটনাই অলিখিত ইতিহাসের জলন্ত সাক্ষী সেই সুড়ঙ্গের বিলোপ সাধনের সূত্রপাত করে। ইহার ফলে গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে পরে কাষ্ঠ ও ইষ্টকরাশির সাহায্যে সুড়ঙ্গ পথটি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীআবদুল করিম।

সাকার।

সাকার মুরতি যার নয়নের সারাৎসার
হৃদয়ের পরশ রতন,
ঘুচাইবে অন্ধকার নিরাকার চিত্র তার
এ কেমন অলীক বচন ?

প্রদীপ্ত প্রতিভা সম নেত্র যার নিরুপম
বাণী যার কণ্ঠে অধিষ্ঠান,
রূপ রস গন্ধ হীন অনন্তের মাঝে লীন
সে কেমনে জুড়াইবে প্রাণ ?

স্নেহ আলিঙ্গন যারে পরশিতে নাহি পারে,
দৃষ্টি যারে ধরিতে অক্ষম,
মমতা সোহাগভারে বুকের মাঝারে যারে
রাখিবারে ব্যাকুল এ মন।

গৃহ দ্বার পুষ্পবনে যার পদশব্দ সনে
আনন্দের তরঙ্গ উচ্ছ্বাসে
যাহার হাস্যের রবে দিক্ মুখরিত সবে
প্রতি অঙ্গে জীবন বিকাশে।

সে যে, একে শত শত ভানুর কিরণ মত
আলোকের প্রবাহ চঞ্চল,
নিরাকার, কল্পনায় কেমনে আঁকিব তায়,
অনুরাগে চির সমুজ্জ্বল।

সে ছবি প্রাণের প্রাণ বিশ্বরূপে মূর্ত্তিমান,
নয়নের প্রত্যক্ষ দর্শন ;
অতুল স্বরূপ তার শক্তি নাহি বর্ণিবার
সৃষ্টিতত্ত্ব নিগূঢ় যখন।

অন্তরের শূন্যতায় সাকার মূরতি চায়
পরিপূর্ণ করিবারে হিয়া,
দেহ মন প্রাণ সহ দীপ্তিমান অহরহ
সৃজনের মাধুরী লইয়া।

সেই মূর্ত্তি চাহি আমি জানত অন্তর-যামী,
তুমি যাহা দিয়াছিলে মোরে,
দেও প্রভু পুনর্ব্বার জীবনের সর্ব্বসার
আবার সাকার করি গ'ড়ে।

শ্রীপ্রসন্নময়ী দেবী।

কাব্য-কথা।

"অভয়া" নামক কাব্য কবির জীবন-মরণ-সন্ধিস্থলে বিরচিত। অভয়ার অমৃত-বাণী চরাচরে 'শুভ বরাভয়-বার্ত্তা ঘোষণা করিয়া কবির 'সতত নিষ্ফল' ও 'শত কোলাহলে ক্লিষ্ট' কর্ণরন্ধ্রে সুধাবর্ষণ করিতেছে। কবি শুনিতেছেন, অভয়ার 'শীতল মনো-রসায়ন' 'প্রেম-সুমধুর যন্ত্রে'র সুমধুর নিক্কন। তাঁহার মানসচক্ষুর সম্মুখে তখন সেই 'চির-প্রমাদ শূন্য' 'চিৎ-স্বরূপ-সিন্ধু'র জ্ঞানারুণবিন্দু 'নীল-গগন-গর্ভে' 'লক্ষ লক্ষ সৌর জগতে'র ন্যায় উদ্ভাসিত; মোহ-মেঘান্তরাল-বর্ত্তিনী 'বৈরাগ্য-শিশির'-ঝরা, 'আনন্দ-কুসুম'-ভূষণা নির্ম্মল-ওঙ্কার-বরণী'-স্বরূপা 'সিদ্ধি-উষা' স্বয়ং আসিয়া কবির 'সদ্বিবেক-মণি' প্রভাসিত করিয়াছেন। 'কোটি কোটি নিষ্কলঙ্ক শরদিন্দু' যাঁহার মুখ-লাবণ্যের রেণু-কণিকা মাত্র, যাঁহার 'শ্রীপাদ-নখরে' 'সহস্র গগনের নক্ষত্র' দীপ্তিমান, তাঁহারই আশীর্ব্বাদের রক্ষা-কবচ কবিকে সর্ব্ব বিপদমুক্ত করিয়াছে। 'ভীম-বৈতরণী-উত্তপ্ত-তরঙ্গ'-তীরে 'সন্ত্রস্ত তিতীর্ষু' কবি তখন 'মোহধ্বান্ত-নাশী,' 'অসীম স্নেহ-দয়া-ক্ষমামৃতময়' 'মায়ের মধুর হাসি' দেখিয়া আনন্দে শিহরিয়া উঠিয়াছেন। তারপর মায়ের স্নেহভরা কোলে উঠিয়া তিনি অতুলানন্দে গাহিয়াছেন ;—

(ওমা) এই যে নিয়েছ কোলে;
আগে, খুব্ ক'রে মোরে মে'রে ধ'রে,
শেষে, আয় যাদু বাছা' বলে।

* * * *

মা, তোর স্নেহের শাসনে, ক্ষমার আদরে,
হৃদয় গিয়াছে গ'লে।

(অভয়া, ২৪ পৃষ্ঠা)

মায়ের অগাধ স্নেহের ছবি, কবি তাঁহার "মা ও ছেলে" নামক কবিতায় অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

মা, আমি যেমন তোর মন্দ ছেলে,
আমায়, ঝাঁটা মে'রে খেদিয়ে দিত,—
এই পৃথিবীর বাপ্ মা হ'লে।
ব'ল্‌তো "শান্তি পেতাম, হাড় জুড়ুতো,
এই অভাগা নচ্ছারটা ম'লে" ;

ব'ল্‌তো, "এটাকে সে নেয় না কেন ?
এত লোক্‌কে যমে নিলে।"
তোর একি দয়া, কি মমতা !
ভাব্‌তে ভাসি নয়ন-জলে ;
এই, বাপ্‌-তাড়ান, মা-খেদান,
অধমটা তুই দিস্‌নে ফে'লে।
আমার, এখনও যে শ্বাস ব'হে গো,
শারীর-যন্ত্র দিব্য চলে ;
ওমা, এখনও যে আমার ক্ষেতে,
বিপুল সোণার শস্য ফলে।
আমার, গাছে মিষ্টি আম ধরে গো,
সাজে বাগান নানাফুলে ;
আমায়, চাঁদ সুধা দেয়, রৌদ্র রবি,
মেঘে বৃষ্টি-ধারা ঢালে।
তুই তো, বন্ধ ক'ল্লে ক'ত্তে পারিস্‌ ;
তোর, অসাধ্য কি ভূমণ্ডলে ?
কান্ত বলে, ছেলে কেমন, আর
মা কেমন, তাই দেখ্‌ সকলে।
(অভয়া, ২৮ পৃষ্ঠা)

মায়ের এই স্নেহ লাভ করিয়া কবি বিকট ভয়াবহ গর্জ্জৎ মৃত্যু-বিষাণ-নিনাদেও অটল রহিয়াছেন ; 'কাল-পয়োনিধি'র তাণ্ডব নর্ত্তনেও তিনি নির্ভীক ও নিশ্চিন্তভাবে মাতৃকোলে বসিয়া আছেন।

অকৃতজ্ঞ সন্তানগণের উদ্দেশে কবি গাহিয়াছেন—

তুই কি খুঁজে দে'খেছিস্‌ তাকে ?
যে প্রত্যহ তোর খোরাক পোষাক
পাঠিয়ে দিচ্ছে ডাকে।

* * * *

খা'স্‌ বেশ দুধে, মাছে,
সুখাস্‌নে আর কা'রো কাছে,

সে যে কোন্ দেশে আছে,
হেসে বেড়াস্ ফাঁকে ফাঁকে।

*　　*　　*　　*

ওরে মন, নিমকহারাম!
সুখ-শয়নে ক'চ্ছ আরাম?
তা'র টাকায় মদ কিনে খাও,
তাঁ'র কাছে কি গোপন থাকে?

*　　*　　*　　*

তুই তো, মন, বধির, অন্ধ,
তবু, করে না সে টাকা বন্ধ;
কান্ত কয়, মকরন্দ ফেলে
খেলি মাখাল ফলটাকে।

সংসারীর উদ্দেশে তিনি গাহিয়াছেন—

যে মা'কে তুই হেলা ক'রে ব'লতিস্ কুবচন,
সেই ক্ষমার ছবি ব'লছে কাণে, "জাগ্‌রে যাদুধন!"
তোর একই কাতে রাত্ পোহালো ভাঙ্‌লো না স্বপন,
তোর জীবন-রাত্রি পোহায়, এখন্ ঊষার আগমন।
তোর বাল্য গেল ধূলো খেলায়, বিলাসে যৌবন,
কেমন ধীরে ধীরে ধ'রলো জরা, এর পরে মরণ।
(অভয়া, ৪৪ পৃষ্ঠা)

কবি মায়ের স্নেহমধুর ডাকে ভববন্ধন মুক্তির নিমিত্ত করুণকণ্ঠে আত্মপ্রকাশ করিয়া গায়িয়াছেন—

আর ধরিস্ নে, মানা করিস্ নে;
আর কাঁদিস্‌নে, আমায় বাঁধিস্‌নে।
(আমার) গেল বেলা, নিয়ে ধূলোখেলা,
(আমি) আর কতকাল ক'রবো হেলা?
(আমায় ছে'ড়ে দে, ছে'ড়ে দে, ছে'ড়ে দে, ছে'ড়ে দে।)
(অভয়া, ৪৫ পৃষ্ঠা)

তিনি পায়ের বেড়ি, হাতের কড়া, গিঁঠে গিঁঠে বাঁধন কাটিয়াছেন, ক্লান্ত-

কণ্ঠে ডাকিয়া ডাকিয়া অবশেষে 'জীবন-মরণ-সন্ধি'-ক্ষণে তাঁহার 'জীর্ণ-হৃদয়-মন্দির' আরাধ্যা অভয়ার পুণ্যপদস্পর্শে অনবদ্য সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে।

প্রাচীমূল কনক-কিরণে কনকিত করিয়া তাঁহার হৃদয়-দেউলের দেবতা তাঁহাকে দেখা দিয়াছিলেন। 'জয়মঙ্গলরূপী' নবরবির আনন্দরশ্মিধারায় তাঁহার হৃদয়-পদ্ম বিকসিত হইয়া অর্ঘ্যস্বরূপ সেই সৌম্যমূর্ত্তির পাদপদ্মেই সমর্পিত হইয়াছিল। তাই তিনি "শেষ আশ্রয়ে" গভীর বিশ্বাসের সুরে গায়িয়াছেন—

আর কি ভরসা আছে তোমারি চরণ বিনে,
আর কোথা যাব তুমি না রাখিলে দীনহীনে।

(অভয়া, ১০১ পৃষ্ঠা)

তাঁহার "দিন যায়" নামক কবিতায় পথভ্রান্ত মনকে কি সুন্দর উপদেশ দিয়াছেন—

আর কেন মন মিছে ঘুরিস্
হিমে মরিস্, রোদে পুড়িস্
প্রেমের গাছের তলায় ব'স্, মন,
যাবে হৃদয় জুড়ায়ে।

(অভয়া, ৪১ পৃষ্ঠা)

তাঁহার "বিশ্বাস" নামক কবিতায়—তিনি যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অপূর্ব্ব—

কেন বঞ্চিত হব চরণে ?
আমি, কত আশা ক'রে বসে আছি,
পাব জীবনে, না হয় মরণে !

*   *   *

আমি শুনেছি, হে তৃষা-হারি !
তুমি, এনে দাও তারে প্রেম-অমৃত,
তৃষিত যে চাহে বারি—(কল্যাণী, ৯ পৃষ্ঠা)

তারপর শ্রীভগবানই যে অগতির গতি, অশরণের শরণ, অনাথের নাথ তাহার বার্ত্তা কবি এক পংক্তিতে অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন—

যার কেহ নাই তুমি আছ তার।

বড় সুন্দর কথা! ভগবৎ-কৃপাপাত্র ভিন্ন আর কেহ এ কথা বলিতে পারে না।

তাঁহার সমস্ত কাব্যের প্রায় সর্ব্বত্রই এই একই কথা বিচিত্র মধুর সুরে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। ভগবৎ-প্রীতি-সিন্ধুতে আত্মসমর্পণের নিমিত্ত কঠোর সাধনার মন্ত্রে তিনি দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং জন্মজন্মান্তরীণ সুকৃতিবলে সে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

তিনি যে দিকে নয়ন ফিরাইয়াছেন, সেইদিকেই তাঁহার চিরসুন্দরকে দেখিয়াছেন। আর সেই প্রাণারাম সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়া নিজে ধন্য হইয়াছেন। কিন্তু এই পার্থিব দুইটী চক্ষু লইয়া সে সৌন্দর্য্য-পিপাসা মিটে না, তাই তিনি প্রার্থনা করিতেছেন—

কোটি নয়ন দেহ, কোটি শ্রবণ, প্রভু,
দেহ মোরে কোটি সুকণ্ঠ,—
হেরিতে মোহন ছবি, শুনিতে সে সঙ্গীত,
তুলিতে তোমারি যশরোল।

(কল্যাণী, ১৭ পৃষ্ঠা)

এবং এই প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সুর কি উচ্চগ্রামে, কি উদাত্ত ষড়জে সমুত্থিত হইয়াছে—

তুমি, সুন্দর, তাই তোমারি বিশ্ব সুন্দর, শোভাময় ;
তুমি উজ্জ্বল, তাই নিখিল-দৃশ্য নন্দন-প্রভাময়!
তুমি, অমৃত-বারিধি হরি হে,
তাই, তোমারি ভুবন ভরি' হে,—
পূর্ণ-চন্দ্রে, পুষ্প-গন্ধে, সুধার লহরী বয় ;
ঝরে সুধাজল, ধরে সুধাফল, পিয়াসা ক্ষুধা না রয়।

(কল্যাণী, ৫৩ পৃষ্ঠা)

'বিশ্ব-শরণে' কবি গায়িয়াছেন—

তোমারি প্রেমে এক হৃদয়
আর হৃদে পড়ে লুঠিয়া ;
তোমারি সুষমা চির-নবীন
ফুলে ফুলে বহে ফুটিয়া।

(কল্যাণী, ৩৯ পৃষ্ঠা)

তারপর দিব্যদর্শনশক্তি লাভ করিয়া কবি দেখিতেছেন—সাধুর চিত্তে আনন্দ, পাতকী-প্রাণে ভয়, সতী-হৃদয়ে প্রেম, জননী-নয়নে স্নেহ, প্রেমিক-প্রাণে

প্রীতি, যোগী-চিত্তে চির-উজ্জ্বল জ্ঞানালোক, অনুতপ্ত প্রাণে ভরসা, আর শোক-দুঃখতাপিত হৃদয়ে সান্ত্বনারূপে তাঁহার হৃদয়-দেউলের আরাধ্য দেবতা চির-জাগরূক রহিয়াছেন। শ্রীভগবৎকৃপালাভ ব্যতীত এ জ্ঞান বিকশিত হয় না।

কবি কখন নক্ষত্র-ধূসরিত দ্বিধাবিভক্ত ছায়াপথের দিকে তাকাইয়া দেখিয়াছেন—

কোথায় অনন্ত উচ্চে, অনন্ত তারকা গুচ্ছে,
অনন্ত আকাশে তব, অনন্ত কিরণোৎসব।

* * * *

অনন্ত সুষমা-ভরা, অনন্তযৌবনা ধরা
দিশি দিশি প্রচারিছে, অনন্ত কীর্ত্তিবিভব ;
তোমার অনন্ত সৃষ্টি, অনন্ত করুণাবৃষ্টি,
অতি ক্ষুদ্র দীন আমি, কিবা জানি কিবা কব।

(কল্যাণী, ৪০ পৃষ্ঠা)

ষড়ঋতুশালিনী, সৌন্দর্য্যের ইন্দিরাস্বরূপিণী বঙ্গজননীর মন্দস্পন্দিত, লীলা-অঞ্চল-অঙ্কিত যে মারকতী দ্যুতি তাঁহার প্রতিভা-মুকুরে প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহা মাতৃভাষার অমূল্য সম্পৎ।

কবির "নিশীথে" নিশীথেরই মতন মনোরঞ্জন ও অতলস্পর্শী—

ধীরে ধীরে বহিছে, আজি রে মলয়া,—
হাসি, বিরাজে গগনে,
থরে থরে মনোরঞ্জন, দীপ্ত, উজল তারা।
প্রেম-অলস অঙ্গে, ধাইছে তটিনী রঙ্গে,
ঢালিছে মৃদু কুলুকুলু গানে, অমিয়ধারা।

কল্যাণী, ৫৪ পৃষ্ঠা)

তারপর এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্য দিয়া তিনি সকল সৌন্দর্য্যের আধার-স্বরূপ সেই পরম সুন্দরকে দেখিতেছেন—

মণ্ডিত এ ভূমণ্ডল, সুধাকর-কর-জালে,
রঞ্জিত অতি সুরভিত, কানন ফুলমালে ;
নিভৃত হৃদয়কন্দরে,—হের পরমসুন্দরে,
হও রে মধুর-প্রেমময়-উৎসব-মাতোয়ারা।

(কল্যাণী, ৫৪ পৃষ্ঠা)

গাহিতে গাহিতে ভাববিহ্বল হইয়া রজনীকান্ত এই মর্ত্ত্যভূমির আনন্দকে বহুনিম্নে ফেলিয়া রাখিয়া, ইহলৌকিক চলচঞ্চল সৌন্দর্য্য-মায়াপুরীর সোপানাবলী অতিক্রমপূর্ব্বক নক্তন্দিবাতীত নির্দ্বন্দ্ব রাজ্যের প্রাসাদতোরণে পঁহুছিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন; উর্দ্ধ হইতে উর্দ্ধতমে যে দ্যৌঃ পিতা এবং ধ্রুব, যে সনাতন লোকোত্তরে অনাদি অনন্ত ঋক্ অপরূপ রাগে মুখরিত হইতেছে, তিনি সেই আশা ও আনন্দের কল্পনিকেতনে সমুত্থিত হইয়াছেন। *

শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত।

বইয়ের ব্যবসা।

সাধারণতঃ লোকের একটা বিশ্বাস আছে যে, বই জিনিষটে পড়া সহজ, কিন্তু লেখা কঠিন। অপর দেশে যাই হোক, এ দেশে কিন্তু নিজে বই লেখার চাইতে অপরকে পড়ানো ঢের বেশি শক্ত। শুন্‌তে পাই যে কোন বইয়ের এক হাজার কপি ছাপালে, এক বৎসরে তার একশ'ও বিক্রী হয় না। সাধারণ লেখকের কথা ছেড়ে দিলেও, নামজাদা লেখকদেরও বই বাজারে কাটে কম, কাটে বেশি পোকায়। বাঙ্গলদেশে লেখকের সংখ্যা বেশি কিম্বা পাঠকের সংখ্যা বেশি, বলা কঠিন। এ বিষয়ে যখন কোন Statistics পাওয়া যায় না, তখন ধরে নেওয়া যেতে পারে যে মোটামুটি দুই সমান। কেউ কেউ এমন কথাও বলে, থাকেন যে লেখা ও পড়া এ দুটি কাজ অনেক স্থলে একই লোকে করে' থাকেন। এ কথা যদি সত্য হয়, তাহলে অধিকাংশ লেখকের পক্ষে নিজের লেখা নিজে পড়া ছাড়া উপায়ান্তর নেই। কেননা পরের বই কিন্‌তে পয়সা লাগে, কিন্তু নিজের বই বিনে পয়সায় পাওয়া যায়। অবশ্য কখন কখন কোনও কোনও বই উপহারস্বরূপে পাওয়া যায়, কিন্তু সে সব বই প্রায়ই অপাঠ্য। এরূপ অবস্থায় বঙ্গসাহিত্যের স্ফূর্ত্তি হওয়া প্রায় একরূপ অসম্ভব। কারণ সাহিত্য পদার্থটি যাই হোক না কেন, বই হচ্ছে শুধু বেচাকেনার জিনিষ, একেবারে কাঁচামাল। ও মাল ধরে' রাখা চলে না। গাছের পাতার মত বইয়ের পাতাও বেশি দিন টেঁকেনা, এবং একবার ঝরে' গেলে উনুন-ধরানো ছাড়া অন্য কোনও কাজে লাগে না।

এ অবস্থা যে সাহিত্যের পক্ষে শোচনীয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ

* উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের কামাখ্যা-অধিবেশনে পঠিত।

নেই, কিন্তু কার দোষে যে এরূপ অবস্থা ঘটেছে, লেখকের কি পাঠকের, সে কথা বলা কঠিন। অবশ্য লেখকের পক্ষে এই বলবার আছে যে, এক টাকা দিয়ে একখানি বই কেনার চাইতে, একশ' টাকা দিয়ে একখানি বই ছাপানো ঢের বেশি কষ্টসাধ্য। অপর পক্ষে পাঠক বলতে পারেন যে একটি টাকা অন্ততঃ ধার করেও যে-সে বাঙ্গলা বই ছাপানো যেতে পারে, কিন্তু নিজের বুদ্ধি অপরকে ধার না দিয়ে যে-সে বাঙ্গলা বই পড়া যেতে পারে না। অর্থ-কষ্টের চাইতে মনোকষ্ট অধিক অসহ্য। আমার মতে দু'পক্ষের মত এক হিসেবে সত্য হলেও আর এক হিসেবে মিথ্যা। বই লিখিলেই যে ছাপাতে হবে, এইটি হচ্ছে লেখকদের ভুল ; আর বই কিনলেই যে পড়তে হবে, এইটি হচ্ছে পাঠকদের ভুল। বই লেখা জিনিষটে একটা সখ মাত্র হওয়া উচিত নয়,—কিন্তু বই কেনাটা সখ ছাড়া আর কিছু হওয়া উচিত নয়।

বাঙ্গলা দেশে বাঙ্গলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হওয়া উচিত কি না, সে বিষয়ে আমি কোন আলোচনা করতে চাইনে। কারণ; সাহিত্য শব্দ উচ্চারণ করবামাত্র নানা তর্কবিতর্ক উপস্থিত হয়। অমনি চারধার থেকে এই সব দার্শনিক প্রশ্ন ওঠে, সাহিত্য কাকে বলে? সাহিত্যে কার কি ক্ষতি হয় এবং কার কি উপকার হয়? তার পর সাহিত্যকে সমাজের শাসনাধীন করে,' তার শাস্তির জন্য সমালোচনার দণ্ডবিধি আইন গড়বার কথা হয়। সমালোচকেরা একাধারে ফরিয়াদি, উকিল, বিচারক এবং জল্লাদ হয়ে ওঠেন। সুতরাং কথাটা দাঁড়াচ্ছে এই যে, সাহিত্য যে কি, সে সম্বন্ধে যখন এখনও একটা জাতীয় ধারণা জন্মে যায়নি, তখন এ বিষয়ে এক কথা বল্‌লে হাজার কথা শুনতে হয়। কিন্তু বই জিনিষটে কি, তা সকলেই জানেন। এবং বাঙ্গলা বই যে বাজারে চলা উচিত সে বিষয়ে বোধহয়—দু'মত নেই, কারণ ও জিনিষটে স্বদেশী শিল্প। যদি কারও এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে,তাহলে তা ভাঙ্গাবার জন্যে দেখিয়ে দেওয়া যেতে পারে যে, নব্য স্বদেশী শিল্পের যে দুটি প্রধান লক্ষণ, সে দুটিই এতে বর্ত্তমান। প্রথমতঃ নব্য সাহিত্য পদার্থটা স্বদেশী নয়, দ্বিতীয়তঃ তাতে শিল্পের কোন পরিচয় নেই।

লেখা ব্যাপারটা যতদিন আমরা মানুষের একটা প্রধান কাজ হিসেবে না দেখে, বাজে সখ হিসেবে দেখব, ততদিন বইয়ের ব্যবসা ভাল করে চল্‌বে না। সুতরাং বঙ্গসাহিত্যের উন্নতি অর্থাৎ বিস্তার করতে হলে, আমাদের স্বীকার করতে হবে যে এ যুগে, সাহিত্য প্রধানতঃ লেখা পড়ার জিনিষ নয়, কেনা বেচার জিনিষ। কোন রচনাকে যদি অপরে অমূল্য বলে, তাহলে রচয়িতার

রাগ করা উচিত, কারণ যে পদার্থের মূল্য নেই, তা যত্ন করে গড়া সকলের পক্ষে সম্ভব নয়।

ব্যবসার দুটি দিক আছে,—প্রথম production (তৈরি করা), দ্বিতীয়তঃ distribution (কাটানো)। মানব জীবনের এবং মালের জীবনের একই ইতিহাস, তার একটা আরম্ভ আছে, একটা শেষ আছে। যে তৈরি করে তার হাতে মালের জন্ম এবং যে কেনে তার হাতে তার মৃত্যু। জন্ম মৃত্যু পর্য্যন্ত কোন একটি মালকে দশ হাত ফিরিয়ে নিয়ে বেড়ানর নাম হচ্ছে distribution। সুতরাং বইয়ের জন্ম-বৃত্তান্ত এবং ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, দুটির প্রতিই আমাদের সমান লক্ষ্য রাখ্তে হবে।

এ স্থলে বলে'রাখা আবশ্যক যে আমি সাহিত্য-ব্যবসায়ী নই! অর্থাৎ অদ্যাবধি বই আমি কিনেই আস্‌ছি, কখন বেচিনি। সুতরাং কি কি উপায় অবলম্বন করলে বই বাজারে কাটানো যেতে পারে, সে বিষয়ে আমি ক্রেতার দিক্ থেকে যা বলবার আছে তাই বল্‌তে পারি, বিক্রেতা হিসেবে কোন কথাই বল্‌তে পারি নে।

সচরাচর দেখ্‌তে পাই যে, বই বিক্রী কর্‌বার জন্য, বিজ্ঞাপন দেওয়া, অর্দ্ধমূল্যে কিম্বা সিকিমূল্যে বিক্রী করা, ফাউ দেওয়া এবং উপহার দেওয়া প্রভৃতি উপায় অবলম্বন করা হয়ে থাকে। এ সকল উপায়ে যে বইয়ের কাট্‌তির কতকটা সাহায্য করে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই সঙ্গে বাধাও যে দেয়, সে ধারণাটি বোধ হয় বিক্রেতাদের মনে তত স্পষ্ট নয়।

প্রথমতঃ বিশখানি বইয়ের যদি এক সঙ্গে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, এবং তার প্রতিখানিকেই যদি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলা হয়, তাহলে তার মধ্যে কোন্ খানি যে কেনা উচিত, সে বিষয়ে অধিকাংশ পাঠক মন স্থির করে উঠ্‌তে পারে না। অপরাপর মালের একটি সুনির্দ্দিষ্ট শ্রেণীবিভাগ আছে। বিজ্ঞাপনেই আমাদের জানিয়ে দেয় যে তার মধ্যে কোন্‌টি পয়লা নম্বরের, কোন্‌টি দোসরা নম্বরের, কোন্‌টি তেসরা নম্বরের ইত্যাদি, এবং সেই ইতরবিশেষ অনুসারে দামেরও তারতম্য হয়ে থাকে। সুতরাং সে সব মাল কিন্‌তে ক্রেতাকে বাঁশবনে ডোম কানা হতে হয় না, প্রত্যেকে নিজের অবস্থা এবং রুচি অনুসারে নিজের আবশ্যকীয় জিনিষ কিন্‌তে পারে। কিন্তু বই সম্বন্ধে এরূপ শ্রেণীবিভাগ করে বিজ্ঞাপন দেওয়া সম্ভব নয়; কেননা, যদিচ সাহিত্যে ভাল মন্দের তারতম্য অগাধ, তবুও কোনও লেখক, তাঁর লেখা যে প্রথম শ্রেণীর নয়, এ কথা নিজ

মুখে সমাজের কাছে জাহির করবেন না। সুতরাং বিজ্ঞাপনের উপর আস্থা স্থাপন করে', হয় আমাদের বিশখানি বই একসঙ্গে কিনতে হয়, নয় কেনা থেকে নিরস্ত থাকতে হয়। ফলে দাঁড়ায় এই, যে বই বিক্রী হয় না, কেননা যাঁর বিশখানি বই কেনবার সঙ্গতি আছে, তাঁর বিশ্বাস যে সাহিত্য নিয়ে কারবার করে শুধু লক্ষ্মীছাড়ার দল।

অর্দ্ধমূল্যে এবং সিকিমূল্যে বিক্রী করবার দোষ যে, লোকের সহজেই সন্দেহ হয় যে বস্তাপচা সাহিত্যই শুধু ঐ উপায়ে ঝেড়ে ফেলা হয়। পয়সা খরচ করে' গোলামচোর হতে লোকের বড় একটা উৎসাহ হয় না।

কোন বই ফাউ হিসেবে দেবার আমি সম্পূর্ণ বিপক্ষে। আর পাঁচজনের বই লোকে পয়সা দিয়ে কিনবে, এবং আমার বইখানি সেইসঙ্গে বিনে পয়সায় পাবে, এ কথা ভাবতে গেলেও, লেখকের দোয়াতের কালি জল হয়ে আসে। লেখকদের এইরূপ প্রকাশ্যে অপমান করে', সাহিত্যের মান কিম্বা পরিমাণ দুয়ের কোনটিই বাড়ানো যায় না। যদি কোন বই বিনামূল্যে বিতরণ করতেই হয়, ত প্রথম থেকে প্রথম সংস্করণ এইরূপ বিতরণ করা উচিত, যাতে করে' পাঠকদের সঙ্গে সহজে সে বইটির পরিচয় করিয়ে দেওয়া যায়। উক্ত উপায়ে Tab সিগারেট এদেশে চালানো হয়েছে। প্রথমে কিছুদিন বিলিয়ে দিয়ে, তার পর দ্বিগুণ দাম চড়িয়ে সে সিগারেট আজকাল বাজারে বিক্রী করা হচ্ছে, এবং এত বিক্রী বোধ হয় অন্য কোনও সিগারেটের নেই। বই জিনিষটিকে ধূমপত্রের সঙ্গে তুলনা করাটাও অসঙ্গত নয়। কারণ অধিকাংশ বই, কাগজে মোড়া ধোঁয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। সে যাই হোক, আসল কথা হচ্ছে এই যে, বিজ্ঞাপনাদির দ্বারা লোকের মনে শুধু কেনবার লোভ জন্মে দেওয়া যায়, কিন্তু কেনানো যায় না। কোন জিনিষ কাউকে কেনাতে হলে, সেটি প্রথমতঃ তার হাতের গোড়ায় এগিয়ে দেওয়া চাই, তার পর সেটি তাকে গতিয়ে দেওয়া চাই। এ দুই বিষয়ে যে পুস্তক-বিক্রেতারা বিশেষ কোন যত্ন করেছেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় না। আমার বিশ্বাস যে নতুন বাঙ্গালা বই যদি ঘরে ঘরে ফেরি করে বিক্রী করা হয়, তাহলে বঙ্গসাহিত্যের প্রতি লক্ষ্মীর দৃষ্টি পড়বে।

সাহিত্যে production সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, demand এর প্রতি লক্ষ্য রেখে সাহিত্য supply করতে হবে। যে বই লোকে পড়তে চায় না, সে বই অপর যে কোন উদ্দেশ্যেই লেখা হোক না কেন, বেচবার উদ্দেশ্যে লেখা চলে না। এবং কি ধরণের বই লোকে পড়তে চায়, সে বিষয়ে একটা সাধারণ

কথা বলা যেতে পারে। এটি একটি প্রত্যক্ষ সত্য, যে সাধারণ পাঠক সমাজ দুই শ্রেণীর বই পছন্দ করে না, এক হচ্ছে ভাল আর এক হচ্ছে মন্দ। যে বই ভালও নয় মন্দও নয়, অমনি একরকম মাঝামাঝি গোছের, সেই বই মানুষে পড়তে ভালবাসে, এবং সেইজন্য কেনে। প্রতি দেশে প্রতি যুগে প্রতি জাতির একটি বিশেষ সামাজিক বুদ্ধি থাকে। সে বুদ্ধির প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে, সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা, এবং সামাজিক জীবনের কাজেতেই সে বুদ্ধির সার্থকতা। কিন্তু সচরাচর লোকে সেই বুদ্ধির মাপকাটিতেই দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, আর্ট প্রভৃতি মনোজগতের পদার্থগুলোও মেপে নেন। সে মাপে যে পদার্থটি ছোট সাব্যস্ত হয়, সেটিও যেমন গ্রাহ্য হয় না, তেমনি যেটি বড় সাব্যস্ত হয় সেটিও গ্রাহ্য হয় না। সামাজিক বুদ্ধির সঙ্গে যদি কোন বিশেষ ব্যক্তির বুদ্ধি থাপে থাপে না মিলে যায়, তাহলে হয় তা অতিবুদ্ধি নয় নির্বুদ্ধি, এবং এই উভয় শ্রেণীর বুদ্ধির সহিত সামাজিক মানব পারৎ পক্ষে কোনরূপ সম্পর্ক রাখ্‌তে চায় না। এই কারণেই সাধারণতঃ লোকে নির্ব্বুদ্ধিতার প্রতি অবজ্ঞা এবং অতিবুদ্ধির প্রতি বিদ্বেষভাব ধারণ করে। উঁচুদরের লেখক এবং নীচুদরের লেখক সমসাময়িক পাঠক সমাজের কাছে সমান অনাদর পায়। কারণ, বুদ্ধি চরিত্র প্রভৃতি সম্বন্ধে উঁচুতেও উঠতে চায় না, নীচুতেও নামতে চায় না, যেখানে আছে সেইখানেই থাক্‌তে চায়। কারণ ওঠা এবং নামা দুটি ক্রিয়াই বিপজ্জনক। সমাজ "বিষয় বালিশে আলিস্" রেখে, নাটক নভেলের দর্পণে নিজের পোষাকী চেহারা দেখ্‌তে চায়, কবির মুখে নিজের স্তুতি শুন্‌তে ভালবাসে, এবং যে গুরুর কাছ থেকে নিজ মতের ভাষ্য লাভ করে, তাঁকেই দার্শনিক বলে মান্য করে। প্রমাণ স্বরূপ দেখানো যেতে পারে, George Meredithএর অপেক্ষা Marie Corelliর নভেলের হাজার গুণ কাট্‌তি বেশি। এবং যে কবি সমাজের সুমনোভাব ব্যক্ত করেন, তাঁর চাইতে যিনি সমাজের কুমনোভাব ব্যক্ত করেন তাঁর আদর কিছু কম নয়। Kiplingএর বই Tennysonএর বইয়ের চাইতে কম পয়সায় বিক্রী হয় না। সুতরাং সাহিত্যব্যবসায়ীদের পক্ষে ভাল বই লেখবার চেষ্টা করবার কোন দরকার নেই, বই যাতে খারাপ না হয় এই চেষ্টাটুকু কর্‌লেই কার্য্যোদ্ধার হবে। এবং কি ভাল আর কি মন্দ তা নির্ণয় কর্‌তে, সমাজের প্রচলিত মতামতগুলি আয়ত্ত করতে হবে। এক কথায় ব্যবসা চালাতে হলে, যে রকমের সাহিত্য সমাজ চায়, তাই আমাদের যোগাতে হবে।

"নিত্য তুমি চাহ যাহা, নিত্য ভাল নহে তাহা,
ভারত যেমত চাহে সেই মত চাও হে"

এরূপ অনুরোধ করে' যে কোন ফল নেই, তা স্বয়ং ভারতচন্দ্র টের পেয়েছিলেন, আমরা ত কোন্ ছার। বাঙ্গলা দেশে কি রকমের বইয়ের সব চাইতে বেশি কাট্‌তি সেইটি জান্‌তে পারলে, বাঙ্গালী জাতির মানসিক খোরাক যোগানো আমাদের পক্ষে কঠিন হবে না। শুনতে পাই বাজারে শুধু রূপকথা, রামায়ণ মহাভারতের আখ্যান এবং গল্পের বই কাটে। এ কথা যদি সত্য হয় ত আমাদের স্বীকার কর্‌তেই হবে যে বালবৃদ্ধ বণিতাতেই বাঙ্গলা বইয়ের ব্যবসা টি'কিয়ে রেখেছে। আর এ কথা যে সত্য সে বিষয়ে সন্দেহ করবার কোন কারণ নেই, কেননা মানুষ সব চাইতে ভালবাসে গল্প। আমাদের অধিকাংশ লোকের জীবনের ইতিহাস সম্পূর্ণ ঘটনাশূন্য, অর্থাৎ আমাদের বাহ্যিক কিম্বা মানসিক জীবনে কিছু ঘটেনা। দিনের পর দিন আসে, দিন যায়। আর সে সব দিনও একটি অপরটির যমজ ভ্রাতার ন্যায়। বিশেষতঃ এ দেশে. যেমন রাম না জন্মাতে রামায়ণ লেখা হয়েছিল, তেমনি আমরা না জন্মাতেই আমাদের জীবনের ইতিহাস সমাজ কর্ত্তৃক লিখিত হয়ে থাকে। আমরা শুধু চিরজীবন তার আবৃত্তি করেও যাই। সেই আবৃত্তির এখানে ওখানে ভুলভ্রান্তিটুকুতেই পরস্পরের ভিতর যা বৈচিত্র্য। কিন্তু যন্ত্রবৎ চালিত হলেও, মানুষ এ কথা একেবারে ভুলে যায় না, যে তারা কলের পুতুল নয়,—ইচ্ছাশক্তিবিশিষ্ট স্বাধীন জীব। তাই নিজের জীবন ঘটনাশূন্য হলেও, অপর লোকের ঘটনাপূর্ণ জীবনের ইতিহাস চর্চ্চা করে' মানুষে সুখ পায়। অন্যরূপ অবস্থায় পড়্‌লে নিজের জীবনও নিতান্ত একঘেয়ে না হয়ে অপূর্ব্ব বৈচিত্র্যপূর্ণ হাত পার্‌ত এই মনে করে আনন্দ অনুভব করে। মানুষের উপবাসী হৃদয়ের ক্ষুধা মেটাবার প্রধান সামগ্রী হচ্ছে গল্প, তা সত্যই হোক আর মিথ্যাই হোক। স্ত্রী সংগ্রহ কর্‌বার জন্য আমাদের ধনুর্ভঙ্গও করতে হয় না, লক্ষ্যভেদও কর্‌তে হয় না, সেই জন্যই আমরা দ্রৌপদীস্বয়ংবর এবং রামচন্দ্রের বিবাহের কথা শুনতে ভালবাসি। আমাদের বাড়ীর ভিতর "কুন্দ"ও ফোটে না, এবং বাড়ীর বাইরে "রোহিনী" জোটে না, তাই আমরা "বিষবৃক্ষ" ও "ভ্রমর" একবার পড়ি, দুবার পড়ি, তিনবার পড়ি। আমরা দশটায় আপিস যাই, এবং পাঁচটায় ঠিক সেই একই পথ দিয়ে

হয় গাড়িতে, নয় ট্রামে নয় পদব্রজে বাড়ি ফিরে আসি; তাই আমরা কল্পনায় সিন্ধবাদের সঙ্গে দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়াতে ভালবাসি।

তাহলে স্থির হল এই যে, আমাদের প্রধান কার্য্য হবে গল্প বলা,—শুধু নভেল নাটকে নয়, সকল বিষয়ে। ধর্ম্মনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, যত উপন্যাসের মত হবে, ততই লোকের মনঃপূত হবে। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই যে, গল্প যত পুরোনো হয় ততই সমাজের প্রিয় হয়ে ওঠে। প্রমাণ, রূপকথা এবং রামায়ণ মহাভারতের কথা। এর কারণও স্পষ্ট। পুরোনোর প্রধান গুণ যে তা নতুন নয়, অর্থাৎ অপরিচিত নয়। নতুনের প্রধান দোষ যে তা পরীক্ষিত নয়; সুতরাং তা সত্য কি মিথ্যা, উদ্ভাবনা কি আবিষ্কার, মানুষের পক্ষে শ্রেয় কি হেয়, তা একনজর দেখে কেউ বল্‌তে পারেন্ না। তা ছাড়া নতুন কথা যদি সত্যও হয়, তাহলেও বিনা ওজরে গ্রাহ্য করা চলে না। মানুষের মন একটি হলেও মনোভাব অসংখ্য। এবং সে মন যতই ছোট হো'ক না কেন, একাধিক মনোভাব তা'তে বাস করে। একত্রে বাস কর্‌তে হলে পরস্পর দিবারাত্র কলহ করা চলে না। তাই যে-সকল মনোভাব বহুকাল থেকে আমাদের মন অধিকার করে বসে আছে, তারা ঐ সহবাসের গুণেই পরস্পর একটা সম্পর্ক পাতিয়ে নেয়, এবং সুখে না হোক শান্তিতে ঘর করে। কিন্তু নতুন সত্যের ধর্ম্মই হচ্ছে মানুষের মনের শান্তি ভঙ্গ করা। নতুন সত্য প্রবেশ করেই আমাদের মনের পাতা ঘরকন্না কতকটা এলোমেলো করে' দেয়। সুতরাং ও পদার্থ মনের ভিতর ঢুকলেই, আমাদের মনের ঘর নতুন করে গোছাতে হয়, যে সব মনোভাব তার সঙ্গে একত্র থাকৃতে পারে না তাদের বহিষ্কৃত করে' দিতে হয়, এবং বাদ বাকী গুলিকে একটু বদ্‌লে সদ্‌লে নিয়ে তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে দিতে হয়। তা ছাড়া নতুন সত্য মনে উদয় হয়ে অনেক নতুন কর্ত্তব্যবুদ্ধির উদ্রেক করে। আমরা চির-পরিচিত কর্ত্তব্যগুলির দাবিই রক্ষে করতে হিমসিম খেয়ে যাই, তার পর আবার যদি নিত্য নতুন কর্ত্তব্য এসে নতুন নতুন দাবি কর্‌তে আরম্ভ করে, তাহলে জীবন যে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে তার আর সন্দেহ কি? মানুষে সুখ পায় না, তাই সোয়াস্তি চায়। যে লেখক পাঠকের মনের সেই সোয়াস্তিটুকু নষ্ট করতে ব্রতী হবেন, তাঁর প্রতি অধিকাংশ লোক বিমুখ ও বিরক্ত হবেন। সুতরাং "সাবধানের মার নেই," এই সূত্রের বলে যে লেখক, যে কথা সকলে জানে, সেই কথা গদ্যেপদ্যে অনর্গল বলে যাবেন, বাজারে তাঁর কথার মূল্য হবে। উপরে যা বলা গেল, তার নির্গলিতার্থ দাঁড়ায় এই যে, ব্যবসার হিসেবে সাহিত্যে গল্প বলা এবং পুরোনো গল্প বলাই শ্রেয়।

সাহিত্যের অবশ্য demand না বাড়লে supply বাড়বে না। সুতরাং সাহিত্যের ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধি অনেক পরিমাণে পাঠকের মর্জ্জির উপর নির্ভর করে, লেখকের কৃতিত্বের উপর নয়। এ দেশের শিক্ষিত লোকদের বই পড়া জিনিষটে বড় একটা অভ্যেস নেই। সাহিত্য চর্চ্চা করাটা নিত্য নৈমিত্তিক কিম্বা কাম্য কোনরূপ কর্ম্মের মধ্যেই গণ্য নয়। এর বহুতর কারণ আছে, যথা অবসরের অভাব, অর্থের অভাব, এবং ফায়দার অভাব, কারণ সাহিত্য-চর্চ্চা কর্‌বার লাভটি কেউ টাকায় কষে বার করে দিতে পারেন না। যে বিদ্যে বাজারে ভাঙ্গানো যায় না, তার যে মূল্য থাকৃতে পারে, এ বিশ্বাস সকলের নেই। কিন্তু স্কুল কলেজের বাইরে যে আমরা কোন বই পড়ি না, তার প্রধান কারণ, স্কুলপাঠ্য *পুস্তক পাঠ্য-পুস্তকের প্রধান শত্রু। বছর বছর ধরে স্কুল-পাঠ্য গ্রন্থাবলী গলাধঃ*-করণ করে' যার মানসিক মন্দাগ্নি না জন্মায়, এমন লোক নিতান্ত বিরল। সুতরাং শিক্ষিত সম্প্রদায়কে সাহিত্যচর্চ্চা কর্‌বার উপদেশ দিয়ে কোনও লাভ নেই। কিন্তু বই কেনাটা যে একটি সখমাত্র হতে পারে এবং হওয়া উচিত, এই ধারণাটি আমি স্বদেশী সমাজের মনে জন্মিয়ে দিতে চাই।

বই গৃহসজ্জার একটি প্রধান উপকরণ, এবং সেই কারণে শুধু ঘর সাজাবার জন্যে আমাদের বই কেনা উচিত। আমরা যে হিসেবে ছবি কিনি এবং ঘরে টাঙ্গিয়ে রাখি, সেই একই হিসেবে বই কেনা এবং ঘরে সাজিয়ে রাখা আমাদের কর্ত্তব্য। আমরা ছবি পড়িনে বলে' ছবি কেনাটা যে অন্যায় এ কথা কেউ বলেন না, সুতরাং বই পড়িনে বলে যে কিনব না, এরূপ মনোভাব অসঙ্গত। এ স্থলে বলে' রাখা আবশ্যক যে বইয়ের মত ছবিও একটা পড়্‌বার জিনিষ। ছবিরও একটা অর্থ আছে, একটা বক্তব্য কথা আছে। বইয়ের সঙ্গে ছবির একমাত্র তফাৎ হচ্ছে যে উভয়ের ভাষা স্বতন্ত্র। যা একজন কালি ও কলমের সাহায্যে ব্যক্ত করেন, তাই অপর একজন রং ও তুলির সাহায্যে প্রকাশ করেন। তা ছাড়া বাঙ্গলা বইয়ের সপক্ষে বিশেষ করে এই বলবার আছে যে, বাঙ্গালী ক্রেতা ইচ্ছে কর্‌লে তা পড়তে পারেন, কিন্তু ছবি জিনিষটে ইচ্ছে কর্‌লেও পড়তে পারেন না।

সচরাচর লোকে ঘর সাজায়, গৃহের শোভা বৃদ্ধি কর্‌বার জন্য নয়, কিন্তু নিজের ধন এবং সুরুচির পরিচয় দেবার জন্য। শেষোক্ত হিসেব থেকে দেখলেও দেখা যায় যে বৈঠকখানার দেয়ালে হাজার টাকার একখানি নোট না ঝুলিয়ে, হাজার টাকা দামের একখানি ছবি ঝোলানতে যেমন অধিক সুরুচির

পরিচয় দেয়, তেমনি নানা আকারের নানা বর্ণের রাশি রাশি বই সারি সারি সাজিয়ে রাখাতে প্রমাণ করে যে গৃহকর্ত্তা একাধারে ধনী এবং গুণী।

পূর্ব্বোক্ত কারণে আমি এ দেশের ধনী লোকদের বই কিন্‌তে অনুরোধ করি, গিলতে নয়। তাঁরা যদি এ বিষয়ে একবার পথ দেখান, তাহলে তাঁদের দৃষ্টান্ত সুদৃষ্টান্ত হিসেবে বহুলোকে অনুসরণ কর্‌বে। যতদিন না বাঙ্গালী সমাজ নিজেদের পাঠক হিসেবে না দেখে,' পুস্তকক্রেতা হিসেবে দেখতে না শিখবেন, ততদিন বঙ্গসাহিত্যের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হবে না।

আমার শেষ কথা এই যে, গ্রন্থক্রেতা যে শুধু নিঃস্বার্থ পরোপকার করেন তা নয়। চারিদিকে বইয়ের দ্বারা পরিবৃত হয়ে থাকাতে একটা উপকার আছে। বই চব্বিশ ঘণ্টা চোখের সম্মুখে থেকে এই সত্যটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, এ পৃথিবীতে চামড়ায় ঢাকা মন নামক একটি পদার্থ আছে।

বীরবল।

কাঙ্গাল হরিনাথ।

ব্রহ্মাণ্ডবেদ।

(২)

কাঙ্গালের ব্রহ্মাণ্ডবেদ জিনিষটা কি, তাহার পরিচয় আমার যতটুকু সাধ্য তাহা গতবারে দিয়াছি। আমি তখনও বলিয়াছি এখনও বলিতেছি, ব্রহ্মাণ্ড-বেদে কাঙ্গাল হরিনাথ যে সমস্ত তত্ত্ব প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহা তাঁহার সাধনলব্ধ; জ্ঞানহীন, বুদ্ধিহীন, সাধনহীন, ভজনহীন আমি কিছুতেই তাহার উপলব্ধি করিতে পারি নাই; সুতরাং আমি কেবল কাঙ্গালের ব্রহ্মাণ্ডবেদ-ভাণ্ডারের অমূল্য রত্নরাজির দুই চারিটি তুলিয়া সুধী পাঠকগণের সম্মুখে ধারণ করিব। তাঁহারা নিজ নিজ সাধনবলে তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করিবেন, ইহাই আমার একমাত্র আশা।

ব্রহ্মাণ্ডবেদের একস্থলে কাঙ্গাল হরিনাথ যে কয়েকটী কথা বলিয়াছেন তাহা পাঠ করিলেই পাঠকগণ জীর্ণকুটীরবাসী হরিনাথের দেবহৃদয়ের পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন। তিনি বলিয়াছেন—"পৃথিবীতে ধর্ম্ম কেবল নামমাত্র রহিয়াছে। যাঁহারা আস্তিক নামে পরিচিত, তাঁহারা ধর্ম্ম-পরিচ্ছদ, ধর্ম্মভূষণ ও ধর্ম্মচিহ্ন ধারণ করিয়া কেবল মুখে ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিতেছেন, প্রকৃতরূপে ধর্ম্মসেবা ও ধর্ম্মরক্ষা

অতি অল্পলোকেই করিয়া থাকেন। ধার্ম্মিক নামে প্রসিদ্ধ হইতে এবং তজ্জন্য খ্যাতিলাভে শ্রুতিসুখে সুখী হইতে, ধর্ম্মযাজক ও ধর্ম্মপ্রচারকদিগের মধ্যে অনেকেরই যাদৃশী ইচ্ছা ও চেষ্টা, দেশ যে ধর্ম্মশূন্য হইয়া দিন দিন অধঃপাতে যাইতেছে, সেদিকে ইহাদিগের তাদৃশ দৃষ্টিপাত অতি বিরল। গুরু প্রভৃতি অনেক ধর্ম্মরক্ষী সম্প্রদায় আবার বাণিজ্য ব্যবসায়ের মত ধর্ম্মের ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া, ধর্ম্মের আরও দুর্দ্দশার কারণ হইয়াছেন। ক্রেতা বিক্রেতার মত গুরু শিষ্যেরও আচরণ হইয়া উঠিয়াছে। কপটতার আবরণে ধর্ম্ম এরূপ আচ্ছন্ন হইয়াছে যে, যথার্থ ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে পরীক্ষা পূর্ব্বক গ্রহণ করা সুকঠিন। নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হওয়ায় ধর্ম্ম এরূপ দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে যে, দুষ্টলোককে শাসন করিবার ক্ষমতা তাহার কিছুমাত্র নাই। অর্থবান্ ও ক্ষমতাবান্ লোকেরা ধর্ম্মকে দলন করিয়া আপনারাই পৃথিবীর প্রভু হইয়া অবিরত স্বার্থ চরিতার্থ করিতেছে। ইহাদিগের অনাহত প্রতাপ ও অন্যায় অবিচারে সহচরী ন্যায়পরতার সহিত ধর্ম্ম নির্জ্জন গিরি-গহ্বরে লুক্কায়িত আছেন। ধর্ম্মযাজক, ধার্ম্মিক ও ধর্ম্মবণিক্‌বেশে লোকে পৃথিবীর এক এক প্রদেশে প্রবেশ পূর্ব্বক পরিশেষে দস্যুবৃত্তি করিতে আরম্ভ করিয়াছে।"

আর একস্থলে কাঙ্গাল হরিনাথ বলিতেছেন,—"রাজার সহিত রাজার ও প্রজার সহিত প্রজার কিছুমাত্র সদ্ভাব নাই। রাজার সহিত প্রজার পিতা পুত্র সম্বন্ধ কেবল পুরাণে ও লোকমুখে শুনিতে পাওয়া যায়। অধিক কি সহোদর সহোদরের প্রতি স্নেহশূন্য, সন্তান পিতামাতার প্রতি ভক্তিশূন্য, প্রভু দাসের প্রতি এবং দাস প্রভুর প্রতি বিশ্বাসশূন্য। পতিভক্তি ও পত্নীমর্য্যাদা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; বাহিরে যাহা কিছু পতিভক্তি ও পত্নী মর্য্যাদা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ইন্দ্রিয়-চরিতার্থ জন্য স্বার্থপুতি-গন্ধে নিতান্ত দূষিত। কি পতিপত্নী, কি সহোদর সহোদরা, কি বন্ধুবান্ধব কোথায়ও প্রকৃত প্রণয় ও শান্তিসুখ নাই। বাহিরে যে কিছু প্রণয় ও শান্তি দেখা যায় তাহা কপটতায় আচ্ছাদিত সুতরাং কার্য্যকালে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া সুকঠিন। বিলাস ও ইন্দ্রিয়সুখে লোকে এরূপ অন্ধ যে, সাক্ষাৎ দেবতা মাতাকে দুর্ব্বাক্য বলিতে এবং প্রহার করিতেও অনেকে কুণ্ঠিত হয় না। কেহ কেহ আবার মাতাকে দাসীকার্য্যে নিযুক্তা করিয়া, প্রণয়িনী ও তদীয় জননী ও ভ্রাতাভগিনীর মনস্তুষ্টি করিতে কিছু

বতী যে তন্নিমিত্ত তাহারা না করিতেছে এরূপ দুষ্কার্য্য নাই। বিলাস-বাসনা চরিতার্থের নিমিত্ত জ্ঞানবিবেকবিশিষ্ট মনুষ্যগণ যে সকল ঘৃণাকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছে, পশুপক্ষী ইতর জন্তুগণও উদরপোষণের নিমিত্ত তাহা করিতে জানে না। লোকে যতই কেন সভ্যতার গৌরব না করুক ও আপনাআপনি সভ্য বলিয়া বিখ্যাত না হউক, বাস্তবিক পৃথিবী ক্রমে পশুভাবে পূর্ণ হইতেছে। প্রজারক্ষাব্যপদেশে, অর্থ ও স্বার্থের নিমিত্ত এক ভূপতি অন্য ভূপতির সহিত বিবাদ, কলহ ও সংগ্রাম করিয়া, অকারণে লক্ষ লক্ষ মহাপ্রাণীর রক্তে পৃথিবীকে দূষিতা করিতেছে। সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি ইতর জন্তুর যুদ্ধে আর ইহাদিগের যুদ্ধে এইমাত্র প্রভেদ যে তাহাতে একটী কি দুইটী হতাহত হয়, ইহাদিগের এক একদিনের সংগ্রামে সহস্র সহস্র মহাপ্রাণী হতাহত হইয়া থাকে। শোকে আনন্দময়ী পৃথিবী নিরন্তর অশ্রুবর্ষণ ও হাহাকার করিতেছেন। দ্বেষ হিংসা ও ব্যভিচারে শান্তিসুখের লোপাপত্তির এবং কুপ্রবৃত্তির আধিপত্যে রোগ, শোক, জরা জীর্ণ ও অকালমৃত্যুর অবিরল সদ্ভাবে পৃথিবী পরিপূর্ণা। যে যত বঞ্চক, পরপীড়ক, পরদ্রোহি এবং কুটিল, যে লোকের অপকার যতই উপকার বলিয়া দেখাইতে পারে, পৃথিবীতে সেই ততই জ্ঞানী, সভ্য ও বুদ্ধিমান বলিয়া বিখ্যাত।”

উপরিউদ্ধৃত কথা কয়েকটী পাঠ করিলে কাঙ্গাল হরিনাথের মহান্ দেবহৃদয়ের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি গভীর ক্ষোভে ও বিষাদে যে সমস্ত কথা বলিতেছেন, তাহা তাঁহার মুখের কথা নহে, তাহা বক্তৃতার উচ্ছ্বাস নহে, তাহা দেবহৃদয়ের করুণ অভিব্যক্তি। এই কথা দেশের দশজনকে আরও সোজা কথায় বুঝাইবার জন্য তিনি যে সুন্দর গানটী রচনা করিয়াছিলেন, আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

মানুষ বড় কিসে ভাবি তিনবেলা।
সে'ত, বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান পেয়ে
না বোঝে পরের জ্বালা।

গাছেতে ফল ধরে যত,
নত হ'য়ে বিলায় সেত, খায় না;
মানুষ ধন জ্ঞান বিদ্যা পেলে,
লাগায় তালার উপর তালা।

২। গাছের তলে বস্‌লে এসে,
সে ত ছায়া দেয় রে ভালবেসে, দেখ্‌না ;
কাট্‌তে গেলেও ছায়া দান করে সে,
গাছ না হয় রে উতলা ॥

৩। ঝড় বৃষ্টি শিলা স'য়ে,
আছে স্থির ভাবেতে দাঁড়াইয়ে, দেখ্‌না ;
যাচ্ছে এক উদ্দেশে, উর্দ্ধদেশে,
তার শক্তি কি অচলা ॥

৪। কাঙ্গাল বলে, বড় যে জন,
সে ত ফকীর হয় রে পরের কারণ, দেখ্‌না ;
ওরে, ঘর ছেড়ে তাই যোগী ঋষি,
সার করে গাছের তলা ॥

কাঙ্গাল হরিনাথ ব্রহ্মাণ্ডবেদের মূলসূত্র সহজবোধ্য করিবার জন্য একটী অতি সুন্দর রূপকের সৃষ্টি করিয়াছেন। গিরিরাজ হিমালয় ও গিরিরাণী মেনকা অনেক দিন তাঁহাদের কন্যা দুর্গাকে দর্শন করেন নাই; তাই তাঁহাদের হৃদয়ে দর্শনাকাঙ্ক্ষা জাগৃত হইয়াছে। ইহারই নাম "আগমনী"। এই আগমনী অবলম্বন করিয়া কাঙ্গাল হরিনাথ সাধনসূত্র প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি এই সূত্রের ব্যাখ্যা উপলক্ষে বলিয়াছেন যে, তুষার পড়িয়া পাষাণ যখন অতি শীতল হয় এবং সূর্য্যোত্তাপে যখন তাহা অতি উষ্ণ হয়, তখন তাহাতে বাস করা কঠিন হইয়া থাকে। পাষাণখণ্ডে কাহাকেও আঘাত করিলে সেই আঘাতও কঠিন হয়। মানুষ যখন ঈশ্বর ভুলিয়া ভোগবিলাস চরিতার্থ করিবার জন্য স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠে, তখন তাহার সহিত বাস করা কঠিন হয়। সেই মানুষ আবার স্বার্থের নিমিত্ত যাহাকে আঘাত করে, সেই আঘাতও প্রস্তর-আঘাতবৎ কঠিন হয়। এই নিমিত্ত লোকে অত্যাচারী মানুষকে পাষাণ বলিয়া থাকে। আমাদের এই প্রসঙ্গের প্রধান নায়ক গিরিরাজও সেইরূপ পাষাণ এবং তাঁহার পত্নী মেনকারাণীও সেইরূপ পাষাণী। কিঞ্চিৎ ভাবিয়া দেখিলে, প্রতি মানুষের হৃদয়েই গিরিরাজ ও মেনকা বিরাজ করিতেছেন, ইহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যায়। বস্তুতঃ প্রতি মানবের আত্মাই গিরিরাজ এবং ভগবানের প্রেম-পিপাসাই মেনকা রাণী। এই আত্মা ও পিপাসা বিশুদ্ধ হইলেই, সেই বিশুদ্ধ আত্মা

ও পিপাসার যোগে ভগবান জন্মগ্রহণ করেন, অর্থাৎ প্রকাশিত হইয়া থাকেন। প্রেম-পিপাসা মেনকাকে আশ্রয় করিয়া ভগবানের ক্ষণপ্রভার প্রথম প্রকাশ পায়, তাহার পর আত্মা সাধনপথে ক্রমে অগ্রসর হইতে থাকে। এই আগমনী প্রস্তাবে সাধনতত্ত্বের ক্রমোন্নতির আভাস প্রদত্ত হইয়াছে।

মানুষ স্বেচ্ছাচার ও অত্যাচার করতঃ যতই কেন পাষাণবৎ কঠিন না হউক, ভগবান তাহাকে কখনও ভুলেন না এং কোমল করিয়া প্রেমানুরাগের পাত্র করিতে বিরত হন না। স্বর্ণকার যেমন অবিশুদ্ধ স্বর্ণ হাফরে দগ্ধ করিয়া গড়নোপযোগী কোমল ও বিশুদ্ধ করে, ভগবানও অনুতাপ ও নানা প্রকার দণ্ডানলে দগ্ধ করিয়া মানুষকে প্রেমানুরাগ অলঙ্কারের উপযোগী কোমল ও পবিত্র করিয়া তোলেন। এ আর ভাল হইবে না বলিয়া তিনি কাহাকেও পরিত্যাগ করেন না। যতদিন মানুষের হৃদয় প্রেমানুরাগের উপযোগী কোমল ও বিশুদ্ধ না হয়, ততদিন পোড়ার উপর পোড়া ও আঘাতের উপর আঘাত করিতে থাকেন। কাঙ্গাল হরিনাথ জীবনে এ প্রকার আঘাত অনেক মহ্য করিয়াছেন, ভগবান তাঁহাকে অনেকবার হাফরে ফেলিয়া পোড়াইয়াছেন। তাহার পর তিনি এই সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যে অতুল সাধন সম্পদের অধিকারী হইয়াছিলেন, তাহারই পরিচয় তিনি ব্রাহ্মণ্ডবেদে দিয়াছেন। সংসারে আসিয়া প্রথমজীবনে ও মধ্যজীবনে বার বার পোড়া খাইয়া কাঙ্গাল হরিনাথ প্রাণের আবেগে যে গান গাহিয়াছিলেন, আমরা তাহা এই স্থানে উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন, সংবরণ করিতে পারিলাম না, কাঙ্গাল গাহিয়াছেন——

মরি ঐ কুবের সেকরা সোণার গয়ণা গড়িতেছে।
সে যে, মিশাল সোণা হাফরে ফেলে,
খাঁটি ক'রে লইতেছে। (পোড়াইয়ে)
১। একবার খাঁটি নাহি হ'লে,
আবার দেয় হাফরে ফেলে,
পোড়ায় পোড়ায় খাঁটি ক'রে তুলিতেছে;
ও সেই, খাঁটি সোণার নূপুর গড়ে,
মায়ের পায়ে পরাইছে। (সোণার নূপুর)
২। কত সোণা-আছে প'ড়ে,
সে দিক সে না চায় ফিরে,

যাতে গড়ন হবে তাই বাছিতেছে;
ও সে, আগুন দিয়ে পোড়াইয়ে,
গলাইয়ে গড়িতেছে। (কত গড়ন)

৩। ও সে, গড়ন গ'ড়ে মাকে সাজায়,
মা আপনি সেজে আপন সোণায়,
কেমন গড়ন হয়েছে তাই দেখিতেছে;
সোণার গরবে আনন্দময়ী
সদানন্দে নাচিতেছে। (মা যে)

৪। সংসার হাফরের মাঝে,
কাঙ্গাল সদা পড়ে আছে,
কত দুঃখানলে সে ত পুড়িতেছে;
কবে নূপুর গ'ড়ে মায়ের পায়ে
পরাইবে ভাবিতেছে। (সেকরা)

কাঙ্গালের রচিত এই ভাবের আর একটী গান আছে; আমরা সেই গানটীও এই স্থানে তুলিয়া দিলাম।

ঐ দেখ, রুদ্রঘরে, কর্ম্মকারে, ব'সে আছে ভাতি ধ'রে।

১। সে কর্ম্মের কয়লা দিয়ে, আগুণ জ্বালিয়ে, রেখেছে মনের হাফরে;
সে, মিশাল ধাতু যা পায়, পোড়ায়, গড়ন গড়ায় খাঁটি ক'রে।

২। একবার না খাঁটি হ'লে, আবার কালে দেয় রে ফেলে অম্নি ক'রে;
খাঁটি না হ'লে পরে, ছাড়ে না রে, সে ত কভু দয়া ক'রে।

৩। ও যেজন হয় রে খাঁটি, দিয়ে মাটী কাম ক্রোধ বাসনারে;
সে ত রে বারে বারে, পোড়ে না রে, চ'লে যায় অমৃতের ঘরে।

৪। কাঙ্গাল কয় আর কত কাল, পোড়াবে কাল রুদ্র বেটা
এমন ক'রে,
তুমি মা, ধর অসি, মুক্তকেশী, মুক্ত কর এবার
মোরে। (আমি পুড়ব কত)

শ্রীজলধর সেন।

সরল সাংখ্য-দর্শন।

ভারতীয় ষড়দর্শনমধ্যে* মহর্ষি কপিলপ্রণীত সাংখ্য-দর্শন সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া অনুমিত হয়। পাতঞ্জল সাংখ্যের ক্রমোন্নতি, বেদান্ত সাংখ্য ও পাতঞ্জলের ক্রমোন্নতি। অবশ্য এসব বিষয়ে কোন একটা নিশ্চিত মতামত প্রকাশ করা বড় কঠিন। তবে দেখিয়া শুনিয়া যাহা অনুমান হয় তাহাই লিখিত হইল। কি কারণে এরূপ অনুমান হয়, এই প্রবন্ধের শেষে তাহাও দেখাইবার চেষ্টা করা হইবে।

সাংখ্য-দর্শনের মতটি অতি সুন্দর ও সর্ব্বসাধারণের আদরণীয় ও গ্রহণীয় হইবার সামগ্রী। যাহাতে ঐ মতটী সকলের বোধগম্য হয় এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটী সেই উদ্দেশ্যেই আরম্ভ করা হইয়াছে।

অনেকের বিশ্বাস সাংখ্যকার নিরীশ্বরবাদী ও নাস্তিক। সাংখ্য-দর্শনের ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ এই সূত্রটী অবলম্বন করিয়াই উক্ত বিশ্বাসের উৎপত্তি হইয়াছে। সাংখ্যকার "ঈশ্বর" এই শব্দটি কি অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন এবং তাহার "অসিদ্ধেঃ" এই বাক্যটীর প্রকৃত তাৎপর্য্য কি এবং সমস্ত সূত্রটী কোন্ প্রকরণে ও কোন্ কার্য্য সাধনের জন্য লিখিত হইয়াছে ইত্যাদি বিষয় ভালরূপে আলোচিত হইলে এরূপ বিশ্বাস থাকিবার কোন সম্ভাবনা থাকিবে না।

এই প্রবন্ধের স্থানান্তরে তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করা হইল।

যদিও ছয় দর্শনের ছয়টি মত, তথাপি যে যে যুক্তিপ্রণালী অবলম্বন করিয়া ঐ ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকটিত হইয়াছে তদনুসারে হিন্দু দার্শনিকগণকে তিনটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত করা যায়। এক সম্প্রদায় পরিণামবাদী, অন্য সম্প্রদায় বিবর্ত্তবাদী এবং তৃতীয় সম্প্রদায় আরম্ভবাদী। সাংখ্য ও পাতঞ্জল পরিণামবাদী, বেদান্ত বিবর্ত্তবাদী। ন্যায় ও বৈশেষিক আরম্ভবাদী। এই তিনটি বাদের প্রকৃত মর্ম্ম সংক্ষেপে নিম্নে লিখিত হইল।

বিশ্বজগৎ কার্য্য ও কারণময় অর্থাৎ বিশ্বের যাবতীয় পদার্থের মধ্যে প্রত্যেক পদার্থই কোনও একটি পদার্থের কারণ ও কোনও একটি পদার্থের কার্য্য। পূর্ব্ব ভাবটিকে কারণ বলে ও পরভাগটিকে কার্য্য বলে। যেমন মৃত্তিকা ও ইষ্টক; মৃত্তিকা হইতে ইষ্টক প্রস্তুত হইয়াছে; মৃত্তিকা ইষ্টকের পূর্ব্বভাব সুতরাং ঐটিই ইষ্টকের কারণ এবং ইষ্টক মৃত্তিকার পরভাব সুতরাং উহা মৃত্তিকার কার্য্য। জগতের অন্যান্য বস্তু আলোচনা করিয়া দেখিলেও ঐরূপ কার্য্য কারণ ভাবের পরস্পর সম্বন্ধ দেখা যাইতে পারে। এই বিষয়ে হিন্দু দার্শনিকগণের মধ্যে মতভেদ

নাই। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যেই এক সমস্যা উপস্থিত হয়, যে কারণ হইতে কার্য্য উৎপন্ন হওয়ার পরেও কার্য্যে কারণ বর্ত্তমান থাকে কি না? অর্থাৎ কার্য্যটি একটি অভিনব বস্তু—কারণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, না কার্য্য ও কারণ একই বস্তু? এই সমস্যার মীমাংসা করিতে গিয়াই উপরিউক্ত তিনটি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। যাঁহারা পরিণামবাদী তাঁহারা বলেন যে কার্য্য ও কারণ দুইটি পৃথক বস্তু নহে। যদিও কারণ হইতে কার্য্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তথাপি কার্য্য অবস্থায়ও কারণ কার্য্যে বর্ত্তমান থাকে, এবং কারণ অবস্থায়ও কার্য্য কারণে বর্ত্তমান থাকে। কারণ হইতে কার্য্যের উৎপত্তি হয় বটে, কিন্তু ঐ কার্য্যটি একটি অভিনব বস্তু নহে। উহার সত্তা পূর্ব্বেও ছিল। তিল হইতে তৈল উৎপন্ন হইয়াছে। তৈল একটি নূতন বস্তু নহে, উহা তিলে অব্যক্ত ভাবে বর্ত্তমান ছিল, ব্যক্ত হইয়া তৈলে পরিণত হইয়াছে। তৈল তিল হইতে পৃথক বস্তু নহে, উহা তিলেরই রূপান্তরমাত্র। এইরূপ রূপান্তরিত হওয়ার নাম পরিণাম। যুক্তি অবলম্বন করিয়া যে দার্শনিক সম্প্রদায় জগতের সৃষ্টি প্রক্রিয়াদি ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাঁহারাই পরিণামবাদী। পরিণামবাদীগণের মতে জগতের কোনও বস্তুরই ধ্বংস হয় না এবং কোন বস্তুই নূতন সৃষ্ট হয় না। মৌলিক বস্তু অনন্ত কাল আছে এবং সেই মৌলিক বস্তুতে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড অব্যক্ত ভাবে লুক্কায়িত রহিয়াছে। এবং রূপান্তরিত হইয়া অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে পরিণত হয়। যে বস্তুটি রূপান্তরিত হয় তাহাকেই কারণ বলে এবং রূপান্তরিত অবস্থাকে কার্য্য বলে। প্রত্যেক পদার্থই অবস্থানুসারে কার্য্য এবং কারণ দুইই হইতে পারে; বীজ হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, বীজ বৃক্ষের কারণ; আবার বৃক্ষ হইতে বীজের উৎপত্তি হয়, সুতরাং বৃক্ষ বীজের কারণ। পরিণামযুক্তি এই প্রকার।

আবার বিবর্ত্তবাদীগণ বলেন যে যখন কারণ হইতে কার্য্যের উৎপত্তি হয় তখন আচরণ ও বিক্ষিপ্ত এই দুইটি শক্তি কার্য্য করে, আচরণ শক্তির ক্রিয়া কারণটীর আচ্ছাদন করা অর্থাৎ কারণটিকে দেখিতে না দেওয়া। আর বিক্ষিপ্ত শক্তির ক্রিয়া কারণটিকে অন্যরূপে প্রতিপাদন করা। অর্থাৎ কারণটি যাহা তাহা না দেখাইয়া অন্যরূপে দেখান। উহা শারীরিক অভ্রান্তির ন্যায়। রাত্রিযোগে কোথাও যাইতেছি, সহসা একটি বৃক্ষমূল দেখিয়া ভীত হইলাম। বৃক্ষমূলটি এমন ভাবে দাঁড়াইয়া আছে যে সেটিকে দেখিয়া মনে হইল একটি দস্যু দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। রজনীযোগে ঐরূপ একটি দস্যু দেখিয়া ভীতি প্রভৃতি যে সকল ভাব মনোমধ্যে হইবার সম্ভাবনা সে সমস্তই হইল। এই ঘটনাটি আলোচনা করিয়া

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

Seyne

দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে একটি আচরণ শক্তির দ্বারা বৃক্ষমূলটিকে এমন ভাবে আবৃত করিয়াছিল যে তাহার প্রকৃত সত্তা জানিতে পারি নাই। এবং একটি বিক্ষিপ্ত শক্তির দ্বারা বৃক্ষমুলটি একটি দস্যুরূপে পরিণত করাইয়া অন্তরে ভীতির সঞ্চার করিয়া দিয়াছিল বিবর্ত্তবাদ এই প্রকার। বিবর্ত্তবাদীগণের মতে কারণ হইতে যখন কার্য্য উৎপন্ন হয় তখন কারণটি আচ্ছাদিত হয়। এবং ভ্রমবশতঃ কারণটিকে অন্যরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহাদের মতে জগতের উৎপত্তি এই ভ্রমের দ্বারাই হইয়াছে। প্রকৃত বস্তু যাহা তাহা জগৎ নহে, প্রকৃত বস্তু আবৃত হইয়া ভ্রান্তিরূপ জগৎ প্রতিভাত হইতেছে। পূর্ব্বোক্ত বৃক্ষমূলটি যেমন ভ্রান্তিময় দস্যুতে পরিণত হইয়াছিল, সেইরূপ প্রত্যেক কারণ প্রত্যেক ভ্রান্তিময় কার্য্যে পরিণত হয়। এই ভ্রান্তিময় কার্য্য ও প্রকৃত কারণ এক বস্তু নহে। যেমন বৃক্ষমূল ও দস্যু এক বস্তু নহে। ন্যায় ও বৈশেষিক আরম্ভবাদী-গণের মতে কারণ ও কার্য্য দুইটি পৃথক পদার্থ। কারণ হইতে উৎপন্ন কার্য্য একটি অভিনব বস্তু, উহাতে কারণের কোনও সত্তা নাই। যদিও তিল হইতে তৈল উৎপন্ন হইয়া থাকে, তৈল একটি অভিনব বস্তু। তিলের সহিত উহার কার্য্যকারণ সম্বন্ধ ভিন্ন অন্য কোনও সম্বন্ধ নাই। ইহাদের মতে পরমাণুসমষ্টি হইতে জগত উৎপন্ন হইয়াছে। পরমাণু জগতের উপাদান কারণ জগতের স্রষ্টা ঈশ্বর, তিনি পরমাণু উপাদানে জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকেন।

সাংখ্যকার পরিণামযুক্তি অবলম্বনে কি প্রকারে জগতের সৃষ্টি প্রক্রিয়াব্যাখ্যা করিয়াছেন সম্প্রতি তাহাই বিশেষরূপে দেখান যাইতেছে।

অন্তর ও বহির্জ্জগতের সমুদয় পদার্থগুলিকে সাংখ্যদর্শনে নিম্নলিখিত পাঁচশটি মৌলিক পদার্থে বিভক্ত করা হইয়াছে।

যথা :—

১। প্রকৃতি ২। পুরুষ ৩। মহৎ ৪। অহঙ্কার ৫। পঞ্চতন্মাত্র (অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, এই পাঁচ সূক্ষ্ম মহাভূত) ৬। পঞ্চ মহাভূত (অর্থাৎ উপরোক্ত পাঁচটি স্থূল মহাভূত) ৭। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ৮। পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ৯। মন উপরি উক্ত পঞ্চবিংশতি পদার্থকে আবার নিম্নলিখিত চারি শ্রেণীতে বিভাগ করা যায় যথা :—

(১) মূল বা অবিকৃতি (২) প্রকৃতি ও বিকৃতি (৩) বিকার (৪) অবিকার

এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুতে রূপান্তরিত বা পরিণত হওয়ার নাম বিকার।

যাহা রূপান্তরিত হয় তাহাকে প্রকৃতি বলে। আর রূপান্তরিত হইয়া যাহা হয় তাহাকে বিকার বা বিকৃতি বলে। (১) বস্তুটি,অন্য কোন পদার্থের পরিণাম উৎপন্ন হয় অর্থাৎ যেটির পূর্ব্বে আর কোন প্রকার রূপ ছিল না তাহাকে মূল বা আকৃতি বলে। (২) যাহা অন্য কোন বস্তুর বিকারে উৎপন্ন হইয়াছে এবং যাহার বিকারে অন্য কোন বস্তু উৎপন্ন হইতে পারে তাহাকে প্রকৃতিবিকৃতি বলা যায়। অর্থাৎ এই জাতীয় বস্তু নিজে অপরের বিকারে সমুৎপন্ন হয় এবং নিজের বিকারে অপরকে সমুৎপন্ন করে। (৩) যাহা কেবল অপরের বিকারে উৎপন্ন হয় এবং নিজে প্রকৃতিরূপে অপরকে উৎপাদিত করিতে পারে না তাহাকে বিকার বলে। (৪) যাহা কাহারও বিকারে সমুৎপন্ন হয় নাই এবং যাহার বিকারে অন্য কোনও বস্তু উৎপন্ন হয় না অর্থাৎ যাহার পূর্ব্বাবস্থা কিছু নাই, পর অবস্থাও কিছু নাই, যাহা অনাদি অনন্ত ও অনন্ত কাল এক অবস্থাপন্ন তাহাকে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চবিংশতিটি পদার্থ মধ্যে প্রকৃতি অবিকৃতি, পুরুষ বিকারও নহে অবিকারও নহে মহৎ অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র এই সাতটী প্রকৃতিবিকৃতি, পঞ্চমহাভূত, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন এই ষোলটি বিকার।

অবিকৃতি ও মূলপ্রকৃতি—

প্রকৃতি মূলা, ইনি অবিকৃতি অর্থাৎ ইনি কাহারও বিকারে উৎপন্ন হন নাই। ইনি অনাদি, ইনি অনশ্বর, ইনি অব্যক্তা ও সর্ব্বভূতের আদিকারণ, আদ্যাশক্তি বীজস্বরূপা ইহাকেই সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীকার গ্রন্থারম্ভে মঙ্গলাচরণ করিয়া বলিয়া- "অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাংনমামঃ। অজামেতাং জুষমানং ভজন্তে জহত্যেনাং ভুক্তভোগাং নুমস্তান্॥" ইনি অজা (জন্মরহিতা) ইনি অদ্বিতীয়া ইনি লোহিতশুক্লকৃষ্ণা বিবিধবর্ণা সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণস্বরূপা যাবতীয় ভূতবর্গের সৃষ্টিকর্ত্রী।

এই মূলা প্রকৃতি কি, ইনি জগতের কর্ত্রী, অথচ চেতনা নহেন কিন্তু কার্য্য করেন। ইহার তিনটি গুণ আছে—সত্ত্ব রজঃ তমঃ—এই তিনটি গুণ যখন সামান্য ভাব অবলম্বন করিয়া ইহাতে বিলীন হইয়া থাকে তখন ইনি অব্যক্ত রূপে অবস্থান করেন, আবার যখন ঐ গুণত্রয়ের বৈষম্য উপস্থিত হয়, তখন ইনি ব্যক্ত হইয়া জগৎ উৎপাদন করেন;—তত্ত্ব যতক্ষণ আমাদের ধারণায় আসিবে ততক্ষণ সাংখ্যদর্শনের প্রকৃত মর্ম্মে আমরা কিছুই করিতে পারিব না।

শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী

নিবেদন

লও মোরে সখা বাঁধিয়া—
তোমাতে আমাতে করি অভিন্ন
দোঁহার জীবন গাঁথিয়া।
করিও এ প্রাণ খেলনা তোমার,
কাযের না হো'ক্ হবে খেলিবার—
খেলার সময়ে হেলায় কখন'
দিও চুম্বন সাধিয়া—
তা' হলেই মম খেলার জনম
সার্থকে যাবে কাটিয়া।

লও মোরে সখা তুলিয়া ;
শতেক গন্ধ কুসুম চয়নে
আমার এ ফুল ভুলিয়া।
সৌরভ নাই—এই অপরাধে
চলিয়া যাবে কি দলিয়া অবাধে ?
না হয় তুলিয়া দিওগো ফেলিয়া
যাবে মম কারা খুলিয়া
তোমার পরশে লভিব মরণ
তব পদ রেণু চুমিয়া।

লও মোরে দয়া করিয়া—
তোমার চরণ হেম-মঞ্জীরে
কঙ্কর রূপে ভরিয়া।
বাজিব নিত্য শিঞ্জন তালে
পড়িব মনে ত' তবু কোন' কালে,
ঝঙ্কার মম বেড়িয়া তোমারে
ধ্বনিবে রহিয়া রহিয়া,—
ধন্য হইব সঙ্গীতরূপে
তোমার চরণে মরিয়া।

লও মোরে সখা চাহিয়া—
আমার আমারে তব দিঠি তলে
একবার শুধু ডাকিয়া।
সব কল্পনা হোক অবসান
আমার এ আমি পাক্ নব প্রাণ—
জীবন মরণ জনম সাধনা
দিব গো সাধিয়া সাধিয়া ;
তব গৌরবে লীন হয়ে আমি
রিক্ত হইব মাগিয়া।

শ্রী বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

রেখাচিত্রশিল্পী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ

দৃষ্টিগ্রাহ্য বস্তুমাত্রই আপেক্ষিকরূপে সীমাবদ্ধ। একের যেখানে অন্ত, অন্যের সেখানে আরম্ভ। সুতরাং জ্যামিতিক রেখার আবশ্যকতাসত্ত্বেও উহা কাল্পনিক। আমার রাস্তার ওপারে বাড়ীখানির উপরে যখন ঘনতরুরাজির শ্যামলছায়া বিস্তৃত হইয়া পড়ে, তখন গৃহ ও তরুরাজির মধ্যে আলোকিত এবং ছায়াস্তৃত প্রাচীরের মধ্যে, পার্থক্য আমি বুঝিতে পারি কিন্তু রেখা দেখিতে পাই না। তাহা পাইনা বলিয়াই যে আনন্দ অনুভব করি, তাহা অসীমতার অনুভূতিসঞ্জাত আনন্দের অংশবিশেষ। কালের অন্ত নাই, আকাশের অন্ত নাই, ঘটনার অন্ত নাই, জীবনের অন্ত নাই,—মৃত্যু কেবল পটপরিবর্ত্তন মাত্র—তাহাও ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে ; তাহার বংশ, তাহার জাতি বা তাহার মানবিকতার পক্ষে নহে। এই অপরিমেয়, অপরিসীম সার-সত্যের সমগ্র সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া দুরূহ ব্যাপার হইলেও, আমাদের জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে ইহার যে কণিকামাত্র উপলব্ধি করিতে পারি, ইহা বোধ হয় প্রাকৃতিক বিচার—নতুবা আমাদিগকে কল-কারখানার মত সুধু মনঃশূন্য কর্ম্মক্ষমমাত্র হইয়া থাকিতে হইত।

যে জগৎব্যাপী রূপসমুদ্রের' একটি মাত্র তরঙ্গের আঘাতে আমরা উৎফুল্ল ও অনুপ্রাণিত হইয়া উঠি' রেখাহীন বর্ণবৈচিত্রই তাহার আনন্দের আধার এবং কারণ।

তথাপি চোখে যাহা দেখিতে পাই, কাগজে কলমে তাহাকে ধরিয়া রাখিতে

হইলে অনেকগুলি Conventional aids অর্থাৎ কৃত্রিম উপায়ের সাহায্য লইতে হয়। ইহার মধ্যে রেখা একটি প্রধান স্থান অধিকার করে। তারপর Autochrome drawing এবং পরিশেষে বর্ণ-চিত্রাঙ্কন। বর্ণচিত্রশিল্পীর পক্ষে রেখাশ্রয় না করিয়াও দর্শনীয়কে পটার্পিত করিবার সুবিধা রহিয়াছে। একবর্ণ-চিত্রকরও অনেকটা রেখা বাদ দিতে পারেন। কিন্তু রেখাঙ্কনশিল্পীর শিল্পের প্রাণ একটি মাত্র সামান্য রেখার উপর অনেক সময় নির্ভর করে। তাঁহাকে অসত্যদ্বারা সত্যের উদারতা,দৃঢ়তা এবং সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলিতে হয়। এবং তাহা এমনভাবে করিতে হয় যেন রেখানির্দ্দেশের সসীম ভাবই দর্শকের মনোমধ্যে রেখাহীনতার অসীমতা জাগাইয়া তুলিতে পারে। সুতরাং এই শিল্পের সাধনায় যে কি পরিমাণ যত্ন, অভিনিবেশ ও একাগ্রতার আবশ্যক তাহা সহজেই অনুমেয়।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় রেখাঙ্কনশিল্পী। তাঁহার রেখায় প্রাণ আছে। সে প্রাণ তাঁহার রেখাঙ্কিত বিষয়সম্ভূত নহে—রেখারই সরু মোটা বাঁকা সোজা দাগের মধ্যে। সে দাগের প্রত্যেক অংশের তাৎপর্য্য আছে, প্রয়োজনীয়তা আছে, স্থিতি এবং ব্যাপ্তি আছে—সে দাগের আরও শক্তি আছে—যাহা মনোযোগ আকর্ষণ করে,—কেবলমাত্র সে রেখায় প্রতি নহে; রেখার অন্তরালে যে সীমাহীনতা আছে, তাহারও প্রতি।

কিন্তু কয়জন জানেন যে,জ্যোতিরিন্দ্রনাথ শিল্পী? তিনি একাধারে নাটককার, সাহিত্যিক, বহুভাষাবিৎ, সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞ, সদ্বন্ধু ইত্যাদি নানারূপে বিখ্যাত। যাঁহারা তাঁহার তাড়নায় কোন না কোন সময়ে কিয়ৎকাল চুপ করিয়া বসিয়া তাঁহাকে 'sitting' দেন নাই তাঁহারা জানেন না যে, এই মনস্বী পুরুষের ড্রয়িং-বুকের পাতায় পাতায় কত ব্যক্তির মুখাকৃতি তাঁহাদের অন্তর্নিহিত বিশেষত্বের জ্বলন্ত ছাপ লইয়া বিদ্যমান। রেখা পদার্থটা অসত্য হইলেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রেখাঙ্কিত চিত্রগুলির মধ্যে যে সতেজ সত্য বিরাজিত, তাহা অনেক বিখ্যাত শিল্পীর বহুমূল্য চিত্রেও দুর্লভ।

বহুদিন পূর্ব্বে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মস্তিষ্কতত্ত্বের (phrenology) আলোচনা করিতেন এবং সেই সূত্রেই মানবমুখের এই রেখাচিত্র অঙ্কন করিতে আরম্ভ করেন। বর্ত্তমান লেখক যখন বালক ছিল তখন 'বালকে' প্রকাশিত "মুখচেনা" শীর্ষক প্রবন্ধগুলি এবং তৎসংশ্লিষ্ট ছবির আশায় মাসান্তে বহুবার ডাকঘরে আনাগোনা করিত। যাঁহারা সে সকল প্রবন্ধ এবং ছবি দেখিয়াছেন তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ একটি সামান্য রেখা দ্বারা কি

অসামান্য ভাব ফুটাইয়া তুলিতে পারেন। "বালকে" প্রকাশিত বঙ্কিম বাবুর চিত্রখানিতে তাঁহার ভ্রু, অক্ষিপল্লব ও তারকা কেবলমাত্র কয়েকটি রেখার সমষ্টি কিন্তু ঐ রেখা কয়টি সেই মহামনস্বী পুরুষের কি অলোকসামান্য প্রতিভা-রশ্মি বিকীর্ণ করিতেছে!

বহু বৎসর চলিয়া গিয়াছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাহার পর বহু ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন, কিন্তু বর্ত্তমান লেখক যখনি তাঁহার অঙ্কিত চিত্র দর্শন করিয়াছে তখনি তাঁহার রেখাসৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়াছে। মানসীর সম্পাদকগণ আজ জ্যোতি-রিন্দ্রনাথের খাতা হইতে একখানা চিত্র পাঠকপাঠিকাকে উপহার দিতেছেন। ইহা খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও সুলেখক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী মহাশয়ের প্রতি-কৃতি। যাঁহারা প্রমথনাথকে জানেন তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে সামান্য কয়েকটি রেখাদ্বারা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রমথনাথের চিত্র ও চরিত্র উভয়ই কিরূপ নিপুণভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন।

বর্ত্তমান যুগের একটি ধর্ম্ম দেখিতেছি যে, বিলাতী 'হলমার্ক' না থাকিলে এত স্বদেশীর দিনেও আমাদের দেশে গুণের সমাদর হইতে বিলম্ব ঘটে।

ইহার কারণ নির্দ্দেশ বহু তর্কসাপেক্ষ। তবে একথা বোধ হয় সত্য যে, সেদেশে ভণ্ডামীর এত আধিক্য নাই - অন্ততঃ উহা আমাদের দেশের মত অধিককাল স্থায়ী হইতে পারেনা। সুতরাং সে দেশের বিচক্ষণগণ যাঁহাকে প্রশংসা করেন, তাঁহাকে ভাল বলিয়া মানিয়া লইতে আমরা মুখে আপত্তি করিলেও, মনে মনে করি না। প্রতিষ্ঠাবান চিত্রশিল্পী মিঃ উইলিয়ম রটেনষ্টাইন জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করা সঙ্গত বিবেচনা করিতেছি। রটেনষ্টাইন লিখিয়াছেন:—

11, Oak Hill Park, Frognal
Hampstead
Sept 14,12.

My dear sir,—Let me thank you for your kindness in sending over the three books containing your drawings. As I expected from the reproductions I saw in an article on your brother, they are admirable. I know of few drawings which show at the same time so much sensitiveness of line and sincerity in characterisation, and there is a beauty and nobility in the expression you give to your sitters which

it would be difficult to match. I do not know which I prefer, the drawings of the men or of the women. Your drawings of ladies remind me of the early drawings by Dante Gabriel Rossette and the admirable drawings by the great French artist, Puvis de Chavanes. Indeed the books have been— and still are a source of great delight to me, and all to whom I have shown them have had similar feelings regarding them. One or two of your sitters, it has been my privilege to meet— I need not speak of your brother Rabindranath, so dear to all of us here ; there a beautiful drawing of his son and one of Kawagachi, whom I saw at Benares. I hope, with your permission, to get one or two of your drawings reproduced here. If ever I return to India—a hope which is very near my heart—the privilege of your acquaintance will be one of the pleasures to which I shall look forward.

Your brother's presence among us is a great joy to us and his friendship I count as one of the great assets of my life. Once more let me thank you for your prompt response to my wish to see more of your work. Believe me to be most faithfully yours William Rothenstein.

বিলাত হইতে রবিবাবু জ্যোতিবাবুকে যে চিঠি লিখিয়াছেন তাহাও আমরা এইখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

ভাই জ্যোতিদাদা,

আপনার ছবির খাতা আমি Rothensteinকে দেখিয়েছি। তিনি এখানকার একজন খুব বিখ্যাত artist ; তিনি দেখে অত্যন্ত আশ্চর্য্য হোয়ে গেছেন। তিনি আমাকে বল্লেন, আমি তোমাকে বল্‌ছি, তোমার দাদা তোমাদের দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্রী। আমাদের দেশের প্রথম শ্রেণীর ড্রয়িং যাঁরা করেন, তাঁদের সঙ্গেই ওঁর তুলনা হতে পারে। এতদিন যে, আমাদের দেশে এ ছবির কোনো সমাদর হয় নি, এর মত এমন অদ্ভুত ঘটনা কিছু হতে পারে না। most marvellous, most magnificent—এই ওঁর মত। তিনি বলেছেন, এখানকার সব চেয়ে বিখ্যাত art criticকে তিনি এই ছবি দেখাবেন, এবং এর একটা ছোট সমালোচনা তিনি নিজে লিখবেন। port folio র আকারে' একটা selection তোমাদের করা উচিত। ..... যেটা যথার্থ আপনার নিজের জিনিষ এবং যাতে আপনার শক্তি এমন আশ্চর্য্যরূপে

প্রকাশ পেয়েছে, সেটাকে লুপ্ত হতে দেওয়া উচিত হয় না। আপনার এই ছবি এখানে যাঁরাই দেখেছেন, সকলেই খুব প্রশংসা করছেন। রোটেনষ্টাইন খুব একজন গুণজ্ঞ লোক, এঁর মতে আপনার চিত্রশক্তি একেবারেই প্রথম শ্রেণীর গুণীর উপযুক্ত; এ কথাটা চাপা রাখ্‌লে চল্‌বে না। ২৯ ভাদ্র ১৩১৯

আপনার স্নেহের রবি।

জনৈক শিল্পসেবী।

(হপ্‌সিং কোং; ৪ চৌরঙ্গী; কলিকাতা)

অজ্ঞাতবাস।

(গল্প)

(১)

পক্ককেশ লোলচর্ম্ম রামদুলালবাবু সে দিন সকাল বেলা তামাক খাইতে খাইতে বলিলেন "দেখ গিন্নী কাজটা ভাল হলো না।"

গিন্নী উমাশশী তখন শয্যাত্যাগ করিয়া একটি বালতিতে একতাল গোবর মিশাইয়া উঠানের চতুর্দ্দিকে ছড়া দিতে ছিলেন—দাসদাসী সত্বেও এ কাজ প্রতিদিন তিনিই করিতেন। স্বামীর অনুযোগ শুনিয়া তিনি সহসা স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন "কেন কাজটা ভাল হ'লো না! একরত্তি মেয়ে না হয় কটা চামড়াই আছে, তা বলে এত অহঙ্কার যে শ্বাশুড়ীকে শ্বাশুড়ী বলে জ্ঞান নেই একেবারেই বিয়ের ক'নে ঘরের গিন্নী হ'য়ে বসতে চায়? মাথা নীচু করতে বুঝি অপমান বোধ হলো; অমন বৌ আমি কিছুতেই ঘরে আনব না।"

পল্লিবালিকা রাধরাণী এই সকল অভিযোগের কোনটারই আসামী নহে। বালিকা প্রথমে শ্বশুর-গৃহে পদার্পণ করিয়া এবং কলিকাতার ন্যায় মহানগরীর শিক্ষিত মহিলাসমাজের সাদর সম্ভাষণ ও অভ্যর্থনার অসামঞ্জস্য অবলোকন করিয়া দিশেহারা হইয়া গিয়াছিল। মা বলিয়া দিয়াছিলেন যে সর্ব্বাগ্রে শ্বশুর শ্বাশুড়ীর পদধূলি গ্রহণ করিবে কিন্তু রাধারাণী প্রথমে শ্বাশুড়ী চিনিতে না পারিয়া অন্য কোন এক আত্মীয়াকে শ্বাশুড়ী জ্ঞানে সরল বিশ্বাসে প্রণাম করে ইহাতে উমাশশী হাড়ে হাড়ে চটিয়া যান। তারপর নানাকাজে তিনি ব্যস্ত হইয়া বেড়ান সুতরাং পুত্রবধূর প্রাপ্য প্রণামটা যখন প্রথম হইতেই তাঁহার পাওয়া হইল না তখন তিনি ক্রোধে ফুলিতে লাগিলেন। মুখখানি কালমেঘের মত

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী

From Pencil-Sketch
by Mr. J. Tagore.

Sey ne

গম্ভীর হইয়া রহিল। মাঝে মাঝে দাসদাসীদের উপর অকারণ জলদগম্ভীরস্বরে ভীষণ গর্জ্জন হইতে লাগিল। আনন্দের দিনে, উৎসবের মাঝে উমাশশীর এই আকস্মিক ভাবান্তর দেখিয়া অনেকেই বিস্ময়ান্বিত হইলেন। কেহ কেহ বৌ মনে ধরে নাই এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, গহনাগুলি মোটেই ভাল হয় নাই; সোনাটা মরা-সোনা বলিয়া অনুমান হইতেছে, এ প্রকার সমালোচনাও অপ্রকাশ রহিল না। গিন্নী বধূমাতার অনেকগুলি অমার্জ্জনীয় দোষ অন্বেষণ করিয়া আবিষ্কার করিলেন। সে গুলিকে অবলম্বন করিয়া পুত্র সত্যেন্দ্রকে বলিলেন "দেখ সতু তুমি আমার তেমন ছেলে নও চিরদিন আমায় মান্নি করে এসেচ। তোমাকে বলছি এ বৌ আমাদের সংসারের সুলক্ষণ নয়, তোমার আবার বিবাহ দিব।"

সত্যেন্দ্র তখন কলেজে পড়িতেছিল। ইংরাজিশিক্ষা করিলে বৃদ্ধ পিতামাতার প্রতি বড় একটা শ্রদ্ধা ভক্তি থাকে না, এমনি একটা সংস্কার তাহার মাথার মধ্যে অনেক দিন হইতে বদ্ধমূল ছিল। সুতরাং সে এই অযথা প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কোন যুক্তি বা কারণ অনুসন্ধান করিল না, যাহার বিপক্ষে এ অভিযোগ তখন তাহার সহিতও সত্যেন্দ্রের কোনও প্রকার পরিচয় ঘটে নাই। অতএব এই নিঃস্বার্থ ত্যাগের প্রলোভনে সে অম্লানবদনে উত্তর করিল "তার আর কি ?"

নববধূ ইহার বিন্দুবিসর্গ কিছুই বুঝিল না। বাপের বাড়ীর ঝিয়ের সঙ্গেই তাহার কথাবার্ত্তা,অপরকে দেখিলেই সে তৎক্ষণাৎ মাথার কাপড় টানিয়া মুখ নীচু করিয়া বসিয়া থাকে। প্রতিবেশীদিগের কন্যা ও বধূগণ যখন আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া বসে ও সহস্র প্রশ্ন করে, সে কি কি বই পড়িয়াছে ? শকুন্তলা ও সীতাচরিত্রের মধ্যে কতটা তফাৎ, সূর্য্যমুখীর স্বামিপ্রেম ও কুন্দনন্দিনীর ভালবাসা কোন্‌টা আদর্শ ? রবিবাবুর কবিতাগুলি তাহার কেমন লাগে ? শেলির সহিত রবিবাবুর তুলনা করিলে তাহার মতে কে বড় ? এমন সকল বড় বড় প্রশ্নই তাহারা জিজ্ঞাসা করে, আর রাধারাণীর মাথা ঘুরিতে থাকে, ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক হইয়া আসে, আশঙ্কায় তাহার বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করিয়া উঠে, মনে হয় ইঁহাদের সংসর্গ এখনই ত্যাগ করিয়া ছুটিয়া সে তাহাদের পল্লী-কুটীরে ফিরিয়া গিয়া হাপ ছাড়ে। মাতা তাহাকে এ সব কথা কিছুই শেখায় নাই। সকালে শয্যাত্যাগ, ঠাকুরের একশ আটনাম জপ, গুরুজনের পদধূলি গ্রহণ সে ভাল করিয়া শিক্ষা করিয়াছিল সংসারের কায কর্ম্ম করা ইহার উপর কোন্

বাঁটনা দিলে ভাল হয় এ গুলিই সে খুব ভাল জানিত সুতরাং এ বিষয় কেহ তাহাকে প্রশ্ন করিয়া ঠকাইতে পারিবে না এ বিশ্বাস রাধারাণীর ছিল। কিন্তু এ সভ্য সহরাঞ্চলে সে সকল কথার কোন আলোচনাই সে দেখিল না। ও সব কাজ মস্তকের অগ্রভাগ মুণ্ডিত, পশ্চাতে ঝুটিবাঁধা উৎকলবাসী ব্রাহ্মণের উপর ন্যস্ত। রাধারাণী ঝিয়ের কাণে কাণে বলিল "কবে আমাদের যাওয়া হবে?" ঝি এদিক ওদিক চাহিয়া বলিল "কেন দিদি কষ্ট হচ্চে?"

"হাঁ" বলিয়া রাধারাণী ঝিয়ের বুকে মুখ লুকাইল।

ঝি বলিল "এই ঘর যে তোমাকে বারমাস করতে হবে। এ যে এখন তোমার নিজের ঘর দিদি।" রাধারাণী কোনও উত্তর দিল না। অঞ্চলের খুঁট অঙ্গুলিতে জড়াইতে লাগিল।

যাইবার সময় রাধারাণী শাশুড়ীকে প্রণাম করিয়া পদধূলি লইতে গেল, শাশুড়ী পা সরাইয়া লইয়া বলিলেন "থাক্ থাক্ হ'য়েছে।" রাধারাণী ভয়-কম্পিত-নয়নে শাশুড়ীর মুখের দিকে একবার চাহিল, দেখিল সে মুখ গম্ভীর।

বিয়ের কনে যথারীতি তিনদিন পরে চলিয়া গেল। গাড়ীতে উঠিয়া রাধারাণীর মুখে হাসি বাহির হইল।

(২)

তাহার পর অনেকগুলি বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। কিন্তু রাধারাণীর শ্বশুর-ঘর করা হয় নাই। শ্বশুরালয় হইতে কেহই তাহাকে আনিতে গেল না। রাধারাণীর পিতা যতীন্দ্রবাবু যে সব তত্ত্ব করিলেন, সে গুলিও অবমানিত হইয়া ফেরত আসিল। রাধারাণীর পিতা মফঃস্বলে ওকালতী করিতেন। পূজা ও বড়দিনের বন্ধে জামাতাকে লইতে কয়েকবার কলিকাতা আসিলেন, কিন্তু বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া গেলেন। শেষবার কলেজে গিয়া জামাতা সত্যেন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কলেজ বন্ধ হইতে তখনও দুই তিন দিন অবশিষ্ট ছিল।

তিনি বলিলেন "বাবাজি এবার ছুটীতে আমাদের ওখানে যেতে হবে বিবাহের পর ত আর তোমার যাবার সুবিধা ঘটে নাই, বাড়ীতে বড়ই দুঃখ করে।"

সত্যেন্দ্র অবনতমস্তকে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সে অনর্থক জুতার অগ্রভাগ দিয়া মৃত্তিকাবদ্ধ একখানি পাথরকে বৃথা উঠাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

"কি বল ?"

"আজ্ঞে।"

"তাহ'লে আজই আমার সঙ্গে চল। এখন ত বন্ধের মুখ, বোধ হয় পড়াশুনার তেমন বিশেষ ক্ষতি হবে না ; কি বল ?"

"কলেজ বন্ধ হ'তে আর দুদিন বাকি, বৃথা কেন পারসেণ্টেজ্‌টা কমাই।"

"তবে না হয় দুদিন অপেক্ষা করি, কি বল ?"

"বাবাকে কি বলেছেন ?"

"তাঁহাকে ত অনেকবারই বলেছি, তিনি রাজি হন, কিন্তু বেনঠাকুরুণ মত দেন কৈ।"

সত্যেন্দ্র পকেট হইতে একটী পেন্সিল বাহির করিয়া দাঁতের মধ্যে বারবার চাপিতে লাগিল। সত্যেন্দ্রর সহপাঠী দুই এক জনযাহারা বাহিরে আসিতেছিল, তাহারা উপহাস করিয়া বলিল "কি হে আবার বিয়ের সম্বন্ধ চলচে না কি, বেশ বাবা ! এ রকম করে টাকা রোজগার করা মন্দ নয়।" সত্যেন্দ্র ক্রোধাবিষ্ট দৃষ্টিতে তাকাইলে তাহারা বুঝিল লোকটী ঘটক নয়, কোন বিশিষ্ট আত্মীয় হইবে। তখন জিভ কাটিয়া "Beg your pardon" বলিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল। তাঁহাদের কথা শুনিয়া যতীন্দ্রবাবুর বুক ধড়াস্‌ করিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তের জন্য তিনি সমস্ত অন্ধকার দেখিলেন। মাথা ঝিম্‌ ঝিম্‌ করিতে লাগিল। সাম্‌লাইয়া লইয়া বলিলেন "দেখ বাবাজি, পিতামাতার আদেশ পালন করা কর্ত্তব্য ; সে বিষয়ে আমি তোমাকে কোন কথাই বলব না। তবে একটা কথা বলি, তুমি লেখাপড়া শিখেচ নিতান্ত ছেলেমানুষটিও নাই। কিন্তু যাকে বিবাহ করেচ তার প্রতিও কি একটা কর্ত্তব্য নাই। তা'র ভালমন্দ দেখা কি তোমার উচিত নয় ? আজ পাঁচ বৎসর বিবাহ হ'য়েছে নানারূপ অছিলা আপত্তি করে এতদিন কেটেছে, আর কি ভাল দেখায় ?"

সত্যেন্দ্র শূন্যদৃষ্টিতে একবার সম্মুখের পথের দিকে চাহিল, একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া কলেজের দিকে তাকাইল, উভয়ে অনেকক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে যতীন্দ্রবাবু বলিলেন "তবে এখন আসি ? বাবাজি মনে করচ তুমি স্বাধীন নও, তবে কি আমার মেয়েটি স্বাধীন হবে ? দুঃখে ক্রোধে ঘৃণায় তখন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যাইতেছিল। তিনি আর বিলম্ব না করিয়া কলেজ প্রাঙ্গণ হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। সত্যেন্দ্র ভাবিতে ভাবিতে ক্লাসে গিয়া বসিল।

(৩)

অনেক চেষ্টা করিয়াও সত্যেন্দ্র বি এ পাশ করিতে পারিল না। উমাশশী একদিন বলিলেন "দেখ সতু তোর শ্বশুর ত কোন খোঁজখবর মোটেই নিলে না, তোর আর একটা বিয়ে দি। বৌ না হ'লে, বাড়ী যেন ফাঁকা ফাঁকা

সত্যেন্দ্র কোন উত্তর দিল না। আলমারী হইতে অকারণ একখানি বই খুঁজিতে ব্যস্ততা দেখাইল। উমাশশী পুত্রের পরিত্যক্ত জামাকাপড় গুলি গুছাইতে গুছাইতে বলিলেন "বৌ না হ'লে আর ভাল দেখায় না, লোকে বড় ঠাট্টা বিদ্রুপ করে। কর্ত্তা মারা যাবার পর থেকে বাড়ী যেন খাঁ খাঁ করচে আমি একলা টেঁকতে পারচি না। তোর কি মত ?"

সত্যেন্দ্র বইগুলি আলমারিতে সাজাইতে সাজাইতে বলিল "এ বেশ থাকা গেছে মা, আর বে-টে করে কাজ নাই। হয়ত সে আবার আর এক রকমের হ'য়ে বসবে তোমার সঙ্গে বনিবনা হবে না। কেবল অশান্তি বেড়ে উঠবে বইত নয়।"

উমাশশীর একটু রাগ ও অভিমান হইল। মনে মনে বলিলেন "বনাবনি হবে না। কেন ? আমি কি সকলের সঙ্গে ঝগড়া করে বেড়াচ্ছি। প্রকাশ্যে কোনও উত্তর দিল না। বিবাহের জন্য উমাশশীর ব্যস্ত হইবার অনেকগুলি কারণ দেখা দিয়াছিল।

বি, এ ফেল হইয়া সত্যেন্দ্র প্রথমে চাকরীর জন্য উমেদারী করে। কিন্তু তাহাতে যখন মনোমত কর্ম্ম জুটিল না, তখন স্বাধীনতার দোহাই দিয়া বাঙ্গালীর কর্ম্মশক্তিকে জাগ্রত করিবার নিমিত্ত সত্যেন্দ্র মাতার নিকট হইতে দশহাজার টাকা লইয়া ইংরাজপল্লিতে একটী ব্যবসা খুলিল। সকালে দুইটি অন্ন মুখে দিয়া সাহেব সাজিয়া কর্ম্মস্থলে রওনা হয়, আর রাত্রি একটার কম কোনও দিন গৃহে ফিরিতে পারে না। উমাশশী প্রায়ই খাবার ঢাকা দিয়া পুত্রের জন্য বসিয়া থাকেন। বসিয়া বসিয়া ঢুলিতে থাকেন, কখন পুত্র আসিবে, হয় ত সাড়া পাইবে না ; দাস দাসীরা সন্ধ্যা না হইতে হইতে শুইয়া পড়ে। হাজার ডাকে সাড়া পাওয়া দায়। এমনও হইয়াছে, দুই একদিন সকাল হইয়া গিয়াছে ; সত্যেন্দ্র বাড়ী আসে নাই। যেমন খাবার তেমন ঢাকা দেওয়া রহিয়াছে। উমাশশী হয়ত সেখানেই ঘরের মেঝের উপরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। জাগিয়া দেখেন পূর্ব্বাকাশ রক্তিম বরণ হইয়াছে। পথের ধারে ফুটপাথের উপর লোকজন আনাগোনা করিতেছে।

জলের কলের নিকট অনেকগুলি হিন্দুস্থানী ও উৎকলবাসী জড় হইয়া বকাবকী করিতেছে,কেহ ফুটপাথের উপর লোটা মাজিতেছে,কেহ একহাত প্রমাণ নিমডাল লইয়া দাঁতন করিতেছে, কেহ বা তাহাকে কোম্পানির গাছ ভাঙ্গিয়াছে বলিয়া শাসাইতেছে। একটা উড়ীয়া ভারির সহিত একজন মুসলমান ভিস্তির কলের নিকট কলহ বাধিয়া গেল। ভিস্তি তাহাকে ধাক্কা দেওয়ার একটা কলসী কলের গাত্রে লাগিয়া একবারে দুইখানা। সেদিন উমাশশীর নিকট এসব ঘটনা যেন কেমন নূতন ঠেকিল। যাহার কলসী ভাঙ্গিল তাহার জন্য উমাশশীর দুঃখ হইল। তিনি ভিস্তির উপর হাড়ে হাড়ে চটিলেন। পীড়নকারীর উপর রাগ ও পীড়িতের উপর সহানুভূতির ভাবটি সেদিন উমাশশীর অত্যন্ত স্বাভাবিক হইয়া উঠিল। বধূমাতার প্রতি তাহার আচরণটা সত্যসত্যই অত্যাচার বলিয়া মনে হওয়ায় দুঃখিত হইলেন। কিন্তু বৌমা শাশুড়ীর প্রাপ্য কর্ত্তৃত্ব ও সম্মানকে, বিনয় ও মিনতির দ্বারা বড় করে নাই, ইহাই তাঁহার নিরুদ্ধ অভিমানকে তখনও মাঝে মাঝে উদ্বুদ্ধ করিতেছিল। তারপর ঢাকা দেওয়া খাবারগুলি তিনি খাটের নীচে সরাইয়া রাখিলেন ও একটী গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া নীচে নামিয়া গেলেন। ঝিকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "মনুর মা, সতু এসে ফিরে যায়নি ত? কাল আমার একাদশী গিয়েছিল কিনা বসে বসে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি।"

"না দাদা বাবু ত আসেন নি। তা হ'লে শুনতে পেতুম।"

"তোরা সন্ধ্যা না হতেই ঘুমিয়ে পড়িস। বাবা, এত ঘুম কোত্থেকে আসে? ধন্নি তোদের ঘুম।"

ঝি বুঝিল মা ঠাকরুনের রাগটা আজ তাদেরই স্কন্ধে পড়বার সুযোগ অনুসন্ধান করচে বেশী কথা কওয়া হবে না। সে ধীরে বলিল "আচ্ছা মা, দাদাবাবুর কি সারারাত্রি কাজ? এমন ধারা কাজত কারো কখন শুনিনি। অত খাটলে দুদিনে যে শরীর মাটি হয়ে যাবে। আমরাত গতর খাটিয়ে খাই— আমরাই পরি না। নটা হো'ক, দশটা হোক, এযে সারারাত্রি কেটে যায়, তবু কিনা দাদাবাবুর কাজ আর শেষ হয় না। তারপর সুর ফিরাইয়া বলিল তুমি মা নেমে নিয়ে একটু জলটল মুখে দাও, তুমিও দেখচি দিন দিন দাদাবাবুর জন্য ভেবে ভেবে না খেয়ে কেমন হয়ে যাচ্ছ। উমাশশীর বুকের ভিতর যে কি জ্বালা, তাহা তিনি মুখে প্রকাশ করিতে পারেন না। মুখ বুজিয়া আস্তে আস্তে স্নান করিয়া উপরে গেলেন। ঝি বুঝিল আজ গতিক বড় সুবিধা নয়। অধিক রাত্রি জাগরণ, অনাহার নানারূপ দুশ্চিন্তায় তাঁহার মাথা ঘুরিতেছিল। এই সকল

কারণের মূলে তিনি নিজের অন্যায় অধিক করিয়া দেখিতে পাইলেন। প্রতি-কারের সূচনা করিলেই পুত্রবধূর উপর তাঁহার রাগ হইল। কেন সে নিজে আসিল না, কেন আসিবার জন্য বিনয় করিয়া তাঁহাকে পত্র দিল না; তাহা হইলে কি আমি তাহাকে এতদিন না আনিয়া পারিতাম। সে অভিমান করিয়া বাপের বাড়ী বসিয়া রহিল. ইহা কি তাহার গুরুতর দোষ নয়। সে আসিলে কি তাড়াইয়া দিতাম, না সতু এমন করিয়া শেষরাত্রে বাড়ী আসিতে সাহস করিত। মনে করিলেন একবার ঝিকে না হয় পাঠাই, পরক্ষণেই আশঙ্কা হইল আজ সাত বৎসর তাহার কোন সংবাদ লই নাই, কতবার তাহার পিতাকে অপমান করিয়া ফিরাইয়া দিয়াছি। আজ কি বলিয়া ঝি গিয়া সেখানে দাঁড়াইবে? কেন বৌমার নিজের ঘরে নিজে আসিবে, তাহাতে তার মান অপমান কি? কিন্তু আমি যে তাকে একদিনের জন্য নিজের ঘর বুঝিবার অবসর দিইনি—কতরকম চিন্তাই উমাশশীর মনে আসিতে লাগিল। ঝি পা টিপিয়া টিপিয়া উপরে আসিয়া দেখিল উমাশশী ভিজা মাথায় মেঝের উপর বসিয়া ভাবিতেছে। চক্ষু দিয়া অশ্রু গড়াই-তেছে। দূরে মিছরী ভিজান, ফলমূল যেমন অবস্থায় সে রাখিয়া গিয়াছে, তেমন ভাবেই পড়িয়া আছে, কোনটিও স্পর্শ করেন নাই। ঝির সম্মুখে যাইতে ভয় হইল। কিন্তু উমাশশীর কষ্ট দেখিয়া তাহার চক্ষে জল আসিল, সে আর থাকিতে পারিল না, ধীরে ধীরে নিকটে গিয়া দাঁড়াইল। উমাশশীর সংজ্ঞা নাই। তিনি নিস্পন্দ নির্ব্বাক। ঝি মৃদুকণ্ঠে ডাকিল "মা ঠাকরুণ, একটু জল মুখে দাও, বেলা অনেক হলো?"

"এ্যাঁ জল, কেন?"

ঝি বলিল "মাঠাকরুণ কাল থেকে একাদশী করে আছ, বেলা অনেক হ'য়েচে, দিদিমনিকে কি আজ একবার নিয়ে আসব?" ঘরের কার্ণিশের উপর একটা টিক্‌টিকি শীকার অন্বেষণে নিস্তব্ধ হইয়াছিল, সহসা সে টিক্‌টিক্ করিয়া উঠিল। উমাশশী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "একবার না হয় নিয়ে আয়।" বাগবাজারের নিকটেই সত্যেন্দ্রের ছোট ভগিনী রঙ্গিণীর শ্বশুরবাড়ী। খুব কমই সে বাপের বাড়ী আসে। যখন আসে সকালে আসিয়া বৈকালে চলিয়া যায়।

রঙ্গিণী যখন আসিল তখন বেলা দশটা বাজিয়া গিয়াছে। পথে গাড়ী ঘোড়া ও ট্রামের অত্যন্ত ভীড়। কুঠিওয়ালারা অপিস চলিয়াছে, ইস্কুল কলেজের ছেলেরা মাষ্টার প্রোফেসারের সমালোচনা করিতে করিতে চলিয়াছে। কেহ নূতন কবিতা

লিখিতে অভ্যাস করিতেছে মাত্র, সে বন্ধুকে গ্যাসপোষ্টের নিকট দাঁড় করাইয়া কবিতা শুনাইতেছে, মাঝে মাঝে বন্ধুর মুখের ভাবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে "কেমন লাগ্‌ল ?"

(৪)

রঙ্গিণী আসিয়া উমাশশীর গায়ে হাত দিয়া দেখিল অত্যন্ত জ্বর, গা আগুনের মত গরম। নয়নে অশ্রু গড়াইতেছে। সে ধীরে ধীরে ডাকিল "মা আমি এসেছি" উমাশশী চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কন্যার অঙ্গে হাত দিয়া স্পর্শ করিয়া যেন কতকটা শান্তি পাইলেন, বলিলেন, ভাল আছিস ? বড় জ্বর হয়েছে বস মা বস।"

রঙ্গিণী মাতার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "কাল একাদশী গিয়েছে, ঝিয়ের মুখে শুনলুম, এখনও মুখে একটু জল-পর্য্যন্ত দাওনি, এমন করে কদিন বাঁচ্‌বে মা ?" উমাশশীর জ্বরক্লান্ত বিশীর্ণ অধর-প্রান্তে ক্ষীণ হাসি দেখা দিল। তিনি নয়ন মেলিয়া কন্যার মুখের দিকে চাহিলেন ধীরে ধীরে বলিলেন, "এখনও বাঁচ্‌তে হবে ? আর সহ্য হয় না মা। সতুর ব্যাপার দেখে আর আমার বাঁচ্‌তে সাধ নেই।"

রঙ্গিণী মাতার ইতস্তত বিশৃঙ্খল কেশগুলি ধীরে ধীরে যথাস্থানে সন্নি-বেশিত করিল ; বলিল, "মা একটু জল খাও, নইলে, তোমার জ্বর কম্‌বে না। উমাশশী কন্যার স্নেহানুরোধ এড়াইতে পারিলেন না। জল খাইয়া, উঠিয়া বসিলেন। এমন সময় সত্যেন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার মুখ শুষ্ক, কেশ উচ্ছৃঙ্খল, চক্ষু লাল, দেখিতে বিশ্রী হইয়াছে, যেন সারারাত্রি মোটেই নিদ্রা যায় নাই। রঙ্গিণীকে দেখিয়া সত্যেন্দ্র যেন একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইল। বলিল "তুই কখন এলি ? এমন সময় তুই ত আসিস না।"

"দাদা, তোমার জন্য ভেবে-ভেবে মা আর বাঁচ্‌বে না। তুমি কাল বাড়ী এ নাই, মা একাদশী করেছিলেন, সারারাত্রি খাবার কোলে করে বসে-বসে সকালে খুব জ্বর। অভিমান করে জল-পর্য্যন্ত মুখে দেন নাই।"

সত্যেন্দ্র মাথা চুলকাইতে-চুলকাইতে একখানি চেয়ারে গিয়া উপবেশন করিল, অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া কি ভাবিল ; বলিল, "ডাক্তার আনতে পাঠিয়েছিস ?"

"না আমি ত এই ঘণ্টা-খানেক এসেচি।"

সে তখন চেয়ারখানি টেবিলের নিকট টানিয়া একখানি চিঠি লিখিল, ঝিকে ডাকিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিল "তুই এখনি হরকালী ডাক্তারের বাড়ী

যা তাঁকে শিগ্‌গির—ডেকে নিয়ে আয়। আমার অত্যন্ত জরুরী কাজ আছে, বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে পারব না।"

"সে কি! দাদা আবার কি এখনি বেরুতে হবে?"

"হ্যাঁ। বিলাত থেকে একজন বড়দরের ব্যবসাদার এসেছেন, তাঁকে নিয়ে কাল সাররাত্রি ঘুরচি আবার বারটার সময় দেখা করবার কথা আছে। যেতেই হবে। আমি যে একজন বড়দরের বিচক্ষণ ব্যবসাদার, সে আমার কথাবর্ত্তা তা শুনে বুঝে নিয়েচে।"

রঙ্গিণী নির্ব্বাক হইয়া ভ্রাতার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল। তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া মুখে কথা সরিল না। উমাশশী এতক্ষণ কোন কথাই বলেন নাই, তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, "কাল থেকে কিছু খাস্‌নি, নেয়ে তাড়াতাড়ি যা হয় দুটো খেয়ে যা। রঙ্গিণীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন "যা মা রঙ্গিণী তুই নিজে গিয়ে একটু যোগাড় করে নিয়ে সতুকে দুটো ভাত খাইয়ে দে" মায়ের কথায় আপত্তি করিয়া সত্যেন্দ্র উত্তর করিল, "এখন খাওয়া-দাওয়ার হাঙ্গামা করতে গেলে ঢের দেরী হয়ে যাবে মা।" তা'হ'লে সাহেবের সঙ্গে কথার ঠিক থাকবে না" এ কথায় মা কোনও উত্তর দিলেন না, অনেকক্ষণ পরে বলিলেন "না হয় একটু জল খেয়ে যা।" সত্যেন্দ্র জল খাইয়া বলিল, "মা পাঁচশো টাকার বিশেষ দরকার একটা জিনিস আনবার জন্য আজ বলাতা মেলে আগাম পাঠাতে হবে, নইলে, সে জিনিষটা ঠিক সময় এসে পৌছবে না।" উমাশশী দ্বিরুক্ত করিলেন না, বিছানার নীচে হইতে লোহার সিন্দুকের চাবিটি বাহির করিয়া পুত্রের হাতে দিয়া বলিলেন, "দুটি খেয়ে গেলে হ'তো না।" সত্যেন্দ্র সিন্দুক খুলিয়া পাঁচশোর জায়গায় বোধ আটশো টাকা লইল; পকেট হইতে ঘড়ী বাহির করিয়া বিড়-বিড় করিয়া কি হিসাব করিল, পরে বলিল, "এখনও ডাক্তার এলো না—বালিগঞ্জ পৌছাতে প্রায় দেড়ঘণ্টা লাগবে। এখন সাড়ে দশটা আর দেরী কর্‌তে পারি না।"

রঙ্গিণী বলিল "ডাক্তার কি বলেন, শুনে যাও না দাদা? "না আর অপেক্ষা কর্‌লে সব পণ্ড হয়ে যাবে" বলিয়া সে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। জননীর নয়নপ্রান্তে কয়বিন্দু অশ্রু জমিয়াছে দেখিয়া, রঙ্গিণী অঞ্চল দিয়া তাহা মুছাইয়া দিল। ভ্রাতার আচরণে মা যে মনে মনে অত্যান্ত ব্যাথা পাইয়াছেন, তাহা রঙ্গিণীর বুঝিতে বাকি রহিল না। তারপর দুইদিন সত্যেন্দ্র বাড়ী ফিরিল না, একখানি পত্রে লিখিয়া জানাইল, সাহেবের সঙ্গে হাজারীবাগ চলিলাম, বিশেষ প্রয়োজন।

উমাশশীর জ্বর ত্যাগ হইল না, ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। জ্বরের প্রবলতার মধ্যে কেবল মাঝে মাঝে, এক একবার ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করেন "সতু এলি?—না বলে কয়ে কি বিদেশ যায় বাছা—অমন করে আর ব্যবসা করতে হবে না—রঙ্গিণী তুই যা নিজে গিয়ে সতুকে খাওয়াগে বলিয়া" কন্যার সেবাপরায়ণ হাতখানি নিজের অঙ্ক হইতে তাড়াতাড়ি নামাইয়া দেন। রঙ্গিণী পুনরায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলে "মা, দাদা ত আসেন নাই—তুমি ও সব কি বল্‌চ?" উমাশশী আর কোন উত্তর দেন না, নির্ব্বাক হইয়া নিরুপায় ভাবে কন্যার মুখের প্রতি একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকেন—অন্তরের সমস্ত বেদনা যেন সে দৃষ্টি আচ্ছন্ন করিয়া আসে,তথন কন্যার হাতখানি টানিয়া ব্যাকুল ভাবে বক্ষের উপর পুনরায় চাপিয়া ধরেন এবং নিমীলিত নয়ন হইতে অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়ে। জননীর এরূপ অবস্থা দেখিয়া রঙ্গিণী বড়ই চিন্তিত ও ভীত হইয়া পড়িল। ডাক্তার তিন দিনের দিন বলিয়া গেলেন "জ্বরের প্রকোপ খুব বেশী মাথারও গোলমাল রহিয়াছে খুব সাবধানে রাখিবেন। সত্যেন্দ্রবাবু কবে আসিবেন?" রঙ্গিণীর স্বামী রাধাবিনোদবাবু উপস্থিত ছিলেন, বলিলেন "কিছু সংবাদ পাওয়া যায় নাই, বোধ হয় আজকালের মধ্যেই এসে পড়বেন।"

পাঁচ দিন পরে সত্যেন্দ্র বাড়ী আসিয়া দেখিল, মায়ের অবস্থা খুব খারাপ—জ্বর বিকারে দাড়াইয়াছে—এবং বিকারের মধ্যে যে সমস্ত প্রলাপ বক্সিতেছেন সবই তাহার ও রাধারাণীর কথা। মায়ের অসুখ হওয়াটা যেন অত্যন্ত অন্যায় বলিয়া সত্যেন্দ্রের মনে হইল। সত্যেন্দ্র আসিবার পর হইতে ক্রমে ক্রমে জ্বরের প্রকোপও হ্রাস পাইতে লাগিল—কিছুদিন পরে ডাক্তার বলিলেন "রোগী অতিশয় দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছেন—জ্বর যদিও নাই, তবে বায়ুপরিবর্ত্তন নিতান্ত প্রয়োজন! পথ্য করিবার দিনকয়েক পরে অনন্যোপায় হইয়া সত্যেন্দ্র, মাতা ও ভগিনীকে সঙ্গে লইয়া বৈদ্যনাথ গমন করিল। উমাশশী ইহাতে যেন অনেকটা শান্তি পাইলেন।

বৈদ্যনাথ জংস্‌নের নিকটেই সত্যেন্দ্র একখানি বাড়ী ভাড়া লইল। যে বাড়ীখানি লইল, তাহার পার্শ্বের বাড়ীখানিতে যাঁহারা ছিলেন তাঁহাদের সহিত অল্প দিনেই ইঁহাদের খুব আত্মীয়তা হইয়া উঠিল। বাড়ীর নিকট দিয়া দেওঘর লাইন গিয়াছে। অল্পদূরেই বড় লাইন। সম্মুখে দিগোড়ীয়া পাহাড়; অদূরে ময়ূর-কণ্ঠ ত্রিকুট মস্তক উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান। এখানে আসিয়া উমাশশী যেন নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন! মনে মনে নিজের পীড়িত-অবস্থাটাকে

করিয়া তাঁহার নিকট বসিয়া কথাবার্ত্তা বলে নাই—অনেক দিন সে এমন করিয়া সংসারের প্রতি ফিরিয়া দেখে নাই, পলাতক পাখী আজ যেন বহু আয়াসে পুনরায় পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়াছে। মুক্ত আকাশ, মুক্ত বাতাস, প্রকৃতির অপরূপ শোভা সম্পদ, জননী ভগিনীর অকৃত্রিম স্নেহ মমতা কিছুতেই সত্যেন্দ্র যেন নিজের অভাব পূরণ করিতে পারিতেছিল না। তবে একটী আকর্ষণ সম্প্রতি তাহার মন অপহরণ করিয়াছিল—তাহা সে কাহার নিকট প্রকাশ করিতে পারিল না।

উমাশশী বলিলেন—"সতু বেশ জায়গা, এ দেশ, ত্যাগ করে আমার আর কোথাও যেতে মন সরে না। মাঝে মাঝে বাবা বৈদ্যনাথকে দেখে আসচি আনন্দে হৃদয় ভরে যাচ্চে।"

রঙ্গিণী বলিল "এই সব দেশে বাস কর। দুধ যেমন সস্তা, জল হাওয়া তেমন মিষ্টি।"

পাশের বাড়ীর মেয়েটী বেড়াইতে আসিয়া উমাশশী ও রঙ্গিণীর পশ্চাতে অল্প ঘোমটা দিয়া বসিয়া কথাবার্ত্তা শুনিতে ছিল, সে ধীরে ধীরে অত্যন্ত মৃদু কণ্ঠে বলিল "আমরা আজ তিনমাস এসেচি কোন অসুখ বিসুক নেই তবু তখন ভাল জল—হাওয়া পড়ে নি। বাবা বলেন—কাছাকাছির ভিতর এমন জায়গা বড় বেশী নেই।"

সত্যেন্দ্র অত্যন্ত আগ্রহ ও উৎসাহ প্রকাশ করিয়া তাহার প্রতি চাহিয়া উত্তর করিল "মধুপুরও খুব ভাল—ওখানে খাওয়া দাওয়া সব রকম মেলে।"

সত্যেন্দ্র খুব আশা করিয়াছিল, যে তার উত্তরের বিরুদ্ধে বালিকা নিশ্চয়ই আপত্তি করিবে। তাহার সহিত কথা কহিবার নিমিত্ত সত্যেন্দ্র অনেকদিন এরূপ অযাচিত ভাবে অন্যের প্রশ্নের উত্তর দিতে ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বা সরম মনে করে নাই। কিশোরী তাহার দিকে না চাহিয়া রঙ্গিণী পিঠে হাত দিয়া করুণকণ্ঠে বলিল "হতে পারে মধুপুর ভাল। কিন্তু সকলের সঙ্গেত আর সকলের মতের মিল হয় না।"

এত সংক্ষেপেই যে বালিকা এই প্রশ্নের মীমাংসা করিবে সত্যেন্দ্র তাহা আশা করে নাই। সে মনে মনে করিয়াছিল, আজিকার এই কথার প্রত্যুত্তরে অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা চলিবে। বালিকাও তাহার পিতার মতের বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই তীব্র প্রতিবাদ উপস্থিত করিয়া সত্যেন্দ্রের সহিত একটা তর্কের মধ্যে পড়িয়া তাহার লজ্জার বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিবে। কিন্তু যখন তাহা হইল না তখন সে

আবার আগ্রহভরে অপেক্ষা করিতে লাগিল। এমন ঘটনা ইতিমধ্যে অনেক বার হইয়া গিয়াছে—এ সব তুচ্ছ ব্যাপার উমাশশীর মনোযোগ বড় একটা আকর্ষণ করিত না। কারণ পুত্রের এই 'মেলামেশা' ভাবটি উমাশশীর বড় মধুর লাগিত। পুত্র তাঁহার নিকট বসিয়া কথোপকথন করিলে, যেন তাঁহার সকল অভাব, সকল দুঃখ দূর হইত। একটা প্রকাণ্ড অভাব, যে তাঁহার সমস্ত আশা ভরসা আচ্ছন্ন করিয়াছিল, তাহা উমাশশী বিলক্ষণ অনুভব করিতেন। নিজে যে অন্যায় করিয়াছেন, তাহা মাঝে মাঝে তাঁহার মনে হইত। কিন্তু নিজের অন্যায় হাজার বুঝিলেও কোন দিন সহানুভূতি প্রকাশ করা, তাঁহার স্বভাবের বিপরীত ছিল। সে জন্য তাঁহার মনের ভিতর যে কষ্ট হইত, আজকাল পুত্রের সদাসর্ব্বদা উপস্থিতি তাহা অনেকটা কমাইয়া আনিয়াছিল। কিন্তু সত্যেন্দ্র যে খুব সুখে ছিল তাহা বোধ হইত না। মা ও মেয়ের মধ্যে সকল সময় গল্পগুজব চলিত। সত্যেন্দ্র বড় একটা তাহাদের সহিত যোগ দিত না। যখন পাশের বাড়ীর মেয়েটি বেড়াইতে আসিত তখন সত্যেন্দ্র তাহাদের মধ্যে গিয়া মিলিত। মুখের উপর বেশ একটা প্রসন্নতার ভাব ফুটিয়া উঠিত। উমাশশীর নিকট পুত্রের এই সরল আচরণটি বড়ই মধুর ও স্বাভাবিক মনে হইত।

সেদিন উমাশশী মেয়েটিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "অমলা,—কই তোমার বাবা এলেন না? কাল না তাঁর আসবার কথা ছিল?" কিশোরীর নাম অমলা, বড় শান্ত ও ধীর বয়স উনিশ কুড়ি হইবে। অমলার মধ্যে বেশ একটী সরম ও সংযমের ভাব সদাসর্ব্বদা পরিলক্ষিত হইত। অমলা আস্তে আস্তে বলিল "বাবা চিঠি দিয়েছেন, তাঁর হাতে একটা বড় মকর্দ্দমা আছে, সে জন্য এখন আস্‌তে পেলেন না।"

(৬)

উমাশশী যে দিন বৈদ্যনাথে আসেন, তাহার দুই তিন দিন পূর্ব্বেই অমলার পিতা চলিয়া গিয়াছেন। সেই পর্য্যন্ত আজ প্রায় একমাস হইতে চলিল আর আসিতে পারেন নাই। নিকটেই অমলাদের একঘর আত্মীয় বাসা লইয়া আছেন, তাঁহারই তত্ত্বাবধানে তিনি এঁদের রাখিয়া গিয়াছেন। অমলার মাতা খুব বুদ্ধিমতি। অমলার একটী দুই বৎসরের ভাই, একটি ঝি, বাড়ীর একজন পুরাতন সরকার ও স্থানীয় বামুন, চাকর লইয়া তাহাদের বৈদ্যনাথের ক্ষুদ্র সংসার।

রান্নার ভার লইয়াছিল। সুতরাং পরিবেশনের সময় সে জড়সড় হইয়া একধারে গিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মা অনেকবার তাহাকে পরিবেশন করিতে বলিল, কিন্তু কোনও মতেই সে রাজি হইল না; বরং মায়ের কাণে কাণে বলিয়া দিল "সে যে রাঁধিয়াছে এ কথা প্রকাশ হইলে সে মাথা মুড় খুঁড়িয়া মরিবে। রঙ্গিণী মধ্যে কি করিতে আসিয়া একবার দেখিয়া গিয়াছিল, যে অমল কটিদেশে কাপড় জড়াইয়া স্নান করিয়া সমস্ত কেশগুলি মস্তকের সম্মুখভাগে আনিয়া গুচ্ছাকারে বাঁধিয়া রন্ধনকার্য্যে খুব মনোসংযোগ করিয়াছে। সে দূর হইতে ইহা দেখিয়া চলিয়া গিয়াছিল।

উমাশশী অমলার মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এতদিন এসেছেন কই একদিন ও জামাই এলো না? অমলা মেয়েটি বড় ভাল—ও দুপুর বেলা গিয়া গল্পগাছা করে, আমার বড় ভাল লাগে।"

অমলার মাতা উত্তর দিবার পূর্ব্বেই রঙ্গিণী বলিল "অমলা মহাভারত পড়ে এত মিষ্টি লাগে যে, কি বলবো—ওর বড় ভাব আসে—কোন খানটা মা, মনে পড়চে না? অমলা যে প্রায় সেইখানটাই পড়ে" অমলা ধীরে ধীরে বলিল কেন রঙ্গিণী দিদির কি সেখানটা পড়ে দুঃখ হয় না।" সুতরাং উমাশশীর প্রশ্ন এখানেও চাপা পড়িয়া গেল।

সত্যেন্দ্র অমলাকে সমর্থন করিবার এমন সুযোগটি ত্যাগ করিতে পারিল না। সে তখন আহারে বসিয়াছে, মুহূর্ত্তের ভিতর সহানুভূতিসূচকস্বরে বলিল 'এমন কোন লোক নাই, যে একজন সতী-নারীর সভাস্থলে নির্য্যাতন নীরবে সহ্য করতে পারে—শুধু তাই নয়, সেখানে আবার তাঁর স্বামীরা বর্ত্তমান! দুঃখের সঙ্গে রাগ হয়।"

অমলা সে কথার কোন উত্তর না দিয়া বরং অল্প উপেক্ষার ভাব দেখাইয়া উমাশশীর প্রতি বেদনা-করুণ দৃষ্টিতে চাহিল। বলিল "ওখানে দ্রৌপদীর অসাধারণ স্বামীভক্তিই প্রকাশ পে'য়েছে। স্বামীর উপর অভিমান না ক'রে ভগবানের উপর একান্ত নির্ভরতাই দেখিয়েছে, কি বল মা?" এ কয় দিনে অমলা উমাশশীর হৃদয় অনেকখানি অধিকার করিয়াছিল। সুতরাং উমাশশীর সহিত এতটা ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল যে, তাঁহাকে মা বলিয়া সম্বোধন না করিলে যেন উমাশশীর স্নেহকে খাট করা হইত।

অমলার মাতা সত্যেন্দ্রকে নিজের পুত্রের মত যত্ন করিয়া খাওয়াইতে ছিলেন। তিনি চকিতে একবার অমলার মুখের প্রতি তাকাইয়া পরক্ষণেই সত্যেন্দ্র মুখের

দিকে চাহিলেন। সত্যেন্দ্র তখন অমলার কথা মনে মনে আন্দোলন করিতে-ছিল। নিজের জীবনের অভ্যন্তরে যে, এমন একটী অন্যায় বরাবর চাপা পড়িয়া-ছিল আঘাত পাইয়া হঠাৎ বড় অসময়ে তাহা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল—তাহার সমস্ত বুদ্ধিশুদ্ধি কেমন যেন একরকম হইয়া গেল—তখন তার নিজের কথাকে মোটেই যুক্তি দিয়া দাঁড়করাইব সামর্থ্য রহিল না—নির্ব্বোধের মত উত্তর করিল "তাঁরা বড় একটা স্ত্রীর সম্মান বা মর্য্যাদা বুঝিত না—ধর্ম্ম এবং যুদ্ধই তাঁদের তখনকার দিনে একমাত্র লক্ষ্য ছিল।

দুর্ব্বল প্রতিদ্বন্দ্বী যেমন সবল প্রতিপক্ষকে আপনার সীমার মধ্যে আহ্বান করিয়া নিজ শক্তি দেখাইবার গর্ব্ব করিয়া থাকে—আজ অমলাও জননীর পাশে থাকিয়া সত্যেন্দ্রকে উল্লেখ করিয়া তাহার অসামঞ্জস্য উত্তরগুলিকে সর্ব্বসমক্ষে মলিন ও নিষ্প্রভ করিয়া দিতে লাগিল।

অমলা মাতার দিকে ফিরিয়া অল্প উচ্চকণ্ঠে উত্তর করিল "তখনকার লোকেরই বরং স্ত্রীর মান সম্মান রক্ষার জন্যই যুদ্ধ বিগ্রহ কর্‌তেন। সেটা কি ধর্ম্মের জন্য নয়? কি বল মা?

অমলার মাতা উত্তর দিবার পূর্ব্বেই উমাশশী বলিলেন "তাইত সীতার জন্যই রামায়ণ, আর দ্রৌপদীর জন্যই অতবড় মহাভারত, একথা কেনা জানে?"

সত্যেন্দ্র যদিও হারিয়া গেল তথাপি যাহার নিকট হারিল পরাজয় তাহার নিকট যেন বাঞ্ছনীয়। ভাবিল এমন করিয়া যদি কিশোরীর সহিত তাহার বেশ একটু আলাপ হয় তবে সে যেন হাত বাড়াইয়া স্বর্গ পায়। উপেক্ষার ভিতর দিয়া যদি দয়া হয়—তবে তাহাতেও সত্যেন্দ্রর যেন কোনও লজ্জা ছিল না।

উমাশশী আহারে বসিয়া নিজের বৌয়ের ও তাহার পিতার অনেক অযথা নিন্দা করিলেন। বৌয়ের মাটিও, যে ভাল লোক নন, তাহাও যে না বলিলেন তাহাও নয়। মাঝে মাঝে অমলা যে চমৎকার মেয়ে—তাহার বৌটি যদি এমন হইতে, অল্প স্বুরু মিহি করিয়া অদৃষ্টে দোহাই দিয়া বলিলেন "তাহা হইলে কি আজ তার ঘর—এমন শূন্য হ'য়ে থাকৃত।"

ইহার কিছুদিন পরেই রঙ্গিণীর শাশুড়ীর হঠাৎ অত্যন্ত অসুখ হয় সুতরাং সে কলিকাতা চলিয়া আসে। তখন অমলা না হইলে উমাশশীর এক দণ্ড চলে না। অমলাও উমাশশীর যথেষ্ট সেবা করে। মধ্যে একদিন উমাশশীর অসুখ করে অমলা সারারাত্রি জাগিয়া তাহার সেবা করে। উমাশশী বলিলেন "অম" তিনি আদর করিয়া তাঁহাকে ঐ নামে সম্বোধন করিতেন "আমরা যখন এখান থেকে

চলে যাব, তুমি শ্বশুরবাড়ী যাবে,সেখান থেকে তোমার পাতান মাকে পত্র দিবে।"
অমলাও ঘাড় নাড়িয়া বলিল "দিব।"

অমলা একদিন বলিল "মা তোমার বৌকে কিন্তু এখন নিয়ে আসা উচিত। এমন করে আর ফেলে রাখা ভাল দেখায় না।"

উমাশশী বলিলেন—"তোমার মত এমন সোণার বৌ কি সে মা, যে, শাশুড়ী না হয় রাগ করেচে, আমি কেন যাই না—তা হবে না, তাহলে যে তার মানের হানি হবে এ কথায় অমলার চক্ষু ছল ছল করিয়া আসিল সে অন্যদিকে মুখ ফিরাইল।

রঙ্গিণীর শাশুড়ী সারিয়াছেন। আসিয়া অবধি রঙ্গিণী মাকে একখানিও পত্র লিখিতে পারে নাই। আজ মধ্যাহ্নে পত্র লিখিবে স্থির করিল। বাক্স খুলিয়া চিঠির কাগজ বাহির করিতে গিয়া দেখিল, অমলার একখানি বহি তাহার নিকট রহিয়াছে! বৈদ্যনাথ হইতে আসিবার পূর্ব্বদিন সেখানি সে অমলার নিকট হইতে পড়িতে লইয়াছিল। কিন্তু সহসা তাড়াতাড়ি তাহাকে আসিতে হওয়ায় সেখানি ফেরৎ দিতে বিস্মৃত হইয়াছিল। বহিখানি তুলিয়া নাড়া-চাড়া করিতেই, তাহার ভিতর হইতে একখানি পত্র মেঝের উপর পড়িয়া গেল। রঙ্গিণী মনে করিল অমলা বোধ হয় ভুলিয়া স্বামীর পত্রখানি পুস্তকের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিল ; দেবার সময় আর মনে ছিল না। অমলা বড় চাপা মেয়ে কিছুতেই সে তার স্বামীর কথা বল্‌ত না—রঙ্গিণীর মনে মনে অত্যন্ত আনন্দ হইল, ভাবিল যাহা মানুষ গোপন ক'রে রাখ্‌তে চায়, কি আশ্চর্য্য! কত অসাবধানেই তাহা ধরা পড়ে যায়। পত্রখানির খামের উপর ইংরাজি শিরোনামা লেখা ছিল সুতরাং রঙ্গিণী খামের মধ্য হইতে চিঠিখানি বাহির করিয়া পড়িতে লাগিল।

বোধহয় এতদিনে তাঁহারা আসিয়াছেন। আমার মাথার দিব্য তুমি কোন রকমে তাঁহাদের নিকট আত্ম-প্রকাশ করবে না। রাধারাণীকে এই অজ্ঞাতবাস করতেই হবে। এতটা লুকোচুরি করবার মোটেই প্রয়োজন ছিল না; যদি তোমরা আমার সঙ্গে চলে আসতে সম্মত হতে। তুমি জামাই দেখবার এবং বেয়াণের অভিমতটা বুঝবে বলে রয়ে গেলে—বোধহয় তাঁহাদের সঙ্গে এতদিনে বেশ আলাপ পরিচয় হয়েচে। একটা কথা স্মরণ রেখ যে রাধারাণীকে খুব সাবধানে রাখতে হবে। অদৃষ্টের হাত কেহ এড়াইতে পারে না। তাঁহাদিগকে যতদূর তোষামোদ করবার করিয়া অবমানিত হইয়াছি তাহা তোমার অজ্ঞাত নাই। সে সব কথা সদাসর্ব্বদা স্মরণ করিও—কোন মতে যেন রাগারাগির কথা মুখ

হ'তে বাহির না হয়। মেয়ের কষ্টের জন্য কে এমন বাপ মা আছে, যে হৃদয়ে ব্যথা পায় না। সত্যেন্দ্র ছেলেটি বেশ দেখেই মেয়ে দিয়াছিলাম। কিন্তু এমন হ'বে কে জানিত? মেয়ে যখন গর্ভেধারণ করিয়াছ তখন লাঞ্ছনা, অপমান পদে পদে সহ্য করতেই হবে'জানা উচিত। সত্য, সকল বিষয়ের একটা সীমা আছে এবং সেই সীমার বাহিরে গেলে, মানুষ অনেক সময় নিরাশায় আর ধৈর্য্যকে বেঁধে রাখ্তে পারে না জানি, তথাপি আমার মাথার দিব্য, কিছুতে তাঁহাদের নিকট পরিচয় দিয়ে অপমানের বোঝা ভারি করিও না। আশা করি খোকা, রাধারাণী, সরকারমহাশয় আর সকলে ভাল আছেন। তুমি বোধ হয় জামাই ও মেয়ে এত কাছাকাছি পর-পর হয়ে রয়েছে ভেবে বৈদ্যনাথের জল হাওয়ার অপযশ ঘোষণা করবার আয়োজন কর্‌ছ। আমি ভাল আছি। স্নেহ ও আশীর্ব্বাদ সকলকে জানাইবে। ইতি—

শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষ।

পত্র পড়িয়া রঙ্গিলা নির্ব্বাক হইয়া গেল। তাহার হৃদয়ের ভিতর হর্ষ ও বিষাদ একসঙ্গে একটা মহাবিপ্লব বাধাইয়াছিল। সে তথনই মাকে পত্র লিখিতে বসিল।

শ্রীফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

মুক্তি

পাষাণের বক্ষে, হায়! জলধারা কেঁদে যায়,
একি ব্যথা! বহিয়া বিরলে!
এ বিশ্বে যেথায় যাই, ওই কান্না সব ঠাঁই,
ও পাষাণ তবু নাহি গলে!
আপনারে দিতে চায় সঁপিয়া কঠিন পায়,
অকাতরে সব ক'রি দান,
হে পাষাণ, একি রঙ্গ! কভু কি হবে না ভঙ্গ
নিদারুণ তোর অভিমান!
এমন রবির কর পড়েছে কানন পর,
বয়ে যায় এমন বাতাস,—
তারি মাঝে কল্ কল্ অশ্রু বহে ছল্ ছল্,
তবু তুই রহিবি উদাস!
যেথা যাই ওই কথা; কেহ না জুড়ায় ব্যথা,
যত ভাবি যারে আপনার,—
সে যেন মরিয়া যায়, বারেক না ফিরে চায়,
কুহকের এমনি বিচার!

হেথা এই নিরজনে, এ আকুল সমীরণে,
এ বিজন কাননের মাঝে!
এ সাধনা, আরাধনা, প্রাণে মোর এ বেদনা,
তোর বুকে কিছু নাহি বাজে!
ভাষায় কেমনে কহি, কি যাতনা হৃদে সহি,
কত দুঃখে কাটে মোর দিন;
কত আশা ভালবাসা, কত যে আকুল ভাষা
প্রাণে নিতি হতেছে বিলীন।
এ কি শুধু স্বপ্ন দেখা, এ কি শুধু চিত্রে লেখা,
নাই, নাই—স্থিতি-পরিচয়!
এ কি শুধু প্রলোভন, মরীচিকা সুশোভন,
একি শুধু শক্তি পরিচয়!
একি শুধু ছল ভরা, একি শুধু ভুল করা,
পাষাণের গলেনাকো হিয়া;
অশ্রুধারা বয়ে যায় কঠিন পাষাণ পায়,
মর্ম্মব্যথা বৃথায় সঁপিয়া।
একি ভুল! একি ভুল! পরাণ চির আকুল!
চির ব্যর্থ তবু কি সে ছাড়ে—
এযে ঘোর অভিশাপ, বিশ্বময় খরতাপ,
মিছা আশা তৃষ্ণা আরো বাড়ে!
লালসার বিষভরা, এত নহে শ্রান্তিহরা,
এ যে ভ্রান্তি! ওরে বুদ্ধিহীন,
চল্ তবে ফিরে যাই, কাজ নাই এ বালাই,
আর তোরে কহিব না হীন।
দীর্ণ এই বক্ষ পুটে, যে ফুল উঠেছে ফুটে,
দেবতার পূজা হবে তায়!
ফেলিব না আজ হ'তে তোমার প্রেমের পথে
দলিবে যে ঘৃণা করে পায়!
চল্ তবে ফিরে যাই, পথ ভুলি, ক্ষতি নাই
লক্ষ্য আছে ঊর্দ্ধে নীলাকাশ
এবার পেয়েছি দেখা, নির্ম্মল আলোক-রেখা
অনন্তের অপূর্ব্ব আভাষ।
যে মোহ ঘিরিয়া আছে, পাষাণের কাছে-কাছে,
রুদ্ধ থাক্ তার আবরণ;
আমার যে শোক তাপ সে চিতা নিভিয়া যাক—
আজ আমি চাহি পাসরণ!

মধুপুর শ্রীযতীন্দ্রনাথ সোমদ্দার

শশাঙ্ক।

আগন্তুক হতভম্ভ হইয়া গেল। চারিপাশে যাহারা দাঁড়াইয়াছিল তাহারা আগন্তুককে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, আগন্তুক তাহাদিগকে জানাইল যে সেও স্থান্বীশ্বরের সেনাদলভুক্ত, সমস্ত রাত্রি প্রসোদে প্রতীহার রক্ষায় নিযুক্ত ছিল, প্রভাতে অবসর পাইয়া নগরে আহার্য্য ক্রয় করিতে গিয়াছিল। ভার অধিক হওয়ায় বিক্রেতা তাহার পুত্রকে আগন্তুকের সঙ্গে দিয়াছিল, বালিকাকে সে পূর্ব্বে কখনও দেখে নাই। যাহারা পথ হইতে বালিকাকে ধরিয়া আনিয়াছিল, তাহারা এক বাক্যে বলিল যে বালিকা পাটলিপুত্রবাসিনী নহে। দেখিতে দেখিতে শিবিরের শান্তিরক্ষকগণ আসিয়া পড়িল, কিন্তু জনতা ক্রমশঃই বাড়িয়া যাইতে লাগিল। শান্তি রক্ষকেরা বহু চেষ্টা করিয়াও গোল থামাইতে পারিল না। নগরবাসীগণ ক্রমশঃ পুষ্ট হইতেছিল, দেখিতে দেখিতে উভয় পক্ষের কলহ গুরুতর হইয়া উঠিল, গালাগালি কথাকাটাকাটি হইতে হইতে হাতাহাতি আরম্ভ হইয়া গেল, মুষ্টিমেয় শান্তিরক্ষকগণ বিবাদ মিটাইতে না পারিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। তখন রীতিমত যুদ্ধ আরম্ভ হইল। থানেশ্বরের সেনা কলহের জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিল, সুতরাং তাহাদিগের অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গেই ছিল, কিন্তু পাটলিপুত্রবাসীগণ যুদ্ধ করিতে আইসে নাই। তাহাদিগের কেহ শকটচালক, কেহবা বাহক, কেহ জল তুলিতেছিল, কেহ বা মোট লইয়া আসিয়াছিল কিন্তু তাহারা সংখ্যায় বিদেশীয়গণের তিনগুণ। থানেশ্বরের সৈন্যগণ প্রথমে দুই এক পদ পশ্চাতে হটিয়াছিল, কিন্তু তাহার পরে পাটলিপুত্রের নাগরিকগণ তাহাদিগের শানিত তরবারির সম্মুখে হটিতে লাগিল। কাহারও মাথা ভাঙ্গিল, কাহারও বা হাতখানি গেল, কেহবা জন্মের মত খোঁড়া হইল, কিন্তু কেহ মরিল না। রক্তপাত আরম্ভ হইবামাত্র নাগরিকগণ পাশ্চাৎপদ হইতে লাগিল কিন্তু পলাইল না, দূরে থাকিয়া বস্ত্রাবাস বা বৃক্ষসমূহের পশ্চাৎ হইতে অজস্র শিলা বর্ষণ করিয়া সৈনিকদিগকে নিকটে আসিতে দিল না।

সেই সময়ে জাহ্নবীতীরবর্ত্তী রাজপথ দিয়া পাটলিপুত্রের একদল সেনা নগর হইতে শিবিরাভিমুখে আসিতেছিল, কিন্তু তাহাদিগকে দেখিয়া নাগরিকগণ বিশেষ উৎসাহিত না হইয়া ক্রমশঃ দুই একজন করিয়া পলায়ন করিতে

লাগিল, কারণ তাহারা জানিত যে তাহাদের স্বদেশী সেনা কলহের কথা শুনিয়া তাহাদের সহিত যোগদান ত করিবেই না, বরং তাহাদিগেরই লাঞ্ছনা করিবে। সেই সময়ে নদীতীরের পথ ধরিয়া একখানি রথ অত্যন্ত দ্রুত বেগে নগরাভিমুখে আসিতেছিল, যুদ্ধক্ষেত্রের সম্মুখে আসিলে একখানা বৃহৎ প্রস্তররথ চালকের মাথার উপরে যাইয়া পড়িল এবং সে আহত হইয়া রথ হইতে পড়িয়া গেল। তাহার পতনের শব্দে ভয় পাইয়া অশ্ব দুইটি উদ্ধশ্বাসে ছুটিল, তাহা দেখিয়া রথের আরোহী রথ হইতে লাফা-ইয়া পড়িল, রথ রাজপথ ধরিয়া—নগরের দিকে ছুটিয়া চলিয়া গেল। আরোহী সর্ব্বপ্রথমে রথচালকের নিকটে গেল, গিয়া দেখিল যে সে জীবিত আছে বটে, কিন্তু তাহার মস্তক চূর্ণ হইয়া গেছে, তখন ক্রোধে তাহার মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। সেই সময়ে পাটলিপুত্রের নাগরিকগণ কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত একখানা বৃহৎ পাষান তাহার কানের পাশ দিয়া চলিয়া গেল। রাজপথ পার হইয়া শিবিরের একখানি বস্ত্রাঞ্চল ধরাশায়ী করিল আরোহী তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইল এবং কোষবদ্ধ অসি নিষ্কাসিত করিয়া—যে বৃক্ষতল হইতে শিলা বর্ষিত হইতেছিল সেই দিকে চলিল। যাহারা পাষাণখণ্ড নিক্ষেপ করিয়াছিল তাহারা বৃক্ষতল হইতে মুখ বাড়া-ইয়া দেখিতেছিল, তখন শিলাবর্ষণের বেগ মন্দীভূত হইয়াছে, নগরের দিকে সেনাদলও নিকটে আসিয়া পড়িতেছে, সুতরাং নাগরিকগণ যে যেদিকে পথ পাইতেছে সেই দিকে সরিয়া পড়িতেছে। আরোহীকে দেখিয়া পূর্ব্বোক্ত বৃক্ষতলে যে কয়জন দাঁড়াইয়াছিল তাহারাও সরিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছিল, হঠাৎ তাহাদিগের মধ্যে একজন বলিয়া উঠিল "ওরে এ আমাদের বড় যুবরাজ"। দ্বিতীয় ব্যক্তি উত্তর করিল "পাগল আর কি, যুব-রাজ ছেলেমানুষ, সে এখানে কি করিতে আসিবে" ?

১ব্য। "কেন যুবরাজ কি বেড়াইতে আসিতে পারে না ?"

২য় ব্য। "যুবরাজ সমস্ত পাটলিপুত্র নগরে বেড়াইবার যায়গা না পাইয়া এই দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে মাঠে বেড়াইতে আসিয়াছে—না ?

১ম ব্য। "ওরে তুই জানিস না, এই যুবরাজটার একটু ছিট্ আছে।"

২য় ব্য। "তবে তুই দাঁড়াইয়া — পাগল যুবরাজ দেখ—আমি সরিয়া পড়ি"

প্রথম ব্যক্তি বৃক্ষতল হইতে বাহির হইয়া—"যুবরাজের জয় হউক বলিয়া রথারোহীকে অভিবাদন করিল, আরোহী বিস্মিত হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া

রহিল। সেই সময় দ্বিতীয় ব্যক্তি বৃক্ষতল হইতে পলায়ন করিতেছিল; আরোহী তাহাকে ডাকিয়া দাঁড়াইতে বলিল, সেও কণ্ঠস্বর শুনিয়া চমকিত হইয়া দাঁড়াইয়া বলিয়া উঠিল "যুবরাজের জয় হউক"। তখন আশে পাশে চারিদিকে যেখানে যেখানে নাগরিকগণ লুকাইয়াছিল, তাহারা আসিয়া—আগন্তুককে অভিবাদন করিল, দেখিতে দেখিতে বৃক্ষতলে বহু লোক সমাগম হইল। নাগরিকগণকে রণে ভঙ্গ দিতে দেখিয়া থানেশ্বরের সৈনিকগণ নিশ্চিন্ত হইয়াছিল, কিন্তু বৃক্ষতলে জনসমাগম দেখিয়া তাহারাও দুই একটা লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল, একখণ্ড ইষ্টক আসিয়া রথারোহীর শিরস্ত্রাণে লাগিল, তাহা দেখিয়া নাগরিকগণ পুনরায় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। সেনাদল সেই সময়ে যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং জনতা দেখিয়া তাহাদিগের অধিনায়কের আদেশে দাঁড়াইল। তখন রথারোহী রাজপথে অগ্রসর হইয়া গিয়া অধিনায়ককে জিজ্ঞাসা করিল "তুমি আমাকে জান?" সেনানায়ক বলিল "না"। তদুত্তরে আরোহী মস্তক হইতে শিরস্ত্রাণ খুলিয়া ফেলিল, বন্ধনমুক্ত কুঞ্চিত কেশরাশি তাহার স্কন্ধে ও পৃষ্ঠে ছড়াইয়া পড়িল সেনানায়ক তাহার মুখ দর্শন করিয়া সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিল। মগধ সৈন্য জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল, নাগরিকগণও তাহাদিগের সহিত যোগদান করিল। সে ব্যক্তি সত্য সত্যই কুমার শশাঙ্ক। অবয়ব লৌহনির্ম্মিত বর্ম্মে আচ্ছাদিত থাকায় চতুর্দ্দশবর্ষীয় বালককে খর্ব্বকায় যোদ্ধা বলিয়া বোধ হইতেছিল। কুমার যখন জিজ্ঞাসা করিলেন—কি হইয়াছে, তখন নাগরিকগণ একবাক্যে কহিল যে বিদেশীয় সেনাগণ একটি বালিকাকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছিল, তাহাকে ছাড়িয়া দিতে বলায় তাহারা ক্রুদ্ধ হইয়া নাগরিকগণকে প্রহার করিয়াছে। যাহারা আহত হইয়াছিল তাহারা অস্ত্রাঘাত দেখাইল, অস্ত্রহীন ব্যক্তিগণের দেহে অস্ত্রাঘাত দেখিয়া ক্রোধে পাটলিপুত্রের সেনাগণও ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিল। তাহার পর তাহারা যখন রথচালকের প্রাণহীন দেহ দেখিতে পাইল তখন তাহাদিগকে শান্ত করিয়া রাখা কঠিন হইল। কুমারের আদেশে সেনানায়ক যখন থানেশ্বরের সেনানিবাসের দিকে অগ্রসর হইলেন, তখন বিদেশীয় সৈনিকগণ বস্ত্রাবাসের অন্তরালে থাকিয়া শিলাবর্ষণ করিলে, সেনানায়ক অগত্যা ফিরিয়া আসিলেন। তখন কুমারের আদেশে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া মগধসৈন্য বস্ত্রাবাস আক্রমণ করিল, থানেশ্বরের সেনার অধিকাংশ সুরাপানে উন্মত্ত হইয়াছিল, সুতরাং

তাহারা সহজেই পরাজিত হইল, যাহাদিগের জ্ঞান ছিল তাহারা পলায়ন করিল, যাহারা মত্ত হইয়াছিল, তাহারা ভূতলে পড়িয়া প্রহার খাইল, দুই চারিজন আহত হইয়াছিল তাহারা বন্দী হইল। কুমার শশাঙ্কের আদেশে আমাদিগের পূর্ব্বপরিচিতা বালিকা ও তাহার ভ্রাতা বন্ধনমুক্ত হইয়া রাজপথে আসিল। কুমার তাহাদিগকে লইয়া রথে নগরাভিমুখে চলিয়া গেলেন। তাহার পর সেনাদল গন্তব্য স্থানাভিমুখে অগ্রসর হইল। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে। ইত্যবসরে বিবাদের কথা নগরে প্রচার হইয়া পড়িয়াছিল। নগর হইতে দলে দলে দুষ্ট লোক আসিয়া নাগরিকগণের দল স্ফীত করিয়া তুলিয়াছিল। সেনাদল চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে নাগরিকগণ শিবির লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইল, মুষ্টিমেয় শান্তিরক্ষকগণ তাহাদিগকে নিবারণ করিতে পারিল না, নাগরিকগণ অবশেষে তাহাদিগকে মারিয়া তাড়াইয়া দিল। লুণ্ঠন শেষ হইলে নাগরিকগণ শিবিরে অগ্নি প্রদান করিল, যখন বস্ত্রাবাস সমূহ জ্বলিয়া উঠিল তখন গগনস্পর্শী অগ্নিশিখাসমূহ দেখিয়া থানেশ্বরের সেনানায়কগণ দেখিলেন যে শিবিরের বিপদ ঘটিয়াছে। নগর মধ্যে হর্ষের শরীররক্ষী সহস্রাধিক অশ্বারোহী অবস্থান করিতেছিল। তাহাদিগকে লইয়া সেনানায়কগণ প্রান্তরে উপস্থিত হইলেন। তখন ইন্ধনাভাবে অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা দেখিলেন যে মত্ত সৈনিক ও বন্দিগণকে নৃশংসভাবে হত্যা করিয়া তাহারা শিবিরে অগ্নিসংযোগ করিয়া সমস্তই ভস্মসাৎ করিয়াছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রোহিতাশ্ব দুর্গ প্রাচীন কাল হইতে আর্য্যাবর্ত্তের ইতিহাসে সুপরিচিত, রোহিতাশ্ব দক্ষিণ মগধ ও করুষের দক্ষিণ সীমান্তে অবস্থিত। রোহিতাশ্ব অরণ্যসঙ্কুল আটবিক প্রদেশে একমাত্র প্রবেশদ্বার। ইতিহাসের প্রারম্ভ হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত রোহিতাশ্ব দুর্গের অধীশ্বরই অরণ্যনিবাসী বর্ব্বরজাতিসমূহের অধীশ্বররূপে পরিচিত। মুসলমান বিজয়ের পরে রোহিতাশ্ব রোহতাস্ নামে পরিচিত হইয়াছিল, পাঠান ও মোগল রাজগণের সময়ে রোহিতাশ্বের দুর্গরক্ষক সুবা বিহারের দক্ষিণসীমান্তরক্ষক ছিলেন। শের সাহ, মানসিংহ, ইস্‌লাম খাঁ, সায়েস্তা খাঁ প্রভৃতি ব্যক্তিগণের নাম রোহতাস্ দুর্গে সুপরিচিত। সকলেই এই প্রাচীন দুর্গের ধ্বংশাবশেষের মধ্যে কিছু কিছু স্মৃতিচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন। অতি প্রাচীন কালে যে

কালের কথা অদ্যাপি ইতিহাস ভুক্ত হয় নাই, সেই কালে রোহিতাশ্ব দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। চূড়াটি দেখিলে বোধ হইত যে উহা শোণ নদ-গর্ভ হইতে উত্থিত হইয়াছে। তাহার পর ত্রয়োদশ শতাব্দী অতীত হইয়া গিয়াছে। ইহার সহস্র বর্ষ ধরিয়া শোন ক্রমাগত নিজ গতি পরিবর্ত্তিত করিয়াছে, এখন আর শোন পাটলিপুত্রে নাই, শোন রোহিতাশ্ব দুর্গনিম্নে নাই। সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে যে স্থানে শোণ প্রবাহিত ছিল, নদের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া— সে স্থানে এখন শ্যামল শস্যক্ষেত্র ও বিটপিরাজিবেষ্টিত গ্রামসমূহ দেখিতে পাওয়া যায়,—বিন্ধ্য পর্ব্বতের পাদমূল এখন নদতীর হইতে বহুদূর। পর্ব্বত চূড়ান্তশীর্ষে প্রাচীন রোহিতাশ্ব দুর্গ অবস্থিত ছিল; দুর্গটি দুইভাগে বিভক্ত, নিম্নের দুর্গ বৃহদাকার চূড়াটিকে পাষাণনির্ম্মিত প্রাচীর দ্বারা বেষ্টন করিয়া দুর্গের এই অংশ নির্ম্মিত হইয়াছিল। বহু অর্থ ব্যয়ে বন্ধুর পর্ব্বত-শীর্ষ সমতল করিয়া দুর্গের দ্বিতীয় ভাগ নির্ম্মিত হইয়াছিল, দুর্গের এই অংশ দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে শতহস্তের অধিক নহে, কিন্তু ইহা অত্যন্ত দুরারোহ এবং দুর্জ্জয়। রোহিতাশ্বের ইতিহাসে এই অংশ দুইবারের অধিক শত্রুহস্তগত হয় নাই। রোহিতাশ্ব দুর্গের উত্তর তোরণের নিম্নে বসিয়া একজন স্থূলকায় বৃদ্ধ কাষ্ঠখণ্ডের সাহায্যে দন্ত ধাবন করিতেছিল। দুর্গ নির্ম্মাণের প্রাচীন প্রথানুসারে প্রাচারের চতুষ্পার্শ্বে পরিখা খনিত হইয়াছিল।

ক্রমশঃ

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

নিদর্শন।

লোকশিক্ষা।

আধুনিক কালে লোকশিক্ষাই আমাদিগের একমাত্র পরিত্রাণ—জাতীয় উন্নতির একমাত্র সোপান। আমরা যে আলোক পাইয়াছি তাহা আমাদিগের অনুন্নত ভ্রাতৃগণের নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। জন ব্রাইট সত্যই বলিয়াছেন, "the nation lives in the hut", অর্থাৎ সমগ্র জাতি পর্ণকুটিরেই বাস করে। পর্ণকুটিরবাসী অসংখ্য লোক এখনও ঘোর অন্ধকারে নিমগ্ন—তাহাদিগকে জাগাইতে হইবে, তাহাদের মধ্যে জ্ঞান-বিস্তারের জন্য কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিকার্য্য করিবার জন্য কৃষি পরীক্ষালয় (Experimental Farm) খোলা হইতেছে, মাছের 'চাষ' শিখাইবার আয়োজন চলিতেছে, স্বাস্থ্য সংস্কারের জন্য ম্যালেরিয়া কমিসন প্রভৃতি বসিয়া লম্বা লম্বা রিপোর্ট বাহির

করিতেছে, কিন্তু চাষীর নিকট এ সকলের কোনও সংবাদ পৌঁছায় না, সে ঠিক মান্ধাতার আমলের চালে চলিতেছে। গ্রামের চারিদিকে বন জঙ্গল বাড়িয়াছে, ডোবাগুলি পানায় ভরাট, সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হইয়া গাই বলদ পালে পালে মরিতেছে। মুষ্টিমেয় জন কয়েক লোক শিক্ষা পাইয়াছে সত্য, কিন্তু দেশ যেমন ছিল তেমনই আছে। জল, বাতাস, সূর্য্যালোক প্রভৃতিতে যেমন সকল লোকের সমান অধিকার, বিদ্যালাভেও সেইরূপ সকলের সমান অধিকার আছে; সে অধিকার হইতে কাহাকেও বঞ্চিত করিলে মনুষ্যত্বের অবমাননা হয়। আমাদিগের সমাজে উপযুক্ত শিক্ষাভাববশতঃ কতলোকের বুদ্ধিশক্তি বিকাশ লাভ করিতে না পারিয়া নষ্ট হইতেছে, তাহা ভাবিলে দুঃখ হয়।

("গৃহস্থ", চৈত্র,
ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায়)।

আমাদের দারিদ্র্য।

আমেরিকা এবং ইউরোপে প্রত্যেক ব্যক্তিরই অন্নবস্ত্রের ব্যয়ের পর, যথেষ্ট উদ্বৃত্ত থাকে। তদ্দ্বারা তথাকার জনসাধারণ শিক্ষা প্রভৃতি উচ্চবিধ অভাবগুলি মোচন করিবার সুযোগ পাইয়া থাকে। আমাদের জনসাধারণের সমস্ত শক্তি ক্ষুধার প্রবল তাড়না নিবৃত্তি করিতে নিয়োজিত হয়, তাহাদের আয়ের দশভাগের নয় ভাগ অন্নকষ্ট মোচনার্থ ব্যয়িত হয়, শিক্ষা ও চিকিৎসার জন্য ব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা তাহাদের একেবারে নাই। ইউরোপের জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা নির্ণয় করিবার জন্য, প্রুসিয়া দেশের ধনবিজ্ঞানবিৎ মনীষী Eugel এক প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছেন। ডাক্তার Eugel স্যাক্সনি প্রদেশের অধিবাসীদিগের পারিবারিক ব্যয়ের যে অনুপাত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত হইল :—

		শ্রমজীবী		মধ্যবিত্ত		ধনী	
১।	আহার্য্য ...	৬২	= ৯৫	৫৫	= ৯০	৫০	= ৮৫
২।	বসন ...	১৬		১৮		১৮	
৩।	গৃহ ...	১২		১২		১২	
৪।	ইন্ধন ও আলো ...	৫		৫		৪	
৫।	শিক্ষা, ধর্ম্মকর্ম্ম ...	২	= ৫	৩½	= ১০	৫½	= ১৫
৬।	রাজকর ...	১		২		৩	
৭।	চিকিৎসা ...	১		২		৩	
৮।	আমোদ প্রমোদ ...	১		২½		৩½	
		১০০		১০০		১০০	

আমাদের দেশের শ্রমজীবীদিগের ব্যয়ের তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল। অন্নবস্ত্রের সীমা অতিক্রম করিয়া তাহারা শিক্ষা, চিকিৎসা ও আমোদ প্রমোদের জন্য কিছু ব্যয় করিতে পারে না।

		মজুর	কৃষক	সূত্রধর	কর্ম্মকার
১।	খাদ্য ...	৯৫.৪	৯৪.০	৮৩.৫	৭৯.০
২।	বসন ...	৪.০	৩.০	১২.০	১১.০
৩।	চিকিৎসা ...	.০	১.০	১.০	৫.০
৪।	শিক্ষা ...	.০	.০	.০	.০
৫।	ক্রিয়াকলাপ ...	.৬	২.০	২.৫	৪.০
৬।	বিলাস-সামগ্রী...	.০	.০	১.০	১.০

("প্রবাসী", চৈত্র,
শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায়)।

য়ুরোপে ধর্ম্ম ও কর্ম্ম।

কর্ম্মকে ব্যূহবদ্ধ করিবার জন্য য়ুরোপ যে একটি শক্তি লাভ করিয়াছে, ইহা তাহার আধ্যাত্মিক উন্নতির অন্তরায় এ কথা বলা চলে না। য়ুরোপের মানুষ কেবলই কাড়াকাড়ি ও হানাহানির মধ্যে দিন যাপন করিতেছে, তাহার জীবনে ইহা অপেক্ষা কোনও উচ্চতর দিক নাই, এ অপবাদ তাহাকে দেওয়া যায় না। এক্ষণে অনন্তের জন্য ব্যাকুলতা যদি য়ুরোপীয় চিত্তকে অধিকার করিয়া থাকে, তবে তাহা স্বাভাবিক পরিণতি ক্রমেই ঘটিয়াছে, প্রতিক্রিয়ারূপে ঘটে নাই। যে চাকা খুব যোরে তাহার গতি আর দেখা যায় না—শক্তি যেখানে আপনাতে আপনি ধৃত ও সংস্থিত, সেখানে তাহার কোনও সংক্ষোভ লক্ষ্য গোচর হয় না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত য়ুরোপে শক্তির হাঁসফাঁস ও ছটফটানি দেখা যাইতেছে, ততক্ষণ তাহা শক্তির চরম প্রকাশ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। কিন্তু সেই সঙ্গে এই অবিচার করিতেও সাহস হয় না যে এই শক্তি প্রলয়ই ঘটাইবে, ইহার মধ্যে সৃজনী শক্তি নাই। এটা রাজসিক, এটা সাত্ত্বিক নয়, ইত্যাদি কথা সাজাইয়া আত্মপ্রসাদ লাভের চেষ্টাও হাস্যকর। কারণ যে শক্তি প্রথমে আপনাকে জড়তার বাধা হইতে কাটিয়া বাহির করিয়া আনে, তাহাই পরিণত অবস্থায় শান্তসুন্দর সংযতরূপ ধারণ করে।

("তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা," চৈত্র,
শ্রীযুক্ত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী)।

বোম্বাই প্রবাস।

মারাঠীদিগের মধ্যে কতকগুলি নাম কেবল পরিবার ও আত্মীয়দের মধ্যেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অপর সাধারণের নিকট তাহারা এক নামে পরিচিত, আপনাদের মধ্যে তাহাদের আর এক নাম ব্যবহৃত হয়, যথা:—কৃষ্ণরাও—নানা সাহেব, ভীমরাও—তাত্যা সাহেব, পণ্ডেরাও—ভাই, গণপতরাও—বালা ইত্যাদি। এইরূপ অপ্পা, আন্না প্রভৃতি কতকগুলি ঘরাও নাম

আছে। গুজরাটীদের মধ্যে নানু, মনু, মোটাভাই বলিয়া কতকগুলি নাম শ্রবণ করা যায়। অনেক সময়ে পিতাকে পুত্রেরা বাবার পরিবর্ত্তে মোটাভাই বলিয়া সম্বোধন করে। মাতাকে মা না বলিয়া মোটী বেন (দিদি) বলিয়া ডাকে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও জ্যেষ্ঠা ভগিনীর জন্য দাদা দিদির অনুরূপ কোনও নাম নাই। যদি অনেক সন্তান মৃত হইয়া দৈববশাৎ একটি বাঁচিয়া থাকে, তবে তাহার নাম জীবা কি জীবী রাখা হয়। যে গৃহে বালকের সংখ্যা অত্যধিক তথায় তাহাদের ধূলা, কচরা, জুঠা, পুঁজা প্রভৃতি অযত্নসূচক নাম ধরিয়া ডাকা হয়। মারাঠী গুজরাটী ও পারসীদের মধ্যে নাম রাখিবার সময়, পুত্রের নামের সঙ্গে পিতার নাম যোগ করিয়া দিবার রীতি সর্ব্বত্র প্রচলিত। যথা পিতার নাম সারাভাই, পুত্রের নাম ভোলানাথ সারাভাই, পৌত্রের নাম ভীমরাও ভোলানাথ। পিতার নাম খরসদ্‌জী, পুত্রের নাম মানকজী খরসদ্‌জী, পৌত্রের নাম জাহাঙ্গীর মানকজী। বাঙ্গালীদের মধ্যে যেমন বন্দ্য, ভট্ট, মিত্র, দাস প্রভৃতি জাতিসূচক নাম ব্যবহৃত হয়, এখানে সেরূপ নিয়ম নাই। মারাঠীদের মধ্যে অনেকেরই কুলপদবী থাকে—যথা, গোড়বোলে (মিষ্টভাষী), কড়কড়ী, জোষী, তর্খড়কর ইত্যাদি। গুজরাটে 'জী' ও 'ভাই' শব্দান্ত নামই অধিক প্রচলিত। কায়স্থ ও বণিকদের মধ্যে দেবতার নামের শেষে দাস শব্দ সংযুক্ত করিবার রীতি আছে—যেমন জগজীবন দাস, লক্ষ্মণ দাস, নরোত্তম দাস ইত্যাদি। এক্ষণে কেহ কেহ বাঙ্গালা নামের অনুকরণে পুত্রকন্যার নাম রাখিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

("ভারতী", চৈত্র,
শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।)

পারিপার্শ্বিক অবস্থা।

বংশানুক্রমিক স্থায়ী পরিবর্ত্তন এবং অস্থায়ী পরিবর্ত্তনেও, পারিপার্শ্বিক অবস্থার স্থায়ী প্রভাবের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। সত্য বটে, পার্ব্বত্য বৃক্ষ সমতলে রোপণ করিলে উহারা সমতলস্থ ঐ শ্রেণীর বৃক্ষের আকার ধারণ করে; কিন্তু কয়েক পুরুষ পরে উহাকে লইয়া আবার পর্ব্বতের উপর রোপণ করিলে, সমতলের লক্ষণ সকল অচিরেই লুপ্ত হয়, উহা পূর্ব্ববৎ পার্ব্বত্য অবয়ব প্রাপ্ত হয়। শ্বেতকায় ব্যক্তি আফ্রিকার সাহারা প্রদেশে দীর্ঘকাল বাস করিলে অপেক্ষাকৃত মলিন বর্ণ প্রাপ্ত হইবে, কিন্তু উহার অপত্য উহার ঐ মলিন বর্ণ প্রাপ্ত হইবে না। অপত্য বীজ হইতে জাত বীজগত পরিবর্ত্তন না হইলে অপত্য পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না। পারিপার্শ্বিক কারণের ফল স্বোপার্জ্জিত—উহা দ্বারা বীজগত পরিবর্ত্তন সিদ্ধ হয় না। এ নিমিত্ত পারিপার্শ্বিক কারণে বংশানুক্রমিক পরিবর্ত্তন সিদ্ধ হয় না। যদিও ফ্রান্‌জ বোয়াজ নামক মার্কিন পণ্ডিত বলেন যে তিনি জলবায়ুর প্রভাবে মানবদেহের পরিবর্ত্তন হয় ইহা প্রমাণিত করিয়াছেন, কিন্তু অধিকাংশ জীবতত্ত্ববিদ পণ্ডিত পারিপার্শ্বিক অবস্থার স্থায়ী প্রভাব অস্বীকার করেন। অধ্যাপক টম্‌সন তাঁহার "Heredity" নামক গ্রন্থে মীমাংসা করিয়াছেন যে স্ত্রীকোষ পুংকোষ কর্ত্তৃক অনুপ্রাণিত হইবার পর, উহার বংশানুক্রমিক বিকাশের গতি কিছুতেই পরিবর্ত্তিত হয় না।

তবে এ কথা স্বীকার্য্য যে যুক্তকোষ-(Zygote) মধ্যস্থ লক্ষণগুলির কিয়দংশ, পারিপার্শ্বিক কারণবশতঃ, প্রকাশিত হইতে পারে; কিন্তু উহার মধ্যে যাহা নাই, তাহার কোনওক্রমে জাত হইতে পারে না।

("সাহিত্য", চৈত্র,
শ্রীযুক্ত শশধর রায়)।

ভারতের সাধনা।

৺সমগ্র দেশে পরা ও অপরা বিদ্যাদির প্রচার আমাদিগের নিজেদের আয়ত্তে আনিতে হইবে। আপনাদের আন্তরিক আশা, আপনাদের কথাবার্ত্তা, আপনাদের চিন্তা, সমস্তই এই মহৎ কর্ত্তব্যটি অধিকার করুক। যতদিন না তাহা হইতেছে, ততদিন এ জাতির উদ্ধার নাই। আজকাল যে শিক্ষা আপনারা প্রাপ্ত হইতেছেন, তাহার কতকগুলি সদ্‌গুণ আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার একটি প্রচণ্ড দোষ আছে—সে দোষ এমনই বিষম যে আর সমস্ত গুণ তাহার দ্বারা সম্পূর্ণ পরাভূত। প্রথমেই দেখুন, আজকালকার শিক্ষা-পদ্ধতি মনুষ্যত্ব গড়িয়া তুলে না, উহা কেবল গড়া জিনিস ভাঙ্গিয়া দিতেই জানে। এইরূপ অস্থিরতা-বিধায়ক শিক্ষা, যাহা কেবল নেতি-ভাবই প্রবর্ত্তিত করায়, সে শিক্ষা মৃত্যু অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর। মস্তিষ্কের মধ্যে নানাবিষয়ের বহু বহু তথ্য বোঝাই করিয়া সেগুলিকে অপরিণত অবস্থায় সেখানে সারাজীবন হট্টগোল বাধাইতে দেওয়াকেই শিক্ষালাভ করা বলে না। সৎ ও আদর্শ ভাবগুলিকে এমন ভাবে স্বপরিণাম লাভ করাইতে হইবে, যাহাতে তাহারা প্রকৃত মনুষ্যত্ব, প্রকৃত জীবন গঠিত করিতে পারে। পাঁচটি সৎ ভাবের যদি তুমি পরিপাক করিয়া নিজের জীবনে ও চরিত্রে পরিপাক করিতে পার, তাহা হইলে যিনি একটি পুস্তকাগার কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহার অপেক্ষা তোমার শিক্ষা অনেক বেশী। অতএব আমাদের লক্ষ্য এই যে, আমাদের দেশের আধ্যাত্মিক ও ঐহিক সকল প্রকার শিক্ষা আমাদের আয়ত্তাধীনে আনিতে হইবে এবং সে শিক্ষায় ভারতীয় শিক্ষার সনাতন গতি বজায় রাখিতে হইবে ও যথাসম্ভব সনাতন প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে।

("উদ্বোধন", চৈত্র,
স্বর্গীয় স্বামী বিবেকানন্দ)।

পল্লীগ্রামে অস্বাস্থ্য।

ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পাঁচটির পাঁচটিতেই আমরা নানারূপে বিড়ম্বিত। আমরা শুষ্ক মাটিতে বাস করিতে পাই না; স্নান, পান ও রন্ধনের জন্য পরিষ্কার জল পাই না; পল্লীগ্রাম জঙ্গলে পূর্ণ বলিয়া প্রচুর সূর্য্যালোক পাই না; মাছ পচা ও পাট পচার জন্য আমরা বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিতে পাই না; অন্নাভাবে শীর্ণ, অকালে জীর্ণ কোটী কোটী নরনারীর আর্ত্তরবে আকাশ পর্য্যন্ত দূষিত হইয়াছে।......জঙ্গলে, বাঁধে, রেলের পথে যখন দেশের জল বদ্ধ হয় নাই, যখন দেশের লোক বড় সহর অপেক্ষা পল্লীগ্রাম নিরাপদ বলিয়া জানিত, নদীগুলি

যখন ভরাট হইয়া উঠে নাই, তখন দেশের যে অবস্থা ছিল, এখন তাহা মনে করিতে গেলেও চক্ষে জল আসে। তখন লোকে দুই বেলা দুই মুঠা মোটা ভাত খাইতে পাইত—দেশে বিস্তর তন্তুবায় ও জোলা ছিল, মোটা কাপড় সকলে পরিতে পাইত। আর ছিল যাত্রা, গান, কবি; পাঁচালি, মেলা, মহোৎসব; সর্ব্বত্রই হাসিখুসি, গল্পগুজব, গান-বাজনা। দেশ অস্বাস্থ্যকর হওয়াতে ঐ সকল কমিয়া গিয়াছে, সে উৎসাহ, সে স্ফূর্ত্তি, সে প্রাণ, সে প্রফুল্লতা, সে সব কিছুই নাই। আছে কেবল সভার আড়ম্বর ও বক্তৃতার বিড়ম্বনা। আছেন উকিল, মোক্তার, কৌন্সলি ও ডাক্তার। আর আছে বাঙ্গালা অক্ষরে ইংরাজের সংবাদপত্র এবং ইংরাজের নকলে দেশের ইতিহাস। বিষম দেশব্যাপী জ্বরে দেশ উজাড় হইয়া যাইতেছে। কি করিব আমরা নির্ব্বাচিত সদস্যপূর্ণ মন্ত্রণাসভা লইয়া? কি করিব কমিটি, বোর্ড কাউনসিল লইয়া?

("বঙ্গদর্শন", চৈত্র,
শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার)।

শ্রীগৌরহরি সেন।

রত্ন-দীপ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

রাখাল বড় দুঃখী

সমস্ত দিন আকাশটা মেঘে আচ্ছন্ন ছিল, সন্ধ্যার পূর্ব্বে বৃষ্টি আরম্ভ হইল।

রাখাল তাহার সেই খাঁচার মত বাসাটিতে, মলিন শয্যার উপর বসিয়া, গালে হাত দিয়া ভাবিতেছে। খোলা জানালাপথে জলের ছাট আসিয়া বিছানাটার একপ্রান্ত ভিজিয়া যাইতেছে, কিন্তু সেদিকে তাহার ভ্রূক্ষেপও নাই।

রাখালের কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে—তাহা কি আর খুলিয়া বলিতে হইবে? আবার সর্ব্বনাশের উপর সর্ব্বনাশ! শ্বশুরালয়ে পৌঁছিয়াই রাখাল জ্বরে পড়িয়াছিল—পাঁচদিন পরে আরোগ্য লাভ করিল। ইতিমধ্যে সকল কথাই সে জানিতে পারিল। শ্বশুরালয় হইতে নিজগ্রামে গিয়া দেখিল, সেখানেও টী টী পড়িয়া গিয়াছে। একদিন মাত্র বাড়ীতে থাকিয়া, খুস্রুপুরে ফিরিয়া আসিল। পৌঁছিয়া শুনিল, ইতিমধ্যে ইন্‌স্পেক্টার সাহেব আসিয়াছিলেন, পীড়ার ভান করিয়া তাহার পলায়নের কথা সমস্তই ধরিয়া ফেলিয়াছেন—হেড্ আপিস হইতে চিঠি আসিয়াছে, এক মাসের নোটিসে রাখালকে কর্ম্মচ্যুত করা হইল।

নোটিসের একমাস উত্তীর্ণপ্রায়, আর দুইটি দিন মাত্র বাকী আছে। একমাস পূর্ব্বে রাখালকে যাঁহারা দেখিয়াছিলেন; আজ তাঁহারা দেখিলে হঠাৎ তাহাকে চিনিতে পারিবেন না। এ একমাসের দুশ্চিন্তায় তাহার দেহখানি শীর্ণ হইয়া গিয়াছে, চক্ষুর কোলে কালিমা পড়িয়াছে।

গৃহখানির আসবাব যৎসামান্য। একখানি দড়ির খাটিয়া, তাহারই উপর রাখাল বসিয়া রহিয়াছে। দেওয়ালের নিকট একটা বড় প্যাকিং কেস্—আড়ভাবে স্থাপিত। তাহার উপর একটি পীতবর্ণ পুরাতন তোরঙ্গ, তাহার উপর কালো টিনের একটি হাতবাক্স—তাহার উপর বটতলার দুইখানা ডিটেক্টিভ্ উপন্যাস। প্যাকিং কেসটির ভিতর পিতল কাঁসার খানকতক বাসন। এক কোণে একটা কাঠের টুল, তাহাতে E. I. R. অক্ষরগুলি ক্ষোদিত। তাহার উপর একটা জলের সোরাই। অপর কোণে পেরেকে বাধা একটা দড়ির আলনায় কয়েকটা কাপড় জামা ঝুলিতেছে। একখানা বড় পেষ্টবোর্ডের উপর সিগারেটবাক্সের অনেকগুলি ছবি গঁদ দিয়া আঁটা, তাহাই ভিত্তিগাত্রে গৃহস্বামীর শিল্পরুচির পরিচয়স্বরূপ ঝুলিতেছে।

বৃষ্টি পড়িতে লাগিল—ক্রমে দিবালোকও অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া আসিল। মাঝে মাঝে সন্ সন্ করিয়া দমকা বাতাস বহিয়া বৃষ্টিপতন-শব্দকে তীব্রতর করিয়া তুলিতেছে। রাখাল বসিয়া বসিয়া অকূল পাথার চিন্তা করিতে লাগিল। আর দুইটা দিন মাত্র তাহার চাকরির মিয়াদ—এ দুইদিন পরে সে কোথায় যাইবে, কি করিবে, কি খাইবে, ইহাই তাহার প্রধান চিন্তার বিষয়। এরূপ অবস্থায় পড়িলে লোকে বাড়ী যায়, আপন আত্মীয়স্বজনের আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু সে পথও তাহার পক্ষে বন্ধ। এ কলঙ্কের পর, দেশে গিয়া লোকের কাছে মুখ দেখাইবে কেমন করিয়া? তাহাও না হয় যাইত—কিন্তু আসিবার পূর্ব্বে বাড়ীতে তাহার বউদিদির ব্যবহার স্মরণ করিয়া, দেশে যাইবার কল্পনামাত্র তাহার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। এত দুঃখে বউদিদির কাছে সে বিন্দুমাত্রও সহানুভূতি পায় নাই। শ্বশুরবাড়ী হইতে ফিরিয়া যে একটি দিনমাত্র সে বাড়ীতে ছিল, সে সময়টুকুর মধ্যেই বউদিদি তাহাকে অনেক মর্ম্মান্তিক কথা শুনাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছিলেন—"তুমি যদি এ আপদকে আমাদের বাড়ী আনাইয়া না রাখিতে, তাহা হইলে ত এ কেলেঙ্কারি হইতে পাইত না। এখন তুমি ত মজা করিয়া পশ্চিম চলিয়া যাইবে, টাকা রোজগার করিবে, আবার বিবাহ করিবে, সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিবে। আমাদের বাড়ীর এই

যে অখ্যাতিটা রটিল, আমার মেয়েদের বিবাহ হইবে কেমন করিয়া ? ভুগিতে আমরাই ভুগিব—তোমার আর কি ?” - বাড়ী গিয়া দাদার অন্নদাস হইয়া, বউদিদির মুখনাড়া খাইতে কিছুতেই রাখালের প্রবৃত্তি হইতেছিল না। আর কোনও আত্মীয়স্বজনও নাই। এ দুইদিন পরে রাখাল কোথায় যাইবে ?

এক—কলিকাতায় যাওয়া, সেখানে কোনও মেসের বাসায় থাকিয়া অন্য একটা চাকরি বাকরির চেষ্টা করা। লেখাপড়াও তেমন শেখে নাই—চট্ করিয়া যে আবার একটি চাকরি হইবে, তাহারই বা ভরসা কি ? যতদিন চাকরি না হইবে, ততদিন বাসাখরচ চলিবে কোথা হইতে ? পোষ্ট আপিসে তাহার গুটিকতক টাকা আছে -বাজারদেনা শোধ করিবার পর বড় বেশী অবশিষ্ট থাকিবে না। রেলের প্রভিডেণ্ট ফণ্ডে তাহার কিছু টাকা আছে—কিন্তু ডিসমিস হইয়াছে বলিয়া, সে টাকার অর্দ্ধেকেরও উপর তাহারা কাটিয়া লইবে। সে টাকা বাহির হইতেও তিন চারি মাস বিলম্ব। এ তিন চারি মাস কাটিবে কেমন করিয়া ? শেষে কি অনাহারে মরিতে হইবে ? নিজের জীবনটা সেই মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যার মতই অন্ধকার বলিয়া রাখালের মনে হইতে লাগিল।

খুস্রুপুরে পৌঁছিয়া অবধি প্রতিদিনই সে এই প্রকার চিন্তা করিয়াছে—চিন্তা করিয়া আজিও কোনও কূলকিনারা পায় নাই। জীবনটা তাহার কাছে অতি বিস্বাদ, অতি তিক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এক এক সময় নৈরাশ্যের প্রাবল্যে তাহার ইচ্ছা করিত—দূর হউক, সংসার ধর্ম্মে আমার কোনও প্রয়োজন নাই—আমি সন্ন্যাসী হইয়া যাইব। সন্ন্যাসী হইয়া, কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিব—আহারের অভাব হইবে না। কয়েকদিন পূর্ব্বে ষ্টেশন-মাষ্টার বাবু যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—“আপিস হইতে পত্র আসিয়াছে, কোন্ ষ্টেশন অবধি আপনার পাস আবশ্যক”—“তখন রাখালের মনে উক্ত ভাবই প্রবল ছিল, সুতরাং সে কাশীর পাসই চাহিয়াছিল। তবে এ বিষয়ে সে এখনও কৃতনিশ্চয় হয় নাই।

জল একটু থামিয়াছে। ষ্টেশনে ছয়টার ঘণ্টা বাজিল। পানিপাঁড়ে আসিয়া, রাখালের কাছে দিয়াশলাই চাহিয়া, কেরাসিনের বাতিটি জ্বালিয়া জানালা বন্ধ করিয়া দিল। শেষে বলিল—“বাবু, সিধা বাহির করিয়া দিন।”

রাখাল অন্যমনস্কভাবে বলিল—“থাক্, আজ আর রাত্রে কিছু খাইব না।”

পাঁড়ে বলিল—"কিছুই খাইবেন না?"

রাখাল বলিল—"ক্ষুধা নাই। যদি দরকার হয়, ষ্টেশনেই দুই চারি পয়সার লুচি কিনিয়া খাইব এখন।"

মা নহে, স্ত্রী নহে, ভগ্নী নহে যে খাওয়াইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিবে।

"আচ্ছা বাবু"—বলিয়া আনন্দে পাড়েজি প্রস্থান করিল। এই বাদলের রাত্রে তাহার একটা ঝঞ্ঝাট বাঁচিয়া গেল।

সন্ধ্যা ছয়টা হইতে সমস্ত রাত্রি রাখালের ডিউটি। টেলিগ্রাফের কর্ম্ম, টিকিট বিক্রয়, গাড়ী পাস্ করা, সকলই তাহাকে একাকী করিতে হয়। তবে রাত্রি বারোটার পর কাযকর্ম্ম আর বড় থাকে না। বারোটার সময় শেষ প্যাসেঞ্জার গাড়ী আসে—তাহার পর সে একটু ঘুমাইতে পায়। টেলিগ্রাফের কলে ঘণ্টা লাগাইয়া, ব্যাটারি বক্সের উপর বিছানা বিছাইয়া, প্রতিরাত্রে সে নিদ্রা যায়।

সাড়ে ছয়টা হইল। রাখাল তখন একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া আপিসের পোষাক পরিল। বগলে ছাতা, হাতে সরকারি লণ্ঠন লইয়া বাহির হইয়া, ঘরে দুয়ারে চাবি বন্ধ করিয়া আপিসে গেল।

বড়বাবু তখন বাসা হইতে জলযোগ সারিয়া আসিয়া, পান চিবাইতে চিবাইতে ধূমপান করিতেছেন। একটু পরেই আপিসের চিঠিপত্র লিখিতে বসিবেন। রাত্রি আটটা অবধি চিঠিপত্র লিখিয়া তিনি বাসায় ফিরিয়া যান। রাখালকে দেখিয়াই বলিলেন—"ওহে—তোমার পাস্ এসেছে—এই নাও।"—বলিয়া পাসখানি বাহির করিয়া রাখালের হাতে দিলেন। বলিলেন—"এখন গিয়ে কাশীতেই থাক্‌বে না কি?"

"হ্যাঁ—দিন কতক তাই থাকব।"

"কতদিনে বাড়ী যাবে?"

"এখনও কিছু ঠিক করিনি।"—বলিয়া রাখাল নীরবে আপন নির্দ্দিষ্ট কাজকর্ম্মগুলি করিতে বসিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ট্রেণে লাস।

রাত্রি বারোটার প্যাসেঞ্জার ছাড়িল। সিগ্‌ন্যালম্যান্ ঘণ্টা বাজাইয়া দিয়া ফুকারিল—"চলো মোসাফির পূরবকে যানেওয়ালা টিকস্ লো।"

টিকিটের জানালা খুলিয়া, রাখাল খানকতক টিকিট বিক্রয় করিল। এই ঝড় জলে, এত রাত্রে আরোহী অধিক নাই।

টিকিট বিক্রয় শেষ করিয়া প্যাণ্টালুন এবং কালো কোট পরিয়া, মখমলের টুপীটি মাথায় দিয়া, লণ্ঠন হস্তে গাড়ী পাস করিবার জন্য রাখাল বাহির হইল।

মেঘে আকাশ তখনও আচ্ছন্ন। উত্তরপশ্চিম কোণে ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকিতেছে। প্ল্যাটফর্ম্মের উপর গুটিকয়েক লণ্ঠন জ্বলিতেছে, কিন্তু যে ক্ষীণ আলোক, এ গভীর অন্ধকার কিছুতেই দূর হইতেছে না।

দেখিতে দেখিতে, বিপুলকায় ত্রিনেত্র নিশাচরের ন্যায় ভীমগর্জ্জনে প্যাসেঞ্জার গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। আজ জলের জন্য পান সিগারেটওয়ালা আসে নাই-- পুরী-মিঠাইওয়ালাও নিজ কুটীরে আরামে নিদ্রামগ্ন। রাখাল এবং সিগ্‌ন্যাল্‌ম্যান্‌ ছাড়া, মাত্র গুটি চারেক খালাসী আছে।

ট্রেনখানি ষ্টেশনে দাঁড়াইবামাত্র ইণ্টারমিডিয়েট গাড়ী হইতে একটা বিষম কোলাহল উত্থিত হইল। জনকতক লোক ব্যস্ত হইয়া নামিয়া পড়িয়া "বাবু— বাবু—গার্ডসাহেব" বলিয়া চীৎকার আরম্ভ করিল।

গোলমাল শুনিয়া লণ্ঠনহস্তে রাখাল সেদিকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"ক্যা হুয়া —ক্যা হুয়া ?" তিন চারিজন সমস্বরে বলিয়া উঠিল—"একঠো আদমি মর গিয়া বাবু।"

"কাঁহা—কাঁহা ?"—বলিয়া রাখাল গাড়ীর কাছে গেল।

"দেখিয়ে না"—বলিয়া তাহারা গাড়ী দেখাইয়া দিল।

রাখাল প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে দাঁড়াইয়াই, খোলা দরজাপথে উঁকি দিয়া দেখিল, গাড়ীর মেঝের উপর সন্ন্যাসীবেশধারী কাহার মৃতদেহ পড়িয়া আছে। কামরার ভিতর প্রবেশ করিতে তাহার সাহস হইল না।

অন্যান্য গাড়ী হইতেও লোক নামিয়া আসিয়া সেখানে ভীড় করিয়া দাঁড়াইল।

রাখাল জিজ্ঞাসা করিল—"কেমন করিয়া মরিল ?"

আরোহীরা বলিল—"ফতুয়া ষ্টেশন অবধি বাবাজী বেশ আসিয়াছিলেন— আমাদের সঙ্গে কত গল্পগুজব করিয়াছেন। গাড়ী ফতুয়া ছাড়িলেই, গাঁজা সাজিবেন বলিয়া ছিলিম বাহির করিলেন, থলি হইতে গাঁজা বাহির করিতে করিতে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। ক্রমে কাঁপুনি অত্যন্ত বাড়িয়া গেল। ভয়ানক জোরে হাত পা ছুড়িতে লাগিলেন। দুই একজন তাঁহার হাত ধরিতে

গিয়াছিল, কিন্তু সামলাইতে পারিল না। তাহার পর বাবাজী গাড়ীর মেঝের উপর পড়িয়া গেলেন। মুখে ফেনা ভাঙ্গিতে লাগিল। তাহার পর সমস্ত থামিয়া গেল। আমরা নাকে হাত দিয়া দেখিলাম, নিঃশ্বাস নাই।"

রাখাল বলিল—"কতক্ষণ এরূপ হইয়াছে?"

"দশ মিনিট, কিম্বা আরও বেশী।"

ইতিমধ্যে গার্ডসাহেব আসিয়া পৌঁছিলেন। সকল কথা শুনিয়া তিনি রাখালকে বলিলেন—"লাস নামাইয়া লউন।"

রাখাল বলিল—"এখানে লাস নামাইয়া কি হইবে? এখানে ডাক্তার নাই, পুলিস নাই।"

গার্ড বলিলেন—"সে হইবেনা। গাড়ীতে মৃতদেহ রাখার নিয়ম নাই। পুলিসকে, ডাক্তারকে যথারীতি অ্যাক্‌সিডেণ্ট মেসেজ দিলেই তাহারা আসিবে।"

অগত্যা তখন লাস নামাইতে রাখাল বাধ্য হইল। চারিজন খালাসী, কামরার মধ্যে প্রবেশ করিয়া, ধরাধরি করিয়া সন্ন্যাসীর মৃতদেহ নামাইল। গার্ডসাহেব আরোহীগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"গাড়ীতে ইহার জিনিষপত্র কি কি আছে?"

আরোহীরা একটা ট্রাঙ্ক, একটা কমণ্ডলু এবং একখানা কম্বল দেখাইয়া দিল।

জিনিষগুলি নামাইয়া, সেগুলির দুইটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া একখানিতে রাখালের সহি লইয়া গার্ডসাহেব আপনার কাছে রাখিলেন, একখানি নিজে সহি করিয়া রাখালকে দিলেন। এই সমস্ত করিয়া গাড়ী ছাড়িতে প্রায় পনেরো মিনিট বিলম্ব হইয়া গেল। সেই ইণ্টারমিডিয়েট গাড়ী হইতে সকল আরোহী নামিয়া ইতিমধ্যে অন্যান্য গাড়ীতে উঠিয়া পড়িয়াছিল।

গাড়ী ছাড়িলে, পরবর্ত্তী ষ্টেশনে সংবাদ দিয়া রাখাল আবার প্ল্যাটফর্ম্মে বাহির হইয়া আসিল। সিগ্‌ন্যাল্‌ম্যান্‌কে জিজ্ঞাসা করিল—"লাস কোথা রাখা যায়? প্ল্যাটফর্ম্মে ফেলিয়া রাখা ত উচিত নহে—শৃগাল কুকুরে টানাটানি করিবে।"

সিগ্‌ন্যাল্‌ম্যান্ বলিল—"পার্শেল গুদামে?"

"সেই ভাল"—বলিয়া রাখাল চাবি আনিয়া, পার্শেলগুদাম খুলিয়া, সন্ন্যাসীর মৃতদেহ স্থানান্তরিত করিল। তাহার জিনিষপত্রও সেখানে রাখাইয়া গুদাম বন্ধ করিয়া, আপিসে ফিরিয়া অ্যাক্‌সিডেণ্ট মেসেজ লিখিতে বসিল।

খালাসীরা আসিয়া বলিল—"বাবু মড়া ছুঁইয়াছি, বাড়ী গিয়া স্নান করিতে হইবে।"

রাখাল বলিল—"যাও।"

সিগ্‌ন্যাল্‌ম্যান্‌ আসিয়া বলিল—"বাবু, এখন কোনও মালগাড়ী আছে কি ?

রাখাল দুইদিকের ষ্টেশনে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, কোনও গাড়ী নাই। তাহা শুনিয়া সিগ্‌ন্যাল্‌ম্যান্‌ বলিল "তবে যদি হুকুম দেন ত একবার বাসায় যাই। আমার স্ত্রী পীড়িতা। দুইটার সময় আসিব।"

রাখাল বলিল—"যাও।"

অ্যাক্‌সিডেণ্ট মেসেজ দিয়া, টেলিগ্রাফের কলে ঘণ্টা লাগাইয়া রাখাল শয়ন করিল।

বাহিরে মাঝে মাঝে মেঘগর্জ্জন হইতেছে। রাখালের ঘুম আসিল না। সে একবার নিজের কথা, একবার মৃত সন্ন্যাসীর কথা চিন্তা করিতে লাগিল।

ভাবিল—কে এ সন্ন্যাসী ? বাঙ্গালী কি ? না, বোধ হয় হিন্দুস্থানী। আকার প্রকার যেন হিন্দুস্থানীরই মত। কোথায় যাইতেছিল কে জানে! বোধ হয় বৈদ্যনাথ কি পুরীতে যাইতেছিল। কল্য প্রাতের ট্রেণে যখন মোকামা হইতে পুলিস আসিবে, তল্লাসী করিবে—তখন উহার টিকিটখানি দেখিলেই বুঝা যাইবে।

নিজের কথা ভাবিল—কাশীর পাস লইয়া মুস্কিল করিয়াছি। কাশীতে গিয়া আমি কি করিব ? সন্ন্যাসী হইব ? বড় কষ্টের জীবন। এই যে একজন সন্ন্যাসী গাড়ীতে বিঘোরে প্রাণ হারাইল—ইহার সম্ভবতঃ এমন কেহ নাই যে মরিয়াছে বলিয়া দুইবিন্দু অশ্রুপাত করে। তা—আমারই বা কে আছে ? আমি মরিলেই বা কে কাঁদিবে ? আমি ত এখন সন্ন্যাসী না হইয়াও সন্ন্যাসী—ফকির —একবারে ফকির। একমাস বসিয়া খাইবার আমার সংস্থান নাই। যাই, কাশী-তেই যাই—মা অন্নপূর্ণা আছেন, সেখানে কেহই না খাইয়া মরে না শুনিয়াছি। অদৃষ্টে কি শেষে এই লেখা ছিল ?

আবার সন্ন্যাসীর কথা আলোচনা করিতে লাগিল—ঐ সন্ন্যাসীও কি আমারই মত ফকির—আমারই মত নিঃস্ব ? বোধ হয় না। ও ত তৃতীয় শ্রেণীতে যাইতেছিল না—দেড়া মাশুলের গাড়ীতে যাইতেছিল। পশ্চিমের লোক একটু সম্পন্ন না হইলে আর দেড়ামাশুলের টিকিট ক্রয় করে না। অনেক অর্থশালী সন্ন্যাসীও ত আছে শুনিয়াছি। সন্ন্যাসী হইলেই সকলেই

কিছু ফকির হয় না। আচ্ছা, উহার ঐ বাক্সে যদি টাকা থাকে! কত-টাকা আছে কে জানে! একশত, না দুইশত, না হাজার, না তাহারও বেশী? কল্য পুলিশ আসিয়া বাক্স খুলিবে—তখন জানা যাইবে। টাকা গুলা কতক পুলিশ খাইয়া ফেলিবে—কতক সরকারে জমা দিবে।

এমন সময়ে, হঠাৎ একটা কথা রাখালের মস্তিষ্কে উদিত হইল। তখনি বাহিরে দেবতা গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। সে শব্দ শুনিয়া রাখাল আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ আবার নিজের আসন্ন অবস্থার কথা ভাবিল। সেই গোপনীয় কথাটি আবার তাহার মনে নানা দিক দিয়া উঁকি দিতে লাগিল।

ভাবিল—এ সন্ন্যাসীর বাক্সে যদি অনেক টাকা কড়ি থাকে—আমিই কেন তা গ্রহণ করি না?—পুলিসে কেন খাইবে—সরকারের অফুরন্ত ভাণ্ডারে কেন তাহা যাইবে?

কৈ, এবার ত অন্তর্য্যামী দেবতা ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন না?

রাখাল মনে মনে তর্ক করিতে লাগিল—যদি লই, তাহাতে দোষ কি? যাহার টাকা, সেত আর তাহা ভোগ করিতে পাইবে না! কাহারও ত অনিষ্ট করিতেছি না! আমি যদি পাহাড়ে বেড়াইতে গিয়া একটা মস্ত হীরা কুড়াইয়া পাই, লইনা কি? কেন লইব না?—উত্তম সুযোগও উপ-স্থিত হইয়াছে। ষ্টেশনে কেহই ত এখন নাই। যাই, পার্শেলগুদাম খুলিয়া সন্ন্যাসীর দেহে অনুসন্ধান করি, নিশ্চয়ই বাক্সের চাবি পাইব।

এই সময় আবার বৃষ্টি আরম্ভ হইল। ষ্টেশনের টিনের ছাদের উপর বড় বড় ফোঁটা পড়িয়া টং টং করিয়া শব্দ হইতে লাগিল।

রাখাল ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিল। জুতা পায়ে দিয়া, চাবি ও লণ্ঠন লইয়া, আপিস হইতে বাহির হইয়া, দুইবার সমস্ত বারান্দাটায় পায়চারি করিল। কেহ কোথাও নাই। এমন অন্ধকার, এমন বৃষ্টি, চোরের পক্ষে এমন উত্তম সুযোগ আর কি হইতে পারে!

রাখাল তখন পা টিপিয়া টিপিয়া পার্শেলগুদামের সম্মুখে উপস্থিত হইল। বাতিটি নামাইয়া রাখিয়া তালাটি খুলিবার জন্য তাহা বামহস্তে ধরিল। কিন্তু তাহার হাত ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। দক্ষিণ হস্ত হইতে চাবির গুচ্ছ পড়িয়া ঝম্ ঝম্ শব্দ হইল।

দাড়াইয়া রাখাল ভাবিতে লাগিল—দ্বার খুলিয়া যদি দেখি, সন্ন্যাসী

দানা পাইয়া উঠিয়া বসিয়া আছে! যদি আমাকে দেখিয়া সে অট্টহাস্য করিয়া উঠে! ভয়ে রাখালের বুক দুরু দুরু করিতে লাগিল। তখন চাবি ও বাতি উঠাইয়া লইয়া, কম্পিত পদে আবার সে আফিস কক্ষে ফিরিয়া গেল।

চেয়ারে বসিয়া কয়েক মিনিট রাখাল চিন্তা করিল। নিজের দুর্ব্বলতায় লজ্জিত হইয়া মনে মনে বলিল—"আমি কি বালক, না স্ত্রীলোক, না অজ্ঞ গ্রাম্যকৃষক যে ভূতের ভয়ে পলাইয়া আসিলাম? যে মরিয়াছে সে আবার দানা পাইয়া উঠিয়া বসিবে কেমন করিয়া? আমার হাতের কাছে এই একটি সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে—আমি কি এইরূপ ছেলেমানুষী করিয়া তাহা হারাইব? না, তাহা কখনই হইবে না। আমি যাইব—দেখিব আমার অদৃষ্টে কি আছে।

ঘড়ির পানে চাহিয়া দেখিল, দুইটা বাজিতে আর কুড়ি মিনিট বাকী আছে। আর অধিক সময় নাই—দুইটার সময় সিগ্‌ন্যাল্‌ম্যান্‌ আসিয়া উপস্থিত হইবে তখন সমস্তই পণ্ড হইয়া যাইবে!

রাখাল তখন দৃঢ়চিত্ত হইয়া, চাবি ও লণ্ঠন দৃঢ়মুষ্টিতে ধারণ করিয়া আবার পার্শেলগুদামের দ্বারে উপস্থিত হইল। চাবি খুলিয়া গুদামে প্রবেশ করিয়া, ভিতর হইতে দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

নানা আকারের ছোট বড় পার্শেল, ফলের টুকরী, মুখআঁটা টিনের ক্যানেস্তারা প্রভৃতি মেঝের উপর চারিদিকে ছড়ান রহিয়াছে। মধ্যস্থলে গৈরিকবস্ত্রপরিহিত সেই মৃতদেহ। লণ্ঠনের আলোক মৃতসন্ন্যাসীর মুখের উপর ফেলিয়া দূর হইতে রাখাল কিয়ৎক্ষণ তৎপ্রতি চাহিয়া রহিল।

যখন দেখিলাম সে দেহে স্পন্দনমাত্র নাই—তখন সে জুতা পরিত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল।

কাছে দাঁড়াইয়া সন্ন্যাসীর মুখের প্রতি আবার সে দৃষ্টিপাত করিল। লোক-টির বয়স ত্রিশ বৎসর বলিয়া অনুমান হইল। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ সুশ্রী পুরুষ—মাথায় বড় বড় চুল—জটা পাকাইয়া গিয়াছে। মুখে গোঁফদাড়ি রহিয়াছে—কিন্তু তাহা পরিমাণে তেমন অধিক নয়। চক্ষুযুগল উল্টাইয়া রহিয়াছে। সেই ভূলুণ্ঠিত জটাজাল, সেই নিমেষবর্জ্জিত শূন্য চাহনি—বর্ত্তিকালোকে দেখিতে দেখিতে রাখালের মনে আবার কেমন আতঙ্কসঞ্চার হইল। কিন্তু প্রাণপণ-চেষ্টায় বল সংগ্রহ করিয়া, হাটু গাড়িয়া রাখাল সেখানে বসিল। মৃতদেহ হইতে

বস্ত্রাবরণ উন্মোচন করিয়া কোমরে হাত দিয়া চাবি খুঁজিতে লাগিল। দেখিল, সন্ন্যাসীর কটিবস্ত্রে একটি রেশমী কাপড়ের "বাটুয়া" বাঁধা রহিয়াছে। বাটুয়ার ফাঁস খুলিয়া দেখিল, তাহাতে দুইটি চাবি, একখানি টিকিট এবং কিছু টাকা ও রেজকি রহিয়াছে।

চাবি দুইটি বাহির করিয়া, তোরঙ্গটি রাখাল খুলিয়া ফেলিল। ভিতর হইতে নানা বিচিত্র জিনিষ বাহির হইতে লাগিল—যথা দুইখানি গেরুয়া রেশমী কাপড়, একটি মশারি, একখানি গোল আয়না, সোণার চেনসুদ্ধ একটি ওয়াচ, একযোড়া গৈরিকবর্ণ পশমী চাদর, একটি মোমবাতি দুইটি দিয়াশলাই, একটি জলখাবার ঘটি, একখানি হিন্দী ভাগবত, একখানি রামায়ণ এবং সর্ব্বশেষে একটি বড় থলি—বেশ ভারি বোধ হইল—এবং অষ্টেপৃষ্ঠে দড়ি জড়ান গেরুয়াবস্ত্রে বাঁধা একটি দপ্তর।

থলিটি ও দপ্তরটি বাহিরে রাখিয়া, বাকী সমস্ত জিনিষ রাখাল আবার বাক্সে ভরিয়া দিল। থলিটিতে রাখালের প্রয়োজনীয় দ্রব্যই আছে—বেশ ঝম্ ঝম্ করিতেছে। ভাবিল, কে জানে, ইহাতে সবই রূপার টাকা—না মোহরও আছে। দপ্তরটিতে কাগজ আছে—টিপিয়া বোঝা যায়—নোট থাকিতে পারে ত? যদি নোট থাকে, সবগুলিই নোট হয়—তবে কত হাজার টাকা কে জানে! বাক্সটি বন্ধ করিয়া, চাবি বটুয়াতে পুনঃ স্থাপিত করিয়া, টিকিটখানি, রাখাল আবার পরীক্ষা করিয়া দেখিল। সন্ন্যাসী সিরাথু হইতে আসিতেছে, হাওড়া যাইতেছিল। বাটুয়ার মুখ বন্ধ করিয়া, দেহটি পূর্ব্বমত বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া, বগলে দপ্তর এবং বামহস্তে থলি লইয়া রাখাল উঠিয়া দাঁড়াইল। লণ্ঠনটি মৃতের মুখের দিকে আবার ফিরাইয়া ভয়চকিতনেত্রে কয়েক মুহূর্ত্ত চাহিয়া রহিল। কিন্তু এ কি!—কি সর্ব্বনাশ! সন্ন্যাসী হাসিতেছে! পূর্ব্বে তাহার ওষ্ঠযুগল সংযুক্ত ছিল, তাহা ফাঁক হইয়া গিয়াছে! দুই পাটি দন্ত দেখা যাইতেছে। রাখাল তীরবেগে দরজার পানে ছুটিল,—দরজা খুলিয়া, জুতা বাহির করিয়া লইয়া, কম্পিতহস্তে সশব্দে কপাট বন্ধ করিয়া দিল। কম্পিতহস্তে কোনও মতে তালা বন্ধ করিয়া, কম্পিত দ্রুতপদে আপিস কক্ষে ফিরিয়া গেল। একটা দেরাজ টানিয়া, থলি ও দপ্তর লুকাইয়া রাখিয়া, সোরাই হইতে জল ঢালিয়া ঢক্ ঢক্ করিয়া রাখাল দুই গেলাস পান করিয়া ফেলিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ হইতে ঘর্ম্ম ঝরিতেছে। আপিস-কক্ষ অত্যন্ত গরম বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু বাহিরে গিয়া একটু বেড়াইতেও সাহস হইল না—বাহিরে অন্ধকার—ভীষণ অন্ধকার।

আর, বাহিরে সেই—যে হাসিয়াছে। যদি আসে—এই খানে আসিয়া উপস্থিত হয়—বলে—আমার টাকার থলি দাও—আমার নোটের বস্তা দাও? তবে কি হইবে? না তা কি আসিতে পারে? দরজায় তালাবন্ধ আছে যে। কিন্তু—উহারা—(উহারা) কি তালা দরজা মানে?

হঠাৎ বাহিরে পদশব্দ হইল।

কে আসে? —ভয়ে রাখালের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল—বিস্ফারিত নেত্রে মুক্ত দ্বারের পানে সে মুখ ফিরাইল। দেখিল—মৃতসন্ন্যাসী নহে—প্রেত নহে—সিগ্‌নাল্‌ম্যান্ মহাবীর সিং।

তাহাকে দেখিয়া, রাখালের দেহে যেন প্রাণ ফিরিয়া আসিল। বলিল—"মহাবীর সিং—এত দেরী করিয়া আসিলে?"

মহাবীর সিং ঘড়ির পানে চাহিয়া বলিল—"না বাবু—এই ত দুইটা বাজিল। আপনি ত আমাকে দুইটা অবধি ছুটি দিয়াছিলেন।"

রাখাল বিকৃতস্বরে বলিল—"হ্যাঁ, ছুটি ত দিয়াছিলাম। কিন্তু গুদামে একটা মড়া পড়িয়া রহিয়াছে—আপিসে আমি একলা—একটু শীঘ্র শীঘ্র আসিতে হয় না?"

মহাবীর সিং হা হা করিয়া হাসিয়া বলিল—"বাবু, আপনি কি ভয় পাইয়াছেন? ভয় কি? মরা মানুষকে জ্যান্ত মানুষ কি ভয় করিবে? কিছু ভয় নাই বাবু। আপনি শয়ন করুন।"

রাখালের অনুরোধক্রমে বাকী রাত্রিটুকু সিগ্‌ন্যাল্‌ম্যান্ আপিসকক্ষের মেঝেতেই শয়ন করিয়া রহিল।

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

সম্পাদকের কর্ত্তব্য।

(১)

দেখিতেছি, ঘরে ঘরে মাসিক পত্র গজাইয়া উঠিল। বাঙ্গালার সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্র সকলের একটা ভঙ্গী বুঝিতে পারি, কিন্তু মাসিক পত্রের ভঙ্গী, সুর, প্রকৃতি, উদ্দেশ্যে কিছুই বুঝিতে পারি না। বিলাতী মাসিক পত্র নিয়মিতরূপে পড়িয়া থাকি, তাহাদের বিধিনিষেধের বিন্যাস বুঝিতে পারি,—বুঝিয়া তাহাদের সিদ্ধান্ত সকল বুদ্ধির মানদণ্ডে ওজন করিয়া লইতে পারি। কিন্তু বাঙ্গালার মাসিক পত্র—

সে বড় কঠিন ঠাঁই।
গুরু শিষ্যে দেখা নাই।

ধর্ম্মমত, রাজনীতির মত, দল, সম্প্রদায় বা পদার্থ বিজ্ঞানের বা ব্যবসায় বাণিজ্যের বিষয় লইয়া বিলাতে মাসিক পত্রের প্রচার হইয়া থাকে। বাঙ্গলায় যাহার পয়সা আছে, খেয়াল আছে, অর্থ অপচয়ের প্রবল আকাঙ্ক্ষা আছে, অথবা অর্থ উপার্জ্জনের সূক্ষ্ম চাতুরী জানা আছে, সেই মাসিক পত্র বাহির করে। লেখকের শ্রেণী বিভাগ নাই;—সবাই সকল কাগজে লিখিতে পারে, লিখিয়া থাকেও। বাঙ্গালার সমাজগত, ধর্ম্মগত, ও ব্যবহারগত বিশৃঙ্খলা এই এক মাসিক পত্র প্রচারেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। কেন এত কথা মুখপাতেই বলিতে হইতেছে, তাহার কৈফিয়ৎ দিব।

গত ফাল্গুন মাসের "প্রবাসী" পত্রের ৫৪২ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় প্যারার মাঝখানে সম্পাদক একটি টীপ্পনী করিয়াছেন, তাহা এই :—

"মাসিক পত্রের পাঠকেরা জানেন যে, সম্পাদক সমুদয় প্রবন্ধ লেখেন না, কখন কখন একটিও লেখেন না, এবং প্রবন্ধ লেখকদের মতের সঙ্গে সম্পাদকের মতের মিল থাকা না থাকা দুইই সম্ভব। কিন্তু সকল পাঠক ইহা জানেন না, যে সম্পাদক সমালোচনার্থে প্রাপ্ত সমস্ত বহির সমালোচনা করেন না, কখন কখন এক খানিরও করেন না, এবং যে সকল বহির সমালোচনা তিনি করেন না, অধিকাংশ স্থলে তাহা তিনি না পড়ায় তৎসম্বন্ধে তাঁহার অনুকূল বা প্রতিকূল কোন মতই থাকিতে পারে না। অতএব ইহা বলা বাহুল্য মাত্র যে সমালোচকদিগের মতের সহিত তাঁহার মতের মিল আছে কি না, এ প্রশ্ন অধিকাংশ স্থলে উঠিতেই পারে না। বস্তুতঃ প্রবন্ধলেখকগণের মতের সহিত সম্পাদকের মতের মিল না থাকিলেও যেমন অনেক প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়, তেমনি কোন কোন সমালোচনা সম্পাদকের মতের বিপরীত হইলেও তাহা ছাপা হইতে পারে।"

কি অদ্ভুত কথা! এমন কথাতো পূর্ব্বে কখনই কোন সম্পাদকের মুখে শুনি নাই। বঙ্কিমচন্দ্র, পণ্ডিত দ্বারকানাথ, অক্ষয়চন্দ্র, যোগেন্দ্রনাথ, কালী প্রসন্ন ঘোষ প্রভৃতি পূর্ব্বগামী সম্পাদকগণের সহিত আমার অল্পবিস্তর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল এবং এখনও আধুনিক বহু সম্পাদকের সহিত আমি পরিচিত। নিজেও জীবনের কুড়ি বৎসর কাল এই কাজেই ব্যয় করিয়াছি; কিন্তু এমন মত —সম্পাদকের কর্ত্তব্যের এমন নির্দ্ধারণ কখনও কাহারও মুখে শুনি নাই, নিজেও কখনও কল্পনার স্বপ্নেও ভাবিয়া পাই নাই। জানি বটে, মাসিক পত্রের সম্পাদককে প্রায় কিছুই লিখিতে হয় না; কিন্তু একেবারেই কলম চালাইতে হয় না কি? প্রত্যেক মাসিকপত্রের লিখন পদ্ধতি ভিন্ন এক একটা কাগজের যে এক একটা

style থাকে, তাহা বজায় রাখিবার জন্য কাট ছাঁট করিতে হয় না? একটা দল, একটা সম্প্রদায় বা মতবাদ বিশেষ লইয়া এক একটা মাসিক পত্র। সেই দল বা সম্প্রদায়ের মতকে ঠিক রাখিবার জন্য সকল প্রবন্ধ কি সম্পাদককে দেখিয়া দিতে হয় না? যদি মতবিরোধ ঘটে, তাহা হইলে কি সে বিরোধের বা বিভিন্নতার উল্লেখও করিতে নাই? তবে কি সম্পাদক ঝুলি ভরিবার জন্য মলাটে নামটি ছাপাইয়া রাখেন? তাহার পর পুস্তক সমালোচনার কথা। সম্পাদক যদি স্বয়ং সকল পুস্তক নিজে পড়িয়া সমালোচনা না করিতে পারেন, তবে যিনি সে কাজ করিবেন বা করিয়া থাকেন, হয় সমালোচনার নীচে তাঁহার নাম ছাপিতে হইবে, নহেত সম্পাদককে সকল দায়িত্ব গ্রহণ করিতেই হইবে। ইহাইত আমরা জানি, এবং এই নিয়ম অনুসারে প্রায় সকল কাজ করিয়া থাকি। সম্পাদক যখন শাদার উপর কালির আঁচড় দিয়া এই অপরূপ মত প্রকাশ করিতেছেন, তখন বলিতে হইবে প্রবাসীর সমালোচনার কোন মূল্যই নাই। ভুল যে কাহারও হয় না, এমন কথা বলি না, মানুষ মাত্রকেই ভ্রম প্রমাদে পড়িতে হয়। সে ভ্রম পরের সংখ্যায় সংশোধন করিয়া দেওয়া চলে,অনেকে দিয়াও থাকেন। কিন্তু কখনও কোন সম্পাদককে বলিতে শুনি নাই যে, আমি কুটস্থ চৈতন্যরূপে কেবল বিরাজ করিতেছি, আমি বহি পড়ি না, প্রবন্ধ রচনা করি না, মতামতের জন্য ভাল মন্দের জন্য আমি দায়ী নহি। কেবলই কি এইটুকু? সম্পাদক যেন ধরিয়া লইতেছেন যে, সম্পাদকের সহিত মতের মিল না থাকিলেও যেমন খোস্ মেজাজে বহালতবিয়তে প্রবন্ধ বাহির হয়, তেমনি সমালোচনাও বেওজর বাহির করিয়া দেওয়া হয়। এই কথাটা ভারতের অন্য প্রদেশের সাহিত্যসেবিগণ শুনিলে ত বিস্ময়ে অবাক হইয়া থাকিবেন; তাঁহারা নিশ্চয়ই ভাবিবেন বাঙ্গলা দেশটা হইল কি? গতিকেই এমন আজগুবী মতের তীব্র প্রতিবাদ করিতেই হয়, চুপ করিয়া থাকা যায় না।

সম্পাদকের কর্ত্তব্যের এই বিবৃতি পাঠ করিয়া শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দাসের এবং শ্রীযুক্ত জলধর সেনের সীতা ও সীতাদেবীর তুলনায় সমালোচনা পাঠ করিয়া, হাসিব কি কাঁদিব তাহা স্থির করিতে পারিলাম না। অবিনাশচন্দ্রের সীতা যখন প্রথম বাহির হয়, তখন উহার প্রকাশের সহিত আমার একটু সম্বন্ধ ছিল; তখন অবিনাশচন্দ্রের সীতা প্রবাসীর দলের তেমন আদর পায় নাই। তাহার পর উহার কয়েকটি সংস্করণ হইয়াছে—পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত জলধর সেনের সীতাদেবীর প্রচার তত্ত্বও আমরা জানি, বুঝি। যে শ্রেণীর পাঠকের জন্য সীতাদেবী, সে শ্রেণীর পাঠকের জন্য সীতা নহে। জলধরের পুস্তক বালক এবং কিশোর-কিশোরীর জন্য লিখিত। ইহা ছাড়া আরও একটু কথা আছে, রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী যে লিখিবে সেই চুরি করিবে। পিপাসা নিবৃত্তির জন্য গঙ্গাজল বা কলের জল সকলকেই সমানভাবে গ্রহণ করিতে হয়। অবিনাশচন্দ্রের পুস্তকেও নূতন কথা নাই, জলধরের পুস্তকেও নূতন কথা নাই—সেই একঘেয়ে, একটানা গঙ্গা-তরঙ্গ-ভঙ্গ মাত্র। কেহ বা গভীর জলের তরঙ্গ

পারম্পর্য্য বুঝাইয়াছেন, কেহ বা বেলা ভূমির বীচিবল্লরী বিতাড়ন করিয়াছেন। যে কথা ও যে গাথা জাতির মেদমজ্জার সহিত জড়ান মাখান রহিয়াছে তাহার আবৃত্তিতে চুরি হয় না। ইহাকে চুরি বলিলে চোর সবাই। এক বাছিতে গাঁ ওজোড় হইবে। এমন চুরি ধরা সমালোচনা নহে, উহা সাহিত্যের টিকৃটিকিগিরি—"মক্ষিকাঃ ব্রণমিচ্ছন্তি" বাক্যের সার্থক পরিচয়। সম্পাদক-সমালোচক বলিতেছেন যে, সীতার জীবনকথা বাল্মীকি রামায়ণের একস্থলে নিবদ্ধ নাই; অবিনাশ বাবু রামায়ণ সাগর ছানিয়া উহা বাহির করিয়াছেন। শ্রীমান অবিনাশচন্দ্রকে ছোট করিবার আমাদের ইচ্ছা নাই, প্রবাসী সম্পাদকের অজ্ঞতা ফুটাইয়া তুলিবার আমাদের প্রবৃত্তি নাই, তবে যাঁহারা হিন্দী পুরাতন সাহিত্যের খবর রাখেন, তাঁহারা জানেন, কে কোথা হইতে কি পাইয়াছেন। সম্পাদকের কর্ত্তব্য বিষয়ে এবার পরিস্কার করিয়া কিছু বলিতে পারিলাম না। সে অনেক কথা, ধীরে ধীরে বলিব। সাহিত্যের নামে সমাজে যে উপদ্রব উপস্থিত হইয়াছে. সেটুকু ফুটাইয়া না বলিলে আর চলিতেছে না। কালি কলম, কাগজ লইয়া লিখিতে জানিলেই যে লেখক হওয়া যায় না, এই কথাটা বুঝাইয়া দিতে হইবে। এই পরিবর্ত্তনের যুগে সমাজে যে ওলট্ পালট্ ঘটিতেছে তাহা দেখিয়া ও বুঝিয়া যিনি লেখনা চালনা করিতে না পারেন, তাঁহার পক্ষে সম্পাদকের আসন অধিকার বিড়ম্বনা মাত্র। শ্রোতা ও পাঠকের ভাবনা না ভাবিয়া যিনি যা-তা লিখিতে সাহস করেন, তাঁহার এমন দুঃসাহসের সঙ্কোচ করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এবার এই টুকু ইঙ্গিত করিয়া রাখিলাম মাত্র।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

দল ও পরিমল

ওগো গন্ধ, তোমায় কেমন করে' বন্ধ করে' রাখি,
ভাবছি বসে' মনে;
পরাগ মাঝে লুকিয়ে তোমায় কেশর দিয়ে ঘিরে'
পাতার আবরণে,
অন্ধ হয়ে থাকব আমি, ফুটব নাক তবু
যতক্ষণ না ঝরি—
মুগ্ধজনের এ অনুরাগ সইতে পারবে তুমি,
জীবন-সহচরি?
পাপড়ি-ঘেরা মর্ম্ম-কোষের রক্ত এবং রেণু,
যা আছে তাই নিয়ে
তৃষ্ণা তোমার মিট্‌বে সখি, থাক্‌তে পারবে তুমি,
ওগো পরাণপ্রিয়ে!

গন্ধ কহে নিশ্বসিয়া, ওগো হৃদয়স্বামি,
এ অনুযোগ কেন ?
তুমি ছাড়া কোথায় আমি ? তোমার মাঝে শুধু
গর্ব্ব আমার জেন'।
আমি যদি তোমার মাঝে বন্ধ থাকি, তবে
তুমিই কি তা পাবে ?
বন্ধ করে' রাখ্‌তে গিয়ে অন্ধ হয়ে তোমার
আনন্দ যে যাবে !
পর্ণ তোমার ফুটাও বন্ধু, গন্ধ ছুটাও লোকে,
বর্ণে উঠ ভরি'—
মৃত্যু যখন আসবে তখন তোমার কোলে শুয়ে
পড়্‌ব ভুঁয়ে ঝরি।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

চিত্রকথা।

উদুম্বরা-মহোষধ বৌদ্ধজাতক হইতে সুপ্রসিদ্ধ চিত্রকর শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ লাহা মহাশয় এই চিত্রখান অঙ্কিত করিয়াছেন। রাজকুমারী উদুম্বরা দেবী স্বীয় সহোদর কুমার মহোষধকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত উপদেশ দিতেছেন। রাজকুমারী কুমারের জ্যেষ্ঠা ভগিনী, কুমার ষোড়শবর্ষীয় যুবক। কুমার বিবাহের উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়া নিজের মনোরমা পাত্রী নিজেই খুঁজিয়া লইবার জন্য ভগিনীর অনুমতি চাহিতেছেন। কুমার মহোষধের বিবাহের গল্পবিবরণ ও পত্নী-পরীক্ষার রহস্য বেশ আমোদজনক। মানসীর আগামী সংখ্যায় উক্ত গল্পটি আমরা বিবৃত করিব।

গত চৈত্র মাসের মানসীতে চিত্রগৃহাভিমুখিনী নামে যে ত্রিবর্ণ চিত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার চিত্রকর শ্রীমান্ ফণীন্দ্রমোহন বাগচী। শ্রীমান্ ফণীন্দ্রমোহন অল্পবয়স্ক এবং চিত্রকার্য্যে নূতন ব্রতী। তাঁহার চিত্রের নিপুণতা দেখিয়া বিশ্বাস হয়, কালে তিনি চিত্র-বিদ্যায় প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিবেন।

এই প্রসঙ্গে দুঃখের সহিত স্বীকার করিতেছি যে, গত ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হাল্‌দার ও শ্রীমান ফণীন্দ্রমোহনের যে দুখানি ত্রিবর্ণ চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে, ব্লকের জন্য চিত্র দুখানিই আশানুরূপ হয় নাই; আশা করি ভবিষ্যতে আমরা মানসীর পাঠকপাঠিকাবর্গকে সুন্দরতর চিত্র উপহার দিতে পারিব।

মাঃ সঃ

আচার্য্য গৌরীশঙ্করের মৃতদেহ

৫ম ভাগ　　জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০ সাল　　৪র্থ সংখ্যা

অভয়ের কথা

(১)

প্রসঙ্গটী বৈদান্তিক। অত্র পুরুষকার দেবতা। জিদ্ করিয়া হঠপূর্ব্বক আলোচনা করিলে ইহার মর্ম্ম বুঝা যায়। ভক্তির আলোচনা কিন্তু ভগবৎ-প্রেরণা ভিন্ন হয় না। তত্র দৈবই দেবতা। এই দেবতার দেশী নাম কৃপা, বিলাতি নাম Grace। ভালবাসা হয় ত হয়; ইহা কোনও উপায় বা অনুষ্ঠান দ্বারা হয় না। আমরা মনে করি যে, কিছু রূপ, গুণ বা কৃতজ্ঞতা ইহার মূল্য। তাহা নহে। ইহা সহজ। কৃত্রিম উপায় বা পুরুষকার-প্রয়োগ বা কৃচ্ছ্র তপস্যা অত্র বন্ধ্য-প্রসব। বালক সুন্দর হউক বা কুৎসিত হউক, তাহার প্রতি জননীর স্নেহ যথা সহজ, কোনও উপদেশ অনুষ্ঠানের অপেক্ষা রাখে না; তদ্বৎ ভগবানের প্রতি প্রীতি সহজ। ভক্তির রহস্য দুরবগাহ। বোধ হয় বেদান্তই ভক্তির ভিত্তি হইবে। ভিত্তিটা মজবুত হইলে তদুপরি বৃহৎ অট্টালিকার মত মনোহর ভক্তি-মন্দির নিরাপদে বিরাজমান হইতে পারে। বদন সুন্দর হইবে, তবে ত হাসি মধুর হইবে। সুকোমল পুষ্পে সদ্‌গন্ধের মত, যৌবনে লাবণ্যের মত, তৃপ্তিতে রোমাঞ্চের মত, স্থির সমুদ্রে লহরীর নৃত্যের মত বেদান্তাশ্রয়ে ভক্তির জাগরণ হয়, শুনা আছে। আমরা বর্ত্তমান প্রস্তাবে বেদান্তের তাৎপর্য্য অনুসন্ধান করিব। বেদান্তের শুভ জ্যোতিঃ অন্ধকে চক্ষুদান করে। প্রাপ্তচক্ষু দূর হইতে অভয়কে দেখিতে পায়। Moses এমনিই promised Land দেখিয়াছিল। ইহা পরোক্ষ দর্শন। কাঁচা দেখা। পরে পাকা দেখা হয়।

গ্রন্থরচনা দ্বারা শব্দসাহায্যে মনের ভাব প্রকাশ করিতে হয়। বাগ্‌দেবীর একটী চরণতল এই অর্থযুক্ত শব্দের উপর, অভিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত। অভিধানগত শব্দগুলির শক্তি অপরিসীম। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মনের ভাব ব্যক্ত করিবার সামর্থ্য তাহাদের প্রচুর পরিমাণেই আছে। সরস্বতীর প্রাচীন বরপুত্রগুলি তত্তৎ শব্দে অধিক শক্তিযোজনা করিয়া নানা দৃষ্টান্ত রচনা করিয়া গিয়াছেন। আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে উক্ত মূল্যবান্ শব্দ ও দৃষ্টান্তগুলি পাইয়াছি। আমাদের সৌভাগ্য কম নহে। অতিশয় জটীল বেদান্তকথা সেই দৃষ্টান্তগুলির সাহায্যে অপেক্ষাকৃত সুগম হইয়াছে। শুনিয়া থাকিবে গাজীপুরের সর্দ্দার প্রত্যহ দেড়মণ মাংস আহার করিত। প্রথমে দেড়মণ মাংসের চারিসের জগস্যুপ তৈয়ার হইত। পরে সেই চারিসেরে সর্দ্দারের একার উপযুক্ত অন্নব্যঞ্জন পাক হইলে সর্দ্দার প্রত্যহ তাহা ভোজন করিত। আমরা যে সকল দৃষ্টান্ত পাইয়াছি, তাহারা দেড়মণ মাংসসারবৎ গুরু বস্তু। এই প্রবন্ধে যথাসময়ে দৃষ্টান্তগুলির প্রয়োগ করা হইবে। কিন্তু ইহাও দ্রষ্টব্য যে, অনেক সময়ে মনের ভাব শব্দসাহায্যে প্রকাশ করা দুরূহ। মনে মনে যূথিকা ও মালতীর সৌগন্ধের পার্থক্য উপলব্ধি করিয়াও তাহা বাক্যে প্রকাশ করা যায় না। কিন্তু ভাষা নিজের দুর্ব্বলতা জানিয়াও, বালক যথা রাঙ্গাকাপড়কে আঙা কাপড় বলিয়া নির্দ্দেশ করিবার সমুহ চেষ্টা করে এবং অঙ্গুলি প্রদর্শনাদি অভিনয়-সাহায্যে ভাষার ত্রুটী সমাধানে যত্ন করে, তদ্বৎ, কোনও ক্রমে মানস-প্রত্যক্ষ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবগুলিকে অস্ফুট শব্দেরই সাহায্যে শ্রোতৃবর্গের গোচর করিবার চেষ্টা করে ও সময়ে সময়ে কৃতকার্য্যও হয়। কোকিল নিজ চিত্তের ব্যাকুল বেদনানন্দ অস্পষ্টাক্ষর কুহুরবে ও প্রণয়ীগণ অল্পাবয়ব অভিধানিক অর্থশূন্য গদ্‌গদ্ কণ্ঠে স্বপ্নের মত, তরল ছায়ার মত অনিশ্চিত অস্থির উল্লাস বস্তুকে যেন কথঞ্চিৎ ঘনীভূত করিয়াই আমাদের বুদ্ধির গোচর করিয়া তুলে। ইহাও লক্ষ্য করিবার যোগ্য যে, অস্পষ্টাক্ষর হইলেও ভ্রমর-গুঞ্জনাদি অসন্দিগ্ধই বটে। বাগ্‌দেবীর দ্বিতীয় চরণকমল কুহুরব, গদভাষণ, অলিগুঞ্জনে সুপ্রতিষ্ঠিত। উভয় পদেই আমাদের সমান আদর করিতে হইবে। কখনও বা আভিধানিক শব্দ দ্বারা কখনও বা অস্পষ্টাক্ষর ইঙ্গিত দ্বারা এই প্রস্তাবের প্রতিপাদ্য বস্তুকে সমর্পণের চেষ্টা করা যাইবে। উদরান্নের জন্য উদয়াস্ত পরিশ্রম করিতে হয় বলিয়া আমাদের তত্ত্বচিন্তা করিবার সামর্থ্য থাকে না, মস্তিষ্কের একটা জড়িমা স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হয়। যদ্যপি গুরুদেব কোনও কল্যাণকর মন্ত্র উপদেশ করেন, তথাপি আমাদের বুদ্ধির জড়তা বশতঃ আমরা

তাহা গ্রহণ করিতেই পারি না জপ অনুষ্ঠান করা ত দূরের কথা। যাহাই হউক, আমরা অভয়ের কথা যথাসাধ্য আলোচনা করিব। অভয়ের কথাটীর পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়া উত্তম পরোক্ষানুভূতি হইলে পরে তবে অপরোক্ষজ্ঞান হইবে। নচেৎ নহে। যত কিছু বিচার তর্ক যুক্তি প্রাচীন বা নবীন তাহা পরোক্ষানুভূতির জন্য। কথাটী প্রতিপাদন করিবার জন্য হয় ত কোনও একই যুক্তির পুনরুল্লেখ হইবে; তাহাতে পাঠক পাঠিকার অরুচি, বিদ্বেষ হওয়া উচিত নহে।

বখেয়া সেলাই, সেলাইএর পুনঃ পুনঃ পুনরুল্লেখ মাত্র হইয়াও নিন্দ্য নহে, বরং অধিক দৃঢ় ও নিরাপদ। একই হাতুড়ীর পুনঃ পুনঃ আঘাতে প্রেকশলাকা সুপ্রবিষ্ট হয়।

বেদান্তের কথাটী অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু ইহার প্রতিপাদনটী বৃহদবয়ব। আমরা যথাসাধ্য অল্পকলেবরে বেদান্তালোচনা করিব; তাহাতে হয় ত এক নিশ্বাসে সাতকাণ্ড রামায়ণ বলার মত হইবে—অনেক কথা বলিতে বাকী থাকিয়া যাইবে। তথাপি আশা আছে, অস্থি কঙ্কালখানা সমগ্র দিতে পারিব। পাঠক পাঠিকাগণ নিজ নিজ বুদ্ধি রুচি অনুসারে সেই অধিষ্ঠানকঙ্কালে গঠন, বর্ণ, লালিত্য, যৌবন দিয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া লইবেন। বিষয়টীর একটা নিজ মহিমা আছে; আমাদের অপর্য্যাপ্ত আলোচনায় কোনও ত্রুটী থাকিলেও বিষয়ের নিজ মহিমাই বিষয়কে মহিমান্বিত করিয়া রাখিবে।

বিষয়টী আত্মা সৎ চিৎ আনন্দ রস কেবল স্বাস্থ্য অভয় ইত্যাদি নানা নামে অভিহিত। সাবধান! উক্ত নানা নামে নানা পৃথক্ বস্তু বুঝিবে না। বুঝাইবার প্রণালীর নানাত্ব বশতঃই বোদ্ধব্য একই বস্তুর নানা নামকরণ হইয়া থাকে। রামকে বুঝাইবার জন্য নাম দেওয়া যায় সীতাপতি, রঘুবর, দশরথাত্মজ, রাবণারি। রাম কিন্তু একই বস্তু। দৃষ্টান্তটী একটু স্থূল হইল। সীতাপতি, রঘুবর প্রভৃতি শব্দগুলি রামের বিশেষণ। বিশেষণের দুইটী শক্তি, ব্যাবর্ত্তকত্ব ও সমর্পকত্ব। সীতাপতি শব্দে রামকে অন্য রাম হইতে পৃথক নির্দ্দেশ করা হয়; সীতাপতি পরশুরাম নহে, বোকারাম নহে। এবং সীতাপতি শব্দ আসল রামকে সমর্পণও করে। কিন্তু আত্মা, সৎ, চেতন, সামান্য, সমান, অদ্বয়, অভয়াদি পর্য্যায় 'শব্দ'। ইহারা পরস্পর কেহ বিশেষ্য, কেহ বিশেষণ নহে। প্রত্যেকেই স্বয়ং সিদ্ধ। তবে কথা কহিতে গেলে কখনও বা বলিতে হয় সদাত্মা, অহং সৎ, অহং ব্রহ্ম, ইত্যাদি। ইহাতে এমন বুঝিতে হইবে না যে, সৎ শব্দ আত্মার বিশেষণ এবং আত্মাকে সমর্পণ করে, ও অন্য কোন একটা অসদাত্মা হইতে পৃথক্ নির্দ্দেশও

করে। আত্মা ও যাহা,সৎও তাহাই,একই বস্তু। সৎ আত্মা হওয়ায় বটে আত্মাকে সমর্পণ করে সুতরাং সৎ শব্দটা আত্মার বিশেষণ হইব; কিন্তু বিশেষণ নহে। যদি বিশেষণ হইত তবে অন্য কোন রকমারি আত্মা হইতে সমর্পিত আত্মাটার পার্থক্যও দেখাইয়া দিত। বুড়াশিব বাক্যে বুড়াশব্দটী ঠিক বিশুদ্ধ অর্থাৎ সমর্পকত্ব ও ব্যবর্ত্তকত্ব শক্তিসম্পন্ন বিশেষণ নহে। যাহা আছে তাহা বুড়াশিবই। অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এমন ছোকরা শিব নাই যে, বুড়া শব্দ সেই নবীন শিব হইতে বুড়াশিবকে পৃথক্ স্থাপিত করিতে পারে। মাংসাশী ব্যাঘ্র শুনিয়া আমরা, নিরামিষভোজী বৈষ্ণব ব্যাঘ্র অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইব না।

আমরা এই প্রবন্ধে অভয় লোকটীকে বুঝিবার জন্য নানাপ্রকারে যত্ন করিব ও প্রকারভেদে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভয়কেই বুঝিব।

অভয় লোকটার সর্ব্বাপেক্ষা সুপরিচিত নামটা "আমি"। ব্যাকরণ মিথ্যা বলে নাই। আমিটা সর্ব্বনাম। সকল নামের এই আমিতে প্রবেশ হয়—যথা সকল নদী সমুদ্রে প্রবেশ করে,—নিজ নিজ নাম ত্যাগ করিয়াই সমুদ্রে প্রবেশ করে।

এই 'আমি' শব্দটার প্রয়োগবাহুল্য রুচিসঙ্গত নহে। ব্যবহারজগতে এই নিরীহ পরমানন্দ 'আমি' শব্দের সঙ্গে অহংকার শব্দের তাৎপর্য্য যোজিত হইয়া 'আমি' শব্দটাকে অত্যন্ত গর্হিত ও নিন্দনীয় করিয়া তুলিয়াছে। বেদান্তের 'আমি'টাতে গর্ব্ব অহংকারের ছায়ামাত্র নাই। শৈশবে যে সকলের প্রিয় আমি, যৌবনে সেই নিষ্কলঙ্ক আমিতেই মদগর্ব্ব অবুদ্ধি বশতঃ আরোপিত হয়—আমিকে সকলের অপ্রিয় করিয়া তুলে। কিন্তু বস্তুতঃ নিষ্কলঙ্ক 'আমি'কে কলঙ্কিত করিতে পারে না। স্ফটিক জবা সন্নিধানে লাল হইয়াও লাল হয় না। যাহাই হউক শ্রুতিকটুদোষ পরিহারের চেষ্টা করিব। 'আমি' শব্দের উল্লেখ করিবার স্থলে মধ্যে মধ্যে, আত্মা, সৎ, রসাদি শব্দ ব্যবহার করিব। তাহা হইলে পাঠক পাঠিকার গ্রন্থকারের উপর বিদ্বেষ হইবে না এবং গ্রন্থের উপরেও কৃপাদৃষ্টি হইতে পারিবে।

অবশ্য কথাটা আর গোপন রহিল না যে, ইহা আত্মারই প্রসঙ্গ; আমিরই প্রসঙ্গ। আমি যদি বলি যে আমি ক্ষুদ্র নহি; ক্ষুদ্র হইব কেন? আমি মন্ত্রবলে বিরাট পুরুষকে বাধ্য করিয়া নিজ সন্নিধানে আকর্ষণ করিতে পারি ও তাহাকে হৃদ্‌গত বা কবলীকৃত করিতে পারি বা পারে; বিশ্বনিয়ন্তা কেহ যদি থাকে তবে

তাহারও নিয়ন্তা আমি। এরূপ কথা বলিলে কিছু মাত্র গর্ব্ব প্রকাশ করা হয় না। যদি এখন না পার, পরে বুঝিতে পারিবে যে ইহাতে গর্ব্ব নাই। তোমরা পাঠক পাঠিকা যে কেহ আছ,—তোমরাও ত আপনা আপনি প্রত্যেকে নিজে নিজে আমি আমি আমি বলিয়া থাক, বুঝিয়া থাক, শুনিতে পাই। পার যদি, তোমরাও যে কেহ আপনাকে উল্লেখ করিয়া বলিতে পার যে, আমিই আছি বা আছে এবং তাহাই আর যাহা কিছু আছে তাহা আছে। ইহাতে আমাদের পরস্পর কিছু বিবাদ নাই।

জড়শব্দে দৃশ্যমাত্রকে বুঝায়; দ্রষ্টাটার নাম আত্মা, সাক্ষী। দৃশ্য বলিলে চক্ষুর গ্রাহ্য মাত্র বুঝায় না, যাহা বোধগম্য তাহাই দৃশ্য; গন্ধ ও দৃশ্য সঙ্গীত ও দৃশ্য দেশকালও দৃশ্য।

শ্যাম বলে আমি দ্রষ্টা, যদু রাম গাছ পাথর আমির বা আমার দৃশ্য। যদু কেহ থাকে যদি, তবে যদুও বলিতে পারে, আমিই দ্রষ্টা, তুমি শ্যাম প্রভৃতি সকলে আমার দৃশ্য। কলহ ত্যাগ করিয়া বেদান্তের 'আমি'টাকে 'আত্মা'টাকে বুঝিয়া লও। ইহা ব্যাবহারিক অহংকারী আমি নহে। বেদান্তের 'আমি'টা জীবের জীবন, সর্ব্বস্ব, স্বরূপ, নিঃশ্রেয়স। ব্যবহার-জগতে 'আমি' শব্দে দেহটাকে লইয়া, এবং গ্রন্থকর্ত্তা বা পণ্ডিত বা অন্য কিছু উপাধিসহ আমিকে বুঝি। কিন্তু কখনও বা ভুলিয়া সত্য কথাও বলি। যখন বলি যে আমার দেহ, আমার দেহ ভাল নাই, আমার মন, আমার মন বড় ব্যাকুল হইয়াছে, তখন আমি একটা কিম্ভূত বস্তু এবং দেহটা মনটা আমির ঘটী বাটী লাঠী জামার মত আমি হইতে বিলক্ষণ পৃথক্ একটা অন্যতম সম্পত্তিমাত্র, ইহা বলা হইয়া যায়। এই সত্য কথা যদি ব্যবহারকালে ভূয়োভূয়ঃ অপ্রমত্ত থাকিয়া বলা যায়, ইষ্টমন্ত্র হিসাবে জপ করা যায়—সঙ্গে সঙ্গে উক্ত সত্য কথাটা আরও সত্যতর করিয়া বুঝিয়া লওয়া যায়, তবে নিরতিশয় লাভবান্ হওয়া যায়—নৈরাকাঙ্ক্ষ্য হয়; প্রার্থনার বিষয় আর কিছু থাকে না।

দর্শনশাস্ত্রের আলোচনাতে সত্বর নেশা হয় না। একটু বিলম্বে হয়। কিন্তু হইবেই হইবে। বর বিবাহের দিনের উপবাস স্বীকার করে; ক্ষুধার কষ্ট বোধ করিয়াও করে না। বধূলাভের আশা তাহাকে উৎসাহিত করিয়া রাখে। পাঠক পাঠিকাকেও আপাতঃ-কঠোর দার্শনিক প্রবন্ধকে ধৈর্য্য সহকারে পড়িতে হইবে,—কিঞ্চিৎমাত্র; পরে প্রিয় বঁধুর সহ আনন্দ-মিলন হইবে নিশ্চয়।

অনেকগুলি পারিভাষিক শব্দ আছে। তাহাদের ব্যবহার করিতে হইলে

প্রসঙ্গটী academic হইয়া পড়ে। তাহাদের ব্যবহার এই প্রস্তাবে প্রায় পরিবর্জ্জিত হইবে। অথচ কয়েকটীর উল্লেখ অপরিহার্য্য। তাহাদের অর্থ সকলের নির্দ্দোষরূপে জানা নাই। পূর্ব্ব হইতেই তাহাদের অর্থ কিছু বিশদ করিয়া লইব। অধিকরণ, সূত্র, ব্যাবহারিক, প্রাতিভাসিক, অঙ্গাঙ্গী, সমাধি, প্রকৃতি, প্রধান, নিমিত্তোপাদান, বিবর্ত্ত, নির্ব্বাণ, স্বাস্থ্য, নির্ব্বিকল্প, নেতি, অনুগতি, সামান্য, সমান ইত্যাদি শব্দের প্রচার কম। আমরা নেতি, পরোক্ষাপরোক্ষ, অনুগতি ও সমান এই চারিটী শব্দের অর্থ শোধন করিয়া লইব। তাহা হইলে ভবিষ্যতে উক্ত শব্দগুলির সাহায্যে প্রস্তাবটীর কলেবর লঘু করিয়া লওয়া যাইবে। নচেৎ প্রতি উল্লেখে উক্ত শব্দগুলির অর্থ ব্যক্ত করিবার জন্য বৃথা সময়ক্ষেপ করিতে হইবে।

নেতি একটী প্রমাণবিশেষ। দৃশ্য বিষয়ের অস্তিত্ব সম্বন্ধে চক্ষু কর্ণাদি মোটা প্রমাণ; মন বুদ্ধি তদ্বিষয়ে সূক্ষ্মতর অনুমানাদি প্রমাণ সমর্পণ করে। অনুমানাদির মতই একটী অন্যতম প্রমাণ নেতি। নেতির বিলাতী নাম Proof by Exhaustion। ধর একখণ্ড বস্ত্র অপর একখণ্ড বস্ত্রের সমান নহে এবং অধিক নহে, ইহাই জানা আছে। সমান নিষেধ ও অধিক নিষেধ অর্থাৎ, সমান নেতি, অধিক নেতি হওয়ায় ইহা প্রমাণ হইয়া গেল যে, তবে প্রথম বস্ত্রখণ্ডটী দ্বিতীয় খণ্ডাপেক্ষা ন্যূন। নিশ্চয় ন্যূন। এই নিশ্চয়তা নেতিমুখেই পাওয়া গেল।

পরোক্ষাপরোক্ষ :—পরোক্ষ জ্ঞানটী অসম্পূর্ণ, ন্যূন, কাঁচা জ্ঞান; বহুমূল্য হইলেও মহামূল্য নহে। অপরোক্ষ জ্ঞানটী সাক্ষাৎকার, পাকা, বস্তুতন্ত্র জ্ঞান, Realization। ইহা মহামূল্য। আমার একটী দুয়ানী পড়িয়া গিয়াছে, আমি রাস্তার এদিকে ওদিকে খুঁজিতেছি। একজন পথিক বলিল যে, ওহে, তোমার দুয়ানী হারায় নাই। পথিক জানিত না যে, আমার কি হারাইয়াছে; কিন্তু যখন সে দুয়ানীর উল্লেখ করিল, তখন সে অবশ্য তাহা দেখিয়াছে। আমার পরোক্ষ জ্ঞান হইল যে দুয়ানীটী নিকটেই আছে; বেশ নিশ্চয় জ্ঞান। কিন্তু সুনিশ্চয় নহে। যখন পথিক দুয়ানী দেখাইয়া দিল, তখন তৎসম্বন্ধে পাকা সুনিশ্চয় অপরোক্ষ জ্ঞান হইল।

অনেকবারের বরযাত্রীর বিবাহ সম্বন্ধে পরোক্ষ জ্ঞান মাত্র হয়। বরযাত্রীটী বালক হইলে তাহার নিজের বিবাহ হইলেও বিবাহ সম্বন্ধে পরোক্ষজ্ঞান মাত্র হয়। যৌবনে অপরোক্ষ জ্ঞান হয়।

স্বপ্নের পরোক্ষ জ্ঞানই হয়। অপরোক্ষ জ্ঞান এ যাবৎ কাহারও হয় নাই। স্বপ্নকালেই স্বপ্নকে স্বপ্ন বলিয়া কেহ অপরোক্ষ করে নাই।

বন্ধ্যার পালিত-পুত্রের প্রতি স্নেহ পুত্রস্নেহের মত বটে; পরোক্ষ কিন্তু; অপরোক্ষ নহে। প্রসববেদনা ভুক্তভোগীই জানে।

উন্মত্ততার জ্ঞান, মৃত্যুর জ্ঞান, পরোক্ষ। অপরোক্ষ করা হয় ত অসম্ভব।

বিপত্নীকের অবস্থা, যাহার পত্নী বিয়োগ কদাপি হয় নাই, তাহার পক্ষে পরোক্ষ মাত্র। তবে কোনও হতভাগ্যের অপরোক্ষ হওয়া ঘটিতে পারে।

অনেক সময়ে স্ত্রীলোকে কুপিতা হইয়া "শালা" বলিয়া গালি দেয়। শালা শব্দার্থ স্ত্রীলোকের পরোক্ষভাবে জানা থাকিতে পারে, অপরোক্ষ ভাবে জানা থাকে না।

প্রায়শঃ অনুগতি, অনুপ্রবেশ, অনুবৃত্তি, অন্বয় ইত্যাদি শব্দে উপসর্গ "অনু"টী সমাপিকা ক্রিয়ার পূর্ব্বকালিক অসমাপিকা ক্রিয়ার অপেক্ষা রাখে। যথা গৃহস্বামী গৃহনির্ম্মাণ করিয়া তত্র অনুপ্রবেশ করিল। অগ্রগামী প্রভু গমন করিলে ভৃত্য অনুগমন করিল। কিন্তু উপাদান কারণের যখন কার্য্যে অনুগতি, অনুপ্রবেশ, অন্বয় হয়, তখন পূর্ব্বোত্তর কাল-নিরপেক্ষ যুগপৎই অনুগতি ঘটিয়া থাকে।

মাটী, ঘট শরাবের উপাদান কারণ। ঘটাদি কার্য্য। ঘট তৈয়ার হইয়া গেলে শেষে মাটী ঘটে যাইয়া অনুপ্রবেশ করিল, এমনটা হয় না। ঘট তৈয়ারীর সঙ্গে সঙ্গেই মাটী ঘটে অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়া যায়।

লৌকিক দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। ক্ত্বাচ্ প্রত্যয় থাকিলেই পূর্ব্বোত্তর-কালের কথা হইবে এমন নহে। 'মুখংব্যাদায় স্বপিতীতি' বলিলে এমন বুঝায় না যে, লোকটা অগ্রে হাঁ করিল পরে ঘুমাইল।

সমান :—বহুব্যক্তির সমষ্টির নাম রাশি, সমান, সামান্য, জাতি। এক একটী রাশি বা সামান্যকে ব্যক্তি ধরিয়া লইয়া তদ্রূপ রাশিগুলির সমষ্টি লইলে একটী বৃহত্তর রাশি বা সমান বস্তু হয়। বৃহত্তর রাশি বা সামান্য ক্ষুদ্রতর রাশিতে এবং ক্ষুদ্রতর রাশিগত ক্ষুদ্রতম ব্যক্তিতে অনুগত থাকে।

রাম শ্যাম যদু আদি ব্যক্তির সমষ্টির নাম মনুষ্যজাতি, সামান্য। ধবলী শ্যামলী প্রভৃতি গোব্যক্তির সমষ্টির নাম গো-সামান্য বা গো-জাতি।

মনুষ্যজাতি, গোজাতি, গজজাতি, কচ্ছপজাতি প্রভৃতি জাতিগুলিকে ব্যক্তি ধরিয়া তাহাদের সমষ্টি লইলে নাম হয় প্রাণী-সামান্য। এই প্রাণী-সামান্য একটা খুব বড় রাশি। ইহা অর্থাৎ প্রাণিত্ব প্রতি ক্ষুদ্র অংশে মনুষ্যে গোতে গজ কচ্ছপে অনুগত, বিদ্যমান, বর্ত্তমান পাওয়া যায়। এবং মনুষ্য-

জাতিটী নিজাংশ ব্যক্তি রাম শ্যাম যদুতে অনুগত হওয়ায় বৃহত্তর সমান প্রাণিত্বটী মনুষ্যত্বে থাকিয়া সুতরাং মনুষ্যত্বের সঙ্গে রামে শ্যামে যদুতে অনুগত।

নানা গুল্ম বৃক্ষ লতাদির সমষ্টি তদ্বৎ পাওয়া যায়—উদ্ভিদ্-সামান্য। ক্ষয়োদয়-রহিত প্রস্তর সুবর্ণাদি লইয়া একটা জাতি বা সামান্য লওয়া যাইতে পারে।

উক্ত বড় বড় জাতিগুলিকে—প্রাণী, উদ্ভিদ্ প্রস্তরাদিকে লইয়া একটা আরও বড় রাশি বা সামান্য "অবয়বী" নামে লইতে পার; তাহা প্রাণিত্বে অনুগত থাকিয়া প্রাণিত্ব সঙ্গে মনুষ্যত্বে ও মনুষ্যত্ব সঙ্গে রামে অনুগত দৃষ্ট হয়।

অবয়বী দ্রব্য-সামান্যের প্রতিযোগী "নিরবয়বী" সামান্য আছে। নিরবয়বী দ্রব্য সামান্য তদংশ সুখরাশিতে, ক্রোধ রাশিতে, কাম রাশিতে অনুগত আছে এবং সুখাদি রাশির ক্ষুদ্রাংশে নিদ্রাসুখ, ভোজন-সুখাদি ব্যক্তিতে নিরবয়বী দ্রব্য সামান্যকে অনুগত দেখিতে পাওয়া যায়।

অবয়বী দ্রব্য, নিরবয়বী দ্রব্য উভয় সামান্য একত্রে লইয়া একটী সামান্য পাওয়া যায়, তাহার নাম সৎ-সামান্য, চরম-সামান্য, বৃহত্তম সামান্য। ছোট
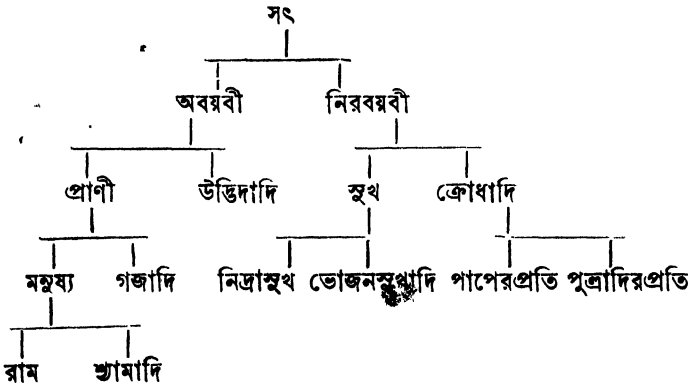
ছোট সামান্য রাশির বিলাতী নাম genus। যে কোন রাশির ক্ষুদ্রাংশগুলির নাম species। যে বিশেষ লইয়া কোন রাশিকে ক্ষুদ্রাংশে বিভাগ করা যায় তাহার নাম differentia. বৃহত্তম রাশির নাম highest genus—চরম সামান্য।

এই চরম সামান্যটাই এই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য। বিলাতী ন্যায়গ্রন্থে ইহার সুবিচারিত মীমাংসা নাই। আমরা সেই মীমাংসাকে নির্দ্দোষ পূর্ণাবয়ব করিবার চেষ্টা করিব। এই চরম সমান সৎটীর বহুবিধ নাম আছে যথা—আত্মা, ভূমা, অন্বন্বিত, স্বরূপ, সচ্চিদ্রস, অদ্বয়, স্বাস্থ্য, অভয়, কেবল। Whole,

absolute, non-relative, Being, Consciousness, Beatitude, One, Health, Beauty, Self. কত শত মেধাবী পণ্ডিত ইহার আলোচনা করিবার জন্য, সংযত সমাহিত হইয়া কঠোর তপস্যার্জ্জিত বলে বলীয়ান্ হইয়া এই সমান সংকে বুঝিবার জন্য প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। সকলেই কিন্তু ভয়ে ভীত হইয়া অর্দ্ধপথে বা সন্নিধানে পহুছিয়া স্তব্ধ হইয়া ভূমা বস্তু হইতে ন্যূন বস্তুতে আট্‌কাইয়া পড়িয়াছেন, আরও অধিক অগ্রসর হইতে সাহস করেন নাই। পণ্ডিতগণ নিজেকে ক্ষুদ্র মনে করিয়া সাধনা আরম্ভ করিয়াছিলেন; এই আরম্ভ সময়ের মৌলিক অ দিন দোষে সমগ্র সাধনা দুষ্ট হইয়াছিল।

যে কোন সাহসী পণ্ডিত নিজেকেই উক্ত ভূমার অত্যন্ত সমতুল্য, ভূমাই বটে, এরূপ পরোক্ষ জ্ঞান লইয়া সাধনারম্ভ করিবে, সেই চরম সংকে অপরোক্ষ করিবে ও সিদ্ধ হইবে, পূর্ণমনোরথ হইবে। আমাদের সকল জ্ঞানই দ্বন্দ্বিত relative. উচ্চতার জ্ঞানসহ নিম্নতার জ্ঞান উদিত থাকে; সুখের জ্ঞান ও দুঃখের জ্ঞান উভয়ে নিত্য-সহচর; নিদ্রা ও জাগরণ জ্ঞানের নিত্য সাহিত্য; পুরুষজ্ঞানের প্রতিদ্বন্দ্বী নারীজ্ঞান; মিলন ও বিরহ উভয়ে একটী দ্বন্দ্ব। নিম্নাধিকারের শেষ কথা এই যে, সকল জ্ঞানই দ্বন্দ্বিত। অদ্বন্দ্বিত absolute জ্ঞান হয় না। কিন্তু উচ্চাধিকারের ইহাই শেষ কথা নহে। উক্ত সমান সংটীর, চরম সামান্যটীর জ্ঞান অদ্বন্দ্বিত absolute। কেহই সংএর প্রতিদ্বন্দ্বী কোনও অসৎ বস্তুর চিন্তা করিতে পারিবে না। যদি পারে তবে অসৎ বস্তু তৎক্ষণাৎ সৎ অর্থাৎ বিদ্যমান হইয়া পড়িবে এবং প্রতিদ্বন্দ্বিত্ব ত্যাগ করিয়া চরম সংকে নমস্কার করিয়া চরম সং ভুক্ত হইয়া যাইবে। যে যেখানে যত পণ্ডিত আছ, এই অদ্বন্দ্বিত absolute সমান সংকে আরাধনা কর, ইহার বিচার কর, ইহার তত্ত্ব নির্ণয় কর, ইহার স্বরূপাবধারণ কর, যদি পার। ইহাই আত্মা, ইহাই আমি, নিষ্কলঙ্ক অপাপবিদ্ধ পরমপ্রেমাস্পদ।

মনে করিও না যে, প্রবন্ধ এই খানেই শেষ হইল! যখন সদ্বস্তুর প্রতিদ্বন্দ্বীরূপ কিছুমাত্র অসৎ বস্তু নাই, থাকিতে পারে না, তখন সমান সংটী absolute হইল ত বটে, সুতরাং আমাদের অনুসন্ধানের যোগ্য—কিছু আর বাকী রহিল না—এমনটা মনে করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া যাইও না। ইহা অদ্বন্দ্বিত সমান সং বিষয়ে পরোক্ষ জ্ঞান মাত্র। কর ত দেখি ইহার অপরোক্ষানুভূতি,—পারিবে না। দেখিবে সমূহ ব্যাঘাত ব্যামোহ। সমান সংকে বিষয়ীভূত করিতে গেলেই—ইদংরূপে দর্শনের

প্রয়াস করিলেই বুঝিতে পারিবে যে, "একটা না একটা সমান সৎএর বিশেষরূপতা অল্পতা, ন্যূনতা, খণ্ডাকারতা, আশ্রয় করিতে বাধ্য হইয়া পড়িবে। ভূমাকে সমানকে পাইবে না ; বিশেষকে পাইবে, ও বিশেষের সঙ্গে অস্তিত্বকে সমান-রূপে নহে বিশেষরূপেই বুঝিতে বাধ্য হইবে।" ঘট অস্তি, দ্বিচন্দ্র অস্তি, প্রতিবিম্ব অস্তি, অশ্বডিম্ব অস্তি, সুখ অস্তি। সমান অস্তিত্ব বিশেষ্য। ইহা ঘট দ্বিচন্দ্র প্রতিবিম্ব অশ্বডিম্ব সুখ-বিশেষণে বিশিষ্ট, উপাধিতে উপহিত, ক্ষুণ্ণ, ক্ষুদ্র, অল্প হইয়া দৃষ্টিগোচর বা বুদ্ধিগোচর হয়। সমান সৎটী, কোনও বিশেষ ঘটাদিদ্বারা অস্পৃষ্টটী, নির্বিকল্পটী, অদ্বন্দ্বিতটী বুদ্ধির গোচর হইয়াও হয় না। স্বপ্নের বস্তুকে যথা ফটোগ্রাফিত করিয়া বাঁধিয়া রাখা যায় না. তেলমাখা চোরকে যথা ধৃত করিয়া রাখা যায় না। যে কেহ এক জীব এই সমান সতের তত্ত্ব সম্যক বুঝিতে পারিবে, সে মুক্ত হইবে, ও অন্য যাবতীয় ব্যক্তি যে যেখানে আছে সকলেই সেই এক জীবের সঙ্গেই পৃথক্ পরিশ্রম না করিয়াই—মুক্ত হইয়া যাইবে। এ রহস্য প্রবন্ধের শেষ, পর্য্যন্ত ধৈর্য্য সহকারে পাঠ করিলে এবং পুনঃ পুনঃ পাঠ করিলে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে।

বিশেষাকারগুলি, উপাধিগুলি, বিশেষণগুলি সমান অস্তিত্বের প্রতিযোগী বা প্রতিদ্বন্দ্বী নহে। ইহারা প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া সমান সৎকে সদ্বন্দ্বিত relative করিতে অসমর্থ। অসৎ একটা কিছু পাইলে সৎ প্রতিদ্বন্দ্বী পাওয়া যাইতে পারিত বটে, কিন্তু বিশেষাকারগুলি, যটটা অস্তিত্ব সৎ বর্ত্তমান, সদনুগত ; অসৎ নহে সুতরাং সমান সতের প্রতিদ্বন্দ্বী নহে, সদ্বিলাসমাত্র। অলমতি বিস্তরেণ।

যথা অবসরে এই প্রসঙ্গমধ্যে সমান সৎকথার ভূয়োভূয়ঃ অনুশীলন হইবে। সেই কথার জন্যই ত এই প্রবন্ধ রচিত হইয়াছে। বিশেষগুলির মধ্যে অন্যোন্য-বিরোধ, প্রতিদ্বন্দ্বিত্ব থাকে থাকুক। ঘটে শরাবে ব্যাবর্ত্তকত্ব আছে বটে ; ঘট শরাব নহে, শরাব ঘট নহে, কিন্তু ঘট শরাব উভয়ে মিলিয়া, স্বাভাবিক নিজ নিজ প্রতিযোগিত্ব ত্যাগ করিয়া এক মূল বস্তু মাটীর প্রতিপাদন করে, সাক্ষ্য দেয়, মাটীকে সমর্পণ করে। তদ্বৎ, যাহা কিছু জগতে আছে এবং যাহা আমরা আছে বলিয়া কল্পনা করিতে পারি, যথা দশমুণ্ডরাবণ বা কচ্ছপীর দুগ্ধ, তাহারা পরস্পর-বিরোধ ব্যাবর্ত্তকত্ব ত্যাগ করিয়া সকলে সমযোগে অনুগত সমান সৎএর, বিদ্যমানতার, অদ্বন্দ্বিত অস্তিত্ব বস্তুর, আত্মার, আমির, অহংএর, প্রণবের, ওঁকারের, পরিচয় দিবার জন্য, সমান সতের পরিচয়ে পরিচিত হই-

বার জন্য, তন্মহিমার মঙ্গলগীতি গাহিবার জন্য, প্রয়োজন হইলে তাহার প্রীত্যর্থে আত্মোৎসর্গ করিবার জন্য তদনুমতি প্রতীক্ষায় করজোড়ে অবহিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বেদান্তে নরনারী নাই। সকলেই তোমরা সমান মতের, মহারাজ আত্মার বিজয়-দুন্দুভি স্কন্ধে লও ; বিজয়-আরতি যাহাতে অঙ্গ-হীন না হয় এমন ভাবে সমাহিত সংযতচিত্তে মহারাজের বিজয়-ঘোষণা কর। ইহাই মঙ্গল, ইহাই কল্যাণ।

প্রবন্ধে অভয়ের গল্প হইতেছে। অভয় শব্দের অর্থটাকে অল্পবিস্তর দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝিয়া লওয়া নিতান্ত অনাবশ্যক নহে।

গোবিন্দের কখন কোন ব্যাধি হয় নাই। তাহাকে প্রশ্ন করা গেল "তুমি কেমন আছ।" গোবিন্দ প্রশ্নই বুঝিল না ; বলিল "কেমন থাকা কি ?" গোবিন্দ স্বস্থ। স্বাস্থ্যকে গোবিন্দ ইদংরূপে, দৃশ্যরূপে বিষয়রূপে গ্রহণ করিতে পারে না। স্বাস্থ্যটী নির্বিকল্প। স্বাস্থ্যাতিরিক্ত কোনও অবস্থা তাহার দ্বারা কল্পিত হয় না। স্বাস্থ্যটী অভয়। স্বাস্থ্যাতিরিক্ত কোন অবস্থা গোবিন্দের হইতে পারে, গোবিন্দের এমন কোনও ভয় হয় না।

জন্মান্ধের যেমন বর্ণ কি, বর্ণবৈচিত্র্য কেমন জিনিষ, তাহা জানিবার ইচ্ছারই উদয় হয় না ; তদ্বৎ অভয় স্বস্থ গোবিন্দের ব্যাধি কি বস্তু, তাহার যন্ত্রণাবৈচিত্র্য, আরোগ্য কি বস্তু, তাহার মনে এমন কোনও কল্পনা ও বিতর্ক উদয় হয় না।

শ্যামের দন্তশূল হইয়াছে। 'তুমি কেমন আছ' জিজ্ঞাসা করিলে শ্যাম বলে "বড় দুঃখে আছি।" শ্যাম দুঃখ বস্তুকে ইদংরূপে গ্রহণ করিয়াছে। পূর্ব্বে যে তাহার স্বাস্থ্য ছিল, সেই স্বাস্থ্যের আভাস শ্যাম পায় ! আভাস মাত্র। এখন তাহার স্বাস্থ্যচ্যুতি হইয়াছে ; দুঃখের সহিত পরিচয় হইয়াছে। আসল অভয়-স্বাস্থ্য সময়ে দুঃখ-পরিচয় ছিল না। অভয়-স্বাস্থ্যকালে দন্তশূল যে কি বস্তু, তাহার কল্পনা অনুমান কিছুই হইত না।

কানাইএর দন্তশূল হইয়াছিল। আরাম হইয়াছে। তুমি কেমন আছ জিজ্ঞাসা করিলে কানাই বলে "বড় সুখে আছি।" কানাই সুস্থ, স্বস্থ নহে। কানাই দুঃখ ও সুখ উভয়েরই পরিচয় পাইয়াছে ; এবং দন্তশূল হইবার পূর্ব্বে যে একটা অভয় অবস্থা ছিল, যখন দন্তশূল কি বস্তু বুঝিত না, দন্তশূল ভবিষ্যতে হইতে পারে এমন ভয়ই হইত না, সেই অভয় অবস্থার আভাস পায়। এখন কানাই সুখী ; কিন্তু তাহার সুখ সভয় সবিকল্প। ভয় আছে যে ভবিষ্যতে আবার দন্তশূল কি অন্য কোনও ব্যাধি হইতে

পারে এবং সুখের অবস্থার প্রতিদ্বন্দ্বী দুঃখের অবস্থা যে কি, তাহাও তাহার মনে অনুভূত হয়। আসল অদ্বন্দ্বিত অভয়-স্বাস্থ্য পুনঃপ্রাপ্তির ভরসা নাই, ইহা কানাই মনে করে। কানাই ভাবে যে, আমি স্বস্থ হইব এবং তখন পরিচিত সুখ দুঃখ সহসা সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত হইয়া যাইবে, বিস্মৃত হইবে এবং আমার সুখ দুঃখ সম্বন্ধে জ্ঞান তিরোহিত হইয়া স্বাস্থ্য হইতে ভবিষ্যতে দুঃখে কি সুখে পতন হইবার দুশ্চিন্তা মনে উদয়ই হইবে না—স্বাস্থ্যচ্যুতির ভয়ই জাগিবে না, এমনটা আমার পক্ষে আর ঘটিবেই না।

গোবিন্দ স্বস্থ। সুখ দুঃখ দ্বন্দ্বাতীত আনন্দের অবস্থা তাহার। গোবিন্দ নিজের অবস্থাকে ইদংরূপে বুঝে না এবং নিজের অবস্থার আভাস পায় না।

দুঃখী কানাই সুখী হইয়াছে; স্বাস্থ্যের আভাস পাইয়াছে। কিন্তু আসল অভয়-স্বাস্থ্যের পুনঃপ্রাপ্তির আশা নাই বুঝে।

গোবিন্দের কোনও আকাঙ্ক্ষা বা ইষ্ট নাই। কানাইএর আকাঙ্ক্ষা আছে, ইষ্ট আছে। কানাই এই প্রার্থনা করে যে, আর যেন ভবিষ্যতে দুঃখ কোন মতে না হয়—ধারাবাহিক সুখই হউক। যখন আর অভয়-স্বাস্থ্য পাওয়া যাইবে না, তখন মন্দের ভাল অর্থাৎ অভয় সুখ যাহাতে পাওয়া যায় সেই কৌশলের সন্ধান করিতে হইবে; উপায়টী পাইলে তাহার অনুষ্ঠান করিতে হইবে; অনুষ্ঠানের ফলে অভয়-সুখ পাওয়া যাইবে, যেন ভবিষ্যতে আর সুখ হইতে চ্যুতিভয়, দুঃখপ্রাপ্তির ভয় না থাকে।

জগতের প্রায় সকল সাধকই কানাইএর মত। নানা প্রকারের সাধনা অবলম্বন করিয়া নানা সাধক অভয়-সুখ অনুসন্ধান করিতেছে।

কদাচিৎ অভয় স্বাস্থ্যের দুই একটী উপাসক দেখা যায়। সক্রেটিস বুদ্ধ যীশু গোরার মত মহাপুরুষগণ সহস্র সহস্র বৎসরান্তে অতি বিরলরূপে জগতে দেখা দেন। নানা-পন্থী সর্দ্দারগণ নানা—আখড়া, টোল, মন্দির, মঠ, সম্প্রদায় স্থাপন করিয়া অভয়-সুখপ্রার্থী কানাইএর মত অন্ধ নানা ব্যক্তিকে নানা পথ প্রদর্শন করিতেছে।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের মত আচার্য্য কখন কখন অবতীর্ণ হইয়া অভয়-সুখটী যে অশ্বডিম্ব তাহা বুঝাইয়া দেন। একটী সাধু দরিদ্রা পুত্রশোকাতুরা সরলা জননীকে দেখিয়া বলে যে, অশ্বডিম্ব পাইলে সে মৃত পুত্রকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া দিতে পারে। জননীর মনে সন্দেহই হইল না যে, অশ্বডিম্ব অসম্ভব। যথা হংসডিম্ব তথাই অশ্বডিম্ব বুঝিয়া ক্রেতা রূপনগরের হাটে

অশ্বডিম্ব ক্রয় করিতে গিয়া দেখিল যে রূপনগরে অশ্বডিম্ব নাই। তখন বুঝিল যে অশ্বডিম্ব হয় না, ছেলেও বাঁচিবে না, শোক করা বৃথা। আচার্য্য কানাইকে বলিল, অভয়-সুখ হয় না; সুখভোগকালেই ভবিষ্যতে সুখের চ্যুতিভয় আছেই, থাকিবেই—নিত্যসহচর। কায়ার সঙ্গে যথা ছায়া থাকে। কানাই অবুঝ ছেলে নহে; কানাই বলে, তাহা কতকটা আমি বুঝি; কিন্তু করি কি? অভয়-স্বাস্থ্য পাইবার উপায় ত নাই। তাহাই বাধ্য হইয়া সুখ বস্তুটাকেই লম্বা করিয়া, দীর্ঘ করিয়া, অচ্ছিদ্র অনবচ্ছিন্ন করিয়া লইতে চাহিতেছি যে, দুঃখ যেন সুখের ধারার মধ্যে প্রবেশলাভ না করে।

আচার্য্য বলেন, অভয় স্বাস্থ্য যাহা তোমার ছিল, যাহা হইতে চ্যুত হইয়াছ, তাহার আভাস ত তোমার জানা আছে। সেই আভাস অবলম্বন করিয়া, আভাসকে সূত্রবৎ ধরিয়া গোলকধাঁধার ভিতরেই আসল পথ আবিষ্কার করিয়া পুনরায় স্বস্থ হইতে পারিবে। দেখ, দর্পণগত প্রতিবিম্ব আভাস মাত্র; তাহাই অবলম্বন করিয়া আমরা আসল বিম্বমুখের যথেষ্ট পরিচয় পাইয়া থাকি।

কানাই বলে, ঠাকুর আভাসটা অতি অল্প; তাহার দ্বারা যে কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে, এমন আশা হয় না।

আচার্য্য বলেন যে, আচ্ছা, আমি তোমাকে অধিক আভাস দিব; এত অধিক যে তাহাতে তোমার ভরসা হইবে যে, পুনরায় অভয় স্বাস্থ্য পাওয়া যাইতে পারে বটে। সচরাচর ব্যাধি-বিনির্মুক্ত ব্যক্তির—সুস্থের—ব্যাধিযন্ত্রণা স্মরণ পথে জাগরূক থাকে, অত্যন্ত বিস্মৃতি হয় না। সুতরাং সুস্থ হইলেও ভবিষ্যতে পাছে পুনরায় ব্যাধি হয় এই ভয় চিরসহচর থাকিয়া যায় এবং অভয়-স্বাস্থ্য প্রাপ্তির আশার প্রায় মূলোচ্ছেদই হয় বটে। কিন্তু হে প্রিয় শিষ্য, তুমি উন্মাদ দেখিয়াছ। সে কখনও হাস্য করে, কখনও কি জানি কি ভয়ে ভীত হইয়া পলায়ন করে, কখনও নিজবক্ষে দারুণ চপেটাঘাত করে। উন্মাদ আরোগ্য লাভ করিলে কিন্তু উন্মত্তাবস্থার যাবতীয় শারীরিক মানসিক যন্ত্রণার কথা বা সুখের কথা সমস্ত অত্যন্ত-বিস্মৃত হইয়া যায়। সুতরাং তাহাকে সুস্থ না বলিয়া স্বস্থই বলিতে হইবে। তুমি কানাই এখন উন্মাদ, আমার উপদেশ-ঔষধ সেবন কর। তুমি পুনরায় স্বস্থ হইবে, অভয়-পদ পাইবে।

পাঠক পাঠিকা! উক্ত উন্মত্তারোগ্যের দৃষ্টান্তের মত দৃষ্টান্ত জগতে খুব

বেশী নাই। এই দৃষ্টান্তটীকে আদর করিবে, ইহা তোমাদের আদর পাই-বার যোগ্য।

শিষ্য কানাই স্বাস্থ্য-প্রাপ্তির বেশ আশা আছে বুঝিল, চমৎকৃত হইল। কিন্তু ব্যাঘ্র একবার মানুষের রুধির পান করিলে নরশোণিতে লোভী হইয়া পড়ে। শিষ্য স্রকৃচন্দন বনিতাভোগ-সুখের পরিচয় পাইয়াছে। সে কিন্তুত স্থির অচঞ্চল সামান্য নির্বিকল্প অভয়-স্বাস্থ্য আর চায় না; চঞ্চল সুখই চায় এবং দুঃখ বর্জ্জিত নিরাপদ সুখ যদ্যপি অশ্বডিম্ববৎ অসম্ভব, তথাপি কোন কৌশলে যদি তাহাকে সুসম্ভব করা যায় তাহারই চেষ্টা করিতে উৎসাহ রাখে সুতরাং তাহার গুরুবাক্যে শ্রদ্ধা থাকিলেও রুচি নাই। আচার্য্য ব্যাপারটা বুঝিতে পারিলেন যে, শিষ্যকে ভোগাপবর্গ পথেই উদ্ধার করিতে হইবে। শিষ্য নানা সুখ ভোগ করিতে থাকুক্ এবং উপস্থিত নিম্নাধিকারের অনুষ্ঠান কিঞ্চিৎ করিতে থাকুক। যখন নিষ্কণ্টকে ভোগ অসম্ভব বুঝিবে এবং যখন ভোগবিষয়ে অল্পবিস্তর নিস্পৃহ হইবে, তখন তাহার অভয়-স্বাস্থ্যে রুচি হইবে, অভয়-স্বাস্থ্যপ্রাপ্তির উপায় শ্রবণ ও তাহার অনুষ্ঠান করিবে।

আচার্য্যের সহিত শিষ্যের যে নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে তাহা শিষ্য আপাততঃ জানে না, পরে জানিবে; পাঠক পাঠিকারও এখন জানিয়া কাজ নাই। দুরন্ত অবাধ্য শিষ্যকে আচার্য্য ত্যাগ করিতে পারেন না; আচার্য্য ছদ্মবেশে নানা আথড়ায় মন্দিরে নানা পন্থী সাজিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। গুরু এক; গুরু নানা হয় না। একই গুরু নানা বেশে শিষ্যের যথা অধিকার উপদেশ দিবার জন্য নানা স্থানে আড্ডা করিয়া থাকেন। অভয় সুখ-প্রার্থী শিষ্য যথাক্রমে সেই সেই আড্ডায় যাইয়া নানা রোচক ভয়ানক অর্দ্ধসত্য অর্দ্ধমিথ্যা উপদেশ উত্তম বলিয়া গ্রহণ করে, কিন্তু অনুষ্ঠান করিতে করিতে সেই সকল উপদেশ কদলী-গর্ভবৎ অসার বুঝিয়া ক্রমে উচ্চাধিকার লাভ করিয়া, মার্জ্জিতবুদ্ধি হইয়া, সূক্ষ্মদর্শী হইয়া উত্তরোত্তর গভীর সারগর্ভ উপদেশ অঙ্গীকার পূর্ব্বক ত্যাগ করিয়া চরমে অভয়-স্বাস্থ্যই যে অভয়, অন্য কিছু অভয় নাই, তাহা বুঝে এবং তাহারই অপরোক্ষানুভূতির জন্য উৎকণ্ঠিত হয়।

প্রসঙ্গাগত কথা একটা বলিয়া রাখি: ভক্ত অভয়-স্বাস্থ্যের পূরা অনুমোদন করে না। ভক্তের যাহা অভিপ্রায় তাহার আলোচনার উপযুক্ত অবসর এখনও উপস্থিত হয় নাই।

রোচক ভয়ানক কথা অৰ্দ্ধসত্য অৰ্দ্ধ-মিথ্যা হইলেও মহদুপকার সাধন করে। জননী, জলমগ্নের শ্বাসপ্রশ্বাস- প্রণালীর ব্যাঘাত হেতু মৃত্যু-বিচার অবোধ শিশুকে না বুঝাইতে চেষ্টা করিয়া জলে জুজু আছে এই ভয় প্রদর্শন করে, বালক সরোবরতীরে জুজুর ভয়ে গমন করে না। বাঁচিয়া যায়। সে বয়স হইলে মাতার মিথ্যা কথাকে পরম উপকারী বুঝে ও হিতৈষিণী জননীর প্রতি মিথ্যাবাদিনী বলিয়া তাহার শ্রদ্ধার লাঘব না হইয়া বরং ভক্তি অধিক বৰ্দ্ধিত হয়।

চিকিৎসক বালককে মিঠাই দিবার লোভ দেখাইয়া তিক্ত নিম্ব পান করায়, মিঠাই দেয় না। বালক প্রবীন হইয়া সেই চিকিৎসকের প্রতি তাহার মিথ্যা কথার জন্য বিদ্বেষবুদ্ধি রাথে না, বরং তাহাকে পরম হিত-কারীই বুঝে।

গুরুমহাশয় অনাবশ্যক অধিক ভয়ানক পরিমাণে বালকদের প্রতি বেত্রচালন করে। কিন্তু বালকগণ বড় হইয়া গুরুমহাশয়কে তজ্জন্য যম-মন্দিরে পাঠাইবার ষড়যন্ত্র করে না।

তদ্বৎ স্বৰ্গসুখের প্রলোভন দেখাইয়া ও নরকাদির ভয় দেখাইয়া পুরো-হিতগণ আমাদের স্বাভাবিক দুর্দ্দান্ত, অকল্যাণকর প্রতিকূল প্রবৃত্তি-গুলিকে সংযমিত করিবার জন্য ব্যয়সাধ্য যজ্ঞাদি কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া আমাদের সমাজধৰ্ম্ম, পরোপকার-প্রবৃত্তি, দানশীলতা, অর্থে মমত্ব ত্যাগাদি শুভ শুভ প্রবৃত্তিগুলির উদ্বোধন ও অভ্যাস সম্পাদন করেন।

এর গুরু শিষ্যকে ধ্রুব দেখাইবার জন্য ধ্রুবেতর ধ্রুবসন্নিহিত বড় বড় তারাগুলিকে আদৌ ধ্রুব উল্লেখে উপদেশ করেন। অবশ্য মিথ্যা উপ-দেশই বটে। কিন্তু ফল পৰ্য্যবসায়ী, যথা খড়ের রাক্ষস পক্ষিগণকে ভয় দেখাইয়া ক্ষেত্রের ফসল রক্ষা করে। ক্রমে তাহা নহে তাহা নহে, এই রূপ গুরু নিজেই স্বীকার করিয়া স্থূল তারাগুলির সাহায্যে চরমে সূক্ষ্ম ধ্রুব নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া শিষ্যকে চরিতার্থ করেন। চরিতার্থ শিষ্যও মিথ্যাবাদী গুরুকে পরম সত্যবাদী মানিয়া পরম সমাদরে নমস্কার করিয়া থাকে। অন্ধবৎ অনধিকারী শিশু-শিষ্যকে আচাৰ্য্য হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে সঙ্গে লইয়া যখন সচ্ছিদ্রস বস্তু দেখিবার সামর্থ্য দিয়া, শিষ্যের চক্ষু ফুটাইয়া আত্মাকে দেখাইয়া দেন, বুঝাইয়া দেন, তখন শিষ্য অবাক্ বিস্মিত হইয়া যায়। তখন বুঝিতে পারে যে অভয় শব্দ ও দুঃখ প্রতিদ্বন্দ্বী সুখ শব্দ

এই দুই অভয় ও সুখ শব্দের পরস্পর ধাতুগত নিরতিশয় বিরোধ আছে। অভয় সুখটী square circleবৎ অসম্ভব। অভয়ই স্বাস্থ্য। সুখ অভয় হয় না। অভয়-স্বাস্থ্যই ইষ্ট। সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ভাল।

অভয় স্বাস্থ্যের কথা বড় উল্টা কথা, আশ্চর্য্য কথা। তাহাতে হঠাৎ বিশ্বাস স্থাপন করা কঠিন। সমগ্র সমুদ্রের একবিন্দু জলে প্রবেশ করার মত কথা। এক জীবে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের প্রবেশ ; এক জীবের মুক্তিতে যাবতীয় প্রাণীর এবং তাহাদের দাঁড়াইবার স্থল বিশাল হইতে সুবিশাল জগতেরও মুক্তি। সম্পূর্ণরূপে অলঙ্কার-বর্জ্জিত হইলে তবে অত্যন্ত নগ্ন শিবই সুন্দর হয়। শিষ্যই নাবালক মহারাজকুমার, গুরু তাহার অভিভাবক মাত্র। পাপ ত পাপই, পুণ্য ও পাপ দুইই ত্যজ্য।

আইস পাঠকপাঠিকা, আমরা শিষ্যের অভয়-সুখান্বেষণে নানা স্থানে নানা গুরুর নিকট গমন সময়ে তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিব এবং নানা গুরুসকাশে কনিষ্ঠ মধ্যম উত্তম অধিকারের উপযোগী নানা বিচার-প্রসঙ্গ শুনিয়া লইব।

অধিকার :—একটা না একটা অধিকার আমরা প্রত্যেকে পৃথকরূপে অবশ হইয়া অজ্ঞাতসারে পাইয়া থাকি। সেই অধিকারের ঔৎকর্ষ্য বিধান কোনও একই ব্যক্তি নিজ জীবনকালেই অথবা পুরুষানুক্রমে নানা বিধিনিষেধানুষ্ঠানে নানা শিক্ষা অভ্যাস সংযমে সম্পাদন করিয়া লয়। একই জীবনে বা পুরুষপরম্পরায় দুর্বিনীত বালকই ক্রমে উদার বৃদ্ধ হয়। যে সমাজে যে পরিবারে আমরা জন্মলাভ করি, তথাকার পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলী আমাদের অজ্ঞাতসারে শিশুকাল হইতে কতকগুলি সংস্কার জন্মাইয়া দেয়। আমরা সুতরাং সবাই কোনও না কোন সংস্কার-কিঙ্কর। সংস্কারকৈঙ্কর্য্যই অধিকার। ভিন্ন ভিন্ন মানুষের পৃথক পৃথক অধিকার। সকলেই যেন নেশা করিয়া জগতে আসিয়াছে। স্বাধীন ভাবে নিরপেক্ষরূপে সাদা চক্ষে বস্তু, বিচার করা যেন আমাদের আর সাধ্যায়ত্ত নহে। বস্তু-বিচার করিতে গেলেই পূর্ব্ব সংস্কারবশতঃ বিষয়বিশেষে আদর, পক্ষপাত বা বিদ্বেষ হইয়া পড়ে ও ভ্রমপ্রমাদশূন্য মীমাংসায় উপনীত হইতে আমরা পারি না। অধিকন্তু যাবজ্জীবন নেশার জন্য মদিরারূপ বিলাসের সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে যোগান পাইতেছি। এবং নেশা ছুটিবার পূর্ব্বেই কে যেন আমাদিগকে যমের জিম্মা করিয়া দিতেছে। যে আমাদের লইয়া এইরূপে নির্দ্দয় ভাবে খেলা করিতেছে, তাহাকে ঠিক ধরিতে না পারিয়া আমরা হতভাগিনী

প্রকৃতিকেই দোষী করিতেছি। হয় ত সে নিরপরাধিনী। তাহার খেলাটী তাঁহার খেলা বটে, কিন্তু আমাদের মরণ।

বৈষ্ণব-সন্তানের সংস্কার এই যে পশুহিংসা পাপ। নিকট প্রতিবেশী শাক্তের বংশধরের পশু-বলিতে উৎসাহ এবং অবশ্য-কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ। আমাদের বৃদ্ধ প্রপিতামহগণ সতীদাহে বা বংশের প্রথম পুত্রকে সমুদ্রে ভাসাইয়া দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তিন চারি পুরুষেই আমরা বিপরীত সংস্কারের কিঙ্কর হইয়া পড়িয়াছি, সতীদাহাদি লোমহর্ষণ ঘটনার প্রসঙ্গ হইলে শিহরিয়া উঠি।

এতটা সংস্কার-পারবশ্যের ভিতরেও কিন্তু একটা ধাতুগত স্বাধীনতা আমা- র আছে, যাহা প্রকৃতির বিরোধী। যদি তাহার উদ্বোধন অধিক মাত্রায় হয়, তবে আমরা বিদ্রোহী হই এবং প্রকৃতিদত্ত মোহমদিরা আর পান করিতে অসম্মত হই, বিলাস-সামগ্রী অনায়াসলভ্য হইলেও সংযমী হই এবং সংযমাভ্যাসে যতই কৃতকার্য্য হই ততই বলসঞ্চয় হইতে থাকে এবং পুরুষপরম্পরায় প্রাপ্ত ও শিশুকাল হইতে অর্জ্জিত সংস্কারগুলির দোষগুণ বিচার পূর্ব্বক তাহার উচ্ছেদে বা রক্ষণে শক্ত হই। এরূপ একটীও বীর জন্মগ্রহণ করিলে প্রকৃতি তাহাকে পরম শত্রু বিবেচনা করে ও সমাজদ্বারে পীড়ন করিয়া হউক, অর্দ্ধেক রাজত্ব ও এক রাজকন্যার লোভ দেখাইয়া হউক, সেই স্বাধীনচেতা বীরের যত্ন উদ্যম বিফল করিতে চেষ্টা করে; এমন কি মহাবীর যিশুর মত লোককে গলা টিপিয়া লবণ খাওয়াইয়া বা বিষপ্রয়োগে নির্লজ্জ নির্দ্দয়ভাবে প্রকাশ্যে ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া মারিয়া ফেলিতে চেষ্টা করে। এযাবৎ ঘটিয়াছে প্রকৃতির জয়। যে সকল বীর জন্মগ্রহণ করিয়াছিল,সকলকেই প্রকৃতির সহ সংগ্রামে পরাজিত হইয়া প্রাণপাত করিতে হইয়াছে। প্রশ্ন এই যে, একটা দুইটা বীরকে প্রকৃতির এত ভয় কেন? তাহারা যদিই সুন্দরী প্রকৃতির অপাঙ্গভঙ্গিতে মুগ্ধ না হইয়া মোহিনীর স্বহস্তদত্ত সুরাসার আদরের সহিত গ্রহণ নাই করে, নাই করিল। তাহারা বনে চলিয়া যায়, যাউক। বক্রী শতকোটী মানুষ ত প্রকৃতির ক্রীড়নক থাকিবে; প্রকৃতির লীলাখেলায় ত ব্যাঘাত হইবে না। তাহা নহে। প্রকৃতির ভয়ের কারণ আরও নিগূঢ়। একটা বীর তৈয়ার হইলেই প্রকৃতির সর্ব্বনাশ। দ্বিতীয় বীরের অপেক্ষা নাই। একটা তৈয়ার বীর প্রকৃতিকে ছাড়িয়া দূরে বনে যাইবে না, প্রকৃতিকে খুন করিয়া ফেলিবে। বীরের মনে দয়া ক্রোধ নাই; প্রকৃতি নানা জীবকে মুগ্ধ করিয়া তাহাদের হানি করিতেছে, অতএব জীবের উপর কর[illegible]য়া এবং জীবের শত্রু প্রকৃতির উপর কোপ করিয়া প্রকৃতিকে

শাসন করিবার প্রবৃত্তি বীরের থাকিবে, এমন কোন কথা নাই। দয়া ক্রোধ ত বন্ধন, সংস্কার, প্রকৃতির পারবশ্য; দয়া ক্রোধ থাকিলে পরিপক্ক বীর হওয়া যায় না। বীর অচঞ্চল, স্থির হইবে। সে দয়ালু বা কোপনস্বভাব নহে—দয়া বা ক্রোধকে বীর নিজ লক্ষ্যভ্রষ্ট করিতে দেয় না। বীর অপ্রমত্ত হইয়া নিজ মুক্তিকে, নিজ গরজেই নিরঙ্কুশ করিতে চায়। সে অন্য জীবের ভাবনা ভাবে না। পূর্ব্বের বীরগণ পরের ভাবনা ভাবিয়াছিল বলিয়া পরিপক্ক বীর-পদবী পায় নাই, অকৃতকার্য্য হইয়াছিল; নিজের মুক্তিও পায় নাই, অপরের উপকারও করিতে পারে নাই।

আসল বীর নিজ কার্য্য উদ্ধারকল্পে অন্য কোনও দ্বিতীয় চিন্তাকে তাহার মনে প্রবেশ করিতে দেয় না, পাছে নিজ কার্য্যে অল্পমাত্র অমনোযোগ হয়। আসল বীরের নিজ মুক্তি হইলেই আপনা আপনি অপর সকল বদ্ধ জীবের মুক্তি অবশ্যম্ভাবী। ব্যাপারটা এই যে,—পাকা বীর ভাবে যে, প্রকৃতি যদি মোহিনী মূর্ত্তিতে সমক্ষে দণ্ডায়মানই রহিল, তবে ত আমার পুনরায় পূর্ব্ববৎ কোনও কারণে—তাহাতে মুগ্ধ হইবার সম্ভাবনারূপ ভয় থাকিয়া যায়। আবার ত আমি স্রকচন্দনবনিতাদি প্রকৃতির কোনও বিশেষ রূপের অধীন হইয়া পড়িতে পারি। সুতরাং যদি পারি তবে প্রকৃতির সম্যক, অত্যন্ত, নিরতিশয় উচ্ছেদ করিব। তবে ত সভয় মুক্তির পরিবর্ত্তে অভয় নিরঙ্কুশ মুক্তি পাইব, অল্প অপেক্ষা ভূমা প্রাপ্তি হইবে। যদি বল তুমি ক্ষুদ্র। তুমি ত তুমি, কেহই বলবান্ প্রকৃতিকে এতাবৎ যমালয়ের অতিথি করা দূরে থাকুক কিঞ্চিন্মাত্র জখম করিতেই পারে নাই। বীর সাধক বলে, কথাটা ঠিক নহে। এ পর্য্যন্ত কেহই মুক্ত হয় নাই; সকলেরই কিছু না কিছু কশুর ছিল। তাহারা বটে ক্ষুদ্র দুর্ব্বল ছিল। আমি কেন ক্ষুদ্র দুর্ব্বল হইব বা হইবে। আমি সাধনবলে বিশাল হইতে সুবিশাল বিরাট বস্তুকে হৃদয়-পিঞ্জরে বদ্ধ করিতে পারি বা পারে। আমি প্রকৃতিকে মারিয়া ফেলিব। সে আর আমাকে ভবিষ্যতে মুগ্ধ, অধীন করিবার জন্য জীবিত থাকিবে না, "বাধিত" হইয়া যাইবে। সে মরিলে অন্যান্য শত সহস্র জীব, যাহারা কেহ বা আছে, সকলেই মুক্ত হইয়া যাইবে; আমার নিজ গরজে আমার দ্বারা প্রকৃতির বধ ঘটিলে তাহাদিগকে মুগ্ধ, অধীন করিবার জন্য প্রকৃতির অভাব হইলে তাহারা সুতরাং মুক্ত হইবে সন্দেহ নাই। প্রকৃতি নিজ প্রাণভয়ে ভীত হইয়া সৃষ্টির আদিমকাল হইতে কখন হাস্যবদনে কণ্ঠলগ্না হইয়া, কখন বা ক্রমশের অথবা অগ্নিজ্বালার ভয়

দেখাইয়া আমার পীড়ন ও সর্ব্বনাশচেষ্টা করিয়া আসিতেছে। কিন্তু সে 'আমির' হস্তেই মরিবে। বটে, শত ভ্রাতা ও দিব্য সহস্রাস্ত্র সুরক্ষিত দুর্য্যোধন-প্রকৃতির দেহ বজ্রসার-কঠিন। কিন্তু সেও জানে, আমিও জানে, তাহার উরুদেশে রন্ধ্র আছে। ভীমপুরুষ যখন তত্র বিষম গদাঘাত করিবে, তখন ভীম নিজে এবং যে যেখানে আছে, কি পাণ্ডবপক্ষীয় কি কুরুপক্ষীয় কি উদাসীন, সকলেই অভয় নিরঙ্কুশ মুক্তিপদ লাভ করিবে। দুর্য্যোধন-প্রকৃতি মরিবার পরে ভবিষ্যতে কাহাকেও অধীন করিতে আসিবে না।

দেখ, কর্ণধার পরিশ্রম করিয়া নদীর পরপারে যায়। সঙ্গে সঙ্গে অলস অপরিশ্রমী আরোহী বাবুগণ এবং জড় নৌকাখানাও নদীর পরপারে যায়; কর্ণধারের সঙ্গে যুগবৎ একই সময়ে মুক্ত হইয়া যায়; একা কর্ণধারের পরিশ্রমের ফল সকলে সমানরূপে পাইয়া থাকে।

একখানি প্রিস্‌ম্ prism মুক্ত হইলে, সংসার হইতে সরিয়া গেলে সাতটী প্রত্যক্ষ বর্ণ ও বহু অপ্রত্যক্ষ বর্ণ মুক্ত হইয়া শুদ্ধ শুভ্র হইয়া যায়।

একা কৃষ্ণ দ্রৌপদীর অন্নভোজনে তৃপ্ত হওয়ায় দুর্ব্বাসার ও সহস্র শিষ্যের আপনা আপনি ক্ষুন্নিবৃত্তি হইয়াছিল।

একখণ্ড দেশালাইএর ক্ষুদ্র কাষ্টিকাবদ্ধ অগ্নি মুক্ত, প্রকট হইলে ঘোর বৃহৎ অন্ধকারের অধীন বৃহৎ গৃহমধ্যস্থ বহু সামগ্রী মুক্ত, প্রকট হয়।

একা রাজা অপ্রমত্ত, মুক্ত থাকিলেই লক্ষাধিক প্রজা দস্যু-দুর্ভিক্ষাদি-পীড়ন-বন্ধন হইতে মুক্ত হয়। স্বপ্নভঙ্গও একটী উত্তম দৃষ্টান্ত।

এতাবৎ প্রকৃতিই জয়লাভ করিয়া আসিয়াছে। বহু সাধক তাহা দ্বারা বিনিষ্ট হইয়াছে।

এক্ষণে আইস, নারী হও, পুরুষ হও, আমি হই তুমি হও, মুক্ত ভীম হইতে চেষ্টা কর; মুক্ত চক্ষুদ্বারে প্রকৃতি-দুর্য্যোধনের রন্ধ্রটী লক্ষ্য কর ও তত্র বিষম জ্ঞানগদাঘাত কর এবং স্ব-পর কল্যাণকারী হও।

একের মুক্তিতে সকলের মুক্তি শুনিয়া পাঠক পাঠিকা, স্তম্ভিত, পশ্চাৎপদ হইও না। একের মুক্তিতে বহুর মুক্তিবিষয়ে বিশ্বাস অতিশয় পুরাতন; নূতন নহে। প্রবাদ আছে বংশে একটী সুপুত্র জন্মিলে সপ্তপুরুষ উদ্ধার পায়, এক ভগীরথ জ্ঞানগঙ্গা দ্বারা সগরবংশ অর্থাৎ সকল বংশ উদ্ধারের যত্ন করিয়াছিল। রাবণ লোকটা স্বর্গের সোপান নিজে স্বকীয় শ্রমে রচনা করিয়া সকলেরই জন্য স্বর্গ সুগম করিতে চাহিয়াছিল। বোধ হয় কুমারিল ভট্ট কৃত

তন্ত্রবার্ত্তিকে লিখিত আছে যে, বুদ্ধ মহাশয় একদিন সকলকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন যে, যে কেহ পাপী হও আর পুণ্যকৃৎ হও, আমাতে নিমজ্জিত হইলেই মুক্ত হইয়া যাইবে। গোরার শিষ্য বাসুদেব প্রার্থনা করিয়াছিল যে, সকল পাপীর সকল পাপ তাহার স্কন্ধে অর্পিত হউক, সে তাহা ভোগ করিয়া শোধ দিবে এবং ইতোমধ্যে সকল জগৎবাসী মুক্ত হউক।

শ্রীমান্ গয়াসুর জীবের কষ্ট দেখিয়া নিজ শরীর স্বর্গ পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন এবং নির্ব্বিশেষে অনুমতি দিয়াছিলেন যে, যে কেহ ইচ্ছা কর; সেই বর্দ্ধিত কলেবরের উপর দিয়া স্বর্গে যাইতে পার।

মহাপুরুষ যীশু মহাশ্মশানে সকলের পাপ নিজে লইয়া আত্মাহুতি দিয়া যাবতীয় জীবের মুক্তিসাধন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তিনি পুনঃ পুনঃ বলিয়াছিলেন come unto me and I will give you rest।

এইস্থলে সাধারণ মনুষ্যের একটী অনবধানতা দৃষ্ট হয়। যীশুকথিত me ও I শব্দে আত্মা বুঝায়, কিন্তু তাঁহার শিষ্যগণ হস্তপদাদি-বিশিষ্ট সৌম্য সুন্দর যীশুদেহকে বুঝিয়াছিল। শিষ্যগণ নিজ নিজ আত্মাকে না বুঝিয়া বক্তাকে বুঝিয়াছিল। কথাটা বুঝিতে এই আদিম ভ্রম হইয়াছিল। সেই ভ্রম বশতঃই ঠিক মীমাংসাটী গোড়া হইতেই দৃষ্টির অগোচর থাকিয়া গিয়াছে।

অজপা সকল মানুষের ভিতরেই হংস বা সোঽহং বলিয়া দিতেছে। মানুষ শুনিয়াও শুনিতে পায় না। আপনাকে, আত্মাকে বুঝে না। এই না বুঝার বিপ্রতিপত্তিটাই মানুষের আপদ হইয়াছে।

ঈশ্বর গীতায় অর্জ্জুন বারম্বার শুনিল যে

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাস্তরন্তি তে
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ
বেদান্তকৃৎ বেদবিদেব চাহং।

উত্তম পুরুষ ক্ষরাক্ষর অতীত। অর্জ্জুন মাম্ শব্দে, অহং শব্দে নিজ আত্মাকে না বুঝিয়া বক্তা কৃষ্ণকে বুঝিয়াছিলেন।

ব্যাকরণ গ্রন্থে উত্তম পুরুষ অর্থে যে অহং-তত্ত্বকে নির্দ্দেশ করে, অর্জ্জুন সেই অহং-তত্ত্বকে না বুঝিয়া কৃষ্ণকে বেশ ভাল একজন উত্তম গুণবান্ ব্যক্তি বুঝিয়াছিলেন।

মুসলমান্-সন্ন্যাসী সুফি পরমহংসগণ আল্লা ও আল্লার রসুল উভয়কেই আত্মা অদ্বয় বলিয়া জানেন; সাধারণে তাহা ধরিতে পারে না।

কৌষিতকী গ্রন্থে ইন্দ্র প্রতর্দ্দনকে বলিলেন 'মামেব বিজানীহীতি।' প্রতর্দ্দনের ভ্রম হইল। সে বক্তা ইন্দ্রকে বুঝিতে চেষ্টা করিল। স্বস্বরূপাত্মাকে, অহং-তত্ত্বকে বুঝিতে হইবে তাহা বুঝিল না।

ব্যাপরটা একেবারে উল্টা। কোথায় ক্ষুদ্র আমি, কোথায় বিশাল জগৎ। বেদান্ত বলে ক্ষুদ্র আমিটা ক্ষুদ্র নহে, সেইটাই বিশাল; বিশাল জগৎটাই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, আত্মার একটা ক্ষুদ্র তুচ্ছ বিলাস মাত্র। এরূপ কথা শুনিয়া যীশুশিষ্য বা অর্জ্জুন বা প্রতর্দ্দনের বা অন্য কাহারও ব্যামোহ হইবে তাহা বিচিত্র নহে। "আমরা ক্ষুদ্র" এই সংস্কার খুব প্রবল, তাই আমরা আপনাদিগকে ক্ষুদ্র বালকই মনে করি এবং উক্ত হিত মহোপদেশ শুনিলে নিজ বালকত্বসংস্কারবশে তাহার অর্থ অবধারণ করিতে পারি না।

গুরুমহাশয় পাঠশালে বলিলেন, my head অর্থে আমার মাথা। শিশু শিষ্য বাটীতে গিয়া পিতৃসমক্ষে আবৃত্তি করিতে লাগিল যে, my head মানে মাষ্টারের মাথা। করুণাময় পিতা বলিয়া দিলেন যে, তাহা নহে my head মানে আমার মাথা। বালক পরদিন বিদ্যালয়ে আবৃত্তি করিল my head মানে বাবার মাথা। গুরুমহাশয় তর্জ্জন গর্জ্জন সহ বলিয়া দিল তাহা নহে, my head মানে আমার মাথা। ভীত বালক বলিল যে, তবে my head মানে বাড়ীতে বাবার মাথা, পাঠশালায় মাষ্টারের মাথা। এরূপ বোধবিপর্য্যয়ের কোনও প্রতীকার নাই। যথাসময়ে বালকত্ব ঘুচিবার পরে অহং শব্দের কিরূপ প্রয়োগে বক্তাকে না বুঝিয়া নিজ আত্মাকে বুঝিতে হইবে, সহজেই তাহা বুঝা যাইবে।

এই যে একের অভয় নিরঙ্কুশ মুক্তি-স্বাস্থ্যে অপর সকলের মুক্তি হয়, তদ্বিষয়ে কএকটী স্থূল দৃষ্টান্ত মাত্র দেওয়া হইল। দৃষ্টান্তগুলি রোচক ভয়ানক অর্দ্ধসত্য অর্দ্ধমিথ্যা-শ্রেণীভুক্ত। ক্রমে কথাটার অর্থ আরও অধিক শোধন করা হইবে। তখন একটা ভাল পরোক্ষ জ্ঞান হইবে। পরে সেই পরোক্ষকে আপরোক্ষা নুভূতিতে পর্য্যবসিত করিতে হইবে। তাহা বড় কঠিন। তুলা শুনিতে নরম বটে, কিন্তু ধুনিতে লবেজান। কিন্তু অপরোক্ষ করিতে পারিলে লাভও অপরিসীম— গণ্ডার-মারা ও ভাণ্ডার জয়ের মত। তখন আর অধিক প্রার্থনীয় কিছু থাকিবে না।

উপস্থিত বিশ্রাম লওয়া গেল। পরের প্রবন্ধে শিষ্যের নানা গুরু-সকাশে গমন ও নানা উপদেশ গ্রহণ পূর্ব্বক ত্যাগ-পরিপাটীর কৌতুককর গল্পাদি লিপি-বদ্ধ করা হইবে। শিষ্যের গুরুজনসহ সবিনয় তর্ক-বিচার দ্বারা অধিকার-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও অধিকার-বৃদ্ধি পাইবে; আমরাও বিশিষ্ট লাভবান্ হইব।

শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

সংযুক্তা। *

১

স্মরণীয়া বরণীয়া রমা,
তুমি দেবী তুমি বীরাঙ্গনা,
চির তপস্যায় সতি, লভিলে বাঞ্ছিত পতি,
যাঁর তরে সাধি নিলে
সহস্র গঞ্জনা।

২

যাঁর গুণে বিমুগ্ধ ভারত
কীর্ত্তিমান দীপ্তিমান রবি,
বীর্য্যবান ইন্দ্র তুল্য, যশোরাজি মহামূল্য
ধার্ম্মিক উদারচেতা
কুলোজ্জলচ্ছবি!

৩

তাই তব কিশোর হৃদয়
তাঁর পদে উদ্দেশে প্রণত,
তুচ্ছ "রাজসূয়" যাগে কেবা "স্বয়ংবর" মাগে
"বর" যে পুরুষবর
চিত্ত তাঁ'তে রত।

৪

কি নির্ম্মম স্বার্থপর পিতা
শুধু চিত্তে গৌরবের আশা,
সম্পদে প্রভুত্বে তৃপ্ত, "সার্ব্বভৌম" আশে দৃপ্ত,
বোঝে না তনয়া-হিয়া—
সেথা কি পিপাসা!

* রাজপুত-মহিলা সংযুক্তা দেবীর কাহিনী বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত। সেই জন্য আমরা তাহা বিবৃত করিলাম না। লেখিকা।

৫

যথা বিশ্ব-নমস্য শঙ্করে,
জনপদে অপমান-হেতু—
দুরাশা-প্রপূর্ণ বক্ষ, কন্যাঘাতী ক্রূর দক্ষ,
গড়িল আপন করে
মরণের সেতু!—

৬

তেমনি পাষণ্ড নীচাশয়
রাজপুত-কলঙ্ক দুর্জ্জন,
নাশিতে বীরেশ-মান, প্রতিমূর্ত্তি দ্বারবান—
ছি ছি! জয়চাঁদ তুমি
দুর্ব্বুদ্ধি এমন?

৭

কন্যা হরি নিলা পৃথ্বিরাজ,
নিবারিতে নাহিক শকতি,
পার্থ যথা দ্বারকায়, হরিলা সে সুভদ্রায়,
রণে পরাজিয়া যত
যদুকুলরথী।

৮

উন্মত্ত দারুণ অহঙ্কারে
বিধর্ম্মীরে করিয়া সহায়,
চোহান কুলের পূজ্য, সেই ইন্দ্রপ্রস্থ-সূর্য্য
গরাসিতে রাহুরূপে
উপনীত হায়!

৯

হে সংযুক্তে! বীরাঙ্গনা তুমি,
প্রাণভরা অসীম পিয়াসা,
সে দেবে নয়নে রাখি, এখনো অতৃপ্ত আঁখি
এখনো ফোটেনি মুখে
মরমের ভাষা!

১০

তবু বীর-কর্ত্তব্য-পালনে,
ধর্ম্মরক্ষা দেশরক্ষাতরে,
সহধর্ম্মিণীর মত জ্বলন্ত উৎসাহে কত
দিলে নবশক্তি—শূর
পতির অন্তরে!

১১

নিজ করে, প্রফুল্ল-আননে
প্রিয়তমে দিলে সাজাইয়া
বীর বেশে! মহাবলী রণক্ষেত্রে গেলা চলি,
অমনি ও আঁখিজল
পড়িল ঝরিয়া!

১২

অস্তগামী হেরি দিবাকরে
কমলিনী মুদিল নয়ন—
কে জানে বিধির লেখা, জগতে হবে কি দেখা?
আতঙ্কে চমকি উঠে
বিধুরার মন।

১৩

না জানি সে কৌমুদী নিশায়
চাহি দূর রণক্ষেত্রপানে,
গগনে জাগিত শশী, সৌধশিরে তুমি বসি
কি ভাবিতে—স্বপ্নমাখা
সে অতৃপ্ত প্রাণে?

১৪

যত দিন যুঝিলা দয়িত
ছিলে শুধু করি বারি পান *
যেদিন শুনিলে শেষ,　　　"রণশায়ী হৃদয়েশ"
অনলে আহুতি দিলে
ও তরুণ প্রাণ!

১৫

আজি সব মিটেছে বাসনা
চলি গেছ চিরানন্দ ধামে,
অমর পতির সহ,　　　অবিচ্ছেদে অহরহ,
ভুঞ্জিতেছ স্বর্গসুখ
আনন্দ আরামে;
যুগে যুগে মর্ত্ত্য কবি,　　　পূজিছে ও প্রেমছবি,
অবনী ভরিয়া আছে ও পবিত্র নামে,
থা'ক সতি! পতি সহ অনন্ত-আরামে।

শ্রীমানকুমারী
বীরকুমারবধ রচয়িত্রী।

কাঙ্গাল হরিনাথ।

প্রতিবারেই বলিতেছি, এবারও আবার বলি, আমি কাঙ্গালের 'ব্রহ্মাণ্ডবেদ' লিখিয়া উঠিতে পারিতেছি না। যিনি যাহাই বলুন, আমি বলিতেছি 'ব্রহ্মাণ্ড-বেদের' পরিচয় যেমন করিয়া দিলে দেওয়ার মত হইত, যেমন করিয়া বলিলে বলিবার মত হইত, আমি তাহা পারিয়া উঠিতেছি না। শুধু কি তাই, মাসান্তে যখনই আমি 'ব্রহ্মাণ্ডবেদের' কথা বলিতে বসি, তখনই আমার মনে হয় আমি কি অন্যায় কার্য্যই করিতেছি। আমার হাতে পড়িয়া এমন পবিত্র বস্তু আত্ম-

* পৃথ্বীরাজ যত দিন যুদ্ধ করিতেছিলেন, সংযুক্তা ততদিন কিছুই ভোজন করেন নাই, কেবল জল পান করিয়াই জীবনধারণ করিয়াছিলেন।

প্রকাশ করিতে পারিতেছে না, আমি অধর্ম্মাচরণ করিতেছি। যাহাতে আমার অধিকার নাই, যে মন্দিরের ছায়া স্পর্শ করিবারও সামর্থ্য আমার নাই, আমি তাহারই পরিচয় দিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছি, একথা যখনই আমার মনে হয় তখনই ইচ্ছা হয় যে, এমন কার্য্য আর করিব না। কিন্তু অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া যখন এমন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, তখন ভাল হউক, মন্দ হউক, আমার কথা শেষ করিতেই হইবে। তবে আমার একটী ভরসা আছে, আমার অযোগ্যতায় ক্ষুব্ধ হইয়া অপর কেহ যদি এই কার্য্যে হস্তার্পণ করেন তাহা হইলে আমার চেষ্টা যে বিফল হয় নাই, ইহা মনে করিয়া আমি কৃতার্থ হইব।

এই স্থানে, এতদিন পরে আর একটী কথা বলিবার প্রলোভন আমি সংবরণ করিতে পারিতেছি না। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষাৰ্দ্ধভাগে যে সকল কৃতী সুলেখকের চেষ্টা, যত্ন ও অধ্যবসায়-ফলে বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি হইয়াছিল, কাঙ্গাল হরিনাথ তাঁহাদিগের অন্যতম, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যখন সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম পুস্তক দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হয় নাই, তখন কাঙ্গাল হরিনাথের 'বিজয়বসন্ত' প্রকাশিত হইয়াছিল, এবং সে সময়ে শত শত নরনারী সেই 'বিজয়বসন্ত' পাঠ করিয়া অশ্রুপাত করিয়াছে। কাঙ্গাল হরিনাথের 'বিজয় বসন্ত' পুস্তকে যে ভাষার সৌন্দর্য্য, ভাবের মাধুর্য্য ছিল, তাহা এখনও অনেক সাহিত্য-রথীর অনুকরণীয়। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, সেই বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতিকল্পে উৎসর্গীকৃত-জীবন কাঙ্গাল হরিনাথের কথা, তাঁহার জীবন-কথা—তাঁহার সাহিত্য সাধনার কথা—তাঁহার একনিষ্ঠ সাহিত্য-সেবার কথা, তাঁহার পবিত্র ঋষিকল্প জীবনের আধ্যাত্মিকতার কথা,—তাঁহার অতুলনীয় বাউলের গানের কথা,—তাঁহার অপরিমেয় জ্ঞান-ভাণ্ডার 'ব্রহ্মাণ্ডবেদের' কথা,—তাঁহার সংবাদপত্র সম্পাদনের কথা,—সকল কথাই বাঙ্গালী ভুলিয়া গিয়াছিল—বাঙ্গালী সাহিত্যসেবকগণ ভুলিয়া গিয়াছিলেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে, বাঙ্গালা সংবাদপত্রের ইতিহাস আলোচনায় কখন কোন দিন কাঙ্গাল হরিনাথের নাম তেমন করিয়া উল্লিখিত হয় নাই। পল্লীবাসী, জীর্ণপর্ণকুটীরবাসী, শতগ্রন্থিযুক্ত মলিনবেশধারী, কাঙ্গাল হরিনাথের জীবনব্যাপী সাধনার সংবাদ কেহই গ্রহণ করেন নাই। কাঙ্গাল হরিনাথ কাঙ্গালের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কাঙ্গাল ভাবেই জীবনযাপন করিয়াছিলেন। কোন দিন তিনি ধন মান যশের পশ্চাতে ধাবিত হন নাই; তাই এই অর্থসর্ব্বস্ব, ধনগর্ব্বিত যুগে কেহ কাঙ্গালের খোঁজ লইলেন না।

কাঙ্গাল তাহাতে কোন দিন ক্ষুব্ধ বা দুঃখিত হন নাই। তিনি তাঁহার একটী গানে বলিয়াছিলেন—

"কাঙ্গালের ছেঁড়া টেনা, নাহিক সোণা,
তাই, কর ঘৃণা কাঙ্গাল ব'লে;
কাঙ্গালের সর্ব্বস্ব ধন, অমূল্য ধন,
ধনী হবে সে ধন পেলে।"

কাঙ্গাল অমূল্য ধনের অধিকারী হইয়া পার্থিব ধনকে, মানসম্ভ্রমকে ধূলি জ্ঞানে তুচ্ছ করিয়াছিলেন; কিন্তু আমরা ত তাহা পারি না, আমরা ত সে অমূল্য ধনের কোন খোঁজ পাই নাই; তাই বাঙ্গালার সাহিত্য-জগত, রাজ-নীতি-ক্ষেত্র, ধর্ম্মজগত হইতে কাঙ্গালের নাম লুপ্ত হইতেছে দেখিয়া আমরা ক্ষুব্ধ, দুঃখিত, ব্যথিত হইয়াছি; এবং সেই জন্যই নিতান্ত অযোগ্য হইয়াও আমি কাঙ্গাল হরিনাথের পরিচয় দিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছি। বড় দুঃখেই এই কথা কয়টী বলিলাম!

এখন আবার কাঙ্গালের 'ব্রহ্মাণ্ডবেদের' কথা বলি। অনেকেই এখন পরলোক সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়া থাকেন! ব্রহ্মাণ্ডবেদে কাঙ্গাল এ সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন, তাহার সারমর্ম্ম আমরা প্রদান করিতেছি। কাঙ্গাল বলিয়াছেন—

কাহারও বিশ্বাস পরলোক নাই, আবার কাহারও বিশ্বাস পরলোক আছে। যাঁহারা পরলোক বিশ্বাস করেন না, তাঁহারা পরলোক দেখেন নাই; অতএব অবিশ্বাস করা তাঁহাদের পক্ষে নিতান্ত অন্যায় নহে। তবে অন্যায়ের বিষয় এই যে, যে পথ অবলম্বন করিলে ইহলোকে থাকিয়াই পরলোক দর্শন করা যায়, তাঁহারা সে পথ অবলম্বন না করিয়া কেবল তর্ক দ্বারা পরলোক নিশ্চয় করিতে গিয়া প্রতারিত হন এবং চিরকালই পরলোক-বিষয়ে অন্ধ থাকিয়া আপনার সর্ব্বনাশ করেন। পরলোক কখনও তর্কে নিশ্চয় হইতে পারে না। যে ব্যক্তি কখনও দুগ্ধ পান করে নাই, তাহাকে দুগ্ধের আস্বাদন বুঝাইয়া দিবার জন্য যতই তর্ক করা না হউক, যতদিন সে দুগ্ধ পান না করিবে, ততদিন দুগ্ধের কি আস্বাদ তাহা যেমন বুঝিতে পারিবে না, তদ্রূপ যে পরলোক দেখে নাই, সে যে পর্য্যন্ত পরলোকের দৃশ্য না দেখিবে, সে পর্য্যন্ত কিছুতেই তাহা বুঝিতে পারিবে না। ইহলোকে পরলোক-দর্শন সাধনসাপেক্ষ। বিনা সাধনে কেহ তাহা দেখিতে পান না।

আবার যাঁহারা পরলোক বিশ্বাস করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেরই ভাগ্যে ইহলোকে পরলোক-দর্শন ঘটিয়া উঠে না। তাঁহারা কেবল শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস করিয়া পরলোক মানিয়া চলেন। সুতরাং কার্য্যকালে পরলোকে বিশ্বাস তাঁহাদিগের হৃদয়ে প্রায়ই তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারে না। তাঁহারা পরলোক দেখেন নাই, তাহার ঐশ্বর্য্য, সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের কথা কিছুই জানেন না এবং বোঝেন না। ইহলোকের ঐশ্বর্য্য, সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য তাঁহাদের যথাসর্ব্বস্ব; শাস্ত্রশাসনে ও জ্ঞানীর উপদেশে তাঁহারা তাহার প্রলোভন কিছুতেই ছাড়িতে পারেন না।

এস্থলে অনেকে এরূপ তর্ক উপস্থিত করিতে পারেন যে, আমরা ইহলোকের সুখৈশ্বর্য্য একেবারে পরিত্যাগ করিয়া লোকদিগকে সন্ন্যাসী করিতে ইচ্ছা করিতেছি। আমাদের সংসারবৈরাগ্যের অর্থ তাহা নহে। পারলৌকিক ঐশ্বর্য্যলাভের যাহাতে বিঘ্ন উপস্থিত হয় সেইরূপ কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সত্য, জ্ঞান ও ন্যায়পরতার অনুমোদিত ইহলৌকিক ঐশ্বর্য্য উপভোগ করা ভগবানের অপ্রিয় কার্য্য নহে; বরং তাহাই তাঁহার ইহলৌকিক প্রিয়কার্য্য সাধনের উপায়।

কিরূপে ইহলোকেই লোকের হৃদয়ে পরলোকের দৃশ্য প্রকাশিত হইতে পারে, সে সম্বন্ধে কাঙ্গাল যে কয়েকটী কথা বলিয়াছেন তাহা প্রণিধান করিতে আমরা সকলকে অনুরোধ করিতেছি। তিনি বলিয়াছেন—"আমাদিগের বাহিরে যেমন দুইটী চক্ষু আছে, সেই চক্ষুর দর্শনীয় বিষয় যেমন ইহলোক, তদ্রূপ অন্তরেরও আর একটী চক্ষু আছে, তাহার দর্শনীয় বিষয় পরলোক। বাহিরের চক্ষুতে কেবল দর্শন করা যায়; অন্তরের চক্ষুতে দর্শন, শ্রবণ, আঘ্রাণ, আস্বাদন ও স্পর্শ সকলই হইয়া থাকে। ইহলৌকিক বস্তু সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞানযুক্ত হইলে যেমন ইহলৌকিক দর্শনক্রিয়া সম্পন্ন হয়, সেইরূপ ভক্তিযোগে পারলৌকিক দৃশ্য সকল জ্ঞানযুক্ত হইলেই পারলৌকিক দর্শনক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

এখন একটু চিন্তা করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইবে, জ্ঞান ও ইন্দ্রিয় যেমন ইহলৌকিক প্রত্যক্ষের হেতু, সেইরূপ পারলৌকিক প্রত্যক্ষেরও হেতু আছে। সেই হেতু জ্ঞান ও ভক্তি। যাঁহার জ্ঞান আছে ভক্তি নাই, তিনি অন্ধের ন্যায় পারলৌকিক দৃশ্য দেখিতে পান না। যাঁহার ভক্তি আছে জ্ঞান নাই, তিনি অন্যমনস্ক মনুষ্যের মত চক্ষু থাকিতেও অন্ধ। যেখানে জ্ঞান ও ভক্তির যোগ, সেই স্থানের দৃশ্যই পরলোক।

অনেকে এখন জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, ভক্তি তবে কি? এবং ভক্তি যে মনুষ্যের আছে, তাহা কিরূপে জানা যাইতে পারে? আমরা বলিতেছি, জ্ঞান ত ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ নহে, তবে জ্ঞান আছে, ইহা যে কারণে স্বীকার করিয়া থাকি, সেই কারণেই ভক্তি আছে, এ কথা স্বীকার করিতে আপত্তি কি?

ব্রহ্মাণ্ডই আমাদের বাহ্যেন্দ্রিয়ের দৃশ্য। আবার তাহার অনেক পদার্থই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহে। তৎসমুদায় কি আমরা নাই বলিয়া বিশ্বাস করি? আমাদের ইন্দ্রিয়শক্তি ও বুদ্ধি জ্ঞানাদি কিছুই দ্রষ্টব্য নহে, অথচ তৎসমুদায় কি নাই বলিয়া আমরা অবিশ্বাস করিয়া থাকি? এই ত আমরা "আমি, আমি" বলিয়া সর্ব্বক্ষণ চাৎকার করিতেছি; আমার সংসার, আমার ঘর বাড়ী বলিয়া কত কথা বলিতেছি, এবং মৃত মনুষ্যের শরীর দেখিয়া, আমার শরীর যে 'আমি' নহে, তাহাও বুঝিতেছি। কিন্তু 'আমি' যে কি, কেহ কি কখন দেখিয়াছি? আমি, আমাকে না দেখিয়াও যখন 'আমি' বলিয়া স্বীকার ও বিশ্বাস করিতেছি, তখন পরলোক দেখা যায় না বলিয়া তাহা অবিশ্বাস করিবার কারণ কি? তাহার পর পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি, সাধন করিলেই অন্তর আঁখি ফুটিয়া উঠে এবং পরলোক প্রত্যক্ষ হয়; তখন আর অবিশ্বাসের স্থান থাকে না।

এই কথাটা সহজ করিবার জন্যই কাঙ্গাল নিম্নলিখিত গানটী করিয়াছিলেন—

কি হয় মানুষ মলে, ও তাই জিজ্ঞাসে রে সবজনা।
মানুষ মলে যা হয় তাই হয়েছে, একবার ভেবে কেন দেখ না।

১। আত্মম্ভরী আত্মসুখী পশুর লক্ষণ, ভেবে দেখ না রে মন;
পশুপ্রবৃত্তি যার, পশু সে জন, হবে যা, তা হয় রে সে জনা!

২। আপনাকে চেনে যে জন, মানুষ সে জন হয়, কেবল মানুষ মানুষ নয়;
মানুষ দেবতা হয় দেবতা হবে, (ক'রে) জগতের হিতসাধন।

৩। পশুর প্রবৃত্তি যার কিছুমাত্র নাই, জীবে দয়া সর্ব্বদাই;
সে ত মানুষ হ'য়ে দেবতা হয়, যা হবে তাই হয় সে জনা।

৪। কাঙ্গাল বলে, যোগী ঋষি সাধক প্রধান, যাঁদের জগৎ সমজ্ঞান;
তাঁরা ঋষি ছিলেন ঋষি হ'লেন, করেন অন্তরীক্ষে সাধনা।

পরলোক সম্বন্ধে কাঙ্গালের কি মত, তাহা আমরা এতক্ষণ দেখাইলাম। কাঙ্গাল বলিতে চান যে, ও সকল কথার মীমাংসা তর্কের দ্বারা হয় না, সাধনার

দ্বারা হয়। প্রথমেই পিপাসা চাই; পিপাসা হইলেই তাহার নিবৃত্তির জন্য ব্যাকুলতা আসিয়া উপস্থিত হইবেই; সেই ব্যাকুলতাই পথিপ্রদর্শককে আনিয়া দিবে; তাহার পর সেই পথিপ্রদর্শকের সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হইতে হইবে। তাহার পর যাহা অপ্রত্যক্ষ ছিল তাহা প্রত্যক্ষ হইবে। তাহার পর— তাহার পর যাহা তাহা তিনিই বলিতে পারেন যিনি—

"চোক্ তাকালে আঁধার দেখেন, মুদ্‌লে সলক্ হয়।"

উপরে যে ব্যাকুলতার কথা বলিলাম সেই সম্বন্ধে কাঙ্গালের একটা সুন্দর গান আছে; আমরা তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

এত ভালবাস থেকে আড়ালে।
আমি কেঁদে মরি, ধরতে নারি, (তোমায়) দুটী হাত বাড়ালে।

১। ছিলাম যখন মা'র উদরে,
ঘোর অন্ধকার ঘর কারাগারে, হায় রে,—
তখন আহার দিয়ে, বাতাস দিয়ে,
তুমি আমারে বাঁচালে।

২। আবার যখন ভূমিষ্ঠ হলাম
মায়ের কোমল কোলে আশ্রয় পেলাম, হায় রে;—
মায়ের স্তনের রক্ত হে দয়াময়,
তুমি ক্ষীর ক'রে যে দিলে।

৩। দিলে, বন্ধুবান্ধব দারাসুত,
ও নাথ! সে সব কৌশল তোমারই ত, হায় রে;—
ও নাথ! ধন ধান্য সহায় সম্পদ,
পেলাম তোমার দয়াবলে।

৪। তোমার দয়ায় সকল পেলাম,
কিন্তু তোমায় একদিন না দেখিলাম হায় রে;—
তুমি কোথায় থাক, কেন এসে,
আমি কাঁদলে কর কোলে।

৫। আমি, কাঁদ্‌লে ব'সে হতাশ হ'য়ে,
তুমি চোখের জল দাও মুছাইয়ে হায় রে;—
আবার কথা ক'য়ে প্রাণের মাঝে,
কত উপদেশ দাও ব'লে।

৬। ও নাথ! দেখা নাহি দিবে আমার,
এই ইচ্ছা যদি আছে তোমার হায় রে;—
ওগো, তবে কেন শাকের ক্ষেত,
তুমি দেখালে কাঙ্গালে।

এই গানটীর সঙ্গে সঙ্গেই কাঙ্গাল আর একটী গান রচনা করিয়াছিলেন। আমার ঠিক মনে পড়িতেছে না, কিন্তু কাঙ্গাল এই গানটী যেদিন লেখেন, যখন লেখেন, তখনই আর একটী গান লেখেন আমরা সে গানটীও এখানে দিতেছি। এই দুইটী গান পাঠ করিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন, কাঙ্গাল হরিনাথ কি ছিলেন। তিনি ব্যাকুল হইয়া, প্রাণের আবেগে গান করিলেন—

"এত ভালবাস থেকে আড়ালে"

তাহার পরই তিনি বুঝিলেন যে, 'তিনি' ত আড়ালে থাকিতে চান না, থাকেন না। আমরা যে তেমন করিয়া তাঁহাকে ডাকি না, তেমন ব্যাকুলভাবে তাঁহাকে চাই না; তাই তিনি আড়ালে থাকিয়া ভাল বাসেন। অমনই কাঙ্গাল গায়িয়া উঠিলেন——

যদি ডাকার মত পারিতাম ডাক্‌তে।
তবে কি মা! এমন ক'রে তুমি লুকায়ে থাক্‌তে পার্‌তে।

১। আমি, নাম জানি না, ডাক জানি না,
আমি জানি না মা, কোন কথা বল্‌তে;—
তোমায় ডেকে দেখা পাইনে তাইতে,
আমার জনম গেল কান্‌তে।

২। দুঃখ পেলে মা তোমায় ডাকি,
আবার সুখ পেলে চুপ ক'রে থাকি ডাক্‌তে;—
তুমি মনে ব'সে মন দেখ মা!
আমায় দেখা দেও না তাইতে।

৩। ডাকার মত ডাকা শিখাও,
না হয়, দয়া ক'রে দেখা দাও আমাকে;—
আমি তোমার খাই মা, তোমার পরি,
কেবল ভুলে যাই নাম কর্‌তে।

৪। কাঙ্গাল যদি ছেলের মত
মা তোর ছেলে হ'ত তবে পারতে জান্‌তে;—

কাঙ্গাল জোর ক'রে কোল কেড়ে নিত,
নাহি সর্‌ত বল্লে সর্‌তে।

উপরিলিখিত দুইটী গান পাঠ করিলেই, আমার মনে হয়, কাঙ্গাল হরিনাথকে বেশ চিনিতে পারা যায়। তিনি মাকে ডাকিলে তিনি তাঁহার অন্তরে আবির্ভূত হইতেন; দীন হীন কাঙ্গাল তখন অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বরত্ব তুচ্ছ করিয়া সেই অনির্ব্বচনীয় রূপসাগরে ডুবিয়া থাকিতেন। তাই তিনি গায়িয়াছেন——

অরূপের রূপের ফাঁদে, পড়ে কাঁদে, প্রাণ যে আমার দিবানিশি।
১। যদি রে চাই আকাশে, মেঘের পাশে, সে রূপ আবার বেড়ায় ভাসি;
আবার রে তারায় তারায়, ঘুরে বেড়ায়, ঝলক লাগে হৃদে আসি।
২। হৃদয় প্রাণ ভ'রে দেখি, বেঁধে রাখি, চিরদিন সেই রূপরাশি;
কিন্তু তায় থেকে থেকে, ফেলে ঢেকে, কুবাসনা মেঘ আসি।
কাঙ্গাল কয় যে জন মোরে, দয়া ক'রে দেখা দেয় রে ভাল বাসি;
আমি সংসারের মায়ায়, ভুলিয়ে তাঁয় প্রাণ ভ'রে কই ভালবাসি।

কাঙ্গাল হরিনাথ যে ভাবের ঘোরে গায়িয়াছিলেন "এত ভাল বাস থেকে আড়ালে" ঠিক সেই ভাবে পাগল হইয়াই আর একজন সাধক লালন ফকির গায়িয়াছিলেন——

আমি একদিনও না দেখিলাম তাঁরে।
আমার ঘরের কাছে আরসী নগর, তাতে এক পড়সী বসত করে।
১। গ্রাম বেড়ে অগাধ পানি, তার নাই কিনারা, নাই তরণী পারের;
আমি, মনে করি দেখব তাঁরি, আমি কেমনে সেথা যাই রে।
২। বল্‌ব কি পড়সীর কথা, তার হস্ত পদ স্কন্ধ কিছুই নাই রে;
সে যে ক্ষণেক থাকে শূন্যের উপর, আবার ক্ষণেক থাকে নীরে।
৩। সেই পড়সী যদি আমার হ'ত, তবে যমযাতনা সকল যেত দূরে;
আবার, সে আর লালন একস্থানে রয়, তবু লক্ষ যোজন ফাঁক রে।

শ্রীজলধর সেন।

জাপানের ধর্ম্ম।

বৌদ্ধমন্দিরের সম্মুখে একটী প্রকাণ্ড ঘণ্টা আছে। পার্শ্বে বিলম্বিত লগুড় দ্বারা উহাতে আঘাত করিলে এক বিষাদময় শব্দ বাহির হইয়া শ্রোতাগণকে নির্ব্বানের (অর্থাৎ মৃত্যুর) কথা মনে করাইয়া দেয়। মন্দির দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া উপাসকগণ যুক্তকরে "নামু আমি দাবুৎসু", (অর্থাৎ নমঃ অনাদিবুদ্ধ) বলিয়া অতিভক্তিভরে প্রণত হন।

বৌদ্ধমন্দিরের ন্যায় শিণ্টোমন্দিরেও আজকাল বাজার বসিয়া থাকে। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের পূর্ব্বে জাপানে কোনও উল্লেখযোগ্য শিল্পাদি না থাকায় পুরাকালে শিণ্টোমন্দিরে বাজার বসিত না। এই কারণেই আমি উহার উল্লেখ পূর্ব্বে করি নাই। বৌদ্ধ পুরোহিতগণই জাপানে শিক্ষাবিস্তার এবং শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা করেন। পল্লীগ্রামস্থিত বৌদ্ধমন্দিরগুলির মহিমা অসীম। গ্রামে কোনও শিশুর জন্ম হইলে পুরোহিতগণ তাহার নাম লিখিয়া লন। যতদিন পর্য্যন্ত উক্ত শিশু গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন না করে, ততদিন পর্য্যন্ত সে অন্য কোনও ধর্ম্মমন্দিরে যোগদান করিতে পারে না। কিন্তু গ্রাম পরিত্যাগ করিলে, যে কোনও ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে পারে।

বৌদ্ধপুরোহিতগণ অতি বিচিত্র এবং বহুমূল্য পোষাকপরিচ্ছদ পরিধান করিয়া থাকেন। ইঁহারা সাধারণতঃ বিবাহ করেন না এবং সকলেই অল্প অল্প সংস্কৃত কিংবা পালিভাষা শিক্ষা করেন। অন্য সমস্ত বৌদ্ধমন্দিরেই কিছু না কিছু সংস্কৃত ভাষায় লেখা আছে। আমি "হিয়োলোর" বৌদ্ধমন্দিরে একখানি প্রস্তরখণ্ডের গাত্রে সংস্কৃত লেখা দেখিয়াছি। সর্ব্বোপরি সুন্দর একটী দেবীমূর্ত্তি খোদিত করিয়া তাঁহার মস্তকের উপরে অর্দ্ধবৃত্তাকারে সংস্কৃত লেখা আছে। অক্ষরগুলি সমস্ত পড়িতে পারিলাম না; কারণ অধিকাংশ অক্ষরেরই সমস্ত অংশ নাই। উক্ত অক্ষরগুলি সুবর্ণে মণ্ডিত থাকায় দুষ্ট লোকে তাহা তুলিয়া ফেলিয়াছে।

স্ত্রীলোকেরাও কুমারী অবস্থায় কিংবা বিধবা হইলে মস্তক ক্ষৌরী করিয়া বৌদ্ধ পুরোহিত হইতে পারেন। বিবাহিতা স্ত্রীরও পুরোহিত হইবার অধিকার আছে। কিন্তু এরূপ পুরোহিত খুব কমই দৃষ্ট হইয়া থাকে। শিণ্টো ধর্ম্মানুসারে স্ত্রীলোক অতি অশুচি। সুতরাং তাঁহারা পবিত্র পুরোহিতব্রত অবলম্বন করিতে পারেন না।

বৌদ্ধধর্ম্ম জাপানে প্রচার হইবার পূর্ব্বে জাপানীদের সামাজিক জীবন এবং ধর্ম্মবিশ্বাস কিরূপ ছিল তাহা একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। খৃষ্টীয় পঞ্চশতাব্দীর পূর্ব্বে জাপানের লোকসংখ্যা খুব কম ছিল। সে সময়ে জাপানে ভাল রাস্তাঘাট কিছুই ছিল না। গরু ঘোড়া কিংবা অন্য কোনও গৃহ-পালিত পশুরও কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না। মানুষের বাসোপযোগী ভাল গৃহাদি নির্ম্মাণ করিতে না পারায় জাপানীরা অতি কদর্য্য পর্ণকুটীরে বাস করিতেন। এই কুটীরগুলি সাধারণতঃ লতাপাতা এবং গাছগাছড়ার দ্বারা নির্ম্মিত হইত। ধাতু কিংবা রত্নের ব্যবহার জাপানীরা আদৌ জানিতেন না। ভূমিকর্ষণোপযোগী এক প্রকার অতি জঘন্য অস্ত্র ছিল; উহা ব্যতীত লৌহ নির্ম্মিত অন্য কোনও অস্ত্রশস্ত্রাদির উল্লেখ পাওয়া যায় না। ৬৭৫ খৃঃ অঃ জাপানীরা প্রথম রৌপ্য দেখিয়াছিলেন। কিন্তু তখনও স্বর্ণের নাম পর্য্যন্ত ইঁহাদের নিকট অপরিচিত ছিল। ৭৪৯ খৃঃ অঃ বৌদ্ধ পুরোহিতগণের সাহায্যে যে স্বর্ণখনি আবিস্কৃত হয় সেই স্বর্ণের দ্বারা কয়েকটী মন্দির মণ্ডিত করা হইয়াছিল।

ধাতুর সংস্পর্শে স্বাস্থ্যের হানি হয় এই বিশ্বাস জাপানীদের প্রবল থাকায় উঁহারা ধাতুনির্ম্মিত অলঙ্কার ব্যবহার না করিয়া মৃত্তিকা এবং প্রস্তরনির্ম্মিত গহনা পরিধান করিতেন। অলঙ্কার স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েই ব্যবহার করিতেন। এবং পুরুষগণ স্ত্রীলোকের ন্যায় লম্বা লম্বা চুল রাখিতেন। কারণ যন্ত্রের অভাবে উঁহারা তাহা কাটিতে পারিতেন না। বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ধাতুসম্বন্ধে জাপানীদের কুসংস্কার তিরোহিত হইলে জাপ স্ত্রীলোকেরা খোপায় লৌহশলাকা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন।

খৃষ্ট পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীর পূর্ব্বে জাপানীদের কোনও গ্রন্থাদি ছিল না। এই সময় হইতে তাঁহারা চীন হইতে সর্ব্ব বিষয় শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। নিজেদের কোনও লিখিত ভাষা কিংবা অক্ষর না থাকায় চীন-দেশীয় অক্ষর জাপানে প্রচারিত করা হয়। উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে জাতীয় ইতি-হাস কেহই লিখিতে সমর্থ হন নাই। সুতরাং জাপানের পুরাতন ইতিহাস নাই। তবে বৌদ্ধ পুরোহিতগণের যত্নে ও পরিশ্রমে উক্ত ধর্ম্মবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে জাপানের ইতিহাস কিয়ৎপরিমাণে লিখিত হইয়াছিল। এই বৌদ্ধ পুরোহিতগণই জাপানে ভারতীয় এবং চীনদেশীয় সভ্যতাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তদ্দেশীয় শিল্প ও বিজ্ঞান জাপানীদিগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। এবং তাঁহাদের

যত্নে ও উৎসাহে মানুষ এবং অন্যান্য জীবের রোগচিকিৎসার বিশেষ বন্দোবস্ত হয়। এই সময় হইতে জাপানে সর্ব্ব প্রথম চিকিৎসাবিদ্যা আরম্ভ হইয়াছিল। জাপানের অনেক দুর্গম স্থানে ইঁহারা গিয়াছিলেন। এবং তথায় রাস্তা প্রস্তুত করাইয়া কূপাদি জলাশয় খনন করাইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত ইঁহারা চীন ও কোরিয়ার সহিত ব্যবসাসূত্রে জাপানকে আবদ্ধ করিয়া ইহার ধনবৃদ্ধির পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

বহু শতাব্দী ব্যাপিয়া জাপানীদের সামাজিক জীবনের উপর বৌদ্ধ-পুরোহিতগণের ক্ষমতা সম্যকভাবে প্রবল ছিল। ইঁহাদের নির্দ্দিষ্ট পথ জাপানীরা অবলম্বন করিতেন। যুদ্ধবিগ্রহের সময় ইঁহারাই দূতের কার্য্য করিয়া সমস্ত গোলমাল মিটমাট করিয়া দিতেন। ইঁহারা জাপানীদের আহার্য্যসম্বন্ধেও পরিবর্ত্তন সংসাধিত করেন, এবং তাঁহাদের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্মের মূলমন্ত্র অর্থাৎ "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" এই মহাবাক্যটী প্রচার করিয়া আশাতীত ফল লাভ করিয়াছিলেন।

"নারা" নামক স্থানে অনেকগুলি আশ্রম এবং মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া বৌদ্ধ পুরোহিতগণ তথা হইতে জাপানীদের সামাজিক গতিবিধি অবলোকন করিতেন। এইরূপে প্রকৃত প্রস্তাবে এই পুরোহিতগণই জাপানে সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করেন।

এস্থলে আর একটু বক্তব্য আছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে জাপানীরা বাসের উপযুক্ত গৃহাদি প্রস্তুত করিতে পারিতেন না। এক্ষণে বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ সভ্য হইয়া উঠিলে তাঁহারা অপেক্ষাকৃত বড় ঘর নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে পুরোহিতগণের চেষ্টায় জাপানী-দের সুখসমৃদ্ধি অনেক বৃদ্ধি পাইলে তাঁহারা আর জাপান পরিত্যাগ করিয়া বিদেশে যাইতেন না। এই কারণে জাপানের লোকসংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

আজও পর্য্যন্ত জাপানীদের মধ্যে যে সমস্ত কুসংস্কার দৃষ্ট হয় তাহাই তাঁহাদের অতি প্রাচীন ধর্ম্মের প্রমাণ স্বরূপ। কারণ শিণ্টো, বৌদ্ধ, এবং কনফিউসান্ ধর্ম্ম কোনও কুসংস্কার শিক্ষা দেয় নাই। খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীর পূর্ব্ব হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তারের সময় অবধি জাপানীরা এক জাতিতে পরিণত হইতেও পারে নাই। এসিয়ার নানা স্থান হইতে ভিন্ন ভিন্ন জাতির লোক আসিয়া এখানে বাস করিতে থাকে। এবং পরিশেষে ইহারাই এক মহাজাতিতে

পরিণত হইয়া এক্ষণে জগতের ইতিহাসে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। একই মহাজাতিতে পরিণত হইবার পূর্ব্বে ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন কুসংস্কার ছিল। সেই কুসংস্কারই তাহাদের ধর্ম্ম ছিল। ধর্ম্মসম্বন্ধে কোনও লিখিত পুস্তক না থাকায় তৎকালীন সমুদয় বিষয় জানা যায় না।

এক শ্রেণীর লোক সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিত না। তাহাদের মতে ক্ষিত্যপতেজঃমরুদ্ব্যোম্‌ * কতকগুলি সৎ এবং অসৎ দৈত্যে পরিপূর্ণ। ঐ দৈত্যগণই নাকি সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয়ের কারণ। এই কারণেই দেশে দুর্ভিক্ষ কিংবা মহামারী হইলে দুষ্ট দৈত্যগণের সন্তুষ্টির জন্য পূজা দেওয়া হইত। কখনও কখনও দুষ্ট দৈত্যগণের হস্ত হইতে মুক্তি পাইবার জন্য 'ওঝার' শরণাপন্ন হইতে হইত। এই ওঝাগণও আমাদের দেশের ভূত এবং সাপের ওঝার ন্যায় নানারূপ মন্ত্র পাঠ করিয়া রোগীদিগকে মাদুলী ধারণ করিতে দিত। আজও পর্য্যন্ত কোনও কোন জাপানী মাদুলী ধারণ করিয়া থাকে। ইহা নাকি চোরের ভয় হইতে রক্ষা করিতে পারে।

জন্তুর মধ্যে জাপানীরা প্রধাণতঃ † "কিরিণ" (একশৃঙ্গী কল্পিত জীব বিশেষ), "হো—য়ো" (কল্পিত পক্ষীবিশেষ)। ইহা ৫০০ বৎসর বয়ঃক্রম কালে অগ্নিতে প্রাণত্যাগ করে, এবং পুনরায় ভস্ম হইতে জন্মাইয়া উঠে)। কচ্ছপ, এবং "রিত্ত" (পক্ষবিশিষ্ট সর্পবিশেষ।) প্রভৃতিকে পূজা করিত।

'কিরিণ' এবং 'হো—য়ো' একাধারে স্ত্রী এবং পুরুষ। ইহারা ধরায় অবতীর্ণ হইলে এই বুঝায় যে পৃথিবীর শাসনকার্য্য খুব ভাল হইবে অথবা এমন কয়েকজন উপযুক্ত লোক জন্ম গ্রহণ করিবেন, যাঁহাদের দ্বারা শাসনকার্য্য সুসম্পন্ন হইবে। কিরিণের শরীর মৃগের ন্যায় ও লাঙ্গুল বৃষের ন্যায়। ইহা কাঁচা মাস ভক্ষণ করে না এবং চলিবার সময় কোনও প্রাণীকে পদদলিত করে না।

'হো—য়ো' সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর বৃক্ষের উপর উপবেশন করে। এবং বাঁশের বীজ ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে। ইহা বসিবার সময় ইতস্ততঃ দেখিতে থাকে এবং উড়িবার সময় নানা জাতীয় পক্ষী ইহার পশ্চাৎ অনুসরণ করে।

---

* ক্ষিতি—পৃথিবী; অপ—জল; তেজ—সূর্য্য; মরুৎ—বায়ু; ব্যোম—শূন্যমার্গ।

† জাপানীরা ল এবং এল্ এর উচ্চারণ করিতে না পারায় "কিলিণকে—"কিরিণ" বলিয়া থাকেন।

ইহার চক্ষু তালচক্ষু পক্ষীর ন্যায়। অবয়ব মৎস এবং সর্পের ন্যায়। ইহার শরীরের প্রধান উপাদান জল এবং গায়ের রং ময়ূরের ন্যায়।

জাপানীরা যে কচ্ছপকে পূজা করেন, তাহা সাধারণ কচ্ছপ হইতে ভিন্ন। এই কচ্ছপ পীত নদীতে (Yellow river) জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া প্রবাদ আছে। কথিত আছে যে এই কচ্ছপের পৃষ্ঠে অনেকগুলি নীতি ও গুপ্তরহস্য লিখিত ছিল। ইহা সহস্র বৎসর বাঁচে। এবং ইচ্ছানুসারে ছোট কিংবা বড় হইতে পারে। ইহার লাঙ্গুল আছে। ইহা জলদেবতার বাহন বলিয়া জাপানীদের বিশ্বাস।

'রিত্ত' ইচ্ছানুযায়ী ছোট কিংবা বড় হইতে পারে। এমন কি ইহা একেবারে অদৃশ্যও হইতে পারে। তাহাদের সকলেরই শৃঙ্গ, ক্ষুর, দাঁড় এবং নখর আছে। ইহাদের নিশ্বাসপ্রশ্বাস অগ্নিবৎ প্রখর, এবং ইহারা অতি দ্রুতগামী ও তেজস্বী হইলেও অতি সহিষ্ণু।

এতদ্ভিন্ন আরও কতকগুলি জন্তুকে জাপানীরা পূজা করিয়া থাকেন। বিড়াল, খেঁকশিয়াল প্রভৃতি জন্তুগণ মনুষ্যমূর্ত্তি ধারণ করিতে পারে বলিয়া জাপানীদের বিশ্বাস আজও পর্য্যন্ত আছে। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া জাপানীরা সমস্ত বিড়ালের লাঙ্গুল কাটিয়া দেন। সম্পূর্ণ লাঙ্গুলবিশিষ্ট বিড়াল জাপানে একটীও নাই। এসম্বন্ধে যথাস্থলে বলিব।

পল্লীগ্রামস্থ কৃষকগণ ভূমিতে লাঙ্গল দিবার পূর্ব্বে উহা হইতে একখানি প্রস্তর কিংবা কিছু মৃত্তিকা লইয়া এক কোনে রক্ষিত করে। পরে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া মনে মনে মন্ত্র পাঠ করিতে থাকে। মন্ত্রপাঠ শেষ হইলে জমিতে লাঙ্গল দেয়। কোনও বৃক্ষ ছেদন করিতে হইলে অগ্রে এরূপ মন্ত্রপাঠ করিয়া তৎপর উহাতে কুঠারাঘাত করা হয়। ইহার অর্থ এই যে মৃত্তিকা এবং বৃক্ষেতে যে সকল দৈত্যগণ অবস্থান করেন, তাঁহারা ক্রোধান্বিত হইলে প্রভূত অনিষ্ট সাধন করিতে পারেনা। এই জন্য তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য মন্ত্রপাঠ করিতে হয়।

জাপানীরা কয়েক প্রকার গাছকে আজ পর্য্যন্ত পূজা করিয়া অসিতেছেন। উপাসকবৃন্দ কাগজে মন্ত্র লিখিয়া এ সমস্ত গাছের শাখায় বাঁধিয়া দেন। এবং জীবনান্তেও ঐ সমস্ত বৃক্ষ কেহ উচ্ছেদ করিতে সাহস করে না। পল্লীগ্রামে অনেক সময়ে বৃক্ষের গায়ে মনুষ্যের তৃণমূর্ত্তি লৌহশলাকা দ্বারা বিদ্ধ দৃষ্ট হয়। ইহার কারণ অতি হাস্যজনক। যদি কোনও পুরুষ একটী স্ত্রীলোককে

ভালবাসিয়া তাঁহাকে বিবাহ না করেন, কিংবা বিনা অপরাধে যদি কেহ স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে উক্ত স্ত্রীলোক প্রতিশোধ লইবার জন্ত রাত্রি দুটার সময় মন্দিরে গমন করেন। তথায় উপস্থিত হইয়া সেই দুষ্ট পুরুষটীর একটী প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করা হয়; পরে তথাকার যে বৃক্ষটী দেবতার নামে উৎসর্গ করা থাকে, তাহার গায়ে উক্ত তৃণমূর্ত্তি লৌহশলাকার দ্বারা আবদ্ধ করা হয়। লৌহ বিদ্ধ করিবার সময় সচরাচর একটী ত্রিপদ কাষ্ঠাসনে তিনটী প্রজ্বলিত বাতি রাখিয়া মস্তকে ধারণ করা হয়। মূর্ত্তিটী বিদ্ধ করা হইলে বৃক্ষদেবতার নিকট যুক্ত করে উক্ত দুষ্ট ব্যক্তিকে উপযুক্ত শাস্তি দিবার জন্ত প্রার্থনা করা হয়। যতদিন পর্য্যন্ত সেই ব্যক্তি ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত না হন, ততদিন পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকটী প্রতি রাত্রিতে মন্দিরে যাইয়া শলাকাগুলি অল্প অল্প করিয়া পুঁতিয়া আসেন।

আমি বৌদ্ধ মন্দির দর্শন করিতে গিয়া যাহা দেখিয়াছি পাঠকবর্গ তাহা শ্রবণ করিলে হাস্ত সংবরণ করিতে পারিবেন না। এই মন্দিরটী একটী পাহাড়ের শিখরদেশে অবস্থিত। এখানে বুদ্ধদেবের মাতা মায়াদেবীর এক বৃহৎ মূর্ত্তি আছে। এই পর্ব্বতটীকে মায়াদেবী নামে অভিহিত করা হইয়াছে। জাপানীরা ইহাকে 'মায়া সান্' বলেন। এই মন্দিরের একটী বারান্দায় কয়েক জন দেবতার মূর্ত্তি আছে। ভক্তগণ কোনও দেবতার পদধূলি লইয়া গায়ে দিতেছিলেন; কেহ বা কাগজে থুথু ফেলিয়া উহা অপর একজন দেবতার নামে নিক্ষেপ করিতেছিলেন। এই শেষোক্ত দেবতাটী থুথুতে পরিপূর্ণ হইয়া গেলেন। কিন্তু ভক্তগণ তাহাতেও প্রতিনিবৃত্ত হইলেন না। শুনিলাম যাঁহার নিক্ষিপ্ত কাগজ ঠাকুরের গায়ে লাগিয়া থাকে, তাঁহার নাকি খুব মঙ্গল হয়। লোকের কি অন্ধবিশ্বাস।

বৌদ্ধ এবং শিণ্টো ধর্ম্ম জাপানে প্রচারিত হওয়ায় উহার ফল কিরূপ হইয়াছিল পাঠকবর্গ তাহা দেখিয়াছেন। এক্ষণে দেখা যাউক কন্‌ফিউসিয়ান্ যে সমস্ত নীতি শিক্ষা দিয়াছিলেন তাহার ফল কি হইয়াছিল। এই নীতি সমূহ জাপানী চরিত্রে প্রভূত পরিবর্ত্তন সংসাধিত করিয়াছিল।

প্রভুভক্তিতে জাপানীরা জগতে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। অনেক ইংরাজ এবং আমেরিকান লেখকগণ ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। পিতা অপেক্ষা প্রভুকে জাপানীরা আজও পর্য্যন্ত অধিকতর ভক্তি করেন। এমন কি ইঁহারা প্রভুর জন্ত ন্যায্য মনে করিলে, নিজেদের পিতাকেও হত্যা

করিতে কিঞ্চিন্মাত্র কুণ্ঠিত হন না। যাঁহারা প্রভুর শত্রু পিতাকে হত্যা করেন, তাঁহাদের নাম জাতীয় ইতিহাসে স্থান পায়।

সন্তানের উপর পিতার ক্ষমতা অসীম ছিল। পিতা ইচ্ছা করিলে সন্তানকে হত্যা করিতে পারিতেন। এ যাবৎ অসংখ্য বালকবালিকা পিতৃহস্তে নিহত হইয়াছে। অতি অল্পদিন হইতে বেচারা বালক বালিকাগণ পিতার নৃশংস অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইয়াছে। এখন আর সন্তানহত্যা বড় একটা করা হয় না। কিন্তু অনেক সময়ে তাহাদিগকে বিক্রয় করা হইয়া থাকে। সহস্র সহস্র বালিকা পিতার অত্যাচারে সতীত্ব রত্নে জলাঞ্জলী দিয়াছে। তবে যে সমস্ত বালিকা পিতাকে ঋণ হইতে মুক্ত করিবার জন্য, কিংবা বৃদ্ধাবস্থায় তাঁহাকে প্রতিপালন করিবার উদ্দেশে অসদুপায় অবলম্বন করিত, তাহারা জনসমাজে অত্যন্ত সম্মানিত হইত। অনেক সময় বিশেষ কোনও কারণ না থাকিলেও খামখেয়ালী পিতা তাহার যুবতী কন্যাকে অসদ্বৃত্তি অবলম্বন করিয়া মুদ্রা উপার্জ্জন করিতে বাধ্য করিত। বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের বিশেষ চেষ্টা সত্বেও এই হেয় প্রথা অদ্যাপিও জাপসমাজ হইতে একেবারে লোপ পায় নাই।

জ্যেষ্ঠ এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতার সম্বন্ধ পিতা পুত্রের ন্যায় ছিল। পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সংসারের সর্ব্বময় কর্ত্তা পূর্ব্বেও হইতেন, এখনও হইয়া থাকেন। সংসারে মাতার কোনও ক্ষমতা থাকে না। তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে অতি সম্মানের সহিত ভয় করেন। এবং পুত্রের উপর কোনও আধিপত্য করিতে পারেন না। জ্যেষ্ঠ পুত্রগণ পিতার সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হন। এবং কনিষ্ঠ ও আর আর পুত্রগণ প্রায়শঃ পোষ্যপুত্রস্বরূপ প্রদত্ত হইয়া থাকেন। যে বংশে কোনও পুরুষসন্তান নাই অথচ কন্যা আছে, সেখানে এই শ্রেণীর পুত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিয়া বংশ রক্ষা করা হইয়া থাকে। বিবাহের সময় উক্ত পুত্রটীকে কন্যার পিতৃবংশের পারিবারিক উপাধি দেওয়া হয়। এইরূপে কন্যার দ্বারাও জাপানীদের বংশ রক্ষা হইয়া থাকে।

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ।

কবি ও মধুকর।

ভিখারী বৈরাগী সম খঞ্জনী বাজায়ে,
স্বভাব-দরিদ্র মক্ষি বন-লক্ষ্মী-দ্বারে,
উষার উদয় হ'তে—সন্ধ্যার বিদায়ে,
ফুলে ফুলে ভিক্ষা মাগি যে মধু আহরে
প্রসন্ন হ'লেও তাহে দেবতার মন,—
দেব-অর্ঘ্য সে কি তবু তেমন মধুর,
সৌন্দর্য্যের মহাপীঠ—বাণীর আসন
কবি-হৃদি-শতদল যাহে ভরপুর ?
মধুর সমস্ত বিশ্ব—কবির হৃদয়-
জাত মধুর মিশ্রণে ; প্রতিভা কবির
নিত্য যাত্রী সেই পথে আনন্দ-আলয়
চির জ্যোৎস্নান্বিত যেথা সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মীর ;
সে সৌন্দর্য্যে প্রেমাকুল উদার বচনে
মধুময় কর কবি, মানবজীবনে।

শ্রীপ্রিয়নাথ সেন।

কর্ণেল গার্ডনার।

অল্পদিন পূর্ব্বে এলাহাবাদ হাইকোর্টে একটি মোকর্দ্দমায় মোগল বাদশাহ-বংশের সহিত কোন য়ুরোপীয় পরিবারের বৈবাহিক সম্বন্ধের কথা ব্যক্ত হয়। প্রকাশ পায়, বাহাদুরশাহের ভগিনী মালখা গার্ডনার নামক এক ব্যক্তির পত্নী বলিয়া পরিচিতা ছিলেন। সুলেমান সেখো গার্ডনার তাঁহাদের পুত্র। সুলেমানের এক কন্যা ও এক পুত্র জন্মে। কন্যার নাম হুমায়ুন বেগম, পুত্রের নাম সেফার্ড গার্ডনার। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে হুমায়ুন বেগম কামরান সিকো গার্ডনারকে বিবাহ করেন। কামরানের পিতার নাম সিকন্দর সেখো গার্ডনার। জননীর নাম কুলসম জামিনি বেগম—ইনিও মোগল বাদশাহবংশের দুহিতা। এই বৈবাহিক সম্বন্ধের বিবরণ বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক।

ভারতে মোগলসাম্রাজ্যের পতনাবস্থায় দেশব্যাপী রাষ্ট্রবিপ্লবের মধ্যে যে সকল বিদেশীয় সেনাধ্যক্ষ অর্থলোভে ও যশোলাভাকাঙ্খায় ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই নীচবংশীয় হইলেও সম্ভ্রান্তবংশীয়েরও অভাব ছিল না। এক পক্ষে যেমন ফ্রাবোয়াঁ চর্ম্মব্যবসায়ীর পুত্র, ক্লডমার্টিন রেশমী বস্ত্রব্যবসায়ীর সন্তান, জর্জ্জ টমাসের পিতামাতা তাঁহাকে কোন বিদ্যালয়ে শিক্ষিত করিতে পারেন নাই বা করেন নাই। পেরং নামে খ্যাত প্রসিদ্ধ সেনাপতি দেউলিয়া বস্ত্রব্যবসায়ীর বংশধর, ফিনোজ হীনবংশীয়—ভারবাহী অশ্বতরচালক, ম্যাডক নিরক্ষর, রেণার্ড ওরফে সমরু কশাই পুত্র—অপর পক্ষে তেমনই সাদারল্যাণ্ড পূর্ব্বে বৃটিশ সেনাধ্যক্ষ ছিলেন, ভারতে য়ুরোপীয় যোদ্ধৃবৃন্দের প্রথম ঐতিহাসিক স্মিথ, একজন বৃটিশ সৈনিক কর্ম্মচারীর পুত্র স্বয়ং সুশিক্ষিত, মার্শাল সুশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্তবংশীয়, লেগ একজন সম্ভ্রান্ত জাহাজ অধিকারীর পুত্র স্বাভাবিক উদ্দামভাববশে স্বজন-ত্যাগী হইয়া পদাতিক ও নাবিকরূপে মাদ্রাজে সমাগত, ডুগঙ্গ সমুচ্চবংশীয় ইটালীয়ান সৈন্যদলের একজন জেনারলের ভ্রাতা, ডিউড্রেনেক, কম্পটনের মতে, ভদ্রবংশীয় এবং স্বয়ং শিষ্টাচারী ও সুশিক্ষিত, গার্ডনার, প্রসিদ্ধ বৃটিশ নৌসেনাধ্যক্ষ লর্ড গার্ডনারের ভ্রাতুষ্পুত্র। ইহাদিগের সকলেরই জীবনকথা বিস্ময়কর ও বৈচিত্র্যময়,* কিন্তু গার্ডনারের বিবাহ ও বংশধরগণের* ইতিহাস উপন্যাস অপেক্ষাও বিস্ময়কর।

ফ্রান্সে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া গার্ডনার বৃটিশ সেনাদলভুক্ত হইয়া ভারতে আগমন করেন ও ক্রমে ক্যাপ্টেনপদে উন্নীত হন। পরে তিনি ঐ পদ ত্যাগ করিয়া ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে টুকাজী হোলকারের সেনাদলে প্রবেশ করেন।

ইতঃপূর্ব্বেই তিনি মুসলমান রীত্যনুসারে কাম্বের নবাববংশীয় এক কুমারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। "Wanderings of a Pilgrimn in search of the Picturesque" গ্রন্থের রচয়িত্রী লেডী ফ্যানি পার্কসের নিকট তিনি এই বিস্ময়কর বিবাহের বিবরণ বিবৃত করিয়াছিলেন।

তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্ত্তৃক কাম্বের নবাবের সহিত সন্ধি সংস্থাপনের ব্যবস্থা করিতে প্রেরিত হন। তথায় তাঁহাকে সর্ব্বদা দরবারে যাইতে হইত। একদিন দরবারে তাঁহার সম্মুখে একটি যবনিকা অতি সতর্কতাসহকারে ঈষৎ অপসৃত হইলে তিনি তাহার পশ্চাতে দুইটি মনোরম নয়ন দেখিলেন। এমন মনোরম নয়ন তিনি আর কখনও দেখেন নাই। তিনি আর সন্ধির কথায়

মনোনিবেশ করিতে পারিলেন না; কেবল সেই নয়নযুগলের কথা ভাবিতে লাগিলেন। তিনি মনে করিলেন, তাঁহাকে দেখিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষায় বালিকা না জানি কত সম্ভাবিত বিপদ উপেক্ষা করিয়াছে। দরবারে আর কেহ যদি এই যবনিকা উত্তোলনের কথা জানিতে পারিত, তবে এই মুসলমান রাজ্যে বালিকাকে কতই লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইত। দরবার শেষ হইতে তিনি অনুসন্ধানে অবগত হইলেন, বালিকা নবাবের দুহিতা। পরদিন দরবারে আসিয়া তিনি কেবল সেই নয়নযুগল দর্শনের আশায় আকুল হইতে লাগিলেন। তাঁহার আশাও ফলবতী হইল। তিনি অস্থিরচিত্তে ফলাফলের বিষয় বিবেচনা না করিয়া বালিকার পাণি প্রার্থনা করিলেন। নিধু বাবু গাহিয়াছিলেন "মনেরে বুঝায়ে বল, নয়নেরে দোষ কেন?" কিন্তু এক্ষেত্রে মনোমিলন না হইতেই যুবক গার্ডনার আঁখি দেখিয়াই উদ্ভ্রান্ত হইলেন।

গার্ডনারের এই অপ্রত্যাশিত ও অতর্কিত প্রস্তাবে নবাব ক্রুদ্ধ হইলেন; কিন্তু কোম্পানীর দূতের অসন্তোষে ভবিষ্যতে স্বার্থহানির সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া বিবাহে সম্মতি দিলেন। বিবাহের উদ্যোগ চলিতে লাগিল। গার্ডনার নবাবকে বলিলেন, যেন অন্য কোন বালিকার সহিত তাঁহার বিবাহের চেষ্টা না হয়। তিনি আর কিছু না দেখিয়া কেবল নয়ন দেখিলেই স্বীয় প্রণয়পাত্রীকে চিনিতে পারিবেন। তিনি আর কাহাকেও বিবাহ করিবেন না। বিবাহকালে তিনি বালিকার মুখাবরণ উন্মোচিত করিয়া মুসলমান প্রথামতে মুকুরে তাঁহার প্রতিবিম্ব দেখিলেন; দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন—এ তাঁহার চিত্তহারিণীর সেই নয়নই বটে। তখন বালিকার বয়স ত্রয়োদশবৎসর মাত্র। উত্তরকালে এই বালিকাকেই দিল্লীর সম্রাট আকবার শাহ কন্যারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ইহার পর গার্ডনার হোলকারের জন্য একদল সেনা সংগ্রহ করিয়া সেই দলের অধ্যক্ষতা করিতে থাকেন। কিন্তু টুকাজীর উত্তরাধিকারী যশোবন্ত রাওয়ের সহিত অল্পদিনেই তাঁহার মনোমালিন্য সংঘটিত হয়। হোলকার ইংরাজের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইলে তাঁহার অধিকাংশ য়ুরোপীয় সেনাধ্যক্ষ তাঁহার পক্ষ ত্যাগ করেন; কেবল গার্ডনারপ্রমুখ কয়েকজন তাঁহার পক্ষেই রত রহেন। হোলকার ১৮০২ খৃষ্টাব্দে সন্ধির প্রস্তাব করিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়-মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ দান করিয়া গার্ডনারকে ইংরাজ সেনানায়কের নিকট প্রেরণ করেন। সন্ধি না করিয়া সন্ধির প্রস্তাবে কিছু সময় অতিবাহিত করাই হোলকারের অভিপ্রেত ছিল। ইংরাজ সেনাপতি লর্ড লেকও

হোলকারের অভিপ্রায় বিষয়ে সন্দিহান ছিলেন। কিন্তু গার্ডনার প্রকৃত অবস্থা অবগত ছিলেন না। তিনি যথাসাধ্য চেষ্টাসত্বেও অকৃতকার্য্য হইয়া একদিন সন্ধ্যাকালে হোলকারের শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। নানা কারণে তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনে বিলম্ব ঘটিয়াছিল। তখন হোলকারের সেনাদলে বিদেশীয় সৈন্যাধ্যক্ষগণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলিতেছিল। এই ষড়যন্ত্রের ফলে কয়জন বিদেশীয় সেনাপতি নিহতও হন। গার্ডনারের প্রত্যাবর্ত্তনে বিলম্ব দেখিয়া হোলকারের পার্শ্বচরগণ তাঁহার সম্বন্ধেও হোলকারকে নানা কথা বলিয়াছিল। যশোবন্তরাও সন্ধ্যাকালে প্রায়ই অপ্রকৃতিস্থ থাকিতেন। গার্ডনারের অকৃতকার্য্যতার বিষয় অবগত হইয়া তিনি প্রথমে তাঁহাকে তিরস্কার করিলেন ও পরে তাঁহার প্রতি অবজ্ঞাসূচকবাক্য প্রয়োগ করিলেন এবং শেষে বলিলেন, গার্ডনার সেই দিন প্রত্যাবৃত্ত না হইলে তিনি গার্ডনারের পট্টাবাসের কানাচ দূরীভূত করিয়া তাঁহার পুরাঙ্গনাদিগকে লোকলোচনগোচর করিতেন। গার্ডনার অতি সম্ভ্রান্তবংশীয় মুসলমান মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। এইরূপ উক্তিতে তাঁহার অপমান সহজেই অনুমেয়। তিনি স্থানকালবিষয় বিবেচনা না করিয়া উন্মুক্ত তরবারি করে হোলকারের দিকে ধাবিত হইলেন। পার্শ্বচরগণ তাঁহাকে নিবারিত করিল। হোলকার ও তাঁহার পরিষদগণ গার্ডনারের এই দুঃসাহসে এমনই বিস্ময়বিহ্বল হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা প্রকৃতিস্থ হইবার পূর্ব্বেই গার্ডনার শিবির ত্যাগ করিয়া অশ্বারোহণে প্রস্থান করিলেন। বেগম হোলকারের শিবিরেই রহিলেন।

পথে গার্ডনার এক বিপদে পড়িলেন। পেশোয়ার তখন ইংরাজের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার ভ্রাতা অমৃত রাও ইংরাজের সহিত বিবাদে ব্যাপৃত। তিনি গার্ডনারকে ধরিয়া ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার আদেশ দিলেন। গার্ডনার অস্বীকৃত হইলে তাঁহার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা দিয়া তাঁহাকে একটি কামানে বাঁধিয়া রাখা হইল। তথাপি তিনি স্বীকৃত হইলেন না; তখন অত্যাচারে তাঁহাকে বশীভূত করিবার জন্য তাঁহাকে একখানি খাটিয়ায় বাঁধিয়া রাখিবার ব্যবস্থা হইল। তিনি মধ্যে মধ্যে কেবল প্রহরীর সহিত একটু ভ্রমণ করিতে পাইতেন। একদিন প্রহরীর সহিত তাপ্তীতটে ভ্রমণকালে পলায়নোদ্দেশে তিনি এক অসম সাহসিক কার্য্য করিয়া বসিলেন। এক স্থানে নদীতীরে প্রস্তরস্তূপ—ত্রিশ কি পঁয়ত্রিশ হস্ত উচ্চ। তিনি 'বিসমিল্লা' বলিয়া তথা হইতে লম্ফ দিয়া নিম্নে পড়িলেন ও নদীগর্ভে গমন করিলেন। সে পথে

কেহই তাঁহার অনুসরণ করিতে সাহস করিল না। কিন্তু সংবাদ পাইয়া বহুলোক তথায় উপনীত হইল। গার্ডনার দেখিলেন, তাহারা ক্রমেই নিকটে আসিতেছে। তখন তিনি একস্থানে নাসিকা ও চক্ষু ব্যতীত সর্ব্বাঙ্গ জলমগ্ন রাখিয়া কোনরূপে তাহাদের দৃষ্টি অতিক্রম করিলেন। তাহারা প্রস্থান করিলে তিনি অপর পারে উপনীত হইলেন এবং অন্যপথে কোন পূর্ব্বপরিচিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির গৃহে উপনীত হইলেন। তথায় কিছুদিন গোপনে থাকিয়া তিনি ঘাসিয়াড়ার ছদ্মবেশে কোনরূপে বৃটিশ শিবিরে উপস্থিত হইলেন। বৃটিশ সেনাপতি লর্ডলেক ইতঃপূর্ব্বে হোলকারের দৌত্যকার্য্যব্যপদেশে গার্ডনারের ব্যবহারে প্রীত হইয়াছিলেন। তিনি তাহাকে ইংরাজের মিত্র জয়পুররাজের অশ্বারোহীদলের সেনাপতিত্ব করিতে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু গার্ডনার অল্পদিন পরেই বৃটিশ সেনাদলে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া Gardner's Horse নামক সেনাদল সংগঠিত করিয়া তাহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ এটা জিলায় খাসগঞ্জের সম্পত্তি পাইলেন। খাসগঞ্জ আগ্রা হইতে ৩০ মাইল দূরবর্ত্তী—আলিপড়ের সন্নিকটে অবস্থিত।

এদিকে ইংরাজও বেগমের পিতা কাম্বের নবাবের রোষ ভয়ে ভীত হইয়া হোলকার বেগমকে মুক্তি দিলেন। তিনি খাসগঞ্জে পতির নিকটে আসিলেন। এই খাসগঞ্জেই গার্ডনার পত্নীসহ মৃত্যু পর্য্যন্ত বাস করিয়াছিলেন।

ইহার পর তিনি দুইবার মাত্র যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। একবার নেপালরাজ্যের বিরুদ্ধে—আর একবার ব্রহ্মাভিযানে।

লর্ডময়রা গভর্ণর জেনারল হইয়া আসিয়া এদেশের অবস্থা বুঝিয়াই স্থির করিলেন, প্রকাশ্যভাবে না হইলেও অপ্রকাশ্যে ভারতে বৃটিশ গভর্মেণ্টকে প্রধান করাই একমাত্র উদ্দেশ্য করিতে হইবে।* লর্ডলেক ও লর্ডওয়েলেসলির চেষ্টায় যে অরাজকতা দমিত হইয়াছিল এখন আবার তাহা সপ্রকাশ করিতেছিল। মধ্যভারতে পৈশাচিক অত্যাচার রাজপুতানা সিন্ধিয়ার ও আমীর খাঁর অত্যাচারে জর্জ্জরিত, অযোধ্যার লোকের ধন প্রাণ শঙ্কাসঙ্কুল, রোহিলাখণ্ডের দোয়াতে দস্যু ভয়। তখন দেরাদুন অঞ্চল নেপালের অধীন। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে গার্ডনার স্বীয় আত্মীয় দিল্লীর সহকারী রেসিডেণ্ট এডওয়ার্ড গার্ডনারের সহিত এ অঞ্চলে শিকারে যাইতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে এডওয়ার্ডের যাত্রায়

* "Our object ought to be to make the British Government paramount, in reality if not declaredly"—Memorandum of February 6th, 1814.

ব্যাঘাত ঘটায় গার্ডনার একক যাত্রা করিলেও এপ্রিল মাসে দেরাছনে বিপদে পতিত হইলেন। তথায় গুর্খা সৈনিক কর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে চর সন্দেহ করিয়া তাঁহার প্রাণনাশের আয়োজন করেন। স্থানীয় শিখ মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের চেষ্টায় গার্ডনারের জীবন রক্ষা হয়। এই সময় গুর্খা সৈনিকগণ কার্য্যব্যপদেশে স্থানান্তরিত হইলে গার্ড়নার আসিয়া এডওয়ার্ডের নিকট কুমারুও অঞ্চল আক্রমণের প্রস্তাব করিলেন। দিল্লীর রেসিডেণ্ট এই প্রস্তাবে সম্মতি দান করিলে কার্পেট হার্সে পর্য্যবেক্ষণ জন্য প্রেরিত হইলেন। এ বৎসর নভেম্বর মাসে ইংরাজের সহিত নেপালরাজের যুদ্ধ বাধিল। প্রথমে কলুঙ্গার যুদ্ধে ইংরাজের পরাজয় হইল। নভেম্বর মাসেই এড ওয়ার্ড যুদ্ধযাত্রা করিলে গার্ডনার সেনাদলসহ তাঁহার সহানুগামী হইলেন। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে মার্লে পুর্ব্বদিক হইতেও অকটার ননী পশ্চিম দিক হইতে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু তাহাতেও বিশেষ ফলোদয় হইল না। হার্সে গুর্খা কর্ত্তৃক অতর্কিত ভাবে আক্রান্ত হইয়া বন্দী অবস্থায় আলমোয়ায় প্রেরিত হইলেন। ২৫ শে এপ্রিল তারিখে সৈন্যদলসহ গার্ডনার আলমোরো আক্রমণ করিয়া অধিকার করিলেন। রাত্রিকালে গুর্খাগণ নগর পুনরধিকার করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া বিফলপ্রযত্ন হইলে তিনি দুর্গ অধিকার করিলেন। সেই দিন সন্ধ্যায় তিনি গুর্খাদিগের সহিত সন্ধি সংস্থাপন করিতে প্রেরিত হইলেন। ফলে গুর্খারা হার্সেকে মুক্তিদান করিল ও প্রধান প্রধান দুর্গগুলি ও কুমাউনাঞ্চল ত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইল। তখন গার্ডনার আলমোরায় আস্তানা করিয়া গুর্খাসেনাপতি অমরসিংহকে স্থলচ্যুত করিলে তিনি ১০ই মে তারিখে অক্টারলোনীর নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন ও যমুনার পশ্চিমে সমস্ত গুর্খা অধিকার ত্যাগ করিলেন। অমরসিংহ স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলে নেপাল দরবার তাঁহার কৃত কার্য্যে বাধ্য হইতে অসম্মত হইলেন বটে, কিন্তু পরবৎসর মার্চ্চ মাসে ঐ সকল সর্ত্তেই ইংরাজের সহিত সন্ধি সংস্থাপিত করিতে, বাধ্য হইলেন।

১৮১৭ খৃষ্টাব্দে গার্ডনারের সেনাদল কোম্পানীর সেনাদল ভুক্ত হইয়া Second Bengal Cavalry নামে পরিচিত হইল। গার্ডনারই তাহাদিগের নায়ক রহিলেন। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মাভিযানে তিনি কর্ণেল উপাধি পাইয়া স্বীয় সেনাদল সহ গমন করেন ও সেনাধ্যক্ষ জেনারল মরিসনের প্রশংসাভাজন হয়েন।

ইহার পর তিনি একবার যোদ্ধৃবেশে রাজপুতনায় গিয়াছিলেন। জীবনের অবশিষ্টকাল স্বীয় খাসগঞ্জের সম্পত্তিতে অতিবাহিত করিয়া ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে

(২৯ শে জুলাই) তিনি প্রাণত্যাগ করেন। বেগমও কয় সপ্তাহ পরেই ইহলোক ত্যাগ করেন। বেগমের গর্ভে গার্ডনারের দুই পুত্র ও এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। ইহারা সকলেই ভারতবাসীর সহিত পরিণয়সূত্রে বদ্ধ হয়েন। জ্যেষ্ঠ পুত্র জেমস দিল্লীর আকবর শাহের কোন আত্মীয়াকে ও কনিষ্ঠ য়্যালেন লক্ষ্ণৌয়ের নবাববংশীয়া কোন মহিলাকে বিবাহ করেন। য়্যালেনের দুইকন্যা‌সুজান ও হারমুজী। হারমুজী ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় বারে গার্ডনারের ভ্রাতুষ্পুত্রকে বিবাহ করেন। তাঁহাদিগের পুত্র য়্যালেন হইত উত্তরাধিকার সূত্রে লর্ড গার্ডনার হন। তিনি ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সম্রাট-বংশীয় কোন খৃষ্টান মহিলাকে বিবাহ করেন। য়্যালেন কিছুদিন পুলিশবিভাগে কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তদীয় পুত্র য়্যালেন লেক লর্ড গার্ডনার হয়েন। কিন্তু তাঁহারা কেহই খাসগঞ্জত্যাগ করিয়া বিলাতে যাইয়া পার্লামেন্টে অধিকারপ্রাপ্তির কল্পনা করেন নাই। ইহাদিগের শিরায় কাম্বের নবাববংশের, লক্ষ্ণৌয়ের নবাববংশের, দিল্লীর সম্রাটবংশের ও বিলাতের অভিজাতবংশের শোণিত প্রবাহিত। এরূপ দৃষ্টান্ত আর দেখা যায় না।

স্মিথ ও লেডী ফ্যানী পার্কস উভয়েই গার্ডনারের ব্যবহারের ও সদাচারের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি দেখিতে সুপুরুষ ছিলেন। তাঁহার সুগঠিত-দেহ ও সৈনিকজনোচিত চালচলন লোককে মুগ্ধ করিত। তিনি বহুদেশীয় আচরণ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং স্বভাবতঃ বিনয়ী ছিলেন।

শ্রীদেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

নববর্ষ।

মহাকাল পারাবারে দূর দ্বীপ-বেলা সম সীমারেখা টানি;
আজি নববরষের বিশাল বাসর-বিভা চুম্বিল বনানী।
জলদ-অলক হ'তে কিরণের আলিপণা সোপান বাহিয়া
অমরাবতীর শিশু হাসির কুসুম গাঁথি' আসিছে নামিয়া।

গোলাপজামের বনে পাগল মধুপগণে তুলি' গুঞ্জরণ,
আম্র-পল্লবের ছায়ে বল্লরীর কিশলয়ে গড়িছে স্বপন।
অবাক্ শুবাক সারি দীঘির মুকুরজলে উঠিছে শিহরি;
চম্পক চামেলি বেলা শ্যামল গালিচা' পরে পড়ে ঝরি' ঝরি'।
সাজায়ে বাসন্তী ডালি এতদিন বন-রাণী ছিল চেয়ে পথ,
অতিথি এসেছে আজি কিশোর নূতন বর্ষ, হের স্বর্ণ-রথ।

মিলন-পুণ্যাহে আজি মধুফল-রসধারে অভিষেকি' তায়,
বসাও রাজার মত হৃদয়ের সিংহাসনে নব মহিমায়।
মাঙ্গলিক শঙ্খরবে সঞ্জীবন-মহোৎসবে উৎসাহে নূতন—
জ্বালি' সত্য-হোম-শিখা কর এ মাহেন্দ্রলগ্নে আত্মসমর্পণ।
জীবন-নিকষে তব পড়ুক সোণার রেখা বিরাট্ অক্ষয়;
বিসর্জ্জিয়া অবসাদ ভুলি তুচ্ছ প্রতিবাদ দৈন্য-পরাজয়।
বৈরীরে মার্জ্জনা করি' দেবতার পরসাদী ধরি' শির'পরে,
আজি এই সন্ধিক্ষণে অগ্রসর হও বন্ধু নির্ম্মল অন্তরে।
পুরাতন দিবসের স্মৃতির সমাধিতলে ঢালি' আঁখিজল
বিলাপে ও অনুতাপে আপনারে ক্ষুণ্ণ করি' নাহি কোন ফল।

যা' হবার হয়ে গেছে, অতীতের তোরণের দ্বার রুদ্ধ হোক—
নবীনের যবনিকা অন্তরালে আশীর্ব্বাণী—অভয় অশোক।
অনন্তের পুত্র মোরা আনন্দের মহার্ণবে ভাসাব তরণী—
হ'ব পূর্ণ হ'ব ধন্য আহরি' অমৃতপণ্য ভরিব ধরণী।
নব বর্ষে নব হর্ষে পূজি' সর্ব্বমঙ্গলার রাতুল চরণ,
লভিব অভীষ্ট বর, অন্তরের অন্তরঙ্গ ভাস্বর ভূষণ।
কত জন্ম ঘুরি ঘুরি এই মৃত্তিকার পুরী—বসুমতী-বুকে,
এসেছি চেতনা নিয়ে উতরিব কবে গিয়ে লক্ষ্য-অভিমুখে।
এই বিকাশের ক্ষেত্রে সাধনার তপোবনে হইব সুন্দর,
তারি লাগি যুগে যুগে নিরন্তর বয়ে আসে জন্ম জন্মান্তর।

কে জানে সৃষ্টির মর্ম্ম,—পুণ্য পাপ ধর্ম্মাধর্ম্ম রহস্যে মগন;
নিরুত্তর প্রশ্ন নিয়ে আত্মহারা দার্শনিক মুছিছে লোচন!

চাহিনা বুঝিতে কিছু, আলেয়ার পিছু পিছু কেন ছুটি মিছে ;
কোন্ বৃন্তে ফুটে আছি ? রসরাগ্ পরিমল্ কোথায় টুটিছে !
যায় কি তা চিহ্ন রাখি' উদ্‌ভ্রান্ত পরাণ-পাখী দুর্ব্বল পাখায় ?
অবসন্ন আশাহীন পশে এসে ধীরে ধীরে আপন কুলায়।
আসে দিন সম্বৎসর, হাসি-কান্না-মণিহার, একি ইন্দ্রজাল !
প্রিয়গণে কাছে পেলে ভালবাসা-আলিঙ্গনে বাঁধে ক্ষণকাল,
এস সথে বাহুপাশে আজি এ নবীন দিনে মিলিয়াছি তাই ;
পাইয়াছি যাহা আজি নিমেষের পরপারে পাছে তা হারাই।

গাও কবি গাও গান যে ক'দিন আছে প্রাণ ; গীতে মাতোয়ারা,
উৎকণ্ঠ চাতক সম, বরষিয়া চরাচরে হরষের ধারা।
বুঝিনা যখন কিছু ছোট বড় উচু নীচু সমস্যা বিষম,
আজি যাহা সত্য ভাবি আগামী পরশ্ব তাহা বুঝি মিথ্যা ভ্রম।
রিপুর কিঙ্কর হ'য়ে অভিমানি-চিত্ত ল'য়ে অবহেলি যারে
হেরি সে রজনী শেষে হাসে অরুণের বেশে গগন-কিনারে !
নব বর্ষে নব প্রাণে মন্ত্রদীক্ষা লও—হও বন্ধু আগুয়ান
হে প্রফুল্ল, হে বিস্মিত, আজি ধৌত করি চিত্ত পরিমুক্ত হও।

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

উনবিংশ শতাব্দীর প্রধান আবিষ্কার

শক্তির ধ্বংশ না হইলে যে "অপচয়" হয় না তাহা সাহস করিয়া বলা যায় না কারণ আমাদের বুদ্ধির দোষেই হউক অথবা দ্রব্যের বিশেষত্ব বশতঃই হউক শক্তির যে ক্রিয়া হয় তাহার সমগ্রটী আমরা কাজে লাগাইতে পারি না। রাসায়নিক শক্তির দ্বারায় কয়লায় জল গরম করে বটে, কিন্তু আমরা দেখি যে কয়লার সমস্ত উত্তাপ কাজে লাগাইতে পারিনা ; বাতাসে কতক মিশিয়া যায় ; আবার বাতাসে ঢেউ উৎপন্ন হওয়াতে—শব্দ শোনা যায়, কিন্তু সেই ঢেউএর শক্তি ক্রমশঃ শূন্যে মিলাইয়া যায়। আমরা কপিকলের সাহায্যে অনেক কাজ করিতে পারি বটে কিন্তু কপিকলের ধুরার friction (ঘর্ষণ) দড়ির [শক্ত ভাব] Rigdity এসকল অতিক্রম করিতে কিছু শক্তি ব্যয় হইয়া যায়। এইরূপ শক্তির অপচয় হয় বলিয়া বৈজ্ঞানিক হিসাবে শক্তিসমষ্টির যে ধ্বংশ হয় না তাহা বাস্তব জগতে অনেক সময় বুঝিতে পারিনা। যতখানি ও যেরূপভাবে শক্তির অপচয় ঘটে, তাহা যদি বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের মধ্যে আনিতে পারি তবে এই আবিষ্কারকে ধ্রুব সত্য বলিয়া ধরিয়া লইব। ইহা যে কতকটা সত্য তাহা সহজেই ধারণা হয়।

আবার সব রকম শক্তিই যে আমরা ধারণা করিয়া লইতে পারি তাহাও নয়। শক্তি সাধারণতঃ দুই প্রকার—নিহিত ও চলিত (Potential); নিহিতশক্তির বিষয় কাজ না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা জানিতে পারিনা ; টেবিলের উপর যে দ্রব্য থাকে তাহা টেবিল সরাইয়া লইলে যে পরিয়া যাইবে তাহা বুঝিতে পারি কিন্তু দ্রব্যের আপনা আপনি নড়িয়া বেড়ান অথবা স্থান পরিবর্ত্তন করার ক্ষমতা (Inertia) কোন দিন দেখা যায় নাই, কাজেই বলিতে হইবে যে, যখন দ্রব্যটী টেবিলের উপর ছিল, তখন তাহাতে কিছু শক্তি নিহিত ছিল। (যাহার বলে সে টেবিল সরাইলেই পড়িয়া যাইবে) রাসায়নিক শক্তি প্রায়ই নিহিত থাকে ; দস্তা এবং মহাদ্রাবক সংযুক্ত না হইলে আমরা কিছু জানিতে পারিনা। আবার চলিত শক্তির আকৃতি অনেকেই দেখিয়াছেন । দুই ট্রেনে ধাক্কা লাগিয়া যে তুমুলকাণ্ড হয়, গুলি লাগিয়া যে জীব-জন্তু মারা যায় ইহা দেখিয়া চলিত শক্তি সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহের কারণ নাই বোধ হয় । বস্তুতঃ শক্তি নিহিতই থাকে ; মনুষ্য দ্বারা অথবা অন্য কোন উপায়ে তাহা চলিত রূপে পরিণত করা যায় । দ্রব্যের গুণই এই যে দ্রব্যের নিহিত

শক্তি অত্যল্প ভাবেই বস্তুতে বিরাজ করে। (The Potential energy always tries to be a minimum) এই তথ্যটীর বিশদ ব্যাখ্যা করা কঠিন। মনে করুন একটা বল হাতে করিয়া উৰ্দ্ধে নিক্ষেপ করা হইয়াছে; আমরা দেখি ক্রমশঃ তাহা উপরে উঠিয়া থামিয়া যায় এবং পুনরায় নামিয়া পড়ে; যখন বলটী হাতের উপর আছে তখন তাহাতে মাধ্যাকর্ষণবশতঃ কিছু শক্তি নিহিত আছে; সে শক্তি যে কতখানি তাহা আমরা হাতে ধরিয়া বুঝিতে পারিনা, কারণ আমরা সবসময় মাধ্যাকর্ষণের বশীভূত হইয়া আছি। যখন বলকে উর্দ্ধে নিক্ষেপ করিলাম তখন তাহাতে কিছু চলিত শক্তি প্রয়োগ করিলাম; তাহার বলে সে তাহার উর্দ্ধে উঠিল কিন্তু মাধ্যাকর্ষণের জন্যই নিহিতশক্তি ক্রমশঃ বেশী হইতেছে এবং চলিতশক্তি ক্রমশঃই কমিতেছে। ক্রমে চলিতশক্তি ফুরাইয়া গিয়া সমস্ত শক্তিই নিহিত হইবে; কিন্তু শক্তি নিহিত যত কম থাকিতে পারে তাহারই চেষ্টা করে বলিয়াই বলটী ক্রমশঃ নামিতে থাকে; তাহাতেই নিহিতশক্তি কমে ও চলিতশক্তি বাড়ে এবং দেখা যায় যে দ্রব্যটী যেখান হইতে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল তাহা অতিক্রম করিয়া আরও নিম্নে মাটীতে পড়ে। কেবল যে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সম্বন্ধে নিহিতশক্তি কম হওয়ার কথা খাটে তাহা নয়; গণিতশাস্ত্রের দ্বারা দেখা যায় যে, আলোক রশ্মি একটা স্বচ্ছ পদার্থ ভেদ করিয়া যদি অপর আর একটী স্বচ্ছ পদার্থের মধ্যে যায় তবে তাহার পথ বাঁকিয়া যায়— ইহাও এই নিয়ম হইতে প্রমাণিত করা যাইতে পারে। অন্যান্য শক্তি সম্বন্ধেও ঐ কথা খাটে। এই নিয়ম জানাতে যে আমাদের জ্ঞানের কোন বিশেষ উন্নতি হইল তাহা নয় বটে, তবে কোন পদার্থ অথবা শক্তি যে কি ভাবে কার্য্য করিবে তাহা আমরা পূর্ব্ব হইতেই জানিতে পারি এবং কখন যে কি অবস্থা হইবে তাহাও কতকটা অনুমান করিয়া লইতে পারি। এটা অবশ্য কম সুবিধার কথা নয় এবং অনেক সময় ইহা অত্যন্ত আবশ্যকীয় বোধ হয়। নিহিতশক্তি সম্বন্ধে একটা বিশেষ গুণের কথা উল্লেখ করা হইল। আবার চলিতশক্তি সম্বন্ধেও বলা যায় যে সে শক্তি যদি কোন প্রকার বাধা না পায় তবে সোজা পথে সমভাবে জিনিষকে চালাইবে। অনন্তকাল পর্য্যন্ত যে শক্তির কোন ধ্বংশ হইবে না (Newton's first law of motion) কিন্তু বাস্তব জগতে অনেক বাধা বিঘ্ন আছে বলিয়াই আমরা একথার সত্যতা সর্ব্বদা অনুভব করিতে পারি না।

জীব জন্তুদের ও উদ্ভিদের মধ্যে কিরূপে শক্তি-বিনিময় হয় তাহা এক অপূর্ব্ব ব্যাপার। জীব-জন্তু, ঘাস-পাতা, শাক-সবজী, প্রভৃতি ভক্ষণ করে। সকল দ্রব্যের রাসায়নিকশক্তি জীবজন্তুর জীবনীশক্তিতে পরিণত হয়। আবার জীব জন্তুদের নিশ্বাস, প্রশ্বাস, মল, মূত্র, প্রভৃতিতে যে সব পদার্থ বাহির হইয়া যায়—তাহাদের রাসায়নিক শক্তি শাকসবজীর, পাতা-লতার শিকড় প্রভৃতিতে রস সঞ্চয় করিবার ও পরিপুষ্ট করিবার শক্তিরূপে লাগিয়া থাকে। একটী অন্যের পরিপোষক। এইরূপে অনেক বিষয়ই দেখা যায় যে নিহিতশক্তির পরিবর্ত্তন হইতেছে, এবং প্রত্যেকে পরস্পরের সাহায্য সাপেক্ষ।

শক্তি-সমষ্টির এই সমস্ত গুণ থাকাতে কেন যে ইহার অক্ষুণ্ণতার অবস্থাকে প্রধান আবিষ্কার বলা হইল তাহা অল্পে বুঝান কঠিন। তবে এই তথ্য কার্য্যে পরিণত করিয়া আমরা কত সহজ নিয়মাবলীর আবিষ্কার করিতে পারিয়াছি, তাহা উল্লেখযোগ্য। বহুদিন পূর্ব্বে বৈজ্ঞানিকদের মনে এইরূপ ধারণা ছিল যে, যদি কখন এরূপ যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়, যাহাতে অনন্ত গতি (Perpetual motion) থাকিবে, তাহা হইলে পৃথিবীর যাবতীয় কলকৌশলের তথ্য লাভ করা যাইবে; এবং কয়লা পোড়ান, বৈদ্যুতিক শক্তির চালনা করা, Petrol পুড়াইয়া শক্তির অবতারণা প্রভৃতির কোন প্রয়োজন হইবে না এবং নানারূপ সহজ উপায়ে শুধু বসিয়া থাকিয়াই সমস্ত জিনিষ সরবরাহ করিতে পারিব। কিন্তু আমরা এখন জানিতে পারিয়াছি যে বাস্তব জগতে যখন দ্রব্যগুণের জন্য শক্তির অপচয় ঘটে এবং প্রত্যেক জিনিষের মধ্যে যখন একটা নিহিতশক্তির সীমা আছে,—তখন কোন জিনিষ অনন্তকাল পর্য্যন্ত চলিতে পারে না এবং তজ্জন্য কোন একটা যন্ত্র প্রস্তুত করিতে যাওয়া পণ্ডশ্রম মাত্র। বাস্তবিক, এরূপ একটী যন্ত্র আবিষ্কার করা বা কোন নূতন পদার্থ অথবা কোন নূতন গ্রহের সৃষ্টি করা একই কথা। একমণ কয়লা পুড়াইয়া কতখানি জল গরম করিয়া বাষ্পে পরিণত করিতে পারা যায়—তাহা আমরা নির্দ্ধারণ করিয়া লইতে পারি। আবার কয়লার উত্তাপে বাষ্পের সম্প্রসারণ শক্তি (যান্ত্রিক) কতখানি হইবে ও তাহাতে রেলগাড়ী কিরূপ গতিতে চলিবে তাহা আমরা অঙ্কশাস্ত্রের দ্বারা স্থির করিয়া লইতে পারি। পথের বাধা বিপত্তি (বাতাসের ও রেলের ঘর্ষণ প্রভৃতি) বাদ দিয়া যাহা স্থির করিয়া থাকি কার্য্যক্ষেত্রে তাহা পাওয়া যায় না এবং সেরূপ গতি পাইতেও পারিনা, কাজেই কয়লার উত্তাপ দান করিবার শক্তি গাড়ী চালাইবার জন্য বাষ্পের শক্তি, এবং গাড়ীর চলিবার শক্তি, এই কয়টীর মধ্যে একটা সম্বন্ধ নির্ণীত হইলে রেলগাড়ীর

পরিচালনা সম্বন্ধে বিস্তর উন্নতি সাধিত হইতে পারে। Electric motorই বলুন Priniting machineই বলুন Airoplane জাহাজ কলেরগাড়ী প্রভৃতি যে কোন যন্ত্রের কথাই বলুন না কেন সর্ব্ববিষয়েই দেখিতে পাওয়া যায় যে, শক্তি-সমষ্টির সম্বন্ধে যে সব কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহারই দ্বারা যন্ত্রের উৎকর্ষ Efficiency স্থিরীকৃত হয়। উৎকর্ষ এখানে Efficiency এই technical কথার পরিবর্ত্তে বসাইয়াছি। ইংরাজী অঙ্কশাস্ত্রে দেখা যায় যে, কোন যন্ত্রের যতখানি কাজ বাস্তবিক পাওয়া যায় এবং কতখানি কাজ যন্ত্রের শক্তির পরিচয় হইতে পাইতে পারি তাহারই অনুপাতকে efficiency বলে। অনেকেই হয়ত চেষ্টা করিবেন কিরূপে কম কয়লা পোড়া হইয়া বেশী কাজ সাধিত হইতে পারে অথবা কয়লার মধ্যে এমন কোন জিনিস ফেলিয়া দিয়া তাহার উত্তাপ বেশী করিতে পারি যাহা কয়লা পুড়িয়া গেলেও কোনরূপে পরিবর্ত্তিত হইবে না। কিন্তু আমরা জানিতে পারি যে তাহাতে efficiency বৃদ্ধি হয় মাত্র কিন্তু তাহা অসম্ভব; কারণ যন্ত্রে আমরা শক্তির অপচয় dissipation কমাইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে পারি, কিন্তু শক্তির বৃদ্ধি কিম্বা যতখানি শক্তি নিহিত আছে তাহার বেশী পাইতে পারি না। এই শক্তির গুণাবলির আবিষ্কার প্রধান, এই জন্য যে ইহা আমাদের প্রত্যেক যন্ত্রাদির মধ্যে, প্রত্যেক ক্রিয়ার মধ্যে এমন একটা নিয়ম দেখাইয়া দেয়, যাহাতে যন্ত্রের উৎকর্ষ অথবা কার্য্যসিদ্ধির সরল উপায় সহজে দেখিয়া লইতে পারি এবং যে সব অভিনব ও অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্কার হইয়াছে তাহাদের সকলের মূলে এই তত্ত্বটী ভিত্তিরূপে আছে তাহা বুঝিতে পারি।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, যে ছয় রকম শক্তির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা রসদ পায় কোথা হইতে এবং এক শক্তি কি ভাবে অন্য শক্তিতে পরিণত হইতে পারে ও এই কয়রূপ শক্তির মধ্যে কোন মূলগত সম্বন্ধ নির্ণয় করা যায় কি না? প্রশ্ন বড় জটিল এবং ইহার উত্তরের উপর শক্তিতত্ত্বের অনেকটা নির্ভর করে। শক্তি যে কোথা হইতে আইসে তাহা কেহ জানে না। মহাদ্রাবক (Sulphuric acid) চিনিকে অঙ্গারে পরিণত করে কেন? লৌহ দস্তা প্রভৃতিকে হজম করিয়া ফেলে কেন? আবার স্বর্ণের উপর তাহার তত আধিপত্য নাই কেন? এ সব কেন'র উত্তর নাই। বৈজ্ঞানিকেরা বলিয়া থাকেন এ সব দ্রব্যগুণ। রাসায়নিকশাস্ত্র অনুসারে দেখিতে গেলে ইহা বিভিন্ন পরমাণুদের মধ্যে একটা সম্প্রীতি ও মেশামিশি করিবার ভাব।

প্রত্যেক পরমাণু অন্য কোন দ্রব্যের পরমাণুকে আকর্ষণ করিতেছে, তাহা ধরিয়া লইতে কোন বাধা নাই; তবে রাসায়নিকপ্রক্রিয়ার মধ্যে পরমাণুদের বাছাবাছি করিয়া মিশ্ খাওয়ার কোন কারণ আছে তাহা কেহ বলিতে পারে না। যাহা হউক, বৈজ্ঞানিকেরা সেই জন্য কতকগুলি নিহিতশক্তি ও দ্রব্যগুণ (Properties of matter) ধরিয়া লইয়া থাকে। দ্রব্যাদির নিহিত শক্তির পরিবর্ত্তন করার জন্য কোন একটী উত্তেজক শক্তির আবশ্যক। পৃথিবী সূর্য্যের নিকট হইতে সেই শক্তি পাইয়া থাকে। সূর্য্য যেন পৃথিবীকে প্রস্তুত করিতেছে, তাহার রশ্মিতে আমরা আলোক ও উত্তাপ পাই। উহাই সেই বাতাসের Carbon ও Oxygen বিভিন্ন করিয়া দেয়। Carbon উদ্ভিদজীবনের প্রধান খাদ্য ও Oxygen প্রাণীজীবনের অবশ্য প্রয়োজনীয়। আবার জীব জন্তুরা উদ্ভিদের নিকট Carbon পাইতেছে, এবং কিছু Carbon বাহির করিয়াও দিতেছে। সূর্য্যের আলোকে গাছের সবুজ পদার্থ গুলির (Chlorophyl) সেই Carbon লইবার এক আশ্চর্য্য ক্ষমতা দৃষ্ট হয়। সূর্য্যের জন্য আমরা বিভিন্ন ঋতু পাইয়া থাকি। সূর্য্যের রশ্মির উত্তাপ কিরূপে অন্য-বিধ শক্তিতে কার্য্য করে তাহা অতীব রহস্যময়। জলকে বাষ্পে পরিণত করিয়া মেঘের সৃষ্টি করে, তাহাতে প্রান্তর ও জনপদসহ রসসিক্ত হইয়া যায়। এইরূপে মেঘ পর্ব্বতের ঝরণা মৃদু প্রবাহিনী কল্লোলিনী মনোহর হ্রদ প্রভৃতির সৃজন করিয়া দেশকে সুজলা সুফলা করে। এই রশ্মির উত্তাপ বৃক্ষাদির রসশোষণ কার্য্য এবং জীব জন্তুদের রক্তপ্রবাহ ও চলৎশক্তি নিয়মিত করে। বাতাস ও আলোক দ্বারা নূতন এক প্রকার চিকিৎসা-প্রণালী আবিষ্কারের কথা অনেকেই হয় ত শুনিয়াছেন। এই সূর্য্যের উত্তাপ কত যুগ যুগান্তর হইতে বিনষ্ট দ্রব্যাদিকে কয়লায় পরিণত করিতেছে, ভূ-অবস্থিত কত দ্রব্যকে কতরূপ আকৃতি দিতেছে! কাজেই বলিতে পারা যায়, সূর্য্য আমাদের এই শক্তি সমষ্টির পিতা; সূর্য্যের রশ্মি যে আলোক বিতরণ করে, তাহার $\frac{১}{২৩০০০০০০০০}$ খুব অল্পভাগই এই পৃথিবীতে আইসে; এত অংশ বাদে সমস্তই শূন্যে মিশাইয়া যায় এবং কিছু অন্যান্য জগৎকে শক্তি দেয়। সূর্য্যের অধিকাংশ শক্তিরই অপচয় ঘটে। শূন্যে যে উত্তাপ মিশাইয়া যায়, তাহাদ্বারা আমরা আর কোন কাজ করিয়া লইতে পারি না। একটা উঁচু টব হইতে জল নামিতে থাকা পর্য্যন্ত আমরা সেই শক্তি দ্বারা কিছু কাজ করাইয়া লইতে

পারি, কিন্তু সমস্ত জল একবার নামিয়া আসিয়া মাটিতে পুষ্করিণী হইয়া দাঁড়াইলে তদ্বারা আমরা সেরূপ শক্তি পাইনা। আশা করা যায় সূর্য্যের শক্তির অপচয় হইতে কোন না কোন কালে সকল বস্তুরই সমতাপ অবস্থা আসিবে। সেরূপ দিন কবে আসিবে তাহাও বৈজ্ঞানিকেরা শক্তির এ অপচয় তথ্য হইতে স্থির করিতে ছাড়েন নাই এবং পৃথিবীর বয়সই বা কত হইল তাহাও অনেকটা স্থিরীকৃত হইয়াছে। কাজেই সূর্য্য হইতে আমাদের এখানে সর্ব্ববিধ শক্তির আমদানী হয় তাহা সহজে ধরিয়া লইতে পারি। সূর্য্য কিরূপে শক্তি পাইয়া থাকে ও আলোক কিরূপে রশ্মিরূপে বাহির হয় তাহা অন্য গবেষণার বিষয়। এই শক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে ভিন্ন প্রবন্ধে আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীকালিদাস বাগচী।

মণিহারা।

চুড়ী চাই, চুড়ী চাই—হাঁকে মণিহারী,
বউমা দিলেন সাড়া, ছুটিল ঝিয়ারি।
খুকু বলে, আমি কিন্তু নেব চুড়ী রাঙা—
পড়িলে, টনকো এত, পড়েনাক ভাঙা!
গৃহিণী বলেন দেখি, এ নূতন ঢঙ,
শাঁখা রুলি গেল, কাচ-চুড়ী নানা রঙ!
পরগো হয়েছে সাধ, কিন্তু সাবধান,
তদণ্ডে ভাঙ্গিয়া মাগো যেন অকল্যাণ
কোর না বাছার, আমরা সেকেলে লোক,
নোয়া শাঁখা সিঁদূরেই ভ'রে যায় চোক;
চরণে আলতা-পাতা, রাঙা শাড়ীখানি
অন্নপূর্ণা জননীরে মনে দেয় আনি,
তাই হলে, হাতে নোয়া, মাথায় সিঁদূর—
মহালক্ষ্মী সনে বাঁধি গণেশ ঠাকুর।

চুড়ী ত হইল কেনা, কিন্তু ঝক্‌মারি,
খুকু পড়ে' ভাঙ্গে সব, রক্তে মাখা শাড়ী ;
রাখিতে চুড়ীর মান অতি সাবধানী
নোড়ায় পেছঁচেন বধূ আঙুল দুখানি!
কাচ-মায়া রাণী মোর ছাড়াইতে নারি
বঁটিতে কাটিল হাত, বাঁচে তরকারী ;
মুখে তুলে দিতে হয় হায়! ভাত জল—
বুড়া হাড়ে কত সয়, হয়েছি অচল!
ইস্কুলের তাড়া পড়ে, আপীসের বেলা,
ঘরকন্না করা মাগো, নয় ছেলেখেলা!
কাক-কোকিলের ঘরে হয়নি ক সাড়া,
সেই উঠে সারাদিন খেটে খেটে সারা ;
তবু কাজে থাকি, সাঁজে আসিলে আবার
দেখিব কেমন তিনি, চুড়ী বেচা তাঁর!

"চুড়ী চাই, চুড়ী চাই", উৎসাহে হাঁকিয়া
অই আসে উৎপাত, দেখিছে ঝাঁকিয়া।
আজিকে ছুটির দিন 'বাবু' আছে বাড়ী,
এই বেলা ঝাঁকা নিয়ে পালা তাড়াতাড়ি।
শুনিবে না ওরে তোর জাপানী দোহাই,
ইরাণী জর্ম্মানি কিছু মানে না গোঁসাই!
গোলাপি আসমানি রাঙা হবে চুরমার—
সে দুর্ব্বাসা সাড়া যদি পায় একবার!
দেখিতে নারিব আমি কাঙালের হানি,
কষ্টে রাখা কড়িগুলি দিতে হবে আনি!
তাই বলি, ভাল মোর এ দেশের শাঁখা,
স্বদেশী গড়ে যে নোয়া, রুলি রংএ আঁকা ;
তাই হ'লে ভরে হাত, দুঃখ হয় দূর,
মহালক্ষ্মী সনে বাঁধি গণেশ ঠাকুর!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

আচার্য্য গৌরীশঙ্কর।

যে মহাত্মার প্রতিভার দীপ্তি ভাস্বর ভাস্করের ন্যায় পুণ্যভূমি ভারতভূমিকে আলোকিত করিয়া সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া সুদূর ইউরোপখণ্ডেও প্রতিফলিত হইয়াছিল, গণিতশাস্ত্রে যাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য, অসামান্য ধী প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে সর্ব্বজন কর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়াছিল, সেই প্রতিভাবান, ধীমান, সাধু-প্রকৃতি গৌরীশঙ্কর ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া পুণ্যলোকে সর্ব্ব মঙ্গলময় বিধাতার চরণোপান্তে অনাবিল অক্ষয় শান্তিনিকেতনে প্রস্থান করিয়াছেন।

গৌরীশঙ্করের মৃত্যুতে গৌড়ের, ভারতের বিদ্বৎসমাজ ব্যথিত, মুগ্ধ, শোকাতুর। হইবারই কথা। আজ যাঁহারা প্রতিষ্ঠার আসনে প্রতিষ্ঠিত, প্রতিভাবান বলিয়া সর্ব্বত্র পূজিত, তাঁহারা প্রায় সকলেই গৌরীশঙ্করের শিষ্য। গৌরীশঙ্করের ন্যায় গুরু সর্ব্বত্র সুলভ নহে। লীলাবতী, শুভঙ্করের পদরেণুপূত পুণ্যভূমিতে গৌরীশঙ্করের ন্যায় মনীষির অভ্যুত্থান অভাবনীয় নহে, বিস্ময়ের বিষয় নহে। অনাড়ম্বর, অনাসক্ত, অক্লান্তকর্ম্মা গৌরীশঙ্কর অগাধ বিদ্যা অর্জ্জন করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা সঞ্চয়ের জন্য নহে; অর্জ্জিত সমস্ত পাণ্ডিত্য অক্ষুণ্ণভাবে নিঃশেষে বিতরণ করিয়া তিনি তাহার শিষ্যমণ্ডলীকে ধন্য করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই দানশৌণ্ডতার প্রভাব বহু দিন এদেশে বিদ্যমান থাকিবে। তাঁহার চরণচিহ্ন অনুসরণ করিয়া তাঁহারা গুরুর গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার প্রয়াস পাইবেন, এ বিশ্বাস, এ আশা আমাদের আছে।

গৌরীশঙ্কর বাবু ১৮৪৫ খৃঃ ১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখে কলিকাতায় ভূমিষ্ঠ হন। তখন তাঁহাদের আর্থিক অবস্থা মন্দ ছিল না। তাঁহার পিতামহ সে কালের একজন বেশ লেখাপড়া জানা লোক ছিলেন। পার্শী ভাষায় তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি সিলেটের জজ আদালতের দেওয়ানী করিতেন। সেই জন্য গৌরীশঙ্কর বাবুর কলিকাতার বাড়ী আজও অনেকের নিকট দেওয়ান-বাড়ী বলিয়া পরিচিত।

কলিকাতার বেনিয়াটোলার মথুর বিশ্বাসের পাঠশালায় গৌরীশঙ্কর বাবুর প্রথম বিদ্যাশিক্ষা হয়। তিনি সেই পাঠশালায় পড়িতেন এবং তাঁহার পিতামহ পার্শীভাষা ভালবাসিতেন বলিয়া বাড়ীতে মুন্সির কাছে পার্শীভাষা শিখিতেন। তাহার পরে ফ্রী-চার্চ্চে ভর্ত্তি হন। সেখানে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া তিনি হিন্দু স্কুলে প্রবিষ্ট হন। হিন্দুস্কুল হইতে ১৮৬১ অব্দের প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন।

গৌরীশঙ্কর বাবুর পিতামহের জীবদ্দশায় গৌরীশঙ্কর বাবুদের অবস্থা বেশ ভাল ছিল, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পরে গৌরীশঙ্কর বাবুর পিতা মধুসূদন দে ব্যবসায়ে যথেষ্ট হউক লোকসান করিয়া ঋণগ্রস্থ হইয়া পড়েন। প্রেসিডেন্সি কলেজে এফ, এ, পড়িবার সময়ে গৌরীশঙ্করের পিতার মৃত্যু হয়। মধুসূদন বাবুর চারি পুত্র; হরশঙ্কর, গৌরীশঙ্কর, দেবশঙ্কর ও ভবানীশঙ্কর। ইহাদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ হরশঙ্কর বাবু এখনও জীবিত আছেন। ইনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্কুলে গণিতের শিক্ষক ছিলেন। দেবশঙ্কর বাবুও গণিতে এম এ পাশ করিয়া রিপন কলেজের অধ্যক্ষতা করিয়াছিলেন। তিনি বেশী দিন জীবিত ছিলেন না।

গৌরীশঙ্কর বাবু এফ,এ, পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। ১৮৬৬ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি বি, এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৮৬৭ সালে এম, এ, গণিতের অনার্সে তিনি সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া সুবর্ণ পদক প্রাপ্ত হন। এম, এ, পরীক্ষার ফল বাহির হইবার পূর্ব্বেই তিনি জেনারেল এসেম্‌বিলি ইনষ্টিটিউসনের গণিতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। অধ্যাপনা করিতে করিতে তিনি বি, এল, পাশ করেন, কিন্তু তিনি কোন দিন ওকালতী করেন নাই। ইহার পরবৎসরে তিনি রায়চাদ প্রেমচাঁদ বৃত্তি প্রাপ্ত হন। সে সময়ের সাধারণ শিক্ষার নিয়ন্তা (Director of Public Instruction) স্যার এলফ্রেড ক্রফট্ গৌরীশঙ্কর বাবুকে গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা-বিভাগে উচ্চবেতনের চাকুরী গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করেন; কিন্তু গৌরীশঙ্কর বাবু অর্থের লোভে একস্থানের কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আর একস্থানে কর্ম্ম গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। গৌরীশঙ্কর বাবু ১৮৮১ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের পরীক্ষক নিযুক্ত হন ও ইহার তিনবৎসর পরেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্ব্বাচিত হন। কলিকাতার গণিত-সভার স্থাপনকাল হইতে তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি বরাবর এই সভার সহকারী সভাপতি ছিলেন।

তিনি প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীকাল যথেষ্ট দক্ষতার সহিত অধ্যাপনা করিয়া গিয়াছেন; অধ্যাপকদিগের মধ্যে এত দীর্ঘকাল অশেষ সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করিবার দৃষ্টান্ত বঙ্গদেশে বিরল! গণিতশাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল। বঙ্গদেশের শিক্ষা-বিভাগে তাঁহার মত গণিতজ্ঞ আর কেহই ছিলেন না, এজন্য কয়েক বৎসর ধরিয়া কেবল জেনারেল এসেম্‌বিলি কলেজেই এম, এ, গণিতের শুদ্ধ (pure) গণিত বিভাগের ক্লাস ছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজেও এম, এ র, শুদ্ধ গণিত পড়াইবার কেহ অধ্যাপক ছিলেন না।

পাঠ্যাবস্থায় পিতৃঋণ মস্তকে লইয়া তিনি লেখাপড়া করিয়াছিলেন, তাই তিনি দুঃখী ছাত্রদিগের অবস্থা বুঝিতেন। তিনি প্রতিবৎসর অন্ততঃ পঁচিশ ত্রিশ জন ছাত্রের পরীক্ষার টাকা নিজে জমা দিয়া সাহায্য করিতেন। তাঁহার প্রণীত অঙ্কের বইগুলির একচতুর্থাংশ ছাত্রদিগের মধ্যে বিতরিত হইত। তাঁহার কলেজের অধ্যক্ষকে বলিয়া তিনি অনেক ছাত্রকে বিনাবেতনে কলেজে পাঠের বন্দোবস্ত করিয়া দিতেন; কিন্তু এক এক বৎসর বিনাবেতন-প্রার্থী ছাত্রের সংখ্যা এত বেশী হইয়া উঠিত যে তিনি সকলের কথা অধ্যক্ষকে বলিতে পারিতেন না; তাহাদের বেতন তিনি নিজেই দিতেন অনেক সময় সাহায্যপ্রাপ্ত ছাত্রেরা সে সাহায্যের কথা জানিতেও পারিত না।

বেশভূষার দিকে দৃষ্টি কোনো কালেই তাঁহার ছিল না। তিনি সামান্য একখানি চাদর লইয়াই পথে বাহির হইতেন বা যে কোন স্থানে যাইতে সঙ্কোচ বোধ করিতেন না। তিনি ধর্ম্মরাজ্যের নীরব সাধক ছিলেন। তিনি প্রত্যহ গীতা পাঠ করিতেন এবং গীতার শিক্ষাগুলি জীবনে সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে বরাবরই সচেষ্ট ছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের নিকট তাঁহাদের একটি ধর্ম্মসমিতি ছিল। গৌরীবাবু প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে সেই সমিতিতে যাইতেন। মুষলধারে বৃষ্টি পড়িয়া রাস্তায় জল দাঁড়াইয়া থাকিলেও তিনি ঠিক সময়ে তাঁহা-দের ধর্ম্মসমিতিতে উপস্থিত হইতেন, একটি দিনও তাহার ব্যতিক্রম হইত না। অর্দ্ধ শতাব্দীব্যাপি কর্ম্মজীবনে কেবল দুই সপ্তাহকাল তিনি কলেজ হইতে অনুপস্থিত ছিলেন।

গৌরীশঙ্কর বাবু আপনাকে কর্ম্মের ভিতর সর্ব্বদাই ব্যাপৃত রাখিতেন। শিক্ষাদান করা তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল; ইচ্ছা করিয়া কলেজে প্রত্যহ অতিরিক্ত খাটিতেন। প্রত্যহ ঠিক নিয়মিতরূপে পরিশ্রম করিতেন বলিয়া তাঁহার স্বাস্থ্য একদিনের জন্যও ভাঙ্গিয়া যায় নাই, জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্তও তিনি কার্য্যক্ষম ছিলেন। আমরা যখন বি, এ পড়ি তখন তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহ হয়। তখন আমরা তাঁহার অনার্স ক্লাসের ছাত্র। বিবাহের দিন ও তিনি অনুপস্থিত হন নাই, আপনার অভ্যাস অনুযায়ী সাড়ে চারিটা অবধি ক্লাস করিয়া-ছিলেন। সে সময়ের একটী কথা এখনও মনে পড়ে। সেই বিবাহের পূর্ব্বদিনে গৌরীবাবু আমাদিগকে কতকগুলি অঙ্ক বাড়ী হইতে কষিয়া আনিতে দিতে-ছিলেন। আমরা তাঁহার কন্যার বিবাহের সংবাদ পূর্ব্ব হইতেই জানিতাম। আমাদের মধ্যে জিতেন বসু নামে একটি ছাত্র ছিল। সে বলিল, "কাল ত অঙ্ক-

গুলি করিয়া আনিতে হইবে না, কাল ত আমাদের অঙ্ক-ক্লাসে ছুটী হবে। তাহার পর অনুচ্চ স্বরে বলিয়াছিল "আপনার বাড়ীতে গিয়া সন্ধ্যা বেলা দেখাব না কি?" সে কথা গৌরীবাবুর কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল। তিনি তাহার জবাবে বলিলেন "Well, I may come to college." তাহার পরে পড়ান শেষ হইয়া গেলে তিনি ছাত্রদিগের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া যথেষ্ট বিনয় সহকারে বলিলেন "আমার কন্যার বিবাহে আমার ইচ্ছা যে তোমাদের নিমন্ত্রণ করি, কিন্তু আমি ত তোমাদের সকলের বাড়ি জানি না। তোমাদের এখানে বলিলে হবে কি?" আমরা একবাক্যে তখনই স্বীকৃত হইয়া মহা আনন্দে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম।

পরলোকগত আচার্য্য গৌরীশঙ্করের কথা মনে হইলে কত কথা মনে হয়। যদি কখন সুবিধা হয় তাহা হইলে তাঁহার জীবনকাহিনী বলিবার চেষ্টা করিব। তিনি সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিয়াছেন; আমরা মায়াবদ্ধ জীব, তাঁহার শোকে অধীর হইয়া ক্রন্দন করিতেছি।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কুণ্ডু।

প্রতিবাদ।

বর্ত্তমান বৈশাখ মাসের "মানসী"তে শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "সম্পাদকের কর্ত্তব্য" নামক প্রবন্ধে মৎপ্রণীত "সীতা" পুস্তকের রচনা ও প্রকাশ সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়াছেন ও ইঙ্গিত করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য আছে।

এই প্রসঙ্গে বাধ্য হইয়া নিজের সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিতে হইতেছে। পাটনা কলেজে যখন পড়ি, তখন হইতেই পাঁচকড়ি বাবুর সহিত আমি পরিচিত। তিনি আমাদের উপরের শ্রেণীতে পড়িতেন। তিনি পাটনা কলেজ হইতে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে বি, এ, পাশ করেন; আমি পর বৎসরে বি, এ, পাশ করি। বি, এ, পাশ করিয়া আমি কলিকাতায় এম্-এ, ও বি, এল্ পড়ি। পাঁচকড়ি বাবু বি, এ, পাশ করিয়া কোথায় যান ও কি করেন, তাহা আমার স্মরণ নাই। বহুদিন পরে, কলিকাতায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয়। সম্ভবতঃ তখন তিনি কলিকাতায় কোনও সাপ্তাহিক বাঙ্গালা সংবাদপত্রের সম্পাদকতা করিতেছিলেন।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে, এম্-এ, পাশ করিয়া আমি যখন বি, এল্ পড়ি, সেই সময়ে "সীতা" রচিত ও প্রকাশিত হয়। "সীতা" বাং ১২৯৭ সালে, ইং ১৮৯০

খৃষ্টাব্দে, প্রথম প্রকাশিত হয়। "সীতা"-রচনার সময়ে পাঁচকড়ি বাবুর সহিত আমার দেখা সাক্ষাৎ বা "সীতা"-সম্বন্ধে কোনও পত্র-ব্যবহার হইয়াছিল কি না, তাহা আমার একেবারেই স্মরণ হয় না। আমার যতদূর স্মরণ হয়, তাহাতে বেশ মনে হইতেছে, "সীতা"র প্রকাশের সহিত পাঁচকড়ি বাবুর কোনও সম্বন্ধ ছিল না। কিন্তু "মানসী"তে তিনি লিখিয়াছেন যে, তাঁহার একটু সম্বন্ধ ছিল। এই সম্বন্ধটি কি রকম ছিল, তাহা তিনি খুলিয়া লিখেন নাই। খুলিয়া লিখিলে, আমি নিরতিশয় সুখী হইব। ইং ১৮৮৯-৯০ খৃষ্টাব্দে তিনি কোথায় ছিলেন, কি করিতেছিলেন, আমার সহিত কলিকাতায় কোথায় দেখা হয়, এবং "সীতা"র প্রকাশের সহিত তাঁহার কি প্রকার সম্বন্ধ ছিল, তৎসম্বন্ধে তিনি সকল কথা খুলিয়া লিখিলে আমি তাঁহার উক্তির যাথার্থ্য বুঝিতে পারিব। আমার যতদূর স্মরণ হয়, পাঁচকড়ি বাবু তখন কলিকাতায় ছিলেন না এবং বাঙ্গলা সাহিত্যজগতেও তখন তাঁহার নাম ফুটিয়া উঠে নাই। ইংরাজী-সাহিত্যে এম্-এ পাশ করিয়া, সংস্কৃত-সাহিত্যে এম্-এ, দিবার অভিপ্রায়ে মহর্ষি বাল্মীকির মূল রামায়ণ পড়িতে পড়িতে "সীতা" লিখিবার সঙ্কল্প আমার মনোমধ্যে উদিত হয়। সঙ্কল্প হইবামাত্র আমি তাহা লিখিতে প্রবৃত্ত হই এবং দুই মাসের মধ্যে তাহা লিখিয়া ফেলি। "সীতা" প্রকাশিত হইবার অনেক দিন পরে পাঁচকড়ি বাবুর সহিত কলিকাতায় দেখা হইয়াছিল, ইহা আমার বেশ স্মরণ হইতেছে।

"মানসী"তে পাঁচকড়ি বাবুর নিম্নলিখিত ইঙ্গিত বা শ্লেষবাক্যেরও তাৎপর্য্য আমার হৃদয়ঙ্গম হইতেছে না। তিনি লিখিয়াছেন "শ্রীমান্ অবিনাশচন্দ্রকে ছোট করিবার আমাদের ইচ্ছা নাই; প্রবাসী সম্পাদকের অজ্ঞতা ফুটাইয়া তুলিবার আমাদের প্রবৃত্তি নাই, তবে যাঁহারা পুরাতন হিন্দী সাহিত্যের খবর রাখেন, তাঁহারা জানেন, কে কোথা হইতে কি পাইয়াছেন।" আমি হিন্দী ভাষা শিক্ষা করি নাই এবং পুরাতন হিন্দী-সাহিত্যেরও খবর রাখি না। সুতরাং "সীতা" রচনা করিতে আমি হিন্দী পুরাতন সাহিত্যের যে কোনও সাহায্য গ্রহণ করি নাই, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি। মহর্ষি বাল্মীকির মূল রামায়ণ, পণ্ডিত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন মহাশয়ের কৃত রামায়ণের বঙ্গানুবাদ, কালিদাসের রঘুবংশের কতিপয় শ্লোক, রাজর্ষি জনকের ব্রহ্মজ্ঞান-সম্বন্ধে কিম্বদন্তী—এই সমস্ত অবলম্বন করিয়াই আমি "সীতা" রচনা করিয়াছিলাম। সীতাদেবীর বাল্যজীবনের বৃত্তান্ত মূল রামায়ণের কোনও একটী স্থলে লিপিবদ্ধ

নাই বটে; কিন্তু রামায়ণের নানাস্থলে তাহা বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। আমি সেই বিক্ষিপ্ত অংশগুলি একত্র করিয়া গ্রথিত করিয়াছিলাম। পরিশ্রম করিলে, যে কেহ এই গ্রন্থনকার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন, তাহা স্বীকার করি। দুইটী বিভিন্ন গ্রন্থনে সাদৃশ্য থাকাও বিস্ময়জনক নহে। কিন্তু গ্রন্থনের প্যারাগ্রাফে প্যারাগ্রাফে ও ছত্রে ছত্রে যদি ভাষা ও ভাবের মিল থাকে, তাহা হইলে কি মনে হয়? এইটিই প্রধান আলোচ্য ও বিবেচ্য বিষয়। একটী অপরটির অনুকরণ কি না, এবং অনুকরণ হইলে, তাহা অনুকারীর স্বীকার্য্য কি না,—এই বিষয়ের মীমাংসা হইলেই সকল গোলযোগ মিটিয়া যায়। কিন্তু "মানসী"তে পাঁচকড়ি বাবুর লেখা পড়িয়া মনে হয়, তিনি যেন বাক্যচ্ছটা ও আড়ম্বর দ্বারা মূল প্রতিপাদ্য বিষয়টিকে পাঠকের দৃষ্টির অন্তরালে রাখিবার জন্য অদ্ভুত সাহিত্যিক ওকালতীর অবতারণা করিয়াছেন। ইহা ওকালতী হইতে পারে, কিন্তু ইহা যে নিরপেক্ষ সমালোচনা নহে, তাহা আশা করি, পাঁচকড়ি বাবুই স্বীকার করিবেন।

প্রবাসীসম্পাদক রামানন্দ বাবুও আমার বাল্যবন্ধু। তাঁহার ধর্ম্মসম্বন্ধীয়, সামাজিক, রাজনীতিক ও সাহিত্যিক অনেক মতের সহিত আমার মতের মিল নাই। কিন্তু তথাপি আমি তাঁহাকে শ্রদ্ধা করি। পাঁচকড়ি বাবু দলাদলির কথা লিখিয়াছেন; কিন্তু তিনি জানেন যে, আমি দলাদলি ভালবাসি না, এবং কোনও দলের মধ্যেই নাই। আমার মনে হয়, সাহিত্যকে দলাদলি হইতে তফাতে রাখিতে পারিলেই ভাল হয়। দলাদলির ভাব থাকিলে, সত্য অনেক সময় আমাদের অজ্ঞাতসারে বিকৃত হইয়া পড়ে। পাঁচকড়ি বাবুও এই দলাদলির মধ্যে পড়িয়া দুই এক স্থলে সত্যকে বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন;—"তখন (অর্থাৎ 'সীতা' প্রকাশিত হইলে) অবিনাশচন্দ্রের 'সীতা' প্রবাসীর দলের তেমন আদর পায় নাই।" পাঁচকড়ি বাবুর এই উক্তি সত্য নহে। "সীতা" যখন প্রকাশিত হয়, তখন রামানন্দ বাবু Indian Messenger পত্রের সম্পাদক ছিলেন। তিনি নিজে "সীতা"র প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনা করিয়াছিলেন। "সীতা" পাঠ করিয়া সীতাচরিত্রের সৌন্দর্য্যে তিনি এরূপ মুগ্ধ হন যে, কতিপয় বৎসর পরে তাঁহার একটী কন্যা হইলে, তিনি তাহার নাম সীতা রাখিয়াছিলেন। "সীতা" যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন "প্রবাসী"র জন্ম হয় নাই। সুতরাং "সীতা"র প্রকাশের সময় "প্রবাসীর দল" বলিয়া কোনও দল ছিল না।

মাসিকপত্র সম্পাদন সম্বন্ধে রামানন্দ বাবুর যোগ্যতাবিষয়ে পাঁচকড়ি বাবু যাহা বলিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছু বলিতে চাই না। তবে সত্যের খাতিরে এইটুকু বলা আবশ্যক মনে করি যে, রামানন্দ বাবু আজ ২৫ বৎসর কাল সাময়িক পত্রের সম্পাদন করিতেছেন। যখন তিনি বি, এ, পড়েন, তখন হইতেই তিনি এই কার্য্য করিতেছেন। রামানন্দ বাবুর সকল মতের সহিত মিল না থাকিলেও তাঁহার যোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ নাই।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস।

প্রতিবাদের প্রতিবাদ। *

তোমরা আমাকে অবিনাশচন্দ্রের পত্রখানি পড়িতে দিয়া ও তাহার উত্তর লিখিবার অনুমতি দিয়া ভাল করিয়াছ, কি মন্দ করিয়াছ, তাহা বলিতে পারি না। কারণ, উত্তরে আমি যাহা লিখিব তাঁহার সমর্থন করিবার প্রধান তিনটি সাক্ষী এখন লোকান্তরে গিয়াছেন, একা আমিই বাঁচিয়া আছি। আমার কথার পোষক দলিল-পত্রও নষ্ট হইয়াছে; স্বদেশীর আমলে থানাতল্লাসীর হাঙ্গামায় সব পোড়াইয়া ফেলিয়াছি। ফলে, অবিনাশচন্দ্রের কথার প্রতিবাদে আমার কথা, যাহার যেটি

* গত বৈশাখের মানসীতে শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বাবু 'সম্পাদকের কর্ত্তব্য' শীর্ষক যে প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছেন, ঐ প্রবন্ধের প্রথম প্রকাশিত অংশে শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দাস মহাশয়ের সীতা সম্বন্ধে কয়েকটী কথা ছিল। অবিনাশ বাবু পাঁচকড়ি বাবুর ইঙ্গিত সম্বন্ধে একটি প্রতিবাদ পাঠাইয়াছেন, এ প্রতিবাদ এই সংখ্যা মানসীতে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধের প্রথম হইতেই সাহিত্যিক কলহের সূত্রপাত দেখিয়া আমরা সতর্ক হইয়াছি এবং ঐ কলহ যাহাতে আর বাড়িতে না পায়, সেজন্য পাঁচকড়ি বাবুকে অবিনাশ বাবুর প্রতিবাদ দেখাইয়া ঐ সম্বন্ধে তাঁহার কিছু বলিবার আছে কিনা জানিতে চাই; কারণ উক্ত প্রতিবাদ বা বিবাদের প্রশ্রয় দিতে আমরা প্রস্তুত নই এবং সেইজন্যই উক্ত দুই প্রবন্ধ, প্রতিবাদ ও প্রতিবাদের প্রতিবাদ একসঙ্গে এবারকার সংখ্যায় প্রকাশিত করিয়া আমরা সর্ব্বপ্রকার মনোমালিন্য হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতেছি। অতঃপর আমরা ঐ ব্যক্তিগত প্রতিবাদ সম্বন্ধে কোন প্রবন্ধ ছাপাইতে অনিচ্ছুক।

মাঃ সঃ

মনে ধরিবে, তিনি তাহাই বিশ্বাস করিবেন। এই হিসাবে আমাকে কলম ধরিতে হইল।

অবিনাশচন্দ্র লিখিয়াছেন—"পাঁচকড়িবাবু বি, এ পাশ করিয়া কোথায় যান ও কি করেন তাহা আমার স্মরণ নাই" (আমি জানি না,—কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে)—এই কথাটা ঠিক নহে। বি, এ পাশ করিয়া কলিকাতায় আসিয়াছিলাম; পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের হিন্দুধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে লেখক ও বক্তারূপে সহায়তা করিতাম। তখন ৺ভূধর চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে প্রায়ই অবিনাশচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ হইত। সেই সময়ে তাঁহার সীতার পাণ্ডুলিপি তিনি আমাকে দেখাইয়াছিলেন। সে পাণ্ডুলিপিতে আমার কলমও ছিল। যাহারা আমার ভাষার সহিত পরিচিত—যথা আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র, নিখিলনাথ, সুরেশচন্দ্র—তাহারা মন দিয়া সীতা পড়িলে, আমার লেখা বাছিয়া বাহির করিতে পারিবেন। আমি জোর করিয়া বলিতে পারিব। যখন "সীতা" প্রকাশিত হয়, তখন "বেদব্যাস" মাসিক পত্র প্রকাশিত হইত, আমি উহার একজন প্রধান লেখক ও সমালোচক ছিলাম। খৃঃ অব্দ ১৮৮২ হইতে "ধর্ম্মপ্রচারক" কাগজেও আমি নিয়মিত লিখিতাম। ভূধরের বাড়িতে তখন একটা মজলিস্ বসিত। অবিনাশচন্দ্রের মনে না থাকিতে পারে, কিন্তু আমার বেশ মনে আছে যে, সীতা প্রকাশিত হইলে শ্রদ্ধাভক্তি বিনয়বচনের লম্বা চৌড়া পাঠ লিখিয়া প্রথম সংস্করণ লাল কাগজে মোড়া ছাপান "সীতা" একখানি তিনি আমাকে উপহার দিয়াছিলেন। আমি "বেদব্যাসে" উহার সমালোচনা লিখিয়া ছাপাইয়াছিলাম। আর একটা কথা মনে আছে। বঙ্গবাসীর ৺কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত, ইণ্ডিয়ান মিররের ৺নরেন্দ্রনাথ সেনের সহিত অবিনাশচন্দ্রের পরিচয় আমি বা ভূধর দুইজনের মধ্যে একজন কেহ করিয়া দিয়াছিলাম। তখন কথা উঠিয়াছিল যে, ব্রাহ্মদের সহিত নব্য-হিন্দুর দলের বড় আড়াআড়ি, এমন গোড়ামীর বনীয়াদ "সীতা" পুস্তকের ভাল সমালোচনা ব্রাহ্মেরা করিবে না; অতএব নব্য-হিন্দুর দল হইতে উহার প্রশংসা বাহির হওয়া কর্ত্তব্য। "প্রবাসীর দল" অর্থে আমি ব্রাহ্মের দলকেই ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। তাই ভূধর যোগাড় করিয়া বঙ্গবাসীতে ভাল সমালোচনা বাহির করিয়া দেয়। আমার ইহাও মনে আছে যে, চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ ভূধরের বাড়িতে যাতায়াত করিতেন, সেই সময়ে আমার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। চন্দ্রোদয় অবিনাশচন্দ্রের ভাষার অনেক দোষ দেখিয়াছিলেন। "সীতা" যে ভাল বহি—এ কথাটা তাহাকে সকলের মধ্য

মুখে প্রচারিত হয়, এ চেষ্টা আমি করিয়াছিলাম। আমার অনুরোধে ভূধরও যথেষ্ট 'ক্যান্‌ভাস্‌' করিয়াছিল।

উপরে যাহা লিখিলাম, তাহার সাক্ষী ত কেহ নাই ; যাহারা ছিল তাহারা মরিয়া গিয়াছে। তবে ১৮৮৭ খৃঃ অব্দ হইতে ১৮৯১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত আমি কলিকাতায় আসিতাম যাইতাম, সাহিত্য-চর্চ্চা করিতাম, মাসিক ও সাপ্তাহিকে লিখিতাম, তখন আমাদের একটা বড় দল ছিল, সে দলের আনুকূল্য লাভ করিবার জন্য অনেকে যে আমার আনুগত্য করিতে বাধ্য হইতেন—এ সকল কথার সমর্থন প্রিয়-সুহৃদ শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় করিতে পারেন।

অবিনাশচন্দ্র আবার লিখিয়াছেন—"আমার যতদূর মনে হয়, পাঁচকড়িবাবু তখন কলিকাতায় ছিলেন না। এবং বাঙ্গালা সাহিত্য জগতে তখন তাঁহার নাম ফুটিয়া উঠে নাই।" উঃ—কি স্মৃতিবিভ্রম! তখন ত সম্মতি আইনের হাঙ্গামা চলিতেছিল। বঙ্গবাসী ও ষ্টেট্‌সম্যানের ফাইল খুঁজিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবে—তোমারই মনে পড়িবে—পাঁচকড়িবাবু তখন কোথায় ছিলেন, কি করিতেছিলেন! ন্যাশনাল স্কুলের কথা মনে পড়ে কি? যখন রামানন্দবাবু সীতার সমালোচনা ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জারে বাহির করেন, তখন আমাকে পত্র লিখিয়া জানাও নাই কি, যে রামানন্দবাবু তোমাদের এক দেশের লোক, উদার, উন্নত এবং তোমার প্রতি অনুকূল ?' তখন সাহিত্য-জগতে আমার নাম ফুটিয়া উঠুক আর নাই উঠুক, তোমার সীতার ফড়িয়াগিরি প্রাণপণে করিয়াছি ; এ যোগ্যতাটুকু ফুটিয়া উঠিয়াছিল। এই সকল ঘটনা মনে আছে বলিয়া লিখিয়াছিলাম, সীতার প্রকাশের সহিত আমাদের একটু সম্বন্ধ ছিল। অবিনাশচন্দ্র অস্বীকার করিতে চাহেন; অতীতকে একেবারে মুছিয়া ফেলিতে চাহেন। আমার সাক্ষী বাঁচিয়া থাকিলে, দলিলী সাবুদ ঠিক থাকিলে, অবিনাশচন্দ্রের বিস্মৃতির মূলে কুঠার আঘাত করিতে পারিতাম। এখন শুধু কথা বলা ছাড়া অন্য উপায় নাই ; তবে এইবার অবিনাশচন্দ্রকে ঠিকমত চিনিতে পারিলাম। ইহাও কম লাভ নহে।

আর একটা ইঙ্গিত করিব। বাঁকীপুরের খড়্গ-বিলাস প্রেসের কথা অবিনাশ-চন্দ্রের মনে আছে কি ? ঐ প্রেসের কর্ত্তা বাবু রামদীন সিংকে মনে পড়ে কি? মনে পড়ে কি রামচরিত নামধেয় একখানি হিন্দী কেতাবের কথা? মনে পড়ে কি পণ্ডিত অম্বিকাদত্ত ব্যাসের সীতাচরিত্রের উপর বক্তৃতা? মনে পড়ে কি ৺নীল-কণ্ঠ মজুমদারের রামায়ণ চর্চ্চা—বেদব্যাসে ধারাবাহিকরূপে সীতাচরিতের বিশ্লে-ষণ? যখন সব ভুলিয়াছ, ১৮৮৭ হইতে ১৮৯২ পর্য্যন্ত এই সময়ের কলিকাতার খেলাটা

সব ভুলিয়াছ,—সে হাঁটাহাঁটি ছুটাছুটি, সে সহি সুপারীষ, উপরোধ অনুরোধ,—সব ভুলিয়াচ,—তখন আর কিছু বলিব না। বলিব—আমারই দোষ, আমার ঘাট হইয়াছে, আমি মিথ্যা লিখিয়াছি, অন্যায় বলিয়াছি। জীবনে কখনও কাহারও নিকটে কোন প্রত্যাশা করি নাই, তাই কখনই ঠকি নাই। কখনও নিজ কৃত কোন কার্য্যের বড়াই নিজমুখে করি নাই, তাই অপ্রস্তুত হই নাই। তবে অবিনাশচন্দ্রের স্মৃতি-বিভ্রম যে ঘটিবে, এমন শঙ্কা কখনই হয় নাই। যাউক, ব্যক্তিগত কথা লইয়া হাঙ্গামা করিবার কোন প্রয়োজন নাই।

অবিনাশচন্দ্র লিখিয়াছেন—"কিন্তু গ্রন্থণের প্যারাগ্রাফে প্যারাগ্রাফে ছত্রে ছত্রে যদি ভাষা ও ভাবের মিল থাকে, তাহা হইলে কি মনে হয়?" অবিনাশচন্দ্র তুমিই বল, কি মনে হয়? তোমার সীতার লেখার ইতিহাস মনে করিয়া, মনের তলা পর্য্যন্ত আলোড়ন করিয়া, স্মৃতির ইন্ধনে বিশাল মশাল জ্বালিয়া হৃৎকন্দরের সকল কক্ষ খুজিয়া দেখিয়া, তুমিই বল অবিনাশচন্দ্র, কি মনে হয়? আমার মনে হয়. রামায়ণ চুরি সম্ভবে না; কেননা উহা হিন্দুমাত্রেরই পৈতৃক সম্পত্তি। তাহার উপর ৺হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের বঙ্গানুবাদ গদ্য রামায়ণ যতদিন বজায় থাকিবে, ততদিন এক ঘাটের জল সকলকেই তুলিতে হইবে। যে যেমন করিয়া পারে উহার প্রচার বাড়াইতে থাকুক, তাহা হইলেই দেশের ও দশের কাজ হইবে। আসল কথা কি জান,তোমার সীতা বা জলধরের সীতাদেবী এ কোনটারই জন্য আমার মাথা ব্যথা নাই। তোমার পুস্তক ভাল অত্যুত্তম; জলধরের পুস্তক ভাল অত্যুত্তম। আমি কেবল প্রবাসী-সম্পাদকের মুন্সিয়ানার জলুস দেখিয়া বিস্ময়ে বিভোর হইয়াছিলাম; দৃষ্টান্তস্থলে তোমাদের সমালোচনা ধরিয়া কথা কহিয়াছিলাম। আমার প্রতিপাদ্য বিষয় তুমিও নয়, জলধরও নহে। কারণ আমি জানি, তোমরা জলবুদ্‌বুদ্ ডুবিয়া যাইবে, থাকিবে কেবল অসীম ও অক্ষয় সাগর-রামায়ণ। অদৃষ্টের গুণে তোমরা দুইজনে বহি বেচিয়া পয়সা করিতে পার—করিয়াছও। সে ভাবনা আমার নাই। আমার ভাবনা—লেখাপড়া শিখিয়া লোকগুলা হইল কি? সম্পাদকের কর্ত্তব্যের কথা বাবুরামানন্দ যাহা প্রবাসীতে লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া পণ্ডিত ছোটুলালের সেই বচন মনে পড়িল,

"একাংলজ্জাং পরিত্যজ্য
ত্রিভুবন বিজয়ী ভব।"

পরে বেগ সামলাইতে পারিলাম না, একটা সন্দর্ভ লিখিয়া "মানসী" পত্রে ছাপাইয়া দিলাম। তোমরা এক অপরের পিঠ চুলকাও; এক অপরকে উঁচু করিয়া ধর।

আমার কথার চোটে তোমরা শিহরাইবে বৈ কি! আমার কোন বহি বা লেখা যদি, কেহ চুরি করিয়া নূতন আকারে ছাপাইয়া দিত, ত আমি খুসী হইতাম। তেমন চুরি যে কেহ কখন করে নাই এমন কথাও বলি না। তুমি নিজে মহাজন গৃহস্থ হইয়া জলধরকে চোর সাব্যস্ত করিতে পারিলে; তোমাদের খুব তৃপ্তি হয় বটে। কারণ, তোমরা ভাবের কাঙ্গাল, কুঁড়ে ঘরের মহাজন। রামানন্দবাবু যোগ্য, সুপণ্ডিত, শান্ত দান্ত ব্যক্তি হইতে পারেন; কিন্তু যে ভাবে উনি প্রবাসী চালাইতেছেন, পুস্তক সমালোচনার ব্যাপারে তিনি যে অদ্ভূত গুপ্ত কথা ব্যক্ত করিয়াছেন,তাহাতে তাঁহাকে ঠাট্টা না করিয়া থাকা যায় না। আমি সেই ঠাট্টাটুকু করিয়াছি, সেই ঠাট্টাটা একটু ঘোরালো করিবার জন্য তোমার সীতা ও জলধরের সীতাদেবীর তুলনায় সমালোচনার ভঙ্গীটা দেখাইয়াছি মাত্র। বড় কথা মনে পড়িল। কিন্তু তাহাত ফুটাইয়া বলিব না। আজ ত রামানন্দ বাবু তোমার বেজায় বন্ধু, কিন্তু "কুমারী" উপন্যাস বাহির করিবার সময়ে সে গুঁতাটা মনে আছে কি? আমরা ছেলেবেলায় কথায় কথায় ভাব করিতাম, কথায় কথায় আড়ি করিতাম। তোমরা সাহিত্যসেবী, তোমাদের ব্যবহার দেখিয়া সেই ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে। এখন বুঝি রামানন্দবাবুর সহিত ভাব হইয়াছে! তাই চারি বৎসর পূর্ব্বেকার গুঁতাটা ভুলিয়া এখন রামানন্দবাবুকে কোল দিলে! রঙ্গ করি কাহাকে লইয়া? ছার অহঙ্কার! ব্যঙ্গত সহিতে পার না; অমনি ফোঁস করিয়া প্রতিবাদ করিতে ফণা ধরিলে! এত ক্ষুদ্র, এমন নগণ্য অহঙ্কারের জন্যও লেখাপড়া জানা,এম এ, বি এল পাশকরা লোকেও আত্মহারা হয়! *

যাউক—এবার এই পর্য্যন্ত। আর এ কথা কহিব না। অবিনাশচন্দ্র ঘুষী উঠাইলেও নহে। অতঃপর আমার যাহা প্রতিপাদ্য, আমি যে কথার সূচনা করিয়াছি, তাহারই ব্যাখ্যা করিব।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

* অবিনাশচন্দ্র "মানসীতে" যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে নিজ স্বাক্ষরের পার্শ্বে এম-এ, বি-এল উপাধিটি নিজেই জুড়িয়া দিয়াছেন। বাঁকীপুরের গোবিন্দচরণ এম-এ পাশ করিল, তখন বিহারে আর বিহারী এম-এ ছিল না, তাই সে পত্নীকে পত্র লিখিতেও এম-এ জুড়িয়া দিত। আমরা রঙ্গ করিয়া তাহাকে গোবিনচরণ এম-এ বলিয়া ডাকিতাম। মনে পড়ে কি অবিনাশচন্দ্র! প্রথম যৌবনে যাহার নিন্দা শ্লেষ ব্যঙ্গ করিয়াছিলে, তুমি বুড়া হইয়া তাহাই নিজে করিতেছ!

পাঁচকড়ি

অরুন্ধতী।

যয়া পূতম্মন্যো নিধিরপি পবিত্রস্য মহসঃ
পতিস্তে পূর্ব্বেষামপি খলু গুরূণাং গুরুতমঃ।
ত্রিলোকী মঙ্গল্যামবনিতল লোলেন শিরসা
জগদ্বন্দ্যাং দেবীমুষসমিব বন্দে ভগবতীম্॥ *

মহাকবি ভবভূতি রাজর্ষি জনকের মুখে ভগবতী অরুন্ধতীর উল্লেখিত রূপে বন্দনা করাইয়াছেন। ইহা কবির অতিশয়োক্তি নহে। বিবাহের কুশণ্ডিকার সময়ে বর মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক বধূকে সপ্তর্ষিমণ্ডলস্থিতা অরুন্ধতী দেখাইয়া থাকেন, উদ্দেশ্য এই যে অরুন্ধতী যেমন পতিব্রতাগণের অগ্রগণ্যা বধূও যেন সেইরূপ হন। আবার সচরাচর লোকে অরুন্ধতী দর্শনকালে যদি দেখা না পায়, তবে বুঝিতে হইবে যে দ্রষ্টার সময় ফুরাইয়া আসিয়াছে ;—

"দীপনির্ব্বাণগন্ধঞ্চ সুহৃদ্বাক্যমরুন্ধতীম্।
ন জিঘ্রন্তি ন শৃণ্বন্তি ন পশ্যন্তি গতায়ুষঃ॥ †

এতাদৃশী অরুন্ধতীর কাহিনী জানিতে কাহার না কৌতুহল হয়? তবে নানা গ্রন্থে নানা আকারে তাঁহার বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। আমরা অদ্য কালিকাপুরাণ-অবলম্বনে তদীয় জীবনকাহিনীর কিয়দংশ বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব, কিন্তু ইতিপূর্ব্বে ভূমিকাস্বরূপ দুই চারিটা কথা বলিব।

কালিকাপুরাণ অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্তর্গত নহে, তাই ইহা উপপুরাণ মধ্যে পরিগণিত; কিন্তু তাহা হইলেও ইহা বিশালতায় এবং উপদেশকল্পে অনেক মহাপুরাণ অপেক্ষা ন্যূন নহে। বিশেষতঃ আমাদের—যাহারা কামরূপের অধিবাসী তাহাদের—ইহা অবশ্য পাঠ্য। কামরূপের কথা ইহাতে যত আছে, বোধ হয়, এক যোগিনীতন্ত্র ব্যতীত, এত আর কোনও সুপ্রচারিত সংস্কৃত গ্রন্থে আছে কিনা সন্দেহ। কামরূপের সীমা, ব্রহ্মপুত্রের

* গুরুর যিনি গরিষ্ঠ পবিত্র ঋষি বশিষ্ঠ
তেজোনিধি পূতমন্য লভিয়া যাঁহায়।
জগদ্বন্দ্যা সাধ্বী সতী উষাতুল্যা অরুন্ধতী
ত্রিলোকমঙ্গলা মাতা নমি তব পায়॥

† প্রদীপ নিভিলে গন্ধ নাহি পায় সুহৃদের কথা করে না শ্রবণ।
অরুন্ধতী যদি নাহি দেখে হায় জানিবে তাহার নিকটে মরণ॥

উৎপত্তিকাহিনী, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরাধিপতি নরকবিবরণ, মহাপীঠ ৺কামাখ্যার বিবরণ ও পূজা-পদ্ধতি ইত্যাদি কত কি রহিয়াছে! এই কালিকা পুরাণেই আছে, বশিষ্ঠ এতদঞ্চলস্থিত সন্ধ্যাচলে—এক্ষণে যাহা বশিষ্ঠাশ্রম * বলিয়া খ্যাত—তথায় অবস্থিতি করিতেন। এই কালিকাপুরাণেই অরুন্ধতীর জন্ম ও বিবাহ-বিবরণ বিস্তারিত বর্ণিত আছে।

সন্ধ্যা ব্রহ্মার মানসীকন্যা। মরীচি প্রভৃতি মহর্ষিগণও ব্রহ্মার মানস পুত্র। একদা ব্রহ্মা পুত্রগণ এবং কন্যাসহ আসীন আছেন; ভগবান্ মহেশ্বরও সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন। হঠাৎ ব্রহ্মার মন সন্ধ্যার প্রতি ভাবান্তরগ্রস্ত হইল; মহর্ষিগণেরও চিত্ত তাঁহাকে দেখিয়া বিচলিত হইয়াছিল এবং সন্ধ্যার মনও তাঁহাদের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া উঠিল। ব্যাপার দেখিয়া মহাদেব ব্রহ্মার প্রতি বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করিলেন; তখন সকলেই স্ব স্ব অবস্থায় নিতান্ত লজ্জিত হইলেন। যাহা হউক, যাহার প্রভাবে ঈদৃশ অস্বাভাবিক ব্যাপার ঘটিল, ব্রহ্মা সেই দুর্দ্দান্ত মদনকে অভিশাপ প্রদান করিলেন। ব্রহ্মাদি চলিয়া গেলে সন্ধ্যা মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "হায় আমি কি পাপীয়সী; আমাকে দেখিয়া পিতা ও ভ্রাতৃগণ বিচলিত হইলেন, আমারও মন তাঁহাদের প্রতি অসদ্ভাবাপন্ন হইল। দুরাত্মা কাম ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হইয়া স্বকর্ম্মের ফলভুক্ হইল, কিন্তু আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল কৈ? আমার এই পাপশরীরই যত অনর্থের মূল, আমি ইহা অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিব; কিন্তু মরিবার পূর্ব্বে তপস্যার দ্বারা এমন এক নিয়ম স্থাপন করিয়া যাইব, যাহাতে মদনের প্রভাব সকল অবস্থাতে সকলের উপর না থাটে।"

সন্ধ্যা এতাদৃশ সঙ্কল্প করিয়া চন্দ্রভাগপর্ব্বতে গিয়া তপস্যার্থ আয়োজন করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিরূপে তপঃসাধন করিতে হয়, তাহার কিছুই জানেন না। ব্রহ্মা তাঁহার এই অসহায় অবস্থা দেখিয়া মানসপুত্রগণের একতম মহর্ষি বশিষ্ঠকে বলিলেন, "বৎস. আমার এবং তোমাদের চিত্ত অন্যায়ভাবে সন্ধ্যার প্রতি বিচলিত হইয়াছিল—সন্ধ্যারও মনে কুভাব উপজাত হইয়াছিল। সন্ধ্যা আজ আমাদের সকলেরই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে। যাও, তাহার অভীপ্সিত তপস্যা কার্য্যের সহায়তা করিয়া সকলের উপকার সাধন কর।"

* প্রবন্ধশেষে বশিষ্ঠাশ্রম সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ বলা যাইবে।

বশিষ্ঠও তখন চন্দ্রভাগপর্ব্বতে গিয়া সন্ধ্যার নিকট হইতে তাঁহার অভিপ্রায় সমস্ত অবগত হইয়া বলিলেন "ভদ্রে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী নারায়ণকে "ওঁ নমো বাসুদেবায় ওঁ", এই মন্ত্র দ্বারা ভজনা কর এবং মৌনীতপস্যা সাধন কর।" এই বলিয়া কি রূপে, কি নিয়মে, কাজ করিতে হইবে, বিস্তারিতভাবে উপদেশ প্রদান করিলেন, সন্ধ্যাও যথোপদিষ্ট কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

কঠোর তপস্যার পর নারায়ণ প্রত্যক্ষগোচর হইলেন এবং অভীপ্সিত বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। সন্ধ্যা স্বীয় অভিলাষ বিজ্ঞাপিত করিলে, নারায়ণ বলিলেন "প্রাণিগণ উৎপন্ন হইবামাত্রই যেন সকাম না হয়, তোমার তপঃপ্রভাবে অদ্যাবধি এই নিয়ম স্থাপিত হইল। তুমি এতাদৃশী সতী হইবে, যে ত্রিভুবনে তোমার ন্যায় আর কেহই হইবে না। তোমার প্রতি পতি ভিন্ন কেহ কামভাবে দৃষ্টিপাত করিলে, তৎক্ষণাৎ ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হইবে। তোমার স্বামী প্রশস্ততপা রূপবান্ সপ্তকল্পান্তজীবী হইবেন। তুমি শরীর ত্যাগে সংকল্প করিয়াছ; নিকটেই মহর্ষি মেধাতিথি যজ্ঞ করিতেছেন, তুমি আমার বরে অদৃশ্যা হইয়া সেই যজ্ঞানলে স্বীয় দেহ, আহুতি প্রদান করিলে, তাঁহারই কন্যারূপে উদ্ভূত হইবে এবং শরীরত্যাগের সময় যাদৃশ স্বামী তোমার অভিপ্রেত তাঁহাকে হৃদয়ে ধ্যান করিলে, পরজন্মে তিনিই তোমার পতি হইবেন।"

নারায়ণ এই বলিয়া অন্তর্হিত হইলে, সন্ধ্যা তাঁহার তপঃসাধনার গুরু বশিষ্ঠের রূপ চিন্তা করিতে করিতে মেধাতিথির যজ্ঞানলে দেহত্যাগ করিলেন। নারায়ণের কৃপায় তাঁহার দেহ পুরোডাশময় হইয়াছিল, তাই দগ্ধনরদেহের পূতিগন্ধও কেহ অনুভব করিতে পারিলেন না। অগ্নিশুদ্ধ বিশুদ্ধ দেহ নারায়ণের অনুমতি ক্রমে সূর্য্যমণ্ডলে স্থাপিত হইলে, সূর্য্যদেব তাহা দ্বিধা বিভক্ত করিয়া প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যা রূপে পরিণত করিলেন। তাঁহার প্রাণবায়ু দিব্যদেহধারিণী কন্যারূপে যজ্ঞানলমধ্যে নারায়ণকর্ত্তৃক সংস্থাপিত হইলে, মেধাতিথি সানন্দচিত্তে গ্রহণ করিয়া পুত্রভাবে লালন পালন করিতে লাগিলেন। তিনি কখনও কোনও চরণে ধর্ম্মরোধ করেন না * এই নিমিত্ত মেধাতিথিকর্ত্তৃক অরুন্ধতী নাম প্রদত্ত হইল।

* ন রুণদ্ধি যতোধর্ম্মং সা কেনাপি চ কারণাৎ
অত স্ত্রীলোকবিদিতং নাম সা প্রাপ সাম্প্রতম্ ॥

চন্দ্রভাগপর্ব্বতোদ্ভূতা চন্দ্রভাগা নদীর তীরে মেধাতিথির আশ্রমে অরুন্ধতী শুক্লপক্ষের শশিকলার ন্যায় পরিবর্দ্ধমানা হইতে লাগিলেন। বালিকা অরুন্ধতী যে স্থানে স্নানাদি করিতেন, আজিও তাহা "অরুন্ধতী তীর্থ" বলিয়া প্রখ্যাত ঐ স্থানে স্নান করিলে বিষ্ণুপদ প্রাপ্তি হয়।

এদিকে অরুন্ধতীর শিক্ষার সময় হইয়াছে দেখিয়া, স্বয়ং ব্রহ্মা মেধাতিথিকে তদর্থে অবহিত হইতে উপদেশ প্রদান করিলেন এবং শিক্ষার নিমিত্ত সাবিত্রী ও বহুলার নিকট অরুন্ধতীকে রাখিয়া দিতে বলিয়া গেলেন। মেধাতিথি অরুন্ধতীকে লইয়া তাঁহাদের উদ্দেশে সূর্য্যমণ্ডলে গমন করিলেন। তখন বহুলা মানস পর্ব্বতে গিয়াছিলেন। সাবিত্রী তাঁহাদিগকে নিয়া মানসাচলে গেলেন; সেস্থানে সাবিত্রী, বহুলা, গায়ত্রী, সরস্বতী ও দ্রুপদা এই পঞ্চসাধ্বী মিলিত হইলেন। মেধাতিথি সাবিত্রী ও বহুলার হস্তে অরুন্ধতীকে সমর্পণ করিয়া কন্যাটি যাহাতে সুচরিত্রা হন তদর্থে অনুরোধ করিলেন। সাবিত্রী ও বহুলা বলিলেন "আমরা আপনার কন্যাকে অবশ্যই যথোচিত শিক্ষা দিব। ইনি পূর্ব্বে ব্রহ্মার কন্যা ছিলেন, আপনার তপোবলে এবং নারায়ণের প্রসাদে আপনি ইঁহাকে পাইয়াছেন। ইনি আপনার কুল পবিত্র করিয়াছেন, সতীত্ব প্রভাবে আপনার বংশবর্দ্ধন করিবেন—জগতের ও দেবতাগণের সতত মঙ্গল সাধন করিবেন। *

মাতার ন্যায় আদর করিয়া সাবিত্রী ও বহুলা সাত বৎসর কাল অরুন্ধতীকে শিক্ষা দিলেন—কখন বা সাবিত্রী তাঁহাকে সূর্য্যমণ্ডলে নিয়া যাইতেন; কখন বা বহুলা তাঁহাকে ইন্দ্রভবনে লইয়া যাইতেন। অরুন্ধতী স্ত্রীধর্ম্ম প্রভৃতি বিষয়ে ঈদৃশী সুশিক্ষিতা হইলেন যে সাবিত্রী এবং বহুলা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠগুণবিশিষ্টা বলিয়া খ্যাতিলাভ করিলেন।

উদ্ভিন্নযৌবনা অরুন্ধতী একদা মানসবনে বিচরণ করিতে করিতে বালসূর্য্যপ্রভ মহাতেজা বশিষ্ঠ ঋষিকে দেখিয়া কামভাবাপন্না হইলেন; কিন্তু সুশিক্ষাগুণে ধৃতি অবলম্বন করিয়া ঈদৃশ মনোবিকারের নিমিত্ত অনুতপ্তা হইয়া সাবিত্রীর নিকটে ম্লানবদনে গমন করিলেন। সাবিত্রী তাঁহার মলিনভাব দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, অরুন্ধতী লজ্জায় অধোমুখী হইলেন। তখন অন্তর্য্যামিনী

* কুলং পুনাতি ভবতঃ সত্ত্বাসৌ বর্দ্ধয়িষ্যতি।
লোকানামস্ত দেবানাং শিবমেষা করিষ্যতি॥

সাবিত্রী সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া বলিলেন "বৎসে চিত্তকে বৃথা ক্লিষ্ট করিও না। যাঁহাকে দেখিয়া তোমার মনোবিকার হইয়াছে, তাঁহাকেই পূর্ব্বজন্মে তুমি স্বামিত্বে বরণ করিয়া তপস্যান্তে দেহত্যাগ করিয়াছিলে।" তখন সাবিত্রীও বহুলা অরুন্ধতীর পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত সমস্ত বিবৃত করিলেন; অরুন্ধতীও তদানীং পূর্ব্বজন্মস্মৃতি লাভ করিয়া আপনাকে নিষ্পাপা মনে করিয়া আনন্দিতা হইলেন।

তখন সাবিত্রী অরুন্ধতীকে সূর্য্যমণ্ডলে রাখিয়া স্বয়ং ব্রহ্মার নিকটে গমন করিয়া তাঁহার কাছে সমস্ত ঘটনা বলিলেন। ব্রহ্মাও ধ্যানযোগে বশিষ্ঠ ও অরুন্ধতীর বিবাহ সময় আগত জানিয়া যে স্থানে অরুন্ধতীর বশিষ্ঠদর্শন হইয়াছিল সেই মানসাচলে সাবিত্রীসহ গমন করিলেন। নন্দিভৃঙ্গি সহিত মহাদেবও তখন উপস্থিত হইলেন। শঙ্খচক্রধারী নারায়ণ এবং অন্যান্য দেবগণও সেই স্থানে আসিলেন। ব্রহ্মা নারদকে পাঠাইয়া মেধাতিথিকে দেবগণ সমীপে উপস্থাপিত করিয়া, অরুন্ধতী-ঘটিত সমস্ত কথা বলিয়া, বশিষ্ঠের হস্তে তাঁহাকে সম্প্রদান করিতে অনুরোধ করিলেন। তখন মেধাতিথি অরুন্ধতীকে লইয়া ব্রহ্মাবিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণ সাবিত্রীবহুলা প্রভৃতি দেবীগণ এবং মুনিগন্ধর্ব্ব বিদ্যাধরাদি সমভিব্যাহারে বশিষ্ঠ যে স্থানে তপস্যা করিতেছিলেন, তথায় উপস্থিত হইলেন এবং ব্রাহ্মবিধি অনুসারে তাঁহার কন্যা অরুন্ধতীকে গ্রহণ করিতে প্রার্থনা করিলেন। বশিষ্ঠ তাহাতে সম্মতি প্রদান করিলে, যথাবিধি বিবাহক্রিয়া সম্পাদিত হইল। *

তদুপলক্ষে দেবদেবী ঋষি প্রভৃতি সকলে মিলিয়া আনন্দোৎসব করিলেন। বশিষ্ঠের জটাসকল খসাইয়া তাঁহাকে এবং অরুন্ধতীদেবীকে নানাবিধ আভরণে ভূষিত করিলেন ও নানারূপ যৌতুক প্রদান করিলেন। সাবিত্রী 'পতিব্রতাত্ব', বহুলা 'বহুপুত্রত্ব', অরুন্ধতীকে প্রদান করিলেন;—রুদ্র 'সপ্তকল্পান্তজীবিত্ব', বিষ্ণু মরীচিপ্রভৃতির নিকটস্থ সর্ব্বদেবগণের ঊর্দ্ধে বসতিস্থান, ব্রহ্মা একটি ব্যোমযান ও জলপূর্ণ কমণ্ডলু বরবধূকে উপহার দিলেন।

ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের পবিত্র পাণিদ্বারা বশিষ্ঠ ও অরুন্ধতীর উপর দেবগণ সমানীত যে জল বর্ষিত হইয়াছিল, তাহা মানসবিল হইতে সপ্তধা বিভক্ত হইয়া

* শ্রীমদ্ভাগবত (৩।২৩) অনুসারে অরুন্ধতী কর্দ্দম ও দেবহূতির নয়টি কন্যার মধ্যে একটি। কর্দ্দম:নবব্রহ্ম :মহর্ষিকে নয়টি কন্যাদান করেন, তন্মধ্যে অরুন্ধতীকে মহর্ষি বশিষ্ঠ লাভ করিয়াছিলেন।

হিমালয় পর্ব্বতের নানা গুহা, সানু ও সরসীতে পতিত হইয়াছিল; যে জল শিপ্রাসরোবরে পড়ে, তাহা হইতে বিষ্ণুপ্রেরিতা শিপ্রানদীর উৎপত্তি হইয়াছে; এইরূপে কৌষিকী, কাবেরী, গোমতী,দেবিকা, সরযূ ও ইরাবতী নদীরও উৎপত্তি হইয়াছিল।

বিবাহের পর অরুন্ধতীর স্বতন্ত্র সত্তা আর থাকিল না, পতিগতপ্রাণা পতিতেই মিশিয়া গেলেন। ব্রহ্মপুত্রে পতিত না হওয়া পর্য্যন্ত ত্রিস্রোতা উপনদীর ভিন্নপ্রবাহ পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু ব্রহ্মপুত্রের স্রোতে আপনাকে মিশাইবার পর উহার আর অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন হয় না। কালিকা-পুরাণে তাই ইতঃপর অরুন্ধতীর কোনও কথা নাই।

অরুন্ধতীর এই উপাখ্যান বলিয়া পুরাণকার বলেন, যে নারী ইহা শ্রবণ করিবে, সে ইহলোকে পতিব্রতা হইবে এবং পরলোকে স্বর্গে গমন করিবে। * আশা করি স্ত্রীপাঠ্য পুস্তকাবলী মধ্যে সত্বরই 'সাবিত্রী, 'শৈব্যা' 'বেহুলা' প্রভৃতির ন্যায় অরুন্ধতী ও দেখিতে পাইব।

অবান্তর ভাবে একটি কথা এস্থানে বলিব। এই যে সাবিত্রীর সঙ্গে 'বহুলার' উল্লেখ কালিকাপুরাণে দেখিতে পাই, ইহার সঙ্গে আমাদের বাঙ্গালার চিরপরিচিত বেহুলার কোনও সম্পর্ক আছে কি?

মহাভারতে সাবিত্রীর উপাখ্যানে আছে যে, রাজা অশ্বপতি সন্তানার্থী হইয়া সাবিত্রীর আরাধনা করিয়া অপত্য লাভ করাতে কন্যার নাম 'সাবিত্রী' রাখিয়া-ছিলেন। বেহুলার পিতা সাহা-বণিক্ এই প্রকার কোনও অনুষ্ঠান করিয়া সাবিত্রী সদৃশী বহুলার প্রীতি উৎপাদন পূর্ব্বক এই কন্যারত্ন লাভ করিয়া ইহার নাম তদনুকরণে 'বহুলা' রাখিয়াছিলেন কি না, এ কথা পদ্মাপুরাণে পাওয়া যায় না। 'বহুলা' হইতে 'বেহুলা', বেউলা (অসমীয়া পেহুলা) হওয়া খুবই স্বাভাবিক। তবে বঙ্গীয় পদ্মাপুরাণে 'বিপুলাসুন্দরী' দেখা যায়,—এটা পরবর্ত্তী কোনও সংস্কৃতীকরণ-প্রয়াসীর কার্য্য কি না অনুসন্ধানের বিষয়।

অপিচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কালিকাপুরাণ ব্যতীত এই 'বহুলার' কথা কুত্রাপি পাওয়া যাইতেছে না। 'বহুলা' অগ্নির এক নাম—তদধিষ্ঠিত কৃত্তিকা নক্ষত্রেরও নাম 'বহুলা'; কার্ত্তিকেয় সুতরাং 'বাহুলেয়' নামেও অভিহিত। কিন্তু এই 'বহুলা' কৃত্তিকার নামান্তর নহে। কালিকাপুরাণকার মার্কণ্ডেয়,

* যা স্ত্রী শৃণোতি সততমরুন্ধত্যাঃ কথামিমাম্।
পতিব্রতা সভূত্বেহ পরত্র স্বর্গমাপ্নুয়াৎ॥

অরুন্ধতী গুহা

ব্যাসি নহেন। এই পুরাণে কামরূপের কাহিনীই বিশে [illegible] মার্কণ্ডেয় এতদঞ্চলেরই অধিবাসী (অন্ততঃ কিয়ৎকাল, এ [illegible] ছিলেন বলিয়াই বোধ হয়। পুরাণ-প্রারম্ভেও আছে যে, [illegible] হিমালয় সন্নিহিত প্রদেশে অবস্থিত মার্কণ্ডেয়ের নিকটে ধর্ম্মস্পৃহা করিয়া এই পুরাণ প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছিলেন। * এই কামরূপও যে হিমালয় সংস্পৃষ্ট প্রদেশ তাহা বলাই বাহুল্য। 'বেহুলা'র কাহিনী অর্থাৎ চাঁদ সওদাগরের সঙ্গে নাগমাতা পদ্মাবতীর বিবাদ বিবরণ এই কামরূপ অঞ্চলে বঙ্গের ন্যায় সুপ্রচলিত। এই অঞ্চলের নিকটেই নাগ পর্ব্বত—বর্ত্তমানে নাগাহিলস্ জেলায় পরিণত এবং পদ্মাপুরাণে উল্লিখিত নানাস্থানও এই প্রদেশের বহুস্থানে অদ্যাপি প্রদর্শিত হইয়া থাকে—যেমন ধুবড়ি—নেতা ধুবানীর নামে সংপৃক্ত, ইত্যাদি। ইহাতে মনে হয় যে, হয় কালিকাপুরাণের লোক মার্কণ্ডেয় মহোদয় এতদঞ্চলে 'বেহুলার' কাহিনী পরিবর্ত্তিত হইয়া সাবিত্রীর ন্যায় সুরলোকেও 'বেহুলার' স্থান প্রদান করিয়াছেন; নয় কালিকাপুরাণের দেবসতী 'বহুলার' নামে পদ্মাপুরাণের নায়িকার নামকরণ হইয়াছিল।

কালিকাপুরাণের মতে অরুন্ধতী পূর্ব্বজন্মে সন্ধ্যা ছিলেন। গৌহাটি হইতে প্রায় ৪॥ ক্রোশ দূরবর্ত্তী বশিষ্ঠাশ্রম † যে পর্ব্বতের প্রান্তভাগে অবস্থিত তাহারও নাম সন্ধ্যাচল। এই পর্ব্বত হইতে একটি জলস্রোতঃ নির্গত হইয়া বশিষ্ঠাশ্রম সন্নিধানে প্রপতিত হইয়াছে এবং উপলসমূহদ্বারা ত্রিধা বিভক্ত সন্ধ্যা, ললিতা ও কান্তা এই ধারাত্রয়ে কিয়দ্দূর প্রবহমান হইয়া পুনশ্চ সম্মিলিত ভাবে সমভূমিতে আসিয়া একটি খালের আকার ধারণ করিয়াছে। ইহার নাম বশিষ্ঠ-গঙ্গা। স্থানটি প্রস্তরোপরি জলপ্রপাতের ঝংকৃতিশব্দে মুখরিত, আবার সমীপস্থ পর্ব্বতের বনরাজিদ্বারা পরিশোভিত। নিকটেই বশিষ্ঠেশ্বর মহাদেবের মন্দির—তৎসম্মুখে জগমোহন, তাহাতে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা অধিষ্ঠিত। মন্দির মধ্যে পাষাণময় বশিষ্ঠেশ্বর শিবলিঙ্গ, পার্শ্বে নারায়ণাদিও আছেন।

মন্দিরটি আহোমরাজ রাজেশ্বর সিংহের সময়ে তদীয় সেনাধ্যক্ষ দশরথ দুয়রা বড় কুকণ ১৬৮৬ শকাব্দে নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ‡

---

* মার্কণ্ডেয়ং মুনিশ্রেষ্ঠং স্থিতং হিমধরান্তিকে
মুনয়ঃ পরিপপ্রচ্ছুঃ প্রণম্য কমঠাদয়ঃ ॥ ইত্যাদি।

† বশিষ্ঠাশ্রম পর্য্যন্ত সড়ক রহিয়াছে—গৌহাটী হইতে অশ্বশকটে বা পদব্রজে অনায়াসে যাওয়া যায়। অবস্থানের জন্য আশ্রমে একটি সুন্দর বাংলো ঘরও আছে।

অনতিদূরে আমাদের অরুন্ধতী দেবীরও একটু স্মৃতিচিহ্ন বর্ত্তমান একটা প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড সম্মুখদিকে ঈষৎ হেলিয়া আছে; সেই :পার্শ্বে একটি প্রাচীন অশ্বত্থবৃক্ষ শিকড় জড়াইয়া বসিয়াছে—তাহাতে একটি মনোহর স্তম্ভ ও ছাদ বিশিষ্ট প্রকোষ্ঠের সৃষ্টি হইয়াছে—ইহারই নাম "অরুন্ধতী গুহা।" বশিষ্ঠাশ্রম পাণ্ডা-পুরোহিতগণদ্বারা অধ্যুষিত হইয়া জনতা বিশিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু এই স্থানটি সম্পূর্ণ নির্জ্জন। বশিষ্ঠাশ্রমে ইষ্টকালয়, টিনের ঘর,—পর্ণকুটীর প্রভৃতি সমাকীর্ণ * কিন্তু অরুন্ধতীর স্থানটিতে প্রকৃতি-গঠিত ঐ গুহাটি ব্যতীত আর কিছুই নাই। বশিষ্ঠাশ্রম সন্ধ্যাচল-বিগলিত জলপ্রপাতে শব্দায়মান—কিন্তু অরুন্ধতীর গুহা নীরব নিস্তব্ধ। ফলতঃ তপস্যার উপযোগী এতাদৃশ স্থান প্রকৃতির লীলানিকেতন এই কামরূপ ভূমিতেও অতি বিরল।

শ্রীপদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য

সাগর

হে আমার আশাতীত! হে কৌতুকময়ি!
দাঁড়াও ক্ষণেক! তোমা ছন্দে গেঁথে লই!
আজি শ্রান্তসিন্ধু এই ম্লান চন্দ্রকরে
করিতেছে টলমল কি যে স্বপ্নভরে!
সত্যই এসেছ যদি, হে রহস্যময়ি!
দাঁড়াও অন্তর মাঝে ছন্দে গেঁথে লই!
দাঁড়াও ক্ষণেক। আমি অর্ণবের গানে
পরিপূর্ণ শব্দহীন অন্তরের তানে,

সম্পূর্ণগুণগণৈকধাম ভবভবানীপদারবিন্দমকরন্দ মধুকর শক্রকুলকুমুদেন্দু শ্রীশ্রীমদ্রাজ রাজেশ্বর সিংহ নিদেশে (নে) স্ত্রনীলাবলম্বিমৌলি তদীয়চরণ চারণচক্রবর্ত্তি কুন্দাবদাত-কীর্ত্তি সমরধীরপারাবার গম্ভীর বিদ্যাবিদ্যোতিতস্তণা শ্রীগোবিন্দপদাব্জরোলম্ববর কাহিনী পতি শ্রীমদমুজহুবরা বৃহৎ ফুকতমুজ শ্রীমত্তরুণদুবর শ্রীমদ্দশরথভিধের সেনাধ্যক্ষেণ বশিষ্ঠাশ্রমশিরোপরি প্রসাদমবী করত্তর্ক নাগরসেন্দু শাকে॥ ১৬৮৬।

* বশিষ্ঠাশ্রম কামাখ্যাযাত্রীদিগের এক অবশ্য-দ্রষ্টব্য স্থান, তাই এস্থলের এইরূপ উন্নতি। ব্রাহ্মণের নিত্য সন্ধ্যাবন্দনার কচিৎ কোনওরূপ ত্রুটি হইয়া থাকিলে এই সন্ধ্যাচলে আসিয়া ত্রিসন্ধ্যা করিলে তাহা সারিয়া যায়। এ ছাড়া অনেকে প্রাকৃতিক শোভাসন্দর্শনার্থেও ঐ স্থানে

ছন্দাতীত-ছন্দে আজি তোমায় গাঁথিব,
অন্তরবিজনে আমি তোমায় বাঁধিব!
তুমি কি রবে না সেথা, হে স্বপ্ন-অচঞ্চলা!
ছন্দবদ্ধ, পরিপূর্ণ, নিত্য, অচঞ্চলা!

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাস।

রত্ন-দীপ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

লাস তদারক।

সিগ্‌ন্যালম্যান ত দশমিনিটের মধ্যেই নাসিকাগর্জ্জন আরম্ভ করিল—কিন্তু রাখালের চক্ষুযুগল হইতে যেন আগুন ছুটিয়া বাহির হইতেছে। ব্যাটারি-বক্সের উপর নিজ শয্যায় শয়ন করিয়া কিছুক্ষণ সে আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়া রহিল। যে দেরাজটিতে থলি ও দপ্তর রাখিয়াছে, তাহা চাবিবন্ধ নাই। হঠাৎ রাখালের মনে হইল, কি জানি যদি সিগ্‌ন্যালম্যান্ রাত্রিতে উঠিয়া ঐ দেরাজ টানিয়া খুলে? উহার চাবিও নাই যে বন্ধ করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইবে। জিনিষগুলা বাসায় রাখিয়া আসিলে হয়, কিন্তু দেরাজ টানিয়া খুলিবার শব্দে যদি লোকটা জাগিয়া উঠে এবং থলি বাহির করিতে দেখিতে পায়, কিম্বা নাড়াচড়ায় ঝম্ ঝম্ শব্দ শুনিতে পায়? তাহা হইলেই ত উহার মনে সন্দেহ হইবে—তখন কি বিভ্রাট ঘটিবে কে জানে? যেখানে মাথা রাখিয়া রাখাল শয়ন করিয়া ছিল, সেখান হইতে দেরাজটা আবার দেখাও যায় না। তাই সে বালিসটা পায়ের দিকে আনিয়া ঘুরিয়া শুইল। একদৃষ্টে দেরাজটির পানে চাহিয়া রহিল।

রাখাল ভাবিতে লাগিল—কে জানে কত টাকা সবসুদ্ধ আছে! থলিটা ত অন্ততঃ ছয় সের ভারি—যদি সবই রূপার টাকা থাকে, তবে পাঁচ শতের কাছাকাছি। হ্যাঁ, তবে যদি উহার মধ্যে মোহর থাকে—কতগুলা মোহর আছে কে জানে! আচ্ছা, যদি সব গুলাই মোহর হয়—যদিও তাহা অসম্ভব—তথাপি হিসাব করিয়া দেখিতে ক্ষতি কি? রূপার টাকার অন্ততঃ কুড়িগুণ মূল্য ত হইবে—দশ হাজার টাকা। আর ঐ খেরো বাঁধা দপ্তরে, নোট আছে কি? না কেবল বাজে কাগজ? যদি নোট থাকে—কে জানে কত টাকার নোট। [illegible]

...ই হয়, তবে লক্ষ টাকা হইতেও আটক নাই।—রাখাল এই-... ...রতে লাগিল, আর তাহার শোণিত ক্রমে উষ্ণ হইতে উষ্ণতর হইয়া মস্তিষ্ককে জ্বালাময় করিয়া তুলিল।

এইরূপে দেড়ঘণ্টা কাটিল—ঘড়িতে তখন সাড়ে তিনটা। বৃষ্টি বোধ হয় থামিয়া গিয়াছে, বায়ুর শব্দও আর শুনা যাইতেছে না। অত্যন্ত গরম বোধ হওয়াতে রাখাল উঠিয়া একটা দরজা খুলিয়া দিল। শীতল বায়ু আসিয়া তাহার মুখে চোখে লাগিতে লাগিল। আরাম পাইয়া সে আরও একটু বাহিরে গিয়া দাঁড়াইল। আকাশের পানে চাহিয়া দেখিল, নক্ষত্র ফুটিয়াছে—কিন্তু শেষরাত্রি বলিয়া তেমন জ্যোতি আর নাই। ঐ, কিছুদূরে, যেখানটা খুব অন্ধকার জমিয়াছে, সেখানে দুইটা বড় বড় আমগাছ আছে, উহার আড়ালেই রাখালের বাসা। মৃদু শীতল বায়ু তাহার সর্ব্বাঙ্গ হইতে উত্তাপ যেন মুছিয়া মুছিয়া লইতে লাগিল। রাখাল ক্রমে প্রকৃতিস্থ হইল। লক্ষটাকার স্বপ্ন তখন বাতুলের কল্পনা বলিয়া তাহার মনে হইল। ভাবিল চারি পাঁচ শত টাকা আছে—যতদিন অন্য একটা চাকরি-বাকরি না যুটে, ততদিন কোনও ক্রমে কাটাইয়া দিতে পারিব।

এই সময় টেলিগ্রাফের ঘণ্টা টং টং করিয়া বাজিয়া উঠিল। রাখাল গিয়া কল ধরিল—এবং একটু পরেই হাঁকিল—"মহাবীর সিং—এ মহাবীর সিং—উঠো উঠো—ফতুয়া মালগাড়ী ছোড়া।"

মহাবীর সিং উঠিয়া বসিল। একটি হাই তুলিয়া, তুড়ি দিয়া বলিল—"কৌন নম্বর বাবু?"

"ছাব্বিশ নম্বর।"

"গাড়ীতো নেহি কাটেগা?"

"নেহি।"

দ্বিতীয়বার হাই তুলিয়া, তুড়ি দিয়া, স্খলিত পাগড়ি মাথায় ভাল করিয়া বাঁধিতে বাঁধিতে মহাবীর সিং সিগন্যাল ফেলিবার জন্য বাহির হইয়া গেল। রাখাল এই সুযোগটির প্রতীক্ষায় ছিল। সে বাহির হইবামাত্র, দেরাজ খুলিয়া, থলি ও দপ্তর বাহির করিয়া, আলোয়ানের ভিতর লুকাইয়া রাখাল দ্রুতবেগে আপনার বাসায় গিয়া উপস্থিত হইল। শয়নকক্ষের তালা খুলিয়া, আলো জ্বালিয়া, থলিটির মুখ শিথিল করিয়া, বিছানার উপর উবড় করিয়া ধরিল। যাহা বাহির হইল—সবই ...—...—...

হলুদের আভা নাই। শীতল বাতাস খাইয়া রাখাল ... ... থাকুক—একটি নৈরাশ্যের দীর্ঘ নিঃশ্বাস কিন্তু পড়িল।

তখন রাখাল বিছানায় বসিয়া দপ্তরটির দড়ি খুলিতে লাগিল। সে দড়ি কি সহজে খুলে? খানিকটা খুলে—আবার একটা গ্রন্থি বাহির হয়। যাহা হউক, অনেক কষ্টে রাখাল সেই খেরুয়ার আবরণ উন্মোচন করিল। বাহির হইল কেবল হিজিবিজি লেখা কাগজের রাশি—কোথায় বা নোট, কোথায় বা লক্ষ টাকা! অনেক গুলা চিঠিপত্র—কতক নূতন কতক পুরাতন—ছেঁড়া ছেঁড়া খবরের কাগজ—আর দুই খানা মোটা মোটা খাতা। রাখাল দেখিল, খাতাগুলায় বাঙ্গলা লেখা, ছিন্ন সংবাদপত্রেও বঙ্গভাষা।—একখানা খামে দেখিল ইংরাজিতে ঠিকানা লেখা রহিয়াছে—

শ্রীশ্রীমোহান্ত ভজনানন্দ গিরি,
তিন্‌তারিয়া মঠ
মহাদেওপুর পোঃ,
ভায়া সিরাথ্, ই, আই, আর।

রাখাল তখন অস্পষ্টস্বরে বলিল—"স্বামীজি দেখ্‌ছি—বাঙ্গালী। আমি ভেবেছিলাম—খোট্টা।"—খাতা দুইখানি পরীক্ষা করিয়া দেখিল—তাহা গ্রন্থাকারে লিখিত। রাখাল একটু বিদ্রূপের হাসির সহিত অস্ফুটস্বরে বলিল—"ও বাবা! বড় কেউকেটা নয়—বাঙ্গলা গ্রন্থকার! কল্‌কাতায় যাওয়া হচ্ছিল কি বই ছাপাতে না কি?"—বলিতে বলিতে একখানি খাতার প্রথম পৃষ্ঠা খুলিয়া দেখিল, লেখা আছে—"আত্মজীবন চরিত—প্রথম খণ্ড—গার্হস্থ্য জীবন।" অপরখানির প্রথম পৃষ্ঠায় লেখা আছে—"দ্বিতীয় খণ্ড—সন্ন্যাস জীবন।"

এমন সময় ষ্টেশনে ঢং ঢং করিয়া ছাব্বিশ নম্বরের দোসরা ঘণ্টা পড়িল। এখনি সিগ্‌ন্যালম্যান গ্রীণ দিবার জন্য হুকুম চাহিবে। রাখাল তাড়াতাড়ি টাকাগুলা থলিতে ভরিয়া, দপ্তরটা যেমন তেমন করিয়া জড়াইয়া, তোরঙ্গের ভিতর পূরিয়া চাবি বন্ধ করিল। ঘরের দ্বারে তালা বন্ধ করিয়া, দ্রুতপদে ষ্টেশনে গিয়া উপস্থিত হইল।

* * * * *

প্রভাত হইল। বখ্‌তিয়ারপুর হইতে প্যাসেঞ্জার ছাড়িল—এই গাড়ীতে মোকামার পুলিস প্রভৃতি আসিয়া পৌঁছিবে। রাখাল খালাসী পাঠাইয়া বড় বাবকে ডাকিয়া আনাইল।

[illegible] হইতে মড়া নামিয়াছে, এ সংবাদ ইতিমধ্যেই চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া [illegible] তামাসা দেখিবার জন্ত বাজারের অনেক লোক ষ্টেশনে আসিয়াছে। [illegible] বাহির হইয়া গেলেই তারা পিল্ পিল্ করিয়া প্ল্যাটফর্ম্মে ঢুকিয়া পড়িল। খালাসীরা মাঝে মাঝে হট্ যাও—হট্ যাও করিয়া তাহাদের উপর তর্জ্জন গর্জ্জন করিল, কিন্তু কে শোনে!

পার্শেল গুদাম্ খুলিয়া, মৃতদেহকে বাহিরে আনিয়া রাখা হইল। ওয়েটিং রুম হইতে খালাসীরা খানকতক চেয়ার আনিয়া মৃতদেহের নিকট স্থাপন করিল। দারোগাবাবু, ষ্টেশনের বাবুরা উপবেশন করিলেন। পুলিসের অনুরোধক্রমে ডাক্তারবাবু তাহার সর্ব্বাঙ্গ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলেন—কোথাও কোনও আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেল না। স্বাভাবিক মৃত্যু বলিয়া ডাক্তারবাবু তখন মত প্রকাশ করিলেন।

দারোগা বলিল—"সন্দেহজনক কিছু নাই ত?"

ডাক্তার বলিলেন—"না সন্দেহজনক কিছু নাই।"

"তবে সার্টিফিকেট লিখিয়া দিন।"

ডাক্তারবাবু কাগজ কলম আনাইয়া, যথারীতি সার্টিফিকেট লিখিয়া দিলেন যে স্বাভাবিক কারণে মৃত্যু হইয়াছে।

দারোগার আজ্ঞানুসারে একজন কনেষ্টবল তখন সন্ন্যাসীর কোমর হইতে চাবি অনুসন্ধান করিয়া, তোরঙ্গটি খুলিল। সমস্ত জিনিষপত্রের মধ্যে বহু গবেষণাসত্ত্বেও সন্ন্যাসীর নাম ধামের কিছুই কিনারা হইল না। কেবল, বাটুয়ার মধ্যে টিকিটখানি যাহা পাওয়া গিয়াছিল, তাহা হইতে এই মাত্র নির্ণয় হইল, সন্ন্যাসী সিরাথু হইতে কলিকাতা যাইতেছিল। বাটুয়া হইতে টিকিট ছাড়া নগদ দশটাকা কয়েক আনাও বাহির হইল। দারোগা বলিলেন—"ভালই হইল, ইহাতে দাহকার্য্য সমাধা হইবে—নহিলে সরকার হইতে খরচটা লাগিত।"

মৃতদেহকে দাহ করে কে? দারোগা সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ বাবাজী কোন দেশের লোক বলিয়া বোধ হয়?"

রাখাল শুনিয়াই বলিয়া উঠিল—"বাঙ্গালী"—বলিয়াই তাহার মনে হইল—কেন বলিলাম, বলাটা ভাল হয় নাই।

দারোগা জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেমন করিয়া জানিলেন বাঙ্গালী?"

রাখাল একটু থতমত খাইয়া বলিল—"কি জানি, তবে মুখ দেখিয়া মনে হইয়াছিল—বোধ হয় বাঙ্গালী। মুখটা যেন বাঙ্গালী ধরণের।"

এই কথা বলিতেই উপস্থিত সকলে একটু মনো[illegible]
মুখের পানে চাহিল। বাজারের একজন মহাজন [illegible]
বলিয়া উঠিল—"এ সন্ন্যাসী কি আমাদের ছোটবাবুর ভাই? দুজনের মুখ ঠিক এক রকম।"

সকলে তখন পর্য্যায়ক্রমে রাখালের ও মৃত সন্ন্যাসীর মুখের পানে চাহিতে লাগিল। অপর একজন মহাজন বলিল—"ঠিক বলিয়াছ সাও-জি। মাথায় জটা ও মুখে দাড়ি না থাকিলে, ঠিক আমাদের ছোট বাবুর মত দেখাইত।"

বড় বাবু বলিলেন—"দুজনের বয়স, গায়ের রঙ প্রায় একই রকম। মুখের ছাঁচও কতকটা মেলে।"

ডাক্তারবাবু বলিলেন—"হ্যাঁ—বেশ মেলে। কপাল, ভুরু, নাক, দুজনের একই রকম। কেবল, রাখালবাবুর ঠোঁট—সন্ন্যাসীর চেয়ে কিছু পাৎলা। দাড়ির কাছটাও মেলে।"

দারোগা তখন হা হা করিয়া হাসিয়া বলিলেন "ছোটবাবু—সন্ন্যাসী যদি আপনার ভাই-ই হয়, তবে আপনিই এই দাহকর্ম্মের ভার নিন্ না। আমি কোথায় এখন লোক খুঁজিয়া বেড়াইব?"

অনেকে হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। রাখাল, না—না—বলিয়া সলজ্জ-ভাবে ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

রাখাল মরিল।

দ্বিপ্রহরে পানিপাঁড়ে ও ভৃত্য চলিয়া যাইবার পর, রাখাল সদর দরজায় খিল বন্ধ করিয়া, শয়নকক্ষের জানালা বন্ধ করিয়া, তোরঙ্গটি খুলিয়া সন্ন্যাসীর থলিটি বাহির করিল। শব্দ না হয়, এমন সাবধানতার সহিত, টাকাগুলি বাহির করিয়া, বিছানায় বসিয়া গণিতে লাগিল। কুড়ি কুড়ি টাকার থাক সাজাইয়া, ঠিক পঁচিশটি থাক হইল—পাঁচশত টাকা।

রাখালের মনটা, অনেক দিন পরে আজ বেশ প্রফুল্ল। সে ভাবিতে লাগিল, এই পাঁচশত টাকা এবং পোষ্ট আফিসে যাহা আছে এবং প্রভিডেণ্ট ফণ্ড হইতে যাহা পাওয়া যাইবে—তাহাতে তাহার তিন চারি বৎসর বেশ কাটিয়া যাইবে—কাহারও গলগ্রহ হইতে হইবে না। কাশী দশাশ্বমেধঘাটে সন্ন্যাসী

...ও করিতে হইবে না, এই তিন চারি বৎসরে একটা কোনও ...সে জুটাইয়া লইতে পারিবে না?— অবশ্যই পারিবে। কিম্বা, এই ...ইয়া কোনও একটা ছোটখাট দোকান করিলেও হয়। দোকান ফাঁদিয়া, শেষে মূলধন নষ্ট হইবে না ত? দোকান না হউক, কোনও রূপ ব্যবসায়—চালানী কারবার। এই খুশ্রুপুরেই বেশ ভাল খাঁটি সস্তা ঘি পাওয়া যায়—হাজার খানেক টাকার সেই ঘৃত যদি কিনিয়া কলিকাতায় লইয়া যাওয়া হয়, তবে খরচ খরচা—বাদ কোন দুইশত টাকা মুনাফা না থাকে! লাভ কিছু কম হইতে পারে, টাকাটা নিশ্চয়ই ডুবিবে না কিম্বা, কয়লার খনিতে গিয়া ঠিকাদারী লওয়া যাইতে পারে। কিম্বা, কলিকাতা হইতে পাঁচ সাত বাক্স তৈয়ারী জামা, কোট, বডিস প্রভৃতি ও বাঙ্গালী পছন্দ পাড়ের ধুতি শাড়ী এই সব আনিয়া, লাইনের প্রত্যেক ষ্টেশনে নামিয়া নামিয়া একদিন করিয়া থাকিয়া, বিক্রয় করিলেও বেশ লাভ হইতে পারে। রেলের ছোট ষ্টেশনে যে সকল বাঙ্গালী কর্ম্মচারীরা থাকে—তাহারা কাপড় জামার অভাবটা বড়ই অনুভব করে। স্থানীয় দোকানে পছন্দমত জিনিষ পাওয়া যায় না—এক, কলিকাতা হইতে আনাইয়া লওয়া, তাহাও সব সময় সুবিধা হয় না—এবং নিজের চোখে দেখিয়া জিনিষ পছন্দ করার উপায় থাকে না। রাখাল ভাবিতে লাগিল—তাই করিব—চাকরি আর করিব না। চাকরি করিয়া কে কবে বড় লোক হইয়াছে? হ্যাঁ, ব্যবসায় করিয়া অনেকে বড়লোক হইয়াছে বটে!

টাকাগুলি থলিতে আবার ভরিয়া, তোরঙ্গে রাখিয়া রাখাল একটু নিদ্রার আয়োজন করিল। কিন্তু বিছানায় শুইয়া, চক্ষু বুজিয়া সে কেবল কল্পনায় নিজের ব্যবসায়ের উন্নতি এবং সঙ্গে সঙ্গে জমিদারী ক্রয়, বাগানওয়ালা দ্বিতল ত্রিতল অট্টালিকা নির্ম্মাণ প্রভৃতি হৃদয়গ্রাহী কার্য্যে এক ঘণ্টা কাটাইয়া দিল। তাহার মাথা গরম হইয়া উঠিল—নিদ্রালাভের আশু সম্ভাবনা রহিল না।

নিজের পাগলামিতে নিজে লজ্জিত হইয়া রাখাল তখন উঠিয়া বসিল। সোরাই হইতে জল ঢালিয়া মাথা, কাণ ও মুখ ধুইয়া ফেলিল। একটি সিগারেট ধরাইয়া ভাবিল—একখানা বই টই পড়ি—পড়িতে পড়িতে ঘুম আসিবে এখন। বটতলার একখানা ডিটেক্টিভ উপন্যাস হাতে করিয়া তুলিয়া ভাবিল—এ পড়া বই, আবার পড়িতে ভাল লাগিবে কি? তার চেয়ে

বরং সন্ন্যাসীঠাকুরের আত্মজীবনচরিত খানাই পড়া য[illegible] না লোকটা কে—কি প্রকৃতির মানুষ ছিল।

এই ভাবিয়া, তোরঙ্গ হইতে খেরুয়া বাঁধা দপ্তরটি বাহি[illegible] শুইয়া শুইয়া রাখাল সেটি খুলিল।

প্রথমে চিঠিগুলা খাম হইতে বাহির করিয়া দেখিল—সবগুলা হিন্দী চিঠি, একখানাও পড়িতে পারিল না।

ছিন্ন সংবাদপত্র একখানি হাতে তুলিয়া দেখিতে লাগিল। হঠাৎ, চারিদিকে লালকালীর চিহ্ন দেওয়া একটা অংশে তাহার দৃষ্টি পতিত হইল। সে অংশ মফঃস্বল সংবাদের অন্তর্গত। রাখাল পাঠ করিল :—

নদীয়া—বাগুলিপাড়া। বিগত ২৭শে কার্ত্তিক অত্রত্য স্বনামধন্য জমিদার ৺নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের আদ্যশ্রাদ্ধক্রিয়া মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র বহুবৎসর যাবৎ নিরুদ্দিষ্ট থাকায়, তদীয় কনিষ্ঠপুত্র শ্রীমান দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় শ্রাদ্ধাধিকারী হইয়াছিলেন। বৃষোৎসর্গ ও দানসাগর যথারীতি সম্পন্ন হইয়াছিল। দিবসত্রয়-ব্যাপী কাঙ্গালীভোজনে অন্যূন দুই সহস্র কাঙ্গালী ভোজন করিয়াছে। নবদ্বীপ, ভট্টপল্লী, বিক্রমপুর প্রভৃতি স্থানের বড় বড় অধ্যাপক পণ্ডিতগণ নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়া সভার শোভাবৃদ্ধি করিয়া ছিলেন।

রাখাল কাগজখানি পরীক্ষা করিয়া দেখিল, ইহা দুই বৎসরের পুরাতন।

আর একখানি ছিন্ন সংবাদপত্র পরীক্ষা করিতে করিতে রাখাল দেখিতে পাইল, বিজ্ঞাপন-স্তম্ভের ভিতর নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটির চতুর্দ্দিক রেখাঙ্কিত—

১০০৲ পুরস্কার।

গত বৃহস্পতিবার ১৯শে পৌষ মদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান ভবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় গৃহ হইতে নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছে। শ্রীমানের বয়ঃক্রম ১৪ বৎসর, শ্যামবর্ণ একহারা চেহারা, মাথায় বড় বড় চুল, গায়ে কালো সার্জ্জের কোট, নেবুরঙের ডুরিদার শাল, পরিধানে দেশী লালফিতা পাড় ধুতি, পায়ে চিনাবাড়ীর স্প্রিংদার বার্ণিস জুতা। যদি কেহ উক্ত বালকের সন্ধান বলিয়া দিতে পারেন তবে তিনি উপরে লিখিত মত পুরস্কার পাইবেন।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
জমিদার—বাগুলিপাড়া গ্রাম
পোঃ দেওয়ানগঞ্জ—জেলা নদীয়া।

অনুসন্ধান করিয়া রাখাল দেখিল, সেখানি ১৬ বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত একখানি "বঙ্গবাসী।" মনে মনে বলিল—"বাবাজী দেখছি ছেলেবেলায় বাড়ী থেকে পালিয়ে এসে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। বড় লোকের ছেলে। এতদিন পরে বোধ হয় বাড়ী যাওয়া হচ্ছিল—কেন? বিষয় সম্পত্তি দখল করবার জন্য না কি? জীবনচরিতটা তা হলে ত ভাল করে পড়তে হ'ল।"

রাখাল তখন অলসভাবে জীবনচরিতের পাতা গুলা উল্টাইতে লাগিল। দেখিল, প্রথম খণ্ডটা গল্পাকারে বিবৃত দ্বিতীয় খণ্ডটা সমস্ত [illegible]

[illegible] প্রত্যেক তারিখের উল্লেখ নাই। মাঝে মাঝে ফাঁক্ আছে। [illegible] উল্টাইতে রাখাল বলিল—"বাবা! এ যে মহাভারত [illegible]। [illegible]খেছে ত কম নয়! এত কে পড়ে? বরং শেষ দিকটা দেখা যাক্—কি উদ্দেশে বাবাজী কলকাতা যাচ্ছিলেন।"

দ্বিতীয় খণ্ডের শেষাংশ পড়িতে পড়িতে রাখাল দেখিল, একমাস পূর্ব্বে তারিখ দেওয়া, নিম্নলিখিত কয়েক ছত্র লেখা আছে—

"স্থির করিয়াছি এ ব্যর্থ সন্ন্যাস পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় গৃহস্থাশ্রমে ফিরিয়া যাইব। কিন্তু একটু দেখিয়া শুনিয়া যাইতে হইবে। দেখিবার প্রধান বিষয়, আমার স্ত্রী বাঁচিয়া আছে কি না এবং যদি বাঁচিয়া থাকে, তবে সে কি অবস্থায় আছে। যখন গৃহত্যাগ করিয়াছিলাম, তখন সে অষ্টমবর্ষীয়া বালিকা—এখন সে চতুর্ব্বিংশতি বর্ষীয়া পূর্ণ যুবতী। এই দীর্ঘকাল সে কি নিজেকে পবিত্র রাখিতে পারিয়াছে? ইহা ত সহসা বিশ্বাস হয় না। সুতরাং স্থির করিয়াছি, বাড়ী যাইব। এই ছদ্মবেশে গিয়া, কিছু দিন গ্রামে থাকিব—ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইব। সকল সংবাদ জানিতে পারিব। মঠের কি বন্দোবস্ত করিব তাহাই ভাবিতেছি।"

পাঠশেষ করিয়া রাখাল কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। বিছানায় একটু উচ্চ হইয়া উঠিয়া বালিসের উপর বামহস্তের ভর দিয়া, রাখাল গভীর চিন্তায় মগ্ন হইল।

কিছুক্ষণ এইভাবে অতিবাহিত হইলে, একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, আবার রাখাল চিৎ হইয়া শয়ন করিল। দ্বিতীয় খণ্ড খানির একস্থান হঠাৎ খুলিয়া এই অংশটি পাঠ করিল—

"অদ্য বঙ্গবাসীতে দেখিলাম, গৃহস্থাশ্রমে যিনি আমার পিতা ছিলেন, তিনি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। মহাসমারোহে তাঁহার শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই সংবাদটি পাঠ করিয়া আজ আমার বুকে দারুণ ব্যথা বাজিয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বকথা সমস্ত মনে পড়িতেছে। কত সময় ভাবিয়াছি, গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া আমি কি ভাল করিয়াছিলাম? আমার আধ্যাত্মিক জীবন যেরূপ পরিণতি প্রাপ্ত হইবে আশা করিয়াছিলাম, তাহার কিছুই ত হইল না। এদিকে পুরাদস্তর বিষয়ী হইয়া উঠিয়াছি। মঠের বিষয়-সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতেই অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়। নিজের চরিত্রও নিষ্কলঙ্ক রাখিতে সমর্থ হই নাই। তবে কেন এ ভূতের বোঝা বহিয়া মরি? কোনও রিপুই দমন করিতে কৃতকার্য্য হই নাই। সেদিন ভৃত্য আমার তামাকু দিতে বিলম্ব করিয়াছিল, এই কারণে ক্রোধে অন্ধ হইয়া তাহাকে খড়ম ছুড়িয়া মারিয়াছিলাম। গতবৎসর আমাদের এষ্টেটের তহশিলদার যখন একহাজার টাকা তছ্‌রুপ করিয়া পলায়ন করে, তখন সেই হাজার টাকার শোকে দুই তিন দিন ভাল করিয়া আহার করিতে পারি নাই। উৎকৃষ্ট পুরাতন বাসমতী চাউলের অন্ন, সুগন্ধি গব্যঘৃত ভিন্ন আমার আহার হয় না। দুই সের দুগ্ধ জাল দিয়া একসের করিয়া, সমস্ত দিনে তাহার উপর যে সরটুকু

পড়ে, সেই সব চিনি মিশাইয়া বৈকালে আহার করিয়া থাকি। আমি মোহান্ত? লোকে পরোক্ষে ভজনানন্দ স্থলে আমাকে ভোজনানন্দ বলিয়া উপহাস করে, শুনিয়া আমি কত রাগ করিয়াছি, কিন্তু কথাটা ত বড় মিথ্যা নহে।—আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছি, মোকদ্দমা জিতিবার জন্য জাল দলিল পর্য্যন্ত নিজের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত করাইয়াছি। কোন পাপটা করি নাই? আমার জীবনে ধিক্।"

তাহার পর রাখাল পড়িয়া যাইতে লাগিল। পড়িতে পড়িতে দেখিল, মঠের জীবনে সন্ন্যাসীর ধিক্কার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে। শেষ হইবার কিছু পূর্ব্বে পড়িল—

"আজ বঙ্গবাসী আসিয়াছে। খুলিয়া অভ্যাস মত প্রথমেই মফঃস্বলস্তম্ভ অন্বেষণ করিলাম, বাগুলিপাড়ার কোনও সংবাদ আছে কিনা। দেখিলাম, আছে—নিদারুণ সংবাদই আছে। আমার কনিষ্ঠভ্রাতা, দেবেন্দ্র আর ইহ-লোকে নাই। আমি যখন গৃহত্যাগ করিয়াছিলাম তখন সে একবৎসরের শিশু। ভাবিতাম, আমি চলিয়া আসিয়াছি, সে ত আছে। তাহার দ্বারাই পিতার বংশরক্ষা হইবে, বিষয়রক্ষা হইবে। সে গেল—এখন আমার বৃদ্ধা জননীকে কে সান্ত্বনা দিবে? কে সংসার দেখিবে? আমার পৈতৃক সম্পত্তি—বাৎসরিক লক্ষাধিক টাকা মুনাফার সম্পত্তি—কে ভোগ করিবে? আমি কি চিরদিন এই মঠে বসিয়া এই বিড়ম্বিত জীবন যাপন করিতে থাকিব? কোথায় সাধন, কোথায় ভজন? কেবল বিষয়—বিষয়—বিষয় চিন্তা—রসনার সেবা—এই মাটীর দেহের সহস্র বিধানে পরিচর্য্যা—আর ভণ্ডামি। যদি বিষয়-চিন্তাতেই জীবন অতিবাহিত করিতে হয়, তবে আমার পৈতৃক বিষয়—যাহা এই মঠের বিষয়ের অন্ততঃ বিশগুণ—সে বিষয় কি অপরাধ করিয়া-ছিল? কি করিব? এ সব ছাড়িয়া ছুড়িয়া বাড়ী ফিরিয়া যাইব কি? আজ সমস্ত দিন তাহাই চিন্তা করিতেছি—কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারি-তেছি না।"

ইহা দুইমাস পূর্ব্বে লিখিত। দুইতিন পৃষ্ঠার পরেই লেখা শেষ হই-য়াছে, সন্ন্যাসী নিজ পত্নীর চরিত্র পরীক্ষা করিবার মানসে, গ্রামে গিয়া কিছু দিন ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইবার সঙ্কল্প পূর্ব্বোদ্ধৃত মত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

রাখাল, খাতা বন্ধ করিয়া, বিছানা হইতে উঠিল। সেই স্বল্পায়তন কক্ষ-খানির মধ্যে পদচারণা করিতে করিতে অনেকক্ষণ চিন্তা করিল। এক এক-বার খোলা জানালার কাছে দাঁড়াইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া থাকে—কিন্তু তাহার চক্ষু বাহিরের কিছুই দেখিতে পায় না। একবার তাহার মুখে যেন বিষাদের ছায়া ঘনাইয়া আসে—আবার যেন সে আশঙ্কায় অভিভূত হইয়া পড়ে—আবার একটু প্রফুল্লভাব ধারণ করে—তাহার মুখে যেন একটা বিদ্রূপের হাসি ফুটিয়া উঠে।

প্রায় এক ঘণ্টাকাল অতীত হইলে—রাখাল আবার শয্যার উপর বসিল। নিজ অবনত মস্তক দুই হস্তে ধারণ করিয়া মনে মনে বলিল—

"আমি যাব—এ বিষম প্রলোভন দমন করা আমার সাধ্য নয়।—লক্ষ-টাকা আয়ের জমিদারী—যুবতী স্ত্রী—একটা মিথ্যা কথার দ্বারাই আমি লাভ করতে পারি। যে এতক্ষণ চিতায় পুড়ে ছাই হয়ে গেছে—তার বয়স, তার গায়ের রং, তার চেহারা—সমস্তই আমার মত। ষোলবৎসর অদর্শনের পর, কার সাধ্য আমার জুয়াচুরি ধরে? তার জীবনচরিত আমার হাতে—তাতে প্রত্যেক খুঁটিনাটি কথাটি পর্য্যন্ত লেখা আছে। সে খানা আমি মুখস্থ করে নিলে, কার সাধ্য আমায় সন্দেহ করে? রাখাল, তুমি মর—তুমি মর—মরে' ভবেন্দ্র হয়ে জন্ম গ্রহণ কর।" ক্রমশঃ

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

অকৃতজ্ঞ।

১

তুই আছিলি ক্ষুদ্র অনাদৃত কোথা শিশু রোরুদ্যমান্
আমি কত না যতনে লইনু তুলিয়া—দিনু এ হৃদয়ে স্থা ।
আমি মণ্ডিত করি বক্ষে
দিনু সঞ্চিত মধু গোপনে
এই কুসুমপেলব কক্ষে
ছিলি ফুলসৌরভ স্বপনে,—
কত মলয় মন্দ আনি সুগন্ধ রচিত ছন্দ স্বর্গ
কত সুখ হিন্দোলে আন্দোলি বুকে দিছি তোরে কত অর্ঘ্য।

২

ওরে লক্ষ আশায় বক্ষবাসায় রাখিয়া বন্ধ তোরে
আমি আছিনু অন্ধ, নয়নানন্দ, দিবস নিশীথ ধরে';
এই ঝঙ্কৃত পিককণ্ঠে
এই রঞ্জিত শশীলাস্যে
এই উজ্জ্বল কম গণ্ডে
এই প্রেক্ষণ ক্ষণ হাস্যে,
হয়ে নৃত্যদোদুল্ ছন্দে অতুল মৃদুল অনিলভরে,—
শেষে তিল তিল করি চয়ন করিলি মরণ আমার তরে?

৩

ওরে তোরে ছাড়ি আমি যাইনি' যে কোথা, ক্ষণেকের' তরে কখন'
যবে গেছি দেবপায়, সে-ও তোরে ল'য়ে—বক্ষে আছিলি তখন';
যবে ঝঞ্ঝা আহত হয়ে
কত লুটায়েছি দুখ পাথারে
তবু তোরে সে হৃদয়ে লয়ে
আমি জিতেছি হা'রের মাঝারে,—
এবে ধূলিলুণ্ঠিত সব বণ্টিত এই কুণ্ঠিত নিঃস্বে•
বুঝি ফেলে যাবে নবসুখসন্ধানে—আরেক নূতন বিশ্বে?

৪

ওগো যাও তবে তুমি ফুরায়েছে মোর লুকানো বক্ষ-অমিয়
আমি তব তরে সব দিয়া যে রিক্ত—কেমনে বুঝাব'ও প্রিয় ?
তব নখর ভীষণ ভিন্ন
সব পাঁপড়ি ঝরিছে আজি
এযে তোমারি দত্ত চিহ্ন
তাই বক্ষে উঠিছে বাজি!
তবু জনম জনম ফুল হয়ে আমি আসিব রে অকুণ্ঠ
আর দংশন ক্ষত বক্ষে বাঁধিয়া যাপিব জীবন-যজ্ঞ!

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

মহোষধ-পরিণয়।

(জাতক অবলম্বনে)

সর্ব্বগুণালঙ্কৃত রাজকুমার মহোষধ ষোড়শবর্ষে পদার্পণ করিতেই তাঁহার যশঃ রাজ্যমধ্যে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। রাজ্যের আবালবৃদ্ধবনিতা তাহাদের রাজকুমারের গুণের কথা সহস্রমুখে কীর্ত্তন করিতে লাগিল। যেখানে দশজন একত্র হয়, যেখানে পাঁচজন বসে উঠে, সেই খানেই রাজকুমারের গুণের কথা—প্রশংসার কথা হইতে থাকে। যেখানে আর্ত্তের পরিত্রাণ, নিরন্নের অন্নসংস্থান, নিরাশ্রয়ের অন্নদান ব্যাপার ঘটে, সেইখানেই নবীন রাজকুমারের কর্ত্তৃত্বের কথা শুনা যায়। গ্রামে ব্যাঘ্রের উৎপাত হইল, প্রজাদল আসিয়া সংবাদ দিল, প্রজাবৎসল রাজকুমার—অব্যর্থলক্ষ্য রাজকুমার নিজে গিয়া সেখানে ব্যাঘ্রবধ করিয়া গ্রাম নিরুপদ্রব করিয়া আসিলেন। দস্যুভয়ে রাজ্য-প্রান্ত উৎপীড়িত হইল, দূত আসিয়া সংবাদ দিল, উৎপীড়িত প্রজা পুত্রকলত্র লইয়া আসিয়া রাজপুরীতে আশ্রয় চাহিল, রাজকুমার সসৈন্যে গিয়া দস্যুদল পরাস্ত ও বন্দী করিয়া আনিয়া উপদ্রুত স্থানে শান্তিস্থাপন করিলেন। দুষ্ট রাজকর্ম্মচারীর অত্যাচারে প্রজা হাল-গরু লইয়া, ধনরমণী লইয়া তিষ্ঠিতে পারে না, আসিয়া দয়াবান রাজকুমারের আশ্রয় চাহিল, শরণাগতরক্ষক, সুবুদ্ধি রাজকুমার কৌশলে ক্ষমতাশালী কর্ম্মচারীকে সরাইয়া তাহাকে এমন শাসন করিয়া দিলেন যে সে আর মাথা তুলিতে সমর্থ হইল না। পণ্ডিতসভায় শাস্ত্রচর্চ্চায় রাজকুমারের মীমাংসাই বিদ্বৎসমাজ মানিয়া লইতে লাগিলেন। কাজেই, ষোড়শবর্ষীয় নবীন রাজকুমার শৌর্য্যে, বীর্য্যে, দয়ায়, দাক্ষিণ্যে, শরণাগতরক্ষণে, বিদ্যাবত্তায় এমন ভাবে আপনার মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করিলেন যে প্রজাবর্গের হৃদয় অধিকার করিতে তাঁহাকে আর কোন আয়াস স্বীকার করিতে হইল না, অধিকন্তু তিনি রাজ্যমধ্যে কূপতড়াগাদিখনন, পথনির্ম্মাণ, আতুরাশ্রম স্থাপন, পান্থশালা প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কার্য্যদ্বারা তাহাদের প্রাণের সমস্ত শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিয়া লইলেন। ক্রমে তাঁহার যশঃ স্বরাজ্যের সীমা ছাড়াইয়া দিগন্তে ছড়াইয়া পড়িল।

কুমার মহোষধের জ্যেষ্ঠা ভগিনী উড়ুম্বরাদেবী দূরদেশীয় রাজার ঘরণী। দূরদেশে বসিয়াই তিনি ভ্রাতার যশঃসৌরভের আঘ্রাণ পাইতে লাগিলেন। আনন্দে তাঁহার হৃদয় উদ্বেলিত হইতে লাগিল, চক্ষু দিয়া আনন্দাশ্রু ঝরিতে লাগিল। একদিন তাঁহার শৈশবের কথা মনে হইল,—মাতৃহীন শিশু মহোষধকে তিনি ক্রোড়ে লইয়া পিতৃগৃহের অলিন্দে বসিয়া আছেন, কুলগুরু তেজঃপুঞ্জ সিদ্ধপুরুষ আসিয়া বালকের ভবিষ্যৎ মহত্ত্বের কথা বর্ণন করিতেছেন, পিতা মহারাজ, পুত্রকন্যার মুখের প্রতি চাহিয়া অজ্ঞাত আশার আশ্বাসে উজ্জ্বল-নেত্রে তৃপ্তির দীপ্তি বিকাশ করিয়া গুরুদেবের চরণরেণু মস্তকে লইতেছেন। আজ সেই সিদ্ধপুরুষের ভবিষ্যদ্বাণী সিদ্ধ হইয়াছে। উড়ুম্বরা আনন্দবেগ হৃদয়ে ধারণ করিতে না পারিয়া স্বামী রাজপদে পিতৃগৃহগমনের অনুমতি চাহিলেন। রাজা অনুমতি দিলে, কুমারোপম কুমারের যশোভাসিত, মহিম-মণ্ডিত মুখখানি দেখিয়া, প্রীতিভরে তাহাকে সস্নেহ-আশীর্ব্বাদে আরও অধিকতর উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে উড়ুম্বরাদেবী সেইদিনই পিতৃরাজ্যে যাত্রা করিলেন।

(২)

রাজকুমারী উড়ুম্বরা আজ কয়েকদিন পিতৃগৃহে আসিয়া পঁহুছিয়াছেন। ভ্রাতাকে শত শত আশীর্ব্বাদে সম্বর্দ্ধিত করিয়া, শিরশ্চুম্বনাদিতে অভিনন্দিত করিয়া, হৃদয়ের আনন্দ ও তৃপ্তির বেগ প্রশমিত করিতে তাঁহার কয়েক দিন কাটিয়া গেল। তাহার পর তাঁহার দৃষ্টি অন্য দিকে পড়িল। তিনি দেখিলেন পিতা মহারাজ পুত্রের শৌর্য্যে বীর্য্যে, মহানুভবতায় নির্ভর করিয়া রাজ্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। ভ্রাতা অসাধারণ ধীশক্তিতে নবীন যুবক হইয়াও রাজ্যের সকল প্রকার মঙ্গলসাধনে সোৎসাহে নিযুক্ত আছেন। প্রজার ধন, প্রাণ, শান্তি নিরুপদ্রব হইয়াছে, শত্রু বিধ্বস্ত হইয়াছে, দুর্নীতি সম্পূর্ণ দমিত হইয়াছে; কিন্তু রাজার অন্তঃপুর নাই, অন্তঃপুরের আনন্দ নাই। মহারাণীর স্বর্গারোহণের পর হইতে মহারাজ শ্রীসৌন্দর্য্যসম্পন্না সুশীলা অগ্রজাতা কন্যাকে সম্প্রদান করিয়া নিশ্চিন্ত মনে পুত্রের শিক্ষাকার্য্যে মন দিয়াছিলেন, সেই পুত্র সেই ভবিষ্যৎ আশার আশ্রয়স্বরূপ শিশুটি আজ তাঁহার সকল আশা পূর্ণ করিয়া কৌমার ও যৌবনের সন্ধিস্থলেই ভুবনবিশ্রুত যশের অধিকারী হইয়াছে, কাজেই মহারাজের মনে আর কোন উদ্বেগ নাই, চিন্তা নাই, ক্ষোভ নাই এখন তিনি নামমাত্র রাজদণ্ড ধারণ করিয়া আছেন, কুমারই যৌবরাজ্যে অধিষ্ঠিত হইয়া রাজ্যপরিচালন করিয়া তাঁহাকে অনন্যমনে আত্মচিন্তার অবসর দিয়াছেন। রাজকুমারী উড়ুম্বরা এই ভাব বুঝিতে পারিয়া একদিন পিতাকে বলিলেন, আমার পিতৃবংশ চিরদিনই যশোমানে গর্ব্বিত। সে বংশের পুত্র হইয়া আমার ভাইটি যে যশস্বী হইয়াছে, তাহা বড় বেশী কথা নহে; কিন্তু এই চিরযশস্বী রাজবংশের বংশসূত্র ছিন্ন হইয়া যায়, ইহা কাহারও অভিপ্রেত নহে, অতএব আপনি কুমারের বিবাহের উদ্যোগ করুন। সর্ব্ববিদ্যাবিৎ কুমারের দারকর্ম্ম ব্যতীত বোধ হয় আর এখন

অপর কর্ত্তব্য কিছু বাকি নাই। কন্যার কথায় বৃদ্ধ মহারাজের দৃষ্টিপথ হইতে যেন একটা আবরণ সরিয়া গেল। তিনি মন্মথোপম কুমারের যৌবন-সন্ধির সময় উপস্থিত দেখিয়া কন্যার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া বলিলেন,—গৃহলক্ষ্মীরূপিণী রাজ্যলক্ষ্মীর অংশসম্ভূতা সুলক্ষণা বধূ আনিতে আমার অসাধ নাই; কিন্তু সর্ব্ববিদ্যাবিৎ, সর্ব্বধর্ম্মবিৎ, কুমারের মতামত না জানিয়া আমি কোন কাজ করিব না। তুমি তাহাকে তোমার প্রস্তাব জানাইয়া তাহার মতামত অবগত হও এবং তদনুসারে কর্ত্তব্য নিরূপণ কর।

(৩)

প্রাতঃস্নান সমাপন করিয়া কুমার মহোষধ যখন বেশভূষা সম্পন্ন করিয়া রাজকার্য্য পরিদর্শনের জন্য অন্তঃপুর হইতে রাজসভায় যাইতেছিলেন, সেই সময়ে অলিন্দের পথে রাজকুমারী উদুম্বরা আসিয়া তাঁহাকে সস্নেহে ক্রোড়ে টানিয়া লইয়া সাদরবাক্যে মৃদুহাস্যে বলিলেন, ভাই, তোমার রাজকুলোচিত সমস্ত বিদ্যালাভ হইয়াছে, পণ্ডিতজনোচিত শাস্ত্রজ্ঞান জন্মিয়াছে, পিতৃবংশোচিত দিগন্তবিশ্রুত যশঃ অর্জ্জিত হইয়াছে এবং সর্ব্বপ্রকার আশ্রমধর্ম্মে তুমি অভিজ্ঞতা-লাভ করিয়াছ, তোমায় অধিক বলিতে হইবে না। আমি তোমার নিমিত্ত পিতার অনুমতি লইয়াছি। এইবার তুমি গৃহধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া তোমার পুত্রত্ব সফল কর, পিতৃপুরুষের ঋণশোধের উপায় কর, রাজবংশতরুর নূতন শাখাপল্লব অঙ্কুরিত কর,—বিবাহ কর।*

মহোষধ ক্ষণমাত্র চিন্তা করিয়া কর্ত্তব্য অবধারণ করিয়া লইয়া বলিলেন, "তাহাই হউক, কিন্তু আর্য্যে সুলক্ষণা মনোরমা কন্যা কোথায়?" উদুম্বরা বলিলেন,—তোমার সম্মতি হইলে কন্যা অন্বেষণ করি। মহোষধ মনে মনে চিন্তা করিলেন—অপরের আনীত কন্যা আমার মনোমত না হইতে পারে। আমি নিজেই কন্যা অন্বেষণে গমন করিব, কিন্তু পিতাকে আমার এ সংকল্প এখন জানান সঙ্গত হইবে না। এই কল্পনা করিয়া রাজকুমার তাহা ভগিনীকে জ্ঞাপন করিলেন। ভ্রাতার যুক্তিযুক্ত প্রস্তাব এবং অভিপ্রায় অবগত হইয়া উদুম্বরা তদ্বিষয়ে সম্মতা হইলেন।

(৪)

রাজধানীর উত্তর দিকে যবমহ্যক গ্রাম। গ্রামটিতে এক সময়ে বর্দ্ধিষ্ণু লোকের বাস ছিল, এক্ষণে তাহারা সকলে কৃষিজীবী হইয়া পড়িয়াছে। এখন যিনি গ্রামের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানার্হ, তিনি গ্রামের পূর্ব্বসমৃদ্ধির অবস্থায় যে শ্রেষ্ঠীবংশ সর্ব্বাপেক্ষা ধনী ও মানী ছিল, সেই বংশোদ্ভূত, কিন্তু এখন একবারে নিঃস্ব—তাঁহাকেও এখন স্বহস্তে হলকর্ষণ করিতে হয়। একদিন প্রাতে এই গ্রামের প্রান্তবর্ত্তী পথের দুই বিপরীত দিক দিয়া দুইটি পথিক আসিয়া এক ছায়াযুক্ত বৃক্ষতলে মিলিত হইল। পথিক দুইটির একটি পুরুষ, আকারপ্রকারে তাহাকে তুর্ণবায় (দরজী) বলিয়া বুঝা যায়। অপরটি

* গত সংখ্যায় মানসীতে উদুম্বরা-মহোষধ নামে যে চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা ভ্রাতাভগ্নীর এই কথোপকথনদৃশ্য। মাঃ সঃ

স্ত্রীলোক—কৃষককন্যা যবাগুভাণ্ড মাথায় করিয়া সে কোথায় যাইতেছে। বৃক্ষতলে উভয়ে উপনীত হইয়া উভয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। সেই দৃষ্টিপাতেই উভয়ে উভয়ের অপরিচিত বলিয়া বুঝিল, কিন্তু উভয়ে উভয়ের প্রতি আগ্রহান্বিত হইয়া পড়িল এবং পরস্পর আলাপে উদ্যত হইল। স্ত্রীলোকটি বালিকা, বয়ঃসন্ধিকালে নবোদ্ভিন্ন যৌবনের সকল সৌন্দর্য্য যেন একত্র করিয়া বিধাতা তাহার লাবণ্যভরা দেহ সৃষ্টি করিয়াছেন। পক্ষান্তরে যুবক তূর্ণবায় ভস্মীভূত অনঙ্গের সমস্ত সৌন্দর্য্যকে যেন আশ্রয়হীন দেখিয়া স্বদেহে আশ্রয় দিয়া রাখিয়াছে। পরস্পর দৃষ্টিবিনিময় করিতেই যিনি অলক্ষ্যে থাকিয়া সকল ক্ষেত্রে স্বীয় লীলা প্রকট করিবার এমন সুযোগ ত্যাগ করেন না,—প্রজাপতির সেই অগ্রদূত মন্মথের কৃপায় যুবক ভাবিল,—এমন সুরূপা সুলক্ষণা কন্যা নীচ-কুলসম্ভবা হইতে পারে না, যদি ইহার পাণি অপরকর্তৃক পরিগৃহীত হইয়া না থাকে, তবে ইহাকে পত্নীত্বে গ্রহণ করিলে মন্দ হয় না। কিশোরী ভাবিল, যদি অদৃষ্টতাড়নে আমায় আজ এই দশায় উপনীত হইতে হইয়া থাকে তবে এই তূর্ণবায়ও যে আমারই মত কোন উচ্চকুলসম্ভূত, ইহা নিশ্চয় বলিতে পারা যায়। এইরূপ যুবকের সহিত যদি আমার বিবাহ ঘটে, তবেই যেন এদশাতেও সুখী হইতে পারি। তখন উভয় উভয়ের অপরিচিত হওয়ায় বুদ্ধিমান তূর্ণবায় ভাবিল, কিশোরীর সহিত ইঙ্গিতে আলাপ করাই সঙ্গত, তাহাতে সে বুদ্ধিমতী কিনা তাহাও বুঝা যাইবে? এই বিবেচনা করিয়া তূর্ণবায় যুবক কিশোরীকে স্বীয় প্রসারিত হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তাহার হাত অপর কাহারও মুষ্টিগত হইয়াছে কি না? কিশোরী দেখিয়া ইঙ্গিতে বুঝিয়া স্বীয় হস্ত প্রসারিত করিয়া দেখাইল যে তাহার হস্ত অপরিগৃহীত আছে। তূর্ণবায় ইঙ্গিত বুঝিয়া নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ভদ্রে, তোমার নাম কি? কিশোরী একটু ভাবিল, মনে করিল ইনি ইঙ্গিতে আমার সপরিগ্রহতা বা অপরিগ্রহতার কথা জানিয়া লইতে আমার বুদ্ধির পরীক্ষা করিয়াছেন, ভাল আমাকেও দেখিতে হইবে ইহাঁর বিদ্যার দৌড় কত? এই বলিয়া সে উত্তর দিল,—"আমার নাম তাই যাহা অতীতে ছিল না এবং বর্ত্তমানেও নাই।" যুবক কিশোরীর উত্তর শুনিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "ভদ্রে বুঝিয়াছি,—অতীতকালে এ জগতে কেহ অমর হয় নাই, এবং একালেও কেহ অমর নাই, অতএব তোমার নাম অমরা। কিশোরী ঈষৎলজ্জিতা হইয়া বিনম্রবদনে বলিল,—হাঁ প্রভু তাই আমার নাম অমরা। যুবক তূর্ণবায় জিজ্ঞাসা করিল,—ভদ্রে, কাহার জন্য যবাগু লইয়া যাইতেছ? কিশোরী পূর্ব্বপ্রশ্নের উত্তরে যুবকের বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পাইলেও একবারে সন্তুষ্ট হইল না, সে কৌশলে প্রশ্নোত্তর করিয়া যাইতে লাগিল। সে উত্তর দিল,—প্রভু পূর্ব্বদেবতার জন্য। তূর্ণবায় হাসিয়া বলিল—বুঝিয়াছি ভদ্রে; তুমি পিতার জন্য যবাগু লইয়া যাইতেছ। পিতামাতাকেই দেবতা বলা হয়, কিন্তু স্ত্রীলোকের স্বামীই প্রথম দেবতা সুতরাং স্ত্রীলোকের পক্ষে পিতামাতাকে পূর্ব্বদেবতা বলিতে হয়। কেমন এই কি? অমরা উত্তর দিল,—হাঁ প্রভু। তূর্ণবায় জিজ্ঞাসা করিল—তোমার বাপ

কি করেন? কিশোরী তথাপি পূর্ব্বপ্রথা ত্যাগ করিল না; বলিল—এককে দুই করেন। তূর্ণবায় বলিল, কর্ষণ করিলে এক দুই হয়, অতএব পিতা কৃষিজীবী কেমন? অমরা নতমুখে স্বীকার করিল,—হাঁ প্রভু তাই বটে। তূর্ণবায় তখন জিজ্ঞাসা করিল,—ভদ্রে তোমার পিতা কোথায় কর্ষণ করেন, তোমাদের ক্ষেত্র কোথায়? রসিকা বুদ্ধিমতী কিশোরী অমরা তখনও স্পষ্ট কথায় উত্তর দিল না, শ্লিষ্ট বাক্যেই জানাইল,—"যেখানে গেলে আর ফিরে আসে না।" যুবক বলিল,—বুঝিয়াছি ভদ্রে, শ্মশানে গেলে মানুষ আর ফিরে আসে না,—তোমাদের ক্ষেত্র শ্মশানপার্শ্বে। অমরা নতমুখে স্বীকার করিল,—হাঁ, তাই বটে প্রভু। তখন তূর্ণবায় অন্য কথার অবতারণা করিয়া বলিল,—ভদ্রে, তুমি আজই ফিরে আসিবে ত? অমরা চকিতে একবার যুবকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল,—"হাঁ, আসিতে পারি, তবে যদি আসে, তাহা হইলে আসা ঘটিবে না আর যদি না আসে তবে আসিব।" তূর্ণবায় পূর্ব্ববৎ ঈষৎ হাসির সঙ্গে বলিল,—বুঝিলাম, তোমার পিতা নদীর ওপারে কর্ষণ করিতেছেন। নদীতে বান আসিলে তোমার আজ আর আসা হইবে না আর যদি, বান না আসে, তবে তুমি আসিতে পারিবে। কিশোরী অমরা তখন একবারে লজ্জায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়া মুখটি যেন নিজ বক্ষে লুকাইয়াই মৃদুস্বরে বলিল,—"হাঁ, প্রভু তাই ঠিক।"

এই রূপ আলাপ-সালাপ করিয়া অমরার আর সাহস কুলাইল না, যে সে তূর্ণবায়ের কোন পরিচয় গ্রহণ করে। তাহার বাক্‌কৌশল সমস্ত ব্যর্থ হওয়াতে সে মনে মনে সম্পূর্ণরূপে হার মানিয়াছিল, আর কথার কৌশল-রচনায় আগন্তুকের পরিচয় লইতে তাহার সাহস রহিল না। সে তখন স্ত্রীজনোচিত ভদ্রজনোচিত স্নেহ প্রকাশ করিয়া বলিল, "প্রভু আপনি একটু যবাগু পান করিবেন?" * তূর্ণবায় প্রথম আলাপে রমণীর উপহার এবং অনুরোধ উপেক্ষা করা অমঙ্গলজনক জানিয়া বলিল, "হাঁ, আপত্তি নাই।"

অমরা যবাগুর ঘট নামাইল। তূর্ণবায় ভাবিল, এই পানীয় পরিবেশনে বংশমর্য্যাদা বুঝা যাইবে। যদি আচমনের জল না দিয়া এবং পাত্র প্রক্ষালন না করিয়া পানীয় পরিবেশন করে, তবে ইহাকে এইখানে ত্যাগ করিতে হইবে। অমরা কিন্তু এ আশঙ্কার অবসর দিল না। সে নিকটস্থ জলাশয় হইতে পানপাত্র ধুইয়া আনিল এবং সেই পাত্র ভরিয়া তূর্ণবায়ের হস্ত প্রক্ষালনের জল আনিল। অমরা বলিল "প্রভু হাত মুখ ধুইয়া আচমন করুন—" এই বলিয়া হাতে জল ঢালিয়া দিল। তাহার পর পানপাত্র হাতে করিয়া পানীয় ঢালিতে গেলে উপরের থিতান জলটুকু পড়িবে বুঝিয়াই যেন অমরা শূন্য পানপাত্র মাটীতে রাখিল এবং যবাগুর ঘট নাড়িয়া ঘুলাইয়া লইয়া

* বৌদ্ধকালে যবাগু—(যবের মণ্ডদ্বারা প্রস্তুত সুখসেব্য পানীয়) পান নিত্য কার্য্য ছিল। এখন যেমন প্রাতঃকালে কেহ বাড়ীতে আসিলে চা খাইবার অনুরোধ করা ভদ্রতার রীতি সঙ্গত হইয়াছে, তখন যবাগু পানীয় উপহার দেওয়া ভদ্রতার রীতি ছিল।

পানীয় পরিবেশন করিয়া তূর্ণবায়ের হস্তে দিল। ঘট নাড়িয়া দেওয়াতে সিকৃথ * বেশী থাকায় পানীয় গাঢ় হইয়া গেল। তূর্ণবায় পান করিতে করিতে বলিল, "ভদ্রে, যবাগু এত বহলা (গাঢ়) হইয়াছে কেন? অমরা বলিল—"গ্রামে জলাভাব, কেদারেও (কর্ষিত ক্ষেত্রের পার্শ্বস্থ খাদে) জল নাই।" তাহার পর অবশিষ্ট যবাগু পিতার জন্য রাখিয়া উচ্ছিষ্ট পাত্রাদি পুনরায় ধুইয়া শুদ্ধ করিয়া রাখিল। তখন তূর্ণবায় বলিল, ভদ্রে আমি তোমাদের বাড়ী যাব, তুমি পথ বলিয়া দাও। অমরা সম্মত হইয়া বাড়ীর রাস্তা বুঝাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। তূর্ণবায়ও অমরার নির্দ্দিষ্ট পথে তাহাদের বাড়ীর দিকে চলিল।

[৪]

অমরার পিতৃগৃহের দ্বারে উপস্থিত হইয়া তূর্ণবায় হাঁক দিল,—জীর্ণ বস্ত্রাদি সংস্কার করাইবে? অমরার মা বহিরে আসিল, দেখিল, দিব্য সুন্দর মূর্ত্তি নবীনবয়ঃ তূর্ণবায়। সে আদর করিয়া ডাকিল, ভদ্র, ভিতরে এস, আসন গ্রহণ কর! তূর্ণবায় ভিতরে গেল অমরার মাতা আসন পাতিয়া দিয়া বলিল, "বাবা এই তৃণমুষ্টিদ্বারা পদসংস্কার করিয়া উপবেশন কর, গ্রামে জলাভাব।" তূর্ণবায় তাহা করিয়া বসিলে পর, বৃদ্ধা বলিল, একটু যবাগু পান করিবে কি? তূর্ণবায় বলিল,—পথে কনিষ্ঠা ভগিনী † অমরা যবাগু পান করাইয়াছেন। অমরার মাতা তখন যুবকের হৃদয়নিহিত উদ্দেশ্য যেন স্পষ্ট বুঝিতে পারিল এবং তূর্ণবায়ের প্রতি স্নেহদৃষ্টিতে চাহিয়া মৃদুহাস্যে মনে মনে বলিল, "বাবাজী আমার মেয়ের অতুল রূপলাবণ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া তাহার লোভেই আসিয়াছেন। বেশ!"

তূর্ণবায় কৃষকপরিবারের দারিদ্র্যাবস্থা বুঝিয়াই বলিল, মা জীর্ণবস্ত্রাদি গৃহস্থের ঘরেই থাকে, তাহা সংস্কার করাইতে বাহির করিলে লজ্জার কারণ হয় না, অতএব যদি কিছু থাকে লইয়া এস,—আমি সংস্কার করিয়া দিব। অমরার মা বুঝিল,—তূর্ণবায় সে দিন কোন অছিলায় সেখানে থাকিতে চায়, সুতরাং বলিল,—যথেষ্ট আছে বাবা, কিন্তু তোমার পারিশ্রমিক দিবার সাধ্য নাই। তূর্ণবায় বলিল—আমি তোমাদের কাছে বেতন লইয়া কাজ করিতে আসি নাই, যাহা থাকে লইয়া এস, বিনাবেতনেই করিয়া দিব।

তাহার পর অমরার মাতা বহু জীর্ণবস্ত্র আনিয়া দিল। তূর্ণবায় নিপুণতা-সহকারে সে সকল সংস্কার করিতে লাগিল। অমরার মাতা তাহার নিপুনতা দেখিয়া কার্য্যব্যপদেশে বাহিরে গিয়া গ্রামের অন্যান্য স্ত্রীলোকের নিকট এই নিপুণ নবীন তূর্ণবায়ের কর্ম্মের প্রশংসা করিল। তাহারা শুনিয়া আপনাদের বস্ত্রের জীর্ণসংস্কার করাইবার আগ্রহ প্রকাশ করিল। অমরার মা তাহা শুনিয়া বাড়ীতে আসিয়া যুবকের নিকট প্রস্তাব করিল। যুবক

---

* সিকৃথ—সিঁটে।

† সেকালে যুবতীদিগের সম্বন্ধে উল্লেখ করিতে হইলে ভদ্রলোকেরা নিঃসম্পর্কস্থলে বয়স-বিবেচনায় জ্যেষ্ঠা বা কনিষ্ঠা ভগিনী বলিয়া উল্লেখ করিতেন।

বলিল, "ভালকথা সকলকে আনিতে বলুন।" তাহাই হইল এবং এই কার্য্যের বেতনে একদিনে যুবকের সহস্র কার্ষাপণ * (কড়ি নহে, তখনকার প্রচলিত মুদ্রা) উপার্জ্জিত হইল। যুবক সেগুলি বৃদ্ধার নিকট গচ্ছিত রাখিল।

তাহার পর বৃদ্ধা পরমাদরে যুবককে প্রাতরাশ এবং অন্নব্যঞ্জনাদির দ্বারা সেবা করিল। সন্ধ্যাকালে সে রন্ধনশালায় যাইবার পূর্ব্বে জিজ্ঞাসা করিল, "ভদ্র, কতজনের অন্ন প্রস্তুত করিব?" যুবক উত্তর দিল—এবাড়ীতে আজ যাঁহারা যাঁহারা খাইবেন নির্দ্দিষ্ট আছেন, তাঁহাদেরই মত।" † তখন অমরার মাতা নানাবিধ সুস্বাদু অন্নব্যঞ্জনাদি পাক করিতে লাগিল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ-হয় হয়, এমন সময়ে অমরা বন হইতে সংগ্রহ করিয়া শুষ্ক-কাষ্ঠের বোঝা মাথায় করিয়া শুষ্ক পত্রের বোঝা কক্ষে লইয়া সদরদ্বারে প্রবিষ্ট হইতে গিয়া দেখিল, প্রাতঃকালদৃষ্ট সেই সুন্দর তূর্ণবায় যুবক বসিয়া আছে। তাহার দৃষ্টি পড়িবার পূর্ব্বেই অমরা সরিয়া গিয়া দ্বারপার্শ্বে কাষ্ঠরাশি ফেলিয়া পশ্চাদ্দ্বার দিয়া গৃহ-প্রবেশ করিল। অমরার পিতাও সন্ধ্যার পর বাড়ী আসিল। তাহার পর যথোপযুক্ত বিশ্রামাদির পর পুরুষেরা আহারে উপবেশন করিল। নানা সুস্বাদু অন্নব্যঞ্জন পরিবেশিত হইল। অমরা পিতার ভোজনের পর মাতাকে আহার করাইল এবং এবং উভয়ের পা ধোয়াইয়া দিয়া শয়ন করিতে দিল, তৎপরে অতিথি তূর্ণবায়ের পা ধোয়াইয়া দিয়া তাহারও শয্যারচনা করিয়া দিল ‡ পরে নিজে আহারাদি করিয়া শয়ন করিল।

এইরূপে তূর্ণবায় কয়েকদিন সেই কৃষকশ্রেষ্ঠীর দরিদ্র পরিবারে অবস্থান করিল। অমরার সকল প্রকার আচারব্যবহার পরীক্ষা করাই তাহার উদ্দেশ্য। একদিন সে অমরাকে অর্দ্ধনালিক মাত্রায় (প্রায় আধসের) চাউল দিয়া বলিল, ইহা হইতে আমায় যবাগু, পূপ ও ভাত রাঁধিয়া দাও। অমরা,—"দিতেছি" বলিয়া চাউল লইয়া গিয়া কুটিল। যেগুলি আস্ত রহিল তাহাতে ভাত রাঁধিল, অর্দ্ধভগ্নগুলি হইতে পূপ প্রস্তুত করিল এবং চূর্ণ হইতে যবাগু রাঁধিয়া উপযুক্ত ব্যঞ্জনাদি সহ আনিয়া দিল।

তূর্ণবায় যবাগু পাত্র মুখে তুলিয়াই বিস্বাদ বোধে থুথু করিয়া সমস্ত ফেলিয়া দিয়া বলিল—রাঁধিতে যদি না জান, আমার কষ্টার্জ্জিত চাউল নষ্ট করিলে কেন? অমরা কিছু বিরক্তি বা ক্রোধ প্রকাশ না করিয়া বলিল,—"যবাগু ভাল না হইয়া থাকে, পূপ খাইয়া দেখুন প্রভু!" তূর্ণবায়

---

* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের চিত্রশালায় প্রাচীনমুদ্রাসংগ্রহে এই প্রাচীন "কার্ষাপণ" মুদ্রা দুইটি সংগৃহীত হইয়াছে।

† ইহাও সেকালের ভদ্রতাব্যঞ্জক রীতি। গৃহকর্ত্রী অভ্যাগতকে জিজ্ঞাসা করেন এই ভাবে যে রাত্রিতে অতিথির কোন বন্ধুবান্ধবের আগমন সম্ভাবনা আছে কি না।—সম্ভাবনা না থাকিলে অতিথি ঐরূপ জবাব দেন, তাহার অর্থ বাড়ীর লোকের মত রাঁধ। আপনাকে তখন বাড়ীর লোক বলিয়া গণ্য করেন। ‡ ইহাও গার্হস্থ্যরীতি।

তাহাও মুখে দিয়া আরও উত্তেজিত হইয়া ঐরূপে ফেলিয়া দিয়া এবং ক্রোধে সমস্ত খাদ্যদ্রব্য একত্র চট্‌কাইয়া অমরার সর্ব্বাঙ্গে মাখাইয়া দিয়া বলিল যাও ঐ দ্বারে গিয়া বসিয়া থাকগে, অমরা অতিথির বিরক্তি উৎপাদন না করিয়া নিজের বিরক্তি বা ক্রোধ না প্রকাশ করিয়া, আপনাকেই অপরাধিনী বোধে শান্তভাবে দ্বারে গিয়া বসিল। কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল। যখন তূর্ণবায় দেখিল, অমরা কোনরূপ চাঞ্চল্য বা অভিমান প্রকাশ করিল না, তখন আদর করিয়া ডাকিল—অমরা ভদ্রে এদিকে এস,! বশীভূতা বিড়ালীর ন্যায় অমরা একবার আহ্বানমাত্রেই স্মিতমুখে নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন তূর্ণবায়ও স্মিতমুখে অমরার তাম্বূলপাত্রের উপর সহস্র কার্ষা-পণ এবং একটি সুদৃশ্য, ধনিজনোচিত বহুমূল্য শাটক (পোষাক) রক্ষা করিয়া তাহার সম্মুখে রাখিল ও শাটকটি তাহার হাতে তুলিয়া দিয়া বলিল "যাও ভদ্রে, সখিসঙ্গে স্নান করিয়া এই শাটক পরিধান করিয়া এস।" অমরা হাস্যবদনে শাটক লইয়া স্নানার্থে চলিয়া গেল। তূর্ণবায় তখন সেই সহস্র কার্ষাপণ শ্রেষ্ঠীদম্পতির হস্তে দিয়া অমরাকে পত্নীত্বে প্রার্থনা করিল। অমরার শাটকগ্রহণ ও সহাস্যবদন দেখিয়া তাহার মাতাও তাহাকে তূর্ণবায়ের প্রতি অনুরক্তা জানিয়া তাহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করিল। তাহার পর সদ্যঃস্নাতা বিধৌতমলা, অনিন্দ্যসুন্দরী অমরা যখন সেই বহুমূল্য শাটক পরিধান করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল তখন তাহার রূপজ্যোতি দশগুণ উছলিয়া পড়িল এবং তাহাকে যেন রাজরাণী বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তাহার পর উপযুক্ত বিদায় সম্বর্দ্ধনার পর তূর্ণবায় ও অমরা তূর্ণবায়ের দেশের উদ্দেশে যাত্রা করিল।

[৫]

রাজার প্রধান দৌবারিকের গৃহদ্বারে প্রত্যূষে এক অনিন্দ্যসুন্দর নরমিথুন আসিয়া দাঁড়াইল। পুরুষটি তূর্ণবায়বেশী এবং স্ত্রীটি কৃষককন্যার বেশে আসিয়া দাঁড়াইল। দৌবারিকপ্রধান তূর্ণবায়কে দর্শনমাত্র অতি সম্ভ্রমের সহিত অভিবাদন করিয়া করজোড়ে যেন আদেশের অপেক্ষায় অবস্থান করিতে লাগিল। তূর্ণবায় দৌবারিকের এরূপ ভাবের ও ব্যবহারের প্রতি বিন্দুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া তাহাকে যেন আদেশের স্বরে বলিল "ইঁহাকে তোমার ভার্য্যার নিকটে থাকিতে দিবে এবং রাজ্ঞীর ন্যায় সম্মানে রক্ষা করিবে; কিন্তু ইঁহার আচারব্যবহারে বা ইচ্ছাপরিচালনে কোন বাধা দিবে না, তাহা একান্ত দূষিত হইলেও নিষেধ করিবে না বা কোন লোকের সহিত দেখাসাক্ষাৎ করায় আপত্তি করিবে না। কেবল তোমার গৃহের বাহিরে একা যাইতে দিওনা।" তূর্ণবায়ের এই আদেশ দৌবারিকপ্রধান শিরোনমনপূর্ব্বক শিরোধার্য্য করিয়া লইল এবং আপন পত্নীকে ডাকাইয়া অমরাকে তাহার হস্তে সমর্পণ করিল। দৌবারিকভার্য্যা অমরাকে লইয়া গৃহাভ্যন্তরে গেল এবং তূর্ণবায় অন্যদিকে প্রস্থান করিল।

কিছুদিন গেলে পর রাজকুমার মহোষধ ভৃত্য সমভিব্যবহারে অশ্বা-

রোহণে সন্ধ্যাকালে বেড়াইতে আসিয়া দৌবারিকের গৃহে সেই অনিন্দ্যসুন্দর-মূর্ত্তি অমরাকে দেখিতে পাইলেন। দৌবারিক তৎকালে গৃহে ছিল না। তিনি স্বীয় ভৃত্যকে দেখাইয়া বলিলেন দৌবারিকের গৃহের এই সুন্দরীকে ছলে, কৌশলে, অর্থদানে বশীভূতা করিয়া আমার নিকট আনিতে চেষ্টা কর, শেষে বলে ধরিয়া আনিতেও কুণ্ঠিত হইও না। দৌবারিককে আমার আদেশ জানাইবে। আমার আদেশ শুনিলে সে তোমাদের গতিবিধিতে বাধা দিবে না।

তাহার পর যাহার রক্ষক নাই, যাহার আশ্রয়দাতাই ভক্ষকদিগের সহায়ক হইয়া দাঁড়ায়, তাহার আর কষ্টের অবধি থাকে না। রাজকুমারের আদেশে তাঁহার ভৃত্যবর্গ অমরাদেবীর উপর নানা অত্যাচার করিতে লাগিল। দৌবারিক-প্রধান কুমারের আদেশে তাহাদের বাধা দেয় না; কিন্তু দৌবারিক পত্নী অমরাকে কন্যার ন্যায় ভালবাসিয়াছিল বলিয়া, রাজাদেশ অমান্য করিয়াও ভৃত্যগণের অঙ্গাদিস্পর্শরূপ অপমানকর ব্যবহার হইতে অমরাকে রক্ষা করিত। অমরা উৎপীড়নে যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা পাইতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই কাহারও পাপপ্রস্তাবে স্বীকৃত হইল না। অবশেষে সহস্র সহস্র স্বর্ণমুদ্রার লোভ দেখান হইতে লাগিল। একদিন অমরা বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিল, আমি সামান্য তূর্ণবায়ের বাক্‌দত্তা পত্নী। আমার স্বামীর পরিশ্রমার্জ্জিত একটিমাত্র কার্ষাপণই আমার নিকট সহস্র স্বর্ণমুদ্রার সমান। আমি রাজকুমারের পাপ-প্রস্তাবে কিছুতেই সম্মত হইব না। তাহার প্রদত্ত লক্ষ সুবর্ণমুদ্রাও আমার স্বামীর চরণ-রেণুর এক কণার তুল্যও নহে। তখন ভৃত্যেরা রাজকুমারের শিক্ষামত অমরাকে টানিতে টানিতে রাজপ্রাসাদে কুমারের প্রমোদাগারে লইয়া গেল। ঝটিকাহত শুষ্কপত্রের মত ধূলায় লুটাইতে লুটাইতে রোরুদ্যমানা অমরা রাজ-কুমার মহোষধের বিশ্রামকক্ষে নীত হইল। সেখানে যাইয়া অমরা মুখে বস্ত্র দিয়া বসিল, বলিল,—আমি এমন নরাধম রাজকুমারের মুখাবলোকন করিব না। ভৃত্যগণ মহোষধের ইঙ্গিতে বলপূর্ব্বক তাহার মুখের বস্ত্র সরাইতে চেষ্টা করিল, পারিল না, বস্ত্র ছিঁড়িয়া গেল। তখন চক্ষু মুদিত করিয়া হাতে মুখ ঢাকিয়া অমরা রোদন করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে কুমারের ইঙ্গিতে ভৃত্য-বর্গ সরিয়া গেলে রাজকুমার নিজে মধুরস্বরে প্রীতি জানাইয়া ডাকিলেন, "অমরা, প্রিয়তমে, আমায় ক্ষমা করিবে কি?"—স্বরে চমকাইয়া উঠিয়া অমরা চকিতে চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিল রাজাসনে সেই যুবক তূর্ণবায় সেই চির-পরিচিতবেশে বসিয়া আছে। তখন বুদ্ধিমতী অমরার নিকট সমস্ত রহস্য খুলিয়া গেল। তখন তূর্ণবায়বেশী রাজকুমার মহোষধ অমরার হাত ধরিয়া আদর করিলেন। অমরা একবার গৃহের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া প্রথমে হাসিলেন, তাহার পর কাঁদিতে লাগিলেন। রাজকুমার এই অভূতপূর্ব্বভাবের কোন অর্থ বুঝিতে না পারিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। অমরা বলিলেন, "স্বামিন্, তোমার এই ধনৈশ্বর্য্য মান, সম্ভ্রম, যশঃ, বিনাপুণ্যে বা সামান্য পুণ্যে লাভ হয় নাই। তোমার পূর্ব্ব পুণ্যের পরিচয় পাইয়া [illegible]

পরম পুণ্যবানের স্ত্রী জানিয়া আপনাকে ধন্যা মনে করিয়া হাসিয়াছি, কিন্তু যখন মনে হইল, এই সকল ধনৈশ্বর্য্য রাজরূপে পরস্বের ন্যায় তোমার হস্তে গচ্ছিত রহিয়াছে, তুমি যদি ইহার সদ্ব্যবহার না কর, তোমায় নরকে যাইতে হইবে, তখন এই দুঃখস্মরণে কাঁদিতে লাগিলাম।" রাজকুমার মহোষধ অমরা-দেবীর এই পরম উপদেশজনক ব্যাখ্যা শুনিয়া তাঁহাকে পবিত্রচিত্তা বলিয়া কৃতনিশ্চয় হইলেন এবং উদুম্বরাদেবীকে ডাকাইয়া তাঁহার হস্তে মনোনীতা পত্নীর ভার দিলেন। উদুম্বরাদেবী ভাবীবধূর রূপলাবণ্য দেখিয়া এবং গুণ-গরিমা শুনিয়া সত্বর বিবাহের আয়োজনে মন দিলেন। পিতা মহারাজকে সমস্ত জানাইয়া অমরাকে এক স্বতন্ত্র সজ্জিতপ্রাসাদে রক্ষা করিলেন; অবশেষে শুভদিনে শুভক্ষণে বহুমূল্য অপূর্ব্বদৃশ্য মহাযোগ্য যানে (রাজজনোচিত বড় গাড়ী) বধূকে আরোহণ করাইয়া এবং সর্ব্বালঙ্কারে ভূষিতা করাইয়া রাজবাড়ীতে আনাইয়া বিবাহ দিলেন। বৃদ্ধ রাজা পুত্রবধূকে সহস্র সহস্র বহুমূল্যরত্ন যৌতুক দান করিলেন। রাজবধূ অমরা সেই রত্নরাশি দুইভাগ করিয়া একভাগ রাজাকে ও একভাগ নগরে বিতরণ করিলেন। স্নেহের জন্য দৌবারিকপত্নী বহু পুরস্কার পাইল।—

(উম্মগ্‌গ বাগ জাতক)

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী।

নিদর্শন।

বিনামূল্যে।

"কে নিবি গো কিনে আমায়, কে নিবি গো কিনে?"
পসরা মোর হেঁকে হেঁকে বেড়াই রাতে দিনে।
এমনি করে হায়, আমার
দিন যে চলে যায়,
মাথার পরে বোঝা আমার বিষম হল দায়।
কেউ বা আসে, কেউ বা হাসে, কেউ বা কেঁদে চায়।

মধ্যদিনে বেড়াই রাজার পাষাণ-বাঁধা পথে,
মুকুট মাথে অস্ত্র হাতে রাজা এল রথে।
বল্‌লে হাতে ধরে', "তোমায়
কিন্‌ব আমি জোরে,"
জোর যা ছিল ফুরিয়ে গেল টানাটানি করে।
মুকুট মাথে ফিরল রাজা সোনার রথে চড়ে।

রুদ্ধ দ্বারের সমুখ দিয়ে ফিরতে ছিলেম গলি।
দুয়ার খুলে বৃদ্ধ এল হাতে টাকার থলি।

করলে বিবেচনা, বললে
"কিনব দিয়ে সোনা,"
উজাড় করে দিয়ে থলি করলে আনাগোনা।
বোঝা মাথায় নিয়ে কোথায় গেলেন অন্যমনা।

সন্ধ্যাবেলায় জ্যোৎস্না নামে মুকুলভরা গাছে।
সুন্দরী সে বেরিয়ে এল বকুলতলার কাছে।
বললে কাছে এসে, "তোমায়
কিনব আমি হেসে,"
হাসি খানি চোখের জলে মিলিয়ে এল শেষে;
ধীরে ধীরে ফিরে গেল বনছায়ার দেশে।

সাগর তীরে রোদ পড়েছে, ঢেউ দিয়েছে জলে,
ঝিনুক নিয়ে খেলে শিশু বালুতটের তলে।
যেন আমায় চিনে' বললে
"অমনি নেব কিনে!"
বোঝা আমার খালাস হল তখনি সেই দিনে।
খেলার মুখে বিনামূল্যে নিল আমায় জিনে।

("প্রবাসী," বৈশাখ,
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)।

পল্লীজীবন।

বাঙ্গালা দেশে সহরের সংখ্যা ১৯০, কিন্তু গ্রামের সংখ্যা ২০৩,৬৫৪—আমাদের শতকরা ৯৫ জন পল্লীগ্রামে ও ৫ জন সহরে বাস করে। সুতরাং বাঙ্গালীর কোনও অভাব-মোচন উদ্দেশ্যে কোন আয়োজন করিবার সময় যদি পল্লীবাসীদের কথা ভুলিয়া যাওয়া যায়, তাহা হইলে উহাকে বাঙ্গালীর অনুষ্ঠান বলা চলে না।......সমাজের প্রকৃতিগত সমবায় প্রবৃত্তি ও আত্মনির্ভরতাকে অভিনব বিজ্ঞানসম্মত প্রথায় নিয়োজিত করিয়া, আমাদের দারিদ্র্য মোচন করিতে হইবে। গ্রামে গ্রামে কৃষকগণকে ঋণদান-সমিতিতে সমবেত করিয়া তাহাদিগকে ঋণজাল হইতে মুক্ত করিতে হইবে। যৌথ-ক্রয় মণ্ডলী স্থাপন করিয়া গো-মহিষাদি পশু, উপযুক্ত কৃষিযন্ত্র, সার ও বীজ-শস্য, সংগ্রহ এবং ক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে। যৌথ-বিক্রয়-মণ্ডলী স্থাপন করিয়া গ্রামের উৎপন্ন শস্যসমূহ ন্যায্য দরে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে। গ্রামে শস্যগোলা স্থাপন করিয়া কৃষকগণকে সাময়িক ভরণপোষণের নিমিত্ত অল্প সুদে শস্য কর্জ্জ দিতে হইবে। বিদেশী মহাজনকে শস্য কর্জ্জদান, শস্যসঞ্চয় এবং শস্যরপ্তানি ব্যবসায়ে প্রভুত্ব স্থাপন করিতে না দিয়া, গ্রাম্যসভার দ্বারাই গ্রামের শস্য আদান-প্রদান কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে। অপরিমিত পরিমাণে শস্যরপ্তানি বন্ধ করিয়া গ্রামের সঞ্চিত শস্য যাহাতে দুর্ব্বৎসরে দুর্ভিক্ষপীড়িত [illegible]

হইবে। পল্লীভাণ্ডার স্থাপন করিয়া কৃষিজীবিগণের জন্য বস্ত্র, তৈল, লবণ প্রভৃতি নিত্য-ব্যবহার্য্য সামগ্রী পাইকারী দরে বিতরণ করিবার সুবিধা সৃষ্টি করিতে হইবে। গ্রামে গ্রামে সমিতি স্থাপন করিয়া মড়ক ইত্যাদিতে গো-মহিষাদির জীবন-বিমা করিতে হইবে, উৎকৃষ্ট বৃষ ক্রয় করিয়া আনিয়া গোবংশের উন্নতি সাধন করিতে হইবে। শিল্পজীবিগণের জন্য যৌথ-ঋণ-দান-মণ্ডলী স্থাপন করিয়া শিল্পকর্ম্মের উপযুক্ত যন্ত্র ও উপকরণ পাইকারি দরে ক্রয় ও বিতরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। গ্রামে গ্রামে বিশুদ্ধ ঘৃত ও মাখন প্রস্তুত করিবার জন্য সমিতি স্থাপন করিতে হইবে। সমবেত সমিতি গঠন করিয়া গ্রামে গ্রামে কূপ খনন, পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার, নদীর ভাঙ্গন প্রতিরোধ, খাল কাটিয়া কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য জল সরবরাহ, জঙ্গল পরিষ্কার, দাতব্য ঔষধালয় এবং অবৈতনিক শিল্প ও কৃষি বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে।

(গৃহস্থ," বৈশাখ,
শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায়)।

বাল্য-স্মৃতি।

ইংরাজী ভাষা ও শিল্পকার্য্য শিক্ষা দিবার জন্য এক ফিরিঙ্গী মেম নিযুক্ত হইল। তাঁহাকে বাড়ীর লোকে "ববের মা" বলিয়া ডাকিতেন। তাঁহার সাহায্যে লেখাপড়া হউক বা নাই হউক, আমার বিদেশী ফ্যাশানটা বেশ আয়ত্ত হয়ে গেল। সেই কথা স্মরণ করিয়া এখন লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হইয়া থাকি। ববের মা রোমান কাথলিক ছিলেন। আমরা তাঁহার হিড়িকে একদিন গির্জায় উপস্থিত হইলাম। আমাদের সম্মানার্থ সে দিন পাদরি মহাশয় বাঙ্গালায় বক্তৃতা করিলেন। সেরূপ অপূর্ব্ব উচ্চারণ ও অদ্ভুত ভাষা জীবনে আর কখনও শুনি নাই। পাদরি মহোদয় বলিয়াছিলেন :—"দ্যাক জানানাগণ, সয়টান ডারের লিকটে, প্রভুর প্রেরণ, টাঁহার ঢর্ম্ম টোমরা লইবে কি না বোলো? ঘ্রুট যেমন আগুণে গলে যায় টেমনি টোমরা নরকে গলে যাবে, সয়টান চুলে ঢরিয়া বেটার্ম্ম ক লয়ে যাবে, গরম লোহা ডিবে।"........প্রতি শনি রবিবারে আমাদের গৃহে সাহিত্যানুরাগী বন্ধুগণের আসর জমিত। "সদ্ভাব শতক," "ব্রজাঙ্গনা', "মৃণালিনী", "অবকাশ রঞ্জিনী" প্রভৃতি গ্রন্থের আলোচনা ও আবৃত্তি চলিত। স্বর্গীয় রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর এই মজলিসের মুরুব্বি ছিলেন। তিনি এক একটা সরস গল্প বলিতেন, আর হাস্যধ্বনিতে গৃহ কম্পিত হইত। বটতলার "কি মজার শনিবার" ও এখানে বাদ যাইত না। সে সব ছড়া একালে আর শুনিতে পাই না। যথা :—

"গঙ্গা যে ডার্টি রিভার্, হয় সে ফিভার,
সে জলে আর কেউ নেও না।
একটা পুতুল গড়ে, মন্ত্র পড়ে,
ফুল দিয়ে আর fool হয়ো না।"

"অসুখী ভীষক মদ্যপ অতি,
অসুখী রূপসী বিধবা সতী,
অসুখী যার যৌবনে জরা,
অসুখের শেষ চাকরি করা।"

সাহিত্যালোচনার সঙ্গে রসনার সেবাও চলিত। মাংসের গরম চপ্ পাতে পড়িবামাত্র স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র worceter sauco ঢালিয়া তাহা উপভোগ করিতেন।

("সুপ্রভাত," বৈশাখ,
শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দেবী)।

আমেরিকার চিঠি।

আমাদর দেশে মানুষের যেমন একটা সামাজিক জাতিভেদ আছে, এদের দেশে তেমনি মানুষের চিত্তবৃত্তির একটা জাতিভেদ দেখতে পাই। মানুষের শক্তি নিজ নিজ অধিকারের মধ্যে অতিশয় মাত্রায় স্বপ্রধান হয়ে উঠেছে, প্রত্যেকে আপনার সীমার মধ্যে যোগ্যতা লাভ করবার জন্য উদ্যোগী, সীমা অতিক্রম করে যোগলাভ করার কোন সাধনা নাই। এ রকম জাতিভেদের উপযোগিতা কিছুদিনের জন্য ভাল। যেমন কোন কোন সবজির বীজ প্রথমটা টবে পুঁতে ভাল করে আজ্জিয়ে নিতে হয়, তারপর তাকে ক্ষেতের মধ্যে রোপণ করা কর্ত্তব্য—এও সেই রকম। শক্তিকে তার টবে পুঁতে একটু তাড়াতাড়ি বাড়িয়ে তোলার কৃষিপ্রণালীকে নিন্দা করতে পারিনে, যদি তার পরে যথাসময়ে তাকে উদার ক্ষেত্রে রোপণ করা যায়। কিন্তু মানুষের মুস্কিল এই যে নিজের সফলতার চেয়ে সে নিজের অভ্যাসকে বেশী ভালবাসতে শেখে—এই জন্য টবের সামগ্রীকে ক্ষেতে পোঁতবার সময় প্রত্যেকবার মহা দাঙ্গা-হাঙ্গামা বেধে যায়। মানুষের শক্তির যতদূর বাড় হবার তা হয়েচে, এখন সময় এসেচে যোগের জন্য সাধনা করবার। মনুষ্যত্বকে বিশ্বের সঙ্গে যোগযুক্ত করে আমরা কি তা'র আদর্শ পৃথিবীর সামনে ধরতে পারব না? এদেশে তার অভাব এরা অনুভব করতে আরম্ভ করেচে, সেই অভাব মোচন করবার জন্য এরা হাতড়ে বেড়াচ্চে, শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে উদারতা আনবার জন্য এদের দৃষ্টি পড়েচে; কিন্তু এদের দোষ হল এই যে এরা প্রণালী জিনিষটাকে অত্যন্ত বিশ্বাস করে, যা কিছু আবশ্যক সমস্তকে এরা কলে তৈরি করে নিতে চায়। মানুষের চিত্তের গভীর কেন্দ্রস্থলে সহজ জীবনের যে অমৃত উৎস আছে, এরা তাকে এখনও আমল দিতে জানে না—এই জন্য এদের চেষ্টা কেবলই বিপুল এবং আসবাব কেবলই স্তূপাকার হয়ে উঠচে। এরা লাভকে সহজ করবার জন্য প্রণালীকে কেবলই কঠিন করে তুলচে। তাতে একদিকে মানুষের শক্তির চর্চ্চা খুবই প্রবল হচ্চে সন্দেহ নেই এবং সে জিনিসটাকে অবজ্ঞা করতে চাই নে—কিন্তু মানুষের শক্তি আছে উপলব্ধি নাই এও যেমন, আর ডালপালায় গাছ খুব বেড়ে উঠচে, অথচ তার ফল নেই এও তেমনি।

("ভারতী," বৈশাখ.
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।)

আলোক রহস্য।

ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী ঈথর নামক কোন এক পদার্থের অতি সূক্ষ্ম তরঙ্গমালা চক্ষুকে উত্তেজিত করিলে, এবং সেই উত্তেজনা বিশেষ স্নায়ুমণ্ডলী দ্বারা মস্তিষ্কের এক নির্দ্দিষ্টস্থানে নীত হইলে, আমরা আলোক দেখিতে পাই। আলোক বলিয়া কোন পদার্থ নাই, আমাদের মস্তিষ্কের একটা বিশেষ অবস্থাই আমাদিগকে আলোক দেখায়। আবার ঈথরতরঙ্গ মাত্রেরই ধাক্কায় আমাদের আলোক জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। তরঙ্গগুলি যদি খুব বড় হয়, তবে সেগুলি শত ধাক্কা দিলেও আমাদের চক্ষে আলোকের উৎপত্তি করিতে পারে না। তরঙ্গগুলি খুব ছোট হইলে, তাহাদের ধাক্কাতেও আলোকের উৎপত্তি হয় না। মানুষের দর্শনেন্দ্রিয় ও মস্তিষ্কের গঠন ইতর প্রাণিগণের চক্ষু ও মস্তিষ্কের অনুরূপ নয়। কীটপতঙ্গ, জলচর, উভচর প্রভৃতি বিচিত্র প্রাণীর মস্তিষ্ক ও চক্ষুর গঠনে অনেক বৈচিত্র্য বর্ত্তমান। ইহা দেখিয়া জীবতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ মনে করেন যে আমরা আমাদের চক্ষু ও মস্তিষ্কের বিশেষ গুণে আলোককে যে প্রকার দেখিতেছি, সম্ভবতঃ ইতর প্রাণিগণ সেরূপ দেখে না। দেহের কোন অংশে চিমটি কাটিলে মানুষ, পশু, কীট সকলেই যে অল্পাধিক পরিমাণে বেদনা পায়, তাহা পরীক্ষা করিয়া নির্ণয় করা চলে, কিন্তু ঈথরের অদৃশ্য তরঙ্গমালা নানা জাতি প্রাণীর চক্ষে আঘাত দিয়া তাহাদের মস্তিষ্ককে কি ভাবে উত্তেজিত করে, এবং সেই উত্তেজনার ফলে যে কি প্রকার আলোক-জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, তাহা পরীক্ষা দ্বারা নির্ণয় করা কঠিন। আমরা আকাশকে যেমন নীল দেখি, গাছপালাকে সবুজ দেখি, ইতর প্রাণীরা সেইরূপ দেখে কি না, তাহা জানিতে কৌতূহল হয়। অনেক পরীক্ষার পর প্রাণিতত্ত্ববিৎ বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেছেন যে কীট পতঙ্গাদির সর্ব্বাঙ্গে আলোক তরঙ্গের প্রভাব বর্ত্তমান। চক্ষুতে পড়িলে তাহা আলোকের অনুভূতি জাগাইয়া দেয় এবং দেহের অপরাংশে পড়িলে সমগ্র দেহটিকে কখনও আলোকের দিকে টানিয়া লইয়া যায়, কখনও আলোক হইতে দূরে সরাইয়া দেয়। চুম্বকের কাছে লৌহ রাখিলে যেমন লৌহখণ্ড ছুটিয়া আসিয়া চুম্বকের গাত্র সংলগ্ন হয়, কতকগুলি পতঙ্গ সেইরূপ প্রবল আকর্ষণের বলে আলোকের নিকটবর্ত্তী হয়। ঘোর অন্ধকার ঘরে, জলপূর্ণ পাত্রে মৎস্য রাখিয়া, নানাপ্রকার বর্ণের আলোক একে একে জলের উপর ফেলিলে দেখা যায় যে, লাল রঙে মৎস্যগণ একটুও সাড়া দেয় না, কিন্তু সবুজ ও হলদে রঙের আলোক ফেলিবামাত্র তাহারা চঞ্চল হইয়া ওঠে। সম্ভবতঃ, যে ঈথরতরঙ্গ আমাদের চক্ষে লোহিত আলোকের উৎপত্তি করে, তাহা মৎস্যের চক্ষে কোনও আলোকেরই উৎপত্তি করে না।

("তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা," বৈশাখ,
শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়)।

নাট্যশালার ইতিহাস।

১২৬৩ সালে কলিকাতা চড়কডাঙ্গায় ৺জয়রাম বসাকের বাটীতে, "কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব" নাটকাভিনয়ে, স্বর্গীয় বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় এক স্ত্রী-চরিত্রের ও ১২৬৭ সালে সিন্দুরিয়া-

পটীতে "বিধবা-বিবাহ" নাটকে 'সুলোচনা'র ভূমিকা গ্রহণ করেন। ১২৬৮ সালে সিমুলিয়া ছাতু বাবুর বাটিতে 'শকুন্তলা'-অভিনয়ে স্বর্গীয় শরৎ চন্দ্র ঘোষ 'স্ত্রী'-ভূমিকা গ্রহণান্তর প্রথমে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হন। এই দুই জন নটরাজ উত্তরকালের সুবিখ্যাত বেঙ্গল থিয়েটার নামক রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। ইঁহাদের রঙ্গালয়েই প্রথমে স্ত্রী-অভিনেত্রী গ্রহণ করা হয়। বাগবাজার দলের অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা ৺ধর্ম্মদাস সুর, ১২৭৪ সালে কয়লাহাটার "সেই কিছু কিছু বুঝি" নামক রঙ্গনাট্যে 'চন্দনবিলাসী' নাম্নী স্ত্রী-ভূমিকা গ্রহণ করিয়া রঙ্গমঞ্চে পদার্পণ করেন। ইংরাজী ১৮৭৩ সালে স্বর্গীয় রায় নরেন্দ্রনাথ সেন বাহাদুর ও ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় অবৈতনিক নাট্য-সম্প্রদায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। নরেন্দ্র বাবু "বিধবা-বিবাহ" নাটকে 'সুখময়ীর পুত্রবধূ' এবং সারদা বাবু "কৃষ্ণকুমারী" নাটকে 'কৃষ্ণকুমারী'র ভূমিকা অভিনয় করিয়াছিলেন। সুবিখ্যাত রাধামাধব কর "লীলাবতী" নাটকে "ক্ষীরোদবাসিনী"র, "সধবার একাদশীতে" 'কাঞ্চনের' এবং "বিয়ে পাগলা বুড়ো"তে 'রামমাণিক্যে'র পালা গ্রহণ করিয়াছিলেন। নটচূড়ামণি অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফি "লীলাবতী" নাটকে 'ঝি'র অংশ গ্রহণ করিয়া, তাঁহার অনন্যসাধারণ স্বরানুকরণ-পটুতা দ্বারা, মেদিনীপুরী ভাষায় 'ঝি'-ভূমিকার আগাগোড়া কথোপকথন পরিবর্ত্তন করেন। "নীলদর্পণ" নাটকে তিনি তিনটী পুরুষ ভূমিকার সহিত "সাবিত্রী'র ন্যায় প্রধান স্ত্রী-ভূমিকাও গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, বৈতনিক ন্যাশনাল থিয়েটারের, সান্যাল বাটীতে, "নীলদর্পণ" অভিনয়ে, 'সৈরিন্ধ্রী'র পালা অভিনয় করেন। স্বর্গীয় মতিলাল সুর ন্যাশনাল থিয়েটারে, "নীলদর্পণে" 'পদী ময়রাণী' সাজিয়া ছিলেন। বাগবাজারের ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সেকালের প্রধান প্রধান নাটকে প্রধান স্ত্রী-ভূমিকাগুলি গ্রহণ করিয়া কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।

("নাট্যমন্দির", চৈত্র, শ্রীবিশেষজ্ঞ)।

নারীর মূল্য।

ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন নরকের দ্বার নারী। সেন্ট অগাষ্টিন তাঁহার শিষ্যবর্গকে শিখাইতেছেন "What does it matter whether it be in the person of mother or sister we have to be beware of Eve in every woman." আমেরিকার ছিনুক জাতির সম্বন্ধে, কাপ্তেন লুইস তাঁহার "Travels to the source of the Missouri river" গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে তাহারা অতিথির শয্যায় বাটীর শ্রেষ্ঠ কন্যাটীকে, না হয় স্ত্রীকে, পাঠাইয়া দেওয়া উচ্চ অঙ্গের ধর্ম্ম বলিয়া মনে করে। কাপ্তেন লায়ন এবং সার জন লাবক এস্কিমো, কামস্কটকা-বাসী প্রভৃতি জাতির ঠিক এই প্রকারের অতিথি-সৎকারের ইতিহাস লিখিয়াছেন। এখনও অনেক অসভ্য জাতি বাড়ী-ঘর জমি-জমা গরু-বাছুরের সঙ্গে বাড়ীর স্ত্রীলোকগুলিকেও ভাগ করিয়া লয়। বাঙ্গালীর ঘরে বিধবা ভগ্নীটার দাম চড়িয়া যায় যখন স্ত্রী আসন্ন-প্রসবা, যখন রাঁধা-বাড়ার লোকাভাব, যখন কচি ছেলেটাকে কাক দেখাইয়া বক দেখাইয়া দুটি খাওয়াতে হয়।

ইংরাজ যখন আমাদিগকে বলে "তোমরা নারীর মূল্য জান না, তোমরা তাঁহাকে আমোদ আহ্লাদে যোগ দিতে না দিয়া, ঘরের কোণে নির্ব্বাসিত করিয়া রাখ—তোমরা বর্ব্বর", তখন

তখনই মনুসংহিতা হইতে নারীর মর্য্যাদা সম্বন্ধে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বলি, "না আমরা মা বোনের মুখে রং মাখাইয়া, শাম্পেন ক্লারেট পান করাইয়া, সভা সমিতিতে নাচাইয়া লইয়া ফিরি না, আমরা তাঁদের ঘরের কোণে পূজা করি"। এই প্রকার কথার যুদ্ধে জিতি বটে, কিন্তু পূজাটা কিভাবে হয় তাহা আলোচনা করিলে, অনেক কথা বাহির হইয়া পড়ে। স্ত্রীলোকের সতীত্ব পুরুষের কাছে খুব উপাদেয়, কিন্তু পুরুষের "সতীত্ব" সম্বন্ধে কোনও বাধা-বাধকতা নাই। শাস্ত্রকারেরা নারী সম্বন্ধে পুরুষের প্রবৃত্তি যতরকমে হাত পা ছড়াইতে পারে তাহার সুবিধা করিয়াছেন—পৈশাচিক বিবাহটাও বিবাহ! এত দয়া, এত সহানুভূতি! এত দয়া না থাকিলে, পুরুষ কোন্ কালে সেই পুঁথি দরিয়ায় ভাসাইয়া মনের মত শাস্ত্র বানাইয়া লইত!

("যমুনা", বৈশাখ,
শ্রীমতী অনিলা দেবী)।

স্বদেশীর পরিণাম।

ফেণা মজিয়াই রস তৈয়ারি হইতে আরম্ভ হয়। স্বদেশী আন্দোলনের ফেণা মজিয়াছে তাহাতে দুঃখ নাই, কেননা রস তো তৈয়ার হইয়াছে। ফালতু ফুল ও পাতা ঝরিয়া পড়িয়াছে তাহাতে ভাবনা কি? ফলের কুঁড়ি তো দেখা দিয়াছে। এই রসের আস্বাদন, এই কুঁড়ির সাক্ষাৎকার আমাদের সাহিত্য সম্মিলন গুলিতে পাই। আগেকার স্বদেশী সভা সমিতি সকল ছিল মতামতের আসর, এখনকার সাহিত্য সম্মিলনগুলি সাধনার ক্ষেত্র। স্বদেশীর রাষ্ট্রীয় আস্ফালনটা বর্জ্জন করিয়া, সাহিত্য সম্মিলন একটা সার্ব্বজনীন মিলনভূমি গড়িয়া তুলিতেছেন। ধর্ম্মসংস্কারে, সমাজ সংস্কারে, রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে কখনও এরূপ মিলন-মন্দির প্রতিষ্ঠার সুযোগ হয় নাই। এস্থলে রাষ্ট্রনীতি বর্জ্জন করাই কর্ত্তব্য। সাহিত্যের উদার রত্নবেদীতে বাগ্-দেবীরই অধিষ্ঠান হয়, তাহা রণরঙ্গিনীর ভৈরবী-নৃত্য অভিনয়ের স্থান নহে। রস সাহিত্যের প্রাণ, আর প্রেম রসের সেরা। সাহিত্য সম্মিলন প্রেমময় বাঁশীই বাজাইবে, বিরোধের ভেরী সেখানে বাজিতে পারে না। দেশে যখন চারিদিকে একটা বিকট প্রলয়ঙ্কর বিদ্বেষ ও বিরোধ জাগিয়া লোকচক্ষুকে বিক্ষিপ্ত করিয়া তুলিতেছিল, তখন বাঙ্গালার সাহিত্যকগণ সাহিত্য সম্মিলনের মধুর মিলনক্ষেত্র গড়িয়া তুলিয়া, দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছেন।

("বিজয়া", বৈশাখ,
শ্রীযুক্ত বিপিন চন্দ্র পাল)।

শ্রীগৌরহরি সেন।

শশাঙ্ক।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বৃদ্ধ বহুক্ষণ ধরিয়া দন্তধাবন করিতেছিল, তাহার প্রাতঃক্রিয়া শেষ হইবার পূর্ব্বে দুর্গদ্বার পথে পদশব্দ শ্রুত হইল, দেখিতে দেখিতে একটি আলুলায়িতকেশা

অনিন্দ্যসুন্দরী ক্ষুদ্রা বালিকা দ্রুতবেগে বাহির হইয়া আসিল, বৃদ্ধকে দেখিয়া গতিরোধ করিতে গিয়া মসৃণ পাষাণাচ্ছাদিত পথে পড়িয়া গেল। বৃদ্ধ ও পরিচারক ব্যস্ত হইয়া তাহাকে উঠাইল তাহার বিশেষ আঘাত লাগে নাই। তাহার বয়স আটবৎসরের অধিক হইবে না, সে বয়সে আঘাত লাগিলেও অধিকক্ষণ স্মরণ থাকে না। বালিকা উঠিয়াই হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল "দাদা, নানিয়া বলিতেছিল আজ ঘরে আটা নাই, আমরা কি খাইব?" বৃদ্ধ বালিকার মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে ঈষৎ হাসিয়া কহিল "ভয় কি দিদি, ঘরে গম আছে, রঘুয়া এখনই ভাঙ্গিয়া আটা প্রস্তুত করিয়া দিবে।" বালিকা বলিল "নানিয়া কাঁদিতেছে, আর বলিতেছে যে ঘরে একটিও গম নাই।" তাহার কথা শুনিয়া বৃদ্ধের মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল; তিনি কহিলেন "আচ্ছা, আমি এখনই শিকার করিয়া আনিতেছি। রঘুয়া আমার তীর ও ধনু লইয়া আয়।" ভৃত্য দুর্গাভ্যন্তরে অদৃশ্য হইয়া গেল। বালিকা তখন পিতামহকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিয়া উঠিল "দাদা, আমি পাখীর মাংস আর হরিণের মাংস খাইতে পারি না, আমার কেমন গন্ধ লাগে।" বৃদ্ধ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, ভৃত্য তীর ধনুক লইয়া আসিল, বৃদ্ধ তাহা লক্ষ্য করিলেন না, বালিকা বিস্মিতা হইয়া পিতামহের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে বৃদ্ধের চমক ভাঙ্গিল, একটী অশ্রুবিন্দু বৃদ্ধের শীর্ণ গণ্ডস্থল বহিয়া শুভ্র শ্মশ্রুরাজির উপর পতিত হইল, বৃদ্ধ ভৃত্যকে আদেশ করিলেন "তুই তীর ধনুক রাখিয়া আমার সহিত ভিতরে আয়," তাহার পর ধীরে ধীরে পৌত্রীর সহিত দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। ধীরে ধীরে তৃণগুল্মাচ্ছাদিত দুর্গপ্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া বৃদ্ধ দ্বিতীয় দুর্গের পাদস্থিত ক্ষুদ্র কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাহার পার্শ্বস্থিত কক্ষে বৃদ্ধা পরিচারিকা নানিয়া গোধূমের অভাব দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছিল, বৃদ্ধকে দেখিয়া ভয়ে নীরব হইল। গৃহকোণে বহুপ্রাচীন কাষ্ঠাধার মধ্যে একটী প্রাচীনতর লৌহপেটিকা আবদ্ধ ছিল, বৃদ্ধ বহুকষ্টে ভৃত্যের সাহায্যে তাহা উন্মোচন করিয়া জীর্ণবস্ত্র ও শুষ্কপুষ্পমাল্যজড়িত একটি গোলাকার বস্তু বাহির করিলেন। বস্ত্রাবরণ মুক্ত হইলে তাহা হইতে হীরকমণ্ডিত একখানি প্রাচীন বলয় নির্গত হইল। বৃদ্ধ সেইখানি ভৃত্যের হস্তে প্রদান করিয়া কহিলেন, "তুমি এইখানি লইয়া গ্রামে যাও, সুবর্ণকার ধনমুখের নিকট বিক্রয় করিয়া আইস, যে অর্থ পাইবে তাহা দিয়া আটা ও গম লইয়া আইস।" বলয়খানি প্রদানকালে বৃদ্ধের হস্ত ঘন ঘন কম্পিত হইতেছিল, পুরাতন ভৃত্য তাহা লক্ষ্য করিল, তাহারও চক্ষুদ্বয় জলে ভরিয়া আসিল, কিন্তু সে নীরবে আদেশ প্রতিপালন করিতে চলিয়া গেল। বৃদ্ধ গৃহতলে বসিয়া পড়িলেন, তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে প্রবলবেগে অশ্রুধারা নির্গত হইয়া তুষারশুভ্রশ্মশ্রুদামের মধ্যে নির্ঝরিণীর সৃষ্টি করিল। বালিকা গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া অবাক হইয়া পিতামহের অবস্থা দেখিতেছিল।

যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন প্রাচীন গুপ্তসাম্রাজ্যের শেষ অবস্থা।

হইয়াছিল, তীরভুক্তিতে, গৌড়ে ও অঙ্গদেশে প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনরাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাগণ নামে মাত্র সাম্রাজ্যের অধীনতা স্বীকার করিতেন, কিন্তু তাঁহারা কখনও রাজধানীতে রাজস্ব প্রেরণ করিতেন না। তবে তাঁহাদের কেহই প্রকাশ্যভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন নাই। গুপ্তসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাকাল হইতে যে নূতন অভিজাত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছিল তাঁহাদিগের অধিকাংশই মগধ ও গৌড়বাসী। গুপ্তবংশের অভ্যুদয়কালে নববিজিত প্রদেশসমূহে তাঁহারা পুরস্কারস্বরূপ বিস্তৃত ভূসম্পত্তি লাভ করিয়াছিলেন। প্রাপ্তভূমির রক্ষার্থ তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া বিদেশে বাস করিয়াছিলেন। ইঁহাদিগের কতকগুলিকে বাধ্য হইয়া মগধে বাস করিতে হইত, কারণ তাঁহারা পুরুষানুক্রমে রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া সম্রাটসকাশ পরিত্যাগ করিতে পারিতেন না গুপ্তসাম্রাজ্য যখন ধ্বংস হইয়া গেল তখন শেষোক্ত অভিজাতসম্প্রদায়ের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিল। ক্রমে ক্রমে তাঁহাদিগের বিদেশস্থ অধিকারগুলি হস্তচ্যুত হইয়া গেল। গৌড়ে ও বঙ্গে যাঁহাদিগের অধিকার ছিল তাঁহাদিগকে কিছুকাল অভাব ভোগ করিতে হয় নাই। পরিশেষে সম্রাট মহাসেনগুপ্তের পিতা দামোদরগুপ্তের সময়ে তাঁহাদিগের অধিকারগুলিও বিনষ্ট হইল, পাটলিপুত্র ও মগধ অন্নহীন আভিজাত্যাভিমানী প্রাচীন অমাত্যবংশীয়গণে পূর্ণ হইয়া গেল, তাহার সহিত মগধসাম্রাজ্যের অবস্থা হীনতর হইয়া উঠিল।

রোহিতাশ্বদুর্গস্বামিন্ গুপ্তসাম্রাজ্যের উন্নতির অবস্থায় অত্যন্ত প্রতাপশালী ছিলেন, দক্ষিণপ্রত্যন্ত রক্ষার জন্য তাঁহারা সম্রাটগণের নিকট যথেষ্ট সম্মান পাইতেন। যখন দেশের পর দেশ বিজিত হইয়া সাম্রাজ্যভুক্ত হইতে লাগিল তখন তাঁহারা মালবে ও বঙ্গদেশে বিস্তীর্ণ ভূসম্পত্তি লাভ করিয়াছিলেন। সাম্রাজ্যধ্বংশের প্রারম্ভে মালবস্থিত সম্পত্তি তাঁহাদিগের হস্তচ্যুত হইয়াছিল। যতদিন বঙ্গদেশের সম্পত্তি তাঁহাদিগের আয়ত্ত ছিল ততদিন তাঁহাদিগকে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে হয় নাই। সম্রাট দামোদরগুপ্তের সময়ে বঙ্গের শাসনকর্ত্তা রাজস্ব প্রেরণে বিরত হন, তাহার পরেও কিছুকাল রোহিতাশ্বদুর্গস্বামিগণ বঙ্গদেশ হইতে কর পাইয়াছিলেন। ক্রমে তাহাও বন্ধ হইয়া গেল। দুর্গের চতুষ্পার্শ্বস্থিত উপত্যকাসমূহ দুর্গস্বামীর অধিকারভুক্ত ছিল, তাহার উৎপন্নের ষষ্ঠাংশ হইতে দুর্গস্বামীগণ কষ্টে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। যে বৃদ্ধ প্রভাতে পরিখাপার্শ্বে দন্তধাবন করিতেছিলেন। তিনি রোহিতাশ্বদুর্গের বর্ত্তমান অধীশ্বর যশোধবলদেব অতি প্রাচীন বংশসম্ভূত, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ উত্তরাধিকারসূত্রে বহুকালযাবৎ মহানায়ক উপাধি ধারণ করিয়া আসিয়াছেন, গুপ্তসাম্রাজ্যে তাঁহারা রাজকুমারগণের সমপদস্থ ছিলেন। যশোধবলদেবের বয়ঃক্রম সপ্ততিবর্ষের অধিক হইবে, তিনি দামোদরগুপ্তের সময়ে বহুযুদ্ধে যশোলাভ করিয়াছেন। মহাসেনগুপ্তের সময়ে মৌখরীবংশীয় সুস্থিতবর্ম্মাকে পরাজিত করিয়া তিনি দক্ষিণ মগধে বিদ্রোহাগ্নি নির্ব্বাপিত করিয়াছিলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্রের নাম কীর্ত্তিধবল। পুত্রও পিতার ন্যায় যশোলাভ করিয়াছিল, অভাব সহ্য

করিতে না পারিয়া পিতার অনুমতি না লইয়া বঙ্গে পূর্ব্বপুরুষগণের অধিকার পুনঃপ্রাপ্তির আশায় নদীবেষ্টিত সমতটে কীর্ত্তিধবল নিহত হইয়াছিলেন। স্বামীর মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করিয়া কীর্ত্তিধবলের পত্নী অগ্নিতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, তদবধি বৃদ্ধ যশোধবলদেব পিতৃমাতৃহীনা পৌত্রীকে লইয়া ভগ্নহৃদয়ে দুর্গমধ্যে বাস করিতেছিলেন। পুত্রের মৃত্যুর পর হইতেই তাঁহার দৈন্যদশা আরম্ভ হইয়াছিল, প্রজাগণ নিয়মিতরূপে করপ্রদান করিত না, বেতন না পাইয়া দুর্গরক্ষিগণ একে একে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া গেল, অবশেষে বৃদ্ধ পরিচারক রঘু ও পরিচারিকা নানিয়া ব্যতীত আর কেহই রহিল না। তখনও দুর্গস্বামীগণের অধিকারে যে ভূমি ছিল তাহার কর বা উৎপন্ন শস্য পূর্ব্বরীতি অনুসারে প্রদত্ত হইলে দুর্গস্বামীর অন্নাভাব হইত না, কিন্তু লোকাভাবে শস্য দুর্গে আনীত হইত না, কেহ চাহিতে যাইত না বলিয়া প্রজাগণ কর দিত না, অবশেষে যুবরাজ ভট্টারকপাদীয় মহানায়ক যশোধবলদেব অন্নাভাবে মৃতপত্নীর অলঙ্কার বিক্রয় করিতে বাধ্য হইলেন।

বালিকা কিয়ৎক্ষণ দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল; পিতামহের অবস্থা দেখিয়া তাহার চক্ষু দুইটি জলে ভরিয়া আসিয়াছিল। তাহার পরে নানিয়া আসিয়া তাহাকে ক্রোড়ে উঠাইয়া লইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গেল, রঘু একটা বৃহৎ থলিয়া স্কন্ধে লইয়া ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া উপস্থিত হইল; তাহাকে দেখিয়া বৃদ্ধের চৈতন্য হইল। তিনি বৃদ্ধ ভৃত্যের মুখের দিকে চাহিবামাত্র সে কটিদেশের বস্ত্র হইতে দশটি সুবর্ণ মুদ্রা বাহির করিয়া দিয়া কহিল "সুবর্ণকার ধনমুখ আপনাকে প্রণাম জানাইয়া বলিয়া দিয়াছে যে বলয়ের মূল্য সমস্ত এখন দিতে পারিল না সন্ধ্যার পূর্ব্বে অবশিষ্ট সুবর্ণমুদ্রা লইয়া সে স্বয়ং আসিবে।" নানিয়া ও রঘু লক্ষ্য করিল যে সে দিন বৃদ্ধ দুর্গস্বামী আহার করিতে পারিলেন না।

সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বে এক শীর্ণ বৃদ্ধ ধীবর মন্থর গতিতে দুর্গে প্রবেশ করিল, সে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ইতস্ততঃ চাহিয়া দেখিতেছিল, দেখিতেছিল যে তোরণে প্রহরী নাই, তোরণের কপাটের কাষ্ঠখণ্ডগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, লৌহখণ্ডগুলি তোরণের সম্মুখে ভূমিতে পতিত রহিয়াছে। দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করা সুকঠিন হইয়া উঠিয়াছে, প্রাঙ্গণ তৃণগুল্মে আচ্ছাদিত হইয়া গিয়াছে, প্রাকারে অশ্বত্থ বট প্রভৃতি বৃহদাকার বৃক্ষ বহুকাল পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, দুর্গস্বামিগণের আবাসগৃহগুলি ভগ্নদশায় পতিত হইয়াছে। কক্ষের সজ্জাসমূহ অযত্নে মলিন হইয়া গিয়াছে, স্থানে স্থানে কীট ও পক্ষিগণের অত্যাচারে অব্যবহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে, দুর্গাভ্যন্তর দেখিলেই বোধ হয় যে সেস্থানে এখন আর মানবের আবাস নাই। দ্বিতীয় দুর্গের নিম্নে একটি ক্ষুদ্র কক্ষের সম্মুখে একখানি বহুমূল্য প্রাচীন পারসীক আস্তরণের উপরে বৃদ্ধ দুর্গস্বামী বসিয়া আছেন, সুবর্ণকার তাঁহাকে দেখিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল, বৃদ্ধ তাহাকে বসিতে আদেশ করিলেন, কিন্তু সে উপবেশন করিল না। একটি বস্ত্রাধার হইতে

কতকগুলি সুবর্ণমুদ্রা বাহির করিয়া বৃদ্ধের সম্মুখে স্থাপন করিল, কহিল "বলয়ের মূল্য কত হইবে তাহা এখানে নির্দ্ধারণ করিতে পারিতেছি না, উপস্থিত সহস্র সুবর্ণমুদ্রা আনিয়াছি, অবশিষ্ট অল্পদিন মধ্যে পাটলিপুত্র হইতে আনাইয়া দিব।"

বৃদ্ধ। "বলয়ের মূল্য কি এত অধিক হইবে?"

ধন। "আমার যতদূর বিদ্যা তাহাতে বোধ হয় যে ইহার মূল্য দশসহস্র সুবর্ণমুদ্রার কম হইবে না।"

বৃদ্ধ। "এত অধিক মূল্য কি তুমি দিতে পারিবে?"

ধন। "আমার পুত্রকে পাটলিপুত্রে পাঠাইয়াছি, সে ফিরিয়া আসিলেই দিতে পারিব।"

বৃদ্ধ নিশ্চিন্ত হইলেন, কিন্তু ধনমুখ পূর্ব্ববৎ সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল, চলিয়া গেল না। কিয়ৎক্ষণ পরে বৃদ্ধ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন "ধনমুখ, জাপিলগ্রামে আমার সৈন্যাধ্যক্ষ মহেন্দ্রসিংহ বাস করিত, সে কি জীবিত আছে?"

ধন। প্রভো, মহেন্দ্রসিংহ বহুকাল স্বর্গগত হইয়াছে, তাহার পুত্র বীরেন্দ্রসিংহ কৃষিকার্য্য অবলম্বন করিয়াছে। তবে জাপিলগ্রামে আপনার পুরাতন ভৃত্য সেনানায়ক হরিদত্ত, অক্ষপটলিক, বিধুসেন এবং পর্ব্বতের উপত্যকায় সিংহদত্ত অদ্যাপি জীবিত আছে।"

বৃদ্ধের নয়নদ্বয় অকস্মাৎ প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল, তিনি কহিলেন "ধনমুখ, তুমি আসিয়াছ ভালই হইয়াছে, আমি পাটলিপুত্রে যাইব মনস্থ করিয়াছি, তুমি ইহাদিগকে একবার আমার নিকট পাঠাইয়া দিতে পার?" তখন বৃদ্ধ ধনমুখ নতজানু হইয়া করজোড়ে কহিল "প্রভো, আমি আপনার প্রাচীন ভৃত্যগণের অনুরোধে এই দুরারোহ পার্ব্বত্যপথ অতিক্রম করিয়া আপনার নিকট আসিয়াছি, দশবৎসর কাল কেহ আপনার সাক্ষাৎ পায় নাই, যাহারা বঙ্গদেশের যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিল তাহারা লজ্জায় আপনার নিকট মুখ দেখাইতে পারে নাই, কিন্তু আপনার অদর্শনে সকলেই অধীর হইয়াছে, তাহারা সকলেই আপনাকে দর্শন করিবার জন্য কল্য প্রভাতে দুর্গমধ্যে আসিতে চাহে।" বৃদ্ধের নয়নদ্বয় জলে ভরিয়া আসিল। তিনি কহিলেন "ধনমুখ, যাহারা আসিতে চাহে, তাহারা যেন আসে, আমি তাহাদিগকে দেখিলে বড়ই সুখী হইব, কিন্তু তাহাদিগকে বলিও যে আমার আর পূর্ব্বের ন্যায় সামর্থ্য নাই, লোকবল বা অর্থবল নাই, আমি যে তাহাদিগকে একমুষ্টি অন্ন দিতে পারিব তাহাও বলিয়া বোধ হয় না। তুমি বোধ হয় তাহা বুঝিতে পারিতেছ, নতুবা মৃতা দুর্গস্বামিনীর বলয় তোমার নিকট বিক্রয় করিতাম না।"

দুর্গস্বামীর কথা শুনিতে শুনিতে ধনমুখ নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছিল, তাহার আর বাক্যস্ফুর্ত্তি হইল না, সে পুনরায় ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

ক্রমশঃ।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

মানসী

৫ম ভাগ | আষাঢ়, ১৩২০ সাল | ৫ম সংখ্যা

অভয়ের কথা

(পর-মত পরীক্ষা)

(২)

"বক্তুরেব হি তজ্জাড্যং শ্রোতা যত্র ন বুধ্যতে।"

কথাটা সর্ব্বতোভাবে সত্য না হউক সর্ব্বতোভাবে মিথ্যাও নহে। কখনও বা শ্রোতার বুদ্ধিমান্দ্য কখন বা বক্তার। উভয়ই ব্যবহার-জগতে পাওয়া যায়। বক্তার অধিকার-তারতম্যে, গুরুতর বিষয়বিশেষে আদর থাকিলেও, দখল থাকে না। দখল থাকিলেও হয় ত মনের ভাব প্রকাশ করিবার উপযুক্ত শব্দের অনটন হয়। হিতৈষী পুরোহিত তোত্‌লা হইলে হিতাকাঙ্ক্ষী যজমানের বিপদ। যজমানের শ্রদ্ধা থাকিলেও শ্রাদ্ধ সুসম্পন্ন হয় না, অধিকন্তু যদি যজমান বধির হয়, তবে ত ব্যাপারটা প্রহসনমাত্রেই পর্য্যবসিত হয়।

লেখক অভয়বিষয়ে, অপরোক্ষানুভূতি দূরে রহুক, সুন্দর পরোক্ষজ্ঞানেরও বড়াই করে না। তবে কিঞ্চিৎ অল্পপরিমাণে পরোক্ষজ্ঞান আছে এবং সেই জ্ঞান অল্প হইলেও বিষয়টীর নিজ গৌরববশতঃ প্রচারযোগ্য, ইহা লেখক বিবেচনা করে। লেখক কিন্তু একটু তোত্‌লা, শব্দাভিধান তাহার অনায়ত্ত। এই মাত্র ভরসা যে, বর্ত্তমান কালের পাঠক-পাঠিকাগুলি শ্রদ্ধাবান্ ও শিক্ষিত। বধির যজমানের সংখ্যা অনেক কমিয়াছে। এক্ষণে যজমানগণ, তোত্‌লার কথার ত্রুটী, নিজ নিজ শিক্ষার বলে পূরণ করিয়া লয়। 'পার্ব্বতী-সুত-লম্বোদর' শুনিয়া 'পাক দিয়া সুতা লম্বা,' করিতে প্রবৃত্ত হয় না। যীশু বার বার

বলিয়াছেন যে, যদি কর্ণ থাকে তবে শুনিতে পাইবে, চক্ষু থাকে দেখিতে পাইবে। যীশুর শ্রোতৃবর্গের ভিতরে সকলের চক্ষু কর্ণ ছিল না। এক্ষণে শিক্ষা-বিস্তারের ফলে চোখকানওয়ালা মানুষ দুর্ল্লভ নহে। অভয়ের কথা যদি গুছাইয়া বলিতে পারি, তাহা হইলে যোগ্য শ্রোতার বোধ হয় অভাব হইবে না। হয় ত আমি ধৌত পট্টাম্বর, বিচিত্র মুকুট, মূল্যবান্ নূপুরাদি সজ্জাব মত ললিত ভাষায় সাজাইয়া আমার ঠাকুরকে পাঠকপাঠিকার নিকট সমুপস্থাপিত করিতে পারিব না। নাই পারিলাম। ঠাকুর আমার শান্ত, সমান, সুন্দর। তাহাতে অলঙ্কার দিয়া তাঁহার নিজ সহজ শোভাকে অধিক করা যায় না। ঠাকুরটীর নিরলংকার সহজ সৌন্দর্য্য ভাষার কারুকার্য্যের বড় অপেক্ষা রাখে না। আমি ঠাকুরকে দেখাইবার চেষ্টা করিব, তোমাদেরও তাঁহাকে দেখিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে।

এখন প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করা যাউক।

অভয়সুখপ্রার্থী শিষ্য ইষ্টপ্রাপ্তির উপায় জিজ্ঞাসা লইয়া নানাপন্থি-গুরু-সকাশে ক্রমে ক্রমে যাইবে। আমরাও তাহার সঙ্গে সঙ্গে যাইব, এইরূপ কথা আছে। আইস যাই।

শ্রমজীবী সম্প্রদায় :—কিয়ার হার্ডী শিষ্যকে বলিলেন যে, উদর-ভরণই পুরুষার্থ। ইহাকে অভয় করিতে হইলে প্রচুর অন্ন সংগ্রহ করিতে হইবে। ক্ষুধার বাড়া শত্রু নাই। ইহাকে জয় করার পরামর্শই জগতে উত্তম।

চক্রগৃহ :—চার্ব্বাক শিষ্যকে ডাকিয়া লইলেন; বলিলেন যে, বটে, অন্ন তুচ্ছ নহে, কিন্তু অন্ন উত্তম নহে। কৎলুখাঁর বন্দী জগৎসিংহই উত্তম। কেবল গ্রাসাচ্ছাদনে দুঃখ-নিবৃত্তি হয় বটে; সাক্ষাৎ-সুখ হয় না। গ্রাসাচ্ছাদন স্বাদু, সুকোমল হওয়া চাই এবং তৎসঙ্গে স্রক্‌চন্দনবণিতাদিও চাই। সংক্ষেপে বলিতে হইলে পঞ্চমকারই উত্তম, মৃত্যুই মোক্ষ; তৎপূর্ব্বে যত পার সুখভোগ করিয়া লও। নীতির প্রতিপালন নিজের জন্য নহে; পরকে উপদেশ দিবার জন্য নীতির উল্লেখ করিবে। ঋণ করিয়াও ঘৃত পান করিবে। ঋণশোধ পার ত করিবে, না পার মহাজনকে আইনের কূট সাহায্যে বঞ্চিত করিতে চেষ্টা করিবে। সমাজে যাহা পাপ বলিয়া খ্যাত, গৃহীত, কিন্তু যাহা সুখপ্রদ, তাহার আচরণ করিও। সাবধানে করিও, গোপনে করিও; এবং যাহাতে নিরাপদে সুখ লাভ হয় তজ্জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করিও। "Tolstoi" লিখিয়াছেন যে, পরস্ত্রীহরণকারী বলিয়া অভিযুক্ত কোনও এক ব্যক্তি সত্যই অপরাধী কি না

স্থির করিতে না পারিয়া জুরীগণ বিলম্ব করিতেছিল। বিচারকের একটী নিমন্ত্রণ-রক্ষার সময় উত্তীর্ণপ্রায় হইলে বিচারক জুরীদিগকে সত্বর হইতে আদেশ দেন, জুরীরা তাড়াতাড়ি আসামীকে অপরাধী সাব্যস্ত করিল। বিচারক তাহার কঠিন পরিশ্রমসহ দীর্ঘকারাবাস ব্যবস্থা করিয়া অবিলম্বে এজলাস ত্যাগ করিয়া নিমন্ত্রণ-রক্ষা করিতে যাইলেন। একটী সুপরিচিতা পরনারী বিচারক মহাশয়কে সেই দিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে সঙ্কেত-স্থলে অভিসার করিবার নিমন্ত্রণ করিয়াছিল! চার্ব্বাকের মতে বিচারক পাপী নহে; বিচারক যদি নির্ব্বুদ্ধিতাবশতঃ ধরা পড়িয়া নিজে আসামী শ্রেণীভুক্ত হয়, তবেই সে পাপী হইবে, নচেৎ নহে। বোকামীই পাপ; যেন তেন প্রকারে সুখভোগ নিরাপদে হইলে তাহা পাপ নহে।

শিষ্যের হৃদয় চার্ব্বাকের কথায় গুরু গুরু করিতে লাগিল। শিষ্য-নীতির মর্য্যাদা-লঙ্ঘন-সংস্কার অর্জ্জন করে নাই। পরলোক অপ্রত্যক্ষ বলিয়া যে অবাস্তবিক, তাহা বলিতে তাহার সাহস হয় না। প্রবাসী স্বামী অপ্রত্যক্ষ। কিন্তু তাহার হস্তাক্ষরলিপিদৃষ্টে ভার্য্যা জীবিত স্বামীর অস্তিত্বে অসন্দিহান থাকে এবং সিন্দুর শঙ্খ মোচন করে না। স্বামীর হস্তাক্ষর-লিপির মত পরলোক-স্বামীর অল্প বিস্তর সংবাদ সকল মনুষ্যেই মধ্যে মধ্যে পাইয়া থাকে। সুতরাং চার্ব্বাকের অনুমোদিত সুখ অভয় হইল না। পরলোকের ভয়যুক্ত হইল। অধিকন্তু ইহলোকেও উক্তরূপ সুখ ভয়বিদ্ধ। ঘৃতপানের জন্য ঋণই' বা প্রত্যহ পাওয়া যায় কোথায়? ভোগ-সামগ্রী যদি নীতিপূর্ব্বক বা অনীতিপূর্ব্বক আহরণই করা যায়, তাহাতেও তৃপ্তিই বা কিরূপে হইতে পারে? ইন্দ্রিয়বর্গের ভোগ দিবার সামর্থ্য অত্যন্ত সীমাবদ্ধ হওয়ায় নিরতিশয়-ভোগ-সম্ভাবনা নাই। প্রত্যহ ঘৃতান্ন যোগান হইলেও উদরাময়ের ভয় আছে। নটীর নৃত্য-বিলাস উত্তম বোধ হইলেও নিদ্রা বলপূর্ব্বক লম্পটের চক্ষু অন্ধ করিয়া দেয়। শিষ্য চার্ব্বাক-সঙ্গ ত্যাগ করিয়া উপস্থিত হইল—যন্ত্রাগারে।

যন্ত্রাগার—তত্রস্থিত বৈজ্ঞানিক সরল, সাহসী, স্পর্দ্ধাশূন্য। বৈজ্ঞানিক বলিল, ধারাবাহিক অভয় সুখ আমিও খুঁজিতেছি। আমিই পাই নাই; হে শিষ্য, তোমাকে দিব কি? যদি পাই, তবে আমি জগতের সকলকেই তাহা দিব। আমার বিশ্বাস, প্রকৃতিগত একটা অদ্বিতীয়, অলঙ্ঘ্য নিয়ম আছে। তাহার আবিষ্কার করিতে পারিলে আমরা প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ অধীন করিব এবং তাহাতে আমাদের ভবিষ্যতে দুঃখলেশ-সম্ভাবনা-রহিত ধারাবাহিক অভয় সুখ হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সে নিয়মটীর উদ্দেশ এতাবৎ পাওয়া যায় নাই।

হাজার বৎসর ধরিয়া যাহা যাহা অভ্রান্ত বলিয়া বুঝিতেছিলাম, একমুহূর্ত্তের একটী ব্যভিচার দৃষ্টে তাহা মিথ্যা হইয়া পড়িতেছে। কখন কখন মনে হয়, বুঝি অলঙ্ঘ্য, অদ্বিতীয় নিয়ম কিছু নাই, হয়ত নিয়মের অভাবই প্রকৃতির অদ্বিতীয় নিয়ম। যথা স্বপ্নসময়ে ব্যাপারগুলি বেশ নিয়ত বলিয়াই বোধ হয়; নিয়মের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় না, কিন্তু স্বপ্নভঙ্গে নিয়মাভাব বুঝা যায়। হয় ত একদিন এমন আসিবে যে, তখন জগৎ-ব্যাপারে নিয়মের অভাব দেখিলে বিস্মিত হইতে হইবে না।

কতকগুলি ক্ষুদ্র খুচরা অপ্রধান নিয়ম পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু দেখিতেছি, তাহাতে বিশেষ সুফল কিছু হয় নাই। বরং স্থলবিশেষে হিতে বিপরীত হইয়াছে।

যবক্ষার গন্ধক অঙ্গারের যেরূপ সংযোগে ঘনীভূত শক্তিমান বারুদ পাওয়া যায়, তাহা আবিষ্কার করিয়াছি। অবশ্য তাহাতে বড় বড় পাহাড় ভগ্ন করিয়া চলিবার পথ প্রশস্ত ও সুগম করিয়া জগতের উপকার করিয়াছি বটে, কিন্তু শতকোটীর অপেক্ষা অধিক লোকেরও হত্যা সম্পাদন করিয়াছি।

বস্ত্রবয়নের নিয়মটা পাইয়া প্রচার করায় বহু বৃদ্ধ তন্তুবায় হঠাৎ নিরন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের নূতন জীবিকা কিছু দিতে পারি নাই।

পশুলোমের সহ তাপের সম্বন্ধ বুঝিয়া লইয়া বহু কম্বল প্রস্তুত করিয়াছি। সব কম্বল বিক্রয় হইতেছে। যত কম্বল বাড়িতেছে ততই শীত বাড়িতেছে। পূর্ব্বে শীত সহ্য করিবার সামর্থ্য বেশী ছিল, তাহা কমাইয়া দিয়া যে ভালই করিয়াছি, এমন কথা নিশ্চয় করিয়া বলিতে সাহস হয় না।

নয়ন-তারার সহ আলোক-তরঙ্গের সম্বন্ধ-রহস্য উদ্‌ঘাটিত করিয়া বাজারে চসমা পাঠাইয়াছি। চসমার খরিদ্দারের সংখ্যা-বাহুল্যে মনে হয় যে, চক্ষুষ্মান্ লোককেও হয় ত অন্ধ করিয়া ফেলিতেছি। মন্দান্ধকে অন্ধতর করিতেছি।

পূর্ব্বকালে মানুষের দুগ্ধ মানুষেই খাইত; গোরুর দুগ্ধ গোরুতে খাইত। দেখিলাম একটি নিয়ম যে, বালক মাতৃস্তন্য পান করিলে জননীর শরীর দুর্ব্বল হয়; ঘাস বস্তুকে, গভীর উদরস্থ করিয়া, কৌশলে দুগ্ধ প্রস্তুত করা যায় ও সেই দুগ্ধ জননীর স্তন্যের উত্তম প্রতিনিধি। ইহা একটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। ইহাতে প্রতিকার হয় নাই। দেখা যায় যে প্রাণিগণ পূর্ব্বে সন্তানগণকে স্তন্যদান করিয়াও সংসারে যতটা পরিশ্রম করিয়া স্ব-পর কল্যাণকারিণী ছিলেন, বর্ত্তমানকালে তদপেক্ষা অল্প শ্রম করিতে হইলেও

তাঁহারা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়েন। অধিকন্তু গোবৎসগুলি স্বাধিকার হইতে বৈজ্ঞানিক দ্বারা বঞ্চিত হইয়াছে।

নিরাবরণ ভট্টাচার্য্যের অসভ্যতা অপেক্ষাকৃত ভাল ছিল। উপর্য্যুপরি তিনটা জামা পরিধান করিয়া বৈশাখের দিবা দ্বিপ্রহরে তড়িৎ পাখার বায়ু-সেবন-বিধান-রূপ বৈজ্ঞানিক সভ্যতাকে ঠিক সুব্যবস্থা বলা যায় না।

যাহাহউক একটা কথা অকপটে স্বীকার আমরা করিব যে, প্রত্যক্ষকে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করিতে শিখাইয়া বৈজ্ঞানিক জগতের যত উপকার করিতেছে, এত উপকার আর কেহ করে নাই। এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক অপেক্ষা আর কেহ আমাদের অধিক কৃতজ্ঞতাভাজন নহে। বৈজ্ঞানিক প্রত্যক্ষটী লইয়া তাহার যন্ত্রাগারে পরীক্ষা করে। প্রায়ই বৈজ্ঞানিকের জেরায় প্রত্যক্ষের সাক্ষ্য টেকে না। ইহাতে বৈজ্ঞানিকের অপেক্ষা বৈদান্তিকের লাভ বেশী হইয়াছে। পুরাতন গুরুমহাশয় বলিতেন পৃথিবী ঘুরে না, ঘুরিলে মাথা ঘুরিত; আমরা তাহাই বেদবাক্যের মত, নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করিতাম। গ্যালিলীও বলিলেন, পৃথিবী ঘোরে; মুর্খ স্বার্থপর রাজশক্তি, গ্যালিলীও সেই কথায় সনাতন ধর্ম্মবিশ্বাসের উচ্ছেদ চেষ্টা করিল, বলিয়া গ্যালিলীওকে কারাগারে নিক্ষেপ করিল। কিন্তু পৃথিবীকে স্থির রাখিতে পারিল না। বৈজ্ঞানিকেরই জয় হইল। আমাদের উপকার হইল; পৃথিবীর প্রত্যক্ষ স্থৈর্য্য যে মিথ্যা, তাহা প্রমাণ হইল। আমাদের অনুসন্ধিৎসা সহসা জাগিয়া উঠিল; আমরা বৈজ্ঞানিকের পদতলে বসিয়া আরও কতশত প্রত্যক্ষ অথচ ভ্রমগুলি বৈজ্ঞানিকের শ্রীমুখ-বচন-প্রমাণে শোধন করিয়া লইলাম। সূর্য্যালোক প্রত্যক্ষ শুভ্র হইলেও যে তাহা শুভ্র নহে, নীললোহিতাদি বহুবর্ণের সমবায় মাত্র, তাহা জানা গিয়াছে। লাল স্ফটিক, লাল জবাচ্ছায়ায় লাল হইয়াও লাল হয় নাই; জবাই নিজে লাল নহে; সূর্য্যকিরণগত লালকে জবা নিজস্ব না করিয়া লালকে পরিত্যাগই করে। পৃথিবী দেখিতে সমতল, কিন্তু সমতল নহে; তাহা বর্ত্তুলাকার। চন্দ্রের ব্যাস প্রত্যক্ষদর্শনে বিতস্তিপরিমাণ, কিন্তু তাহা আসলে বহুযোজনবিস্তৃত। বালকে দর্পণগত প্রতিবিম্বকে সত্য বস্তু বলিয়া প্রত্যক্ষ করিয়া আদর করে, কিন্তু তাহা আদরযোগ্য নহে। অভিনয়ের বা খড়ের রাক্ষস প্রত্যক্ষ করিলে বালকে ভীত হয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক তাহাকে ভীষণ বুঝে না, প্রত্যক্ষ ভীষণকে নিরপরাধ শান্তই বুঝে। সিংহচর্ম্মাবৃত হইলেও গর্দ্দভকে বৈজ্ঞানিক ধরিয়া

ফেলে, প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট শূন্য স্থলীতে অণুবীক্ষণাদি যন্ত্রসাহায্যে বহু বস্তুর সমাবে দেখাইয়া দেয়। প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট স্থির দীপশিখাটি যে স্থির বস্তু নহে, অসংখ্য শিখা দ্রুতপ্রবাহ, তাহা বুঝাইয়া দেয়। আমরা প্রত্যক্ষ দেখি যে, মানুষের মস্তকটা পায়ের উপর স্থাপিত, কিন্তু বৈজ্ঞানিক বলিয়া দেয় মস্তিস্ক-গৃহীত মানুষটী উৰ্দ্ধ পদ, অবাক্-শিরঃ। প্রকাণ্ড দীর্ঘ বাঁশ যে তুচ্ছ তৃণ, তাহা বৈজ্ঞানিকই প্রমাণ করিয়াছে। এতদ্বিধ নানা দৃষ্টান্ত উদাহৃত করিয়া দেখান যাইতে পারে যে, আজীবন প্রতিপালিত প্রত্যক্ষ-প্রমাণসিদ্ধ সংস্কারগুলি বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষায় অসিদ্ধ হইয়াছে।

বৈজ্ঞানিকের উপদেশ এই যে, প্রত্যক্ষকেই লও। কিন্তু তাহাকে অবিশ্বাস কর। যন্ত্রাগারে মুষা বা নিকষে পরীক্ষা করিয়া প্রত্যক্ষকে শোধিত করিয়া গ্রহণ কর। প্রায়শঃ যন্ত্রাগারের পরীক্ষায় প্রত্যক্ষ বিপরীতটীরই সত্যত্ব প্রতিপাদিত হইয়া পড়ে। তাহাতে আমাদের সাহস এত বাড়িয়াছে যে, সত্যানুসন্ধানকালে কোনও বস্তু প্রত্যক্ষ করিয়া, তাহার বিপরীতটীকেই, বিনা-পরীক্ষায়, সত্য ও প্রত্যক্ষীকৃত বস্তুটীই মিথ্যা, ইহা স্বীকার করিতে কুণ্ঠা হয় না। চন্দ্রের জ্যোৎস্না চন্দ্রের নিজস্ব নহে, তাহা সূর্য্যেরই; ইহা বুঝিবার পরে সূর্য্যের দীপ্তি যে সূর্য্যের নিজস্ব নহে অপর কাহারও হইবে, ইহা সহজেই, কোন বিবাদ না করিয়া, স্বীকার করিতে প্রবৃত্তি আমাদের হয়। শ্রুতি যখন বলে যে, আত্মাকে দেখাইবার জন্য সূর্য্যরূপ মশালের প্রয়োজন হয় না; ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকা ন বিদ্যুতাগ্নিঃ; বরং সূর্য্যাদি সেই আত্মার নিকট হইতে কর্জ্জ করিয়া জ্যোতিঃ পাইয়াই নিজেরা ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্ক হইয়াছে, তখন কথাটার ভিতরে যে কোন সার নাই, এমন বিবেচনা হয় না। যাহা হউক আমরা বিনাবিচারে প্রত্যক্ষকে ফাঁসি দিব না; অথচ বিনাবিচারেও ছাড়িয়া দিব না। ঈশ্বর-গীতায় লেখা আছে আমরা বড় অবোধ, যাহা দেখি তাহাই বিশ্বাস করি; অতস্মিন্ তৎবুদ্ধি করি; সুতরাং আমরা যাহাকে দিবা বলি তাহা কিন্তু নিশাই; এবং সেই নিশাতে আমরা যাহা প্রত্যক্ষ করিয়া সত্যবুঝি তাহা ভ্রমদর্শনই। কিন্তু নিশা বৈজ্ঞানিকের কাছে বস্তু গোপন করিতে পারে না। নিশাকালেও বৈজ্ঞানিক বস্তুর যথাতথ্য নিশ্চয় করিয়া লয় বলিয়া আমাদের নিশা-কালও বৈজ্ঞানিকের নিকট দিবার মত। বচনটী এই যে "যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।" বস্তুর স্বরূপের অগ্রহণ হয় অন্ধকারে এবং অন্যথা-গ্রহণ হয় মন্দান্ধকারে, যথা রজ্জুসর্পদর্শন সময়ে কি

অন্ধকার কি মন্দান্ধকার উভয়ই সত্যসম্বন্ধে, নিশাই। বুদ্ধিমান্দ্যই অন্ধকার ও মন্দান্ধকার ও গীতোক্ত নিশা।

বৈজ্ঞানিক শিষ্যকে প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়মটী দিতে অসমর্থ হইল, নিজেই তাহা আবিষ্কার করিতে পারে নাই। সুতরাং প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ বশীভূত করিয়া তাহাকে আমাদের সুখসাধনে নিয়োগ করার সন্ধান বৈজ্ঞানিকের নিকট পাওয়া গেল না। কিন্তু প্রত্যক্ষকে অবিশ্বাস করাই কল্যাণকর, এই বৈজ্ঞানিক উপদেশকে শিষ্য দৃঢ় কবচ বলিয়া গ্রহণ করিল। তাহাতে ঘটিল এই যে, ভ্রম মহাশয়কে, এই দৃঢ় রক্ষাকবচ-সন্নদ্ধ শিষ্যকে বিদ্ধ ও পাতিত করিবার আশা ত্যাগ করিতে হইল।

যজ্ঞশালা ঃ—শিষ্য বৈজ্ঞানিককে সবিনয় নমস্কারপূর্ব্বক যন্ত্রাগার হইতে যজ্ঞশালায় জৈমিনীর নিকট উপস্থিত হইল। জৈমিনীর উপদেশ এই যে, অভয় সুখ ইহজগতে পাইবে না। পরলোকে পাইতে পার। যদি কর্ম্মের উপাসনা যথোচিত প্রকারে কর তবে স্বর্গ ও তত্র কাম্য প্রাপ্তি হইবে। দুইটী মত প্রচলিত আছে। একটী এই যে স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্; অপরটী এই যে, হৃষীকেশ মানুষের হৃদয়ে থাকিয়া মানুষকে অবশভাবে কর্ম্ম করিতে বাধ্য করেন, কর্ম্মে সু বা কু কিছু নাই; মানুষ কর্ম্মের জন্য দায়ী নহে। মানুষ যন্ত্রবৎ। তাহার স্বাধীন ইচ্ছাবশে নিজকৃত কর্ম্ম কিছু নাই। যন্ত্রে অধিষ্ঠান করিয়া ঈশ্বর যন্ত্রকে যথেচ্ছ চালনা করেন। ঈশ্বর নিজ লীলা পোষণের জন্য নানা মানুষযন্ত্রকে নানা বিচিত্র কর্ম্ম করিতে বাধ্য করেন। বিচিত্র কর্ম্মগুলি ভাল বা মন্দ নহে। জগৎটী একটী সুবৃহৎ অভিনয়লীলা মাত্র। তত্র কর্ম্মগুলি ও কর্ম্মকর্ত্তাগুলিও অভিনয়ের মাত্র। অভিনয়ের পরপীড়ন ব্যাপার, অভিনয়ের রাবণ, দুঃশাসন কুক্কুরাদি দ্বারা সংঘটিত হয় এবং অভিনয়ের বানর, ভীম, মুদ্গরাদি দ্বারা শাসনক্রিয়া সম্পাদিত হয়। জৈমিনীর মতে এই দ্বিতীয় মতটী অসার, বাতীল ও নামঞ্জুর। এবং প্রথম মতটী অর্থাৎ কর্ম্মই ভোগায়তন দেহ-দাতা এবং ভোগদাতা এই মতটীই সমীচীন। জৈমিনীর অজ্ঞাত ছিল না যে, "কর্ম্মফল" মতে একটী বিশেষ দোষ আছে; তাহার নাম অন্যোন্যাশ্রয়, অনবস্থা বা অন্ধ-পরম্পরা। কর্ম্ম, ভোগায়তন ভবিষ্যৎ দেহ-দাতা হইলে বর্ত্তমান দেহ কোথা হইতে আসিল, এই প্রশ্নের উত্তরে স্বীকার করিতে হয় যে, তাহা অতীত কর্ম্মের ফল-স্বরূপ পাওয়া গিয়াছে। পুনঃ প্রশ্ন উঠে যে, অতীত কর্ম্ম করিবার জন্য যে একটী দেহ ছিল, তাহার

হেতু কি ? এইরূপে পূর্ব্বে কর্ম্ম, উত্তরকালে ফলরূপ দেহ, কিম্বা পূর্ব্বকালে দেহ, উত্তরকালে সেই দেহ দ্বারা কর্ম্ম সম্পাদিত হয়, ইহার ব্যবস্থিত মীমাংসা পাওয়া যায় না ; অনবস্থা দোষটীর পরিহার হয় না। বীজাঙ্কুর দৃষ্টান্তে বীজ ও বৃক্ষের কোন্‌টী হেতু, কোন্‌টী ফল, অগ্রে বীজ পরে বৃক্ষ, কিম্বা অগ্রে বৃক্ষ পরে বীজের জন্ম, তাহার সুনির্দ্দেশ হয় না। সুতরাং "কর্ম্মদেহ" ব্যাপারের হিসাব-নিকাশ করিবার জন্য, তুল্য দোষদুষ্ট বীজাঙ্কুর-দৃষ্টান্তের গ্রহণে শঙ্কাপ্রশ্নের জটিলতা পরিষ্কৃত হয় না, গোলযোগ যথাপূর্ব্ব থাকিয়া যায়। একটী অন্ধকে অপর একটী অন্ধ পথ দেখাইতে পারে না।

জৈমিনী কিন্তু উক্ত দ্বিতীয় মতে নিজ অপরিতোষ বশতঃ অগত্যা এই অনবস্থা-দোষদুষ্ট "কর্ম্মফল" মতকেই নিজে আশ্রয় করিয়াছেন ও অপরকে আশ্রয় করিতে উপদেশ দিয়াছেন। আমরা এই "কর্ম্মফল" মতটী নির্দ্দোষভাবে প্রতিপাদিত না হইলে গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত। কিন্তু ইহা আমাদের স্বীকার করিতে হইবে যে, জৈমিনীর উক্ত দ্বিতীয় মতে অপরিতোষের যথেষ্ট হেতু ছিল এবং তাহা আমরা নিজে নিজেই স্পষ্টই বুঝিতে পারি এবং আমরাও উক্ত দ্বিতীয় মতটীকে হঠাৎ গ্রহণ করিতে সাহস করি না। কর্ম্মে সু, কু, পুণ্য, পাপ, নাই, কেমন করিয়া বলিব ? আমাদের মনের গোচরে একটা না একটা কর্ম্মে পাপ পুণ্যভেদ, পদে বিদ্ধ কণ্টকের মত, সাক্ষাৎ বর্ত্তমান রহিয়াছে। একই কর্ম্মে হয় ত আমার পুণ্যবোধ, যথা শাক্তের পশুবলিতে ; সেই কর্ম্মেই হয় ত তোমার পাপবোধ, যথা বৈষ্ণবের পশু-হিংসায়। বিষয়ে ভিন্নতা থাকে থাকুক, কিন্তু কি শাক্ত কি বৈষ্ণব, প্রত্যেকেরই পাপপুণ্য বোধ আছে। একেবারে পাপত্ব পুণ্যত্ব মোটেই নাই, মানুষ নিজে কোনও কর্ম্মের জন্য দায়ী নহে, সমস্ত জগৎ-ব্যবহারই ঈশ্বরের লীলা মাত্র, অভিনয়ের পাপ পুণ্যবৎ নির্দ্দোষ, ইহা যখন মনের গোচর নহে, তখন সুতরাং এই মত গ্রহণ করা আমাদের মত অমুক্ত সাধকের পক্ষে অসাধ্য। তাই জৈমিনী, কর্ম্মফল-মতটী শুদ্ধ-নির্দ্দোষ না হইলেও, অনবস্থা দোষ দুষ্ট হইলেও, অগত্যা গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু শিষ্য লোকটা নৈয়ায়িক বৈজ্ঞানিকের কৃপাপাত্র, কলহ-নিপুণ ; সে অনবস্থা দোষ বা অন্য কিছু দোষ-লেশযুক্ত মত স্বীকার করিবে না ; অভয় সুখ-প্রাপ্তির নির্দ্দোষ উপায় যজ্ঞ-শালায় না পাইলে জৈমিনীকে ত্যাগ করিয়া অন্যত্র সন্ধান করিবে। আপাততঃ জৈমিনীর নিকটে যাহা বস্তু আছে, শিষ্য তাহার বিলক্ষণ আলোচনা বিচার করিবে। জৈমিনীর কথা এই যে, ঠাকুর মরে না, ঠাকুরের কলেবর বদল

হয়। মানুষের দেহ-মন্দিরে আত্মা-ঠাকুর আছে। দেহের পতন হইলেও আত্মা মরে না, বাঁচিয়া থাকিয়াই পরলোকে যায় ও তত্র নরক, দুঃখ বা স্বর্গসুখ ভোগ করিবার জন্য কোনও একটা দেহ আশ্রয় করে। প্রয়োজনমত বাসাবাটী ত্যাগ করিয়া অন্য বাসগৃহে প্রবেশ করার মত, আত্মার, কর্ম্মফল রূপ ভোগায়তন নূতন দেহ-প্রবেশ ঘটিয়া থাকে। তুমি সাবধানে যদুপদি কর্ম্ম, অঙ্গহীন না হয়, এমন ভাবে অনুষ্ঠান কর; তুমি পরে স্বর্গে দেবদেহ পাইয়া অভয় সুখভোগ করিও। গুটীপোকা যথা না মরিয়াই পূর্ব্বদেহ বর্জ্জন পূর্ব্বক অত্যন্ত বিলক্ষণ প্রজাপতিদেহ স্বীকার করে, মানুষ যথা না মরিয়াই জাগ্রৎ দেহ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক স্বাপ্নিক নূতন দেহাশ্রয় করে; তদ্বৎ যাজ্ঞিক তুমি না মরিয়াই ঐহিক দেহ ত্যাগ ও দেবদেহাশ্রয় করিয়া বিনা বিঘ্নে যৎপরোনাস্তি স্বর্গসুখ ভোগ করিতে পারিবে। যজ্ঞই কর্ম্ম, কর্ম্মেই ভোগায়তন দেহ ও কর্ম্মেই স্বর্গফল ভোগ। ফলদাতা কর্ম্মেরই সম্যক্ অনুষ্ঠান কর। একটা কথা বলিব, তাহাতে উপহাস করিও না। কর্ম্ম, অনুষ্ঠান-কারীকে যে ফল দেয়, তাহা বাধ্য হইয়া দেয়। কর্ম্ম কর্ম্মীর উপর সুতরাং ঠিক সদয় নহে। কর্ম্ম অঙ্গহীন ভাবে অনুষ্ঠিত হইলে, সেই স্থলে, কর্ম্ম, ফল দেয় না। সুতরাং কর্ম্মী অপ্রমত্ত থাকিয়া ঠিক নিয়মমত কর্ম্ম করুক, কোনও যেন ক্রটী না থাকে। মন্ত্রের উচ্চারণে দোষই সর্ব্বপ্রধান ক্রটী। 'ইন্দ্রশত্রু' শব্দের উচ্চারণভেদে দুইটী অর্থ হয়। ইন্দ্র যাহার শত্রু সেই বৃত্রই, ইন্দ্রশত্রু শব্দের লক্ষ্য হইতে পারে। এবং ইন্দ্রই শত্রু, সেই ইন্দ্রই ইন্দ্রশত্রু শব্দের লক্ষ্য হইতে পারে। বৃত্র মহাশয় যজ্ঞাগ্নিতে "ইন্দ্রশত্রু হত হউক" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পূর্ণাহুতি দিয়াছিল। তাহার ইচ্ছাছিল ইন্দ্রের মৃত্যু হয়, কিন্তু বৃত্রের উচ্চারণদোষে মন্ত্রগত ইন্দ্রশত্রু শব্দ বৃত্রকেই বুঝাইয়াছিল এবং বৃত্র নিজেই হত হইয়াছিল; ইন্দ্র মরে নাই।

এই বিষয়ে লৌকিক দৃষ্টান্তও আছে। "রাম একটা ঘোড়া দাও" এই মন্ত্র এক ব্যক্তি দীর্ঘকাল জপ করিয়াছিল। লোকটার উচ্চারণে দোষ ছিল। একদা এক সিপাহীর প্রিয় অশ্ব মরিয়া যায়। সে নিকটে জাপককে দেখিয়া বলপূর্ব্বক তাহার স্কন্ধে মৃত ঘোড়াটী চাপাইয়া দেয়। এবং অশ্বটীর কবরস্থান পর্য্যন্ত জাপক সেই মৃত ঘোড়াটী বহন করিয়া লইয়া যায়। বহনকালে জাপক ভাবিয়াছিল যে, রাম উল্টা বুঝিয়াছে। জাপক চড়িবার ঘোড়া চাহিয়াছিল, রাম বহিবার জন্য ঘোড়া দিল। জৈমিনী বলেন রাম দোষী নহে, রাম উদাসীন, রাম ভাবগ্রাহী হইয়া বাঞ্ছাটি স্বীকার করিতে রাজী নহে। যত দোষ ঐ

জাপকের উচ্চারণের; চড়িবার জন্য যে ঘোড়া তাহার উচ্চারণ উদাত্ত এবং বহিবার জন্য অনুদাত্ত, জাপক অনুদাত্ত জপ করিয়াছিল, দোষ তাহারই।

হে শিষ্য, তুমি কিছুদিন ধরিয়া উচ্চারণ দোরস্ত কর। শিষ্য সুতার্কিক। শিষ্য জেরা করিয়া জৈমিনীকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। বলিল যে এই লোকেই, হস্তামলকবৎ, অভয় সুখের বিধান ত পাওয়া গেলই না, অধিকন্তু ব্যাকরণপাঠ, উপবাস, কায়ক্লেশাদিসাধ্য ব্রতধারণাদি দুঃখের বেশ বন্দোবস্ত পাওয়া গেল। ধ্রুব ত্যাগ ও অধ্রুব উপাসনা-পদ্ধতি অর্থাৎ ধ্রুব ঐহিক সুখবর্জ্জন ও অনিশ্চিত অপ্রত্যক্ষ স্বর্গসুখের আশার আরাধনা-প্রণালী শিষ্যের পরিতোষজনক হইল না।

অপিচ স্বর্গসুখ অভয় নহে। সভয়ই। স্বর্গভোগ ক্ষয়িষ্ণু এবং ভোগকালেই স্বর্গে মর্য্যাদার তারতম্য আছে। রাজা ইন্দ্র, প্রজা বরুণ আছে। সুধা, পারিজাত ঐরাবতাদি তত্র সুলভ হইলেও, নিরঙ্কুশ-সুলভ নহে। ইন্দ্ররাজ যখন ঐরাবতাদি ভোগ করিতে থাকেন, তখন বরুণাদি অধীনগণ কামী হইয়াও অতৃপ্তাবস্থায় অবসর প্রতীক্ষা করিতে বাধ্য হয়। স্বর্গে অশ্বিনী নামে বৈদ্য আছে, তবেই স্বর্গে রোগ আছে। রোগভয়, ভয়ই, স্বর্গ সুখকে অভয় হইতে দেয় না। স্বর্গে অপরাধ নামে ইন্দ্ররাজেরও শাসনকর্ত্তা বর্ত্তমান, অপরাধী নহুষাদির মত ইন্দ্রত্ব হইতেও পতন হয়। স্বর্গসুখ অভয় নহে; তাহা সভয়ই, বুঝিয়া শিষ্য যজ্ঞশালা ত্যাগ করিল।

পর্ব্বত-গুহা ঃ—বলিষ্ঠকায়, সুস্থ, অল্পে তুষ্ট, একান্তবাসী, হাস্যবদন জনৈক উদাসীন শিষ্যকে বলিল, পলায়নই অভয় সুখপ্রাপ্তির অদ্বিতীয় উপায়। পিতামাতা, ভাই, বন্ধু প্রভৃতির সঙ্গলিপ্সা আমারও ছিল, ও তাহাদিগকে আদর করিয়া ও তাহাদের নিকটে আদর পাইয়া সুখী হইব, বড় আশা ছিল। কিন্তু আমার ও আমার ন্যায় সকলেরই আশা ভঙ্গ হইয়াছে। তথাপি লোকে এখনও লোকালয়ে,স্বার্থপূর্ণ কুটুম্ব প্রতিবাসিগণের নিকটে থাকিয়া কৌশলে সুখ পাইবার চেষ্টা করিয়া বৃথাই অমূল্য জীবন অতিবাহিত করিতেছে। জগতে সুখলেশ নাই। দুঃখই মধ্যে মধ্যে সুখরূপ ধারণ করিয়া, কণ্ঠলগ্না সুন্দরীর মত, কপট মায়া বিস্তার করে; পরে সেই ক্ষণিক সুখের অবসান হয়। মানুষ পুনরায় সেইরূপ সুখের পুনঃ প্রাপ্তির জন্য যত্ন করে। প্রায়ই পায় না। কদাচিৎ পায়। সুখের কাদাচিৎকতাও দুঃখে পর্য্যবসান সুনিশ্চিতই; কিন্তু মনুষ্য তথাপি সংসারে উন্মত্তবৎ লিপ্ত। সংসারটা দদ্রুর মত, অনবরত চুলকাইতে হয়। বটে

চুলকাইয়া কিছু সুখ হয়। সেই কিন্তুত অধম সুখে মগ্ন থাকা বুদ্ধির পরিচায়ক নহে। শিষ্য, তুমি সংসার হইতে পলাইয়া অরণ্যে আইস। তোমার অভয় সুখ হইবে। তুমি সংসারলিপ্ত গুরুর নিকট "গার্হস্থ্যই কর্ত্তব্য", "জনক রাজার মত নির্লিপ্ত ভাবে সংসার করাই মুক্তির পথ" এরূপ উপদেশ গ্রহণ করিও না। একদা একটী হাঁপকাশরোগীকে চিকিৎসা করিবার জন্য আহুত চিকিৎসক রোগীর দ্বারদেশে আসিয়া বসিয়া পড়িল ও বলিল যে, কিঞ্চিৎ বিলম্ব কর। আমি বাটীর ভিতরে রোগীকে দেখিতে যাইবার পূর্ব্বে একটু বিশ্রাম করিয়া লইব; আমার হাঁপকাশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। রোগীর অভিভাবক বুদ্ধিমান ছিল, বলিল তুমি নিজের হাঁপকাশ আরাম করিতে পার নাই, তুমি রোগীর উপকার করিবার সাহস কি হিসাবে কর। তুমি ফিরিয়া যাও; তোমার দ্বারা রোগীর চিকিৎসা করাইব না। সংসারী গুরু হাঁপকাশযুক্ত চিকিৎসকের মত, হাঁপকাশযুক্ত সংসারীর কোনও উপকারে লাগিতে পারে না। শিষ্য, তুমি সংসারকে হঠ পূর্ব্বক ছাড়িয়া পর্ব্বত—গুহাতে আসিয়া বসবাস কর। দেখ নিদ্রার পূর্ব্ব-কালেই শয্যার তদ্বির। নিদ্রিত হইলেই, শয্যা দুগ্ধফেননিভ, কি কঠিন দারু-খণ্ড, কি কঠিনতর পাষাণ, তাহার কোন বিচার থাকে না। ক্ষুন্নিবৃত্তি ঘৃতান্নেও হয়, অল্প ভাজা-ছোলাতেও হয়। খাদ্যের তারতম্য আছে, কিন্তু ফলে অর্থাৎ ক্ষুন্নিবৃত্তিতে তারতম্য নাই। তুমি ফল বিষয়ে লক্ষ্য রাখ, অল্পে তুষ্ট হইতে অভ্যাস কর। গুহাতে বিলাস-সামগ্রী মিলিবে না বটে, কিন্তু ক্ষুন্নিবৃত্তি ও নিদ্রা বিশ্রামাদির জন্য অযত্নসিদ্ধ-সুমিষ্ট-ফল-সমৃদ্ধ আরণ্য বৃক্ষগণ হইতে আহার্য্য ফল, দুঃস্বপ্নরহিত গাঢ় নিদ্রার জন্য গুহামধ্যে শীতল শিলাতট মিলিবে। ভবিষ্যতে শিশুর জগতে আগমন প্রতীক্ষায়, জননী যথা, পূর্ব্ব হইতে বক্ষে দুগ্ধ-কলস ধারণ করিয়া থাকেন, তথা সন্ন্যাসীর জন্য বনদেবী বৃক্ষে ফল, নদীতে পানীয় ও বৃক্ষতলে শয্যা পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। উক্ত উদাসীনের অভি-প্রায় যে মানুষ বাসনা ত্যাগ করুক। বাসনা তৃপ্তির জন্য বস্তুসংগ্রহচেষ্টায় দুঃখ; চেষ্টা বৃথা হইলে, বস্তু না পাইলে দুঃখ, পাইলে কথঞ্চিৎ সুখ; কিন্তু ভয় যে পাছে বস্তু ভবিষ্যতে পরহস্তগত হয়; এবং প্রাপ্তবস্তু ভোগের পরে তাহাতে তুষ্টি হইয়া গেলে পুনরায় ইতর কোনও বস্তু প্রাপ্তির বাসনার উদয় ও তদ্দুখ নানা ঝঞ্ঝাট্ ও দুঃখ হয়। শিষ্য বলে যে, যদি সাংসারিক বস্তুতে বহু কষ্টে—বাসনা ত্যাগ করাই যায়, তবে দুঃখের অধিকার হইতে মুক্ত হওয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু সাক্ষাৎ সুখের বস্তু কিছু মিলিল কৈ? উদাসীন বলে মিলিবে, তাহা ভূমা;

কিন্তু তাহা যাহার মিলিয়াছে সেই জানে, সে তাহা অপরের বোধগম্য করিতে পারে না, যথা যুবা বালককে বিবাহের মর্ম্ম চেষ্টা করিয়াও বুঝাইতে পারে না। শিষ্য বলে যে, যে বুঝাইতে পারিবে অভয় সুখটী কি বস্তু, তাহাকেই আমার আবশ্যক। যে উদাসীন তাহা পারে না, তাহাকে আমার আবশ্যক নাই। শিষ্য উদাসীনের বাসনা-ত্যাগটীর গুরুত্ব ঠিক উপলব্ধি করিতে পারিল না; বৈরাগ্যই যে অভয় তাহা বুঝিল না। তাহার জিদ্ হইয়াছে যে, অভয় সুখ বুঝিয়া লইতে হইবে এবং তাহা পাইতেই হইবে। সে পর্ব্বতগুহা হইতে উদ্যান-বাটিকাতে যাইল।

উদ্যান-বাটিকাঃ—তত্র বসন্ত বাবু সুখে সমাসীন। বসন্ত নিজে কবি ও মন্ত্রণাকুশল। বসন্ত জগৎ হইতে পলায়ন করিতে চাহেন না; পলায়ন করা অনাবশ্যক বুঝে। সে আশ্রিতজনকে, নিজে যে অভয় সুখ ভোগ করে সেই অভয় সুখ দান করিতে প্রস্তুত আছে। কোকিল বসন্তের অনুগত, আশ্রিত, সহচর। শিষ্য যদি কোকিলের মত বসন্তের শরণ লয়, শিষ্যও অভয় সুখে সুখী হইতে পারে। ভাড়াটীয়া বাটী ত্যাগ করিবার সময় মনুষ্য যথা নিজ শয্যা, বাসনাদি সম্পত্তি সঙ্গে লইয়া নূতন ভাড়টীয়া বাটীতে বাস করে, তদ্বৎ চঞ্চল বসন্ত বাবু প্রতি বৎসরের দুই দুই মাস এক স্থলে বাস করিয়া পরে অন্য স্থলে যাইয়া দুই মাস অবস্থান-ক্রমে নিরক্ষবৃত্তের উত্তর দক্ষিণ প্রদেশ যাতায়াত করে; ও যেখানে যে সময়ে অবস্থান করে তখন সেই স্থলে তাহার উদ্যান-বাটিকা সঙ্গে লইয়া যায়। সুতরাং সদাই ফুল ফুটিয়া থাকে, মলয় পবন, শীতল সুগন্ধ বহমান থাকে, নিত্য-সহচর কোকিল কুহুস্বরে বসন্তের কর্ণের তৃপ্তিসাধন করে ও কোকিল নিজেও বসন্তের নিত্য-সাহিত্যে উল্লাসিত থাকে, মধুমত্ত অলিগুঞ্জনের সঙ্গীত-লোভে সুন্দর ও সুন্দরী দেবদেবীগণ প্রকট অপ্রকট থাকিয়া বসন্তের শোভিত উদ্যানকে সুশোভিত করিয়া রাখে। শিষ্য যদি চতুর হয়, জগৎ হইতে পলায়ন না করিয়া বাস-স্থান পরিবর্ত্তন যথাসময়ে করিয়া, কোকিলের মত যে স্থলে যে সময়ে বসন্ত সেই সময়ে সেই স্থলে বাসা লউক। মোটা ভাত মোটা আচ্ছাদনে তুষ্ট থাকিয়া, বসন্তের নিত্য সহচর হইয়া নিরবচ্ছিন্ন ফুলের হাসি, চাঁদের আলো মলয় পবনের কোমল পরশ, তরুবরালিঙ্গিতা সুকুমারী লতিকার স্নেহ ইত্যাদি রস অনুভব করতঃ শিষ্য, কোকিলের মত, ধারাবাহিক সুখভোগী হইতে পারে। তাহা হইলে শিষ্যকে আর ঘর্ম্মাক্ত গ্রীষ্ম, ভিজা বরষা বা কম্বাবরণ

শীতাদি অমঙ্গলের সহ দেখা সাক্ষাৎ প্রযুক্ত দুঃখভোগ করিতে হইবে না। শিষ্যের মনে হইল আহা বেশ! যদি জরা মরণ না থাকিত, তাহা হইলে আমি কবি কোকিলের মত বাসা পরিবর্ত্তন করিয়া প্রিয় বসন্তের নিত্য সহচর হইয়া নিরবচ্ছিন্ন অভয় সুখ ভোগ করিতাম। কিন্তু হায়, জরামরণ শরীরকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিবে। আমি বৃদ্ধ হইলে জগতে বসন্ত-শোভিত স্থানগুলি পর্য্যটন করিতে অশক্ত হইব, বুঝি এই কুৎসিত নির্দ্দয় জরা-মরণ ব্যাধি হইতে পরিত্রাণের জন্যই আমাকে বৈদ্যরাজ বৈদান্তিকের নিকটে শেষে যাইতে হইবে। আপাততঃ দেখা যাউক কপিলদেব কি বলেন।

কপিলাশ্রম ঃ—তত্র সকলেই বলে, আমরা বহু অসঙ্গ পুরুষগণ, চেতনবর্গ। প্রকৃতি একা, জড়। প্রকৃতি একা হইয়াও নানারূপে আমাদের সমক্ষে দণ্ডায়মানা। তত্তৎ নানা আকারে বৈচিত্র্য আছে, কিন্তু ভাল মন্দ নাই। একই বস্তুকে কেহ সুন্দর, কেহ কুৎসিত, দেখিয়া অনুরাগ বা দ্বেষ করে; কেহ বা সেই বস্তুকে দেখিয়া উদাসীন থাকে। এই ভাল, মন্দ, ঔদাসীন্যের সাক্ষাৎ হেতু জড়া প্রকৃতির নানা সংস্থানে নাই; আছে চেতন পুরুষে। আমাদের যে ভাল মন্দ বোধ হয়, অবশ্য তাহা প্রকৃতির নানাকার দেখিয়াই হয়। এই হিসাবে আমাদের রাগ দ্বেষের সাক্ষাৎ হেতুত্ব প্রকৃতিতে নাই বটে, কিন্তু প্রকৃতির কিঞ্চিৎ অপেক্ষা াছে। প্রকৃতি-সন্নিধানে দণ্ডায়মান থাকিয়া নানাকার গ্রহণ না করিলে আমাদের তত্তৎ নানাকারে রাগদ্বেষের উৎপত্তি হইত না। আমরা যদি প্রাকৃতিক নানা সংস্থানে রাগদ্বেষ ত্যাগ করি, তাহা হইলে, বিষহীন উরগের মত, প্রকৃতি দণ্ডায়মানা থাকিয়াও আমাদিগকে জ্বালা যন্ত্রণা দিতে অসমর্থ হইবে। প্রকৃতিকে আমাদিগের উপর উপদ্রব করিবার ক্ষমতাহীন করিতে হইলে প্রকৃতির শোধন আবশ্যক নহে। আমাদের নিজেরই ভ্রমদোষ, লালসাদোষ, সংশোধন প্রয়োজন। তাহা হইলেই অর্থাৎ পুরুষ নিজ নিজ অসঙ্গতা বিবেকপূর্ব্বক বুঝিয়া লইলেই আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক, এই ত্রিতাপের অত্যন্ত উচ্ছেদ হইবে এবং সেই অত্যন্ত দুঃখ-নিবৃত্তিই পরম পুরুষার্থ। যে বিবেকদ্বারে পুরুষের অসঙ্গতা প্রতিপাদিত হয় তাহার উপার্জ্জন কোনও কঠিন অনুষ্ঠানের অপেক্ষা রাখে না; যৎকিঞ্চিৎ বাক্য-ব্যয়েই কার্য্য সমাধা হয়। কোনও শ্রম নাই, সমাহিতচিত্তে ব্যাপারটী বুঝিয়া লইলেই হয়।

এক সময়ে প্রকৃতির নানাকার ছিল না। সুষুপ্তির মত প্রকৃতি একাকার,

ছিল, অব্যক্ত অর্থাৎ ঈষদ্ব্যক্ত মাত্র ছিল। আমরা চেতন পুরুষগুলি নিকটেই ছিলাম। আমাদের পরস্পর সান্নিধ্যবশতঃ প্রকৃতির ক্ষোভ হইয়াছিল; চুম্বক সন্নিধানে যথা লৌহ চঞ্চল হয়, চন্দ্র সমীপে যথা সাগর তরঙ্গায়িত হয়। ক্ষোভ হইলে সমানাকার প্রকৃতির নানা বিষমাকার দেখা গেল; এবং আমরা যে বহু চেতন স্বচ্ছ পুরুষ-স্ফটিক নিকটে ছিলাম, সেই আমাদের, কাহারও উপর প্রকৃতির নানাকারগত অন্যতম জবার লাল ছায়া, কাহারও উপর অপরাজিতার নীল ছায়া, কাহারও উপর চম্পকের পীত ছায়া পড়িল। আমরা অসঙ্গ পুরুষ বটে এবং নীল লোহিতাদি ছায়া বাস্তবিক হইলেও, ছায়া সহ আমাদের সম্বন্ধ অতাত্ত্বিক বুঝিতেছিলাম; এমন সময়ে কি জানি কোন কারণে স্বপ্রবিষ্ট ইব ছায়া দেখিতে দেখিতে ভ্রম হইয়া পড়িল এবং "ইব" টা ভুলিয়া সত্য ছায়া সম্বন্ধের অভিমান ঘটিল। পরের গচ্ছিত টাকা যথা অনেকদিন নিকটে থাকিলে তাহাতে মমতা হয় ও প্রত্যর্পণে অনিচ্ছা জন্মলাভ করে; যথা পালিত পুত্রে স্নেহ অতর্কিতভাবে সংজাত হয়। আমরা ভ্রমে আমাদিগকে সত্যই ক্রুদ্ধলাল, ভীতনীল, প্রণয়রুগ্নপীত বুঝিয়া নানা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলাম এবং দুঃখেরও দুঃখানুবিদ্ধ, অর্থাৎ দুঃখপরিণামী, সুখের ভোক্তা হইয়া প্রকৃতির অধীন ইব হইয়া পড়িলাম। এই যে আমাদের বন্ধন, এই যে প্রকৃতির সহ মমত্বাদি সম্বন্ধ স্থাপন, এই যে একটা "ইব" মাত্র, ইহা তাত্ত্বিক নহে; ইহা অভিমানিক মাত্র। এই ব্যাপারটী যে ব্যক্তি গুরুমুখে পরোক্ষভাবে শুনিয়া, বুঝিয়া, অপরোক্ষ করিতে পারিবে, সে নিজেকে সদা শুভ্র মুক্ত শুদ্ধ স্ফটিক অসঙ্গ পুরুষ বুঝিয়া মুক্ত হইবে। যাহার এই বিবেক অপরোক্ষভাবে না হইবে, সে নিজ স্বীকৃত ভ্রমে ভ্রান্ত হইয়া আপনাকে বদ্ধ বুঝিবে ও বদ্ধ থাকিবে। সে জবা অপরাজিতার ছায়া স্পর্শকে সত্য বুঝিতে থাকিবে ও রাগদ্বেষ অবিদ্যা, অস্মিতা ও মৃত্যুর অভিনিবেশ রূপ পঞ্চক্লেশক্লিষ্ট হইয়া, ত্রিতাপতপ্ত জীবনযাত্রা দুঃখে নির্ব্বাহ করিতে থাকিবে। শিষ্য, তুমি আপনাকে প্রকৃতি হইতে বিবিক্ত, পৃথক্, অসঙ্গ পুরুষ বুঝিয়া মুক্ত হইয়া যাও। শিষ্য আপত্তি করে যে, কপিলের সাংখ্যমতে দুঃখনিবৃত্তি হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও সাক্ষাৎ সুখ প্রাপ্তির কোন বন্দোবস্ত নাই; কিন্তু সাক্ষাৎ অভয় সুখই ত ইষ্ট; দুঃখ পরিহার মাত্র ইষ্ট নহে। ঔদাসীন্যেরও অসঙ্গতার অধিক ধারাবাহিক সুখ চাই। অধিকন্তু দুঃখ পরিহার ও নিরতিশয় হইতেছে না, ভয় থাকিয়া যাইতেছে। সেই প্রকৃতি দণ্ডায়মানা ও পুরুষ সন্নিহিত থাকিবে। বিবেকের পরে, মুক্ত হইবার পরে যে পুনরায় পূর্ব্ববৎ কোনও কারণে পুরুষের

প্রকৃতি সঙ্গ, প্রকৃতির অংশবিশেষে মমতানুরাগ ও অংশবিশেষে দ্বেষবুদ্ধি ভবিষ্যতে হইবে না, হইতে পারিবে না তাহার জামিন কি আছে? ভবিষ্যতে সত্য না হউক, ভ্রমেও যদি উক্ত প্রকৃতি সঙ্গ হয়, তবে ভ্রমটা, ভ্রম হলেও, দুঃখ ভোগটা ত সত্যই ঘটিয়া যাইবে; বন্ধনটা মিথ্যা হইবে না।

কপিল মহাশয় ভরসা দেন যে, বদ্ধ পুরুষ নিজের অসঙ্গতা পাকা বুঝিয়া লইলে, প্রকৃতি ভর্জ্জিতবীজবৎ পড়িয়া থাকিবে, তাহাতে আর অঙ্কুরোদ্গম হইবে না, আর সে মুক্ত পুরুষকে লুব্ধ মুগ্ধ করিতে পারিবে না।

কিন্তু হায় কপিল, বরষার দিনে কি কখন ছোলাভাজা খাইয়া সুখ পাও নাই? যেদিন বরষা হইবে সেইদিন বন্ধনমুক্ত পুরুষকে প্রকৃতি ভাজা আকারেই মজাইবে। তাহার প্রতিবিধান ত কিছু কর নাই।

সমাধি-মন্দির :—শিষ্যের কপিলমতে অরুচি। কপিলাশ্রম ত্যাগ করিয়া সে ইষ্টানুসন্ধানে চলিল। "অভয় সুখ দেলায়্ দে রাম" শিষ্যের এই চীৎকৃত হইলে পতঞ্জলির সমাধিভঙ্গ হইল। মুনি, শ্বাসকে নাসাভ্যন্তরচারী, দৃষ্টিকে ভ্রূমধ্যে স্থিরা ও মেরুদণ্ডকে জ্যামিতিক সরলরেখার মত ধারণ করিয়া নিশ্চিন্তাবস্থায় ছিলেন। সহসা শিষ্যকে দেখিয়া বলিলেন, ক্ষণবিলম্বে প্রয়োজন নাই; যদি অভয় সুখ পাইতে চাও, বাবাজি, তবে আমার কথা শ্রবণ ও পালন কর, শীঘ্র চক্ষু মুদ্রিত কর, গাঢ় সমাধি বা গাঢ় নিদ্রা স্বীকার কর, তাহা হইলে কপিলের প্রকৃতির দণ্ডায়মানা থাকা না থাকা উভয় সমান হইবে। তোমার সমাধি হইলে প্রকৃতি তোমার গোচর হইতে পারিবে না এবং সুকোমল ছায়াদ্বারে পরশ-বিভোল করিতে অসমর্থা হইবে। শিষ্য বলে, ঠাকুর, তোমার দশা স্বচক্ষে দেখিলাম; আমার চীৎকারে তোমার মত ওস্তাদের সমাধি ভাঙ্গিল ও দণ্ডায়মানা কপিল প্রকৃতির সহ পুনঃ পরিচয় ঘটিয়া গেল। সুতরাং আমার মত অপক্ব শিষ্যের সমাধিস্থ হইয়া চিরকাল নিরাপদে অবস্থান করার কোনও ভরসা নাই। চলিলাম।

বিরাট-পূজা :—অত্র রামানুজ পুরোহিত, শিষ্য যজমান। আমি শব্দে সচরাচর দেহ-সম্বলিত ব্যবহারিক "আমিকে" বুঝায়। কিন্তু আমি যখন বলি "আমার দেহ" তখন আমার দেহটাকে, সহজেই, আমার সম্পত্তি ঘটী বাটী গৃহ ছত্রাদির অন্যতম বুঝি। উক্ত দেহ-সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী "আমিটাকে" কিন্তু তত সহজে বুঝি না; স্বত্বাধিকারী বলিয়া বুঝি বটে, কিন্তু সম্পত্তিগুলিকে যথা দীর্ঘ বা ক্ষুদ্রাবয়বী, কঠিন বা কোমল, নূতন বা পুরাতনাদি গুণ সাহায্যে,

গুণসহযোগে, বেশ ভাল করিয়া, বিষয়রূপে, ইদং রূপে, ইন্দ্রিয়গোচর রূপে গ্রহণ করি, বুঝি, তথা স্বত্বাধিকারী "আমি" কে স্বত্বাধিকারী গুণযুক্ত এবং সম্পত্তিগুলির দ্রষ্টা সাক্ষী বলিয়া যোগেযাগে মাত্র 'বুঝি। আমিটার অবয়ব নাই, ইহা ইন্দ্রিয় নহে এবং ইন্দ্রিয়গোচর নহে; ইন্দ্রিয়গুলি ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যাবতীয় বস্তুগুলি ইহারই গোচর। ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে যে, আমিটাকে যে যোগেযাগে বুঝি সে আমিই বুঝি বা বুঝে, অপর কেহ নহে। যে কেহ আপনাকে "আমি" বলে, সে হয় সাবধানে বলে বা অসাবধানে বলে। আমি যখন বলি আমার দেহ, তখন আমিটা ও আমার দেহটা দুইটাকে পৃথক বস্তু রূপে উল্লেখ করা হয়। আমিটা স্বত্বাধিকারী এবং আমার দেহটা আমার ছত্র টুপি লাঠিরই মত একটা অন্যতম সম্পত্তি। আমিটা নিরবয়ব, ভাব রূপ, নিরাকার, সাক্ষী; আমার দেহটা সাবয়ব, ভাবরূপ, সাকার, সাক্ষ্য। অসাবধানে আমি শব্দ উচ্চারিত হইলে, উক্ত উভয় সাক্ষী সাক্ষ্য, মিলিত-ভাবে একটা ব্যবহারিক আমিকে বুঝায়। রামানুজের মতটা পরিষ্কার করিয়া বলিবার সময় ব্যবহারিক আমি শব্দে অথবা ব্যবহারিক আত্মা শব্দে, সাবয়ব দেহ সহ দেহের সাক্ষী নিরবয়ব স্বত্বাধিকারী আত্মাকে একযোগে মিলিত ভাবে বুঝিব। এবং আমি শব্দে বা আত্মা শব্দে শুদ্ধ কেবল নিরবয়ব, সাবয়ব দেহ হইতে পৃথক্, সাবয়ব দেহের সাক্ষী স্বত্বাধিকারীকে বুঝিব।

একাধিক নিরবয়ব বস্তুর উল্লেখ সময়ে, যদ্যপি, অবয়ব-রাহিত্য বশতঃ ক্ষুদ্র, বৃহৎ, বিশেষণের প্রয়োগ অযৌক্তিক, তথাপি প্রয়োজন হইলে বোধ-সুগমতার জন্য একটী নিরবয়বকে ক্ষুদ্র, অপর একটীকে বা বৃহৎ বলা হইবে।

আমার দেহ বলিলে, আমি ও দেহ এই দুই পৃথক্ বস্তু বুঝায়। আমার আত্মা বলিলে কিন্তু দুইটী পৃথক বস্তু বুঝাইবে না। যথা রাহুর শির বলিলে একই বস্তু বুঝায়, কারণ রাহুর সমগ্র অবয়বটী একটী শির-মাত্র; যথা শিলা পুত্রের শরীর বলিলে একই বস্তু বুঝায়, সমগ্র নোড়াটাই নোড়ার শরীর তদ্বৎ আমার আত্মা অর্থে একই "আমি" বুঝায়। অত্র ষষ্ঠী বিভক্তি দ্বিতীয় বস্তুকে সমর্পণ করিতে কুণ্ঠা প্রাপ্ত হয়।

গোটাকয়েক ব্যাবহারিক কৃমি কীট ও শত কোটী ব্যাবহারিক রক্তবীজ আমার দেহটার ভিতরে বসবাস করিতেছে। তাহারা প্রত্যেকে নিজে নিজে "আমি" "আমি" বলিয়া বুঝে ও ব্যবহার করে। কখন কোনও এক খাদ্য খণ্ডে দুইটা কৃমির লোভ হইলে তাহারা পরস্পর বিবাদ করে। রক্তবীজগুলি

নির্দ্দিষ্ট উপায়ে সঙ্গত হইয়া বংশবৃদ্ধি করে, তাহাদের বাসাবাটী আমার দেহে ব্রণ ক্ষত হইলে বুদ্ধিপূর্ব্বক দলবদ্ধ হইয়া ক্ষতস্থলের সংস্কার, মেরামৎ করে; বসন্তাদি শত্রু কীট বাসাতে প্রবেশ করিলে তৎসহ প্রণালীপূর্ব্বক যুদ্ধ করে। এবং তাহারা অন্যোন্য পৃথক "আমি" "আমি" "আমি" এইরূপ বুঝে। অত্যন্ত বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, শতকোটী রক্তবীজগণ, যাহারা শতকোটী পরস্পর নিরপেক্ষ ব্যাবহারিক "আমি"র সমূহ, তাহাদিগকে ও তাহাদের বাসাবাটী আমার দেহটাকে অবলম্বন করিয়া, একত্রীভূত একটা সম্পত্তি ধরিয়া লইয়া, সেই সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী একটা ভাবরূপ নিরবয়ব সাক্ষী "আমি" শব্দের, "আমি" ভাবের উদয় হয়। এই উদিত আশ্চর্য্য নিরবয়ব আমিটা, আত্মাটা, শতকোটী স্বাধান রক্তবীজ "আমি" বৃন্দের, "আত্মা" বৃন্দের তুলনায় একটা পৃথক স্বাধীন আত্মা। ইহা বৃহৎ নিরবয়ব; রক্তবীজাত্মাগুলি ক্ষুদ্র নিরবয়ব। ক্ষুদ্রগুলি পরস্পর পৃথক এবং উক্ত বৃহৎ হইতেও পৃথক্ অস্তিত্ববান্ এবং যেন ক্ষুদ্রগুলি বৃহৎটিকে আশ্রয় করিয়াই আছে।

তদ্বৎ ব্যাবহারিক আমি, ব্যাবহারিক রাম, ব্যাবহারিক শ্যাম ইত্যাদি ব্যষ্টি জীবগণ উক্ত ব্যাবহারিক রক্তবীজের মত। ব্যাবহারিক আমরা, আমি, রাম, শ্যামাদি, যে বৃহৎ জগৎ বাসাবাটিতে অবস্থান করিয়া ব্যবহার সম্পন্ন করিতেছি সেই বৃহৎ বাসাবাটী, যাহার নাম বিরাট দেহ, এবং তত্রগত বাসিন্দা ব্যাবহারিক আমরা, এই উভয়ে বাসা ও বাসিন্দাগণকে, একযোগে লইলে যে বস্তু হয়, সেই বস্তুকে যে নিরবয়ব আত্মা "আমার দেহ" এরূপ কথা বলিতে পারে, তাহারই নাম বিরাট পুরুষ, ঈশ্বর, সমষ্টি আত্মা, বিরাড়াত্মা, পরমাত্মা। এই বৃহত্তম নিরবয়ব পরমাত্মার তুলনায় ব্যাবহারিক ব্যষ্টি জীবগণের দেহ খোলস-বিনির্মুক্ত, দেহাতিরিক্ত, নিরবয়ব জীবাত্মাগুলি, ক্ষুদ্র নিরবয়ব আত্মা।

জীবের দেহাভিমান থাকিলেই, দেহ কারাগারে বদ্ধ জীব পাওয়া গেল। দেহ পৃথক্ ও আত্মা পৃথক্, ইহা যে ব্যাবহারিক জীব অপরোক্ষ করিবে, সে নিজে ক্ষুদ্র নিরবয়বাত্মা এবং সে বৃহৎ নিরবয়ব পরমাত্মাতে, যথা ক্ষুদ্র তরঙ্গ বৃহৎ সমুদ্রে তদ্বৎ, সংলগ্ন ও তৎসহ সমান সত্মায় বুঝিবে, দেখিবে। যে জীব উক্তরূপ অপরোক্ষ করিবে সে যথাসময়ে, ক্ষুদ্র তরঙ্গের বৃহৎ সমুদ্রে অবগাহন, তিরোভাবের মত, পরমাত্মাতে প্রবেশ পূর্ব্বক, অবগাহন পূর্ব্বক মুক্ত হইবে। যে জীব উক্তরূপ অপরোক্ষ করিবে না, সে বদ্ধই থাকিয়া যাইবে। ক্ষুদ্র জীবাত্মার বৃহৎ পরমাত্মায় অবগাহনটী পরমানন্দের; অত্যন্ত সুখের। সে সাগর

উপমা, দৃষ্টান্ত জগতে নাই। ইহার ইঙ্গিতমাত্র সম্ভব। নরনারীর পবিত্র নিবিড় স্নেহ-আলিঙ্গনেও আত্মায় আত্মা মিলিত হইতে পারে না; নির্দ্দয় দেহ ব্যবধান থাকিয়া সুখের মিলনে বিঘ্ন উৎপাদন করে। জীবপরম মিলনে বিঘ্ন লেশ নাই। বুঝিয়া লও যে, জীব পরমের দুর্ল্লভ অথচ নির্ব্বিঘ্ন মিলনে কত সুখ।

শিষ্যের আপত্তি যে ক্ষুদ্র জীবাত্মা, লহরীর মত, কেহ পরমাত্মা-সমুদ্রে মিলাইয়া গেল, কেহ গেল না বদ্ধ রহিল; কিন্তু যে জীবাত্মামুক্ত হইল, সে যে নূতন লহরীরূপে সমুদ্রাত্মাতে পুনরুদিত হইয়া পুনরায় বদ্ধ হইবে না, তাহার সুনিশ্চিত ব্যবস্থা রামানুজ দেন নাই। রামানুজের মুক্তি অভয় নহে, সভয়ই; সুষুপ্তের মত মুক্তের পুনরুত্থান ভয় থাকিয়া যাইতেছে।

বুদ্ধ ঃ—দেখা যাউক অশীতিবর্ষের বৃদ্ধ প্রামাণিক বুদ্ধ মহাশয় কি বলেন? রামানুজের প্রস্তাবিত বৃহত্তম নিরবয়ব সমষ্টি পরমাত্মা এবং তাহার বৃহত্তম প্রকাণ্ড অবয়বী ব্রহ্মাণ্ড-শরীর, উভয় একযোগে নিরতিশয় বৃহৎ পদার্থ হইল। ক্ষুদ্রাংশগুলি, ব্যষ্টি ক্ষুদ্র নিরবয়ব জীবাত্মা ও সেই ক্ষুদ্রাত্মার অবয়বী ক্ষুদ্র জীবশরীর এবং ক্ষুদ্র নদী পর্ব্বতাদির অধিষ্ঠাতা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিরবয়ব দেবদেবী ও সেই দেবদেবীর অবয়বী নদী শরীর, পর্ব্বত শরীর, বৃক্ষ শরীর ইত্যাদি। বুদ্ধ বলেন উক্ত ব্যষ্টি পৃথক পৃথক ক্ষুদ্রাংশগুলির কথা দূরে থাকুক যাবতীয় ক্ষুদ্রাংশগুলির সমষ্টি, বৃহত্তম, নিরবয়ব পরমাত্মা এবং সেই পরমাত্মার বৃহত্তম অবয়বী ব্রহ্মাণ্ড শরীর একত্রীকৃত হইয়া যাহা হয়, তাহা আমার মুঠার ভিতরে। তাহা আমার দৃশ্য, আমার সম্পত্তিবৎ, আমার হস্তামলকবৎ, আমার চিন্তার বিষয়ীভূত, আমার আলোচনার বিষয় মাত্র। সমগ্রটা আমার দৃশ্য হওয়ায়. গ্রাহ্য হওয়ায়, নিরবয়ব পরমাত্মাটী আমার দৃশ্যৈকদেশ মাত্র হইতেছে; এবং সাবয়ব ব্রহ্মাণ্ড শরীরটী আমার দৃশ্যের অপর বক্রী দেশ হইতেছে। বৈরাজ নিরবয়ব আত্মা ও বৈরাজ সাবয়ব প্রকাণ্ডতম দেহ উভয়ে একযোগে আমার পুরাদৃশ্য।

বুদ্ধ লোকটা অতি বড় সাহসী। তাঁহার মতে "আমি"ই বড়; পরমাত্মা ও পরমাত্মার শরীর একত্র হইয়াও আমির দৃশ্য, "আমি" অপেক্ষা সুতরাং মর্য্যাদায় হীন, অল্প, ন্যূন্। আমার সমান বা আমির অধিক কিছু নাই। আমিটা, আত্মাটা অসমোর্দ্ধ। আমি ভূমা।

বুদ্ধ মিথ্যা বলেন নাই। রামানুজের ঠাকুরও ঠিক তাহাই বলিয়াছেন।

একদা নারদ ভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা করেন যে, বৃহত্তম বস্তুটী কি? ভগবান্ বলেন যে শ্রবণ কর। দেখ পৃথিবী একটা বড় বস্তু; তাহার বেষ্টন-পরিখা সমুদ্র। সমুদ্র পৃথিবী অপেক্ষা বড়। অগস্ত্য একগণ্ডুষে সমুদ্র পান করিয়াছিল সুতরাং অগস্ত্য সাগর অপেক্ষা বড়। সেই অগস্ত্য বৃহদাকাশে একটী ক্ষুদ্র নক্ষত্র মাত্র। এমন বৃহদাকাশ "আমার" প্রতি লোমকূপে বর্ত্তমান। এত বড় আমি ভগবান্, বিশাল হইতে সুবিশাল হইয়াও, হে নারদ, তোমার হৃদয়ের এক কোণে অবস্থিত। সুতরাং নারদ তুমিই বৃহত্তম। নারদ, তোমার শক্তি অপরিসীম, মন্ত্রবলে তুমি প্রকাণ্ড দেহ সমেত প্রকাণ্ড বিরাট পুরুষকে কবলীকৃত করিতেছ।

বুদ্ধ রামানুজের পরমাত্মাকে খণ্ডন করিবার জন্য "আত্মা"রূপ মহাস্ত্রের, "ব্রহ্মাস্ত্রের", সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে কণ্টক দ্বারা কণ্টক উদ্ধারের পরে উভয় কণ্টক তুচ্ছবোধে ত্যাগ করার মত এই "আমি" রূপ মহাস্ত্রের ত্যাগ, উচ্ছেদ, সর্ব্বনাশ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া ছিলেন। কিন্তু বুদ্ধ বৃদ্ধ ও জীর্ণ; আত্মা নিত্যনূতন, যুবা। যুবার সহিত সংগ্রামে বৃদ্ধ জয়লাভ করিতে পারে নাই। বুদ্ধ যে প্রণালীতে আত্মার সর্ব্বনাশ করিবার জন্য আত্মার সহ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ নিম্নে লিপিবদ্ধ করা গেল। বুদ্ধের বুদ্ধিতে দুঃখ বস্তু বুল-ডগের মত কামড়াইয়া ধরিয়াছিল। বুল-ডগ কামড়াইয়া ধরিলে তাহার প্রভু ছাড়িয়া দিতে বলিলেও ছাড়ে না এবং বুল-ডগের মাথাটা কাটিয়া লইলেও, মৃত বুল-ডগের মৃত মাথা কামড় ছাড়ে না, তদবস্থই থাকে। বুদ্ধ মতে জগতে দুঃখ ত আছেই; যাহা কিছু সুখ আছে তাহা ক্ষণস্থায়ী, দুঃখ-পরিণামী, দুঃখানুবিদ্ধ সুতরাং সেরূপ সুখও দুঃখরাশিভুক্ত। যথা কথঞ্চিৎ সুখদ বস্তুর প্রাপ্তিতেও ভয়; পাছে সুপুত্রটী মরিয়া যায়, মনোহর ফুলটী ঝরিয়া যায়, সুন্দর যৌবনকে জরামরণ অপদস্থ করে। এই দুঃখের দুশ্চিন্তা বুদ্ধের মেজাজ ভাল থাকিতে দেয় নাই। তিনি দুঃখের উচ্ছেদ করিতে অসমর্থ হইয়া দুঃখের ভোক্তাকে, আমিটাকে হত্যা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। অভিপ্রায় যে রোগীর মৃত্যু হইলে, রোগ আক্রমণ করিবার পাত্র না পাইয়া আপনা আপনি বাধ্য হইয়া নির্ম্মূল হইবে। একটা শূন্যমাত্র থাকিবে। বুদ্ধ যদি সন্ধান পাইতেন যে শয়তান অর্থাৎ দুঃখবস্তু কিছু একটা বিদ্যমান্ নাই, শয়তানের জন্মস্থান নাই বলিয়া তাহার জন্মই হয় নাই; তাহা হইলে আত্মার সর্ব্বনাশ, নির্ব্বাণ করিবার জন্য উদ্যম করিতেন না। বরং আত্মাকে বাঁচাইয়া রাখিয়া সুখের ভোক্তা করিবার

চেষ্টা করিতেন। আত্মাই পরানন্দ, পরম প্রেমাস্পদ ; বুদ্ধ তাহার প্রতি প্রীতি বশতঃই, তাহার উদ্ধার করিতে না পারিয়াই তাহাকে দুঃখের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি দিবার জন্যই, তাহাকে নির্ব্বাপিত, হত করিবার যত্ন করিয়াছিলেন। আত্মা নির্ব্বাপিত হইতে রাজী হয় নাই। বুদ্ধ আত্ম-নির্ব্বাণে সচেষ্ট থাকাকালেই মরিয়াছেন ; আত্মা এখনও বাঁচিয়া আছে।

আমাদের দুঃখ সাক্ষাৎ ব্যাবহারিক কণ্টক, ক্ষুধা ব্যাধি হইতে ঘটে, কখনও প্রাতিভাসিক কিছু বা ভ্রম হইতেও দুঃখ হয় ; ভ্রমটী ভ্রম হইলেও দুঃখভোগটা সত্যই বটে। মন্দান্ধকারে হিতৈষী পিতাকে দস্যু বোধ হইলে হৃৎকম্প, পলায়নকালে ভূপতিত হইলে আঘাত, আঘাতহেতু দীর্ঘকাল-স্থায়ী ক্ষতাদি সত্য সত্যই পীড়াদায়ক ; কোন পথিককে ঘোষজা মনে করিয়া তাহাকে গৃহে আনয়নপূর্ব্বক উত্তম পানভোজনাদি দ্বারা সমাদরে তাহার সৎকার করার পরে, যদি নিজ ভ্রম বুঝিয়া তাহাকে বলা যায় যে, ওহে তুমি ত ঘোষজা নহ ; তাহাতে কোনও লাভ বা প্রতীকার নাই ; উক্ত পান-ভোজনাদি সংগ্রহে, দুঃখে আর্জ্জিত অর্থের অযথা ব্যয় ত পূর্ব্বেই হইয়াছে। দুঃখ, সমগ্র ব্যাবহারিক প্রাতিভাসিক প্রকৃতি এবং দুঃখভোক্তা, রোগ, রোগী দুইএরই যাহাতে উচ্ছেদ হয় এমন সক্তিকৌশল আবিষ্কার করিতে বুদ্ধ যত্ন-বান্ হইয়াছিলেন। ক্ষুৎ-পীড়া দূর করিবার জন্য অন্নসংগ্রহের চেষ্টা না করিয়া, উদরের উচ্ছেদ কামনা করিয়াছিলেন। সত্য যে কি বস্তু বুদ্ধ তাহার আবিষ্কারে মনোযোগ করেন নাই। সত্যবস্তুর নির্ণয় করা তাহার উদ্দেশ্য ছিল না।

যথাপ্রাপ্ত পূর্ব্বসঞ্জাত সংস্কার কৈংকর্য্য বশতঃ তাঁহার বুদ্ধিতে দোষলেশ ছিল। তাহাই তিনি দুঃখ যে আছে এবং আত্মার দুঃখ ভোক্তৃত্ব যে আছে, ইহাই সত্য বলিয়া যথোচিত পরীক্ষা না করিয়াই ধরিয়া লইয়া-ছিলেন। এবং তাহা স্বীকার করিবার পরে সুতরাং দুঃখ, ও ভোক্তা আত্মার উচ্ছেদ করিবার প্রক্রিয়াপদ্ধতি আবিষ্কারের জন্য চিন্তাশক্তির প্রবল প্রয়োগ করিয়াছিলেন। দেশ, বহির্দ্দেশ, অন্তর্দ্দেশ ; কাল, অতীত কাল, বর্ত্তমানকাল, ভবিষ্যৎকাল ; দেশে কালে অবস্থিত ঘট, পট, দ্বিচন্দ্র, প্রতিবিম্বাদি বস্তু ; কালে বিদ্যমান সুখ, দুঃখ, ক্রোধ, পিতাপুত্রাদি সম্বন্ধ, প্রভৃতি বস্তু, প্রকৃতির সকল বিশিষ্টাকারগুলি বুদ্ধের মতে ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞান মাত্র, স্বপ্নদৃশ্যবৎ। বহির্দ্দেশ যে একটা কিছু আছে—ঘট

কিছু আছে, এবং বহির্দ্দেশে ঘট আছে বলিয়াই যে আমার ভিতরে বহির্দ্দেশ বিজ্ঞান ও বহির্দ্দেশস্থ ঘটবিজ্ঞান হইতেছে তাহা নহে। বহির্দ্দেশ কিছু তত্ত্বতঃ নাই, বহির্দ্দেশে বাস্তবিক ঘটও কিছু নাই।

আলয়সংস্কারের মনোরাজ্যবৎ, স্বপ্নদৃশ্যবৎ স্বয়ং সিদ্ধ; বহির্দ্দেশস্থ ঘটাদি হেতু নিরপেক্ষই ঘটবিজ্ঞান, বহির্দ্দেশবিজ্ঞান, ঘটের বহির্দ্দেশে অবস্থান বিজ্ঞান, আমার ভিতরে আছে! দর্পণের পশ্চাতে দেশ দেখা যায় ও তত্রাবস্থিত প্রতিবিম্ব দেখা যায়। কিন্তু উক্ত দেশ ও উক্ত প্রতিবিম্ব বস্তু বাস্তবিক নাই; তাহাদের প্রতীতি মাত্র, বিজ্ঞান মাত্রই আছে। ক্ষুদ্র এক রাত্রিতেই স্বপ্নে বহুবর্ষব্যাপী অতীতাদি কাল ও সেই দীর্ঘ কালেই কোনও বালকের ক্রমে যৌবন, বার্দ্ধক্যপ্রাপ্তি দেখা যায়। কিন্তু উক্ত দীর্ঘকাল বাস্তবিক নাই; কাল ও কালদৈর্ঘ্যের প্রতীতি মাত্র, বিজ্ঞান মাত্রই আছে। জাগ্রৎ সময়ে কোনও বিষয়ে গাঢ় মনোনিবেশ বশতঃ দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইলেও অল্পকাল বলিয়া প্রতীতি হয়। এই অল্পকালের "অল্পতা" বাস্তবিক নহে; অল্পকালের প্রতীতি মাত্র, বিজ্ঞান মাত্রই আছে। এইরূপ যুক্তিতে পাওয়া গেল যে, বেশ কঠিন বদ্ধ, সুস্থির, জগৎ কিছু নাই; আছে কেবল নানা বিজ্ঞান ও তাহার ধারা। একটা একটা করিয়া অনেকগুলি বিজ্ঞানের দ্রুত উদয়, তরল অস্থির জলের প্রবাহের মত। তাহাদের ধারা পারম্পর্য্যের নাম, নদী নামের মত, অহং ধারা, অহং বিজ্ঞান, আত্মা, আমি। ধারাটা স্বয়ংসিদ্ধ নহে; ইহা সাপেক্ষিক বিজ্ঞান ও খুচরা বিজ্ঞানগুলির অপেক্ষা রাখে; পরে পরে বহু বিজ্ঞান না থাকিলে ধারা থাকিত না; খুচরা বিজ্ঞানগুলিরই ধারা বলিয়া ধারাটী, খুচরা বিজ্ঞানগুলির অপেক্ষা রাখিয়াই উদিত হয়। ধারাটীও একটী বিজ্ঞান, অথচ খুচরা স্বয়ংসিদ্ধ বিজ্ঞান হইতে কিঞ্চিৎ ভিন্নরূপও বটে। নানাপুষ্পলোপ সহ মালার লোপ, অপরিহার্য্য ভাবে হয়। পুষ্পগুলির লয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মালা থাকে; মালাটী আপুষ্পলয় বর্ত্তমান থাকে। পরে থাকে না। তদ্বৎ খুচরা বহু বিজ্ঞানগুলির সম্যক্ লয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অহং বিজ্ঞান থাকে। অহংটী আলয়-বিজ্ঞান বর্ত্তমান থাকে। পরে থাকে না। দীপশিখাটী বহুতর শিখার দ্রুত প্রবাহ; বহুতর শিখাগুলির উচ্ছেদে তাহাদের দ্রুতপ্রবাহের উচ্ছেদ অর্থাৎ দীপ নির্ব্বাণ অবশ্যম্ভাবী। স্বয়ংসিদ্ধবিজ্ঞানগুলির উচ্ছেদে সাপেক্ষিক অহং বিজ্ঞান সুতরাং উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়।

এই ধার বুঝিয়া লও বুদ্ধের প্রক্রিয়া—কাল বা বহির্দ্দেশ ও তত্রাবস্থিত প্রকৃতি কোন কিছু নাই। আছে বহুবিজ্ঞান ও তাহাদের পারম্পর্য্য। লাগাও দৃঢ় ধ্যান; ধ্যানং নির্বিষয়ং মনঃ; কোনও বিজ্ঞানের উদয় না হয় এমন দৃঢ় ধ্যান ধর। বিজ্ঞান মাত্রের উদয়-রাহিত্যে, খুচরা বিজ্ঞানের সাপেক্ষিক অহং-বিজ্ঞানও লুপ্ত নির্ব্বাপিত হইবে। সুতরাং অহং বেচারা দুঃখভোগ সহ্য করিতে আর বর্ত্তমান থাকিবে না। রহিবে না দুঃখ, রহিবে না দুঃখভোক্তা অহং বিজ্ঞান রহিবে না দুঃখদাতা খুচরা বিজ্ঞান, রহিবে শূন্য। শূন্যই তত্ত্ব।

শিষ্য বলিল হা হতোঽস্মি। আমি লোকের কাছে বলে আসিয়াছিলাম। বুদ্ধ আমার সকল দুঃখ দূর করিল, কিন্তু একটা মহৎ দুঃখ আমার জন্য নূতন সৃষ্টি করিল। সেই মহৎ দুঃখটা এই যে, তবে কি আমি আর নাই? আমি কি না থাকিয়াই আছি! বুদ্ধ, তুমি গয়াতে নির্ব্বাণ পাইয়াছ, গয়াতে পিণ্ডদেহ সমর্পণ করিয়াছ; আমারও উদ্ধারের জন্য বোধ হয় গয়াতেই পিণ্ডদান ব্যবস্থা করিতেছ চাও।

বেদান্ত—ভগবান্, শঙ্করাচার্য্য শিষ্যকে প্রবোধ দেন। বলেন যে বুদ্ধদেব বুদ্ধগয়ার মঠে স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি রক্ষা করিয়া আমার হস্তে তাহার ভারার্পণ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বায়াত্তর বৎসর বয়ঃক্রম হইবার পূর্ব্বে রামানুজের হস্ত হইতে অহং তত্ত্বকে উদ্ধার করিয়াছিলেন; এবং পরে কিছু শূন্য পদার্থও অর্জ্জন করিয়াছিলেন, প্রবাদ আছে। বুদ্ধার্জ্জিত সম্পত্তি আমার আয়ত্তাধীন হইবার পরে আমি খাতাপত্র দলিলাদি হিসাব করিয়া "অহং" বস্তুটীকে পাইয়াছি; শূন্য পদার্থ কিছু আমার হস্তগত হয় নাই। বোধ হয় বস্তুটা শূন্য বলিয়াই পাওয়া যায় নাই। আমার জিহ্বা নাই বলিলে যথা জিহ্বা থাকাই সাব্যস্ত হইয়া পড়ে, তদ্বৎ আমি নাই বলিলে "আমি"র থাকাটাই সিদ্ধ হইয়া যায়। আত্মাটা পরমবস্তু; মহামহিম, হইলেও ইহার ক্ষমতার সীমা আছে; আত্মা আত্মহত্যা করিতে অক্ষম, আত্মাকে নিষেধ করিতে যে উদ্যম করিবে সেই ত নিজে আত্মা থাকিয়া যাইয়া, অনিষিদ্ধ অশক্যনিষেধ হইয়া পড়িবে। "আমি আছি" এই জ্ঞান চক্ষুরাদি সকল প্রমাণ নিরপেক্ষ, অপ্রমেয়, স্বয়ংসিদ্ধ। বরং বন্ধ্যাপুত্র অর্থাৎ ভবিষ্যৎ কাল চিন্তার বিষয় হইতে পারে, কিন্তু "আমি নাই" এরূপ একটা জ্ঞানের জন্মলাভ হইতেই পারে না; নিপুণ হইলেও নট যথা নিজস্কন্ধে আরোহণ করিতে

অক্ষম, সূর্য্য যথা সর্ব্বত্র গতিশীল হইয়াও অন্ধকারে যাইতে পারে না, পুরুষ যথা মহাযোগী হইলেও নিজপত্নীকে বিধবা দেখিতে পারে না; তদ্বৎ আত্মা নিজসত্তা অস্বীকার করিতে পারে না এবং আপনাকে বিষয়রূপে ইদংরূপে গ্রহণ করিতেও পারে না। এই না পারাটা, ক্ষমতার সীমা নির্দ্দেশটা, চরমবস্তুর মহিমাকে লঘু করে না, হীন করে না, বরং চরমবস্তুর অপলাপ করা অসম্ভব বুঝাইয়া, ইহা চরমবস্তুর চরমত্বের পোষক, সাধক ও অলংকার স্বরূপই।

অদ্য বিশ্রাম লইতে হইল। বারান্তরে বেদান্ত আলোচিত হইবে।

শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

বাতায়নের দীপ

ঐ জানালায়—
দীপটি উঠিত জ্বলি' প্রতি সন্ধ্যায়;
কেশের সুগন্ধ সনে ধূপের সুবাস
তুলিত উতলা করি' সায়াহ্ন বাতাস।
বাতায়ন নিম্নে কুঞ্জে ফুটন্ত চামেলী
নিশ্বাসি' ভাবিত—মোরে কেন অবহেলা;
বিস্মিত চন্দ্রমা ভাবে অতন্দ্র আকাশে—
কে এরা প্রদীপ জ্বালি' মোরে পরিহাসে!
আপনার শান্তি দিয়া রচিয়া মন্দির
সন্তোষ হাসিত বসি না চাহি' বাহির।

হাসি' খিল-খিল—
ছোট দুটি ছেলে-মেয়ে ভরিত নিখিল।
অস্ফুটন্ত গল্পগাথা অফুরন্ত কথা
নিঃশেষ করিত যেন বিশ্বের বারতা।
প্রাচীরের জম্বুশাখে কূজন্ত কোয়েলা

সনসানি' শতশাখা, গরবে অধীর
খর্জ্জুর ভাবিত—এরা হবে বা বধির !
আপন সৌভাগ্য-গর্ব্বে আপনি বিভোর
হাসিত দীপের রশ্মি সারা নিশিভোর ;

মুগ্ধ অর্দ্ধরাতে—
দীপটি উঠিত জ্বলি' দ্বিগুণ প্রভা-তে।
অস্ফুট গুঞ্জন সাথে মৃদু কলস্বর
গৃহটি তুলিত করি' আনন্দ-বাসর।
বাহিরে প্রকৃতি যেন বহি' দুঃখভার
বিস্ময়ে রহিত মৌন হেরি' ব্যবহার।
অনন্ত আকাশ ঊর্দ্ধে বাতায়ন খুলি'
ইঙ্গিত করিত মেলি' তারকা অঙ্গুলি।
ক'টি অন্ধ প্রাণী একি করে ছেলেখেলা-
উদাস বিশ্বের প্রতি—একি অবহেলা !

ভেঙে গেল হাট—
আঁধার টানিয়া দিল অদৃষ্ট কবাট !
বন্ধ হ'ল বাতায়ন—অন্ধ যেন চোখ,
মুহূর্ত্তে নিভায়ে দিয়ে প্রদীপ্ত আলোক !
না ফুরাতে খেলাঘরে উৎসবের রাত,
রুষ্ট প্রকৃতির যেন অব্যর্থ আঘাত !
চামেলী ফুটিয়া ঝরে, চন্দ্র রহে চাহি'—
শিহরে খর্জ্জুরকুঞ্জ, পিক উঠে গাহি'—
বাহিরে বৃহৎ বিশ্ব তেমনি চঞ্চল—
শুধু ঐ দীপখানি জ্বলে না কেবল।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

পরাণ মণ্ডল।

মামুদপুর গ্রামে হিন্দু মুসলমান উভয় জাতিরই বাস। গ্রামখানিও নিতান্ত ছোট নহে। গ্রামে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যাই অধিক। উভয় জাতির মধ্যেই দুই চারি ঘর অবস্থাপন্ন গৃহস্থ আছে।

ওলাদেবী প্রায় প্রতি বৎসরই এই গ্রামে শুভ পদার্পণ করিয়া থাকেন। তাঁহার কৃপা বা শুভদৃষ্টি মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুর উপরই অধিক ছিল। দেবতারাও জাতিভেদ মানেন!

এই পক্ষপাত-দোষ ক্ষালনের জন্য একবার দেবী গ্রামে আসিয়াই প্রথমে মুসলমান-পল্লীতে শুভ-পদার্পণ করেন। তিন দিনের মধ্যেই হারু মণ্ডল ও তাহার স্ত্রী এই দেবীর কৃপায় কোন্ এক অজানা অচেনা দেশে চলিয়া গেল। মণ্ডলের বাড়ীতে রহিল তাহার সাবালক বড় ছেলে পরাণ ও নাবালক ছোট ছেলে নয়ান। স্ত্রীলোকের মধ্যে রহিল পরাণের যুবতী পত্নী। নয়ানের বয়স তখন সাত বৎসর।

পরাণের স্ত্রীর বয়স যদিও উনিশ বৎসর; কিন্তু তাহার মাথার মধ্যে উনচল্লিশ বৎসরের বুদ্ধি খেলিত; আর সেই বুদ্ধির গতিটা "সু"র দিকে না গিয়া "কু"র দিকে গিয়াছিল। এতদিন মাথার উপর বাঘের মত শ্বশুর ও বাঘিনীর মত শাশুড়ী থাকায় পরাণ-পত্নী টুঁ শব্দটী করিবারও সাহস পায় নাই। পরাণ যদিও পঁচিশ বৎসর বয়সের যুবক, কিন্তু সে ত স্কুল কলেজে পড়ে নাই, সভ্যতার আলোকও পায় নাই; সুতরাং সে পত্নীর জন্য মাতাপিতার অবাধ্য হইতে শিক্ষালাভ করে নাই। চাষার ছেলে, চাষবাস করে, খায় দায়, আমোদ আহ্লাদ করে, আর এই পঁচিশ বৎসর বয়সেও বাপের কথার প্রতিবাদ করা দূরে থাকুক, তাঁহার সম্মুখে কথা বলিতেও সাহস পায় না। পরাণ সত্যসত্যই গোবেচারী ভালমানুষ।

পরাণের স্ত্রী নয়ানকে দেখিতে পারিত না। তাহার মনে কেন যে নয়ানের উপর বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল, তাহার কোন কারণই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। একে স্ত্রীলোক, তায় সুন্দরী যুবতী; তাহার মনের ভাব "দেবা ন জানন্তি" আমরা ত ক্ষুদ্র মানুষ।

এতদিন মাথার উপর শ্বশুর শাশুড়ী ছিল; তাই পরাণের স্ত্রী আত্মপ্রকাশ করিতে পারে নাই। সে হয় ত প্রতিদিন আল্লার কাছে

কামনা করিত ; কিন্তু আল্লা, পীর বা প্যায়গম্বর কেহই তাহার এ আবেদন বা আব্‌দারে কর্ণপাত করেন নাই। অবশেষে কি কারণে জানি না, ওলাদেবী তাহার আরজ মঞ্জুর করিলেন। পরাণের বাপ্‌ মা সংসারের কর্ত্তৃত্বভার তাহাদের পুত্রবধূর উপর সমর্পণ করিয়া ওলাদেবীর অনুসরণ করিল। পরাণের স্ত্রী হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল।

সংসারের কর্ত্তৃত্বভার হাতে পাইয়াই পরাণ-পত্নী নয়ানের উপর তাহার ক্ষমতা জাহির করিতে লাগিল। বৌ যখন অকারণ তাহার উপর বাক্যবাণ বর্ষণ করিত, তখন সে ছেলেমানুষ ছলছল-নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিত—একটী কথাও তাহার মুখ দিয়া বাহির হইত না। বাপমায়ের মৃত্যুর পর প্রথম প্রথম দুই চারি দিন সে বৌয়ের নিকট এটা ওটা চাহিত, ক্ষুধাবোধ হইলে খাইতে চাহিত ; কিন্তু সে যখন দেখিল যে বৌ মুখনাড়া না দিয়া কথা বলে না, তখন সে ক্ষুধায় কাতর হইলেও মুখ ফুটিয়া ভাত চাহিত না। সাত বৎসরের বালক তখনই বুঝিয়াছিল যে, বাপমায়ের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার আদর আব্‌দারেরও কবর হইয়াছে।

পরাণের বাপের বিঘা আষ্টেক জমি ছিল। তাহারা বাপবেটায় সেই জমি চাষ করিত। জমিতে যে ধান ও রবিশস্য হইত, তাহার দ্বারা সারা বৎসর চলিত না—দেশে অজন্মা যে লাগিয়াই আছে। সেইজন্য যখন তাহাদের চাষের তাড়া না থাকিত, তখন তাহারা বাপবেটায় মজুর খাটিত। তাহারা কখনও বা অন্যের জমি চাষ করিয়া দিত, কখনও বা ঘরামীর কাজ করিত। এই উপায়ে তাহাদের যাহা লাভ হইত, তাহাতে তাহাদের সংসার চলিয়া যাইত। তাহারা যদি ইচ্ছা করিত, তাহা হইলে মাসে মাসে কিছু—কিছু, টাকাটা সিকেটা সঞ্চয়ও করিতে পারিত। কিন্তু সঞ্চয় করা বা ভবিষ্যৎচিন্তা করা বাঙ্গালার চাষার কোষ্ঠীতে লেখে না! হারুমণ্ডল ও পরাণের বুদ্ধিও সাধারণ কৃষকের মতই ছিল। যে দিন জন খাটিয়া বাপবেটায় দশ আনা পয়সা পাইত, সে দিন ছয় আনা দিয়া হয় ত একটা ইলিশ মাছ কিনিত, দুই আনা দিয়া দুই ভাঁড় দধিই কিনিত। তাহার পর দিন হয় ত বেগুনভাতে ভাত, অনেক সময় তাহাও মিলিত না। সুতরাং হারু মণ্ডল যখন মরিয়া গেল, তখন পরাণের ঘরে একটী পয়সাও ছিল না। দুই বাপবেটায় রোজগার করিত। এখন বাবা চলিয়া গেল ; একলা পরাণ চাষের কাজই দেখিবে, না জনমজুরই খাটিবে। তবে সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, বাড়ীতে খাইবার লোক সবে তিন জন। তবুও পরাণকে

খাটিতে হইত ; সে যে দু-দণ্ড বসিবে, বা ছোট ভাইটীর তত্ত্ব লইবে, তাহা আর তাহার ঘটিয়া উঠিত না। সন্ধ্যার পূর্ব্বে বা কোন দিন সন্ধ্যার সময় বাড়ী আসিয়া সে শুধু বলিত "ওরে নয়ানে, গরু দুটো গোয়ালে তুলেছিস্ ত, ভাল ক'রে জাব দিইছিস ?" নয়ান যখন সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িত, তখন পরাণ নিশ্চিন্ত হইয়া বলিত "তবে এক কল্‌কে তামুক সাজ্।" নয়ান তামাক সাজিয়া দিত, পরাণ তামাক খাইয়া হাত মুখ ধুইতে যাইত। তাহার পর তাহার স্ত্রী যাহা কোলের কাছে ধরিয়া দিত, তাহাই দুইটা নাকে মুখে দিয়া শুইয়া পড়িত। ভাইয়ের যে অযত্ন হইতেছে বা হইতে পারে, একথা তাহার মনেই আসিত না। তাহার স্ত্রীর প্রকৃতি তাহার অবিদিত ছিল না, কিন্তু সেই ভালমানুষের মেয়ে যে এমন একটা কচি ছেলের উপর কোন অত্যাচার করিতে পারে, এ কথা তাহার সাদাসিদে চাষা বুদ্ধিতে আসিত না।

একদিন পরাণের স্ত্রী নয়ানকে পুকুর হইতে একটা পাথরের বাটি ধুইয়া আনিতে বলিয়াছিল। পাড়াগাঁয়ের পুকুরে ত আর বাঁধা ঘাট থাকে না, ইঁটের তৈরি সিঁড়িও থাকে না। নয়ানদের বাড়ীর পাশেই যে পুকুরটা ছিল, তাহার একটী ঘাটে দুইটা তালগাছ ফেলা ছিল ; সেই তালের গুঁড়ি দুইটাই ঘাটের সিঁড়ির কাজ করিত। জলের মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া গুঁড়ি দুইটায় সেঁতলা ধরিয়া গিয়াছিল; ভয়ানক পিচ্ছিল হইয়াছিল। সকলেই বিশেষ সাবধানে সেই ঘাটে নামা ওঠা করিত। নয়ান যখন পাথরের বাটি ধুইবার জন্য ঘাটে যায় তখন বৌ বলিয়াছিল "জল্‌দি আসিস্, তোর ত আঠারো মাসে বছর।" পাছে বিলম্ব হইলে গালাগালি খাইতে হয়, এই ভয়ে নয়ান যেই তাড়াতাড়ি ঘাটে নামিতে গিয়াছে, অমনই তাহার পা পিছ্‌লাইয়া গেল এবং হাতের বাটিটা তালের গুঁড়ির উপর পড়িয়া একেবারে দুইখানি হইয়া গেল ; নয়ানও বিশেষ আঘাত পাইল।

নয়ান তাড়াতাড়ি গা ঝাড়িয়া উঠিয়া দেখে বাটিটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তখন তাহার আঘাতের বেদনার কথা আর মনে থাকিল না ; তাহার অপেক্ষাও গুরুতর বেদনা যে আজ তাহার নসিবে আছে, তাহাই ভাবিয়া বালক কাঁদিয়া ফেলিল। বাড়ী যাইতে তাহার সাহস হইল না। সে একবার মনে করিল, এখনকার মত ত পলায়ন করি, তাহার পর যাহা হয় হইবে। কিন্তু পরক্ষণেই তাহার মনে হইল যে, পলায়ন করিয়া ত সে শাস্তির হাত এড়াইতে পারিবে না ; পলায়ন করিলে হয় ত শাস্তি আরও গুরুতর হইবে। বালক কি করিবে, স্থির করিতে না পারিয়া ঘাটের ধারে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল।

এদিকে বিলম্ব দেখিয়া তাহার ভ্রাতৃবধূ চীৎকার করিয়া ডাকিল "ওরে, হাড়হাবাতে, পুকুর ঘাট কি যমের বাড়ী? এমন বজ্জাত, কুড়ে ছেলেও দেখি নি।"

নয়ান তখন কি করে! যাহা অদৃষ্টে থাকে তাহাই হইবে ভাবিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ীর দিকে আসিতে লাগিল। তাহার পা-দুখানি আর চলে না। যখন সে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল তখন তাহার ভ্রাতৃবধূ গর্দ্দভনিন্দী স্বরে বলিল "নবাবজাদার আর ঠ্যাং চলে না, পুকুর কি সাতকোশ রে কুড়ে! দে পাথর বাটি।"

নয়ান অতি মৃদুস্বরে বলিল "পাথর বাটিটা ভেঙ্গে গেছে, আমি পা পিছ্‌লে প'ড়ে গিয়েছিলাম।"

আর যাবে কোথায়! রাক্ষসী বৌটা একেবারে বাঘিনীর মত গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "ভেঙ্গে গেছে! "ওরে সয়তান, হারামখোর, বেইমান, কেমন ভেঙ্গে গেছে দেখাচ্ছি।' এই বলিয়া পরাণের স্ত্রী নয়ানের দিকে ধাবিতা হইল। নয়ান যদি তখন পলায়ন করে তবে আর তাহাকে প্রহার খাইতে হয় না; কিন্তু ছেলেটা এতই শান্ত, এতই ভালমানুষ, এতই ভীত যে, সেই রণচণ্ডী মূর্ত্তি দেখিয়া তাহার বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পাইয়া গেল। সে কাঠের পুতুলের মত সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল।

পরাণের স্ত্রী ছুটিয়া আসিয়া "তবে রে হারামের পুত" এই বলিয়া সেই বালকের গালে ঠাস্ করিয়া চড় লাগাইল। নয়ান "ও আল্লা, জান গ্যাল" বলিয়া পড়িয়া গেল। রাক্ষসীর তখনও রাগ থামে নাই। সে ঐ মূর্চ্ছিতপ্রায় ভূপতিত বালককে একটি পদাঘাত করিয়া বলিল "ন্যাকামী দেখ! ওঠ্ বল্‌ছি, নইলে তোর গোস্ত টুক্‌রো টুক্‌রো কর্‌ব।"

নয়ান মূর্চ্ছিত হয় নাই, কিন্তু সেই দৃঢ়হস্তের চড় তাহার বড় লাগিয়াছিল, এবং চড়ের বেগ সামলাইতে না পারিয়া সে পড়িয়া গিয়াছিল। পাছে আরও প্রহার খাইতে হয়, এই ভয়ে সে উঠিয়া বসিল। পরাণের স্ত্রী তখন আজ্ঞা প্রচার করিল "বেরো আমার বাড়ী থেকে। আর যদি এ বাড়ীতে ঢুক্‌বি তাহলে তোরে খুনই করে ফ্যাল্‌ব।" বালক নড়িল না। রাক্ষসী আবার গর্জ্জিয়া উঠিল "শিগ্‌গির বেরো, নইলে তোর ভাল হবে না।"

বেলা তখন প্রায় দ্বিপ্রহর। চৈত্র মাসের রৌদ্র পৃথিবীময় আগুন ছড়াইয়া দিতেছিল। সেই সময়ে পিতৃমাতৃহীন সাতবৎসরের বালক নয়ান কাঁদিতে

কাঁদিতে একবার বৌয়ের মুখের দিকে চাহিল। সেখানে দয়া বা করুণার লেশ মাত্র দেখিতে পাইল না। সে তখন ধীরে ধীরে উঠিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া গেল। তখনও তাহার মুখে জলবিন্দু পড়ে নাই। মা বাঁচিয়া থাকিলে এতক্ষণ তাহার তিনবার আহার হইয়া যাইত। এখন আর তাহার সে দিন নাই। এখন যে তাহার মুখের দিকে চাহিবার লোক নাই। এক বড় ভাই, সে সকল সময় বাড়ী থাকে না; নয়ানের উপর যে এত অত্যাচার হয়, তাহাও সে জানে না। নয়ানও কোন দিন কোন কথা বৌয়ের ভয়ে দাদাকে বলে নাই।

নয়ান বাড়ীর বাহির হইয়া ভাবিতে লাগিল, কোথায় যাইবে। একবার ভাবিল পাশের কোন বাড়ীতে গেলে হয়,—পরক্ষণেই মনে হইল কাহারও বাড়ীতে গেলেই সে সময়ে সকল কথা বলিতে হইবে; আর সে কথা বৌয়ের কানে পৌঁছিলে তাহার আর রক্ষা থাকিবে না। বয়স সাত বৎসর হইলে কি হয়, এই অল্প কয়েকদিনের দুঃখ, কষ্ট ও নির্য্যাতন, তাহার বয়সকে দ্বিগুণ করিয়া দিয়াছিল। সে তখন স্থির করিল কোথাও সে যাইবে না। বাড়ীর বাহিরে, রাস্তার ওপাশে গাছের ছায়ায় সে বসিয়া থাকিবে। রাগ পড়িয়া গেলে বউই তাহাকে ডাকিয়া ভাত দিবে। আর সে যদি নাই ডাকে, তাহার দাদা ত সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাড়ী আসিবে; তখন সে বাড়ীতে খাইতেই পাইবে। একবেলা না খাইলে ত মানুষ আর মরে না!

নয়ান রাস্তার পার্শ্বে বটগাছের শীতল ছায়ায় ঘাসের উপর শুইয়া রহিল। প্রথম কিছুক্ষণ তাহার বড়ই ক্ষুধাবোধ হইতে লাগিল; তাহার পর সর্ব্ব-সন্তাপনাশিনী নিদ্রা আসিয়া এই অনাথ শিশুকে কোলে লইয়া বসিলেন। বালক কিছুক্ষণের জন্য মায়ের কোলে স্থান প্রাপ্ত হইল।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে পরাণ দাখানি হাতে করিয়া শ্রান্তদেহে ধীর পদবিক্ষেপে যখন বাড়ীর সম্মুখের সেই বটগাছের নিকট উপস্থিত হইল, তখন সে দেখিল নয়ান শুষ্কমুখে মলিনভাবে সেই বৃক্ষতলে বসিয়া আছে।

"ওখানে অমন ক'রে বসে আছিস্ যে নয়ানে!" বলিয়া পরাণ সেইস্থানে দাঁড়াইল। তাহার দাদার—আপন মায়ের পেটের ভাইয়ের মুখের দিকে চাহিয়া নয়ানের শোকের সাগর উথলিয়া উঠিল। সে কাঁদিয়া ফেলিল—তাহার মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইল না।

পরাণ তখন নয়ানের নিকট সরিয়া আসিল

স্নেহের স্বরে জিজ্ঞাসা করিল "নয়ান, কি হয়েছে ভাই! তুই কাঁদছিস্ কেন? তোর মুখ শুকিয়ে গেছে কেন? তুই কি কিছু খাস্ নাই?"

এমন স্নেহের স্বর যে নয়ান আজ অনেক দিন শোনে নাই। পৃথিবীতে এমন কথা বলিবার যে তাহার কেহ আছে তাহা ত সে জানিত না। নয়ান কাঁদিতে লাগিল। পরাণ তখন তাহাকে নিজের কোলের মধ্যে টানিয়া লইল, তাহার স্কন্ধের কালো গামোছাখানি দিয়া নয়ানের মুখ মুছাইয়া দিল। তাহার পর অতি স্নেহপূর্ণস্বরে বলিল "কি হ'য়েছে, আমাকে খুলে বল্? কেউ মেরেছে? কেউ কিছু ব'লেছে।"

নয়ান তখন আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না; সে কাঁদিতে কাঁদতে, সমস্ত কথা পরাণকে বলিল। বাপমায়ের মৃত্যুর পর হইতে তাহার উপর কি অত্যাচার হইয়া আসিতেছে, তাহা সব বলিল। তাহার পর সেই দিনের ঘটনা, সেই পাথর বাটি ভাঙ্গবার কথা,—সেই গালাগালির কথা—সেই প্রচণ্ড চড়ের কথা,—সেই লাথির কথা—সেই বেলা দ্বিপ্রহরে বাড়ি হইতে তাড়াইয়া দিবার কথা—সমস্ত কথা নয়ান পরাণকে বলিল। তাহার পর বলিল "ভাইজি, আজ তামাম দিন আমার প্যাটে একটা দানাও পড়ে নাই—একরতি জলও না।"

পরাণ রাগে কাঁপিতেছিল; কিন্তু তাহার সেই সোনার কনিষ্ঠ, তাহার পিতা মাতার সেই আদরের নিধি—যখন বলিল "ভাইজি, আজ তামাম দিন আমার প্যাটে একটা দানাও পড়ে নাই—একরতি জলও না।" তখন পরাণ আর স্থির থাকিতে পারিল না। সে চীৎকার করিয়া উঠিল "কি, এত বড় কথা। দেখিগে সে হারামজাদিকে। এত বড় গোস্তাকি।"

এই বলিয়া পরাণ পাগলের মত বাড়ীর দিকে দৌড়িল। নয়ান তাহার ভাইজির সেই ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া চীৎকার করিতে করিতে তাহার পিছু পিছু ছুটিল, আর বলিতে লাগিল "ভাইজি, দাঁড়াও ভাইজি! ওরে ভাইজিরে!"

পরাণ বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াই, গর্জ্জন করিয়া বলিল "দেখি, কোথায় সেই হারামজাদি!" এই বলিয়াই সে রান্নাঘরের দিকে গেল;—তাহার হাতে তখনও সেই তীক্ষ্ণধার দাখান ছিল।

পরাণের চীৎকার শুনিয়া এবং তাহাকে ছুটিয়া আসিতে দেখিয়া তাহার স্ত্রী ঘর হইতে বাহির হইয়া পলায়নের চেষ্টা দেখিতেছিল; কিন্তু সে পলায়নের অবকাশ পাইল না। সে যখন দ্বারের নিকট আসিয়াছে, তখনই দেখিতে

পাইল উন্মত্তের মত পরাণ তাহার সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। তাহাকে দেখিয়াই পরাণ চীৎকার করিয়া বলিল "তবে রে হারামজাদি!" এই বলিয়াই সে বাম হস্তে তাহার স্ত্রীর কাপড়খানি চাপিয়া ধরিল, আর দক্ষিণ হস্ত-স্থিত দাখানি দ্বারা সজোরে তাহার গলায় আঘাত করিল। এক আঘাতেই হতভাগিনীর ছিন্নমুণ্ড ধরাতলে পড়িয়া গেল, রক্তের ফোয়ারা ছুটিল, পরাণ সেই রক্তে স্নাত হইল। তখনও পরাণের রাগ যায় নাই, ক্রুদ্ধ সিংহের মত তখনও সে গর্জ্জন করিতে লাগিল।

নয়ান বাড়ীর মধ্যে আসিয়া দেখে পরাণের স্ত্রীর মস্তক একস্থানে ও তাহার শরীর একস্থানে পড়িয়া রহিয়াছে, রক্তে ঘর ভাসিয়া গিয়াছে, আর তাহার দাদা সেই দা হাতে করিয়াও তখনও গর্জ্জন করিতেছে। নয়ান এই দৃশ্য দেখিয়া "ও আল্লা, ওরে ভাইজি!" বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

গোলমাল শুনিয়া প্রতিবেশীরা আসিয়া পড়িল। এই ভয়ানক দৃশ্য দেখিয়া সকলেই ভয়ে অস্থির হইয়া উঠিল। পরাণ তখনও দা'হাতে করিয়া সেই স্থানেই কাঠের পুতুলের মত দাঁড়াইয়া আছে।

তাহার পর গ্রামের চৌকীদার, পঞ্চায়েত ও ভদ্রাভদ্র অনেক লোক সেখানে উপস্থিত হইল। পঞ্চায়েত ও কয়েকজন লোক পরামর্শ করিয়া তখনই চৌকিদারকে থানায় পাঠাইয়া দিল। এত লোকের সমাগম দেখিয়া পরাণ হাতের দাখানি ফেলিয়া দিয়া সেই স্থানে বসিয়া পড়িল। প্রতিবেশীরা নয়ানের চৈতন্য সম্পাদন করিল। তখন এক বৃদ্ধ পরাণকে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতে গেল,— পরাণ কোন উত্তরই দিল না, চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। নয়ান শুধু মধ্যে মধ্যে "ও আল্লা, ওরে ভাইজি!" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। সকলে নানা প্রকারে তাহাকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

রাত্রি প্রায় নয়টার সময় থানার দারোগা, কনেষ্টবল প্রভৃতি আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন যথারীতি তদন্তের ব্যবস্থা হইতে লাগিল; কিন্তু তদন্ত আর বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারিল না। দারোগা যখন নয়ানকে ঘটনার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন পরাণ আপনা হইতেই বলিয়া উঠিল "বাবুজি, ওকে আর কি বল্‌ছেন। এ খুন আমিই করেছি। আমাকে বেঁধে নিয়ে যান।"

দারোগা বলিলেন "কেন তুমি খুন করলে?" পরাণ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল "সে কথা আর একশবার ব'লে কি হবে; একেবারে জেলার হাকিমের কাছেই সব বলব।" এই বলিয়া পরাণ যে চুপ করিল, তাহার পর আর কেহ

তাহাকে কথা বলাইতে পারিল না। দারোগা মহাশয় নয়ানের নিকট হইতে সকল কথা শুনিয়া লাস চালান দিলেন এবং পরাণের হাতে হাতকড়ি লাগাইয়া তাহাকে থানায় লইয়া গেলেন। নয়ান উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল।

ডিপুটী হাকিম যথারীতি সাক্ষী সাবুদ গ্রহণ করিয়া পরাণকে সেসন-সোপর্দ্দ করিলেন। পরাণ সেই যে চুপ করিয়াছিল, তাহার পর এ পর্য্যন্ত একটী কথাও বলে নাই। নিম্ন আদালতে গরিব পরাণের পক্ষ-সমর্থন করিবার জন্যও কোনও উকিল মোক্তার উপস্থিত হন নাই।

সেসন আদালতে যখন মোকদ্দমা উঠিল, তখন একজন জুনিয়ার উকিল পরাণের পক্ষ-সমর্থন করিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তিনি যখন পরাণকে দুই একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে গেলেন। তখন এই প্রথম পরাণ কথা বলিল; সে বলিল "বাবুজি, আমার কথা আমিই বল্‌ব, সেলাম!" উকিল বাবু বিমুখ হইয়া চলিয়া গেলেন।

মোকদ্দমার ডাক পড়িল। হাতকড়িবদ্ধ পরাণকে কাঠগড়ায় দাঁড় করান হইল। সরকারী উকিল মাথার শামলাটা ভাল করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া বসাইয়া একবার গলা ঝাড়িয়া যখন মোকদ্দমার অবস্থা বলিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন, তখন পরাণ বলিয়া উঠিল "ধর্ম্মবতার, সায়েব, আর কাউকে কিছু বল্‌তে হবে না। যা যা বল্‌তে হবে আমিই হুজুরের কাছে ব'লে যাচ্ছি।" এই বলিয়া সে তাহার অবস্থার কথা, তাহার পিতামাতার মৃত্যুর কথা, তাহার স্ত্রীর বদ্‌মেজাজের কথা বলিতে লাগিল। তাহার পর স্বর আরও একটু উঁচু করিয়া সে বলিল "হুজুর, ধর্ম্মাবতার, সায়েব, কোম্পানী বাহাদুর, আমার পরিবার আমার ঐ ছোট ভাইকে খাইতে দিত না, তারে ধ'রে মারত। আমি জন খাটি, তামাম দিন পয়সার ধান্দায় ঘুরি, ঘরে কি হয় না হয়, তার কি খবর আমি রাখ্‌তে পারি? যে দিন খুন হয়, সেদিন ধর্ম্মাবতার, আমি মজুরী করে সারাদিনে সাতটা পয়সা কামাই করে ঘরে যাচ্ছিলাম; মেজাজটা বড়ই খারাপ ছিল। বাড়ীর সুমুকে বটগাছতলায় দেখি নয়ান ব'সে আছে। তার মুখ শুকিয়ে গেছে।—আমারে দেখে সে হাউ হাউ ক'রে কাঁদতে লাগ্‌ল। হুজুর, আমাদের বাপমা নেই, আমার ঐ একটা ভাই। তার কান্না দেখে আমার পরাণের মধ্যে কেমন করে উঠ্‌ল। আমি গামোছা দিয়ে তার মুখ মোছায়ে দেলাম; তারে দুইটা মিষ্টি কথা বল্‌লাম। সে তখন বল্‌ল কি, যে একটা পাথরের খোরা নিয়ে সে ঘাটে গেছ্‌ল্; ঘাট পিছল ছিল; নয়ানে পা পিছ্‌লে পড়ে

গিয়েছেলো ; হাতের খোরাটা প'ড়ে একেবারে চৌচির হয়ে গেল। তাই না শুনে, আমার পরিবার নয়ানকে ঠাস্ করে একটা চড় দিল। ভাই আমার ঘুরে পড়ে গেল। তাতেও কি সে তারে ছাড়ে, তার উপর ধর্ম্মবতার, লাথি—লাথি সায়েব, লাথি—"পরাণের চক্ষু রাগে জ্বলিয়া উঠিল ; তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। আদালতশুদ্ধ লোক, জজ সাহেব প্রভৃতি হা করিয়া পরাণের কথা শুনিতে লাগিল।

জজ সাহেব পরাণকে চুপ করিতে দেখিয়া বলিলেন "ওয়েল, গো অন। তারপর।"

পরাণ তখন সামলাইয়া লইয়াছে। পরাণ বলিতে লাগিল "তারপর হুজুর, তারপর। তারপর নয়ান বল্‌ল আমার পরিবার এই চৈত্তির মাসের দুপুর রৌদ্দুরে নয়ানকে বাড়া থেকে বা'র করে দেল। ছাওয়াল মানুষ, তখনও তার প্যাটে একটা দানা পড়ে নাই—হুজুর এট্টা দানা পড়ে নাই। এতটুকু ছাওয়াল-ডার মুখে তখন একরত্তি জল পড়ে নাই। আমার জন্যি তামামদিন সে পথে বসে-ছিল ; হুজুর সাত বছরের ভাই আমার তামাম দিন কিছু খায় নেই, জলটুকুও না। হুজুর, ধর্ম্মাবতার, কোম্পানী বাহাদুর, তোমারও ভাই আছে হুজুর! তোমার এতটুকু ছোট ভাইকে যদি তোমার মেমসাহেব না খেতে দিয়ে এই চৈত্তির মাসের দুপুর বেলায় বাড়ী থেকে বার কোরে দিত, আর তামামদিন খবর না নিত, তা হ'লে তুমি সে পরিবারের কি কোরতে হুজুর! তোমার পরাণডার মদ্দি তখন কেমন করে উঠ্‌ত হুজুর! এতটুকুখানি ছাওয়াল, মা নেই বাপ নেই, তারে কুকুরডার মত বাড়ির বা'র করে দিল ; এই দুপুর রোদ্দুরে ধর্ম্মাবতার, তুমিই বল, আল্লার কিরে, তুমিই বল হুজুর, এমন পরিবারেরে তুমি কি ক'রতে? সাটতা না পাঁচটা না, একটা ভাই ; তারে কিনা তাড়ায়ে দিল, একটা দানা দিল না, লাথি মারলো হুজুর, লাথি মারলো। তুমিও যা কোরতে, আর দশজনেও যা করতো, আমিও তাই করেছি। এমন পরিবারকে খুনই কোরতে হয়। ধর্ম্মাবতার, কোম্পানীর আয়েনে খুনির বদলে খুন নিতি হয়। তাই হোক। তাই হোক।" এই বলিয়া পরাণ চারিদিকে চাহিয়া যেন কাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিল। জজসাহেবের মন গলিয়া গিয়াছিল ; তিনি অনুচ্চ স্বরে পরাণকে বলিলেন "তুমি কি চাও?"

পরাণ বলিল "হুজুর, একবার নয়ানের মুখখানি জন্মের মত দেখ্‌তে চাই।"

জজ সাহেব তথনই নয়ানকে সেখানে আনিবার জন্য হুকুম দিলেন। নয়ান আসিয়া যখন কাঠগড়ার মধ্যে প্রবেশ করিল তখন পরাণ তাহাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিল, কিছুক্ষণ কোন কথা বলিতে পারিল না। তাহার পর জজ সাহেবের দিকে চাহিয়া পরাণ বলিল "হুজুর, আমার এই ভাইটারে কার হাতে দিয়ে যাব? আমি এরে কোম্পানী বাহাদুরের হাতে দিয়ে গেলাম। ভাই নয়ান, তোরে আজ আমি কোম্পানী—সায়েবের হাতে দিয়ে গেলাম ভাইরে—"পরাণ আর কথা বলিতে পারিল না, চক্ষের জলে তাহার বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল। ধর্ম্মাবতার জজ বাহাদুরও এই দৃশ্য দেখিয়া রুমালে চক্ষু মুছিলেন।

তাহার পর জজ সাহেব বলিলেন "এ মামলার আর সাক্ষীর প্রয়োজন নাই। আসামী কবুল করিয়াছে।" জজসাহেব জুরীদিগের দিকে চাহিলেন; জুরীগণ একবাক্যে বলিলেন "আসামী অপরাধ করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার উপর লঘু দণ্ড প্রদান জন্য আমরা অনুরোধ করিতেছি।" জজ সাহেব তখন বলিলেন "আমি আসামী পরাণ মণ্ডলকে এক বৎসরের মেয়াদের হুকুম দিলাম।"

জজ সাহেবের রায় শুনিয়া সকলে অবাক্ হইয়া গেল। সকলে ভুলিয়া গেল যে, তাহারা আদালতগৃহে উপস্থিত। তখন সেই জনসংঘ একযোগে জয়ধ্বনি করিল। জজ সাহেব বাধা দিলেন না।

কনেষ্টবলেরা যখন পরাণকে কাঠগড়া হইতে নামাইয়া লইয়া যাইতে উদ্যত হইল, তখন জজ সাহেব আসন ত্যাগ করিয়া বলিলেন "পরাণ মণ্ডল, তোমার ভাই আজ হইতে আমার কুঠীতে থাকিবে।"

পরাণ জজ সাহেবের দিকে কাতর নয়নে চাহিয়া দক্ষিণ হস্তখানি তুলিল।

শ্রীজলধর সেন।

আদিশূর ও কুলশাস্ত্র।

গৌড়রাজমালা প্রকাশিত হইবার পর হইতে আদিশূরের অস্তিত্ব এবং বাঙ্গালার ইতিহাসে তাঁহার স্থান সম্বন্ধে মাসিক পত্র সমূহে অনেকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়রাজমালার গ্রন্থকার আদিশূরের অস্তিত্বের প্রমাণ

ও ইতিহাসে তাঁহার স্থান বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার সিদ্ধান্ত :—

"বর্ত্তমান কালকে আদিশূরানীত ব্রাহ্মণগণের কাল হইতে গড়পড়তায় ৩৪।৩৫ পুরুষের কাল বলা যাইতে পারে। প্রতি পুরুষে ২৫ বৎসর ধরিয়া লইলে আদিশূর ৮৫০ বৎসর পূর্ব্বে (১০৬০ খৃষ্টাব্দে) বর্ত্তমান ছিলেন, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। এই অনুমান "বেদবাণাঙ্ক শাকেতু গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ" [৯৫৪ শাকে বা ১০৩২ খৃষ্টাব্দে গৌড়ে ব্রাহ্মণগণ আগমন করিয়াছিলেন] এই কিংবদন্তীর বিরোধী নহে এবং তৃতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকালে কর্ণাট-রাজকুমার বিক্রমাদিত্যের সহিত বল্লালসেনের পূর্ব্বপুরুষের গৌড়ে আগমন-কালের সহিত ঠিকঠাক মিলিয়া যায়। প্রথম রাজেন্দ্রসেনের তিরুমলয়-লিপিতে দক্ষিণরাঢ়ের অধিপতি রণশূরের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। আদিশূরকে রণশূরের পুত্র বা পৌত্র ধরিয়া লইলে কোনই গোল থাকে না" এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অনেকেই মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী রায় মহাশয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিনোদবিহারী বাবু গত ফাল্গুন মাসের "ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন" পত্রিকায় "আদিশূর" নামে একটি সুচিন্তিত ও সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয় লইয়া তাঁহার সহিত আমার বিশেষ মতভেদ থাকিলেও আমি রচয়িতার বিশেষ প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। এই প্রবন্ধে বিনোদবিহারী বাবু আদিশূরের অস্তিত্ব ও কুল-শাস্ত্রের ঐতিহাসিকতা প্রমাণ করিবার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন।

ভুবনেশ্বরের অনন্তবাসুদেব-মন্দিরের আবিষ্কৃত ভবদেবভট্টের কুল-প্রশস্তি হইতে গৌড়রাজমালার গ্রন্থকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, "ভবদেবের ভুবনেশ্বরের প্রশস্তিতে আদিশূরকর্ত্তৃক সাবর্ণগোত্রীয় ব্রাহ্মণ আনয়নের প্রতিকূল প্রমাণ দেখিয়া, আদিশূরবৃত্তান্তের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে ঘোর সংশয় উপস্থিত হয়।" তদুত্তরে বিনোদবিহারী বাবু লিখিয়াছেন যে "এই ভবদেবের প্রশস্তিই আদিশূরের অস্তিত্বের প্রমাণস্বরূপ আমরা উপস্থিত করিব। সাতপুরুষ পর্য্যন্ত গাঁই-গোত্র শিক্ষা করিবার পদ্ধতিরও ইহা একটি পাথরে খোদিত প্রমাণ।" গৌড়রাজ-মালার গ্রন্থকার ভুবনেশ্বর প্রশস্তির আদিশূর সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন আমার নিকট তাহা অতিশয়োক্তি বলিয়া বোধ হয়। গৌড়ে শত শত রাজা ব্রাহ্মণ-দিগকে শত শত গ্রাম প্রদান করিয়াছিলেন। ভট্ট ভবদেবের কুলপ্রশস্তিতে

শত গ্রাম আর্য্যাবর্ত্তে আছে তন্মধ্যে সিদ্ধল রাঢ় দেশের একমাত্র অলঙ্কার ;—

"সাবর্ণস্য মুনেম্মহীয়সীকুলে যে যজ্ঞিরে শ্রোত্রিয়া
স্তেষাং শাসনভূময়ঃ শনিগৃহ গ্রামাঃ শতং সন্তি তে।
আর্য্যাবর্ত্ত ভূবাম্বিভূষণমিহ গ্রামস্য সর্ব্বাগ্রণীগ্রামঃ
সিদ্ধল এব কেবলমলঙ্কারোস্তি রাঢ়াশ্রিয়ঃ ॥"

এই সূত্রে আদিশূরের কথা কেন আসিবে? আদিশূর নামক কোন রাজা ঐতিহাসিক ব্যক্তি হইলেও এ প্রসঙ্গে তাঁহার নাম কেন উল্লিখিত হইবে? গৌড় দেশীয় আদিশূর ব্যতীত আর কোন রাজা কি কখনও ভূমিদান করেন নাই? গৌড়রাজমালার গ্রন্থকার বোধ হয় বলিতে চাহেন যে, কুলশাস্ত্র অনুসারে সিদ্ধলগ্রাম সাবর্ণগোত্রীয় বেদগর্ভের পুত্র পরিষ্ঠকে ব্রাহ্মণশাসনরূপে প্রদত্ত হইয়াছিল। গ্রন্থকার যখন কুলশাস্ত্রের কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন না, তখন এই সম্বন্ধে আদিশূরের কথা উত্থাপন না করিলেই ভাল হইত। কুলশাস্ত্র ঐতিহাসিক প্রমাণরূপে গ্রহণ করিলে বিপরীত ফল হয়। সিদ্ধল যদি আদিশূর-কর্ত্তৃক প্রথম ভবদেবের পূর্ব্বপুরুষকে প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহা হইলে, প্রশস্তিকার পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন ও আদিশূরের নাম উল্লেখ করিলেন না কেন? পক্ষান্তরে বিনোদবিহারী বাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহাও বিশ্বাসযোগ্য নহে। ভবদেবের কুলপ্রশস্তিখানিকে "সাতপুরুষ পর্য্যন্ত গাই গোত্র শিক্ষা করিবার পদ্ধতিরও ইহা একটি পাথরে খোদিত প্রমাণ", বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। সিদ্ধলগ্রামের নাম আছে বলিয়াই যে ধরিয়া লইতে হইবে, ইহা সাতপুরুষের নাম ইত্যাদি শিক্ষার প্রস্তরে উৎকীর্ণ উদাহরণ, ইহা যুক্তিযুক্ত নহে। বাচস্পতি ভবদেবের কুলপ্রশস্তি রচনা করিয়াছিলেন, তিনি ভবদেবের উর্দ্ধতন ছয় পুরুষের পরিচয় দিয়াছেন ঃ

ইঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা যে গ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং যে যে কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তাহারই পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। আমরাও বাল্যকালে পূর্ব্বপুরুষগণের নাম পিতার নিকটে শ্রবণ করিয়া কণ্ঠস্থ করিয়াছিলাম; কিন্তু প্রপিতামহ বা তাঁহার ঊর্দ্ধতন পুরুষগণ কি কার্য্য করিতেন, তাহার কোন কথাই জানিতে পারি নাই। ভবদেবের কুলপ্রশস্তি অন্যরূপ; এখানে "কুল" বলিতে বঙ্গদেশে যে বিশেষার্থ প্রচলিত আছে, তাহা ধরিয়া লওয়া উচিত নহে। কুল বলিতে সুবাস্ত হইতে কামরূপ পর্য্যন্ত এবং হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতবাসী সাধারণতঃ যাহা বুঝিয়া থাকে, সেই অর্থই গ্রহণ করা উচিত।

পূর্ব্বে একবার বলিয়াছি যে "কুলশাস্ত্রের প্রমাণগুলি অদ্যাপি ঐতিহাসিক প্রমাণস্বরূপ গণ্য হইবার যোগ্য হয় নাই।" কার্য্যতঃ দেখা যাইতেছে যে কুলশাস্ত্রে যে দুই একটি ঐতিহাসিক কথা আছে, তাহার মূল্য কিছুই নহে,—(১) কুলশাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করিয়া প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় স্থির করিয়াছিলেন যে শ্যামলবর্ম্মা সেনবংশীয় রাজা বিজয়সেনের পুত্র এবং বল্লালসেনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। অতি অল্পদিন পূর্ব্বে শ্যামল বা সামলবর্ম্মার পুত্র ভোজবর্ম্মার তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। তদ্দ্বারা এতদিনে প্রমাণ হইয়াছে যে, শ্যামলবর্ম্মার সহিত সেনবংশের কোনই সম্পর্ক ছিল না; তাঁহার পিতার নাম জাতবর্ম্ম, তিনি যদুবংশজাত এবং কলোচুড়ি চেদীরাজ কর্ণের দৌহিত্র। (২) কুলশাস্ত্রের প্রমাণ এবং অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় স্থির করিয়াছিলেন যে, চন্দ্রদ্বীপরাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা দনুজমর্দ্দনদেব লক্ষ্মণসেনের পৌত্র এবং দিল্লীর সম্রাট গিয়াসউদ্দিন বলবনের সমসাময়িক। দৌলতপুর কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় দনুজমর্দ্দনদেবের চন্দ্রদ্বীপ টাকশালের একটি রৌপ্যমুদ্রা ও মালদহের স্বর্গীয় রাধেশচন্দ্র শেঠ দনুজমর্দ্দনদেবের পুণ্ড্রনগর টাকশালের আর একটি রৌপ্যমুদ্রা আবিষ্কার করিয়াছেন। এই দুইটি মুদ্রা হইতে প্রমাণ হইয়াছে যে, চন্দ্রদ্বীপের দনুজমর্দ্দনদেব শকাব্দের ১৩৩৯ বর্ষে অর্থাৎ ১৪১৭ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন; সুতরাং তিনি বলবনের সমসাময়িক এবং লক্ষ্মণসেনের পৌত্র হইতে পারেন না। (৩) কুলশাস্ত্রে যাঁহাদিগের অগাধ বিশ্বাস তাঁহারা সকলেই মানিয়া থাকেন যে, সেনরাজগণ আদিশূরের দৌহিত্রবংশজাত। বিনোদবিহারী রায় ——

"জাতো বল্লালসেনো গুণিগণিতস্তস্য দৌহিত্রবংশে" এই বচন অনুসারে বল্লালসেন আদিশূরের দৌহিত্র বংশে জন্মিয়াছিলেন।

(২) আসীৎ গৌড়ে মহারাজ আদিশূরঃ প্রতাপবান্।
তদাত্মজাকুলে জাতো বল্লালাখ্যো মহীপতিঃ॥"

গৌড়রাজ আদিশূরের কন্যার বংশে বল্লালসেন জন্মিয়াছিলেন।

(৩) "আদিশূরাৎ কুলেজাতা পুরুষাৎ সপ্তমাৎপরম্।
কন্যকা সুন্দরী সাধ্বী—নাম্না শ্রীঃ শ্রীরিব শুভা॥

এই শ্লোকটি হইতে বিনোদবিহারী বাবু স্থির করিয়াছেন যে, বল্লালসেন শূর-বংশের দৌহিত্র নহেন।

(৪) "যতী জগদ্রাজ জয়ীশবর্যা ঐশ্বর্যাশৌয্যাজ্জববীর্য্যভাজঃ
অপূর্ব্বভক্তির্ভবদেবদেবেষবেদ শশাঙ্কস্মররন্ধ্রশাকে॥
জাতো বিজয়সেনো গুণিগণগণিতস্তস্য দৌহিত্রবংশে।
পুণ্যাত্মা দেবশূন্যো ধরণী পতিগণৈঃ পূজ্যমান প্রধানঃ॥

আদিশূরের দৌহিত্রবংশে ৯৫১ শকে (১০২৯ খৃষ্টাব্দে) বিজয়সেন জন্মগ্রহণ করেন।

(ক) প্রথম শ্লোক অনুসারে বল্লালসেন আদিশূরের দৌহিত্রের বংশ জাত।

(খ) দ্বিতীয় শ্লোকটির অর্থ নানাভাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে; বল্লালসেন আদিশূরের কন্যার পুত্রও হইতে পারেন অথবা কন্যার বংশজাত হইতে পারেন।

(গ) আদিশূরের অধস্তন সপ্তম পুরুষের শ্রীনাম্নী এক কন্যা ছিলেন, সম্ভবতঃ ইনি বল্লালের মাতা অথবা পিতামহী।

(ঘ) বিজয়সেন আদিশূরের দৌহিত্রবংশে জন্মিয়াছিলেন।

এই সকল মত আলোচনা করিয়া বিনোদবিহারী বাবু নিম্নলিখিত স্থির-সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন,—

"উপরিউক্ত প্রমাণসমূহে বেশ বুঝা গেল ক্ষত্রিয় (কায়স্থ) আদিশূর, ক্ষত্রিয় (কায়স্থ) বল্লালের মাতামহ নহেন, তাঁহার সপ্তম পুরুষ রণশূর বিজয় সেনের মাতামহ। অতএব আদিশূর—৬৫৪ শক বা ৭৩২ খৃষ্টাব্দে ছিলেন।"*

* ঢাকা রিভিউ ১৩১৯ ফাল্গুন পৃঃ ৪৪৪

প্রকৃতকথা অতি অল্পদিন পূর্ব্বে আবিষ্কৃত বিজয়সেনদেবের এক-তাম্রশাসনে পাওয়া গিয়াছে। ইহতে স্পষ্ট কথিত আছে যে, বিজয়সেনের মহিষী বিলথদেবী শূরবংশের কন্যা এবং স্বয়ং বল্লালসেন শূরবংশের দৌহিত্র। সুতরাং,—

(১) বিজয়সেন আদিশূরের দৌহিত্র বংশজাত নহেন।

(২) আদিশূরের কুলেজাত শ্রীনাম্নী কোন কন্যা বল্লালসেন বা বিজয়-সেনের মাতা নহেন।

(৩) বল্লালসেন আদিশূরের দৌহিত্রবংশজাত নহেন।

ভরসা করি, ভবিষ্যতে বিনোদবিহারী বাবু আর কুলশাস্ত্রের প্রমাণ শুনাইতে আসিবেন না।

আদিশূরের কালসম্বন্ধে বিনোদবিহারী বাবু যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহার মূল্যও তদনুরূপ। প্রথম কথা সিদ্ধান্তটি তাঁহার নিজস্ব নহে, বহুকাল পূর্ব্বে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা বঙ্গবাসী মাত্রেই অবগত আছেন। বলা বাহুল্য এই সিদ্ধান্তের কোন মূল্য নাই, কারণ, কুলশাস্ত্র ব্যতীত ইহা প্রমাণ করিবার আর কোনই উপায় নাই। যে কুলশাস্ত্র হইতে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় ও বিনোদবিহারী বাবু আদিশূরের কালনির্ণয় করিয়াছেন, সেই কুলশাস্ত্রেই আদিশূরের কালসম্বন্ধে নানা কথা শুনিতে পাওয়া যায়,—

(১) "বেদবানাঙ্কশাকে" ও "বেদবানাঙ্গশাকে" পাঠ লইয়া বিলক্ষণ মতভেদ আছে।

(২) ক্ষিতীশবংশাবলিচরিতে ৯৯৯ শক

(৩) ভট্টগ্রন্থমতে ৯৯৪ শক

(৪) কায়স্থকৌস্তভমতে ৮১৪শক

(৫) দত্তবংশমালামতে ৮০৪ শক

আদিশূর কর্তৃক ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ আনয়নের তারিখ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে; সুতরাং প্রচলিত পাঠানুসারে "বেদবানাঙ্কশাকে" পাঠ গ্রহণ করিলে, অপরাপর কুলশাস্ত্রের মতের সহিত মিলন হয় এবং স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে শকাব্দের দশম শতাব্দীতে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ আনীত হইয়াছিলেন। কায়স্থ কৌস্তভ ও দত্তবংশমালার উদ্ধৃত তারিখ অন্যরূপ, কিন্তু তাহা অবলম্বন করিয়াও আদিশূরকে ৬৫৪ শকে লইয়া [illegible]

দেখিতে পাওয়া যায় যে, আদিশূর পালবংশজ বৌদ্ধ নৃপতিগণকে পরাজিত করিয়া পৃথিবী শাসন করিতেন। একথা সত্য হইলে "বেদবাণাঙ্গশাকে" পাঠ গ্রহণ করা অসম্ভব। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর উত্তরার্দ্ধে প্রথম গোপালদেব কর্তৃক গৌড়ে পালরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; সুতরাং আদিশূরকে তাহার পূর্ব্বে নিক্ষেপ করা যায় না। এতক্ষণে বিনোদবিহারী বাবু স্বয়ং, বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছেন যে, কুলশাস্ত্রের কোনই ঐতিহাসিক মূল্য নাই।

রাজতরঙ্গিণী সম্বন্ধে ডাঃ ষ্টাইনের ভূমিকা হইতে দুইটি ছত্র উল্লেখ করিলাম :—

(১) All the above observations combine to show that Kalhana knew nothing of that critical spirit which to us now appears the indispensable qualification of the historian. Prepared as he himself is to believe, we cannot expect him to have chosen his authorities with special regard to their reliability, or their closeness to the events they profess to relate. Still less can we credit him with a critical examination of the Statements he chose to reproduce from them. It would be manifestly unfair were we to lay all the defects of the Chronicle which result from this attude, solely on Kalhana's shoulders. We know how recent a growth even in the west that system of critical principles is upon which modern historical science rests. There is nothing to justify that they had ever been recognised by any of Kalhana's forerunners and models.

(২) In proportion as Kalhana's account becomes more and more historical, the excerpts of these later writers grow briefer and more superficial. But when they approach the centuries immediately preceding their own time, their interest in historical details is roused. Contemporaray Muhammadan records are used; the narrative grows fuller and more authentic. Thus in turn these later chronicles present themselves in their final portions as useful sources of historical information.

ডাঃ বুলার কৃত, কাশ্মীরে সংস্কৃত পুথির অনুসন্ধান সম্বন্ধে রিপোর্ট, ডাঃ ষ্টাইন রচিত কাশ্মীরে সংস্কৃত পুথির বিবরণ এবং রাজতরঙ্গিণীর অনুবাদের ভূমিকা বিনোদবিহারী বাবুকে পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

কাঙ্গাল হরিনাথের সম্বন্ধে আমার স্মৃতি।*

সাহিত্য-সেবক সাধক-প্রবর স্বর্গীয় হরিনাথ মজুমদার মহাশয় অনেক দিন হইল মর্ত্তাধাম পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। আমি তাঁহার সম্বন্ধে যাহা জানি তাহা লিপিবদ্ধ করিতেছি।

হরিনাথের চিঠিপত্রাদি যাহা আমার নিকট আছে, এ পর্য্যন্ত তাহা সংগ্রহ করিবার সুবিধা হইয়া উঠে নাই। যতদুর মনে আছে তাহাই লিখিলাম। ভরসা করি ইহাতেই পাঠক তাঁহার চরিত্রের মহত্ত্ব এবং জীবনের উন্নতি কতকটা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

বাঙ্গালা ১২৮৫ সালে (১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে) হরিনাথের সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ। মৎ-প্রণীত ক্ষুদ্র কবিতাপুস্তক "শরদবকাশ" ছাপাইতে কুমারখালি যাই। মথুরানাথ-যন্ত্র হরিনাথের, এবং তাহা তাঁহার বাড়ীতেই স্থাপিত। এই সময়ে হরিনাথের বয়স পঁয়তাল্লিশ বৎসর, আমার ষোল বৎসর মাত্র। হরিনাথকে দেখিলাম বটে,—কিন্তু তাঁহার চরিত্রের মহত্ত্ব সম্যক্ বুঝিতে পারিলাম না। তখন আমার বুঝিবার শক্তিই বোধ হয় তেমন পরিস্ফুট হয় নাই। আর বয়সের পার্থক্যে হরিনাথের সম্মুখে তেমন ভাবে অগ্রসর হইতে পারি নাই। বিজয়-বসন্তের রচয়িতা, গ্রামবার্ত্তা-প্রকাশিকার সম্পাদক, আর মথুরানাথযন্ত্রের স্থাপয়িতা বলিয়া হরিনাথের নাম পূর্ব্ব হইতেই জানিতাম। সেই প্রৌঢ় পুরুষের সম্মুখীন হইয়া সঙ্কোচ পরিহার করিতে পারিলাম না। মূর্ত্তি দেখিয়াই বুঝিলাম তাহাতে প্রবীণত্ব এবং সরলতার সংমিশ্রণ। সঙ্গে সঙ্গে এক জ্বলন্ত ধর্ম্মভাব। দেহের সৌন্দর্য্য এবং মাধুরী দেখিয়া মনে হইল এমন মূর্ত্তি ব্রাহ্মণের বংশে হইলে ঠিক হইত।

ইহার কয়েক মাস পরে 'শরদবকাশ' মুদ্রিত হইলে, আমি আর একবার কুমারখালিতে গিয়াছিলাম। হরিনাথ তখন অসুস্থ ছিলেন। আমি তাঁহাকে একবার মাত্র দেখিয়া ছিলাম।

দুই তিন বৎসর পরে পুনরায় হরিনাথের সাক্ষাৎ লাভ করি। সেবারে আমার একজন বয়োজ্যেষ্ঠ আত্মীয় সঙ্গে ছিলেন। আমি অধ্যয়নার্থ এবং

---

* বিগত অক্ষয়তৃতীয়ায় কাঙ্গাল হরিনাথের স্বর্গারোহণ দিবসে কুমারখালি স্মৃতিসভায় পঠিত।

তিনি বিষয় কার্য্যোপলক্ষে উভয়ে কৃষ্ণনগরে যাইতেছিলাম, আষাঢ় মাসে গ্রীষ্মাবকাশের পরে কলেজ খুলিবার কিছু পূর্ব্বে, অপরাহ্নে আমরা হরিনাথের ভবনে উপস্থিত হই, এবং রাত্রির গাড়ীতেই বগুলায় যাই। যে কয়েক ঘণ্টা হরিনাথের সঙ্গে ছিলাম, তাহাতেই তাঁহার প্রতি আমার ভক্তি অতিশয় বর্দ্ধিত হইয়াছিল। আমার আত্মীয় বালো কুমারখালি বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া হরিনাথকে জানিতেন, হরিনাথ তাঁহাকে বিশেষরূপে জানিতেন না। আর আমার সঙ্গে পরিচয় সেই 'শরদবকাশের' মুদ্রাঙ্কন সময়ে। এমন কি হরিনাথের ওখানে যাইব কি না এ বিষয়ে আমরা ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিয়াছিলাম। কিন্তু সেই সামান্য পরিচয়ে হরিনাথ আমাদিগকে যেমন ভাবে আদর করিলেন, দূরস্থ কোন আত্মীয় কুটুম্ব বাড়ীতে আসিলেও বোধ হয় অনেক গৃহস্থ তেমন করেন না। সে আদর বড়ই সরলতা মাখা।

এবারেও আমি হরিনাথের সহিত যেন প্রাণ খুলিয়া কথা কহিতে পারি নাই। কিন্তু আমার আত্মীয়ের সহিত তাঁহার যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল তাহা সমস্তই শুনিয়াছিলাম এবং তাহার অনেকাংশ এখনও মনে আছে। হরিনাথ আমাদিগকে জলযোগে অতি সুস্বাদু আম দিয়াছিলেন। আমার আত্মীয় সেই আম খাইয়া কহিলেন, বড়ই সুমিষ্ট আম। হরিনাথ কহিলেন "আর বুঝি কুমারখালিতে গরীবের ভাগ্যে ভাল আম যুটে না। আমার গ্রামবার্ত্তা উঠে গেছে—আর গরীবে আম খাবে কি?" হরিনাথের চক্ষু দিয়া জল পড়িল। আমার আত্মীয়, গ্রামবার্ত্তার সহিত লোকের আম খাইবার কি সম্বন্ধ বুঝিতে না পারায় নম্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন"? হরিনাথ উত্তর করিলেন "পাবনা এবং উত্তর অঞ্চল হইতে এই সব আম কুমারখালিতে আসিয়া থাকে। মহকুমা এখানে না থাকায় স্থানীয় কতকগুলি লোকে আমওয়ালাদিগের উপর বড়ই অত্যাচার করে। ঝাঁকার ভাল আমগুলি তুলিয়া কখনও অল্প দাম দেয় কখনই বা দেয়ই না। এই অত্যাচার নিবারণার্থ আমি গ্রামবার্ত্তায় লিখিয়া আম এবং ইলিশ মাছের নিমিত্ত বিশেষ পুলিশ পাহারা করিয়াছিলাম। গ্রামবার্ত্তা উঠিয়া গিয়াছে, শাসনেরও শিথিলতা ঘটিয়াছে। পুনরায় পূর্ব্বরূপ অত্যাচার আরম্ভ হইয়াছে। উহার ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে গরীবেরা ভাল আম পায়ই না। খারাপ যাহা পায় তাহাও অত্যধিক মূল্য দিয়া; কেননা আমওয়ালারা সেই অপহৃত আমগুলির দাম পোষাইয়া লয়। ক্রমে হয়ত আর আমওয়ালা এ বাজারে আসিবেই না।" হরিনাথ হৃদয়ের যে গভীরতার সহিত এই কথাগুলি

কহিয়াছিলেন, আমার দুর্ব্বল লেখনীর সাধ্য নাই, যে তাহা সম্যক্ বুঝাইয়া দিই।

জলযোগান্তে গ্রামবার্ত্তা উঠিয়া যাওয়া সম্বন্ধে অনেক কথা হইল। হরিনাথ কহিলেন গ্রামবার্ত্তার জন্য তিনি অনেক টাকা ঋণ করিয়াছেন। গ্রাহকগণের নিকট যদিও ঋণের তিনগুণ পরিমাণ টাকা পাওনা রহিয়াছে, তথাপি তাহা আদায়ের আশা নাই। যাহাদিগের দিবার ইচ্ছা ছিল তাঁহারা সকলেই পত্রিকার মূল্য দিয়াছেন। অন্য অনেককে চিঠি লিখিয়া ত্যক্ত করাতেও কোন ফল হয় নাই। দুএক কথার পরে আমার আত্মীয় কহিলেন দুএকজন গ্রাহকের নামে নালিশ করিলে হয় না? হরিনাথ শিহরিয়া উঠিলেন, কহিলেন "তা হলে কি ভদ্রতা থাকে? আমার বুঝিয়া লওয়া উচিত যে গ্রামবার্ত্তা-প্রকাশিকায় সমাজের আর প্রয়োজন নাই; তাই আমি বন্ধ করিয়া দিয়াছি। যাহারা চারি পাঁচ বৎসর বা তদূর্দ্ধ কাল কাগজ লইয়া দাম দেন নাই, তাঁহাদের ভদ্রতার ক্রুটী আছে, আমি স্বীকার করি, কিন্তু তাই বলিয়া আমি অভদ্রতা করি কিরূপে?"

হরিনাথের সহিত আমার আত্মীয়ের আরও অনেক কথা হইয়াছিল। যে গৃহবিবাদ উপলক্ষ করিয়া তিনি "চিত্তচপলা" লিখিয়াছিলেন হরিনাথ আমাদের দেশস্থ সেই পরিবারের নাম করিয়া ঘটনাংশ আমাদিগকে বুঝাইয়া দেন। সম্প্রতি নূতন কিছু লিখিতেছেন কি না জিজ্ঞাসা করায় হরিনাথ তাঁহার শিরঃ-পীড়ার কথা উল্লেখ করেন এবং কহেন "বর্ষা আসিতেছে, এই সময়ে পীড়ার বৃদ্ধি হইবে।" আমার আত্মীয় কহিলেন, "ইংরাজী বিজ্ঞানে পড়িয়াছি মেঘের সহিত মস্তিষ্কের সম্বন্ধ আছে। আকাশে মেঘ হইলে মস্তিষ্ক পরিষ্কার থাকে না।" হরিনাথ এই কথা শুনিয়া যেন কিছু দুঃখিত হইলেন এবং কহিলেন "দেখুন আজকাল অনেক সময়েই আমরা ইংরাজী বিজ্ঞানের দোহাই দিয়া থাকি। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান আমাদিগকে অনেক শিখাইয়াছে, এবং শিখাইবে। কিন্তু তাই বলিয়া আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা কি জানিতেন, কি না জানিতেন, তাহা জানিয়া লাভ আছে। নিজের পিতৃদত্ত সিন্ধুকে কোন জিনিষ থাকিতে তাহা পরের কাছে ধার করিতে যাওয়ার প্রয়োজন কি? আপনি কি জানেন না যে, আকাশে মেঘ থাকিলে টোলের অধ্যয়ন অধ্যাপনা বন্ধ থাকে? ব্রাহ্মণের উপনয়ন স্থগিত হয়? এসবই মস্তিষ্কের ব্যাপার। মেঘের সঙ্গে মস্তিষ্কের সম্বন্ধ জানিতেন বলিয়াই আর্য্যগণ এ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।" আমার আত্মীয় নির্ব্বাক রহিলেন। আমি হরিনাথের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। বুঝিলাম পৈতৃক

সিন্ধুকের কোথায় কি আছে তাহা জানিবার ইচ্ছা ইহার বড়ই প্রবল। সেই ইচ্ছা কতদূর সকল সফল হইয়াছিল, হরিনাথ শেষ জীবনে 'কাঙ্গালের ব্রহ্মাণ্ডবেদে' তাহার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

নিরূপিত সময়ে আমরা হরিনাথের গৃহ ছাড়িয়া ষ্টেশনাভিমুখে যাত্রা করিলাম। বিদায়কালে হরিনাথ আমাদিগকে যে কয়েকটি কথা কহিয়াছিলেন তাহা আমার চিরদিন স্মরণ থাকিবে। তিনি কহিলেন "আপনাদের দর্শন পাইতে পারি এমন সৌভাগ্য কিছুই নাই। কেবল বাড়ীর কাছে রেলওয়ে ষ্টেশন আছে এই। ইহাতে যদি আমাকে এ সুখে বঞ্চিত করেন বড়ই দুঃখিত হইব। যখন কুমারখালি হইয়া যাইবেন একবার যেন দর্শন পাই।" কোথায় আমরা তাঁহাকে দেখিয়া ধন্য হইলাম—তাঁহার ব্যবহার ও আতিথ্যে পরমাপ্যায়িত হইলাম, আবার কিনা তিনিই আমাদিগকে এইরূপ বিনয় ও সৌজন্যের সহিত বিদায় দিয়া পুনরাগমন প্রার্থনা করিলেন! বস্তুতঃ আমি তাঁহার আচরণ দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। কয়েক ঘণ্টা একত্র থাকিয়াই যেন একরূপ ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়া গেল। বোধ হয় কিছুকাল পূর্ব্বেই রঘুবংশে পড়িয়াছিলাম—"সম্বন্ধমাভাষণ পুর্ব্বমাহুঃ"; মনে হইল এ কথা কেবল সাধুসঙ্গেরই সম্বন্ধে খাটে। হরিনাথ এতই মহৎপ্রকৃতিসম্পন্ন যে, তিনি আমাদের ন্যায় লোককেও অল্পক্ষণের মধ্যে আপনার করিয়া লইতে পারেন। আসিবার সময়ে হরিনাথ আমাদিগকে আলিঙ্গন করিলেন। সে আলিঙ্গন বড়ই প্রাণভরা। ইহার পর যতবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে হরিনাথ প্রত্যেকবারেই আমাকে এই ভাবে আলিঙ্গন করিয়াছেন। শেষ জীবনে যখন তিনি সাধন-রাজ্যে বিলক্ষণ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন তখন তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিতে আমার কেমন সঙ্কোচ বোধ হইত। হরিনাথ তখনও আমাকে আলিঙ্গনদানে কুণ্ঠিত হন নাই। ১৩০২ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে আমি তাঁহার শেষ আলিঙ্গন লইয়া ময়মনসিংহে যাই।

হরিনাথের শেষ অনুরোধ আমার আত্মীয় রক্ষা করিতে পারেন নাই। উপরের লিখিত ঘটনার কিছুকাল পরেই তিনি মানবলীলা সংবরণ করেন। আমি হরিনাথের অনুরোধ অনুগ্রহ বলিয়া মনে করিতাম, এবং ইহার পরে যতবার কুমারখালি গিয়াছি, দুএকবার ব্যতীত হরিনাথকে না দেখিয়া কুমারখালি ত্যাগ করি নাই। অন্যূন বিশবার তাঁহাকে দেখিয়াছি এবং প্রতিবারেই তাঁহার ব্যবহারে ও মুখনিঃসৃত বাক্যে কত জ্ঞান, কত উপদেশ লাভ করিয়াছি। সকল কথা স্মরণ করা অবশ্য দুঃসাধ্য

একবার হরিনাথের সঙ্গে তাঁহার বাড়ীতে বসিয়া রহিয়াছি, নিকটে বাড়ীর এবং পাড়ার কতকগুলি স্ত্রীলোক শুভচণ্ডী পূজা করিতেছেন। পূজা শেষ হইলে একজন বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক আমাদের শ্রুতিগোচরে কথা কহিতে কহিতে বাড়ী যাইতেছিলেন। দেবতার নিকট তাঁহার শেষ প্রার্থনা আমরা শুনিতে পাইলাম। তিনি কহিছেন "মা শুভচণ্ডী, আমার ছেলেটীর চাকরি হ'ক্; বউকে দুখানা গয়না দি'ক।" হরিনাথ কহিলেন, "শুনিলেন? আমাদের মা নাই। মা না থাকিলে উন্নতি আসিবে কোথা হইতে? যে জাতির মাতার প্রার্থনা এইরূপ; সে জাতির উন্নতি বহুদূরে। বউকে দুখানা গয়না দিলেই জীবনের সার্থকতা হইল!" পাঠক দেখিবেন, অতি ক্ষুদ্র ঘটনাও হরিনাথ কেমন ভাবে লক্ষ্য করিতেছেন। "আমাদের মা নাই" এ কথা তিনি অনেকদিন অনেক ভাবে বলিয়াছেন; চিরদিন তিনি স্ত্রী-শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন।

হরিনাথের প্রাণ অতিশয় কোমল ছিল। সামান্য বিষয় বা কথাতেই তাহাতে আঘাত লাগিত এবং সামান্য আঘাতেই তাহাতে দাগ বসিত। এক দিন সন্ধ্যার পরে হরিনাথ ও আমি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের গান শুনিতেছি। সেখানে আরও দুচারিজন ভদ্রলোক ছিলেন। একটি গানের শেষ চরণ ছিল "রাধাকৃষ্ণ যুগল বিরাজে"। এই অংশ গীত হইবামাত্রই হরিনাথ কাঁদিয়া উঠিলেন। গান শেষ হইলে দু তিনবার ঐ কথাটাই কহিলেন "রাধাকৃষ্ণ যুগল বিরাজে"। শেষে বলিলেন বর্ত্তমান সময়ের বৈষ্ণব বৈষ্ণবীরা এই মধুর বাক্যের কি বিকৃত অর্থই করিয়াছে। আমরা যতজন শুনিতেছিলাম "রাধাকৃষ্ণ যুগল বিরাজে" একথা কাহারও প্রাণে অমন ভাবে লাগে নাই।

মধ্যে কিছুকাল "গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা" পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছিল। কয়েকটি কৃতবিদ্য যুবক লেখার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। হরিনাথ নিজে কিছুই লিখিতে পারিতেন না। একদিন আমি হরিনাথকে কহিলাম "গ্রামবার্ত্তা" আবার বাহির হইল। হরিনাথ কহিলেন "আর না বাহির হওয়াই ভাল ছিল।" আমি বলিলাম "কেন?" তিনি কহিলেন "ভাষার শ্রাদ্ধ হইতেছে। কিঞ্চিৎ এর স্থলে "কথঞ্চিৎ" ব্যবহৃত হইতেছে। ক্রিয়ার বিষেষণকে বিশেষ্যের বিশেষণ-রূপে প্রয়োগ করা হইতেছে।" হরিনাথ তৎক্ষণাৎ একখানি গ্রামবার্ত্তা আনাইলে, এবং আমাকে "কথঞ্চিৎ"এর দূষিত প্রযোগ দেখাইয়া দিলেন। আমি দেখিলাম এই সামান্ত ভ্রম দেখিয়াই তিনি বিলক্ষণ দুঃখিত হইয়াছেন। কিন্তু বস্তুতঃ তাঁহার দুঃখিত হইবার কারণ ছিল। হরিনাথ বাল্যে অতি কষ্টে

বাঙ্গালাই শিক্ষা করিয়াছিলেন। চিরদিন বাঙ্গালাভাষার চর্চ্চা করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা তাঁহার পুস্তকগুলি পড়িয়াছেন, তাঁহারাই জানেন হরিনাথ কেমন বিশুদ্ধ বাঙ্গালা লিখিতেন এবং ভাষায় তাঁহার কেমন ব্যুৎপত্তি ও অধিকার ছিল। হরিনাথ ইংরাজী জানিতেন না এবং তজ্জন্য সময়ে সময়ে দুঃখ প্রকাশ করিতেন একবার আমাকে কহিয়াছিলেন "গ্রামবার্ত্তায় আমি যাহা লিখিতাম তাহা প্রায়ই আমার মস্তিষ্ক হইতে বাহির করিতে হইত; কেন না ইংরাজী হইতে অনুবাদ করিবার ক্ষমতা আমার নাই।" হরিনাথ এইরূপ দুঃখ করিতেন বটে এবং ইহাই তাঁহার মস্তিষ্কের পীড়ার অন্যতর কারণ; কিন্তু আমাদের বিশ্বাস এই যে, শৈশবে ইংরাজী শিখিলে তিনি এমন বিশুদ্ধ বাঙ্গলা লিখিতে পারিতেন না। আজকালি আমরা অল্প ইংরাজী অল্প বাঙ্গলাজানা লোকে বাঙ্গালা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি বলিয়াই ত বাঙ্গালায় অতিপ্রয়োগের ছড়াছড়ি হইতেছে। দেশে খাঁটি বাঙ্গালা লিখিতে পারেন এমন লোকের সংখ্যা ক্রমশঃই কমিয়া আসিতেছে।

আমার মনে আছে হরিনাথের বাড়ীতে আমি একদিন অন্ন পাক করিতে ছিলাম। রন্ধনে তেমন পটু ছিলাম না বলিয়া একটি ভাত উঠাইয়া একজনকে দেখাইতেছিলাম এবং জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম "হইয়াছে কি না?" তিনি কহিলেন "আর একটু হ'বে, এখনও একটু মাইজ আছে।" হরিনাথ নিকটেই বসিয়া ছিলেন। কথাটি শুনিয়াই আস্তে আস্তে বলিতে আরম্ভ করিলেন "মাইজ—মধ্যভাগ—সার; মসজ্ ধাতু, যা' থেকে মজ্জা।" আমি নীরবে শুনিয়া গেলাম। হরিনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন, তাই ত?" আমি কহিলাম "আমরা অমন ভাবে বাঙ্গালা পড়ি নাই, যা'তে প্রত্যেক কথার ধাতু বলিয়া দিতে পারি।" হরিনাথ হাসিলেন। এমন আবৃত্তি তাঁহার মুখে আরও শুনিয়াছি। ঠিক পণ্ডিতের মত তিনি আবৃত্তি করিতেন। হরিনাথ বিদ্যালয়ে পণ্ডিতের কাজও করিয়াছিলেন। অনুসন্ধানপ্রবৃত্তি তাঁর প্রবল ছিল। এই জন্যই ভাষায় তাঁহার বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল।

আর্থিক অসচ্ছলতা নিবন্ধন হরিনাথ চিরদিনই ক্লেশভোগ করিয়া গিয়াছেন। বড়ই সহিষ্ণু লোক ছিলেন বলিয়া তিনি কাহাকেও ইহা বলিতে দিতেন না। তথাপি দু-এক সময়ে মনের আবেগে বাহির হইয়া পড়িত। হরিনাথ অমিতব্যয়ী ছিলেন না। ভোগবিলাস কাহাকে বলে জানিতেন না। দেশের জন্য তিনি যথেষ্ট করিয়াছিলেন। দেশ তাঁহার জন্য কিছুই করে নাই। মানুষ ইহাতে

ক্ষুব্ধ না হইয়া থাকিতে পারে না। হরিনাথের মনে এমন ক্ষোভ আছে ইহা আমি তাঁহার সহিত প্রথম পরিচয়ের প্রায় দশ বৎসর পরে জানিতে পারি। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে আমি চট্টগ্রামে ছিলাম। একদিন শ্রীযুক্ত বাবু নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সঙ্কলিত সঙ্গীত মুক্তাবলী পড়িতেছি, সহসা হরিনাথ প্রণীত দু-একটী বাউল, সঙ্গীতের প্রতি দৃষ্টি পড়িল। একটি গানের আরম্ভ এইরূপ—

"ওরে ভাই সকল ফাঁকি, শেষ দশা কি, মনে একবার ভেবে দেখ্‌লে।" ইহার ভনিতায় হরিনাম লিখিয়াছেন—

"কাঙ্গাল যে ভবের মুটে, খেটে খেটে, জব্দ এখন এই শেষকালে।
বুড়ো বলদের মত, কষ্ট কত, যায়গা না পায় কোন স্থলে॥"

গানটি পড়িয়াই আমার প্রাণ ফাটিয়া গেল। চক্ষু দিয়া জল পড়িল। হরিনাথকে আমি নিজেই ছিন্নবস্ত্র এবং ভগ্ন কাষ্ঠপাদুকা ব্যবহার করিতে দেখিয়াছি! এ সবই মনে পড়িল। সেই দিনই হরিনাথকে এক চিঠি লিখিলাম। ইহার পূর্ব্বে দুই বৎসরের অধিককাল আমি হরিনাথকে দেখি নাই। আমার পত্র পাইয়া হরিনাথ যে উত্তর লিখিয়াছিলেন, পাঠকদিগকে তাহা দেখাইবার বড় সাধ ছিল। ঐ পত্র বড়ই দীর্ঘ, বড়ই উপদেশপূর্ণ, বড়ই ভালবাসামাখা। হরিনাথ তখন "কাঙ্গালের ব্রহ্মাণ্ডবেদ" প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ব্রহ্মাণ্ডবেদ সম্বন্ধে পত্রে অনেক কথা ছিল। সে সবই ধর্ম্মের কথা, প্রাণের কথা; পড়িয়াই বুঝিলাম হরিনাথ সাধনরাজ্যে অগ্রসর হইতেছেন। ইহার পরে হরিনাথকে যতবার দেখিয়াছি—সাধক ভাবেই দেখিয়াছি। আর তাহাকে সাংসারিক অভাবের ক্ষোভ করিতে দেখি নাই বা শুনি নাই। বোধ হয় সংসারের নিন্দয় ব্যবহার হরিনাথের মনে নির্ব্বেদ উপস্থিত করিবার অন্ততর কারণ।

হরিনাথ সাধক হইয়াও বন্ধুবান্ধব এবং পরিচিত ব্যক্তিগণকে ভুলিয়া যান নাই। পুত্রকলত্রাদিকেও পূর্ব্ববৎ স্নেহ করিতেন। তবে আপনার পার্থিব অভাব যতদূর সম্ভব হ্রাস করিয়া আনিয়াছিলেন। ইদানীং তিনি যাহা আহার করিতেন, তাহা একটি শিশুর পক্ষেও পর্য্যাপ্ত খাদ্য নহে। হরিনাথ আমাকে একদিন বুঝাইয়াছিলেন "আহার একেবারে কমান সম্ভব নহে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে লঘু হইতে লঘুতর আহারেও শরীরধারণ করিতে পারা যায়। আহার যত লঘু হয় মস্তিষ্ক তত পরিষ্কার থাকে। কোন একটি নূতন জটিল তত্ত্ব বুঝিতে

ব্রহ্মাণ্ডবেদ পড়িয়াছেন তাঁহারই জানেন হরিনাথ কত জটিল তত্ত্ব বিশদ করিয়া বুঝাইয়াছেন।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে আমি চট্টগ্রাম হইতে আসিয়া হরিনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিলে নানাকথার পর হরিনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন "সেখানে লোকের প্রাণ আছে ত?" ইহার পরে তমোলুক এবং জামালপুর হইতে আসিয়া যখন আমি তাঁহাকে প্রথম দর্শন করি হরিনাথ ঠিক আমাকে এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন। হরিনাথের প্রাণ থাকার অর্থ এই যে, লোকের ধর্ম্মে মতি আছে কি না। হরিনাথ কাঙ্গালের ব্রহ্মাণ্ডবেদে মৃত্যুর অর্থ করিয়াছিলেন যে, যাঁহারা কেবল সংসার লইয়া ব্যস্ত, ঈশ্বরের দিকে যাহাদিগের গতি নাই, তাঁহারাই মৃত। তিনি বুঝাইয়াছেন যে, নদী সমুদ্রমুখে যায়, তাই জীবিত। আর যাহা কারণবিশেষে বদ্ধ, তাহাই মৃত। তাহারই নাম মরা-নদী। তেমনই মানুষও ঈশ্বরমুখে না গেলেই সেই মানুষ মরামানুষ।

হরিনাথ ধর্ম্ম সম্বন্ধে বড়ই উদার মত পোষণ করিতেন। পৃথিবীর কোন ধর্ম্মের প্রতিই তাঁহার বিদ্বেষ ছিল না। বিদ্বেষ ছিল কেবল কপটতার প্রতি। তিনি ব্রহ্মাণ্ডবেদে বুঝাইয়াছিলেন যে, ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়াই ব্রহ্মাণ্ডপতির তত্ত্বনির্ণয় করিতে হয়। সকল ধর্ম্মই এই চেষ্টা করিয়াছেন। যাঁহার নকলে যেটুকু ভুল হইয়াছে, সেই অংশই পরিত্যজ্য। নকল ঠিক হইলে সকলই গ্রাহ্য। হরিনাথ কতবার আমাকে এই কথা বুঝাইয়া দিয়াছেন। কেহ কেহ দেখাইয়াছেন, হরিনাথ প্রথম ও মধ্যজীবনে ব্রাহ্ম ছিলেন, শেষ জীবনে হিন্দু হইয়াছিলেন। হরিনাথ যখন যাহাই থাকুন ধর্ম্মবিশ্বাস এবং ধর্ম্মভাব চিরদিনই তাঁহার অচল এবং অটল ছিল। হরিনাথ এক সময়ে কুমারখালির ব্রাহ্মসমাজের প্রাণস্বরূপ ছিলেন। এই হরিনাথই শেষজীবনে ব্রহ্মাণ্ডবেদে সাকার উপাসনার সুন্দর সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। কিরূপে এই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল তাহা বুঝাইতে গেলে এই প্রবন্ধে স্থান কুলাইবে না। বিস্তৃত জীবনী-লেখক এ কথার আলোচনা করিবেন সন্দেহ নাই। এ পর্য্যন্ত বলিতে পারি হরিনাথে কোন দিনই ধর্ম্মের ভাণ ছিল না। তিনি প্রকৃত ধার্ম্মিক ছিলেন। আমি বঙ্গের এক পরিবারে দুই সহোদর দেখিয়াছি, একজন গোঁড়া হিন্দু আর একজন গোঁড়া ব্রাহ্ম। কে ভাল কে মন্দ বলিতে পারিব না। দুজনেই কিন্তু খাঁটি জিনিষে পরিপূর্ণ, নকল কাহাতেও নাই। সারাংশ গ্রহণ করিলে পৃথিবীর সকল ধর্ম্মই এক, হরিনাথের কথার এই এক প্রমাণ।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি হরিনাথ এক একটি সামান্য ঘটনা হইতে এক এক অসাধারণ সত্য উদ্ঘাটন করিতে পারিতেন। সাধন রাজ্যে উন্নতি লাভ করিবার পর তাঁহার এই ক্ষমতা যেন আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। হরিনাথকে একদিন আমি আমার লিখিত সৎকথা পড়িয়া শুনাইতেছিলাম হরিনাথ বলিলেন "এ ত আমার ব্রহ্মাণ্ডবেদের অংশ হইয়াছে।" আমি কহিলাম "মনে করিতেছি ছাপাইয়া দিব।" হরিনাথ বলিলেন "তাহাতে আবার দ্বিধা কেন? যাহা কিছু লিখিবেন তাহাই প্রকাশ করিবেন। প্রকাশ করাই চৈতন্যের লক্ষণ। তদ্বিপরীত ভাবই জড়ত্ব। দেখুন, অল্প বয়স্ক শিশুরা ধুলা কাদা দিয়া যদি কোন মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করে তাহাহইলে উহা কিছু হউক আর না হউক সকলকেই দেখাইবে, কহিবে "দেখ আমি কি একটা গড়েছি।" শিশুতে চৈতন্যের অল্প পরিস্ফুরণ মাত্র। আর দেখুন যাঁরা কোন ধর্ম্ম মানেন তাঁহারাই বলিবেন ভগবান সমস্ত সৃষ্টি করিয়া শেষে মানুষ সৃষ্টি করেন। যাহা করিলাম ইহা বুঝিবে কে, এই ইচ্ছা হইতেই মনুষ্যের সৃষ্টি। তাই আপনার অংশ দিয়া মনুষ্য নির্ম্মিত। আমরা যাহা কিছু গড়ি, তাহাই অন্যকে দেখাইবার জন্য।

দুঃখের বিষয় এই যে হরিনাথ এমন গঠিত জিনিষ অনেকটা পৃথিবীকে দেখাইয়া যাইতে পারেন নাই। অর্থাভাবে ব্রহ্মাণ্ডবেদের অনেকাংশ এখনও অপ্রকাশিত রহিয়াছে। সাধারণের নিকট অর্থ ভিক্ষা করিয়া হরিনাথ লিখিয়াছিলেন কোন মূকব্যক্তি এক উৎকৃষ্ট স্বপ্ন দর্শন করিয়া তাহা প্রকাশ করিতে না পারায় যে যন্ত্রণা ভোগ করে কাঙ্গাল তাঁহার ব্রহ্মাণ্ডবেদ প্রকাশ করিতে না পারিয়া সেই যাতনা অনুভব করিতেছেন। ধন্য আমাদের দেশ যে ব্রহ্মাণ্ডবেদের ন্যায় জিনিষ প্রকাশ করিতে উপযুক্ত অর্থসাহায্য মিলিল না। বলা কর্ত্তব্য যে দেশের কতকগুলি বড়লোক হরিনাথকে শ্রদ্ধা করিতেন এবং ব্রহ্মাণ্ডবেদ প্রকাশার্থ অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। ব্রহ্মাণ্ডবেদে ইঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার আছে। পূর্ব্বেই আভাস দিয়াছি ব্রহ্মাণ্ডবেদের গ্রাহক সংখ্যা অতি অল্প ছিল। যাঁহারা গ্রাহক ছিলেন তাঁহাদের মধ্যেও কেহ কেহ নিয়মিতরূপে মূল্য প্রদান করেন নাই। গ্রামবার্ত্তায় সর্ব্বস্বান্ত হরিনাথের শেষ জীবনে এমন সম্বল ছিলনা যে তিনি নিজ ব্যয়ে ব্রহ্মাণ্ডবেদ মুদ্রিত করেন।

একদিন রবিবারে হরিনাথের বাড়ীতে আমি স্বয়ং রন্ধন করিয়া হবিষ্যান্ন আহার করিতেছি, হরিনাথ সম্মুখে বসিয়া

"আপনার বাড়ীতে এই হবিষ্যান্নও কি এত মিষ্ট লাগে?" হরিনাথ কহিলেন "আমার বাড়ীর কিংবা আমার প্রদত্ত তণ্ডুলের কোনই গুণ নাই। আপনি স্বয়ং পরিশ্রম করিয়া অন্ন প্রস্তুত করিয়াছেন বলিয়াই মিষ্টত্ব। বাড়ীতে অন্যে রন্ধন করিয়া দিতেন। এই জন্যই প্রবাসের অন্ন বড়ই মিষ্ট। প্রবাসে পরিশ্রম করিতে হয়। যাহা পাইতে যত পরিশ্রমের প্রয়োজন, তাহার মিষ্টত্ব ততই অনুভব করা যায়। দেখুন এই জন্যই ভগবান তাঁহাকে পাইবার পথ এত দুর্গম করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার চেয়ে মিষ্ট কিছুই হইতে পারে না। তিনি সহজে ধরা দিলে মানুষ তাঁহার মিষ্টত্ব বোধ হয় সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিত না।" আমি ভাবিলাম কি সামান্য কথা হইতে কত উচ্চ সত্য প্রতিপন্ন হইল। হরিনাথ এমন কত কথাই হয়ত কতজনকে কহিয়াছেন। সমস্ত সংগ্রহ করিতে পারিলে ইহাতেও এক মূল্যবান পুস্তক হইতে পারে।

হরিনাথ সাধক হইলেও দেশের এবং সমাজের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি চিরদিন সমান ছিল। ১৩০২ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে আমি যখন তাঁহাকে শেষবার দেখিয়া ময়মনসিংহে আসি তখনও তিনি দেশের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে দুই একটি কথা কহিয়াছিলেন। বালকদিগের শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কথা উঠিলে তিনি কহিলেন,"দেখুন, ৮।৯ বৎসরের বালককে জ্যামিতি পড়ানো আর মাথনের উপর পাথর ভাঙ্গা একই কথা। ইহাতে তাহাদের মস্তিষ্ক ভবিষ্যতের জন্য অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। আর আমি এখন বৈশাখ মাসেও ছেলেদিগকে পায়ে মোজা দিতে দেখিতে পাই। দেখুন, আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশ। এখানে দ্বাদশ পা বাড়ালেই পা ধুইতে হয়। ইহাই ছিল সে কালের নিয়ম। এখনও পুরোহিত ঠাকুরেরা লক্ষ্মী স্বরস্বতী পূজা করিতে আসিয়া এক পাড়ার প্রতি যজমানের বাড়ীতে যাইয়াই পা ধুইয়া থাকেন। ইহাতে পবিত্রতা এবং স্বাস্থ্য দুইই আছে। ইহার পর হরিনাথ কহিলেন "আমরা যে এখন মধ্যাহ্নে কাজ করি ইহাতেই আমাদের স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। আমাদের দেশের কাজের উপযুক্ত সময় পূর্ব্বাহ্ণ ও অপরাহ্ণ। দেখিবেন এখনও যাঁহারা জমিদারী সেরেস্তায় কর্ম্ম করেন, তাঁহারা সাধারণতঃ সকলেই নীরোগ ও দীর্ঘজীবি। হরিনাথ শেষ জীবনেও যে দেশের ভাবনা পরিত্যাগ করেন নাই এই সমস্ত কথাই তাহার প্রমাণ।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি হরিনাথের সহিত এই আমার শেষ সাক্ষাৎ। ইহজগতে আর সে সুন্দর প্রশান্ত দিব্যমূর্ত্তি দেখিতে পাইব না। তেমন মধুময় জ্ঞানগর্ভ বাক্য-

বলি আর শ্রবণ করিব না। একজন লেখক যথার্থই বলিয়াছেন যে শেষ জীবনে হরিনাথের গৈরিক বসনাবৃত সৌম্যমূর্ত্তি দর্শন করিলে দেবদূত বলিয়া ভ্রম হইত। কাঙ্গালের ব্রহ্মাণ্ড বেদেই পড়িয়াছি সাধনায় কতকদূর অগ্রসর হইলে শরীর হইতে একরূপ দিব্য গন্ধ বাহির হইয়া থাকে। হরিনাথের দেহে এইরূপ গন্ধ আমি অনুভব করিয়াছি। অনেকে এ কথায় বিশ্বাস না করিয়া উপহাস করিতে পারেন। তাঁহাতে আমার দুঃখ নাই। হরিনাথ কি উচ্চ প্রকৃতির লোক ছিলেন আর তিলির বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও সাধনরাজ্যে কতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণার্থ আমি আর একটি মাত্র কথা বলিব। পণ্ডিতাগ্রণ্য ভারতবিখ্যাত সাধক প্রবর শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব ভট্টাচার্য্য মহাশয় হরিনাথের দেহত্যাগের পরে হৃদয়ের গভীর শোকোচ্ছ্বাসময়ী "শ্মশানে কাঙ্গাল" নামে যে কবিতা লিখিয়াছিলেন তাহার একচরণ এই—"তোমার শাসনে ভাবি পিতৃসম, সাধনে ডাকি দাদা বলে।" চরিত্রে কত মহত্ত্ব থাকিলে এবং সাধনায় কতদূর সিদ্ধিলাভ করিলে শিবচন্দ্রের ন্যায় সিদ্ধতাপস হরিনাথকে উদ্দেশ করিয়া এমন কথা কহিতে পারেন পাঠক স্বয়ং তাহা বিবেচনা করিবেন।

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িল। হরিনাথের কথা লিখিতে গেলে ফুরায় না। বৎসরান্তে বা দু'বৎসর পরে একবার যাইয়া হরিনাথের সঙ্গ লাভ করিয়া তাঁহার পবিত্রতাময় দরিদ্র কুটীরে যে শান্তি পাইতাম অনেক ধনীর প্রাসাদে তাঁহা পাই নাই, পাইব না। নিদারুণ সংসার রৌদ্রে ঘুরিতে ঘুরিতে ক্লান্ত হইয়া দিনেকের তরে সেই মহাপুরুষের শীতল ছায়ায় যাইয়া উপবেশন করিতাম। ১৩০৩ সালের বৈশাখ মাসের ৫ই তারিখে সে সম্ভাবনা শেষ হইয়াছে।

শ্রীচন্দ্রশেখর কর।

বিশ্ব ও বিশ্বনাথ

তুমি ত জড় বিশ্ব নহ—তুমি যে নিজে বিশ্বনাথ,
পাগল ভোলা! একি এ খেলা, দৃশ্য হেরি দিবসরাত।
জ্যোছনাজ্যোতিঃ তারার ভাতি বিভূতি উড়ে তোমার গায়,
ভাঙ্গের ঘোর করেছে ভোর চরণ তব টলিয়া যায়।
বারিধি'পরে নদীলহরে ডমরু তুলে গভীর তান,

ইন্দ্রচাপে সন্ধ্যারাগে কটিতে বাঁধা বাঘের ছাল,
ধরেছ তাপ দুঃখপাপ গরল গলে হে মহাকাল।
তোমার পাশে গৌরী হাসে বিতরি সবে অন্নজল,
শম্ভুশিরে আঁচল উড়ে চরণে ফুটে কমলদল।
তুমি ত জড় বিশ্ব নহ—তুমি যে নিজে বিশ্বনাথ,
পাগল ভোলা! একি এ খেলা দৃশ্য হেরি দিবসরাত।

শিশিরকণা মাণিক-জ্বলা তুলিয়া ফণা চিকন শির,
বিটপীলতা অহির মত জড়ায়ে দেহে রয়েছে ধীর।
পিণাক তব অশনি রবে কাঁপায়ে তুলে ভুবন তিন,
কানন ভেদি বাজিছে শিঙ্গা ঝঞ্ঝানিলে রজনীদিন।
ফিরিছ গলে হাড়ের মালা, করোটি করে শ্মশানমাঝ,
শৃঙ্গে মেঘপঙ্ক মাখা বৃষভ তব ভূধররাজ।
তৃতীয় আঁখি ললাটে থাকি দীপ্তভানু কৃশানুময়,
পঞ্চশরে ঋতুপতিরে করিয়া তুলে ভস্মচয়।
তুমি ত জড় বিশ্ব নহ—তুমি যে নিজে বিশ্বনাথ,
পাগল ভোলা! একি এ খেলা, দৃশ্য হেরি দিবসরাত।

শ্রীকালিদাস রায়

অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেন।

গত ১০শে চৈত্র সেই সর্ব্বজনপ্রিয় সর্ব্বগুণাধার, আদর্শ শিক্ষক বিনয়েন্দ্রনাথ স্বীয় কর্ম্ম অসমাপ্ত রাখিয়া, আত্মীয়, ছাত্র ও বন্ধুবর্গকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া, অমরলোকে প্রস্থান করিয়াছেন।

বিনয়েন্দ্রনাথ ১৮৬৮ খ্রীঃ অব্দে ২৫ সেপ্টেম্বর কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পৈতৃক নিবাস হুগলী জেলার অন্তর্গত ত্রিবেণী গ্রামে ছিল। পিতা ৺মধুসূদন সেন বেঙ্গল ব্যাঙ্কে কর্ম্ম করিতেন এবং চাকরী উপলক্ষে কলিকাতায় স্থায়ীরূপে বাস করিয়াছিলেন। ইঁহার মাতা কলুটোলার সেন গোষ্ঠীর বিখ্যাত

দেওয়ান ৺রামকমল সেনের দৌহিত্রী। বিনয়েন্দ্রনাথ বিদ্যাশিক্ষার্থ প্রথমে এলবার্ট কলেজিয়েট্ স্কুলে প্রবিষ্ট হন এবং ১৮৮৪ সালে, ১৫ বৎসর বয়সে, প্রথম বিভাগে এণ্ট্রান্স পাস করেন ও প্রথম শ্রেণীর জলপানি পান। স্কুলে পড়িবার সময়েই স্বর্গীয় কেশবচন্দ্রের সহিত ইঁহার পরিচয় হয়। কেশবচন্দ্র বালক বিনয়েন্দ্রনাথের মুখে প্রতিভার আলোক দেখিয়া মুগ্ধ হন। বিনয়েন্দ্র এই সময় প্রায়ই কেশবচন্দ্রের নিকট যাতায়াত করিতেন। কেশবচন্দ্রের অমোঘ উপদেশসমূহ বাল্যাবস্থায় বিনয়েন্দ্রনাথের হৃদয়ে অঙ্কুরিত ও কালক্রমে ফলফুলে সুশোভিত হইয়া, চিরদিন তাঁহার জীবন শান্তিময় করিয়াছিল। কেশবচন্দ্রের তিরোধানের পর স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ছাত্র ও কর্ম্মজীবনে বিনয়েন্দ্রনাথের আদর্শ ছিলেন।

এলবার্ট্ কলেজ হইতে এফ, এ পাস করিয়া তিনি জেনারল এসেম্বলী ইন্‌ষ্টিটিউসনে বি, এ পড়িতে আরম্ভ করেন। স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্রের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মিত্র মহাশয় বিনয়েন্দ্রনাথের সহপাঠী ও বন্ধু ছিলেন। তাঁহার মুখে শুনিয়াছি যে, তিনি কলেজের সকল শ্রেণীর ছাত্রেরই প্রিয় ছিলেন। সেই তরুণ বয়স হইতেই তাঁহার বিনয়-গুণ সুন্দর পরিস্ফুট হইয়াছিল। সর্ব্বদা বিদ্যাচর্চ্চায় রত থাকিয়াও তিনি আশ্চর্য্যরূপে সকলের সহিত মিশিতে পারিতেন। কখনও কোন ছাত্রের সহিত কোন বিষয়ে তাঁহার মনোমালিন্য হইত না। কি শিক্ষক, কি ছাত্র সকলেরই তিনি বিশেষ প্রীতিভাজন ছিলেন। তাঁহার বিদ্যানুরাগ অসাধারণ ছিল ১৮৮৮ সালে তিনি ইংরাজী ও দর্শন-শাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীর অনার্স লাভ করিয়া বি, এ পাস করেন। ইহার পর তিনি দর্শন-শাস্ত্রে পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। পরীক্ষার ঠিক ৪ মাস পূর্ব্বে তিনি ইতিহাসে এম, এ দিবার সংকল্প করেন। তখন তাঁহার নিকট পাঠ্যপুস্তক কিছুই ছিল না। তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের কোন ছাত্র-বন্ধুর নিকট হইতে পুস্তক সংগ্রহ করিয়া, নিজে নোট লিখিয়া, এম, এ পরীক্ষা দেন এবং প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেন। এই পরীক্ষায় তিনি কব্‌ডেন মেডেল পুরস্কার পাইয়াছিলেন। পর বৎসর (১৮৯০) তিনি দর্শনে এম, এ দিয়া দ্বিতীয় বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। সে বৎসর কেহই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই।

কলেজের বিদ্যা সাঙ্গ করিয়া, বিনয়েন্দ্রনাথ শিক্ষাদানই জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করেন। প্রথমে তিনি বহরমপুর কলেজে অধ্যাপক হইয়া যান, পরে ভাগলপুর টি, এন্, জুবিলি কলেজে অধ্যাপকের পদ

সার এল্‌ফ্রেড্‌ ক্রফট্‌ শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর ছিলেন। তিনি বিনয়েন্দ্রনাথের সুখ্যাতি শুনিয়া তাঁহাকে প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবেশ করিয়া অবধি, ২০ বৎসরের মধ্যে, তাঁহাকে একবারও অন্যত্র বদলী হইতে হয় নাই। দেশী অধ্যাপকের ভাগ্যে এরূপ ঘটনা অতি বিরল।

অধ্যাপনা-কার্য্যে বিনয়েন্দ্রনাথের কৃতিত্ব অসাধারণ ছিল। অধ্যাপনা গুণে তিনি ছাত্রমণ্ডলীর সমধিক শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন। এরূপ সুযশ সচরাচর অধ্যাপকের অদৃষ্টে ঘটে না। কি ইতিহাস, কি দর্শন, কি অর্থনীতি, সকল বিষয়েই তিনি সজীব দৃষ্টান্ত দ্বারা ছাত্রগণের হৃদয়ঙ্গম করাইতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। সেই অপূর্ব্ব শিক্ষা কৌশল, সেই দ্রুততরঙ্গিনী ভাষার প্রবাহ সমবেত ছাত্রগণকে মন্ত্রমুগ্ধ করিত। এক কথায় বলিতে গেলে তিনি আদর্শ শিক্ষক ছিলেন।

১৯০৫ সালে আগষ্ট মাসে বিনয়েন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিনিধিরূপে ইটালির অন্তর্গত জিনেভা নগরের আন্তর্জাতিক ইউনিটেরিয়ান্‌ ও উদার সম্প্রদায়ের অধিবেশনে গমন করেন। পরে ইংলণ্ড ও আমেরিকার কয়েকটী প্রধান নগরে ভ্রমণ করেন। তত্রত্য অধিবাসীগণ তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, হৃদয়স্পর্শী বক্তৃতা ও গম্ভীর ধর্ম্মপ্রাণতার পরিচয় পাইয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া Pilgrim নামক পুস্তিকায় তাঁহার ভ্রমণ-বিবরণ ও পাশ্চাত্য-দেশবাসিগণের ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ধর্ম্মভাবের পবিত্র সম্মিলন পরিণামে কি শুভফল প্রসব করিতে পারে, তাহা এই পুস্তিকায় তাঁহার স্বাভাবিক উচ্ছ্বাসময়ী ভাষায় বিবৃত হইয়াছে।

দুই বৎসর পূর্ব্বে তিনি অস্থায়িভাবে কলেজ ইনস্পেক্টরের পদে নিযুক্ত হন। এই নূতন কার্য্যের জন্য তাঁহাকে মফঃস্বলের নানা স্থানে ঘুরিতে ও কঠোর পরিশ্রম করিতে হইত। গত বৎসর জুন মাস হইতে তিনি দুশ্চিকিৎস্য ক্যান্‌সার রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন এবং ১০ মাস অবধি দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া, বিজ্ঞ ও বহুদর্শী চিকিৎসকগণের চিকিৎসা-নৈপুণ্য ব্যর্থ করিয়া ৪৫ বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

বিনয়েন্দ্রনাথ ২০ বৎসর প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। কলিকাতাই তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র ছিল। তিনি কলিকাতার অনেক সভা-সমিতির

সভ্য ছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ, বিশ্ব-বিদ্যালয় ও ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট্—এই তিনটী স্থানেই তাঁহার কর্ম্মপটুতা বিশেষরূপে প্রকাশ পাইয়াছিল। ইহা ছাড়া ভিক্টোরিয়া ইন্‌ষ্টিটিউসনেও তিনি যথেষ্ট কার্য্য করিতেন।

ইউনিভার্সিটী ইন্‌ষ্টিটিউট্ যে, কি পরিমাণে তাঁহার নিকট ঋণী তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তিনিই ইহার বর্ত্তমান সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির মূল। তিনি যখন ইহার-কার্য্যভার গ্রহণ করেন তখন ছাত্র সংখ্যা একশতের কিছু বেশী ছিল আর এখন সেই সংখ্যা প্রায় আটশতে দাঁড়াইয়াছে।

বিনয়েন্দ্রনাথের পাণ্ডিত্য ও বাগ্মীতা অসাধারণ ছিল, কিন্তু তাঁহার সঙ্কল্পের দৃঢ়তা, কর্ত্তব্যবুদ্ধি, সহৃদয়তা, অসামান্য ধর্ম্মানুরাগ ও সর্ব্বোপরি সেই চরিত্র-মাধুর্য্য সমগ্র ছাত্রমণ্ডলীর অকপট ভক্তি ও প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছিল। যে কেহ একবার তাঁহার সংস্পর্শে আসিত সেই তাঁহার মধুর ব্যবহারে মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া পড়িত। তিনি যে কত ছাত্রের চরিত্রগঠনে সহায়তা করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। ইন্‌ষ্টিটিউটের সেক্রেটারীর পদে থাকিয়া তিনি কলিকাতার প্রায় সমস্ত কলেজের ছাত্রমণ্ডলীর উপর স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি ছাত্রদিগের সহিত আশ্চর্য্যভাবে মিশিতে জানিতেন। কি ক্রীড়ায়, কি ভ্রমণে কি জ্ঞানচর্চ্চায়—তিনি তাঁহাদিগেরই একজন হইয়া যাইতেন। ছাত্রগণ বুঝিত যে, তাহাদের আদর্শ শিক্ষক এখন আর কলেজের সেই দুর্ভেদ্য গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ নহেন—তিনি তাহাদেরই সহচর। আবার এই অবাধ আমোদের মধ্যেও শৃঙ্খলা ছিল। তিনি কখনও উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় দিতেন না। তিনি ছাত্রগণকে বেশ অনুভব করাইতেন যে, এই সুশৃঙ্খলার মধ্যেই প্রকৃত, পবিত্র আনন্দ নিহিত রহিয়াছে। কদাচিৎ তাঁহার মতের বিরুদ্ধে কোন বিষয়ের অনুষ্ঠান দেখিলে তিনি এমন স্বাভাবিক মাধুর্য্য ও নৈপুণ্যের সহিত তাহা নিবারণ করিতেন যে, কোন অপ্রীতিকর ব্যাপার ঘটিবার অবসর হইত না। এই মধুর প্রীতিবন্ধনের আর একটী শুভফল হইয়াছিল। তিনি বলিতেন, "ইন্‌ষ্টিটিউটে আসিয়া আমার নিজের যথেষ্ট উপকার হইয়াছে।" তিনি ইন্‌ষ্টিটিউটকে নিজের শিক্ষা-ক্ষেত্র বলিয়া জ্ঞান করিতেন।

যাঁহারা তাঁহাকে সেক্রেটারী বা ইন্‌স্পেক্টররূপে কার্য্য করিতে দেখিয়াছেন তাঁহারাই জানেন যে আফিস-সংক্রান্ত কার্য্যেও তাঁহার স্বাভাবিক চরিত্রের পূর্ণ বিকাশ দেখা যাইত। তিনি নিজে অক্লান্তকর্ম্মা ছিলেন এবং অধীন কর্ম্মচারী-দিগের দ্বারা শৃঙ্খলার সহিত কার্য্য করাইয়া লইতে ;

দিগের নিয়মিত কার্য্যে কখনও হস্তক্ষেপ করিতেন না। তিনি কর্ম্মচারীদিগের প্রতি নিজের সহযোগীর ন্যায় ব্যবহার করিতেন এবং স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ কর্ত্তব্যজ্ঞান ও সৌজন্যেরগুণে তাঁহাদিগের অকৃত্রিম প্রীতি ও সম্মান আকর্ষণ করিতেন। আফিসের সর্ব্বাঙ্গীন বিশুদ্ধি রক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। নীরস আফিসও যেন তাঁহার সংসর্গে মধুময় হইয়া উঠিয়াছিল।

তিনি কখনও সাধারণের সমক্ষে নিজের কৃতিত্বের পরিচয় দিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইতেন না। তিনি জীবনে নানাস্থানে কত বক্তৃতা দিয়াছেন। কিন্তু সেই সকল বক্তৃতা রক্ষা সম্বন্ধে তিনি একেবারে উদাসীন ছিলেন; কখনও কোন উপাদেয় বক্তৃতার সারাংশ তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি বিনয়-নম্র সলজ্জ-মধুর মৃদুহাস্যে জানাইতেন যে কোনই স্মারক লিপি রাখেন নাই। এই জন্যই অমূল্য-রত্নরাজির ন্যায় তাঁহার বক্তৃতা সমূহের চিহ্ন-মাত্র নাই। ইহা সাধারণের পক্ষে বিশেষ দুর্ভাগ্যের বিষয়। বাস্তবিকই তাঁহার 'বিনয়' নামকরণ সার্থক হইয়াছিল।

নিজে একজন আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম হইলেও তিনি সর্ব্ব সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। তাঁহার কোন ব্যবহারেই কখনও সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা প্রকাশ পায় নাই। তাঁহার উদার হৃদয় মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের ন্যায় নির্ভয়ে, সর্ব্বত্র বিমল আনন্দে বিচরণ করিত। ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী কোন ব্যক্তির নিকট ধর্ম্মপ্রসঙ্গ শুনিবার সময় তিনি বিনয়ী শিক্ষার্থীর ন্যায় আগ্রহের সহিত তাঁহার বাক্যের সার গ্রহণ করিতেন—কখনও অনর্থক প্রতিবাদ করিতে অগ্রসর হইতেন না। যেমন অগাধ পাণ্ডিত্য তেমনই অসাধারণ সংযম! ছাত্রগণের নিকট গীতা ব্যাখ্যা করিবার সময় যেন ভগবদ্বাক্যার্থ হৃদয়ে স্পষ্ট উপলব্ধি করিতেন। বিশ্বরূপদর্শন অধ্যায় পাঠের সময় তাঁহার মুখমণ্ডল কি অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিত! প্রকৃত ভক্তের লক্ষণ তাঁহাতে পরিস্ফুট ছিল।

এমন দেবচরিত্র ভক্ত শিক্ষকের তিরোধানে ছাত্র সমাজের যে ক্ষতি হইল তাহা সহজে পূরণ হইবার নহে। তাঁহার পবিত্র স্মৃতি, ছাত্রমণ্ডলীর হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরূক থাকিয়া তাঁহাদিগের জীবন চিরদিন কর্ত্তব্যপথে পরিচালিত করিতে থাকুক।

শ্রীরাজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

উপযুক্ত ভৃত্য

(সেখ সাদির পারসী হইতে)

চিত্ত যাহার
চিন্তা-শূন্য,
বিত্তে যাহার
চিত্ত জয়!
নেত্র যাহার
অশ্রু-শূন্য
দৈন্যে যাহার
নাইক ভয়;
ভিক্ষুকেরে
দস্যু বলে,
হর্ষ জাগে
দুঃখে যার!
কর্ম্ম যাহার
ধর্ম্ম-শূন্য
"অহং সর্ব্ব—"
অহঙ্কার;
ভৃত্য তাহার
হাস্য-মুখে—
বিস্ময় কি,
বল্‌বে যে—
"কর্ত্তা এখন
নাইক বাড়ী
ঘুরে আসুন
খানিকটে।"

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা।

সাহিত্যিক যৎকিঞ্চিৎ। *

আজকার এই সাহিত্যিক উৎসবে আমাকে সভাপতিত্বে আহ্বান ক'রে আপনারা এই অযোগ্যের প্রতি যে সম্মান দেখালেন, বহুদিন তার একটি কৃতজ্ঞতাপূর্ণ স্মৃতি আমার চিত্ত অধিকার করে থাকবে। কাব্য লিখে যদি কোন অপরাধ করে থাকি, গদ্যে বক্তৃতা পাঠ ক'রে তার প্রায়শ্চিত্ত হয় হোক, ভালই, কারণ আমি আজ বাহবা নিতে আসি নাই, নিজের অযোগ্যতা নিয়ে ধরা দিতে এসেছি।

যে সব সদাশয়গণের চেষ্টায় এখানে বঙ্গবাণীর এই দানসত্রটী খোলা হয়েছে, আমি বার বার তাঁহাদিগকে অভিনন্দন করি। চেৎলায় আমি আরও এসেছি; পল্লী ও সহরের সঙ্গমস্থলে তন্দ্রা ও জাগরণের মাঝখানে স্বপ্নের মত এ স্থানটি আমার বড় ভালো লাগে। আমার মনে হয় এই রকম জায়গাই সাহিত্যসাধনার উপযোগী। এখানে পল্লীর মাধুর্য্যও আছে, সহরের উদ্দীপনাও আছে; অস্থিমজ্জাও আছে, আবার প্রাণও রয়েছে। এখানে আম্রশাখায় যে কোকিল ডাকে, সে বেচারা হাওয়া-গাড়ীর ঝক্‌ঝকানিতে তা'র সাদাসিধে পল্লীসুলভ সুমিষ্ট তান ভু'লে সহরের কালোয়াতি সুর ভাঁজে কি না জানি না, কিন্তু এটা জানি, যেখানে 'নলিনীভূষণ,' 'সরোজনাথ,' 'মুনীন্দ্রনাথ' বিরাজ কচ্ছেন, যেখানে 'জলধর' এসে বাসা বেঁধেছেন, যার কাছেই 'চিত্ত' কবির সাধনমালঞ্চ, সে স্থানে সরস্বতীর নূপুরনিক্কণ শোনা যাবে, তাতে বিস্মিত হবার কারণ নাই। আমার কাছে আজকার এই মিলনটি বৈদেশিক আড়ম্বরের তর্জ্জমার মত ঠেক্‌ছে না, সাহিত্যসাধনা বলে মনে হচ্ছে।

সাহিত্য কাকে বলে? এটা যে কতযুগের জিজ্ঞাসা তা কে জানে? কতকালে এ প্রশ্নের মীমাংসা হবে, তাই বা কে ব'লতে পারে? অল্প সময়ের মধ্যে এই বড় কথা নিয়ে নাড়াচাড়া কর্‌বার সাহস আমার নাই। এক কথায় বল্‌তে গেলে সাহিত্য মানবের উচ্চ চিন্তার সরস প্রকাশ। আট্‌-পৌরে জীবনযাত্রার জন্য আমরা অনবরত যে মনের ভাব ভাষায় ফুটিয়ে তুলে বাইরে আনি, তাতে যে রস, সংযম, শৃঙ্খলা, সঙ্গতি ও পূর্ণতা প্রভৃতি কলা-লক্ষণ বিকশিত ক'রে যা গড়ে তুলি তাই সাহিত্য, বাদ বাকী সব ভাষা।

সাহিত্য সংসারে থেকেও সন্ন্যাসী। সে আমাদিগকে নিত্যকার তুষ্ট

* চেতলা 'নিত্যানন্দ লাইব্রেরীর' দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত।

বাষ্পের আবহাওয়া থেকে এমন একটা উঁচু স্তরে তুলে নিয়ে যায় যেখানে আমাদের মনুষ্যত্বের তুষ্টি, পুষ্টি ও বিকাশ হয়ে থাকে। মানবের উচ্চ চিন্তার প্রকাশ মাত্রকেই সাহিত্য বলা যেতে পারে না। সেই প্রকাশের মধ্যে একটা কায়দা, একটা ভঙ্গী, একটা ধ্বনি, একটা নিগূঢ় বাণী থাকা চাই। এই সব গুণ যাঁর রচনায় আছে তিনিই শ্রেষ্ঠ কলাশিল্পী, তিনিই প্রকৃত সাহিত্যকার। এই যে দেশে বিদেশে গদ্যে পদ্যে ভাষার তাজমহল তৈরি হচ্ছে, তার মধ্যে এমনও অনেক আছে যা' আলাদিনের প্রদীপসৃষ্ট কুহকপ্রাসাদের মত মায়াশেষে ছায়ার দেশে মিলিয়ে যাবে।

সাহিত্যের উদ্দেশ্য কি? আমার মনে হয় আত্মার উৎকর্ষবিধানই সাহিত্যের একমাত্র কর্ত্তব্য। যাঁর রচনা যে পরিমাণে উন্নত লক্ষ্যের দিকে অঙ্গুলীসঙ্কেত করে, উচ্চ মনোবৃত্তিগুলির বিকাশে সহায়তা করে, তাঁর রচনা সেই পরিমাণে সার্থক। পিনালকোড্ এতকাল ধ'রে তার শিকল বেড়ি ঝন্‌ঝনিয়ে মানুষকে মনুষ্যত্বের আদর্শের কাছাকাছিও নিতে পারে নাই, শ্রেষ্ঠ সাহিত্য তার রসপিপাসুর কাছে ভাবের সুন্দর ছবি এঁকে, চরিত্রের সরস আদর্শ ফুটিয়ে অনায়াসে তাকে সেই অমৃত রাজ্যে নিয়ে যায়। আকালের সঙ্গেও মানুষ ল'ড়ে টিকে থাক্‌তে পারে, কিন্তু ভাবের দুর্ভিক্ষ হ'লে সংসার উচ্ছন্ন যাবে।

আমার মতে সাহিত্য শুধু দুই প্রকার— দৃশ্য ও শ্রব্য। যার রসগ্রহণ মুখ্যতঃ দৃষ্টিসাপেক্ষ তা' দৃশ্যসাহিত্য। সঙ্গীত, বক্তৃতা প্রভৃতি যা' বিশেষ ভাবে শ্রোতার জন্যই রচিত, তা' শ্রব্য-সাহিত্য। অনেকে এই অংশেরও ভগ্নাংশ কত্তে চা'ন; তাঁদের মতে কাব্য, নাটক, উপন্যাস প্রভৃতি সুকুমার সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব ইত্যাদি রাশভারি সাহিত্য। ভুল, ভুল! সাহিত্য অখণ্ড অথচ বিচিত্র। শ্রেষ্ঠ কবিগণের কাছ থেকে কত বৈজ্ঞানিক তাঁর অদ্ভুত আবিষ্কারের প্রেরণা পেয়েছেন, কত দার্শনিক তাঁর অপূর্ব্ব উদ্ভাবনার বীজ সংগ্রহ করেছেন। কাব্য, নাটক, উপন্যাস প্রভৃতির অপরাধ—উহা কল্পনাসর্ব্বস্ব চিত্রপ্রধান ও ভাবপ্রবণ রচনা। প্রথম বিশ্বেশ্বরের সত্তা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব ক'রে বৈদিকযুগের ঋষিকবি আনন্দে বিভোর হ'য়ে যে সাহিত্যের সৃষ্টি করেছিলেন, তাতে মূর্চ্ছনা আছে, পিপাসা আছে, গবেষণা বা অনুসন্ধিৎসা নাই বলিলেই হয়; তবু তা' যুগ যুগ ধ'রে জগতের চিন্তারাজ্যের মুকুটমণি হ'য়ে আছে। আমার বিশ্বাসকে কেন

কেউ বিদ্বেষ ব'লে ভ্রম না করেন। সাহিত্যে বিদ্বেষের স্থান নাই। এমন একটা একীকরণের মিলনমণ্ডপ আর নাই; সকলে মিলিবার এমন একটি হাট, সকল যাত্রীর এমন একটি তীর্থ আর কোথায়? এমন অভেদের মন্ত্র আর কোথাও এমন করুণকণ্ঠে উচ্ছ্বসিত হয় না। এখন কলসে কলসে প্রেম ঢাল্‌তে আর কেউ জানে না! কেন না সাহিত্যের অন্য নাম মনুষ্যত্ব। সাহিত্য না হ'লে সমাজ দু'দিনও চল্‌ত না, চুরমার হয়ে ভেঙ্গে পড়্‌ত। আমাদের দেশে এখন যে একটি মহৎ সাধনা, তার দিকে সমস্ত দেশের যোগ কি ঝোঁক্ নাই কেন? এ যেন আমরা জনকয়েক সাহিত্য-সেবী একঘ'রে হ'য়ে সমাজের বাইরে জটলা কচ্ছি। অন্য দেশের মত আমাদের দেশে সাহিত্যের সমাদর বা পড়ুয়া জোটে না। এর একটা কারণ, শিক্ষিত লোকের সংখ্যা খুব জোরে বাড়্‌লেও, আজও অনুপাতে ঢের কম। আর বেল পাক্‌লেই বা পক্ষীবিশেষের আশা কি? আধুনিক শিক্ষার গতি সাহিত্যসাধনার অনুকূল নয়। আমাদের কৃতবিদ্যের দল, রুটিন্‌বাঁধা কাজে সাহিত্যের বাজেখরচার যেটুকু দরকার তাহাই মাত্র করেন। বাদ বাকী যা তা মর্‌চে ধ'রে জং হ'য়ে থাকে। যাঁরা লেখেন তারাই শুধু সারস্বত, আমি এ কথা মানি না। যাঁরা পড়ার মত পড়েন—চোখ বুলিয়ে যান্ না, তাঁরাও সারস্বত। বিলেতে একদল লোক কেবল সেক্‌স্‌পীয়ার নিয়ে ডুবে আছেন। প্রস্ফুটিত ফুলে ভ্রমর বস্‌লে সে যেমন গুঞ্জন ভুলে যায়, এদের অনেকের সেই দশা। তাই ব'লে কি তাঁরা অসাহিত্যিক? তর্ক উঠ্‌তে পারে—বাংলায় সেক্‌স্‌পীয়ার থাক্‌লে তবে ত কৃতবিদ্যের দল থেকে সেক্‌স্‌পিরিয়ান স্কলার-জাতীয় পাঠকের প্রত্যাশা করা যেতে পারে। উত্তরে আমি নিঃসঙ্কোচে বল্‌তে পারি, যতখানি বড় গলায় ইংরেজ সেক্‌স্‌পিয়ারের নাম করে, ফরাসী যতটা জোরে ভিক্টর হিউগোর কথা বলে, বাঙ্গালী ঠিক সেই মাত্রায় বঙ্কিমের গর্ব্ব করতে পারে। কালের প্রবাহে যদি ইংরেজী ও ফরাসী সাহিত্য ধুয়ে মুছে যায় তবু যেমন সেক্‌স্‌পিয়ার থাক্‌বে, হিউগো থাক্‌বে, তেমনি যদি বাঙ্গালীর অর্দ্ধ শতাব্দীর সাহিত্যসাধনা কালস্রোতে ভেসে যায়, তবু সে বিপ্লবে বঙ্কিম টিকে থাক্‌বে। আমার মনে হয় একাধারে সেক্‌স্‌পিয়ারের বিশালতা ও হিউগোর প্রাখর্য্য বঙ্কিমের প্রতিভায় ছিল। আমাদের দেশের বড় বড় কবিদের আমরা টেনিসন, ব্রাউনিং ইত্যাদি ব'লে তৃপ্তি লাভ করি। শ্রেষ্ঠ

ঔপন্যাসিককে স্কট বা ডিকেন্স উপাধি দিই; শক্তিশালী নাট্যকারের মার্লো বা অট্ওয়ে নামকরণ করি। একটা সাধারণ বিশ্বাস—সুধু কবির সঙ্গে কবির, নাট্যকারের সহিত নাট্যকারের, ঔপন্যাসিকের সাথে ঔপন্যাসিকেরই তুলনা খাটে। এটা সুধু যে ভ্রান্তি তা নয়, এতে অনেক ক্ষেত্রে তুলনাও যথাযথ হয় না। প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকেরই একটি বিশেষ বক্তব্য থাকে; তাঁরা সেই মূলতত্ত্বটী জগতে প্রচার কর্ত্তে আসেন। কেউ গদ্যে বা পদ্যে, কেউ নাটক বা উপন্যাসের ভিতর দিয়ে তা' ঘোষণা করেন। ও সব প্রকাশের বিভিন্ন রাস্তা। কোন সুরবিশেষের আলাপ সেতারে যেমন ফোটে, সারঙ্গে হয় ত তেমন ওঠে না। তা হলেও, যন্ত্র যন্ত্রই, তাতে সঙ্গীতের বিভূতি অর্পণ করা চলে না।

আমি বল্‌তে বাধ্য যে, বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলীর সরস গল্পাংশই আমাদের গল্পখোর মনের সবটুকু জায়গা জুড়ে বসেছে। কিন্তু তিনি যে তত্ত্ব প্রচার ক'রে গেছেন, জীব-জন্মে জীবন-জ্যামিতির যে কূট সমস্যার মীমাংসা ক'রে দিয়েছেন, তা' বরাবর আমাদের নজর এড়িয়ে চলেচে; তাই আজ পর্য্যন্তও বাঙ্গালী তার সেই লোকান্তরিত অমর কবির একটা রীতিমত জীবনচরিতও লিখে উঠ্‌তে পারে নাই। কিন্তু প্রাণহীন অভিনয়ে আমরা পেছপা নই। কাঁঠালপাড়া গিয়ে কয়েকটা ফাটা ঢোল আর ভাঙ্গা কাঁসির মহলা দিয়ে আমরা বাংলার সেক্‌সপিয়ারের বার্ষিক শ্রাদ্ধ সেরে আস্‌ছি। এত বড় কবির প্রেতাত্মার প্রতি এমন অবিচার কেবল এদেশেই শোভা পায়। এ সব "মক্ মোর্ণিং" এর অভিনয় ছেড়ে আমরা যদি সেক্‌সপিয়ার সোসাইটির মত বঙ্কিমসমিতি গড়ে তুল্‌তে পারতাম, তবে সেই মৃত মহাত্মার উদ্দেশ্যে তর্পণ সার্থক হ'ত।

ভক্ত না থাক্‌লে যেমন দেবতার দেবত্ব বজায় থাকা অসম্ভব, তেমনি সুপাঠক না থাক্‌লে সুলেখকের পূজাও সম্ভবপর নয়। আমাদের দেশে এ দুইয়েরই দুর্ভিক্ষ না বলা যাক্, সুভিক্ষ বলাও চলে না। এ কি হাভাতে যুগে জন্মেছি আমরা! এ ক্ষুধিত শতাব্দীতে অন্য সব চিন্তা সেই এক সর্ব্বনেশে অন্নচিন্তায় ডুবে গেছে। ধন্যবাদে ত পেট ভরে না; খালি পকেটের কথা মনে হ'লে প্রতিভার আত্মা খাঁচাছাড়া হয়ে যায়—মগজের ঘিঁ শুকিয়ে কাঠ হয়। তাই আমাদের দেশের মাথাওয়ালা লোক যে পথে টাকা আসে, সেই রাস্তায় মাথা

থাকছে, সে কেবল গাদ্,—তাই নিয়ে কেউ কেউ সাহিত্যের হাটে মাল সরবরাহ কর্ত্তে আসেন—এও যেন মাতৃভাষাকে কৃতার্থ করা। আমরাও দল বাড়াবার জন্য পরীক্ষা না করেই যা তা সাহিত্য ব'লে গছিয়ে দিই। আমরা ভুল্‌তে পারি না যে, এই দুর্দ্দিনে যে যা দেন তা দয়া করেই দেন। দীনের পক্ষে দান ফিরিয়ে দেওয়াতে যে শক্তির আবশ্যক, আমাদের তা নাই। কাজেই বাজে মালের এত আমদানী। এদিকে এই গরীব দেশের পাঠকের দল যাতে বস্তু আছে, সে রচনাও বিনামূল্যে অথবা অর্দ্ধমূল্যে, সিকি-মূল্যে না পেলে গ্রহণ কর্ত্তে নারাজ। তা'তে ফল দাঁড়াচ্ছে এই যে, উঁচু-দরের শিল্পী সে প্রথম শ্রেণীর কলা-নৈপুণ্য প্রদর্শনের জন্য আর পণ্ড-শ্রম কর্ত্তে রাজী নয়। সে উচিত মজুরীর লোভে, তা'র আভাস টুকুমাত্র যেখানে সেখানে ফলাতে বাধ্য হ'চ্ছে। এই যে পাঁচকড়ির ঝক্‌ঝকে প্রতিভা দৈনিকের বেষ্টনির মধ্যে জালবদ্ধ রোহিতের ন্যায় ছট্‌ফট্ কচ্ছে, যশস্বী সমাজ-পতি সরস্বতীর কলম কানে গুঁজে তাঁ'র প্রাণপ্রিয় 'সাহিত্যের' ইজ্জৎ বাঁচাতে গিয়ে হয়রাণ হ'চ্ছেন, মনস্বী জলধরকে ললাটের শ্রমস্বেদ মুছতে মুছতে লেখনী-চালনা ক'র্ত্তে হচ্ছে—আরও কি দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখাতে হবে? এ অঘটন ঘটনার মূলে এই হাভাতে যুগের অন্নচিন্তা। এ যুগটাই ব্যবসার যুগ। এক্কালে সাহিত্যসেবাকে নিষ্কাম-কর্ম্ম ক'রে তোল্‌বার যো নেই। যতদিন আমাদের দেশে লেখনী-চালনা একটা লাভের ব্যবসা হয়ে না দাঁড়াবে, যিনি যা'ই বলুন, ততদিন আমাদের দেশে সাহিত্যের ক্রমোন্নতির আশা কম। তাই ব'লে আমি কোন সাহিত্যসেবককে ধনীর দ্বারে হাত পাত্‌তে বল্‌ছি না। ওতে সাহিত্যিকের যে একটি স্বাভাবিক স্বাতন্ত্র্য, সম্ভ্রম ও আত্মমর্য্যাদা আছে তা'তে ঘা লাগ্‌বে। আমরা যদি সারস্বত-সাধনাকে সাফল্য দিতে চাই, তবে যা'তে সাহিত্যের খরিদ্দার (বিনামূল্যের গ্রাহক নয়!) বাড়ে, তা'র উপায় কর্ত্তে হবে। যাতে শ্রেষ্ঠ রচনা-শিল্পিগণের চিন্তার চিত্রাবলী লোকে উচিত দামে কেনে, তা'র জন্যে উঠে পড়ে লাগ্‌তে হবে। এতে বাংলায় খাঁটি সাহিত্যজীবির উদ্ভব হবে, সাহিত্য একটা দস্তুরমত জীবিকা হ'য়ে উঠবে। যাদের শরীর না খাটালে দিন গুজরাণ হয় না, তা'দের অনেকে নিরক্ষর। তা'দের জন্য নৈশ-বিদ্যালয়ের মত দিশি ভাষার পঠন-পাঠনার ব্যবস্থা আমাদের দেশে কি চল্‌তে পারে না? আমাদের অনেক সদুদ্দেশ্যের যে অপঘাত মৃত্যু হয়, তার একটা প্রধান

কারণ আমরা অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা কর্ত্তে জানি না। অন্য দেশেও হুজুগ বলে' একটা নেশা আছে; কিন্তু সে সব জাতির খেয়ালেরও এমন একটা তোড় আছে যা'তে একটি আমূল পরিবর্ত্তন আন্‌তে পারে। সে সব ঝোঁকে এমন একটা কম্পন আছে, যা'তে সমগ্র দেশের প্রাণে সাড়া পড়ে। আর আমাদের কম্পন ঠিক যেন ম্যালেরিয়ার কাঁপুনি—খানিক বাদে জ্বালা অর্থাৎ রিয়্যাক্‌সনের পালা।

কিন্তু এই নকলনবিশ জাতের বাইরের জাঁকজমক দেখ্‌লে অতি বড় সংশয়ীও তাদের প্রতি আস্থাবান্ হয়ে উঠে। কার্য্যকালে সব গুমর ফাঁক হ'য়ে পড়ে। একালের এই দোষ যে, লোকে রাতারাতি বড় হ'তে চায়। আমাদের এই হামাগুড়ি দেওয়া কচি জাতের কাঁধেও সে খেয়াল চেপেছে। তাই আমরা খেল্‌নার রেলগাড়ী চালাতে শিখেই একদম সত্যিকার এঞ্জিন চালাতে যাই। মাঝে যে একটা ক্রমবিকাশের দীর্ঘ রুক্ষ রাস্তা থেকে যায়, সেই সাধনার ধাপ্‌গুলো বেয়ে ওঠবার ধৈর্য্য বা শক্তি আমাদের ধাতে কুলায় না; তাই আমাদের ষ্টিম্‌ও হয় না, এঞ্জিনও চলে না—কেবল কয়লাই পোড়ে। সত্য বটে এটা ওপরচাল্লাকির যুগ;—তা হ'লে কি হয়? যে সব জাতি বহুদিন ধ'রে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ভাণ্ডার ভর্ত্তি করে রেখেছে তাদের পক্ষে আয়েসের অবসর আছে। আমরা লোণা মুল্লুকের দেখাদেখি ভাসতেই শিখলাম, ডুবতে জানলাম না। লাভের মধ্যে আমরা স্রুধু জল ঘোলা করেই বেড়াচ্ছি। ডবল্‌প্রমোশনপ্রাপ্ত ছাত্রের মত আমাদের জাতির লেফাফা-দুরস্ত কিন্তু বনেদ কাঁচা।

সাহিত্য-প্রচার সহজ ব্যাপার নয়! আমাদিগকে সাবধানে প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে লড়াই ক'রে অগ্রসর হ'তে হবে। যাঁরা—শিক্ষিত অসাহিত্যিক অথবা মাতৃভাষার রসগ্রহণে অসমর্থ, তাঁ'দের আমরা অনেককাল থেকে মর্ম্মঘাতী কথা শুনিয়ে আস্‌ছি। সে রাস্তা ছেড়ে দিতে হ'বে। যে মহাত্মার পবিত্র নামের সঙ্গে জড়িত হ'য়ে সরস্বতীর এই অমিয় ভাণ্ডারটি ধন্য হয়েছে, তিনি যেমন একদিন লক্ষ্যভ্রষ্টকে লক্ষ্য ক'রে গদ্‌গদ কণ্ঠে বলেছিলেন—"মেরেছে কলসীর কানা, তা ব'লে কি প্রেম দেব না?" সেই প্রীতি, ত্যাগ ও তিতীক্ষার আদর্শ নিয়ে পলাতকদের পাকড়াও কর্ত্তে হ'বে। যেমন নিষ্ঠায় ধর্ম্মপ্রচার কর্ত্তে হয়, ধর্ম্মের ন্যায় কল্যাণময় সাহিত্যকেও তেমনি ক'রে দেশময় ছড়িয়ে ফেল্‌তে হ'বে। সেদিন এই সব পুথির গুদাম

সাহিত্যের প্রচারালয়ে পরিণত হবে। অর্দ্ধ শতাব্দীর যে সাহিত্য আজ জগতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের সঙ্গে এক পংক্তিতে স্থান পাবার দাবী ক'রে বসেছে, সেই বঙ্গসাহিত্যকে কার সাধ্য অবহেলা করে? কা'র সাধ্য তার বৃদ্ধি ও সিদ্ধিকে থামায়? আমাদের মাতৃভাষাকে প্রকৃতি নিজ হাতে সাজিয়ে তুলেছেন। বিশ্বের কলালক্ষ্মী তাঁর প্রসাধনে রত। কে বল্‌তে পারে যে একদিন বঙ্গভাষা আসমুদ্র হিমাচল বিশ্বের তীর্থ ভারতবর্ষের মাতৃভাষা হয়ে উঠবে না? আমার কথা অতিবাদ ব'লে অগ্রাহ্য হ'তে পারে, কিন্তু এক যুগের দুরাশা যে অন্য যুগে সত্য হ'য়ে ফলে, তার দৃষ্টান্তও বিরল নয়। কে জানে, আবার এই গৌড়লক্ষ্মীর গর্ভ হ'তে অভিনব বঙ্কিমের অভ্যুদয় হবে না? আর এক মধুস্থদন নূতন মধুর মধুচক্র গড়বে না? বাঙ্গালীর ভাষা-জননীর উৎসঙ্গে আসবে না কি এমন কেউ? সেই ন'দের পাগলের মত উদ্দাম প্রেমিক—যাঁর আবির্ভাবে মুগ্ধজগৎ আবার দেখ্‌বে, "সারা ভারত ডুবু ডুবু বঙ্গ ভেসে যায়!" আসুন, আমরা সেই মহাপুরুষের জন্মকে আহ্বান করার জন্য সাধনা করি। আমাদের শিরে ভগবান, বক্ষে কর্ত্তব্য হস্তে মাতৃভাষার বিজয় বৈজয়ন্তী!

শ্রীপ্রমথনাথ রায়চৌধুরী।

চাষার বেগার।

রাজার পাইক বেগার ধ'রেছে,
ক্ষেতে যাওয়া বন্ধ হ'ল আজ;
পরের কাজে কাট্‌বে সারাদিন,
রৈল প'ড়ে ঘরের যত কাজ।
আষাঢ় মাসে চাষের ক্ষেতে,
খাট্‌চে সবে দিনে ও রেতে,
শেষ জোয়ে'তে 'রুইব' ব'লে
বেরিয়েছিলাম আজ,—
হঠাৎ প'ল রাজার বাড়ী কাজ।

লোকের ক্ষেতে নূতন চারাগুলি
সবুজ—যেন টিয়ে পাখীর পাখা ;
পাটের ডগা লক্‌লকিয়ে উঠে'
মাঝের-গাঁয়ের বাজার দিল ঢাকা।
গাঙের জল বানের টানে
আস্‌ল ধেয়ে গ্রামের পানে,
পল্লীপথ গরুর ক্ষুরে
হ'ল যে কাদামাখা ;
শস্যভারে পড়্‌ল চরা ঢাকা।

উপর-ঝরণ দারুণ এ বাদলে
জীর্ণ আমার কুটীর ভাসে জলে ;
মোড়লের ঝি ভাব্‌ছে অধোমুখে,
ছেঁড়া কাঁথায় কাঁদ্‌ছে দুটি ছেলে।
'শ্যাম্‌লা' আমার দুঃখ বুঝে
উঠানকোণে দাঁড়িয়ে ভেজে'
দেনার দায়ে দাদাঠাকুর—
গোয়াল ভেঙ্গে নিলে।—
সাম্‌লে নিতাম আজকে রু'তে পেলে।

জীর্ণ চালে হ'লনাকো দেওয়া
কোথাও দুটি পচাখড়ের গুঁজি ;—
রাজার কাজে বেগার দিতে লোক
মিল্‌ল না কি পল্লীখানি খুঁজি !
সারা সনের অন্ন ছাড়ি'
যেতে হ'বে রাজার বাড়ী,
স্বর্ণচূড়ার বর্ণ সেথা
মলিন হ'ল বুঝি !
মিল্‌ল না এই গরীব ছাড়া পুঁজি।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

ঊষা।

মেয়েটি খুব ছোট নয়, নাম ঊষা, মুখেসদাই হাসি লাগিয়া আছে; এখনো সকালে উঠিয়াই দুচারিটি মেয়ের সঙ্গে এ বাগান সে বাগান হইতে ফুল তুলিয়া আনে; পুণ্যিপুকুর, সেঁজুতি, তুঁষ-তুষুলী, যম-পুকুর প্রভৃতি ব্রতের একটিও বাদ দেয় না; বেলা পর্য্যন্ত উপবাস করিয়া চীৎকার করিতে করিতে যখন সে মন্ত্র পড়িতে থাকে,তখন সে মনে মনে খুব একটা গৌরব অনুভব করে; লোকের সাক্ষাতে "রামের মত পতি পাই," বা "আমার জন্য এনো একটী সুন্দর বর" এ সব কথা উচ্চারণ করিতে বা ভবিষ্যতের কল্পিত সতীনটির প্রতি তীব্র মন্ত্রবাণ প্রয়োগ করিতে একটুও কুণ্ঠাবোধ করে না।

সকালে উঠিয়া মা যদি বলিতেন "ঊষা, চারটি সজনা ফুল কুড়াইয়া আনিস্" সে অমনি গ্রামপথ দিয়া সঙ্গীদের সহিত ছুটিত। বসন্তের আমগাছের উপর কোকিল ডাকিয়া উঠিত, তাহার শব্দ অনুকরণ করিতে করিতে শিশির-সিক্ত ঘাসের উপর হইতে যখন সে বৃন্তচ্যুত সজিনাফুল সংগ্রহ করিত, তখন বেলায় বাড়ী ফিরিলে মা তিরস্কার করিবেন, এ কথাটা মনেই আসিত না।

ঊষার পিতা এক সময়ে মোটা মাহিনার চাকরী করিতেন। ত্রিশবৎসর চাকরী করিয়া যাহা কিছু জমাইয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশই দুই কন্যার বিবাহে খরচ হইয়া গিয়াছে। এখন তাঁহার অবস্থা ভাল নয়।

কাজেই ছোট মেয়েটির বিবাহের কথা অনেকবার মনে উদিত হইলেও গৃহিণী তাহা কর্ত্তার নিকট প্রকাশ করিতে পারিতেন না; কিন্তু ঊষা ক্রমশঃ যখন বসন্তের বনশ্রীর মত বিকসিত হইয়া উঠিল, তখন তিনি একদিন বলিলেন "আর যে মেয়ের দিকে চাওয়া যায় না।"

কর্ত্তা বলিলেন "কি করিব, ব্রাহ্মণের ঘরের মেয়ে ত সহজে পার হইবার নয়?" কর্ত্তা দারিদ্র্যের তাড়নায় একটু বিকৃতমস্তিষ্ক হইয়াছিলেন, কোনো একটা শক্ত কথা তিনি বেশীক্ষণ ধরিয়া ভাবিতে চাহিতেন না, ভাবিবার ক্ষমতাও তাঁহার ছিল কি না সন্দেহ।

গৃহিণী কথাটার নিষ্পত্তি এত সহজে করিতে পারিলেন না, তিনি ঘটকী নিযুক্ত করিলেন, কিন্তু কোনো বরকর্ত্তাই এক হাজারের কমে রাজী হইলেন না। যত দিন কাটিতে লাগিল, গৃহিণীর হৃৎকম্প ততই বাড়িয়া উঠিল।

ঊষা চৌদ্দ বৎসর অতিক্রম করিল। তাহার সঙ্গী সুভাষিণী, কালিদাসী

প্রভৃতি সকলেরই বিবাহ হইল। আর তাহারা খেলিতে আসে না। দুচারি মাস অন্তর মাঝে মাঝে যখন তাহারা উষার সহিত দেখা করিতে আসিত, তখন উষা তাহাদের সহিত ভাল করিয়া মিশিতে পারিত না; তাহাদের মাথার সিন্দূর, পায়ের অলক্তকরাগ, মুখের একটা নূতন হাসি উষার মনের মধ্যে কেমন যেন সঙ্কোচ আনিয়া দিত।

উষা সঙ্গীদের দেখিয়া ভাবিত, বিবাহ কি? বিবাহ করিলে মেয়েরা বুঝি খুবই সুখী হয়। তাহার বিবাহের বয়স হইয়াছে; তবু বিবাহ হইতেছে না কেন? এই সব কথা ভাবিতে ভাবিতে যখন মাঝে মাঝে সে মায়ের দিকে চাহিয়া থাকিত, মা মুখ অবনত করিতেন, তখন সে যেন কোনো একটা ভাবী আশঙ্কায় আকুল হইয়া উঠিত।

অনেক কথা তাহার মনে জাগিয়া উঠিত, কিন্তু সে একটিও প্রকাশ করিতে পারিত না। ক্রমশঃ সে পিতামাতার নিকটেও বড় ঘেঁসিত না, নিতান্ত অপরাধিনীর মত আপনাকে লুকাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিত। বিবাহের বয়স পার হইয়াছে, অথচ বিবাহ হয় নাই, এমন মেয়ে সে কল্পনাও করিতে পারিত না; ঘরের কোণে বসিয়া সে কোনো কোনো দিন আপনার সম্বন্ধে কত কি অনির্দ্দিষ্ট ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে কখনো কখনো কাঁদিয়া ফেলিত, মা তাহাকে বাহিরে ডাকিতেন, কিন্তু ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিতেন না।

যখন পিতামাতা সমাজের নির্য্যাতন ভোগ করিতেন, কন্যা তাহার কারণ বুঝিত ও মনে করিত তাহার জন্যই পিতামাতা কষ্টভোগ করিতেছেন, তখন গোধূলির প্রথম তারাটির মত তাহাকে উজ্জ্বল অথচ ম্লান, উৎফুল্ল অথচ নিঃসঙ্গ, ম্রিয়মান বলিয়া বোধ হইত।

মাঝে মাঝে বিবাহের কথা মনে উদিত হইয়া তাহার চক্ষের সম্মুখে একটা অননুভূত স্বপ্নালোক প্রসারিত করিয়া দিত। বিবাহের পর জীবনটা নিশ্চয়ই কোন একটা অপূর্ব্ব আনন্দে ভরিয়া উঠে, তাহা না হইলে সুভাষিণী অমন করিয়া হাসে কেন, কালিদাসী চলিতে চলিতে অমন করিয়া চায় কেন, গিরিবালা যখন লাল পাছাপেড়ে কাপড় পরিয়া, মাথা সিঁন্দূরে, পা আল্‌তায় রঞ্জিত করিয়া উঠানে আসিয়া দাঁড়ায় তখন তাহাকে অমন মানায় কেন?

একদিন মা কন্যাকে ডাকিয়া তাহার চুল বাঁধিয়া দিলেন; যে কয়খানি, অলঙ্কার ছিল, তাহা পরাইয়া দিলেন, একজন অপরিচিতা বর্ষীয়সী আসিয়া উষাকে বাহিরে লইয়া গেল। বাহিরে একজন যুবক বসিয়াছিলেন; তিনি

কিছুক্ষণ উষাকে দেখিয়া বলিলেন "মেয়ে লেখাপড়া জানে?" অপরিচিতা উত্তর করিল "কিছু কিছু জানে বই কি?"

"এত বিমর্ষ, বিষণ্ন কেন, ভাল লেখাপড়া জানিলে বোধ হয় এমন হইত না। আচ্ছা যাক্ সে কথা" বলিয়া যুবক চলিয়া গেলেন।

অপরিচিতা অন্তঃপুরে আসিয়া বলিল, "জামাই কেমন?"

গৃহিণী বলিলেন "বেশ!"

ফাল্গুনমাসের একটা জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে বিবাহ শেষ হইয়া গেল। পরদিন গৃহিণী কন্যাকে জামাতার গৃহে পাঠাইয়া দিলেন।

জামাতা হরেন্দ্রবাবু, মিউনিসিপ্যাল্ আফিসের একজন কেরাণী, মাসিক বেতন ত্রিশ টাকা, বয়স প্রায় আটাশ হইবে। সতের বৎসর বয়সের সময় তিনি একবার বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যখন তিনি কালেজে পড়িতে আরম্ভ করিলেন ও নানাবিধ লোকসমাজে মিশিয়া একটু স্বাধীন-চিন্তার পক্ষপাতী হইয়া পড়িলেন, তখন আর সেই গ্রাম্য অশিক্ষিতা পত্নীর উপর একটুও শ্রদ্ধা রহিল না। হরেন্দ্রবাবুর বয়স যখন পঁচিশ বৎসর তখন সেই অনাদৃতা পত্নী চিরকালের জন্য স্বামীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। তারপর হরেন্দ্রবাবু মনে করিলেন—আর তিনি বিবাহ করিবেন না। আফিস হইতে ফিরিয়া প্রতিদিন তিনি বাঙ্গালার রমণীসমাজকে লক্ষ্য করিয়া প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল বাঙ্গালীর ঘরের মেয়েরা স্বামীর দাসী বা ক্রীড়া-পুত্তলিকা হইতে পারে কিন্তু সহধর্ম্মিণী হইবার উপযুক্ত নয়।

দিনকতক পরে হরেন্দ্রবাবু দেখিলেন—বিপত্নীক থাকিবার ইচ্ছা আর তাঁহার নাই। তখন তিনি একটি সহধর্ম্মিণীর অনুসন্ধান করিলেন; কিন্তু চেষ্টা যখন বিফল হইল, তখন মনে করিলেন—একটি দাসী বা ক্রীড়া-পুত্তলিকাকে ঘরে আনিয়া তাহাকে সহধর্ম্মিণীর উপযুক্ত করিয়া লইবেন।

এমন সময় পূর্ণযৌবনের রূপরাশি লইয়া উষা তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিল। হরেন্দ্রবাবু তাহাকে ভালবাসিলেন, সেও এতদিন ধরিয়া তাহার হৃদয়ে যত ভাব, যত ভালবাসা সঞ্চিত করিয়াছিল সবই তাঁহার চরণে উৎসর্গ করিল। অভিমানে, অপমানে, দুঃখে তাহার হৃদয় আবিল হইয়াছিল, এখন তাহা ধৌত হইয়া গেল। উষা এতদিন পরে শান্তি পাইল; গচ্ছিত ধন অধিকারীকে সঁপিয়া দিয়াছে মনে করিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

ঊষা সংসারের সমস্ত কাজ করিত, হরেন্দ্রবাবু বাড়ীতে একটিও ঝি রাখেন নাই। ঊষাকে দিনরাত খাটিতে দেখিয়া তিনি একদিন বলিলেন "তুমি ত বাড়ীর ঝি নও, তোমাকে খাটিতে হইবে না।"

ঝি নিযুক্ত হইল। রাঁধিবার জন্য একজন পাচকও আসিল। ঊষা কাজের অভাবে একটু কষ্ট বোধ করিল। হরেন্দ্রবাবু বলিলেন "রান্না আর ঝিএর কাজ ছাড়া কি মেয়েমানুষের আর কাজ নাই।"

ঊষা লজ্জায় অধোমুখী হইল। সে বেশী কথা কহিতে পারিত না, বিশেষতঃ হরেন্দ্রবাবু যখন তর্কজাল বিস্তার করিয়া তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিতেন, তখন সে আপনাকে স্বামীর অযোগ্য মনে করিয়া এত ম্রিয়মান হইয়া পড়িত যে, আর তাহার মাথা তুলিবার সাহস হইত না। এই জন্য হরেন্দ্র-বাবু অনেক সময়ে তাহাকে বোবা বলিতেন।

ঊষার সময়ে বিবাহ হয় নাই, তাই সে মনে করিত বধূর যাহা অধিকার তাহা হইতে সে বঞ্চিত। তাহার সঙ্গিনীরা বিবাহের পর হাসিতে, কথায়, নয়নের ভঙ্গীতে যে অনির্ব্বিন্ন গভীর আনন্দের উৎস ছুটাইয়া দিত, সে আনন্দ তাহার আছে, কিন্তু প্রকাশ করিবার অধিকার নাই। হরেন্দ্রবাবুকে সে দেবতার মত জ্ঞান করিত, তাহার হৃদয়ের আবেগ বদ্ধ-পুষ্করিণীর মত অচঞ্চল হইয়া থাকিত, নদীর উচ্ছল জলরাশির মত প্রবাহিত হইতে পারিত না।

হরেন্দ্রবাবু যখন কথা কহিতেন, ঊষা তাঁহার সহিত যোগদান করিতে পারিত না, তাঁহার একটি কথা ঊষার কাছে অমূল্য দান বলিয়া বোধ হইত। প্রতিদানের ব্যাকুলতায় যখন তাহার হৃদয় ভরিয়া উঠিত, তখন সেই অল্পভাষিণী যুবতী নিদ্রিত স্বামীর পাদুটি মাথায় ও বুকে তুলিয়া কতকটা শান্তি অনুভব করিত।

এই ভাবে দুই বৎসর যখন কাটিয়া গেল, তখন হরেন্দ্রবাবুর প্রেমের নদীতে ভাটা পড়িয়াছে। একদিন গভীর রাত্রে প্রবন্ধ লিখিতে লিখিতে মনে হঠাৎ একটা কথা জাগিয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন—পত্নী যদি তাহার সমস্ত অস্তিত্বটুকু স্বামীর অস্তিত্বে ডুবাইয়া দেয় তাহা হইলে জগতের লোকের বিপত্নীক থাকাই ভাল। স্বামী হইতে আপনাকে একটু স্বতন্ত্র না করিলে, আপনার অস্তিত্বের পরিচয় না দিলে তাহার শক্তি থাকিতে পারে না, সে কেমন করিয়া স্বামীকে সাহায্য করিবে, কেমন করিয়া সহধর্ম্মিণী হইবে? হরেন্দ্র বাবু অনেকক্ষণ ধরিয়া কথাগুলি ভাবিতে লাগিলেন। ঊষাকে তিনি অল্পকালের জন্যই ভালবাসিয়াছিলেন, এখন হঠাৎ তাঁহার মনে

একটা তর্ক উঠিল। তাহার প্রতি অনুরাগও একটু কমিল ; তাঁহার অব্যবস্থিতচিত্তে কোন একটা জিনিষ বেশীক্ষণ স্থান পাইত না।

বাড়ীতে আর তিনি অধিকক্ষণ কাটাইতেন না। আজ সভা, কাল গার্ডেন-পার্টি, পরশু বন্ধুর বাড়ী নিমন্ত্রণ, এই সব ওজর দেখাইয়া তিনি বাড়ীর বাহিরেই থাকিতেন। উষা মনে করিত—বাস্তবিক স্বামীর কাজ আছে, তাই তিনি আসেন না। এই জন্য স্বামী যে কারণ দেখাইতেন তাহার প্রতি সে মনোযোগ করিত না, কারণ শুনিবার জন্যও সে কোনো দিন আকুল হয় নাই। দিনকতক পরে হরেন্দ্র বাবু উষার নিকট কোন কারণ প্রকাশ করা বন্ধ করিলেন।

যে স্বামী কাজের অবসরে কথনো বাড়ী ছাড়িতেন না, তিনি প্রতিদিন তাঁহার নিকট হইতে দূরে থাকেন দেখিয়া একদিন উষা বড় দুঃখিত হইল। স্বামীর উপর তাহার কোনও সন্দেহ আসিল না ; কিন্তু একা সময় কাটে কেমন করিয়া। একদিন সে ধীরে ধীরে স্বামীর নিকট আসিয়া বলিল "তুমি বাড়ী থেকে চলে গেলে একা থাকিতে পারি না।" কথাটা বলিতে গিয়া উষার গলা দু'তিনবার বাধিয়া গেল।

হরেন্দ্র বাবু কি একটা ভাবিতেছিলেন, উষার কথার উত্তর দিলেন না।

উষা আর কথা কহিতে পারিল না! ফিরিয়া আসিবার সময় তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিল। সেদিন অনেকক্ষণ ধরিয়া সে ভাবিল—স্বামী তাহার কথার উত্তর দিলেন না কেন?

এমন যে কথনো হয় নাই তাহা তো নয়, হরেন্দ্র বাবু অনেকবার উষার কথার উত্তর দেন নাই, সব সময়েই তো সে তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছে। আজ কিন্তু সে চঞ্চল না হইয়া থাকিতে পারিল না। অতীতের তুচ্ছ অবহেলা-গুলিও নূতন আলোকে রঞ্জিত হইয়া উঠিল।

এথন হরেন্দ্র বাবু যদি উষাকে কোনো দিন 'বোবা' বলিতেন, তাহা হইলে সে ভাবিত, স্বামী তাহাকে ঘৃণা করিতেছেন, যদি কোনো দিন তিনি তাহার সহিত ভাল করিয়া কথা না কহিতেন তাহা হইলে সে মনে করিত তাহার কপাল পুড়িয়াছে, সে সমাজছাড়া—সৃষ্টিছাড়া ;—স্বামীর আদর তাহার কপালে জুটিবে কেন?

একদিন ফাল্গুন মাসের সন্ধ্যার উৎফুল্ল আকাশে একটা অবসাদ ঘনাইয়া আসিতেছিল। হরেন্দ্র বাবু একখানি চেয়ারের উপর বসিয়া লিখিতেছিলেন।

তাঁহার মুখ গম্ভীর দেখিয়া উষা ধীরে ধীরে উঠানের উপর আসিয়া বসিল, স্বামীর কক্ষে যাইতে কে যেন তাহাকে বাধা দিতে লাগিল। সন্ধ্যার সময় দুঃখীর ভাবনা খুবই ঘন হইয়া উঠে। উষা কত কি ভাবিল; সে বুঝিল তাহার জীবন গোড়া হইতেই একটা বাঁকা পথ ধরিয়া চলিয়াছে, এ পথে সে একা—নিঃসঙ্গ, এ পথের সীমাতেও হয়তো কাহারো সহিত দেখা হইবে না।

সন্ধ্যা কাটিয়া গেল। আকাশ চাঁদ ও অসংখ্য নক্ষত্রের আলোকে বিপুল চন্দ্রাতপের মত ঝলমল করিতে লাগিল, বাতাসে গাছগুলি আবার শিহরিয়া উঠিল। উষা ভাবিল অনেকক্ষণ স্বামী একা বসিয়া আছেন, একবার যাই।

ধীরে ধীরে সে কক্ষে প্রবেশ করিল, দেখিল স্বামী কলমটি দাঁতে চাপিয়া দ্বারের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া আছেন, টেবিলের উপর একখানা খাতা পড়িয়া আছে। তিনি উষার দিকে একবার চাহিয়াই আবার লিখিতে বসিলেন, একটিও কথা কহিলেন না। উষা একবার কক্ষমধ্যে এদিক সেদিক ঘুরিয়া বাহিরে আসিল।

বাহিরে আসিয়া সে ভাবিল—স্বামী নিশ্চয়ই কোনো বিষয় ভাবিতেছেন, তাই কথা কন্ নাই মেয়েমানুষের মন বোধ হয় খুব সন্দিগ্ধ, তাই আমি স্বামীর উপর অভিমান করিয়াছি।

কিছুক্ষণ বাহিরে পায়চারি করিয়াই সে আবার কক্ষে প্রবেশ করিল, মনে করিল—এবার স্বামীর সহিত নিজেই কথা কহিবো। হরেন্দ্র বাবু তখন ভাবিতেছিলেন। উষা জিজ্ঞাসা করিল "কি ভাবিতেছ ?"

হরেন্দ্রবাবু কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক হইয়া বসিয়া রহিলেন, তারপর বলিলেন "কি বলিতেছ ?"

"বলি ভাবিতেছ কি ?"

"সে আর তুমি বুঝিবে কেমন করিয়া ?"

"পারিব—বল।"

একটা অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া হরেন্দ্রবাবু বলিলেন "তোমরা যদি মানুষ হইতে তাহা হইলে বলিতাম।" এই কথা বলিয়া তিনি বাহিরে চলিয়া গেলেন।

উষা স্বামীর এ ব্যবহার সহ্য করিতে পারিল না। অন্য কক্ষে প্রবেশ করিয়া সে কাঁদিবার উপক্রম করিল। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে যাহা সে ভুলিতে চেষ্টা করিয়া-

ছিল, তাহা আবার স্পষ্ট জলন্ত হইয়া উঠিল। আমি মানুষ নয় এ কথা নিজমুখে সে অনেকবার বলিয়াছে। আজ স্বামীর কাছে সেকথা শুনিয়া সে আপনাকে অপমানিত বোধ করিল।

তিন দিন সে হরেন্দ্রবাবুর সহিত কথা কহিল না। চতুর্থদিনে হরেন্দ্রবাবু স্ত্রীর এই ভাবের কোনো কারণ না বুঝিয়া বলিলেন "তুমি যে এমনি হইবে তাহা বিবাহের সময়ই বুঝিয়াছি, তোমাকে বিবাহ করাই আমার অন্যায় হইয়াছে।" ঊষা সে কথার উত্তর দিল না। হরেন্দ্রবাবু একটা প্রশ্ন করিয়া স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন—তাহার চক্ষু জলে ভরিয়া আসিয়াছে।

তিনি বলিলেন "তোমাদের কোনো বিষয়ে যোগ্যতা নাই, অথচ রাগ আছে, চোখের জল আছে,—এ সব জঘন্য বৃত্তি" বলিয়া তিনি কক্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

ঊষা আকুল হইয়া পড়িল। তাহার জীবনে যে সব ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহাতেই সে আপনাকে নিতান্ত অপরাধিনী মনে করিয়াছিল। সে বুঝিয়াছিল—সমাজ তাহার বিরুদ্ধে। বিরোধ সহ্য করিবার ক্ষমতা তাহার কখনো ছিল না। হরেন্দ্রবাবুর সহিত বিবাহের পর সে একবার মনে করিয়াছিল—সে তরঙ্গ-উচ্ছল নদীর কূলে আসিয়াছে। তারপর যখন সে দেখিল স্বামী তাহাকে কেবল অবজ্ঞা করিয়া আসিতেছেন—তখন অতীতের জ্বালা ও বর্ত্তমানের নিরাশা প্রতিমুহূর্ত্তে তাহাকে বৃশ্চিকের মত দংশন করিতে লাগিল। সে ভাবিল—তাহার জীবন ব্যর্থ হইয়াছে—বিবাহের পর বরপক্ষ মেয়েকে দেখিতে আসে, তারপর পাকা দেখা, তারপর গায়ে হলুদ, বিবাহ, ফুলশয্যা; আমার সে সব কিছুই হয় নাই বলিলেও চলে। হঠাৎ একদিন একজন এক কথায় তাহাকে হাটের জিনিসের মত কিনিয়া লইয়া গিয়াছে। মেয়েরা শ্বশুরবাড়ীতে যে 'প্রতিপত্তি' পায় তাহা সে পায় নাই। পুরাতন ব্যবহৃত দ্রব্যের মত অবহেলাই পাইয়া আসিতেছে। মেয়েরা দাসীত্ব করিয়া গৃহিণীর আদর পায়, তাহার ভাগ্যে শুধু দাসীত্বই সার হইয়াছে।

এই সব ভাবিতে ভাবিতে সে সকল বিষয়ে বীতরাগ হইয়া গেল।

হরেন্দ্র বাবু স্ত্রীর উপর খুবই রাগিয়া গেলেন। সময়ে সময়ে, ইচ্ছা করিয়াও তাহার অন্তরে কষ্ট দিতে তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না।

একদিন হরেন্দ্র বাবু পত্নীকে বলিলেন "তুমি কি করিতে ইচ্ছা কর?" ঊষা বলিল "আমাকে বাড়ী পাঠাইয়া দাও।"

হরেন্দ্র বাবু বলিলেন "তুমি রাগিও না, স্থির হও। দেখ, তোমাদের তেজ নাই, আত্মসম্ভ্রম নাই, কাজেই তোমরা শিক্ষিত স্বামীর স্ত্রী হইবার অযোগ্য।"

উষা বলিল "তাহা হইলে আমায় বিবাহ করিলে কেন?"

হরেন্দ্র বাবু আর কথা বলিলেন না। নানা অনুনয় বিনয় করিয়া তাহাকে কতকটা শান্ত করিলেন।

এখন হইতে তিনি স্ত্রীর সহিত বাহিরে সদালাপী হইলেন, কেন না তিনি বুঝিয়াছিলেন তর্কবিতর্কে কোন ফল হইবে না, অথচ একটা আগুণ জ্বলিয়া উঠিবে। কিন্তু মৌখিক স্নেহ ধরা পড়িল।

উষা স্বামীর এ আলাপ অন্তরে গ্রহণ করিতে পারিল না! স্বামী যখন তাহার সহিত কথা কহিতেন, তখন সে তাহা শুনিত, মুগ্ধ হইত না। রাগে তাহার সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া যাইত। প্রকাশ্যে বিচ্ছেদ হওয়া ভাল, কিন্তু এ প্রবঞ্চনা কখনই সহ্য করা যায় না। উষা দিন দিন ম্লান, শীর্ণ হইয়া পড়িল।

হরেন্দ্র বাবু এখন পত্নীর সহিত অনেক কথা কন, উষাও উত্তর দেয়; কিন্তু দুজনের কথার মধ্যে কোনোখানেও আন্তরিকতা প্রকাশ পায় না।

এমন অবস্থায় একদিন রাত্রে আকাশ জ্যোৎস্নায় ভরিয়া গিয়াছে। বৈশাখের মেঘ এইমাত্র এক পশলা বৃষ্টি বর্ষণ করিয়া পশ্চিমে পুঞ্জীভূত হইয়া আছে। উন্মুক্ত জানালার কাছে উষা চুপ করিয়া শুইয়া আছে, তখনও তাহার নিদ্রা আসে নাই। এমন সময়ে হরেন্দ্র বাবু নিকটে আসিয়া বলিলেন "কি ভাবিতেছ?"

উষা উদাসভাবে বলিল "তুমি ভাবিতেছ কি—বল?"

"আমাদের বিবাহের কথা।"

আমার "সপত্নীর সহিত বিবাহের কথা?"

"না, তোমার সহিত।"

"আমার বোধ হয় তাহা নয়।"

'সে বিবাহ আমার মনেই পড়ে না—তোমার সহিত বিবাহ হইবার একটা গল্প আছে, তাই ঐ কথাটাই মনে পড়িতেছে।"

"কি গল্প?"

"এক দিন বলিব।"

ঊষা আর কোনো কথা বলিল না, সমস্ত রাত্রি কেবলই তাহার সেই গল্পটি শুনিবার জন্য আগ্রহ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

পর দিন রাত্রে আবার সেই জ্যোৎস্না, সেই মেঘ দেখা দিয়াছে। ঢং ঢং করিয়া রাত্রি বারোটা বাজিল। ঊষা বলিল "হাঁ গা, কি গল্প বল্‌বে ?" হরেন্দ্র বাবু বলিলেন "তবে শোনো। আমার প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর মনে করিয়াছিলাম, আর বিবাহ করিব না। অনেক দিন এ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছিলাম। তোমাদের বাড়ী যে গ্রামে, সেই গ্রামে আমার এক বন্ধুর বাড়া। একদিন সেই বন্ধু আমাকে বলিলেন—"বিবাহ করিতে চাও না ? আমার হাতে এমন এক মেয়ে আছে, যাহাকে দেখিলে বিবাহ করিব না এ কথা উচ্চারণ করা অসম্ভব।" আমি বলিলাম—"তোমার কথা স্বীকার করি, কিন্তু সে মেয়ে আমায় বিবাহ করিবে কেন ?"

ঊষা ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল "সে মেয়ে কে ?"

হরেন্দ্র বাবু বলিলেন "শোনো না—বলিতেছি। বন্ধু বলিলেন সে ভাবনা আমার—সে মেয়েকে বিবাহ করা খুবই সোজা—যে চায় সে তার। আমার বড়ই কৌতূহল হইল। বন্ধুর সহিত আমি তোমাদের গ্রামে আসিলাম। বন্ধু যে বাড়ীতে সেই মেয়েটি আছে সে বাড়ীটি দেখাইয়া দিলেন।"

ঊষা বলিল "সে বাড়ী কাদের ?

হরেন্দ্র বাবু তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন "তারপর প্রতিদিন আমি সে বাড়ীর আশে পাশে ঘুরিতে লাগিলাম, মেয়েটকে প্রায়ই দেখিতে পাইতাম। তখন তাহার সর্ব্বাঙ্গে যৌবনের দীপ্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল, তাহাকেই বিবাহ করিব স্থির করিলাম"।

হরেন্দ্র বাবু হঠাৎ চুপ করিলেন। দেখিলেন ঊষা নিস্পন্দ হইয়া আছে—ছিন্নমুণ্ড ছাগের মত তাহার বক্ষস্থল মুহুর্মুহু কাঁপিয়া উঠিতেছে। হরেন্দ্র বাবু বিস্মিত হইলেন, ঊষাকে অনেকবার ডাকিলেন, কিন্তু উত্তর পাইলেন না। এমন সময় পট্‌ পট্‌ ঝম্‌ ঝম্‌ করিয়া বৃষ্টি নামিয়া আসিল। ঝড় উঠিল।

সকালে উঠিয়া হরেন্দ্র বাবু ঊষাকে দেখিতে পাইলেন না, হঠাৎ পাশের ঘরে দৃষ্টি পড়াতে বুঝিলেন—ঘরের কোনে ঊষা মেঝেয় লুটাইয়া কাঁদিতেছে। তিনি অনেকবার ডাকিলেন, কিন্তু সে সাড়া দিল না। সেইদিন হইতে তিনি খুব অন্য-মনস্ক হইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে দেখিলেই বোধ হইত যেন কোনো একটা বৃহৎ চিন্তা তাঁহার মস্তিষ্কে বিপ্লব বাধাইয়াছে।

ঊষা আর স্বামীর কাছে আসিত না। এক একদিন যখন সে চুপ করিয়া

গম্ভীর ভাবে বসিয়া থাকিত, তখন হরেন্দ্র বাবু তাহার নিকটে আসিতে সাহস করিতেন না।

একদিন ভয়ানক গুমট্‌। আকাশে মেঘরাশি যেন একটা ষড়যন্ত্র করিয়া নিঃশব্দেবসিয়া আছে। হরেন্দ্র বাবু মাথায় হাত দিয়া কি ভাবিতেছেন। এমন সময় ঊষা উন্মত্তের মত তাঁহার পদতলে লুটাইয়া পড়িল, বলিল "আমাকে ছাড়িয়া দাও —আমি যেথা ইচ্ছা চলিয়া যাইব।"

"কেন?"

"আমি পতিতা—যে চায় আমি তার।"

"কেন? কে বলিল?"

"ওগো, তাইতো তুমি আমায় বিবাহ করিয়াছিলে, তাইতো এমন করিয়া রাখিয়াছ।"

হরেন্দ্র বাবু ভূলুণ্ঠিতা পত্নীকে বক্ষে টানিয়া লইলেন।

শ্রীসুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

নিদর্শন।

ভারত ও মিশর।

Ethiopia, Nubia এবং Egyptকে প্রাচীন হিন্দুগণ কালীতট বলিতেন, কারণ এই তিন দেশই কালী (Nilo) নদীর তটে। হিন্দুগণের মতে এই কালীতট দেবগণের আবাস-স্থান ছিল, গ্রীকদেরও প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, নাইল নদীর তীরে দেবগণ জন্মগ্রহণ করিতেন। পুরাণ-বর্ণিত বর্ব্বর দেশ আধুনিক Barbara, তপঃ অথবা Thebais, শঙ্খাব্ধি Mediterranean Sea। নাইল নদীর তটবাসী পুরাণোক্ত জাতিসমূহের মধ্যে পুলিন্দজাতি Pulindas, শার্ম্মিক জাতি Sharmicas, ও পল্লীজাতি Pallis নামে খ্যাত। পদ্মপুরাণে লিখিত আছে যে আদি-পুরুষ সত্যব্রতের জয়াপতি, চর্ম্ম ও শর্ম্ম নামধেয় তিন পুত্র ছিল। শর্ম্ম বহুকাল ভ্রমণ করিয়া কালী (বর্ত্তমান Nilo) নদীর তীরে উপস্থিত হন। শর্ম্মের সন্তানগণ তৎসন্নিকটে রূপবতী নামে এক নগরী স্থাপন করেন। পদ্মপুরাণে বর্ণিত এই রূপবতী নগরীই শেষে প্রাচীন গ্রীক-দিগের নিকট Rapta অথবা Raptu নামে পরিচিত হয়। শর্ম্মের সহচরগণ পদ্মাদেবীর পূজার্থে এক বিরাট মন্দির নির্ম্মাণ করেন—ইহাই পদ্মামঠ বা Pyramid। শার্ম্মিকগণের পর ভারতবর্ষ হইতে আরও কতিপয় জাতি মিশরদেশে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। তন্মধ্যে পল্লীজাতির নাম উল্লেখযোগ্য। স্কন্দ ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে এই পল্লীজাতির জম্বুদ্বীপ (ভারতবর্ষ) হইতে শঙ্খদ্বীপে (আফ্রিকা) গমনের বর্ণনা আছে। রাজপুতানার পালী অথবা ভীল জাতি, বারাণসী নগরীর উত্তর-পূর্ব্বদিকস্থ পর্ব্বতাবলী-নিবাসী কিরাত জাতি, এই পল্লীগণেরই বংশধর। [illegible]

ভারতবর্ষ হইতে চতুর্ব্বেদ লইয়া মিশরে যাত্রা করেন। স্কন্দ ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে ইহার উল্লেখ আছে। মিশরীয়গণের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় প্রাচীনতম গ্রন্থের নাম Books of Harmonia or Harmes—ইহাও বেদের ন্যায় চারিভাগে বিভক্ত।

("অর্ঘ্য", বৈশাখ,

শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ বসু)।

পুরাতন প্রসঙ্গ।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট তারিখে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির গাড়ি হাবড়া ষ্টেশন হইতে প্রথম ছাড়া হয়। প্রথমে তিনখানি ফাষ্ট ক্লাস, দুইখানি সেকেণ্ড ক্লাস, তিনখানি থার্ড ক্লাস ও গার্ডের জন্য একখানি ব্রেকভ্যান্ ছিল। ঐ গাড়িগুলি, ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির প্রথম লোকো-সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হজ্‌সন সাহেবের তদারকে, এই দেশেই নির্ম্মিত হয়। বিলাত হইতে জাহাজে যে কয়খানি গাড়ি আসিতেছিল, তাহা রেল খুলিবার কিছু পূর্ব্বে সমুদ্রগর্ভে লয় প্রাপ্ত হয়। নদীতীর হইতে কিয়দ্দূরে একখানি ক্ষুদ্র কুটীর—তাহাই প্রথম হাবড়া ষ্টেশন। একটি ক্ষুদ্র চালা ঘরে বুকিং আপিস—তন্মধ্যে দুই জন বাঙ্গালী বাবু টিকিট-বিক্রেতা। যে দিন প্রথম রেল ছাড়ে, সে দিন প্রায় এক হাজার লোক টিকিট কিনিবার জন্য দরখাস্ত করেন, কিন্তু গাড়িতে তাহার এক দশমাংশেরও স্থান ছিল না। প্রথম প্রথম সপ্তাহে ছয় দিন রেল চলিত—রবিবারে বন্ধ থাকিত। "হরকরা" নামক ইংরাজী পত্রে অনেক আন্দোলনের পর, রেলওয়ের কর্তৃপক্ষ রবিবারে গাড়ি চালাইবার বন্দোবস্ত করেন। দুইখানি ট্রেন প্রতি রবিবার পাণ্ডুয়া পর্য্যন্ত যাইত।

("অর্চ্চনা", বৈশাখ,

শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায়)।

ইংরাজ ও বাঙ্গালী।

আমরা মাঝে মাঝে গরুর পা পূজা করি, বৎসরে বিশেষ তিথি উপলক্ষে তাকে মালা দিয়া সাজাইয়া থাকি। শাস্ত্রে গো ভগবতী—বিষ্ণু ও ব্রাহ্মণের সঙ্গে এক পর্য্যায় ভুক্ত। কিন্তু ইংরাজ যেমন পশুর সেবা করে, এক জৈনেরা ভিন্ন আর কেহ কি সেরূপ মমতাসহকারে পশু-কুলের পরিচর্য্যা করিয়া থাকে? আমাদের কাছে গরুর পূজা আছে, আদর নাই, নৈমিত্তিক সম্বর্দ্ধনা আছে, নিত্য সেবা নাই—আমরা তাহাদিগকে ধীরে ধীরে তিল তিল করিয়া মারিতে দি। খাদ্যের প্রয়োজনে বা প্রমোদের খাতিরে ইংরাজ পশু বধ করে, কিন্তু প্রয়োজন বা প্রলোভন উপস্থিত না হইলে, ইংরাজ তাহাদিগকে যে কি আদর যত্ন করে তাহা দেখিলে অবাক হইতে হয়। চড়িবার আগে সে ঘোড়াটিকে চুম খায়, কার্য্যে নিযুক্ত করিবার পূর্ব্বে গরুটির গায়ে মৃদুভাবে হাত বুলায়। আমাদের দেশে চাকর-বাকরের সঙ্গে ইংরাজ মানুষের মত ব্যবহার করে না—ইহার জন্য কে দায়ী তাহার বিচার করিব না। কিন্তু তাহার নিজের

দেশে চাকর মনিবের ব্যবহার দেখিলে মনে হয় যে, ইংরাজ মনিবও আমাদের চাইতে বড়, আর ইংরাজ চাকরও আমাদের চাকরের চাইতে বড়। চাকর তার কর্ত্তব্য করিবে, কিন্তু সেত 'মানুষ' তাহারও ত আরাম বিরামের প্রয়োজন আছে, সেইজন্য ইংরাজের বাড়ীতে চাকর-মনিবের সম্বন্ধের মধ্যে ইহার একটা বিধি-ব্যবস্থা আছে। বিলাতের চাকর চাকরাণী মাসে একদিন পুরা ছুটি পায়, রবিবারে একবেলা ছুটি পায়, রাত্রি সাড়ে নয়টার পর তাহারা স্বাধীন। মনিবের কাজ করিবার সময় চাকরাণীরা তাহাদের বিশেষ টুপি মাথায় দেয়, ছুটির সময় ভদ্র মেম সাজিয়া জমকাল পোষাক পরিয়া বাহির হয়। আমাদের দেশের দাস দাসীর অবস্থা অন্যরূপ—তাদের একটুও নিজের সময় নাই। ইংরাজ দোকানদার তাহার গ্রাহকের সঙ্গে যে প্রকার ব্যবহার করে তাহাতেও তাহাকে বড় বলিয়া মনে হয়। ইংরাজ পরার্থে এ সকল করে না—স্বার্থই তাহার লক্ষ্য। আমাদের লক্ষ্যও তাই। কিন্তু স্বার্থটা থাকে কিসে আর যায় কিসে, ইংরাজ তাহা বেশ বোঝে—আমরা তাহা বুঝি না। ইংরাজ তাহার গ্রাহকের নিকট টাকা আদায়ের ফন্দি করে—তাহাকে বৃথা হায়রাণ করে না। সে নিজের লাভ চায়; নিজের লাভ হউক বা না হউক, পরের ক্ষতি করিতে পারিলেই বাহাদুরি, এ ভাবটা সে পোষণ করে না।

("বঙ্গদর্শন", বৈশাখ,
শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল)।

আর্য্য সভ্যতার উদ্ভব।

প্রাচীন আর্য্য-সভ্যতা দক্ষিণ ভারতেই প্রথম উদ্ভূত হয়। উত্তর ভারতের সভ্যতা অপেক্ষা দক্ষিণভারতের সভ্যতা প্রাচীনতর, এবং উত্তর ভারত প্রধানতঃ দক্ষিণ দেশের ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বন করিয়াই, আপনাদের মনোমত পুরাণ, ইতিহাস গঠনে প্রয়াসী হইয়াছেন। দক্ষিণ ভারতের পূর্ব্ব উপকূলে দ্রাবিড় জাতির বাস। এই জাতির এক শাখা অন্ধ্রবংশ নামে বঙ্গদেশে রাজত্ব করিয়াছিল এবং এই জাতি পারস্যে, বাবিলনে এবং মিশরে আপনার পরিচয় দান করিতে বিরত হয় নাই। দক্ষিণ ভারতের তমিড় (আমরা যাহাকে ইংরাজের অনুকরণে Tamil বলি) রাজ্যের কেন্দ্রস্থান ছিল "কুমরী"—ইহাই বর্ত্তমান কালের কন্যাকুমারী বা Capo Comorin। এক্ষণে উক্ত কুমরীর দক্ষিণে সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ ঘূর্ণ্যমান, কিন্তু পুরাকালে ঐস্থান হইতে আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া পর্য্যন্ত এক প্রকাণ্ড ভূমিখণ্ড ছিল। কুমরীর পর মাদুরা ও তাঞ্জোর উক্ত রাজ্যের রাজধানী হইয়াছিল। তমিড়-পুরাতত্ত্ব-আলোচনা-সমিতির (Tamil Archaeological Society) সভ্যেরা বলেন যে ভারতভূমির সভ্যতার আদি কেন্দ্রস্থান মলয় পর্ব্বতের দক্ষিণভাগ অর্থাৎ বর্ত্তমান তমিড় দেশের দক্ষিণাংশ। পুরাণ ও বাইবেলে বর্ণিত মহা জলপ্লাবনের যে মানব পর্ব্বতগাত্রে অবরোহণ করেন তিনিই মনু, আর সেই পর্ব্বত ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের উত্তরে অবস্থিত মলয় পর্ব্বত।

("প্রবাসী", জ্যৈষ্ঠ,

বার-গণনা।

রবি, সোম প্রভৃতি ক্রমে গ্রহ লইয়া বার-গণনাটা আমরা বিদেশ হইতেই পাইয়াছি। বৈদিক সাহিত্যে গ্রহের নাম নাই, এবং গ্রহ লইয়া বার গণনা নাই। ঐ গণনা প্রাচীন বৌদ্ধ-যুগের সাহিত্যে নাই, পাণিনিতে নাই, খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর মহাভাষ্যেও নাই। মহাভারতের কোনও স্থানেই যে বার-গণনা নাই, ইহা সকলের জানিয়া রাখা উচিত। সর্ব্বত্রই নক্ষত্র ও তিথি লইয়া গণনা, এবং তিথি দ্বারা দিবস-গণনা দেখিতে পাওয়া যায়। বারের নাম সম্বন্ধেও একটা খট্‌কা হয়। প্রায় খৃষ্টোত্তর পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত "পঞ্চতন্ত্র" গ্রন্থে রবিবারের নাম পাই "ভট্টারকবাসর"। কুত্রাপি কোনও শাস্ত্রে সূর্য্যকে "ভট্টারক" বলা হয় নাই। প্রভুর বার অর্থাৎ Lord's day শব্দের অনুবাদ হইতে ত, উহার উৎপত্তি নয়? খৃষ্টীয় ৩য় ও ৪র্থ শতাব্দীতে যে ভারতের অন্তর্ভুক্ত গান্ধার প্রভৃতি দেশের অদূরে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারিত হইতেছিল, তাহার অনেক প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে।

রাশিচক্রের গণনাও বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। যে ঋতুর যে অবস্থা হইতে দ্বাদশ রাশির নামকরণ হইয়াছে, তাহা ভারতবর্ষের ঋতু ও অবস্থার সহিত মেলে না। মেষ বৃষাদির বসন্তে সন্তান-প্রসব হইতে যদি ঐ নামের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তবে মেষপালক ভবঘুরে জাতির মধ্যেই ঐ নামের উৎপত্তি সম্ভবপর হয়।

("সাহিত্য", জ্যৈষ্ঠ,
শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার)।

নিষাদ জাতি।

বৈদিক যুগে নিষাদগণ আর্য্যনিবাসের নিকট স্বতন্ত্রভাবে স্বজাতীয় অধিপতিগণের অধীনে বাস করিত। পদ্মপুরাণ ও বায়ুপুরাণে, বিন্ধ্য-পর্ব্বতবাসী বর্ব্বর জাতিনিচয়কে কৃষ্ণবর্ণ, খর্ব্বাকৃতি ও চিপিট-নাসিকা-মুখসম্পন্ন নিষাদের বংশধর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। বৈদিক ও পৌরাণিক সাহিত্যে নিষাদ জাতির যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে অনুমান হয় যে নিষাদাকৃতি মনুষ্যগণই আর্য্যাবর্ত্তের আদিম অধিবাসী ছিল। আর্য্য ঔপনিবেশিকগণ ইহাদিগকে হয় বশীভূত ও অন্ত্যজজাতিতে পরিণত করিয়াছিলেন, না হয় সন্নিহিত আরণ্য ও পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয় লইতে বাধ্য করিয়াছিলেন। দক্ষিণাপথের দ্রবিড়ভাষাভাষী পনিয়ান, কাদির, কুরুম্বা, কণিকর প্রভৃতি জাতিও আকারে বিন্ধ্যবাসী ভিল, গোন্দ প্রভৃতির অনুরূপ। সুতরাং ইহাদিগকেও নিষাদবংশীয় মনে করা যাইতে পারে। সিংহলের বেদ্দাগণ এবং মলয় উপদ্বীপের সকাই ও সেমাঙ্গ প্রভৃতি জাতি নিষাদাকৃতি। বর্ত্তমান কালেরনিষাদগণ তিনটি পৃথক শ্রেণীর ভাষা ব্যবহার করে। সাঁওতাল, মুণ্ডা, শবর প্রভৃতি জাতি মুণ্ডা-শ্রেণীভুক্ত ভাষা, ভিলেরা আর্য্যভাষা, এবং গোন্দ, খণ্ড, ইরুলা প্রভৃতি জাতি দ্রাবিড় শ্রেণীর ভাষা ব্যবহার করে। মুণ্ডাশ্রেণীর ভাষাই নিষাদ জাতির আদি ভাষা। মুণ্ডা ভাষার সহিত আসামের খসিয়াগণের, নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসিগণের এবং মলয় উপদ্বীপে কথিত মনখমের শ্রেণীর ভাষার সম্পর্ক লক্ষিত হয়।

("সাহিত্য", জ্যৈষ্ঠ,

আচার্য্য কৃষ্ণকমলের উক্তি।

সিপাহী-বিদ্রোহের সময় আমি "দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ" নামক একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করি। সে সময়ে বাঙ্গালা রচনার দিকে আমার ঝোঁক ছিল। আমি তৎকালে "বিচারক" নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র বাহির করিয়াছিলাম। উহা এডিসনের "স্পেক্টেটর" পত্রের অনুকরণে গঠিত হইয়াছিল—এক একটি সন্দর্ভে সমস্ত কাগজ পূর্ণ হইত, সর্ব্বোপরি একটি করিয়া সংস্কৃত শ্লোক থাকিত। পাঁচ ছয় সংখ্যা বাহির হইয়াই এই কাগজ বন্ধ হইয়া যায়। অনতিবিলম্বে স্বর্গীয় কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী "পূর্ণিমা" নামে একখানি মাসিকপত্র প্রতিষ্ঠিত করেন। আমি তাহাতে "জুঁইফুলের গাছ" ও "তাঁতিয়া টোপি" নামক দুইটি কবিতা প্রকাশিত করিয়াছিলাম। কিছুকাল পরে বিহারী চক্রবর্ত্তী, যোগেন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি কয়েক জন বন্ধু "অবোধ বন্ধু" নামক একখানি মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। এই পত্রিকা বোধ হয় ১৮৭১-৭২ সাল পর্য্যন্ত জীবিত ছিল। ইহাতে আমি অনেক বিষয় লিখিয়াছিলাম—সমগ্র "পল-ভর্জিনিয়া" গ্রন্থ ফরাসী ভাষা হইতে অনূদিত করিয়াছিলাম এবং নেপোলিয়নের একটি জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশিত করিয়াছিলাম। চিঠি-পত্রের প্রণালীতে লেখা "উজ্জ্বল" নামক একটি গল্প রচনা করিয়াছিলাম—কিন্তু তাহা মুদ্রিত হইতে দিই নাই। সতের আঠার বৎসর বয়ঃক্রমকালে আমি "বিচিত্র-বীর্য্য" নাম একখানি গ্রন্থ রচনা করি; প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপকতাকালে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে উহা মুদ্রিত হয়। ...... বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাময়িক সাহিত্যে লিখিবার অবসর ছিল না; বোধ হয় মদনমোহন তর্কালঙ্কারের "সর্ব্বশুভকরী" পত্রিকায় তিনি কিছু কিছু লিখিতেন। বহু-বিবাহের অবৈধতা প্রমাণের জন্য বিদ্যাসাগর যে মনু বচনের আশ্রয় লয়েন তাহা এই :—

"সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানাং ইমাং স্যুঃ ক্রমশোঽবরাঃ॥
শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রানাং সা চ স্বাচ বিশঃ স্মৃতে।
তে চ স্বা ক্ষত্রিয়স্যোক্তাস্তাশ্চ স্বা ব্রাহ্মণঃ স্মৃতাঃ॥"

পূর্ব্বে এই শ্লোকের অর্থ করা হইত যে প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে প্রথমে স্বজাতীয়া কন্যা বিবাহ করা অত্যাবশ্যক ও অবশ্যকর্ত্তব্য; পরে ইন্দ্রিয় তৃপ্তির প্রয়োজন হইলে স্বজাতীয়া বা ভিন্নজাতীয়া কন্যা বিবাহ করিতে পারে। বিদ্যাসাগর এই শ্লোকের অর্থ করিলেন যে ধর্ম্মার্থে স্বজাতীয়া পত্নীর একান্ত আবশ্যক; কিন্তু ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য স্বজাতীয়া পত্নী হইতেই পারে না, বিজাতীয়া চাহি। বহুবিবাহ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের যুক্তি ছিল যে যখন মনুর মতে কাম্য-বিবাহ ভিন্নজাতীয়া কন্যা ব্যতিরেকে সম্ভব নহে, এবং যখন কলিতে জাত্যন্তর বিবাহ উঠিয়া গিয়াছে,, তখন কলিতে বহুবিবাহ অশাস্ত্রীয় হইয়াছে। এই ব্যাখ্যা শুনিয়া তারানাথ তর্কবাচস্পতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি আদর করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমাদের ঢিপ্‌লে না হ'লে এমন সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা কে বাহির করতে পারে?" বিদ্যাসাগরের দেহ গ্যাটাগোটা ছিল, তজ্জন্য তারানাথ প্রভৃতি তাঁহাকে ঢিপ্‌লে বলিয়া ডাকিতেন।

("আর্য্যাবর্ত্ত", বৈশাখ,
শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী গুপ্ত)।

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল চলিয়া গেলেন—রহিয়া গেল কেবল ঘোষণা ;—তাঁহার হাস্যের, কাব্যের, নাট্যের, গানের, প্রতিভার এবং চারিত্রের ঘোষণা। এ ঘোষণা কতদিন রহিবে তাহা বিধাতাই বলিতে পারেন, আগামিগণই তাহার নির্দ্দেশ করিতে পারেন। তবে আপাততঃ এই ঘোষণার প্রতিধ্বনিতে শিক্ষিত বঙ্গীয়-সমাজ মুখর হইয়া রহিয়াছে। "আমার দেশ" এবং "আমার জন্মভূমি" আর "আমার ভাষা" এই তিন গানের কবি-গায়ক-প্রচারক দেহত্যাগ করিয়াছেন। এ কথাটা শিক্ষিত বাঙ্গালী একটু চিন্তা করিলেই শিহরিয়া উঠিবে ; এবং যাঁহার কৃপায় পঙ্গু গিরিলঙ্ঘন করে, বামনে চাঁদ ধরিতে পারে, মূকে প্রাণের কথা কহিতে পারে, তাঁহাকে স্মরণ করিয়া উৰ্দ্ধনেত্র হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিবে—তুমি দিয়াছিলে, তুমি লইলে প্রভু ; তোমার নিধি তোমার কাছে যাইয়া আত্মারাম লাভ করুক। কি জানি কাহার প্রেরণায় কি হইতেছে ; এক একটি জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ, প্রতিভার খ-ধূপ হস্তে করিয়া বাঙ্গালার সারস্বত-আয়তনে আসিয়া উপস্থিত হইতেছেন, ক্রীড়ার ছলে সেই ধূপে মনীষার অগ্নি-সংযোগ করিয়া নানাবিধ খেলা করিয়া জীবনের মধ্যাহ্নেই আত্মগোপন করিতেছেন। তাঁহারা চলিয়া যাইতেছেন,—রাখিয়া যাইতেছেন এক একটি অগ্নির রেখা—ভাবের লীলাখেলা। এই ভাববিন্যাসের পরিণতি কিসে এবং কোথায় হইবে, তাহা কে বলিতে পারে।

শিক্ষিত বাঙ্গালীর জীবন যেন সফরী-লীলা। জনন ও যৌবন আছে, জরা নাই ; জরার পূর্ব্বেই মরণ আসিয়া গ্রাস করে। যৌবনটাও সেই এক গণ্ডুষ জলের মধ্যে ফর্‌ফরাণ মাত্র ;—সেই স্কুল-কলেজ, পাশ-ফেইল এবং চাকরী। চাকরী করিতে করিতেই অকালবার্দ্ধক্য এবং সহসা মৃত্যু। দ্বিজেন্দ্রলাল এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটাইতে পারেন নাই। পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ করিতে না করিতেই তাঁহার সফরীলীলার পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে,—সহসা জীবনের মধ্যাহ্নে চিরনিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন ; কাহাকেও সেবা করিবার অবসর দেন নাই, মিত্র স্বজনকে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় দিনাতিপাত করিবার অবকাশ দেন নাই। মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ডময়ূখমণ্ডিত, নানাবর্ণ প্রতিবিম্বিত, পদ্মপত্রস্থায়ী জলবিন্দুর মত টল্‌-টল্‌, ছল্‌-ছল্‌ করিতে করিতে, কালের পবনতাড়নে সহসা গড়িয়া—গড়াইয়া অনন্ত সমুদ্রে মিশাইয়া গেলেন। মানবতার সে গজমুক্তাসদৃশ জীবনবিন্দু দেখিতে-

৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

দেখিতে, পলক ফেলিতে না ফেলিতে কোন অজ্ঞেয় গর্ত্তে গড়াইয়া পড়িল! দেখার সাধ মিটিল না, সাহচর্য্যের তৃষ্ণার নিবৃত্তি হইল না, এক-সঙ্গে খেলাধূলার পাট সাঙ্গ হইল না;—এই যে ছিল—কোথায় গেল ভাবে, নিদাব সন্ধ্যার চক্রবালদীপ্তির মত চকিতে চমকাইয়া কোথায় লুকাইল! আলেয়ার আলোর মত এমন জীবন-কাহিনী কোন্ ভাষায় বর্ণনা করিব?

দ্বিজেন্দ্রলাল বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা ৺দাওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় নদীয়ার মহারাজের অমাত্য ছিলেন। ইঁহারা পুরুষানুক্রমে নদীয়ারাজের দাওয়ান। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আমল হইতে রায় পরিবার নদীয়ারাজের আশ্রয়ে সুরক্ষিত এবং প্রতিপালিত হইয়া আসিতে-ছেন। এখনও দ্বিজেন্দ্রলালের এক ভ্রাতা নদীয়ার মহারাজের দাওয়ানী করিতেছেন। দাওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় এই কার্য্যে বিশেষ খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। দাওয়ান কার্ত্তিকেয় স্বয়ং সুলেখক, সুগায়ক এবং সুরসিক ছিলেন। তিনি বাঙ্গালার প্রথম শ্রেণীর সংস্কারক দলের অন্যতম ছিলেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর, বাবু রামতনু লাহিড়ী প্রমুখ মনীষী সমাজ-সংস্কারকগণ তাঁহার মিত্র এবং সহচর ছিলেন। বাঙ্গালায় ইংরেজি শিক্ষার প্রথম যুগে দাওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র ইংরেজি শিক্ষা ও সভ্যতা প্রচার পক্ষে অনেকটা প্রযত্ন করিয়াছিলেন। ইঁহারই সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রলাল। ইঁহারা সাত ভাই ও এক ভগিনী ছিলেন; ভগিনী মালতী-দেবী সর্ব্বকনিষ্ঠা এবং সর্ব্বাগ্রেই স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। পরে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ রাজেন্দ্রলাল দেহত্যাগ করেন; এইবার সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রলাল চলিয়া গেলেন। এখন রহিলেন পাঁচভাই। এই পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে বাবু জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় বঙ্গসাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ নিবন্ধকার। দ্বিজেন্দ্রলাল একটি পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন; উভয়েই অপ্রাপ্তবয়স্ক। বালক দীলিপকুমার এখনও ষোড়শবর্ষ অতিক্রম করে নাই বালিকা মায়াদেবী কনিষ্ঠা, এখনও অনূঢ়া। দ্বিজেন্দ্রলাল কলিকাতার বিখ্যাত হোমিওপ্যাথী চিকিৎসক ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা সুরবালা দেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। সুর-বালা তাঁহার মৃত্যুর আট বৎসর পূর্ব্বে লোকান্তরে গমন করিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল শেষ আট বৎসর বিপত্নীক অবস্থায় কাটাইয়াছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিখ্যাত ছাত্র। তিনি প্রশংসার সহিত এম-এ পাশ করিয়া, গবর্ণমেন্টের

সেখানে সিসেষ্টার কলেজে (Cirencester) তিনি কৃষিবিদ্যা শিক্ষা করেন। কৃষিবিদ্যার পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া তিনি বাঙ্গালায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তখন স্যার চার্লস্ এলিয়ট বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা; তিনি দ্বিজেন্দ্রলালকে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও কালেক্টারের পদে নিযুক্ত করেন। দ্বিজেন্দ্রলাল ইংরেজি-সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন; ইংরেজি গদ্যপদ্য তিনি অতি সুন্দরভাবে লিখিতে পারিতেন। তিনি Lyrics of Ind শীর্ষক একখানি ক্ষুদ্র কবিতাপুস্তক ইংরেজিভাষায় রচনা করিয়াছিলেন। ইংরেজ কবি স্যার এডুইন আর্ণল্ডকে তিনি এই পুস্তক উৎসর্গ করেন। আর্ণল্ড দ্বিজেন্দ্রলালের গুণানুরাগী ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল ইংরেজিতেও অনেকগুলি হাসির গান রচনা করেন। তাহার দুই একটা গান, এক সময়ে বাঙ্গালার ইংরেজসমাজে বেশ প্রচলিত ছিল। ইংলণ্ডে প্রবাসকালে দ্বিজেন্দ্রলাল প্রায় এক বৎসর কাল রীতিমত ইংরেজি সঙ্গীতশাস্ত্রের সাধনা করিয়াছিলেন। তাই তাঁহার কণ্ঠস্বর অনেকটা ইংরেজদের মত দরাজ ছিল। তাঁহার তুল্য ইংরেজি গান করিতে বাঙ্গালীর মধ্যে কেহ ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।

ইহা জোর করিয়া বলা চলে যে, দ্বিজেন্দ্রলালের যৌবনকালটা অতি সুখেই অতিবাহিত হইয়াছিল। তিনি স্বয়ং সুকান্ত, সুপুষ্ট, সুস্থকায় পুরুষ ছিলেন; তাঁহার পত্নীও অনিন্দ্যসুন্দরী এবং সুশিক্ষিতা ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালকে কখনই অভাবের পেষণে জীর্ণ হইতে হয় নাই। তিনি নিজে অমিতাচারী ছিলেন না, আয় অনুসারে ব্যয় করিতেন; তাঁহার পত্নী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী ছিলেন; উভয়ে সংসারযাত্রা অতি সুখেই নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। যতদিন দ্বিজেন্দ্রলাল সংসার-সুখে সুখী ছিলেন, ততদিন তিনি নিজে হাসিয়াছিলেন, বাঙ্গালার বিদ্বজ্জন সমাজকেও হাসাইয়াছিলেন। তাঁহার হাসির গান বাঙ্গালা সাহিত্যে অপূর্ব্ব সামগ্রী; তিনি সে গান নিজে যেমন গাহিতে পারিতেন এমন আর কেহ পারিত না। কিন্তু দগ্ধবিধাতার দৃষ্টিতে ত এত সুখ সহে না; তাই দ্বিজেন্দ্র পত্নী অকালে কালকবলে পতিত হইলেন। দ্বিজেন্দ্রের অন্তরের পবিত্র হাসিটুকু সহসা শুকাইয়া গেল। রসময় ও আনন্দময় দ্বিজেন্দ্রলাল ভাবময় এবং করুণাময় হইয়া উঠিলেন। এই ভাব ও করুণার ঘাতপ্রতিঘাতে তাঁহার শেষ ছয়খানি নাটক রচিত হইয়াছিল। সে করুণা ঠিক দয়া বা অনুকম্পা নহে, উহা দয়া এবং তিতিক্ষায় পরিস্ফুট।

দ্বিজেন্দ্রলালের চরিত্রে দুইটি গুণ দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি সারল্যের

অবতার স্বরূপ ছিলেন ; সে সারল্য অনেক সময়ে বালকত্বে—শিশুসুলভ বিশ্বাস-পরায়ণতায় পরিণত হইত। এই হেতু তিনি কপটতাকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন ; কপটের কাছে একবার ঠকিলে, সে প্রবঞ্চনার কথা তিনি জীবনে ভুলিতে পারিতেন না। এই সরলতা ছিল বলিয়াই তিনি প্রাণ খুলিয়া প্রশংসা করিতে পারিতেন ; আবার মন খুলিয়া নিন্দা-তিরস্কারও করিতে পারিতেন। কাহারও কোন কার্য্যের বা লেখার নিন্দা করিতেন বলিয়া তিনি তাহার প্রতি যে বিরাগের ভাব পোষণ করিতেন, এমন কথা বলিতে পারি না। দ্বিতীয় গুণ, তাঁহার ঔদার্য্য ; তিনি মিত্রস্বজনেরর নিকট যেন উলঙ্গ হইয়া থাকিতেন। তিনি স্তুতিশুষ্ক বান্ধবতার কখনই পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি বন্ধু বা সহচরের মুখে তাঁহার কোন কার্য্যের নিন্দা শুনিলে বান্ধবতার বন্ধন ছিন্ন করিতেন না। বরং বন্ধুমুখে অতিমাত্রায় কোন বিষয়ের সুখ্যাতি শুনিলে তিনি যেন একটু সঙ্কুচিত হইতেন। তাই ব্যাজস্তুতির হিসাবে তাঁহার নাট্যকাব্যের প্রশংসা করিতে হইত। মিত্রস্বজনের মধ্যে তিনি বালকের মতন হুড়াহুড়ি, ঠেলাঠেলি, ছুটাছুটি করিতেন ; কিন্তু সেই সময়ে একজন বাহিরের লোক বা অপরিচিত কেহ আসিলে, দ্বিজেন্দ্রলাল অমনি চুপ হইয়া যাইতেন। তিনি অপরিচিত ভদ্রসমাজে লৌকিকতা বজায় রাখিতে পারিতেন না। অপরিচিত বা অল্প-পরিচিত ভদ্রলোক থাকিলে, দ্বিজেন্দ্রলাল নবোঢ়ার মতন সঙ্কুচিত হইয়া থাকিতেন। যাহারা তাঁহাকে চিনিত না, তাহারা ভাবিত হয় ত লোকটা অহঙ্কারী ; কিন্তু দুইচারিদিন মেলামেশা করিলেই সকলেই বুঝিতে পারিত যে, দ্বিজেন্দ্রলালে লেশমাত্র অহঙ্কার নাই। তিনি বন্ধুবৎসল ছিলেন ; মিত্রস্বজনের মান-অভিমান রক্ষা করিতে, তাহাদিগকে বেমালুম অর্থসাহায্য করিতে তিনি যেমন জানিতেন, তেমন বুঝি আর কেহ জানিত না। দোষই বল, আর গুণই বল, দ্বিজেন্দ্রলাল মনের কথা চাপিয়া রাখিতে পারিতেন না ; যাহা ভাবিতেন তাহাই বলিয়া ফেলিতেন। এই হেতু তাঁহার জীবনে দুই একবার মিত্রবিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল বটে ; তথাপি এমন বিচ্ছিন্নমিত্রের গুণাংশের কথা প্রয়োজন হইলে, তিনি মুখ ফুটিয়া বলিতে জানিতেন। দ্বিজেন্দ্রলালের চরিত্র নির্ম্মল, নিষ্কলঙ্ক, নিরাবিল শরৎজ্যোৎস্নার মতন ছিল ; অতি বড় শত্রুতেও এ পক্ষে তাঁহার কোন নিন্দা রটাইতে পারে নাই। তিনি যে পত্নীবৎসল ছিল—দেহ-মন-প্রাণ দিয়া সহধর্ম্মিণীকে ভালবাসিতেন ; সে ভালবাসায় কপটতা ছিল না, ছলনা ছিল না। যখন বিপত্নীক হইলেন, তখন গঙ্গাপ্রবাহের ন্যায় প্রগাঢ়, পবিত্র,

ভালবাসার স্মৃতি তাঁহাকে সাধুতার মঞ্চে রক্ষা করিতে পারিয়াছিল। তেমন আর কাহার হয়? তেমন রূপসীপত্নী, তেমন গুণবতী, সাধ্বীসতীর প্রেম কে পায়? যদি পায় ত, তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে দ্বিজেন্দ্রলালের মতন আর কে পারে? দ্বিজেন্দ্র পত্নীর সুখস্মৃতি বক্ষে ধরিয়া জীবনের বাকী কয়টা দিন কাটাইয়া দিয়াছেন। তিনি ত ভাবের ঘরে চুরি করিতেন না, পত্নীর ভালবাসায় ছলনা জানিতেন না; তাই তাঁহার দেহ মন প্রাণ সর্ব্বস্বই মরণ পর্য্যন্ত পবিত্র ছিল। সরল, উদার, সত্যপ্রিয় দ্বিজেন্দ্রলাল জীবনের সকল ব্যাপারেই সারল্যের ও সত্যপ্রিয়তার মহিমা রক্ষা করিতে পারিতেন।

এইবার দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যসেবার পরিচয় দিব। এপক্ষে দ্বিজেন্দ্রলালের বিশিষ্টতা, তাঁহার হাসির গানে, তাঁহার গদ্য-পদ্যের ভাষা বিন্যাসে, পরিস্ফুট হয়। তাঁহার হাসির গান বাঙ্গালাসাহিত্যে নূতন সামগ্রী; এমনটি পূর্ব্বে ছিল না, ভবিষ্যতে আর হইবে কি না বলিতে পারি না। দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান, ঠিক শ্লেষবিদ্রূপ নহে, ব্যঙ্গরঙ্গ নহে; উহা কৌতুকমাত্র। সে কৌতুকের অন্তরালে স্তরে স্তরে করুণা, অনুকম্পা, সমবেদনা যেন সাজান রহিয়াছে। শ্লেষবিদ্রূপ যাঁহারা করিয়া থাকেন, তাঁহারা যেন অভিজ্ঞতার এবং পবিত্রতার উচ্চ আসনে বসিয়া অপরকে হীনজ্ঞানে শ্লেষবিদ্রূপের প্রয়োগ করিয়া থাকেন। অন্যের চরিত্রের বা ব্যবহারের বিকটতা ফুটাইয়া দেখাইতে হইলে, তাহাকে একটু খাটো করিতেই হয়। ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল যাহাদের লইয়া সরল হাসি হাসিতেন, স্বয়ং তাহাদের দলে মিশিয়া যাইতেন। "আমরা সেজেছি বিলাতি বাঁদর"—এই এক "আমরা" শব্দ প্রয়োগ করাতেই ইউরোপঅনুচিকীর্ষু বাঙ্গালী সাহেবদের প্রতি কি প্রগাঢ় অনুকম্পা প্রকাশ করা হইয়াছে। তিনি যেন বিলাত-ফের্ত্তাদের বলিতেছেন যে, "ভাই আমিও তোমাদের দলের একজন; তা হইলে কি হয়, আমরা সব কি এক হাস্যজনক ব্যাপারে লিপ্ত হইয়াছি তাহা একবার বুঝিয়া দেখ দেখি।" Reformed Hindus, ইরাণদেশের কাজি, ইংরেজিনবীশের ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তনপ্রিয়তার গানে, নন্দলালের দেশহিতৈষণায়; পাঁচ্‌শ বছর এমনি করে—গানে, প্রত্যেক হাসির গানে, প্রত্যেক ব্যঙ্গে, রঙ্গে কৌতুকে, তিনি নিজেকে বাদ দেন নাই, নিজেকে জড়াইয়া সকলকে লইয়া কৌতুক করিয়াছেন। সে কৌতুকে ভাঁড়ের অন্তঃসারশূন্য উৎকট হাস্য নাই; আছে বয়স্যের কৌতুকের সঙ্গে প্রগাঢ় করুণা। সে করুণা যেন পাথর-চাপা প্রস্রবণের মত

পর্ব্বতপঞ্জর ভেদ করিয়া নির্ম্মল-নিরাবিল হাসির কুল্‌কুল্‌ ধ্বনিতে বাহির হইয়া আসিতেছে। তাই দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানে সমাজের কোন শ্রেণীর লোকই চটে নাই; সে গান গাহিয়া সবাই হাসিয়াছে, বুঝিবা কেহ কেহ মর্ম্মগ্রাহী আগায় গোপনে রোদনও করিয়াছে। তাই বলিতেছিলাম এমন গান বাঙ্গালাসাহিত্যে পূর্ব্বে বড়ই কম ছিল, দ্বিজেন্দ্রলাল সে অভাব দূর করিয়া বাঙ্গালীকে ধন্য করিয়াছেন।

এ গানের ভাষা অপরূপ, সুরও অপূর্ব্ব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি দ্বিজেন্দ্রলাল বিলাতী সঙ্গীতশাস্ত্রের সাধনা করিয়াছিলেন। আমাদের দেশীয় সঙ্গীত-বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি বাঙ্গালা সঙ্গীতের মহিমা বুঝিতেন; বিলাতী সঙ্গীতের বিশিষ্টতার সহিত পরিচিত ছিলেন। তাই তিনি এই দুইটাকে বেমালুম মিলাইতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার হাসির গানের সকল সুরেই ইংরেজি ভাঁজ আছে। বিশেষতঃ Reformed Hindus, ইরাণ দেশের কাজী প্রভৃতির ছাঁকা বিলাতী সুর। কিন্তু এ বিলাতী সুর বাঙ্গালীর কাণে বাজে না, সবাই সানন্দে ঐ বিলাতী সুরে গানগুলি গাহিয়া আনন্দ উপভোগ করেন। যাঁহারা হিন্দু সঙ্গীত-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, অন্যদেশের সুর যাঁহাদের কাণে বাজে তাঁহারাও দ্বিজেন্দ্রলালের গান শুনিয়া কখনই ব্যথিত বা মর্ম্মাহত হন নাই। ইহা কম বাহাদুরীর কথা নহে। প্রতিভা বলি তাহার, যে আধুনিক ইংরেজি ভাবভঙ্গী, রীতিপদ্ধতিকে বেমালুম বাঙ্গালীর বিশিষ্টতার সহিত মিলাইয়া চালাইতে পারে। এ পক্ষে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভা অদ্বিতীয়—অপরাজেয়। তাঁহার ভাষাতেও ইংরেজি ভঙ্গী আছে। গ্রীণ জনবনিয়ানের ভাষায় উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন—in its directness, in its haze, in its transluscent imagery—ভাষার সারল্যে, মোহবিন্যাসে, আলেখ্যের-মুগ্ধ প্রস্ফুরণে বনিয়ানের ভাষা অপরাজেয়। এই উক্তি দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতি ও অনায়াসে প্রয়োগ করা যায়। তিনি, মনের ভাবটা সোজা করিয়া ব্যক্ত করিতে পারিতেন। সোজা করিয়া ব্যক্ত করিতে পারিতেন বলিয়া তাঁহার ভাষায় ইতরতার ছাপ থাকিত না। পুরুষযোগ্য পরুষতা তাঁহার প্রযুক্ত প্রত্যেক শব্দ হইতে যেন ফুটিয়া বাহির হইত। সে পরুষতায় কঠোরতার দোষ ছিলনা। "মানুষ আমরা নহিত মেষ"—কথাটা খুব জোরের, খুব তেজের—সোজা, সাদা, চাঁচা, ছোলা কথা; কিন্তু ইহাতে কঠোরতা নাই, ইতরের রূঢ়তা নাই। দেশাত্মবোধের অনেক গান ত বাঙ্গালা ভাষায় পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল; কিন্তু সে সকলে বামাসুলভ

যে কোমলতা ছিল, দ্বিজেন্দ্রের রচিত "আমার দেশ" এবং "আমার জন্মভূমি" গানে লক্ষ্ণৌ ঠুংরির সে গড়ানে ভাব নাই। মমত্ববোধের জোর জবরদস্ত বিকাশ একা তিনিই করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার লিখনভঙ্গীর ইহাই বিশিষ্ঠতা। তাঁহার style এর ইহাই মূলতত্ত্ব। কোন লিখন পদ্ধতিতে, কোন ভাববিন্যাসে, শব্দালেখ্য চিত্রণে, চরিত্রের উন্মেষে, বিতণ্ডার প্রতিদ্বন্দ্বিতায়—সর্ব্বত্র এবং সর্ব্ববিষয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের এই বিশিষ্টতা নিত্য বিদ্যমান। ইংরেজি ভাবের ও অভি-ব্যঞ্জনা পদ্ধতির হাত হইতে তিনি অব্যহতি পান নাই। আবাল্য যাহার চর্চ্চা করিয়াছেন তাহা যে মেদ মজ্জার সহিত মিশিয়া থাকে, তাহা কি পরিহার যোগ্য? দ্বিজেন্দ্রলালের লেখায়, গানে, ছড়ায় ইংরেজি ভাব বিস্তর আছে; কিন্তু সে সকল "সুবর্ণ সুযোগ" "চার পোয়ালায় ঝঞ্ঝাবাত" প্রভৃতির ন্যায় আমাদের বাঙ্গালিত্ব কে দংশন করে না। সে সকল যেন তাঁহার লিখনভঙ্গীর সহিত মিলিয়া মিশিয়া খাপ্ খাইয়া গিয়াছে। তাঁহার লিখিত নাটক সকলের মধ্যে অনেক ভূমিকা ইউরোপীয় ছাঁচে ঢালা, কিন্তু সে ঢালাই এত পরিষ্কার হইয়াছে যে সহসা ধরা যায় না। তেমনটি যে আমাদের দেশে নাই, বা হইতে পারে না, কবির কাব্যের মোহে এমন কথা কেহ জোর করিয়া বলিতে পারে না। এই সামঞ্জস্যই প্রকৃত প্রতিভার পরিচায়ক। তিনি যে দেশ-বিদেশ দুই চিনিয়াছিলেন উভয়ের মধ্যে সমান গুণ বাছিয়া লইতে পারিয়াছিলেন, এবং সেই গুণ-সকলের সমবায়ে একটা নূতন সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার উচ্চাঙ্গের প্রতিভার পরিচায়ক। "মানুষ আমরা, নহিত মেষ"—এই উক্তির ভিতরে ইংরেজি ভাষার ছাপ থাকিলেও উহা বেমালুম বাঙ্গলা হইয়া গিয়াছে। আবার—"এই দেশেতে জন্ম আমার, এই দেশেতে মরি"—ইহা খাঁটি বাঙ্গালীর উক্তি—বাঙ্গালীভাব, বাঙ্গালী কোমলতা যেন জড়ান-মাখান রহিয়াছে। ইহাকেই বলি ভাব ও শব্দসামঞ্জস্য—স্বদেশ ও বিদেশের ঘাত প্রতিঘাতে নবীন স্বদেশীয়তার সম্প্রসারণ। প্রতিভা না থাকিলে এটুকু হয় না। এ পক্ষে দ্বিজেন্দ্রলালের অসামান্য প্রতিভা ছিল। তাঁহার গদ্যপদ্যের যখন সবিস্তর সমালোচনা হইবে, তখন দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভার প্রকৃত মহিমা ফুটিয়া বাহির হইবে। আমি প্রসঙ্গত একটু ইঙ্গিত করিয়া রাখিলাম মাত্র।

"আবার তোরা মানুষ হ"—ছিল একদিন, যেদিন তোমাদের মানবতায় জগৎ সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল,—ছিল একদিন যে দিন বলবীর্য্যে, প্রতাপে প্রাবল্যে তোমরা জগৎকে করামলকবৎ মুষ্টিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলে,—ছিল

একদিন, যেদিন জ্ঞানবিজ্ঞানে সংযম-সন্ন্যাসে, দারিদ্র্যের সেবায়, দারিদ্র্যের শ্লাঘায় তোমরা জগতের আদর্শ হইয়াছিলে—ছিল একদিন, যেদিন তোমাদের কাব্যগাথা জগতের কাব্যকাননকুঞ্জের কোকিলকলরবের পঞ্চমতানে দিগ্দেশকে মুখর করিয়া রাখিত,—ছিল একদিন, যেদিন তোমার সামগান বিশ্ব-মানবতার কাতরআহ্বানে বিধাতার আসনকে টলাইয়া ছিল—সেদিন আর নাই; কেননা সে মানবতা আর নাই! তাই—"আবার তোরা মানুষ হ'," —দেশাত্মবোধ বিহ্বল, অতীতস্মৃতির জাগরণে উদ্বুদ্ধ কবি, তোমাদের গলা জড়াইয়া, অনু-কম্পার অশ্রুবর্ষণে যুগল গণ্ড ভাসাইয়া, তোমাদিগকে অনুরোধ করিতে-ছেন। ইহা আচার্য্যের অনুশাসন নহে, আপ্তবাক্যের প্রত্যাদেশ নহে, সর্ব্বদর্শীর বিধান নহে,—ইহা সখা-সহচরের কারুণ্য পূর্ণ অনুরোধ—ব্যথিতের-মর্ম্মাহতের কাতরোক্তি। ইহাই দ্বিজেন্দ্রলাল বাঙ্গালীকে শিখাইয়া গিয়াছেন। এ শিক্ষার তিনটি স্তর আছে। প্রথম—ভাই ভাই এক ঠাঁই হইতে হইবে; একঠাঁই হইবার জন্য যদি সর্ব্বস্বপণ করিতে হয় ত তাহাই করিবে। দ্বিতীয়—পতিতের ও আর্ত্তের সেবা করিয়া সকলকে বুকের উপর জড়াইয়া ধরিবে; সেবায় পরকে আপন করিতে হইবে, আপনাকে পরার্থে বিলাইয়া দিতে হইবে। তৃতীয়—মানব-জাতিকে আপনার করিতে হইবে—বিশ্বমানবতার পূজা করিতে হইবে—বসু-ধাকে কুটুম্বরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। এই তিন কর্ম্ম করিতে পারিলে মানুষের মতন মানুষ হওয়া যাইবে। মানুষের মতন মানুষ হইতে পারিলে যাহা ছিল আবার তাহাই পাইবে, যেমনটি ছিল আবার তেমনটি হইবে, সর্ব্বস্বাপহৃতের সর্ব্বৈশ্বর্য্যলাভ হইবে। ইহাই দ্বিজেন্দ্রলাল বাঙ্গালীকে শিখাইয়াছেন। এ শিক্ষা গ্রহণ করিবার যোগ্যতা বাঙ্গালীর আছে কি? এ শিক্ষার অধিকারী বাঙ্গালী হইতে পারে কি? এই শঙ্কা দ্বিজেন্দ্রলালের চিত্তকে অহঃরহ বিচলিত করিত। এই সন্দেহ নিরসনের কাল উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে দ্বিজেন্দ্রলালকে মহাপ্রস্থান করিতে হইয়াছে। তাঁহার ব্রত অনুদ্যাপিত রহিয়াছে। তবে এই উদ্যাপনের ইঙ্গিত তিনি তাঁহার রচিত "ভীষ্ম" নাটকে দিয়া গিয়াছেন। কে আছ তোমরা, এই মহাপ্রাণের মহদ্ব্রতের সূত্র অবলম্বন করিয়া উদ্যাপনের পথে অগ্রসর হইতে পার?

ঐ দুঃখেই মরমে মরিয়া আছি। বিলাতী সভ্যতার সজ্ঘাতে, ইংরেজি শিক্ষার উদ্বোধনে বঙ্গদেশে যে সকল মহামনস্বী পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই অপরিসমাপ্তকর্ম্মা হইয়া জীবনযাত্রার শেষ করিয়াছেন।

তাঁহাদের প্রত্যেকের কার্য্যের পরম্পরা রক্ষা পায় নাই। এক বঙ্কিমচন্দ্র মহাপুরুষের মুখে বলিয়া গিয়াছেন—আবার আসিব। যখন ধর্ম্মের গ্লানি ঘটিবে, যখন সাধু অবসন্ন হইবেন, যখন শ্রীমানদিগের সন্তান সন্ততিগণ শ্মশানচারী হইবে, যখন সংযম-ত্যাগ-সন্ন্যাস উপভোগের দৌরাত্ম্যে বিলাসরুক্মীরূপে পরিণত হইবে —তখন আবার আসিবে কি? শ্রীভগবানের আশ্বাসবাণী আছে, অতএব নিরাশ হইবার অবসর নাই। কিন্তু যদি কার্ত্তিকের সন্ধ্যাপ্রদীপের মত এক একটি করিয়া ঘৃতের প্রদীপ নির্ব্বাপিত হয়, কালকল্লোলিনী-কালিন্দির বিমলতটে গৃহস্থের—সকল প্রদীপ যদি এমনই ভাবে কালঝঞ্ঝার পবনতাড়নে সহসা নির্ব্বাপিত হয়, তাহা হইলে কোন আশায় বুক বাঁধিয়া থাকিব প্রভু? নাই কিছু, আছে অতীতের ভস্মাচ্ছাদিত স্মৃতির চুল্লী। মনীষার ফুৎকারে অতীত গৌরবের পুঞ্জায়মান ভস্মকে উড়াইয়া যিনি স্মৃতির অগ্নিকণাকে—বহ্নিবিন্দুকে প্রোজ্জ্বল এবং অনুরাগপ্রফুল্ল করিতে পারেন তিনিই ত ধন্য—তিনিই ত প্রতিভাশালী মহাপুরুষ। সে অগ্নিকণা যাহাতে ভাবের ইন্ধনে বহ্নিজিহ্বায় পরিণত হয়, সে জিহ্বা-সমুদ্গীর্ণ আলোকে যাহাতে হৃদয়কন্দর সমালোকিত হয়, এমন অবসর তুমি দেও না কেন? ফুৎকার দিতে দিতে সলিলসিক্ত ভালের ইন্ধন যখন ধূমোদ্গার করিতে থাকে, সেই ধূমের জ্বালায় যখন তাহার দুইনয়ন দিয়া অনবরত জলধারা পড়িতে থাকে, তখনই তাহাকে কোলের দিকে টানিয়া লও কেন? যুগযুগান্তরব্যাপী জাড্যের শীতলজলপ্রক্ষেপে শ্রাবণের কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় আমাদের ভাবগুলি জলস্নিগ্ধ হইয়া আছে। তাহাদিগকে অনুরাগের তাপে উত্তপ্ত করিতে বিলম্ব ঘটে; সে বিলম্বের অবকাশ দেও না কেন? আমাদের বড় সাধের, বড় সোহাগের দ্বিজেন্দ্রলাল, জীবনের প্রান্তে পঁহুচিতে না পঁহুচিতে কেন তাহাকে লইয়া গেলে—মনুষ্যত্বের যে ভেরীনিনাদ সে করিতেছিল, তাহা প্লুতে উঠিবার পূর্ব্বে কেন তাহাকে কাড়িয়া লইলে? বলিব না কি, ইহা জাতিগত হতভাগ্যের লক্ষণ? বলিব না কি, ইহা জাতিব্যাপী স্থবিরতার পরিচায়ক? উপর্য্যুপরি এমনটি ঘটিলে, সে জাতিকে রন্ধ্রাদোষগ্রস্ত বলা হয়। আমাদের সেই হতভাগ্যই ঘটিয়াছে। আমাদের ভাগ্যে যাহা আছে তাহা হইবে, তুমি দ্বিজেন্দ্রলাল মহাসিন্ধুর অপর পার হইতে এই পতিত জাতির প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখিও। তোমার অশরীরী স্নেহের আকর্ষণে হয়ত আমরা মনুষ্যত্বের পথে অগ্রসর হইবার যোগ্যতা লাভ করিলেও করিতে পারি। একবার দেখ! ইহজীবনে আমাদের যেমন করিয়া দেখিতে—তেমনি করিয়া একবার দেখ! আমাদের শোকের অপনোদন হউক—বাঙ্গালীজন্ম সার্থক হউক!

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

রত্ন-দীপ।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সোণার হরিণ।

চৈত্রমাসের প্রথম সপ্তাহ, কিন্তু ইতিমধ্যেই এবার বেশ গ্রীষ্ম পড়িয়া গিয়াছে।

বেলা দশটার সময়, কলিকাতার উত্তরাংশের কোনও সদর রাস্তা দিয়া, রেশমী ছাতা মাথায় এক যুবক ধীরে ধীরে চলিতেছিল। লোকটি অত্যন্ত সুপুরুষ—মুখে চক্ষে রূপ যেন ঝলমল করিতেছে। তাহার বেশবিন্যাসেও বাহারের ছড়াছড়ি। মস্তকে তরঙ্গায়িত কেশের বড় বাহার, অঙ্গে পঞ্জাবী পিরিহানের বাহার, পায়ে লপেটি জুতার বাহার, তাহার উপর বসনের সুকুঞ্চিত প্রান্তভাগের বাহার যেন লুটাপুটি খাইতেছে। লোকটির বয়স বত্রিশ—বড় জোর তেত্রিশ হইতে পারে।

যুবকের নাম খগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। পিতা, কলিকাতা সমাজের একজন বিখ্যাত ধনী ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে, অল্পবয়সেই খগেন্দ্র তাঁহার অগাধ সম্পত্তির অধিকারী হয়। কিন্তু সে সব গিয়াছে - খগেন্দ্র এখন এক-প্রকার নিঃস্ব। লক্ষ টাকা খরচ করিয়া একটা থিয়েটার খুলিয়াছিল--সে থিয়েটার উঠিয়া গিয়াছে। এক সময়, একরাত্রে খগেন্দ্র পাঁচশত টাকা বাগান খরচ করিত—সে সকল এখন তাহার স্বপ্নবৎ। এখন দায়ে পড়িয়া সে অপেক্ষাকৃত সংযত-চরিত্র—কিন্তু অর্থলালসা তাহার মনে রাবণের চিতার মত জ্বলিতেছে। গত বৎসর একটা বড় রকম জাল করিয়া বেঙ্গল-ব্যাঙ্ক হইতে অনেক টাকা আত্মসাৎ করিবার চেষ্টায় ছিল--ধরাও পড়িয়া যায়। পুলিসকোর্টে সঙ্গীন মোকর্দ্দমা উপস্থিত হয়, তথা হইতে দায়রা সোপর্দ্দ হইয়াছিল। কিন্তু পিতৃপুণ্যে অনেক কষ্টে অব্যাহতি পাইয়াছে।—হা ভগবান! যাহার বহিরাবরণ এমন শ্রীমণ্ডিত করিয়া পাঠাইয়াছ, তাহার অন্তরদেশ এমন অসার পদার্থে গঠিত করিলে কেন?

কিয়দ্দূর চলিয়া খগেন্দ্র একটি গলির মোড় পাইল। মাথা তুলিয়া গলির

মাত্র দেখিয়া, সেই গলির পথে নম্বর খুঁজিতে খুঁজিতে অগ্রসর হইল। ক্রমে একটি পীতবর্ণের দ্বিতলবাটীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া, পকেট হইতে কাগজখানি বাহির করিয়া আবার নম্বরটি মিলাইল। উপরিতলের কক্ষ হইতে খোলা জানালা দিয়া হার্ম্মোনিয়মের সুরলহরী ভাসিয়া আসিতেছিল। খগেন্দ্র বদ্ধদ্বারে করাঘাত করিতে লাগিল।

ভিতর হইতে শব্দ আসিল—"কে গা?"

খগেন্দ্র বলিল—"খুলেই দেখ না।"

দ্বার খুলিয়া একজন ঝি আত্মপ্রকাশ করিল। খগেন্দ্রের মুখপানে চাহিয়াই, বিস্ময়ে সে কিয়ৎক্ষণ অবাক্ হইয়া রহিল।

খগেন্দ্র বলিল—"কনক এ বাড়ীতে থাকে?"

ঝি অস্ফুটস্বরে বলিল—"আপনি—কে?"

"আমি যেই হই না। কনকের এই বাড়ী?"

"হ্যাঁ।"

খগেন্দ্র ভিতরে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইল। ঝি আত্মসম্বরণ করিয়া বলিল—"দাঁড়ান—দাড়ান। আপনি কি চান?"

"যা চাই তা তোমার মনিবের কাছেই বলব"—বলিয়া খগেন্দ্র আরও দুইপদ অগ্রসর হইল।

ঝি বলিল—"এখন একটু এখানে থাকুন। আমি আগে খবর দিই। আপনার নাম কি বলুন।"

খগেন্দ্র একটু চিন্তা করিয়া বলিল—"নাম না বল্লে উপরে যেতে পাব না?"

"না।"

"তোমার মনিব যে দেখ্‌ছি মস্ত মেম-সাহেব হয়েছেন। বলগে যাও—সোণার হরিণ।"

ঝি বলিল—"সোণার হরিণ!—আপনার নাম বলব সোণার হরিণ?"

খগেন্দ্র একটু হাসিয়া বলিল—"এক সময় ও দলে আমি সোণার হরিণ বলেই বিখ্যাত ছিলাম। বলগে—বল্লেই চিন্তে পারবে।"

পাশে একটি ক্ষুদ্র কক্ষে টেবিল ও খানদুই চেয়ার রাখা ছিল। ঝি খগেন্দ্রকে সেইখানে বসিতে অনুরোধ করিয়া, ভিতরে গেল। খগেন না বসিয়া, সেই হার্ম্মোনিয়মের সুরসঙ্গতির সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া গুণ-গুণ স্বরে গান গাহিতে লাগিল।

কয়েক মুহূর্ত্ত পরে হার্ম্মোনিয়ম থামিয়া গেল। ঝি নামিয়া আসিয়া বলিল—"উপরে চলুন।"

খগেন্দ্র উপরে গিয়া দেখিল, সভ্যস্নাতা, আলুলায়িতকুন্তলা, কনকলতা, হার্ম্মোনিয়মের টুল ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেছে। প্রবেশমাত্র সে বলিয়া উঠিল—"আসুন—আসুন। আজ কি সুপ্রভাত! কেমন আছেন?"

"ভাল আছি। তুমি এ গলির ভিতর—এ খনির তিমিরগর্ভে—আশ্রয় নিয়েছ কত দিন?"

"এই বছরখানেক হ'ল। সে বাড়ীতে থাকতে লোকে ভারি বিরক্ত করত। আপনি জানেনই ত, অভিনেত্রী হ'লেও, আমার মনের গতি একটু অন্যরকম। আমি গোলমাল ভালবাসিনে।"

"বেশ বেশ। দুটো পান আনতে বল ত।"

কনক উঠিয়া গিয়া, উপরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া, ঝিকে পান আনিতে আদেশ করিল। ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"তামাক দেবে কি?"

"না, আমার কাছে সিগারেট আছে।"—বলিয়া, স্বর্ণনির্ম্মিত একটি সিগারেট-কেস পকেট হইতে বাহির করিয়া, খগেন্দ্র একটি সিগারেট কনকলতাকে দিল, একটি নিজে ধরাইল।

রূপার ডিবায় ভরিয়া ঝি পান আনিয়া দিল। কিয়ৎক্ষণ গ্রীষ্মাধিক্য ও অন্যান্য বিষয়ক কথোপকথনের পর খগেন্দ্র বলিল—"আজকাল কি করছ তুমি?"

"বেকার বসে আছি। মাসখানেক হল থিয়েটারের চাকরি ছেড়ে দিয়েছি।"

"হ্যাঁ—তাই শুনলাম যদুর কাছে। কি হয়েছিল?"

"ম্যানেজারের সঙ্গে বকাবকি হয়েছিল।"

"কেন? ব্যাপারটা কি?"

"হয়েছিল কি জানেন? সাজাহানের রিহার্সাল হচ্ছিল। আমাকে দিয়েছিল জাহানারার পাঠ। সুরুতেই এক জায়গায় সাজাহান আমাকে বল্‌ছে—'বেচারী মাতৃহীনা পুত্রকন্যারা আমার? তাদের শাসন করবো কোন্ প্রাণে জাহানারা? ঐ চেয়ে দেখ, ঐ স্ফটিকে গঠিত দীর্ঘনিঃশ্বাস—ঐ তাজমহলের দিকে চেয়ে দেখ'—এখন কবি, তাজমহলকেই স্ফটিকে গঠিত দীর্ঘনিঃশ্বাস বলে বর্ণনা করেছেন, কেমন কি না?"

খগেন্দ্র বলিল—"হ্যাঁ—ইংরেজিতেও তাজমহলকে মর্ম্মরগঠিত স্বপ্ন বলে বর্ণনা করা হয়েছে।"

"তাই ত। তেমনি, বাঙ্গালী কবি, সৌন্দর্য্যের রঙ আরও একটু চড়িয়ে, স্ফটিকে গঠিত দীর্ঘনিঃশ্বাস বল্লেন। শোক যেন মূর্ত্তি ধারণ করেছে। ভাবটি চমৎকার না ?"

"নিশ্চয়।"

"এখন, হয়েছে কি জানেন ? ছাপাখানার ভূতেরা, ছাপার বই খানিতে, ঐ দীর্ঘনিঃশ্বাস কথাটির দুই পাশে দুটি বন্ধনী ছেপে দিয়েছে—অর্থাৎ ওটা যেন 'পতন ও মূর্চ্ছা' কিম্বা 'বেগে প্রবেশ'—ঐ জাতীয় একটা ব্যাপার। তাই মনে করে, ম্যানেজার মশায় সাজাহানকে শেখাচ্ছেন—'ঐ স্ফটিকে গঠিত' পর্য্যন্ত বলে, উস্—হুস্ করে একটা বড়রকম দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে হবে—তার পর আবার বলে যেতে হবে—'ঐ তাজমহলের দিকে চেয়ে দেখ' ইত্যাদি। আচ্ছা খগেনবাবু, আপনিই বলুন তো, আপনি ত থিয়েটারের একটি ঘুণ—আচ্ছা এটা বাঁদরামি নয় ?"

"অবশ্য।"

"অপরাধের মধ্যে, আমি তাই ম্যানেজারকে বলেছিলাম। এই না শুনে ম্যানেজার একবারে চটে লাল। 'এত বড় আস্পর্দ্ধা—আমায় তুই বাঁদর বল্লি !'—বলে চেঁচামেচি আরম্ভ করে দিলে। আমার মেজাজটিও রাজা ও রাণীর ভাষায়, বলতে গেলে, নিতান্ত মধুমত্ত মধুকরের মত নয়—জানেনই ত। আমিও খুব কড়া কড়া শুনিয়ে দিয়ে, চাকরিতে লাথি মেরে, বাড়ী চলে এলাম।"

"তার পর ?"

"তারপর লোকের পর লোক পাঠাতে লাগল। কিন্তু আমি আর কিছুতেই নড়ছিনে। আমি বসে আছি গম্ভীর হিমালয়ের মত।"—বলিয়া অভিনেত্রী, নিজ মুখভাব অত্যন্ত গম্ভীর করিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত নতনেত্রে বসিয়া রহিল। এই ক্ষণিক অভিনয়টুকু শেষ করিয়া সে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল—খগেন্দ্রও সে হাসিতে যোগ দিল।

হাসি থামিলে কনক বলিল—"তার পরে—আজ কি মনে করে আগমন বলুন দেখি ? বোধ হয় দুবছর আপনার দেখা পাইনি।"

"একটু কাযেই এসেছি। একজন ভাল অভিনেত্রী খুঁজছি।"

কনক উচ্ছ্বসিত স্বরে বলিল—"আবার থিয়েটার খুলবেন না কি ?"

খগেন্দ্র ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"যদি খুলি, তুমি আমার থিয়েটারে চাকরি নেবে ?"

"নেব না ? নিশ্চয়—নিশ্চয়। আপনার থিয়েটারেই ত প্রথম আমার হাতে খড়ি। তখনত আমার নামও কেউ জানত না। সত্যি, খুলবেন ?"

খগেন্দ্র ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"না, এবার থিয়েটার নয়।"

"তবে অভিনেত্রী খুঁজছেন কেন ?"

"একটু কায উদ্ধার করবার জন্যে। তুমি বেকার বসে আছ শুনে তোমারই কাছে এসেছি। যতদিন আমার কাযে থাকবে, আমি মাসে দুশো টাকা করে তোমায় মাইনে দেব। যদি আমার কাযটি সফল করে দিতে পার, তা হলে বেশ ভারি রকম বক্শিস্ পাবে।"

ব্যাপারটা কিছুই বুঝিতে না পারিয়া কনক সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল—"আমায় কি করতে হবে ?"

"বেশী কিছু নয়। পাড়াগাঁয়ে গিয়ে মাসকতক একজন বড়লোকের পুত্র-বধূর সহচরী হয়ে তোমায় থাকতে হবে।"

অধিকতর বিস্মিত হইয়া বলিল—"কার সহচরী হতে হবে? ব্যাপার কি ?"

খগেন্দ্র তখন পকেট হইতে একখানা বাঙ্গলা সংবাদপত্র বাহির করিয়া, একটা বিজ্ঞাপন কনকলতাকে পাঠ করিতে দিল। বিজ্ঞাপনটি এইরূপ :—

কর্ম্মখালি।

অত্র এষ্টেটের শ্রীযুক্তেশ্বরী বধূরাণী মহোদয়ার জন্য একজন সৎকুলজাতা সচ্চরিত্রা সহচরীর প্রয়োজন। যিনি ভালরকম বাঙ্গলা লেখাপড়া জানেন এবং অবসর সময়ে চিত্তবিনোদনের জন্য সঙ্গীতাদি করিতে সুপটু, অথচ নিষ্ঠাবতী হিন্দুরমণী (নিঃসন্তান বিধবা হইলে আরও ভাল হয়) তাঁহার আবেদনই সর্ব্বাগ্রে গ্রাহ্য হইবে। অশন বসন ব্রতাদি নিয়ম প্রভৃতির উপযুক্ত ব্যয় অত্র এষ্টেট্ হইতে নির্ব্বাহ হইবে, তাহা ছাড়া মাসিক ২৫৲ হিসাবে জলপানি দেওয়া যাইবে। কর্ম্মপ্রার্থিনীগণ দুইজন পদস্থ ব্যক্তির স্বাক্ষরিত প্রতিষ্ঠাপত্র সহ সত্বর আবেদন করুন।

শ্রীরঘুনাথ মজুমদার,

ম্যানেজার, বাগুলিপাড়া এষ্টেট,

পোঃ দেওয়ানগঞ্জ, জেলা নদীয়া।

কনকের পাঠ শেষ হইলে খগেন্দ্র বলিল—"আমি চাই, তুমি ঐ পদের জন্যে দরখাস্ত কর, তার পর সেখানে গিয়ে মাসকতক সহচরী হয়ে থাক।"

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কনক বলিল—"আমি কিছু বুঝতে পারছি নে! আপনার মৎলব কি? ঐ বধূরাণী আপনার কেউ হয় না কি?"

"হয় না—যদি হইয়ে দিতে পার, তা হলেই আমার কার্য্যসিদ্ধি হয়।"

"কি হইয়ে দিতে পারি?"

"স্ত্রী। সে বিধবা, যদি তার সঙ্গে আমার বিবাহ ঘটিয়ে দিতে পার, তা হলে ভাল রকম ঘটকালি পাবে।"

শুনিয়া কনক গালে হাত দিয়া বলিল—"ওমা! বিধবা-বিবাহ করবেন? এতদিন বিবাহ না করে শেষে এই কায? আপনার এ মতি কেন হল, খগেন বাবু? দেখতে কি বড় সুন্দরী না কি?"

"তাকে আমি কখন চক্ষেও দেখিনি।"

"তবে?—যদি সে কালো কুৎসিত হয়?"

"হলোই বা কালো কুৎসিত-কালো কুৎসিত মেয়েকে কেউ কি বিবাহ করে না?"

একটি অঙ্গুলি গালের উপর স্থাপন করিয়া, নতনেত্রে কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ থাকিবার পর মৃদুহাসি হাসিয়া চক্ষু তুলিয়া কনকলতা বলিল—"অনেক টাকা আছে বুঝি? আপনি একটা দাঁও মারবার চেষ্টায় আছেন—নয়?"

"পাগল!—আমি কি সেই চরিত্রের লোক? আমি শুধু বিধবা-বিবাহ করে বাঙ্গলাদেশকে একটা দৃষ্টান্ত দেখাব বলে মনে করেছি।"

মাথা নাড়িয়া কনক বলিল—"বকেন কেন? দৃষ্টান্ত দেখাবার জন্যে ত রাত্রে আপনার ঘুম হচ্ছে না। বলি, ঐ বউরাণী কি 'অত্র এষ্টেটের' ম্যালিক?"

"ষোল আনার।"

"আয় কত?"

"বছরে লাখ খানেক টাকা হবে।"

কনক তখন বিজয়িনীর ন্যায় হাস্য করিয়া বলিল—"তাই বলুন—এতক্ষণে ব্যাপারটা পরিষ্কার হল।—তা সে হিঁদু ঘরের বিধবা—অমনি চট্ করে আপনাকে বিয়ে করতে রাজি হবে?"

"চট্ করে রাজি হলে তোমার দ্বারস্থ হয়েছি কেন? তোমায় সেখানে গিয়ে, তার মনটির উপর ধীরে ধীরে অল্পে অল্পে নিজের অধিকার বিস্তার করতে হবে। খুব সাবধানে, তোমায় অগ্রসর হতে হবে। প্রথমে বিধবা বিবাহের সমর্থক খান কতক উপন্যাস—যেমন রমেশ দত্তের 'সংসার,' শিবনাথ শাস্ত্রীর 'মেঝবউ'—এইগুলো পড়ে শোনাতে হবে। কথাপ্রসঙ্গে বিধবা-বিবাহ

জিনিষটাকে বেশ ভাল রঙ দিয়েই চিত্রিত করে তার মনশ্চক্ষের সমূখে তোমায় ধরতে হবে। কলকাতায় এখন কত বড় বড় ভাল ভাল লোক বিধবা-বিবাহ সমর্থন করছেন, এই সব সংবাদ কথাকৌশলে তাকে জানাতে হবে।—এই রকম করে তিলে তিলে তার প্রতিকুল মনকে অনুকুল করে আনতে হবে।—এ বড় কঠিন কাজ,—প্রথম শ্রেণীর আর্টিষ্ট ভিন্ন অন্য কেউ পারবে না। তাই কনক আমি তোমার শরণ নিয়েছি ”

অভিনেত্রী এ কথায় একটু আত্মপ্রসাদ অনুভব করিল। বলিল—আচ্ছা, আমি চেষ্টা করব। কোনও রকম দায়ে বিপদে পড়ব না ত খগেন বাবু ?”

“দায় বিপদ কিসের ? তোমায় খুনও করতে হবে না—জালও করতে হবে না, চুরিও করতে হবে না—দায় কিসের ? তুমি মুখের কথা বলবে মাত্র। আমার ভাগ্য যদি নিতান্ত মন্দ হয়, তবে বড় জোর সে তোমার উপর অসন্তুষ্ট হয়ে তোমায় বিদায় করে দেবে। করে, করবে—তুমি ঘরের ছেলে—অর্থাৎ ঘরের মেয়ে—ঘরে ফিরে আসবে।”

কনকলতা বসিয়া ভাবিতে লাগিল। খগেন্দ্র সিগারেট কেসটি খুলিয়া আর একটি সিগারেট কনককে দিল, একটি নিজে আবার ধরাইল। এই ভাবে নীরবে প্রায় দুই তিন মিনিট কাটিল। কনক তখন জিজ্ঞাসা করিল—“আচ্ছা, তার বয়স কত শুনেছেন ?”

“খবর পেয়েছি—তেইশ চব্বিশ।”

“কতদিন বিধবা হয়েছে ?”

“বলতে গেলে আজন্ম বিধবা। যখন আট বৎসর বয়স তখন তার বিবাহ হয়। মাস দুই পরে তার বালক-স্বামী নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। তার পর থেকে চৌদ্দ বছর সে সধবার বেশেই ছিল। দুবৎসর হল তার শ্বশুরের মৃত্যু হয়েছে। শ্রাদ্ধে বড় বড় পণ্ডিতেরা এসেছিলেন, তাঁরা বিধান দিলেন, যে ব্যক্তি চৌদ্দ বছর নিরুদ্দেশ, সে মরে গেছেই ধরতে হবে। কুশ পুত্তল দাহ করে তার শ্রাদ্ধ করা আবশ্যক। তাই হল,—সেই অবধি—অর্থাৎ এ দুবছর—বউরাণী বিধবার বেশ ধারণ করেছে।”

“সংসারে আর কে কে আছে ?”

“এক বুড়ো শাশুড়ী। একটি দেওর ছিল, সেও মরে গেছে। আর কেউ নেই। একলা থাকতে পারে না, তাই কাগজে ঐ বিজ্ঞাপন দিয়েছে।”

কনকলতা সংবাদপত্রখানি উঠাইয়া বিজ্ঞাপনটি দ্বিতীয়বার পাঠ করিল।

বলিল—"আচ্ছা—আমি না হয় নিষ্ঠাবতী হিন্দুবিধবা সেজে দরখাস্তই করলাম। আমাকেই যে চাকরি দেবে তার স্থিরতা কি?"

"স্থিরতা অবিশ্যি নেই। তবে সম্ভাবনা খুব বেশী। যদি ব্রাহ্ম বা খৃষ্টান মেয়ে চাইত, তাহলে ভাল লেখাপড়া জানে, ভাল গাইতে বাজাতে পারে, অথচ গরীবের ঘরের ভাল মেয়ে, পেতে পারত। কিন্তু নিষ্ঠাবতী হিন্দুবিধবাটিও হবে অথচ ভাল লেখাপড়া গান বাজনা জানবে, এমন সোণার পাথরবাটি কোথায় আছে? তুমি দরখাস্ত করলে নিশ্চয়ই তোমার হবে।"

"আচ্ছা--২৫৲ জলপানি বলেছে কেন?"

"বেতন বল্লে পাছে রূঢ় শোনায়—হিঁদুর মেয়ে রাজি না হয়"।

"দুজন বড় বড় লোকের প্রতিষ্ঠাপত্র চাই যে লিখেছে—তার কি হবে?"

"আমি যোগাড় করে দেব—তার জন্যে চিন্তা নেই।"

"কবে দরখাস্ত করতে হবে?"

"যত শীঘ্র হয়। আমি একটা মুসাবিদা প্রস্তুত করে এনেছি।"—বলিয়া খগেন্দ্র চারি পৃষ্ঠা লেখা একখানা চিঠির কাগজ বাহির করিয়া কনকের হাতে দিল।

কনক সেটি পাঠ করিতে লাগিল—আর মাঝে মাঝে হাসিয়া উঠিতে লাগিল। বলিল—"উঃ—এত মিথ্যেকথাও আপনি লিখেছেন খগেন বাবু!"

কনকের পাঠ শেষ হইলে খগেন্দ্র বলিল—"বল, তুমি রাজি?"

কনক বলিল—"আমায় আজ সারাদিনটা সময় দিন। আমি ভেবে চিন্তে সন্ধেবেলায় আপনাকে বলব।"

খগেন্দ্র ঘড়ির পানে চাহিয়া দেখিল—প্রায় সাড়ে এগারোটা। উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"বেশ—মুসাবিদাটা তুমি রাখ। ভেবে চিন্তে দেখ। যদি দরখাস্ত করাই স্থির কর, তবে ওটা ভাল করে নকল করে রেখ। সন্ধেবেলা এসে আমি নিয়ে যাব।"

কনকলতাও উঠিয়া দাঁড়াইল। হাসিতে হাসিতে বলিল—"আচ্ছা—ভেবে দেখি। যদি এ কাযে হাত দিই, আর সফলই হই,—তা হলে ঘটকালিটে কি পাব বলুন দেখি?"

খগেন্দ্র বলিল—"তুমিই বল।"

কনক চাপাহাসির সহিত বলিল—"বিশ হাজার—আর, কলকাতায় একখানা ভাল বাড়ী।"

"তথাস্তু"—বলিয়া খগেন্দ্র দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল।

কনক বলিল—"আমার মাথা গরম হয়ে গেছে। আর একটা সিগারেট্ দিন।"

সিগারেট দিয়া, খগেন্দ্র প্রস্থান করিল।

বৈকালে একটু ঘুরিয়া দুইখানি প্রতিষ্ঠাপত্র সংগ্রহ করিয়া, সন্ধ্যার পর খগেন আবার ফিরিয়া আসিল দেখিল—কনক দরখাস্তখানি নকল করিয়া রাখিয়াছে। সেখানি লইয়া বলিল—"আমার মুসাবিদাটা?"

কনক বলিল—"ওটা আমার কাছে থাক্ না।"

"তুমি নিয়ে কি করবে?"

"আমি রেখে দেব।"

খগেন্দ্র একটু হাসিল। বলিল—"যদি বেইমানি করে' তোমার ঘটকালি ফাঁকি দিই—তাই আমার হাতের লেখায় আমার বিরুদ্ধে একটা প্রমাণ সংগ্রহ করে রেখে দিলে?"

কনক হাসিয়া বলিল—"না—না খগেনবাবু তা নয়। আপনার হাতের একটা চিহ্ন থাকল।"

খগেন্দ্র বলিল—"বেশ, রেখে দাও। কোনও ভয় কোরো না—তোমায় আমি ফাঁকি দেব না কনক। জেনো, চোরেদের মধ্যেও ইমান বলে একটা জিনিষ আছে। নৈলে কি চোরেরই ব্যবসা চলে?"—বলিয়া খগেন্দ্র বিদায় গ্রহণ করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

এ আবার কে?

গঙ্গার উপরেই বাগুলিপাড়ার বাবুদের সুপ্রশস্ত বাসভবন। বাটীর পশ্চাতে, অনেকটা স্থান ঘিরিয়া অন্তঃপুরের বাগান—তাহাতে দেশী ও বিলাতী ছোটবড় নানাজাতীয় ফল ও ফুলের গাছ, পাতাবাহারের গাছ, লতামণ্ডপ শোভা পাইতেছে। বাগানটি গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত প্রসারিত। ফল ও ফুলগাছ ছাড়া অনেকগুলি অন্যান্য গাছও আছে, বরং গঙ্গার কাছাকাছি এই সকল গাছেরই প্রাচুর্য্য। স্থানে স্থানে মর্ম্মরমণ্ডিত আসন-বেদিকা।

তাঁহার পরিধানে একখানি শ্বেতবস্ত্র—গাত্রে নামাবলী জড়ান। যুবতীর মুখের উপর উষার আলোক পড়িয়া সেই কমনীয় মূর্ত্তি কমনীয়তর করিয়া তুলিল। তাঁহার দক্ষিণহস্তে একটি ফুলের সাজি—বামহস্ত রিক্ত। ইনি আর কেহ নহেন—বাগুলিপাড়া জমিদার বাটীর বধূরাণী শ্রীমতী ইন্দুমতী দেবী—আপাততঃ সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র সত্বাধিকারিণী। তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রৌঢ়বয়স্কা একজন ঝিও বাহির হইল। তাহার হস্তে বস্ত্রাদি ও গামছা রহিয়াছে।

বউরাণী ধীরে ধীরে বাগানের পথ অতিক্রম করিয়া ঘাটের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ঝিও পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। উভয়েই নীরব। গাছে গাছে পক্ষীকুল উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে প্রভাতী গাহিতেছে। মৃদু সমীরণ ফুলবাস আহরণ করিয়া দিকে দিকে খেলিয়া বেড়াইতেছে।

বাগানের প্রান্তভাগে পরস্পর-সংলগ্ন দুইটী বাঁধা ঘাট। একটি পুরুষদিগের জন্য, একটি অন্তঃপুরিকাগণের ব্যবহারার্থ। শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত সোপানাবলী অবতরণ করিয়া জলমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। উভয় ঘাটের মধ্যভাগে পাথরে গাঁথা উচ্চ ব্যবধান।

বউরাণী যখন ঘাটের প্রথম সোপানে পৌঁছিলেন, তখনও উষালোক অস্পষ্ট। সেইখানে দাঁড়াইয়া দেখিতে পাইলেন, জল হইতে দুই তিনটি সোপান উর্দ্ধে কি একটা পদার্থ যেন পড়িয়া রহিয়াছে। তাহা মনুষ্য কি কোনও জন্তু কি কাষ্ঠখণ্ড, ভাল নজর হইল না। বউরাণীর মনে একটু ভয়ও হইল। সেইখানে থমকিয়া দাঁড়াইয়া, মুখ ফিরাইয়া ঝিকে বলিলেন—"হাবার মা—শীগ্‌গির আয়!"

হাবার মা সেখান হইতে দশ বারো হাত পশ্চাতে ছিল। এই কথা শুনিয়া দ্রুতগতি আসিয়া বলিল—"কেন বউরাণী?"

বউরাণী অঙ্গুলির দ্বারা জলের দিকে দেখাইয়া বলিলেন—"ওটা কি পড়ে রয়েছে বল্ দেখি?"

হাবার মার বয়স পঞ্চাশ পার হইয়াছিল। সে কেবল দেখিল, কালো রকম লম্বা রকম কি একটা পড়িয়া রহিয়াছে। বলিল—"ওমা তাই ত! ওটা কি গা বউরাণী?"

"আমি তোকেই ত জিজ্ঞাসা করছি। যা দিকিন, কাছে গিয়ে দেখে আয় পড়ে রয়েছে ওটা কি?"

হাবার মা চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিল—"না মা, আমি যেতে পারব না। কামড়ায় যদি?"

বউরাণী একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"আ মরণ! কামড়াবে কেন? বাঘও নয় ভালুকও নয়।"

"তবে কি ওটা?"

"আচ্ছা, তুই না পারিস, আমি গিয়ে দেখছি।"—বলিয়া বউরাণী সোপান অবতরণ করিতে উদ্যত হইলেন।

ঝি তাঁহার বস্ত্রাঞ্চল ধরিয়া ফেলিয়া বলিল—"যেও না মা, যেও না। ওটা কোনও জানোয়ার, জলে ভেসে এসেছে।—কি হয়ত কুমীর ডাঙ্গায় উঠে হয় ত গা শুকুচ্ছে। যদি কামড়ায় ত আর বাঁচবে না।"

বউরাণী সবলে ঝির কবল হইতে অঞ্চল মুক্ত করিয়া লইয়া, সাবধানে সোপান অবতরণ করিতে লাগিলেন। ঝিও, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চারি পাঁচটা সিঁড়ির ব্যবধানে নামিতে লাগিল।

বউরাণী যত অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ততই সেই পদার্থটি স্পষ্টতর হইয়া, মনুষ্যমূর্ত্তিবৎ প্রতীয়মান হইল। নিকটে গিয়া দেখিলেন—একজন স্ত্রীলোক—তাহার মুক্তকেশ মুখ-বক্ষের উপর পতিত রহিয়াছে।

বউরাণী ডাকিলেন—"ওগো—কে গা তুমি?"

কোনও উত্তর নাই।

ঝি পৌঁছিয়া বলিল—"ওমা, যা মনে করেছি তাই! জলে মড়া ভেসে এসেছে। আ হতভাগী ছারকপালী!—ভেসে ডাঙ্গায় ওঠবার আর জায়গা পেলিনে? উঠলি কি না শেষে আমাদের ঘাটে?"

বউরাণী বলিলেন—"ঝি, বোধ হয় মরেনি। ঐ দ্যাখ্, বুকের উপর যে চুলগুলি পড়ে রয়েছে—সে গুলি একটু একটু উঠছে নামছে। বুকটি বোধ হয় ধুক্ ধুক্ করছে।"

হাবার মার ক্ষীণচক্ষু সে স্পন্দনটুকু দেখিতে পাইল না। বলিল—"হ্যাঁ—বউরাণীর যেমন কথা! ও নাকি বেঁচে আছে!"

বউরাণী আরও কাছে গিয়া স্ত্রীলোকটির ললাট ও বক্ষ হইতে চুল সরাইয়া হস্ত দ্বারায় পরীক্ষা করিলেন। দেখিলেন, দেহে এখনও উত্তাপ আছে। বুকটি বাস্তবিকই ধুক ধুক করিতেছে। বলিলেন—"হাবার মা, এ বেঁচে আছে। শীগ্‌গির দৌড়ে বাড়ী যা। একে বাড়ীতে তুলে নিয়ে যাবার জন্যে লোকজন ডেকে আন্—আর কাউকে ছুটিয়ে দে ডাক্তার আনবার জন্যে। যা শীগ্‌গির যা—যত শীগ্‌গির পারিস্।"

হাবার মা তখন—"ওমা কি বিপদ হল গো !—হে হরি রক্ষে কর"—বলিতে বলিতে সাধ্যানুসারে বাগানের ভিতর দিয়া দৌড়িতে আরম্ভ করিল।

হাবার মা গামছা ও বস্ত্রাদি ঘাটের উপর ফেলিয়া গিয়াছিল। বউরাণী সেগুলি লইয়া আসিয়া, স্ত্রীলোকটির সিক্তবস্ত্র কষ্টে মোচন করিয়া লইলেন। গামছা দিয়া যথাসাধ্য তাহার গাত্র মার্জ্জনা করিয়া, একখানি শুষ্ক বস্ত্র তাহাকে পরাইয়া দিলেন। তাহার পর স্বীয় অঞ্চল দিয়া আবার তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন। ততক্ষণ একটু আলো হইয়াছিল। দেখিলেন তাহার গ্রীবার পশ্চাদ্ভাগ ব্যাপিয়া মাল্যের আকারে একটা রক্তবর্ণ চিহ্ন পড়িয়াছে—চর্ম্ম স্থানে স্থানে ক্ষত হইয়া অল্প অল্প রক্তপাতও হইতেছে।

ইতিমধ্যে হুম্ হুম করিয়া চারিজন বেহারা একটা পাল্কী আনিয়া ফেলিল। ইঙ্গিত পাইয়া, মৃতকল্প স্ত্রীলোকটিকে পাল্কীতে উঠাইয়া তাহারা বাটীর দিকে ছুটিল। বউরাণীও ক্ষিপ্রচরণে পশ্চাদ্গামিনী হইলেন।

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

সম্পাদকের কর্ত্তব্য।

(২)

টাকা-টাকা-টাকা !—ইহাই আজকাল সকল কার্য্যের মাপকাটি হইয়া পড়িয়াছে। অথচ,—কেবল মানুষেই টাকা রোজগার করিতে পারে ; টাকায় কথনও মনুষ্যত্ব উপার্জ্জিত হয় না। টাকার সাহায্যে মনুষ্যত্ব ক্রয় করা সম্ভবপর হইলে, আজ পৃথিবীর সকল ধনকুবেরের বাটীতে গণ্ডায় গণ্ডায় মানুষ মিলিত। তাহা হইলে, আজ মনুষ্যত্বের অপচয়ের ভাবনায় বিলাত বিচলিত হইত না, ফ্রান্স চিন্তিত হইত না, জর্ম্মণী চঞ্চল হইত না, মার্কিন প্রমাদ গণিত না। টাকায় মানুষ পাওয়া যায় না, পরন্তু মানুষের মতন মানুষ হইলে অনায়াসেই টাকা রোজগার করিতে পারে। এই ধ্রুবসত্যটি আমরা কিন্তু বুঝিয়াও বুঝি না। আমাদের সকল ব্যাপারের পশ্চাতেই টাকার হাহাকার নিত্য বিদ্যমান ! স্বদেশী করিব তাহাতেও টাকা ; ধর্ম্ম-সাধন করিব তাহার পশ্চাতেও টাকার সিকন্দরী গজ বিরাজ করিতেছে। মজা এই, যে টাকা রোজগার করিবে, যে উদ্‌যোগী পুরুষসিংহের প্রভাবে ধূলিমুষ্টি কনক-মুষ্টিতে পরিণত হইবে, তাহার ভাবনাই আমরা ভাবিতে ভুলিয়া যাই।

আমাদের কথাবার্ত্তা শুনিলে আমাদের নিবন্ধ-প্রবন্ধ পড়িলে মনে হয় যেন আমরা ইচ্ছা করিলেই অর্থোপার্জ্জন করিতে পারি; যেন আমরা উদাসীন আছি বলিয়াই ইউরোপের নানাজাতি ভারতবর্ষকে মন্থন করিয়া ধনরত্ন লইয়া যাইতেছে; যেন আমরা উপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছি বলিয়াই মারবাড়ি, ভাটিয়া, নাখোদা, পাঠান, কাব্‌লেওয়ালা প্রভৃতি ভারতের অন্য সকল প্রদেশের জাতিসকল বাঙ্গালায় আসিয়া কোটীশ্বর হইতেছে! আমরা যেন আবার একটু ইচ্ছা করিলেই ইংরেজের সমকক্ষ ধনশালী হইতে পারি। সেই ইচ্ছা শক্তিকে প্রকট করিবার চেষ্টায় কেহ বা দলে দলে যুবকগণকে ইউরোপে ও মার্কিণে পাঠাইতেছেন, কেহ বা ছেলেদের বিজ্ঞান শিক্ষা দিতেছেন, কেহবা আরও কত কি করিতেছেন। চেষ্টা ত হইতেছে নানামতে, পরন্তু ঘরে ক ঝুড়ি ঝুড়ি, টাকা আসিতেছে? যাহারা ইউরোপ ও মার্কিণ হইতে নানাবিধ শিল্পবিদ্যা শিখিয়া আসিতেছে, তাহাদের সকলেই কি দুইবেলা পেটভরিয়া খাইতে পাইতেছে? তাহাদের সকলেই কি সদ্য সদ্য কোঠা বালাখানা তৈয়ার করিতেছে? তাহার ত কিছুই হইতেছে না, অথচ তোমাদের টাকা-টাকা রব কোন মতেই বন্ধ হইতেছে না। প্রকৃতপক্ষে দেশে যতটা দারিদ্র আছে, তাহার দশগুণ হাহাকার উঠিয়াছে।

কথাটা এমন ভাবে পাড়িলাম কেন—জান? তোমরা সবাই দেশোদ্ধারের জন্য উন্মত্ত, সবাই সমাজসংস্কারের জন্য প্রমত্ত, সবাই জাতিসৃষ্টির জন্য বিহ্বল। তাই তোমরা জনে জনে মাসিক পত্র বাহির করিতেছ, প্রত্যেকেই নিজের খোস্ খেয়ালের কথা দেশের দশজনকে শুনাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছ। অথচ, কিসে কি হইল, কেন এমন হইল, সমাজের অবস্থা কি, সমাজ কি চাহে,—কোন শক্তির দ্বারা সমাজ এখন বিভ্রান্তভাবে পরিচালিত, এ সকল সমাচার তোমরা কেহ রাখ না;—বুঝিবা রাখিতেও জান না। তোমরা সবাই নিজের ভাবেই বিভোর নিজের বিদ্যায় নিজে বিহ্বল, নিজের লিখন-পদ্ধতিতে নিজেই মুগ্ধ। তোমাদের যাহা ভাল লাগে তোমরা সমাজকে তাহাই দিতে ব্যগ্র হও; একবার ভাবিয়া দেখ না যে, তোমার যাহা প্রিয় তাহা সমাজের প্রিয় হইতে পারে কি না, তুমি যাহা বুঝ সমাজ তাহাই বুঝিতে চাহে কি না, তুমি যাহা হইতে চাও বা হইতে পার, সমাজের সকলে তাহা হইতে চাহে কি না,—হইতে পারে কি না। এই প্রবল গ্রীষ্মে তুমি বরফ দিয়া সরবৎ পান করিতে ভালবাস, অর্থ-সামর্থ্য আছে বলিয়া

বেশ তোফা সরবৎ চুমুকে চুমুকে উপভোগ করিতেছ; কিন্তু তোমার পার্শ্বের কক্ষে তোমার ভ্রাতা ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা জ্বরে ছট্‌ফট্ করিতেছে, পিপাসায় কাতর হইয়া পড়িয়াছে। তাহার প্রতি অনুকম্পাপরবশ হইয়া যদি তাহাকে এক-গ্লাস অতি শীতল সরবৎ দেও, আর সে যদি তোমার কথা শুনিয়া এবং লোভে পড়িয়া সরবৎ পান করে, তাহা হইলে ভাইটিকে নিউমোনিয়া রোগগ্রস্ত হইতে হয়; কদাচিৎ বা দেহত্যাগের উপক্রম করিতে হয়। তুমি যাহা সমাজকে যোগাইতেছ, তাহা কি সমাজের উপযোগী? তাহা উপভোগ করিয়া ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগগ্রস্ত সমাজের দেহে নিউমোনিয়া দেখা দেয় নাই ত? এ খবর রাখ কি?

সম্পাদক হইয়াছ—বেশ কথা। কিন্তু তোমার পাঠক ও শ্রোতাদিগের কোন পরিচয় তুমি কখনও গ্রহণ করিয়াছ কি? তাহারা বর্ষে-বর্ষে তোমাকে টাকা যোগায়, তুমি মাসে-মাসে তাহাদিগকে কাগজ দেও। সে কাগজে যখন যাহা খুসী, যাহার যাহা খুসী, তাহাই লিখিয়া ছাপা হয়। কাগজের কাট্‌তির দিকে তোমার দৃষ্টি স্থির আছে বলিয়া, কোন্‌টা বিকায় এবং কোন্‌টা বিকায় না, তাহার একটু হিসাব তুমি রাখিয়া থাক। তাই যাহার লেখা বিকায় বলিয়া তোমার মনে হয়, তাহারই জুতার সুখতলা হইয়া তুমি থাক, যেন-তেন-প্রকারেণ তাহার নিকট হইতে প্রবন্ধ আদায় করিয়া ছাপিয়া দেও। সে লেখা কেবল চানাচুর কি না, সে চানাচুরের অতিপ্রচারে লোকের বিষম উদরাময় হইতে পারে কি না, এভাবনা তোমার নাই। তোমার কাগজ বিকাইলেই হইল, তোমার ঘরে টাকা আসিলেই হইল। ইহাই কি সম্পাদকের কর্ত্তব্য? এই কর্ত্তব্য সাধন করিবার জন্যই কি কলম ধরিয়াছিলে? টাকার সিকন্দরী গজে কি বাণীর সেবাটাও মাপিয়া লইতে হইবে? বলিব কি লজ্জার কথা সে দিন দেখিলাম কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ পত্রিকার জন্যও প্লাকার্ড মারা হইয়াছিল—হায় টাকা!

তুমি ব্রাহ্ম, তোমার বড় সাধ এই যে, তোমার যাহা ধর্ম্মমত তাহার অতিপ্রচার হউক; লোকে তোমার মতকে আদর করুক। এ সাধ দোষের নহে। তুমি হিন্দু, তোমারও বড় ইচ্ছা যে লোকে হিন্দু হউক, শাস্ত্র-বিশ্বাসী হউক, সদাচারপরায়ণ হউক। বেশ কথা। কিন্তু, এ সাধ, এই আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি করিবার উদ্দেশ্যে তুমি ব্যবসাদারীর চাল ধর কেন? ধর্ম্মের দোকানদারী কর কেন? বিলাসের সহিত আপোষ করিবার চেষ্টা কর

কেন? বসিয়াছ লোকশিক্ষার উচ্চাসনে; সে উচ্চাসন স্বাধিকারে চিরস্থায়ী রাখিবার দুরাশায় বারাঙ্গনাবিলাস বিভ্রম-বিমূঢ়তার এত বিকাশ ঘটাও কেন? আচার্য্য বেশ্যার সাজ অবলম্বন করিবে কেন? আসল কথা কি জান? পোড়া পেটের জন্য বহুরূপী সাজিতে হয়। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত বহুরূপীর ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া কোন দেশের কেহই ধনশালী হইতে পারে নাই। ভিক্টর হুগোর একখানা উপন্যাস আছে তাহার নাম 'The Man Who Laughs.' এই উপন্যাসে একটা বহুরূপীর জীবনচিত্র শব্দ-আলেখ্যে অতি উজ্জ্বলভাবে অঙ্কিত করা হইয়াছে। বাঙ্গালার ইংরেজিশিক্ষিত সমাজের দিকে তাকাইলেই ভিক্টর হিউগোর সেই বহুরূপীর কথা মনে পড়ে। বহুরূপীর বিদ্যা ছিল, বুদ্ধি ছিল, লাটিন গ্রীক জানা ছিল, গদ্য পদ্য রচনার অসীম সামর্থ্য ছিল, কেবল ছিল না অর্থ উপার্জ্জনের যোগ্যতা। বহুরূপী সদ্বক্তা ছিল, সুকবি ছিল, সুপণ্ডিত ছিল। তথাপি তাহাকে বহুরূপী সাজিয়া উদরান্নের সংস্থান করিতে হইত। আমাদেরও সব আছে; বিদ্যা আছে, বুদ্ধি আছে, গদ্যপদ্য লিখিবার শক্তি আছে; নাই কেবল মনুষ্য-সামান্য অর্থোপার্জ্জনের শক্তি। শক্তি নাই আমাদের, দোষ কিন্তু দিই দেশের লোকের; তাই দেশের দোহাই দিয়া, সমাজের দোহাই দিয়া, নানাভাবে নানারূপ ধরিয়া, একপ্রকার উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন করিয়া আমরা অন্নমুষ্টি অর্জ্জন করিয়া থাকি। তাই আমরা কেহ সম্পাদক, কেহ বক্তা, কেহ নেতা, কেহ কবি, কেহ লেখক, কেহ বা ধার্ম্মিক বা সমাজ-সংস্কারক। এত সাজ সাজিতেছি, পরন্তু টাকার মাপকাটিতে আমাদের কোন সাজই টিকিতেছে না। দুইদিন জোয়ারের ঠেলে দুইপয়সার মুখ দেখিতে পাই বটে, শেষে দারিদ্র্যের ভাঁটার টানে একেবারে নদীগর্ভ শুকাইয়া যায়, বত্রিশপঞ্জর বাহির হইয়া পড়ে। ইংরেজের সাময়িক, মাসিক, সাপ্তাহিক, দৈনিক পত্রসকল শতাব্দী পার করিল, কিন্তু আমাদের ব্যাঙের ছাতা এক এক বর্ষায় দলে দলে গজাইয়া উঠে, গ্রীষ্মে উহাদের চিহ্নমাত্র থাকে না, আবার নববর্ষায় দলে দলে আনাচে কানাচে বিকাশ পায়। ইহাই কি সাহিত্যসেবা?

ডিস্‌পেপ্‌সিয়া কেবল উদরেই হয় না, মস্তিষ্কেও হয়; বায়ুর প্রকোপ কেবল অন্ত্রের মধ্যেই ঘটে না, মস্তিষ্কের কক্ষে কক্ষে কুপিত বায়ু বিচরণ করে। তুমি সমাজ দেখিলে না, সমাজের সহিত মিশিলে না, সমাজের অভাব-অভিযোগের খবর রাখিলে না, টবের ফুলের মতন কেবল

লেখাপড়া শিখিলে, এখন শুকাইবার সময়ে, দারিদ্র্যের উত্তাপে ইংরেজী লেখা-পড়ার পাপড়িগুলি ঝরিয়া যাইবার কালে, তুমি সম্পাদক সাজিতেছ, নেতা বনিতেছ! কাজেই বলিতে হয় যে, ডিস্পেপ্সিয়া কেবল পেটেই হয় না, মাথাতেও হয়। প্রকুপ্ত বায়ুর প্রভাবে অনেককে মাথাভারি বা Top heavy হইতে হয়। দেশের সনাতন ভাঁড়ার ঘরে খুব পুরাতন তেঁতুল আছে। সে তিন্তিড়ী সর্ব্বরোগহর। যখন রক্তের তেজ কমিয়া যায়, মরণের ছায়া সম্মুখে আসিয়া পড়ে, তখন এই পুরাতন তেঁতুলের খোঁজ পড়ে। ভাঁড়ার খুঁজিয়া যখন সে সামগ্রী খুঁজিয়া পাও না, তখন জ্বালা নিবারণের জন্য নিজেই একটা রেচক-পাচক পদার্থ গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা কর! সে চেষ্টার পরিচয় পাই তোমার সম্পাদকতায়—নেতৃত্বে-বক্তৃত্বে। পেটেণ্ট ঔষধের মতন তোমার ভাগ্যগুণে একজীবনে একটা বড়ী খুব বিকাইতে পারে, পরন্তু মরণের সঙ্গে সঙ্গে উহা যে একেবারে যাইবে! হিন্দু-পেট্রিয়ট্, রইস্-রইয়ৎ, ইণ্ডিয়ান-নেশন্, সোমপ্রকাশ, ইণ্ডিয়ান মিরর্, নববিভাকর, বঙ্গদর্শন, আর্য্যদর্শন, বান্ধব, কল্পদ্রুম—কত নাম করিব; সকল বড়িই ত নষ্ট হইয়াছে। যখন নূতন বাহির হয়, তখন বিজ্ঞাপনের বাহারে মনে হয় গৃহস্থের গরু হারাইলেও উহার সাহায্যে পাওয়া যাইতে পারে; যখন ভাসিয়া যায় তখন গরুর মতনও ভাসিয়া যায় না, খড়কুটার মতন ভাসিয়া যায়। মধ্য হইতে দুইদিনের ইয়ারকী তোমরা বেশ করিয়া লও, কাঁচা পয়সার ঝাঁজে বেশ দুই দিন আমোদে কাটাও। ইহা সাহিত্যচর্চ্চা নহে, গুরুগিরিও নহে। ইহা খোস্খেয়ালের বাবুয়ানী। এ দেশে যে একবার গুরু হয় সে পুরুষানুক্রমে গুরুগিরি বজায় রাখিতে পারে। পুরাতন তেঁতুলের গুণই ঐ, যত রগড়াও ততই রস বাহির হয়, সিটে প্রায় থাকে না। কথাটা পরে খুলিয়া বলিব। আজ এই পর্য্যন্ত।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

শশাঙ্ক।

পাটলিপুত্রের প্রাচীন রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে একটি ক্ষুদ্রকক্ষে সন্ধ্যার অব্যবহিত পরে দুইজন উপবিষ্ট রহিয়াছেন। ক্ষুদ্র কক্ষটি নীলবর্ণের যবনিকায় আবৃত, গৃহতল সুকোমল বহুমূল্য পারসিক আস্তরণে আচ্ছাদিত। তাহার উপরে ক্ষুদ্র হস্তীদন্তনির্ম্মিত সিংহাসনে বৃদ্ধা মহাদেবী মহাসেনগুপ্তা বসিয়া

মানসী—

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শিকাগো
চৈত্র ১৩১৯
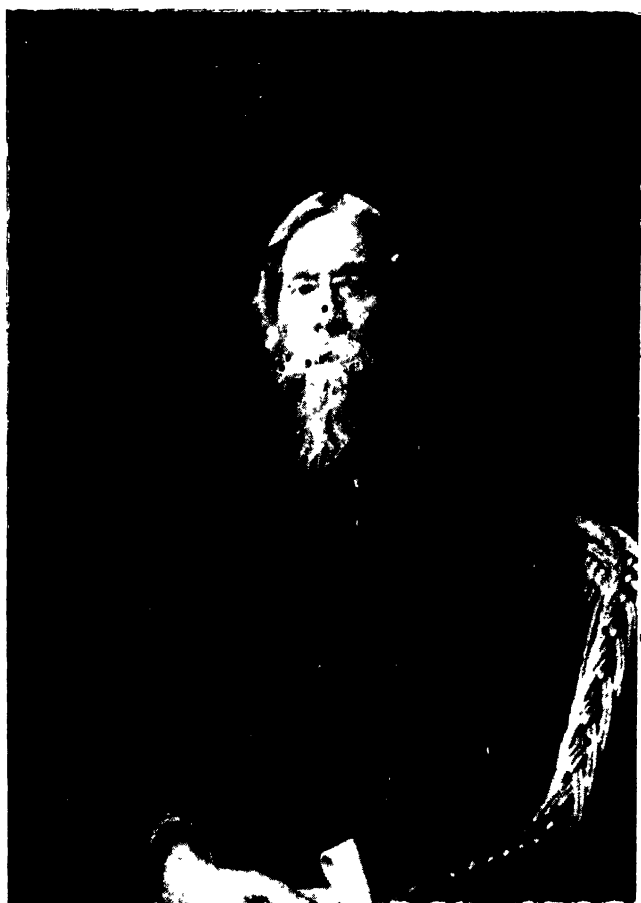
আছেন। তাঁহার সম্মুখে স্বর্ণসিংহাসনে বহুমূল্য পীতবর্ণের রাজভূষা পরিধান করিয়া সম্রাট প্রভাকরবর্দ্ধন উপবিষ্ট রহিয়াছেন। গৃহকোণে একটি ক্ষীণ গন্ধদীপ নীলবর্ণের স্বচ্ছ যবনিকার অন্তরাল হইতে গৃহের কিয়দংশ আলোকিত করিতেছিল। অন্ধকারে সিংহাসনে উপবিষ্ট মূর্ত্তিদ্বয় স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল না। মাতাপুত্রে অস্ফুটস্বরে কথোপকথন হইতেছিল। মহাদেবী বলিতেছিলেন "প্রভাকর তোমার এখন আর অত অধীর হইবার বয়স নাই, তুমি যৌবনসীমা অতিক্রম করিয়াছ। মগধ তোমার মাতামহের রাজ্য, এই গৃহ তোমার মাতামহ বংশের, আবার তুমি অতিথিস্বরূপ পাটলিপুত্র নগরে আসিয়াছ। তোমার মাতামহবংশ বহু প্রাচীন, আর্য্যাবর্ত্তে অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত, এখনও উত্তরাপথে তোমার পিতৃকুল দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে বলিয়া এবং ভাগ্যচক্রের পরিবর্ত্তনে তোমার পিতৃকুল উন্নতিলাভ করিয়াছে বলিয়া, অতিথিস্বরূপ মাতুলগৃহে আসিয়া তাঁহাকে অপমানিত করা সম্রাটপদধারী স্থান্বীশ্বররাজের উচিত কার্য্য হইবে কি ?"

মহাদেবী কথাগুলি অতি ধীরে ধীরে বলিতেছিলেন, তাঁহার স্বর এত মৃদু যে গৃহের বাহিরে থাকিয়া কোন ব্যক্তি চেষ্টা করিয়াও তাহা শুনিতে পাইত কিনা সন্দেহ।

প্রভাকরবর্দ্ধন উত্তেজিত হইয়া বলিতে যাইতেছিলেন "মহাদেবী আপনি অদ্যোপান্ত আমায় অভিযোগ——"

তাঁহাকে বাধা দিয়া মহাসেনগুপ্তা কহিলেন, "প্রভাকর, আমি তোমার মাতা, তুমি যাহা বলিতেছিলে তাহা আমি পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছি। পাটলিপুত্রের উচ্ছৃঙ্খল নাগরিকগণ যে একেবারে নির্দ্দোষ তাহা আমি বলিতে চাহি না; তবে তাহারা স্থান্বীশ্বরের সৈন্যগণের অত্যাচারদর্শনে উত্তেজিত হইয়া আমাদিগের শিবির আক্রমণ করিয়াছিল।"

বাধা পাইয়া স্থান্বীশ্বরের সম্রাটের কর্ণদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি বহু-কষ্টে মনোভাব গোপন করিয়া কহিলেন, "আপনার যাহা ইচ্ছা হয় করুন।"

মহা—"আমি তোমার সম্মুখে কল্যকার ঘটনার প্রধান প্রধান নায়কগণকে আহ্বান করিয়া বিচার করিতেছি, তুমি কোন কথা কহিও না। অবশ্যক হইলে আমাকে যবনিকার অন্তরালে আহ্বান করিও। তোমার কর্ম্মচারিগণ তোমাকে কি বলিয়াছে ?"

প্রভা—"একজন সেনা পথে একটা সুন্দরী দাসী ক্রয় করিয়াছিল, তাহাকে দেখিয়া নাগরিকগণ বলে যে সে নগরবাসী জনৈক বণিকের কন্যা। সেই দাসীর

অধিকার লইয়া সেনাগণ ও নাগরিকগণ বিবাদ করিতেছিল, এমন সময়ে কুমার শশাঙ্ক সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া একদল মগধসেনার সাহায্যে নিরস্ত্র স্থান্বীশ্বর সেনাগণকে বধ করিয়া শিবিরে অগ্নিসংযোগ করিয়াছে, নগরের অপর পার্শ্ব হইতে আমাদিগের সেনা আসিয়া পড়িবার পূর্ব্বে এই সকল কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে।”

মহা--“তোমার কর্ম্মচারিগণ তোমাকে যাহা বলিয়াছে তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা। কাহার কথা সত্য তাহা তোমার সম্মুখে দেখাইয়া দিতেছি।”

করতালিধ্বনি করিবামাত্র যবনিকার অন্তরাল হইতে একজন বৃদ্ধ পরিচারক গৃহে প্রবেশ করিল। মহাদেবী তাহাকে আদেশ করিলেন “মহাপ্রতীহার বিনয় সেনকে লইয়া আইস।” পরিচারক দুইবার অভিবাদন করিয়া যবনিকার অন্তরালে চলিয়া গেল, কিয়ৎক্ষণ পরে একটি যবনিকা উত্তোলন করিয়া পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল, একজন উজ্জ্বল লৌহবর্ম্মাবৃত পুরুষ গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া অভিবাদন করিল। মহাদেবী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “যে সেনা পাটলিপুত্রের পথে দাসী ক্রয় করিয়াছিল তাহার নাম কি?”

বর্ম্মা—“চন্দ্রেশ্বর, সে জালন্ধরের অশ্বারোহী সেনা।”

মহা—“তাহাকে লইয়া আইস।”

মহাপ্রতীহার দুইবার অভিবাদন করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। যবনিকা পুনরায় উত্তোলিত হইল, মহাপ্রতীহার চন্দ্রেশ্বরকে লইয়া প্রবেশ করিলেন। মহাদেবী তাহাকে দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার নাম কি?”

সেনা—“চন্দ্রেশ্বর সিংহ।”

মহা—“নিবাস কোথায়?”

সেনা—“জলন্ধর নগরে।”

মহা—“তুমি কি স্থান্বীশ্বরের সেনাদলভুক্ত?”

সৈনিক অভিবাদন করিল। মহাদেবী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি বারাণসী হইতে পাটলিপুত্রের পথে কোন দাসী ক্রয় করিয়াছিলে?”

সেনা—“হাঁ, পাটলিপুত্রবাসিগণ তাহাকে কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে।”

মহা—“কাহার নিকট ক্রয় করিয়াছিলে?”

সেনা—“পথে একজন বণিকের নিকট হইতে।”

মহা—“কত মূল্য দিয়েছিলে?”

সেনা—"দশ দিনার।"

মহা—"চলিয়া যাও। বিনয়সেন, অপহৃতা বালিকাকে লইয়া আইস।"

উভয়ে দুইবার অভিবাদন করিয়া গৃহ হইতে প্রস্থান করিল পরিচারক যবনিকার অন্তরাল হইতে প্রবেশ করিয়া যথারীতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া বলিল "দ্বারে সম্রাট মহাসেনগুপ্ত অপেক্ষা করিতেছেন।" তাহা শুনিয়াও .প্রভাকরবর্দ্ধন নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া ছিলেন,মহাদেবী ক্রুদ্ধা হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,"পুত্র,তোমার জ্ঞানবুদ্ধি লোপ পাইয়াছে? দ্বারে তোমার মাতুল দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া আইস।" প্রভাকরবর্দ্ধনের যেন হঠাৎ চৈতন্তোদয় হইল। তিনি ব্যস্ত হইয়া সিংহাসন হইতে উত্থিত হইলেন এবং কক্ষদ্বারে গিয়া মাতুলকে আহ্বান করিলেন। ইত্যবসরে পরিচারকগণ আর একখানা সুখাসন স্থাপন করিয়াছিল। উভয়ে গৃহমধ্যে উপবিষ্ট হইলেন।

মহা—"ভাই, তুমি যে কারণেই আসিয়া থাক, এখন কোন কথা কহিও না, বিচার করিতেছি, শ্রবণ কর।"

মহাপ্রতীহার বিনয়সেন পূর্ব্বপরিচিতা বালিকাকে লইয়া গৃহে প্রবেশ করিল। বিনয়সেনের আদেশমত বালিকা, ভূমিষ্ঠা হইয়া তিনজনকে প্রণাম করিল।

মহা। "তোমার নাম কি?"

বালিকা। "গঙ্গা"

মহা। "তোমরা কি জাতি?"

বলিকা। "ক্ষত্রিয়।"

মহা। "তোমার পিতার নাম কি?"

বালিকার নয়নদ্বয় আর্দ্র হইয়া আসিল। সে উত্তর করিল, "যজ্ঞবর্ম্ম।"

মহাদেবী বালিকার নয়নদ্বয় জলভারাক্রান্ত দেখিয়া দয়ার্দ্রস্বরে তাহাকে আশ্বাস দিবার জন্য কহিলেন, "তোমার কোন ভয় নাই, আর কেহ তোমাকে কিছু বলিবে না। তোমাদিগের নিবাস কোথায়?"

বালিকার গণ্ডস্থল বহিয়া অশ্রুজল পড়িতে আরম্ভ করিল, সে রুদ্ধকণ্ঠে উত্তর করিল "চারণাদি দুর্গে।"

সম্রাট মহাসেনগুপ্ত এতক্ষণ নিশ্চল পাষাণের ন্যায় সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন, গৃহমধ্যে যে কথোপকথন হইতেছিল তাহার অধিকাংশ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ লাভ করিতেছিল না, "যজ্ঞবর্ম্ম" ও "চারণাদিদুর্গ" এই দুইটি কথা শ্রবণ করিয়া

তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। তিনি হঠাৎ বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বলিলে, চারণাদিদুর্গ ? তোমার পিতার নাম যজ্ঞবর্ম্মা ? কোন যজ্ঞবর্ম্মা ? মৌখরীনায়ক শার্দ্দুলবর্ম্মার পুত্র ?" বালিকা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "হাঁ"। সম্রাট কি বলিতে যাইতেছিলেন, মহাদেবী তাঁহাকে বাধা দিয়া মহাপ্রতিহারকে প্রধানা মহল্লিকাকে ডাকিবার জন্য আদেশ করিলেন। বিনয়সেন তিনবার অভিবাদন করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল ও নিমিষের মধ্য মহল্লিকাকে লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল। মহাদেবী আদেশ করিলেন "বালিকাকে লইয়া যাও, সান্ত্বনা করিয়া লইয়া আইস।" তাহার পর সম্রাটের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি যজ্ঞবর্ম্মা সম্বন্ধে কি বলিতেছিলে ?" সম্রাট দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, "দেবী, সে বহুদিনের কথা, তখনও সাম্রাজ্যের সম্ভ্রম ছিল, আমার বাহু তখনও শীর্ণ হয় নাই, তখন যজ্ঞবর্ম্মার নামে উত্তরাপথ কম্পিত হইত। স্মরণাতীত কাল হইতে মৌখরীবংশের এক শাখা বংশপরম্পরায় চরণাদিদুর্গরক্ষায় নিযুক্ত ছিল। ভট্ট ও চারণগণের মুখে শুনিয়াছি, মহারাজাধিরাজ সমুদ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক তাহাদিগকে চারণাদি দুর্গ রক্ষার ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। প্রথম কুমারগুপ্ত ও স্কন্দগুপ্তের সময়ে যখন বন্যার ন্যায় হূণ সেনা উত্তরাপথ প্লাবিত করে তখন সাম্রাজ্যের সেই ঘোর দুর্দ্দশার সময়ে মৌখরী দুর্গস্বামিগণ কিরূপে দুর্গরক্ষা করিয়াছিল তাহা চারণগণ এখনও পথে পথে গাহিয়া বেড়ায়। ভগিনি, বাল্যস্মৃতি কি তোমার মন হইতে দূর হইয়া গিয়াছে ? বৃদ্ধ যদু ভট্ট এমনও জীবিত আছে। বিবাহের পূর্ব্বে গঙ্গা-সৈকতে বসিয়া ভাইভগ্নী বৃদ্ধ ভট্টের গান শুনিতে শুনিতে আত্মবিস্মৃত হইয়া যাইতাম, তাহা কি ভুলিয়া গিয়াছ ?" সম্রাট্ সিংহাসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন "মৌখরী নরবর্ম্মা কিরূপে দুর্গরক্ষা করিয়াছিল, তাহা কি বিস্মৃত হইয়াছ ? আমি যদুভট্টের স্বর এখনও স্পষ্ট শুনিতে পাইতেছি। যখন জলাভাবে ও অন্নাভাবে সমস্ত সেনা অবসন্ন হইয়া পড়িল তখনও বীর নরবর্ম্মা ভীত হয় নাই। শিশুপুত্রত্রয় পিপাসায় অধীর হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেও নরবর্ম্মা বিচলিত হয় নাই। বীরগণ, মৌখরী বীর কি বলিয়াছিল শ্রবণ কর। মৌখরীবংশ সমুদ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত, সমুদ্রগুপ্তের বংশধর ব্যতীত দুর্গে কাহারও প্রবেশাধিকার নাই। যতক্ষণ পর্য্যন্ত একজন মৌখরী থাকিবে ততক্ষণ সম্রাট ব্যতীত আর কেহ সসৈন্যে দুর্গে প্রবেশ করিবে না। বীরগণ, মৌখরী বীর যাহা করিয়াছিল তাহা আর্য্যাবর্ত্তে নূতন নহে, শত শত দুর্গে, শত শত যুদ্ধে বিদেশীয় সেনা বিস্ময়স্তিমিত নেত্রে তাহা দেখিয়াছে। চাহিয়া

দেখ মৌখরী কুলনারীর রক্তে দুর্গপ্রাঙ্গন প্লাবিত হইয়াছে। ছিন্নশীর্ষ শিশুকুল বৃন্তচ্যুত কুসুমের ন্যায় কঠিন পাষাণ আস্তরণের উপর পতিত রহিয়াছে। মৌখরী বীরগণ কোথায়? তাহারা কি পত্নী, মাতা ও ভগিনীর জন্য বিলাপ করিতেছে? চাহিয়া দেখ দুর্গপ্রাকারে গরুড়কেতন উর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছে। মৌখরী বীরগণ রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া উল্লাসে চীৎকার করিতেছে, কণ্ঠে রক্তজবার মাল্য ধারণ করিয়া রক্তচন্দনে চর্চ্চিত হইয়া বীর নরবর্ম্মা স্বয়ং গরুড়ধ্বজ হস্তে সৈন্য চালনা করিতেছেন। তাঁহার জয়ধ্বনি শ্রবণ করিয়া সহস্র হস্ত নিম্নে হূন কম্পিত হইতেছিল। ভীষণ হুঙ্কার শ্রবণ করিয়া পশুপক্ষী উপত্যকা পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতেছিল, বীর নরবর্ম্মা তখন নিশ্চিন্ত হইয়াছেন, ইহজন্মের মত তাঁহার মন হইতে পুত্রকলত্রের চিন্তা দূর হইয়াছে। মানুষে যাহা করিতে পারে নরবর্ম্মা তাহা করিয়াছিলেন, যাহা মানবের অসাধ্য তাহা তিনি পারেন নাই। দেখিতে দেখিতে হূনসেনা দুর্গপ্রাকারে উঠিয়া পড়িল, কিন্তু একজন মৌখরী জীবিত থাকিতে তাহারা দুর্গে প্রবেশ করিতে পারে নাই। নরবর্ম্মা ও তাঁহার সহচরবর্গ দুর্গপ্রাকারে চিরনিদ্রিত হইলে হূনসেনা দুর্গ অধিকার করিয়াছিল। দেবি, শার্দ্দূলবর্ম্মাকে বিস্মৃত হইয়াছ কি? পিতার সিংহাসন পার্শ্বে পরশুহস্তে যে বিশালকায় যোদ্ধা দাঁড়াইয়া থাকিত তাহাকে মনে আছে কি? যজ্ঞবর্ম্মাকে আমার স্মরণ আছে, তাহার হস্তে খড়্গ না থাকিলে আমি সরযূতীরে সুস্থিতবর্ম্মার হস্তে নিহত হইতাম। তাহার কন্যা"— বাত্যাহত কদলীবৃক্ষের ন্যায় সম্রাট মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। প্রভাকরবর্দ্ধন তাঁহাকে ধারণ না করিলে আঘাত আরও গুরুতর হইত। মহাপ্রতিহারের আহ্বানে প্রাসাদের পরিচারকবর্গ আসিয়া তাঁহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার জ্ঞানোদয় হইল, তখন তিনি সলজ্জভাবে ঈষৎ হাসিয়া ভগিনীকে কহিলেন "দেবি, আমি বিচারে বাধা প্রদান করিব না। জরা আমাকেও স্পর্শ করিয়াছে, কেশ শুভ্র হইয়াছে, দেহ শক্তিহীন হইয়াছে, তাহার সহিত মানসিকশক্তিও হ্রাস হইয়াছে, আপনি আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন।"

মহা। "ভাই, তুমি অসুস্থ হইয়াছ, গৃহান্তরে গিয়া বিশ্রাম কর, আমি একাই বিচারকার্য্য শেষ করিব"

সম্রাট। "দেবি, বাহুযুদ্ধে সাম্রাজ্যের জন্য মৌখরীগণ রক্তপাত করিয়াছে, যজ্ঞবর্ম্মা স্বয়ং বাহুযুদ্ধে আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছে, খড়্গ উপাধান করিয়া

বহু অভিযানে একত্র রজনী যাপন করিয়াছি। মহাসম্ভ্রান্ত মৌখরীমহানায়কের কন্যা কিরূপে সামান্য সৈনিকের দাসী হইল তাহা শ্রবণ করিবার জন্য উৎসুক হইয়া বসিয়াছি!"

মহাদেবী উত্তর না করিয়া ভ্রাতার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন ও মহাপ্রতীহারকে কহিলেন "পৃথুদকের পদাতিক সেনার নায়ক রত্নসিংহকে ডাকিয়া আন ও তাহার সহিত বালিকার ভ্রাতাকেও লইয়া আইস।"

রত্নসিংহ ও বালককে লইয়া বিজয়সেন প্রত্যাগমন করিলে মহাদেবী রত্নসিংহকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার নাম রত্নসিংহ"?

রত্ন। "হাঁ"।

মহা। "তুমি কি কার্য্য করিয়া থাক?"

রত্ন। "আমি পৃথুদকের পদাতিক সেনানায়ক"।

মহা। "তুমি কল্য প্রাতে নগরের কোন বিপণিতে আহার্য্য ক্রয় করিতে গিয়াছিলে"?

রত্ন। "হাঁ। আমার অধীনস্থ সেনাশতকের পরিদর্শন শেষ হইলে গৌল্মীকের আদেশক্রমে এই বালকের পিতার বিপণিতে তণ্ডুল ক্রয় করিতে গিয়াছিলাম।"

মহা। "বিপণিস্বামী যে বালকের পিতা তাহা তুমি কিরূপে জানিলে?"

রত্ন। "আমি যে সমস্ত দ্রব্য ক্রয় করিয়াছিলাম তাহার ভার অধিক হওয়ায় বিপণিস্বামী বলিল যে আমার পুত্র তোমার সহিত গিয়া ইহা পৌছাইয়া দিয়া আসিবে।"

মহা। "তুমি পূর্ব্বে কখনও ইহাদিগকে দেখিয়াছ?"

রত্ন। "না"।

মহা। "পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াও। বিজয়সেন; বিপণিস্বামী উপস্থিত আছে?"

বিজয়। "সে পণ্য ক্রয় করিতে আদেশ দিয়াছে, তাহার উপপত্নী উপস্থিত আছে"।

মহা। "তাহাকে লইয়া আইস।"

বিজয়সেন নিষ্ক্রান্ত হইলে মহাদেবী বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার নাম কি?"

বালক। "অনন্তবর্ম্মা"

মহা। "মৌখরীবংশীয় যজ্ঞবর্ম্মা তোমার পিতা?"

বালক ঘাড় নাড়িয়া বলিল হাঁ"।

মহা। "তোমরা কি চারণাদিদুর্গে বাস করিতে?"

বালক। "হাঁ, কিছুদিন পূর্ব্বে আমার খুল্লতাতপুত্র অবন্তীবর্ম্মা আমাদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছেন।"

মহাসেনগুপ্তা এতক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়াছিলেন, এই সময়ে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন" দুর্গবাসী সেনা কি তোমার পিতার বিপক্ষাচরণ করিয়াছিল?"

বালক। "না, পিতা বলিতেন থানেশ্বরের রাজা গোপনে সাহায্য না করিলে আমার খুল্লতাতপুত্র কখনই আমাদিগকে দুর্গ হইতে তাড়াইতে পারিত না। পিতা সাহায্যের জন্য পাটলিপুত্রে দূত পাঠাইয়াছিলেন কিন্তু সম্রাট সাহায্য করেন নাই"।

প্রভাকরবর্দ্ধনের মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, লজ্জায় মহাসেনগুপ্তের মুখ অবনত হইল, মহাদেবী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন "দুর্গ অধিকৃত হইলে তোমরা কি করিলে ?"

বালক। "পিতা আমাকে ও দিদিকে লইয়া সাহায্যের জন্য সম্রাটসকাশে আসিতেছিলেন পথে—"

বালকের স্বর গম্ভীর হইয়া আসিল, তাহার নীল নয়নদ্বয় জলে ভরিয়া আসিল। তাহা দেখিয়া, মহাদেবী তাহাকে ক্রোড়ে টানিয়া লইলেন, বালক শীর্ণ বক্ষে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল। ইত্যবসরে বিজয়সেন আমাদিগের পূর্ব্বপরিচিতা বিপনীস্বামিনীকে লইয়া ফিরিয়া আসিল। সে গৃহে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই মধুকরগুঞ্জনের ন্যায় মৃদু শব্দ করিতেছিল, গৃহে প্রবেশ করিয়াই চীৎকার করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল, পশ্চাৎ হইতে একজন প্রতীহার তাহাকে আঘাত করিলে তাহার কণ্ঠস্বর একটু নামিল। সে বলিল যে সে কোন অপরাধ করে নাই, তাহাকে বিনা অপরাধে ধরিয়া আনা হইয়াছে, তাহার শোকের বেগ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে দেখিয়া বিজয়সেন তাহাকে নিস্তব্ধ হইতে আদেশ করিল। মহাদেবী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার নাম কি ?"

রমণী। "আমার নাম যূথিকা, আমার মায়ের নাম—"

বিজয়। "যাহা জিজ্ঞাসা করা হইতেছে তাহারই উত্তর দে।"

রমণী নিরুপায় হইয়া নীরব হইল। প্রভাকরবর্দ্ধন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এই বালক তোমার পুত্র" ? রমণী অবসর পাইয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল "ও আমার সাতপুরুষের পুত্র নয় বাবা। আমাদিগের বংশের চৌদ্দপুরুষের মধ্যে কাহারও পুত্র নাই, সবই মেয়ে। লক্ষীছাড়া মিন্সে কোথা থেকে এই ছোঁড়াকে জুটিয়ে—"

প্রতীহারকর্ত্তৃক প্রহৃত হইয়া রমণী নীরব হইল, মহাদেবী তাহার কথা শুনিয়া হাসিতেছিলেন, সে নীরব হইলে জিজ্ঞাসা করিলেন "যাহাকে মিন্সে বলিতেছ সে কি তোমার স্বামী ? রমণী বলিল "গোবিন্দ, গোবিন্দ, আমার স্বামী অনেক দিন মরিয়া গিয়াছে। উহার সহিত অনেক দিনের আলাপ, গ্রাম হইতে জিনিষপত্র আনিয়া আমার নিকট বিক্রয় করে এবং নগরে আসিলে আমার গৃহে থাকে। মহাদেবী বলিলেন "বুঝিয়াছি, তুমি যাইতে পার।" রমণী দ্বিতীয় কথার অপেক্ষা না করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। তখন মহাদেবী বালককে ক্রোড়ে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমরা কি পদব্রজে চারণাদ্রি হইতে পাটলিপুত্রে আসিতেছিলে ?"

বালক। "হাঁ, অবন্তিবর্ম্মা আমাদিগের যথাসর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়াছে। পিতার একজন বৃদ্ধ পরিচারক একটি গর্দ্দভ দিয়াছিলেন, তাহাও অবন্তিবর্ম্মার ভয়ে গোপনে আমি তাহাতে চড়িয়া আসিতেছিলাম। পিতা ও দিদি হাঁটিয়াই আসিয়াছিলেন।"

মহা। "তার পর?"

বালক। একদিন পথে বৃষ্টি আসিল, কোন গ্রামে আশ্রয় পাইবার পূর্ব্বে সন্ধ্যা হইয়া গেল, পিতা আমাদিগকে লইয়া এক আম্রবৃক্ষের নিম্নে আশ্রয় লইলেন। পথে অনেক অশ্বারোহী সেনা আসিতেছিল, তাহাদিগের মধ্যে কয়জন বৃক্ষের দিকে আসিতেছে দেখিয়া পিতা যেমন বৃক্ষের আশ্রয় ছাড়িয়া বাহির হইয়াছেন অমনই তাহাদিগের একজন বর্শা দিয়া পিতাকে মারিয়া ফেলিল"। বালক আর বলিতে পারিল না, কাঁদিতে লাগিল।

মহাদেবী বিজয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিল "নায়ক রত্নসিংহ চলিয়া যাইতে পারে"। নায়ক তিনবার অভিবাদন করিয়া নির্গত হইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে বালক প্রকৃতিস্থ হইলে মহাদেবী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন "তাহার পর কি হইল?"

বালক। "অশ্বারোহিগণ দিদিকে ধরিয়া লইয়া গেল, গর্দ্দভটা আমাকে লইয়া পলায়ন করিয়াছিল, প্রভাতে একজন বণিক আমাকে দেখিতে পাইয়া নগরে লইয়া আসিল। যে সৈনিকপুরুষ এখনই চলিয়া গেল সে তাহার বিপণি হইতে তণ্ডুল ক্রয় করিতে যাইতেছিল। আমি পথে দিদিকে দেখিতে পাইয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বসিয়াছিলাম, তাহার পর একজন দেবতা আমাদিগকে এখানে আনিয়াছেন"।

সম্রাট মহাসেনগুপ্ত সিংহাসন হইতে উঠিয়া বলিলেন "দেবি যজ্ঞবর্ম্মার পুত্র আমার অবশ্য প্রতিপাল্য। বালক তোমার কোন ভয় নাই, আমি স্বয়ং তোমাকে রক্ষা করিব"।

বালক। পিতা বলিতেন আমি যদি মরিয়া যাই, অনন্ত, তাহা হইলে সম্রাট মহাসেনগুপ্তের আশ্রয় গ্রহণ করিও, আর কাহারও নিকট যাইও না। আপনি কে আমি জানি না, আমি সম্রাটের নিকট যাইব"।

বৃদ্ধ সম্রাটের শীর্ণ গণ্ডস্থল বহিয়া অশ্রুধারা ঝরিতে লাগিল, তিনি কম্পিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন "পুত্র, আমি জীবনদাতাকে বিস্মৃত হইয়াছিলাম। কিন্তু যজ্ঞবর্ম্মা আমাকে বিস্মৃত হয় নাই; আমারই নাম মহাসেন গুপ্ত।" বালক সম্রাটের পদতলে লুটাইয়া পড়িল, সম্রাট তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তখন মহাদেবী মহাসেনগুপ্তা কহিলেন "প্রভাকর, আমার বিচার শেষ হইয়াছে, তুমি কি কিছু বলিতে চাহ?" লজ্জায় অবনতবদন হইয়া সম্রাট উত্তর করিলেন "মাতা, আমারই ভুল, আপনি আমাকে মার্জ্জনা করুন, আমি একাই চন্দ্রেশ্বরের দণ্ডবিধান করিতেছি"।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

মানসী

৫ম ভাগ শ্রাবণ, ১৩২০ সাল ৬ষ্ঠ সংখ্যা

অভয়ের কথা।

সদ্ব্যাপ্তি

(৩)

দ্বিতীয় প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, আত্মা আপনাকে অস্বীকার করিতে পারে না, "আমি নাই" বলা চলে না ; "আমি নাই" বলিলেও বক্তা-আমির লোপ সিদ্ধ হয় না। শব্দের জ্ঞাপকত্ব আছে, কারকত্ব নাই। যাহা নাই তাহা সৃষ্টি করিবার শক্তি, বা যাহা আছে তাহার অপলাপ করিবার সামর্থ্য, শব্দের নাই। শব্দ-অস্তি-আত্মার নিষেধ করিতে পারে না, জ্ঞাপন করিতে পারে। বুদ্ধ বলিয়াছেন বটে যে, আত্মার উচ্ছেদ শব্দ-উপদেশ দ্বারা করা যায় ; কিন্তু যে বস্তুর তিনি উচ্ছেদ করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন এবং বিচার দ্বারা, যাহার উচ্ছেদ করিতে সমর্থও হইয়াছিলেন তাহা বিম্ব নহে ; তাহা প্রতিবিম্ব মাত্র, তাহা I নহে, তাহা me মাত্র ; তাহা দ্রষ্টা নহে, তাহা দৃশ্য মাত্র ; তাহা আত্মা নহে, তাহা আত্মার নকল মাত্র।

বুদ্ধ বলেন যে পৃথক্ পৃথক্ বিজ্ঞান গুলি, নানাবিধ পুষ্পের মত এবং সেই বিজ্ঞানগুলির ধারা, মালার মত। পুষ্পগুলি ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিলে যথা তৎসঙ্গে মালার অভাব আপনা আপনি হইয়া যায়, তদ্বৎ নানা বিজ্ঞান গুলির অভাব সম্পাদন করিতে পারিলে সেই বিজ্ঞানগুলির ধারাটীও অপরিহার্য্যরূপে অভাব-রূপ, অর্থাৎ নির্ব্বাপিত, হইয়া যায়। বুদ্ধের এ কথাটা সত্য কথা। আইস আমরা এই বিজ্ঞান-ধারাটার স্বরূপ বুঝিয়া লইব। ইহা আত্মা নহে, ইহা

বুদ্ধ, বুদ্ধ কেন সকলেই, বিচার সময়ে লঘু কল্পনাই স্বীকার করেন এবং কল্পনা-গৌরবকে দোষ বলিয়া ত্যাগ করেন। সহজে নাসিকা প্রদর্শন সিদ্ধ হইলে, মস্তকের পশ্চাৎদেশ দিয়া হস্ত ঘুরাইয়া নাসা প্রদর্শন করা অনাবশ্যক। পদ-সাহায্যে পলায়ন সম্ভব হইলে জানু-সাহায্যে, অর্থাৎ, হামাগুড়ি দিয়া পলায়ন করিবার প্রথা নাই।

বহির্দ্দেশে ঘটবস্তু আছে, তদবলম্বনে একটা মানসিক ঘটচ্ছবি হয় এবং সেই ঘটচ্ছবিটাই ঘট-বিজ্ঞান, এরূপ বলিলে কল্পনা-গৌরব হয়। বহির্দ্দেশে ও তত্রাবস্থিত ঘটবস্তুর কোনও অপেক্ষা না রাখিয়াই, ঘটবিজ্ঞান হইতে পারে এবং হয়ও তাহাই; ইহাই লঘু কল্পনা এবং বুদ্ধের অনুমোদিত। বুদ্ধমতে বিজ্ঞান গুলি স্বপ্নদৃশ্যবৎ, আলনস্কারের মনোরাজ্যবৎ, তাহারা আপনাদিগকে ব্যক্ত করিবার জন্য স্বাতিরিক্ত প্রাকৃতিক কোনও বহির্বস্তুর অপেক্ষা করে না।

বিদেশে পুত্র মরিয়াছে। লোকমুখে পিতা শুনিলেন যে, পুত্র সুস্থ আছে। পিতার সুস্থ-পুত্র-বিজ্ঞান হইল। অত্র বহিঃস্থ সুস্থ-পুত্র বাস্তবিক নাই; অথচ সুস্থ-পুত্র-বিজ্ঞান আছে।

দর্পনের পশ্চাতে দেশ ও প্রতিবিম্ব বস্তুরূপ কিছু নাই; দ্বিচন্দ্র বাস্তবিকই নাই, অথচ দেশ, প্রতিবিম্ব, দ্বিচন্দ্র বিজ্ঞান আছে।

স্বপ্নে দীর্ঘকাল নাই অথচ এক ক্ষুদ্র রাত্রিতেই স্বপ্নমধ্যে বহু-বর্ষ-দীর্ঘ-কালের বিজ্ঞান হয়।

বেদান্ত, বুদ্ধের লঘু কল্পনা মান্য করে। অথচ বেদান্ত বলে যে বিজ্ঞানের উদয়, বহির্বস্তুর অপেক্ষা না রাখিলেও যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও সর্ব্ব-নিরপেক্ষ তাহা নহে। বিজ্ঞানগুলি এবং তাহাদের ধারাটী উভয়েই সাক্ষ্য এবং সুতরাং সাক্ষীর অপেক্ষা রাখে।

বিজ্ঞানের অপর পারিভাষিক নাম প্রত্যয়। আমরা কয়েকটী খুচরা প্রত্যয়কে ও তাহাদের সমষ্টিতে অনুগত ধারাটীকে লইয়া পরীক্ষা করিব। "শ্যামসুন্দর" "পর্ব্বত উচ্চ," "আমি দীন"; "তুমি রোগী" "যদু চিকিৎসক" ইত্যাদি প্রত্যয়গুলি, খুচরা প্রত্যয়। ইহাদিগকে পরে পরে সাজাইলে তাহাদের পরস্পর একটা সম্বন্ধ পাওয়া যায়; তাহার নাম ধারা-প্রত্যয়, অহং-প্রত্যয়। আমি দেখি শ্যাম সুন্দর; আমি দেখি পর্ব্বত উচ্চ; আমি দেখি আমি দীন; আমি দেখি তুমি রোগী; আমি দেখি যদু চিকিৎসক। এই যে প্রতি খুচরা প্রত্যয়ে সর্ব্বত্র অনুগত "আমির দেখা"-প্রত্যয় ইহার নাম অহং-প্রত্যয়, ইহার প্রত্যেক

খুচরা প্রত্যয়ে নিত্য সাহচর্য্য, অর্থাৎ অবিনাভাব পাওয়া যায়। খুচরা প্রত্যয় গুলিও যেমন প্রত্যয়, খুচরা সাপেক্ষ ও তৎসমষ্টিতে অবশ্যানুগত, নিত্য সহচর, অহং-প্রত্যয়টীও তেমনই একটী প্রত্যয়। বুদ্ধ ও বেদান্ত উভয়েই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন যে খুচরা প্রত্যয়গুলির বাধ হইলে সুতরাং "আমির দেখা" রূপ যে একটা ধারা প্রত্যয়, অহং-প্রত্যয়, তাহাও বাধিত হইবে। এবং হয়ও তাহাই। সুষুপ্তি মরণ মূর্চ্ছা সমাধিতে খুচরা প্রত্যয় গুলি ও অহং প্রত্যয় নামক তাহাদের লম্বা ধারা প্রত্যয় উভয়ই যুগপৎ লুপ্ত হয়।

এই অহং প্রত্যয়ের বিলাতী নাম me এবং গীতাদি শাস্ত্রে, সপ্তম ত্রয়োদশ ও পঞ্চদশ অধ্যায়ে, জীব, ক্ষেত্রজ্ঞ বা পুরুষ। [অত্র মনে রাখিতে হইবে যে এই পুরুষ নামের নামী, যাহা দৃশ্য, তাহা গীতার পঞ্চদশে উক্ত ও কঠোক্ত দ্রষ্টা পুরুষ হইতে ভিন্ন ও নূন্য]

কিন্তু কি খুচরা প্রত্যয়গুলি, কি তত্রানুগত নিত্য সহচর অহং-প্রত্যয়টী ইহারা যে সাক্ষী অবলম্বনে, যে সাক্ষীর অপেক্ষায়, দণ্ডায়মান হয় সেই সাক্ষীটীই সেই প্রত্যয়টীই আত্মা—"I"। বুদ্ধ এই "I" আত্মাকে তাঁহার হিসাবে লইতে ভুলিয়াছিলেন। সাক্ষ্য অহং প্রত্যয়টী প্রতিবিম্ব-বৎ; তাহার উচ্ছেদেও অর্থাৎ meর উচ্ছেদেও, সাক্ষী, বিম্ব, আত্মা, I, অক্ষতি-গ্রস্ত হইয়াই থাকিয়া যায়। সুষুপ্তি হইতে সেই অক্ষতিগ্রস্ত, নিরমল, সমান আত্মা পুনরায় খুচরা প্রত্যয়কেও অহং প্রত্যয়কে ইদংরূপে দেখিবার জন্য, ও ব্যবহার করিবার জন্য নিজে সাক্ষী উপাধি স্বেচ্ছায় অবলম্বন করিয়া কিঞ্চিৎ বিশিষ্ট হয়; পুনরায় কি খুচরা-প্রত্যয় কি অহং-প্রত্যয় উভয় দৃশ্যকে পরিবর্জ্জন করিয়া সুতরাং সাক্ষী নামও ত্যাগ করিয়া সমান, অবিশিষ্ট সুষুপ্ত ও স্বরূপাবস্থিত হয়। বুদ্ধ অহং-প্রত্যয়রূপ দৃশ্যটীর লোপের জন্য কৌশল আবিষ্কার করিয়াছেন; তাহা এই যে দৃঢ় ধ্যানে খুচরা প্রত্যয়ের উদয় রাহিত্যে—খুচরা গুলিতে অনুগত—নানাপুষ্পে অনুগত এক মালার মত—অহং প্রত্যয়ের নাশ অবশ্যম্ভাবী। বেদান্ত বলে অহং-প্রত্যয়টী একটী দৃশ্য মাত্র, তাহা মরিলেও, আত্মা মরে না। দৃশ্য লোপে, দ্রষ্টানাম লুপ্ত হইলেও দ্রষ্টা নামের নামী পুরুষটীর লোপ হয় না।

টিকি কাটিয়া দিলে বটে টিকিদারকে পাওয়া যায় না; কিন্তু মানুষটা বিনা টিকি মৌজুদ থাকে।

বুদ্ধের পুষ্পমালা দৃষ্টান্ত তুচ্ছ করিয়া তাহাই বেদান্ত দৃষ্টান্ত দেন যে, শিখা নষ্টে শিখী নষ্ট, কিন্তু পুরুষ অনষ্ট।

অত্র খুচরা প্রত্যয় ও অহং প্রত্যয় উভয়ে একযোগে সমগ্র দৃশ্যবর্গ, টিকির মত; এই টিকি আত্মা হইতে দূর করিলে আত্মার যে দ্রষ্টৃত্ব নাম বা উপাধি তাহাও দূরীভূত হইয়া যায়, কিন্তু চরম আত্মা তথাপি, অক্ষুণ্ণ, অনষ্ট পুরুষের মতই থাকে। ইহাকে বুদ্ধ হত্যা করিতে পারেন নাই; তিনি দর্পণ ভাঙ্গিয়া প্রতিবিম্বের হানি করিয়াছেন; বিম্ব ঠিকই আছে। তিনি টিকি কাটিয়া, টিকিদার এই উপাধি লোপ করিয়াছেন বটে, কিন্তু মানুষটার ক্ষতি করিতে পারেন নাই। যখন সুষুপ্তিতে, না আছে খুচরা প্রত্যয়, না আছে অহং প্রত্যয় তখনও এবং যখন স্বপ্নজাগরে খুচরা প্রত্যয় আছে, অহং-প্রত্যয়ও আছে, তখনও আত্মা সদা বর্ত্তমান। সুষুপ্তি সময়ে, আত্মাতে সাক্ষিত্ব উপাধি নাই; স্বপ্ন জাগরে, আত্মাতে সাক্ষিত্ব উপাধি আছে। বুদ্ধহত অহং-প্রত্যয় আত্মা নহে; বুদ্ধ নিজে এবং বুদ্ধ-হত অহং-প্রত্যয় আত্মার সাময়িক, নিজ বিলাসগত কাদাচিৎ অস্থায়ী, দৃশ্য মাত্র। সুষুপ্ত আত্মা, অথবা তারও খোলষা বলিতে হইলে, স্বপ্নজাগর সুষুপ্তি এই তিন অবস্থা যিনি পর্য্যায়ক্রমে স্বেচ্ছায় স্বীকার করেন এবং স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেন সেই চতুর্থ অর্থাৎ পারিভাষিক তুরীয় আত্মা যাহা, তাহা অপাপপুণ্যবিদ্ধ, অসম্বোর্দ্ধ, অভয়। তাহার মৃত্যু ঘটে না, তাহাতেই বরং বুদ্ধ অবুদ্ধ সকলেই, জলে বরফের মত, আকাশে খণ্ডমেঘের মত, অবশে মরিয়া মিলাইয়া যায়।

এই আত্মা কখনও বা উপহিত, যথা অহং পিতা, অহং দুঃখী, অহং বৃদ্ধ, বস্তুর দ্রষ্টা, অহং অন্নভোক্তা, ইত্যাদি কখনও বা নিরুপহিত সুষুপ্ত। অথচ উভয়কালেই উপাধি দ্বারা এবং উপাধির অভাব দ্বারা অসংস্পৃষ্ট, নিত্যশুদ্ধ। স্ফটিকবৎ, নীল লোহিত বা শুভ্র সকল অবস্থাতেই স্ফটিক স্ফটিকই। এই আত্মা উপহিত অবস্থায় দ্রষ্টা, দৃশ্য নহে। সুষুপ্ত্যাদি নিরুপহিত অবস্থায়, দ্রষ্টত্ব উপাধিও পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক নিরুপহিতই,—দৃশ্য নহে। ইহা কদাপি দৃশ্য নহে। ইহা যে কদাপি দৃশ্য নহে ইহা আত্মার একটি লক্ষণ; ইহা দ্বারা, অদৃশ্য, দ্রষ্টা, আত্মাটীকে কথঞ্চিৎ বুঝা যায়।

এই কথঞ্চিৎ বুঝাতে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার, আত্মপরিচয় প্রাপ্তি প্রয়াসের তৃপ্তি হয় না। সেই জন্যই গ্রন্থবাহুল্য; সেই জন্যই অন্যান্য লক্ষণের অবতারণা। লক্ষণগুলি দুই রাশিতে বিভক্ত। প্রথম স্বরূপ লক্ষণ, সৎচিৎ আনন্দ এবং দ্বিতীয় তটস্থ লক্ষণ, জগৎ-জন্ম-স্থিতি-লয়াধিপত্যাদি। উক্ত উভয়বিধ লক্ষণ কখনও পৃথকরূপে, কখনও বা একযোগে আত্ম বস্তুকে সমর্পণ করে। দেখাইয়া দেয় না, ইদংরূপে দেখাইয়া দিতে পারে না, বুঝাইয়া দেয়।

যুগযুগান্তর হইতে আত্মার কথা আলোচিত হইতেছে। কিছুতেই ইহাকে ইদংরূপে, ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যরূপে, কর্ম্মকারক রূপে গ্রহণ করা যাইতেছে না। যে গ্রহণকর্ত্তা সেই যে আত্মা। বিশুদ্ধ কর্ত্তৃকারক আপনাকে বিশুদ্ধ কর্ম্মকারকরূপে পরিণত করিতে পারিতেছে না। চেষ্টাও ছাড়িতেছে না। বিম্ব নিজেকে ইতর বিম্ব করিতে পারিতেছে না, কিন্তু দর্পণ সংগ্রহ করিয়া তত্র গর্ভাধান দ্বারা প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করিয়া তৎসাহায্যে আপনাকে বুঝিতে চেষ্টা করিতেছে। "আমি নাই" এরূপ প্রত্যয় ও হয় না, অথচ আমিটা যে কি তাহাও ঠিক গ্রহণ হইতেছে না, অর্থাৎ সমস্যা এই যে, আত্মাটা সদা প্রকট হইয়াও মহাগুপ্ত। আত্মাটা নিজ পরিচয়ের যে চেষ্টা সহস্রাধিক যুগ ধরিয়া করিয়া আসিতেছে ও অকৃতকার্য্য হইতেছে, ইহা বোধ হয় তাহার লীলাবিনোদ ও বড় সুখেরই লীলা-বিনোদ। আমরাও দেখিয়াছি যে, যখন যাহা পাই না তখন তাহার প্রাপ্তি-চেষ্টাতে সুখ আছে এবং যখন তাহা পাই তখন প্রায় তাহাতে আর আদর থাকে না। তাহাই বোধ হয় আত্মা ইচ্ছা করিয়াই এযাবৎ স্বপরিচয় প্রাপ্তির পথে যত্নপূর্ব্বক বিঘ্ন রক্ষা করিয়াছে।

কেহ কেহ বলেন আত্মাটা অবাঙ্‌মনসগোচর। কিন্তু আমি আত্মা, তাহাদের কথা শুনিব কেন? আমি "আমির" সংবাদ জানি, কি জানি না, তাহা অপরের বলিবার কোনও অধিকার নাই। আমি মুখোষ পরি বা নরনারী না হইয়াও নরনারীত্ব স্বীকার করিয়া রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করি, অপর-লোকেরা "আমিকে" চিনিতে পারুক আর নাই পারুক, আমি আপনার স্বীকৃত সহস্র আবরণের ভিতরেও নিজ নিরাবরণ স্বরূপকে জানিই নিশ্চয়। অভয়-আত্মার ইতিহাস সৃষ্টির আদিম কাল হইতে আত্মা স্বয়ং জগৎ খাতায় স্বহস্তে লিখিয়া রাখিয়াছে, অপরে তাহা পড়িতে না পারিলেও আত্মা নিজে তাহা পড়িতে পারে। অতএব যে কেহ আত্মাকে অবাঙ্‌মনসগোচর বলিতে চাহ; তোমরা চুপ রহ। তোমাদের আন্ধ্য তোমাদের থাকুক। আত্মা অন্ধ নহে।

স্ফটিক যথা রক্তজবার বা নীল অপরাজিতার ছায়ায় সত্য সত্য লাল বা নীল হয় না, সদাই শুভ্র থাকে, তদ্বৎ যদ্যপি দেহে মমত্ব, পুত্রে পিতৃত্ব, কামে কৈঙ্কর্য্যাদি সম্বন্ধ আত্মাতে জড়িত থাকিয়া উপাধি বিনির্মুক্ত শুদ্ধ আত্মাকে দুর্ল্লভপ্রায় করিয়া রাখিয়াছে, তথাপি আত্মা সদা মুক্তই আছে। ব্যাপারটা বড়ই আশ্চর্য্য। কি "কুহকই" আত্মা জানে! জাগর হইতে স্বপ্নে, স্বপ্ন হইতে সুষুপ্তিতে, স্বপ্ন হইতে জাগরে, নিয়ত পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিবার কালে

জাগর কালের দুশ্ছেদ্য সম্বন্ধ বন্ধন ও দোষ গুণ গুলি অনায়াসে, অবলীলাক্রমে ত্যাগ করিয়া স্বপ্নে যায় এবং স্বপ্নকালের দুশ্ছেদ্য বন্ধনগুলি অনায়াসে ত্যাগ করিয়া জাগরে আইসে, সকল সম্বন্ধ নির্ম্মুক্ত হইয়া সুষুপ্তিতে উলঙ্গ চলিয়া যায়। এত বড় Miracle, অঘটন-ঘটনা আর নাই। অন্য যাবতীয় Miracle, দুই একটা অন্ধের চক্ষুদান, দুচারিটা মৃতদেহে জীবন-সঞ্চার শতযোজনলম্ফ, গোবর্দ্ধনধারণ, কৌশল্যাদি বন্ধ্যাতে যজ্ঞমন্ত্রমাত্রবলে সন্তানোৎপত্তি, ইহারা জাগর স্বপ্ন সুষুপ্তি বিচরণে আত্মার রাহিত্য রূপ বৃহৎ Miracle এর, অঘটন-ঘটন-পটুতার তুচ্ছ ক্ষুদ্রাংশ মাত্র।

পুরাতন পঞ্চাশৎ বৎসরের জীর্ণ দেহে আমার এত গাঢ় প্রীতি যে, আমি বলি আমার বয়ঃক্রম পঞ্চাশৎবর্ষ। কিন্তু বয়স আমার ত নহে, তাহা দেহেরই; নিরবয়ব আত্মার বয়স বিশেষণ নাই; ইহা কাল ব্যাপিয়া, কাল অতিক্রম করিয়া কালেরও স্রষ্টা ইহা অস্তি। দেহ কণ্টক বিদ্ধ হইলে, "আমিতে" কণ্টকবেধ হয় না, অথচ দেহে 'মমত্ব বশতঃ আমি বলি যে, আমি কণ্টকবিদ্ধ। স্ত্রীপুত্রেই বা প্রীতি কত। কেহ যদি বলে সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হও, তবে সংসারে আমার পক্ষপাত বশতঃ, সংসারের শত্রু সে রূপ উপদেষ্টাকে প্রহার করিতে যাই।

কিন্তু হায়, এত যে প্রীতি তাহা, ক্ষণবিলম্ব না করিয়াই, নিতান্ত নির্দ্দয়ের মত, প্রিয় দেহ ও সংসার সহ, ত্যাগ করিয়া আমি সহসা স্বপ্নে চলিয়া যাই। অত্র সুস্থকায়, মধ্য বয়স, ঘনকুঞ্চিত কৃষ্ণকেশ, ঈষদরুনায়ত লোচন, লাবণ্যময়ী যুবতী দেহের দেহী; তত্রদেহে প্রীতিমতী, হাস্য পরিহাসাদি, রসালাপ-বিনোদিনী, পুষ্প-বাটিকা-বিহারিণী, গরবিণী।

আবার তত সুন্দর দেহে তত প্রীতি-আদরও, নিতান্ত অরসিক, অস্থিরমতির মত অকস্মাৎ সম্যক ত্যাগ করিয়া দেহমাত্র শূন্য বিদেহসুষুপ্তি স্বীকার করি। এই যে জাগরাদি বিচরণকালে আত্মার দ্বারা দৃঢ় দুশ্ছেদ্য উপাধি স্বীকার এবং অথচ তত্তৎ অবলীলাক্রমে ত্যাগ এবং সুতরাং আসলে সদামুক্ত থাকা, ইহা সকলেই জানেন। কিন্তু ব্যাপারটী কাহারও দ্বারা এ পর্য্যন্ত অপরোক্ষীকৃত হয় নাই।

আইস আমরা আবার আত্মার অঘটনঘটনপটুতার আলোচনা দ্বারা আত্মার পূজা করিব।

আমি জাগরে মনে করি যে, আমি ক্ষুদ্র, অল্পশক্তি, দীন, হীন। শিব

গড়িতে গেলে বানর হইয়া পড়ে। মরা বাঁচাইতে পারি না। অন্ধকে চক্ষু-দিতে পারি না। প্রিয় পুত্রের ব্যাধি আরাম করিতে পারি না। বিধবাকে স্বামী দিতে পারি না। বিপত্নীককে যজ্ঞসাধন ভার্য্যা দিতে পারি না। কিন্তু আমার স্বপ্ন আমিই ত স্বয়ং নিজে সৃষ্টি করি; অপব কেহ করে না। স্বপ্ন সৃষ্টি করিবার যে আমার শক্তি তাহা যে অপরিসীম তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তত্র শিব গড়িতে ঠিক শিবই হয়; চন্দ্র, সূর্য্য, বাঘ, হাতী, পাহাড়, পর্ব্বত, এক রাত্রির স্বল্প সময়ে বহুবর্ষ-ব্যাপি দীর্ঘতা, ক্ষুদ্র গৃহাবকাশে বিস্তৃত প্রান্তর জনপদ, আমি স্বপ্নে, বিনা আয়াসেই, প্রস্তুত করি। কোথায় লাগে দুচারটীর চক্ষুদান, এক আধটা গোবর্দ্ধন-ধারণ; স্বপ্নে কটাক্ষ মাত্রে কত শত সহস্র জীব জন্তুর সৃজন সংহার করি। অথচ স্বপ্নকালে, ঠিক জাগর কালেরই মত, আমি আমিকে ক্ষুদ্র, স্বপ্নৈকদেশ, স্বল্পশক্তি, দীন, হীন মনে করি। দেখ আমিই আমিকে ক্ষুদ্র মনে করি, অথচ হিসাবে বুঝি যে আমিই স্বপ্নস্রষ্টা, অপরিসীম শক্তিমান। স্বপ্নে আমারই অনুমতিতে বিশাল স্বপ্ন বর্ত্তমান। আমিই অল্প, আবার আমিই ত ভূমা। আমার অনু-মতি নাই বলিয়া সুষুপ্তিতে কেহ থাকিতে পায় না, সকলেই সংহৃত হয়, তখন আমি সর্ব্বগ্রাস করিয়া থাকি। জাগরটাও একটা স্বপ্নতুল্য কিছু; স্বপ্নই। আমি মহামৎস্যবৎ জগৎ-নদীর কখন জাগর কূল দেখি, কখনও স্বপ্ন কূল দেখি, কখনও বা অকূল সুষুপ্তি-সমুদ্রে প্রত্যাবর্ত্তন করি, যত্র জগৎ নদী নাম রূপ ত্যাগ করিয়াই অস্তগত। জাগর দর্শন কালে জাগর অভি-মানী আমি, আমিকে ক্ষুদ্র হীন মনে করি; স্বপ্ন দর্শন কালে জাগর অভি-মান সহজেই ত্যাগ করিয়া, পৃথক স্বপ্নাভিমানী আমি, আমিকে ক্ষুদ্রহীন মনে করি; কিন্তু ভূমা আমি ত ক্ষুদ্র, হীন, নহি। স্ফটিক যথা সহজেই জবা সন্নিধানে লাল হয় ও জবাতিরস্কারে ও অপরাজিতা পুরস্কারে সহজেই লাল ত্যাগ পূর্ব্বক সহজেই নীল হয়—অথচ স্ফটিক লালও হয় না, নীলও হয় না, তদ্বৎ আমি জাগর স্বপ্ন সুষুপ্তিতে সদাই শুভ্র, মুক্ত। বন্ধন কদাপিই বাস্তবিক নাই বলিয়া মোক্ষটী প্রাপ্ত-প্রাপ্তি, কর্ণে কলম বা গ্রীবাস্থ গ্রৈবেয়ক প্রাপ্তিবৎ এবং মোক্ষটী পরিহৃত পরিহারও বটে, রজ্জুর সর্পাবরণ নিষেধবৎ। স্বপ্ন-স্রষ্টাও আমি, জাগর স্রষ্টাও আমি। আমি বড় কেও কেটা নহে, এক অদ্বিতীয়; অসীম শক্তিমান, নিত্যমুক্ত। আমি লীলা-চ্ছায়ে জগৎ সংহার করি সুষুপ্তিতে; এবং লীলা চ্ছায়েই জগৎ সৃষ্টি করিয়া

দেখি, অথবা দৃষ্টিদ্বারেই সৃষ্টি করি। জগৎসৃষ্টি করিবার জন্য কোনও নিয়মের বশীভূত আমি নহি, নিয়মই আমার বশীভূত অর্থাৎ অনিয়মই আমার নিয়ম; আমার ইচ্ছাই নিয়ম। আমার ইচ্ছাতেই বৃক্ষচ্যুত ফল পড়ে; আমির ইচ্ছা হইলেই বৃক্ষ-চ্যুত ফল উড়িবে, পড়িবে না। আমিই তার-যোগে সংবাদ পাঠাই; আমি তার-বিনা সংবাদ পাঠাই। আমিই মানুষ হইয়া জলে ডুবিয়া মরি, আমিই মৎস্য হইয়া জলে ডুবিয়া বাঁচি, আমি সূর্য্য হইয়া অন্ধকারগতবস্তু প্রকট করি; আমিই সূর্য্য হইয়া প্রকট নক্ষত্রাদিকে গোপন করি; আমিই হত্যা করিয়া ফাঁসী যাই, আমিই জহ্লাদ হইয়া হত্যা করিয়া বেতন পুরস্কার লই; আমিই নর হইয়া নারীকে ভোগ-করি, আমিই নারী হইয়া নরকে ভোগ করি; আমিই মানুষ হইয়া মিঠাই ভোগ করি, আমি মিঠাই হইয়া মানুষকে ভোগ করি না।

কথাটা বলিতে সহজ হইল, কিন্তু আমির স্বরূপটা পরোক্ষ করিয়াও অপরোক্ষ করা বাকী থাকিল। ভরসা রাখিতে হইবে যে "শনৈঃ কন্থা শনৈঃ পন্থা শনৈঃ পর্ব্বত লঙ্ঘনম্"।

যত ক্ষণ না অপরোক্ষ হইবে ততক্ষণ গ্রন্থকারও থাকিবে ও গ্রন্থপাঠকও থাকিবে। অনাদি অতীত কাল হইতে আত্মার কথা রচিত পঠিত হইয়া আসিতেছে। যে কেহ আত্মাকে অপরোক্ষ করিলেই, তৎক্ষণাৎ পঞ্চমাঙ্কের অপেক্ষা না রাখিয়াই যবনিকা পড়িয়া যাইবে. স্বপ্নে যে ভবিষ্যৎ পঞ্চমাঙ্কের জন্য বৃহৎ আয়োজন সযতনে করা হইয়াছে, স্বপ্ন ভঙ্গ হইয়া তাহা সকলই ফোক্কা হইয়া যাইবে। সূর্য্যোদয়ে পূর্ব্বদিক ধার্য্য হইলেও যথা তত্র উত্তর দিক্ ভ্রম কিয়ৎকাল থাকায় দিগ্মোহে পরম বিস্ময়রসের আবির্ভাব হয়, তদ্বৎ আত্মা অপরোক্ষীকৃত হইলেও পরিদৃশ্যমান নানা জীব জন্তুর সমষ্টি জগৎ যে আত্মাতেই অবস্থিত, আত্মা হইতে অপৃথক এই বোধ এবং জগৎটা যে আত্মা হইতে পৃথক ও নানা দোষ দুষ্ট, এই ইযত্ত্রাস্ত বোধ, এই উভয় বোধ যুগপৎ কিয়ৎকাল আত্মাকে বিস্ময়-রস ভোগ করাইবে। পরে আত্মা শান্ত হইয়া অভয় হইবে।

যে সকল লক্ষণে আত্মপরিচয় হয়, তাহারা হয় স্বরূপ লক্ষণ সচ্চিদ্রস না হয় তটস্থ লক্ষণ, জগজ্জন্ম স্থিতি লয়াদি।

ইহা বৈদান্তিকের ও ভক্তের উভয়েরই সমানুমোদিত। কিন্তু অত্র ঘোর বৈদান্তিক ও ঘোর ভক্ত, পরস্পর বিবাদ করিয়া সঙ্গ ত্যাগ করে। বিবাদ তটস্থ লক্ষণ লইয়া।

ভক্ত, জগতের সৃষ্টি ও জগৎ সৃষ্টির হেতু শক্তিকে বাস্তবিক বলিয়া অঙ্গীকার করে; বৈদান্তিক জগৎ সৃষ্টির জন্য আত্মাতে, আত্মাতিরিক্ত শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করে না, আপত্তি করে যে যদি অদ্বয় আত্মাতে সৃষ্টিশক্তিরূপ প্রচ্ছন্নদ্বৈত কিছু থাকে তাহা হইলে আত্মা কখনই অভয় হইতে পারে না। যদি ভ্রান্ত বদ্ধ জীব, গুরু কৃপায় ও বহু পরিশ্রমে নিজ সাধনবলে জগদুচ্ছেদ পূর্ব্বক জগদ্বন্ধন হইতে ত্রাণ পাইয়া, মুক্ত হয়, তথাপি পূর্ব্ববৎ কোন কারণে আত্মাবস্থিত সৃষ্টিশক্তি চঞ্চলা হইয়া ভবিষ্যতে জগন্নির্ম্মাণ করিলে, বদ্ধ জীবকে পুনরায় কৃচ্ছ্রসাধ্য অনুষ্ঠান করিয়া পুনরায় মুক্ত হইতে হইবে এবং অথচ ভয় থাকিয়া যাইবে যে, পাছে আবার এবং বারম্বার জগৎ সৃষ্টি হইয়া জীবকে মুগ্ধ বদ্ধ, করে। সুতরাং জীবের আর অভয় হওয়া হয় না। ভক্তের অভিপ্রায় এস্থানে উদ্ঘাটন করিব না। বৈদান্তিকের কথাই বলিব। কথাটি অতি সূক্ষ্ম; কথাটি উপস্থিত না বলিলেও চলিত। কিন্তু যখন প্রসঙ্গগত পাওয়া গিয়াছে তখন এই মহা নিগূঢ় কথার ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু ইঙ্গিত মাত্র করিব ও করিয়া সরিয়া পড়িব ও ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে বেদান্তকে কনিষ্ঠাধিকার হইতে আরম্ভ করিয়া সুখপাঠ্য করিবার যত্ন করিব। সরিয়া পড়িবার কারণ এই যে, ঘোর উচ্চাধিকারের কথা গঙ্গা-প্রপাতের মত, গঙ্গাধর ব্যতীত আমাদের মত ক্ষুদ্রগণের ইহার বেগ সহ্য করিবার ক্ষমতা নাই। ঘোর উচ্চধিকারের কথা এই যে, মোটেই জগৎ সৃষ্টি হয় নাই। জগৎ সৃষ্টি কথাটী কাল্পনিক "আরোপ"। এই জগৎ সৃষ্টি যদি হইত তবে যাহাকে এই জগতের স্রষ্টা বলা যাইতে পারিত সেই ই অভয় আত্মা। এইরূপে পাকে প্রকারে জগৎ সৃষ্টি অস্বীকার করার পারিভাষিক নাম "আরোপাপবাদ"। এই আরোপাপবাদ ন্যায়ে অভয় আত্মা সমর্পিত হইলে, জীব চরিতার্থ হইয়া যায়। তখন সৃষ্টিবিষয়ে কোনও বিতর্ক কেন হইল, কে করিল, কিরূপে করিল ইত্যাদি প্রশ্ন আর উত্থাপিত হইবার প্রয়োজন থাকে না। উক্ত আরোপাপবাদ ন্যায়ের প্রয়োগটী একটা কণ্টক প্রয়োগের মত; এতদ্বারা জগৎ কণ্টক উদ্ধৃত হইলে, উভয় কণ্টকই পরিত্যক্ত হয়। স্বস্থ, অভয় আত্মা থাকিয়াই যায়।

বেদান্ত ইহার বহু উদাহরণ সংগ্রহ করিয়াছে। রাম শ্যামকে বলিল যে, যে বাটীতে কাক্ বসিয়া আছে, তাহাই আমার বাটী। শ্যাম, রামের কাক মার্কা বাড়ী চিনিল। পরে কাক উড়িয়া গেল; তখনও রামের বাটী শ্যামের পরিচিতই রহিল। কাকটী তটস্থ লক্ষণা, কাক্ লক্ষণে বাটীর পরিচয় হইবার পরে

বাটীর স্বরূপ লক্ষণ, দ্বিতল, লালরং দেওয়া ইত্যাদিও শ্যামের দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। তটস্থ কাক্ লক্ষণের অভাব হইলেও শ্যাম স্বরূপ-লক্ষণ দ্বারাই বাটী চিনিতে পারিল।

তদ্বৎ আচার্য্য শিষ্যকে বলিল যে, এই তটস্থ জগতের স্রষ্টাই আত্মা। শিষ্য আত্মাকে তটস্থ লক্ষণে জানিবার সময়ে, আত্মার আমিত্ব, সচ্চিদ্র-সত্ব, স্বরূপ লক্ষণও দেখিয়া লইল। আচার্য্য পরে বলিল যে, অদ্যাপি এই জগৎ সৃষ্টি হয়ই নাই; জগৎ কাক্ উড়িয়া গেল। কিন্তু শিষ্য আত্মাকে তথাপি স্বরূপ লক্ষণেই চিনিতে পারিল।

তামাসা দেখিবে যে, বড় বড়, পরম পণ্ডিত, ঋষিগণ জগৎ-সৃষ্টি বিষয়ে, যাহার যেমন ইচ্ছা, এক একটা পরস্পর বিভিন্ন, প্রণালী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কেহ বলেন আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে রস, রস হইতে ক্ষিতির জন্ম; পরে তাহাদের নানা অনুপাতে মিশ্রণ হইতে জগৎ পাওয়া যায়। কেহ বা বলেন তেজ হইতে রসঃ, রস হইতে অন্নরূপ ক্ষিতি এবং তাহাদের পরস্পর মেলনে জগৎ-সৃষ্টি হইয়াছে। কাহারও মতে জগৎটা স্বপ্নারম্ভের মত, যুগপৎপ্রাপ্ত নানা বস্তু তাহাদের অবকাশদাতা আকাশ, বস্তুর নবীনত্ব প্রাচীনত্ব হিসাবে অতীতাদি কাল, ইত্যাদির ইত্যাদির সমষ্টি। তাঁহারা সৃষ্টির ভিন্ন ভিন্ন ক্রম নির্দ্দেশ করিয়া ঠিকই করিয়াছেন। তাৎপর্য্য সৃষ্টিতেও নহে; স্রষ্টৃত্ব ও সৃষ্টিরূপ তটস্থ লক্ষণে আত্মার পরিচয়লাভেই তাৎপর্য্য। সকলে একবাক্যে একই সৃষ্টিক্রম নির্দ্দেশ করিলে ঋষিবাক্যে শ্রদ্ধাবান্ পাঠকের সৃষ্টিটাকে সত্য বলিয়া ভ্রম হইতে পারিত। তাহা হইলে পাঠকের অনিষ্ট হইত।

সৃষ্টিটা বারুদের হস্তী; যেমন বারুদের তুবড়ী, হাউইকে আমরা ভাল বলি যদি অগ্নি যোগে তাহারা উত্তম রূপে পুড়িয়া যায়; তদ্বৎ বারুদের হাতি-বাজীর কর্ণ লাঙ্গুলাদি অঙ্গের যথাবিন্যাসে ও নির্ম্মাণকৌশলে মনোযোগ, যত্ন আবশ্যক নাই; বারুদ বর্ত্তিতে অগ্নি সংযোগ করিলে যদি সুন্দররূপে হাতি বাজী পুড়িয়া যায় তবেই বলা যায় যে হাতি-বাজী ভাল বটে।

অর্থাৎ সৃষ্টির প্রক্রিয়া সুসংলগ্ন করিয়া বর্ণনার প্রয়োজন নাই। বারুদের হাতি, ইহাকে সহজে, সুন্দররূপে নিঃশেষ উড়াইয়া দিতে হইবে। কিন্তু সাধক হাথি পুড়িয়া যাইবার পূর্ব্বেই বাজীকরকে অর্থাৎ আত্মাকে চিনিয়া লউক, সৃষ্টি ও স্রষ্টাত্বোপাধি লয়েও শিখানষ্টে শিখীনষ্ট অথচ অনষ্ট পুরুষবৎ আত্মাকে অবশিষ্ট পাওয়া যাইবে।

জগৎটা খোদার খাসী। ইহার কিছুদিন লালন পালন কর। খোদার দেখা পাইলেই, খোদার প্রীত্যর্থে ইহাকে উৎসর্গ করিয়া, ভবিষ্যতে খাসীপালনের দায় মুক্ত হইবে। স্মরণ রাখিও যে বর্ত্তমানে পালনের তাৎপর্য্য নিজভোগে নহে। ইহা খোদার, ইহা উচ্ছিষ্ট না হয়।

লোকে বলে ভাত চড়িয়াছে, পত্যোদনং, বলে দেব দত্তো গ্রামং গচ্ছতি" ভাতটী ভবিষ্যৎ; গ্রাম গমনও ভবিষ্যৎ। অথচ প্রয়োগ বর্ত্তমান। বর্ত্তমানে যদি পাকস্থালী ভগ্ন হয়, ভবিষ্যতে তবে চাউল ভাতরূপ হইবেই না। বর্ত্তমান পথিমধ্যস্থ দেবদত্ত যদি মরিয়া যায় তবে ভবিষ্যৎ গ্রাম-গমনটী ঘটিবেই না। তদ্বৎ সৃষ্টি ব্যাপারটী ভবিষ্যৎ, অথচ প্রয়োজন বশতঃ ইহার বর্ত্তমানে উল্লেখ হয়, প্রয়োজন সিদ্ধি হইলে অর্থাৎ ভবিষ্যৎ সৃষ্টির স্রষ্টা যিনি হইলেও হইতে পারিতেন, এমন আত্মা প্রতিপাদিত হইলে, সৃষ্টি বিষয়ে পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন বলিয়াই নিরর্থক হয়।

গ্রামে একটী বর্ষীয়সী বৃদ্ধা ছিল, তাহার নাম ছিল অভয়া, কিন্তু অল্পবয়স্কেরা তাহাকে নাম ধরিয়া আহ্বান করা রুচিসঙ্গত নহে বুঝিয়া, তাহাকে গোপালের মা বলিয়া ডাকিত। গোপালের মা নামে উক্ত বৃদ্ধাকেই সকলে নিঃসংশয়ে চিনিতে পারিত। কিন্তু বৃদ্ধাটী বন্ধ্যা, তাহার গোপাল নামে বা অন্য কোন নামে কোনও পুত্র বা কন্যা হয় নাই। জগৎটা গোপাল অভয়। বৃদ্ধাই অভয় আত্মা।

ঘোর উচ্চাধিকারী বলেন যে সৃষ্টিশক্তি কিছু একটা বস্তু অভয় আত্মাকে প্রচ্ছন্নরূপে সদ্বিতীয় করিয়া বর্ত্তমান নাই। সৃষ্টি শক্তিটী ফলানুমেয়া, কার্য্য-লিঙ্গৈক গম্যা। সৃষ্টিকে বাস্তবিক বলিয়া স্বীকার করিলে তবে বটে শক্তি-কারণ অনুমিত হয়; সৃষ্টিকে পচত্যোদনং বৎ, ভবিষ্যৎ, কল্পিত, আরোপ, তটস্থ মাত্র স্বীকার করিলে, শক্তি অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয় না, এবং পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি এবং বন্ধনের ভয় যুক্ত অকিঞ্চিৎকর সভয় মুক্তিই যে চরম বস্তু তাহাও স্বীকার করিতে হয় না।

বশিষ্ঠ জগৎকে "ভবিষ্যৎ" বুঝিবার চেষ্টা করিতেন। কিন্তু পারেন নাই। তিনি জগৎকে সাক্ষাৎ "বর্ত্তমান" অথচ কল্পিত, মনোরাজ্যবৎ মায়াময়, দ্বিচন্দ্রবৎ, প্রতিবিম্ববৎ, সুস্থির বৃক্ষের অস্থির বৃক্ষছায়াবৎ, স্বপ্নবৎ, কিঞ্চিৎ, বুঝিতে হয়ত পারিয়াছিলেন। মত্তহস্তী দর্শনে পলায়নপর বশিষ্ঠকে উপহাস করিয়া কেহ বলিয়াছিল যে, ঠাকুর হাতীত স্বপ্নের, তুমি পলাও কেন?

বশিষ্ঠ প্রত্যুত্তরে বলেন যে, হাতীও স্বপ্নের, আমার পলায়নও স্বপ্নের, তোমার ও তোমাদের উপহাসও স্বপ্নের।

বশিষ্ঠের শিষ্য শ্রীরামজী। রামজী যতবার সৃষ্টির কথা উত্থাপন করেন, ততবার যোগী বশিষ্ঠ তাহার উত্তর না দিয়া, আখ্যায়িকা আরম্ভ করিয়া আত্মার স্বরূপ লক্ষণ ও আখ্যায়িকার মধ্যেই সৃষ্টি যে ভবিষ্যৎ তাহার অল্প বিস্তর উল্লেখ করিতেন। বহু আখ্যায়িকা শুনিয়া শ্রীরামের অধিকার বৃদ্ধি হইলে তিনি নিজেই সৃষ্টি যে ভবিষ্যৎ তাহা বুঝিতে পারিলেন। শ্রীরামের উক্ত প্রত্যয় সুদৃঢ়রূপে পরোক্ষ হইলে, তিনি একদিন গুরু সমীপে উপস্থিত হইয়া সে দিন আর সৃষ্টি বিষয়ে প্রশ্ন শান্ত করিলেন না। বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম তুমি কৃতার্থ হইয়াছ; তোমার প্রশ্ন শেষ হইয়াছে, দেখিতেছি। যাও তুমি, মুক্ত। কিন্তু হায় শ্রীরামের অপরোক্ষানুভূতি হয় নাই; যদি হইত তবে ভবিষ্যৎ সৃষ্টিগত গ্রন্থলেখক বা গ্রন্থপাঠক ত বর্ত্তমানে পাওয়া যাইত না; তাহারা সকলেই শ্রীরামাপরোক্ষগত হইয়া মুক্ত হইত। তথাপি রামের উত্তম পরোক্ষ-জ্ঞান হইয়াছিল বলিয়া আমরা তাহাকে আদর করিয়া, খাতির করিয়া, মুক্তরাম বলিয়া, থাকি। বস্তুতঃ রাম মুক্ত হন নাই। মুক্তি বস্তুও দুর্ল্লভ; রামের অধিকারেরও ন্যূনতা ছিল। সীতা সতীকে বহুকষ্টে কঠোর ধনুর্ভঙ্গপণে লাভ করিয়াও রাম তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারেন নাই। অপরোক্ষ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার পিতৃসত্য পালনাদি নিম্নাধিকারের সংস্কারবিধি পারবশ্যদোষে মুক্তিসীতা দশমুণ্ড অর্থাৎ দশেন্দ্রিয় রাবণাসুরদ্বারা হৃতা হয়েন।

যদ্যপি রামমহাশয় যৎপরোনাস্তি শ্রমে, সমুদ্র বন্ধনাদি, অলৌকিক, অসাধারণ উদ্যোগে পুনরায় সীতাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, তথাপি প্রজারঞ্জনাদি নিম্নাধিকারের বিধিবাধ্য থাকায় সীতাদেবীকে আয়ত্ত রাখিতে পারেন নাই। সীতা সতী। তিনি এখনও জন্মস্থানেই নিহিতা আছেন। রামজী নকল স্বর্ণ সীতাকে আসলের প্রতিনিধি স্বীকার করিয়া, সন্দেশ ফেলিয়া ঠোঙ্গা চাটিয়া, হাঁদারাম নামে অদ্যাবধি পরিচিত হইয়া আসিতেছেন।

যাহাই হউক, ঘোর উচ্চাধিকারের কথা স্থগিত থাকুক। আমরা মুক্ত রাম নহি; আমরা হাঁদা রামেরও অধম; কনিষ্ঠাধিকারের নিম্নতম স্তরে বা অধিকতর নিম্নেই আমরা অবস্থিত আছি। বশিষ্ঠের মত আচার্য্যও নাই; আমরা শ্রীরামের মত যোগ্য শিষ্যও নহি। আমরা সৃষ্টি স্বীকারই করিব। এবং নানা রোচক, ভয়ানক, অর্দ্ধসত্য, অর্দ্ধমিথ্যা আলোচনার ভিতর দিয়া,

কাঠের বিড়াল সাহায্যে সত্য ইন্দুর তাড়াইবার আশার মত, যথার্থ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার আশা রাখিব। আচার্য্য যথার্থ সিদ্ধান্ত বলিলেও আমরা অনধিকার বশতঃ তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারি না; ছবি সুন্দর হইলে কি হয়, অন্ধের মত আমরা তাহা দেখিতে পাই না।

গুরু আমাদের চক্ষুর অজ্ঞান-তিমির নাশ করিয়া দিব্যদৃষ্টি দিবেন, তবে আমরা দেখিয়া কৃতার্থ হইব। গুরু যে সুতীক্ষ্ণ শলাকাদ্বারা নয়নাবরণ উন্মোচন করেন তাঁহার নাম "পাপত্যাগ, শুভসকাম অনুষ্ঠান, শুভ নিষ্কামাচরণ ক্রম।" তবে চিত্তশুদ্ধি হইবে; তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্য শ্রবণানন্তর তদর্থে মনন সামর্থ্য অর্জ্জিত হইবে; তবে শোধিত শ্রুতিবাক্যের মর্ম্মে ধ্যান লাগিবে তবে আত্মসাক্ষাৎকার হইবে।

বেদান্তের একটী নিন্দা আছে যে, বৈদান্তিক পাপপুণ্য মান্য করে না। চরমে বটে পাপ ত পাপই, ত্যাজ্যই, পুণ্যও সুখভোগপ্রদ সুতরাং চিত্ত বিক্ষেপকর বলিয়া পাপ। পাপপুণ্য দুইই ত্যাজ্য। কিন্তু আরম্ভ মুখে পাপকে বৈদান্তিক যত ভয় করে, তত আর কেহ করে না।

চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এই বটে যে, যাহা কিছু আত্মা হইতে পৃথক্ বস্তুতে প্রবলরূপে চিত্তাকর্ষণ করে, তাহার নাম দেশে বা বিদেশে পাপ বা পুণ্য যাহাই হউক, তাহা পাপই। ইহাকে ভয় করিতে হয়।

প্রথমতঃ আমরা লৌকিক পাপ পুণ্যের স্বরূপ বিচার করিব।

ধাতুগত পাপপুণ্য কিছুই নাই। যাহা একজনের পাপ বলিয়া বোধ হয় তাহাই অপরে উদাসীন ভাবে গ্রহণ করে, অথবা হয়ত পুণ্য বলিয়াই স্বীকার করে। তদ্বৎ সমাজ ভেদেও একই ব্যাপার কোথাও পুণ্য, কোথাও বা পুণ্য কোথাও বা উদাসীনরূপ বলিয়া স্বীকৃত হয়।

শাক্ত মাংসাহার উদাসীন ভাবে করে; বৈষ্ণব তাহা পাপ মনে করে। মুস্কিল আরম্ভ হয়, যখন বৈষ্ণব মাংস ভোজনকে পাপ বুঝে অথচ মাংসভোজ'ন তাহার অত্যন্ত লোভ হয়। অনিষ্ট জানিয়াও তত্রলোভই পাপ। স্পার্টা সহরে চোরের পুরস্কার হইত, আথেন্সে তাহার নির্ব্বাসন হইত। অল্প কয়েক বৎসর পূর্ব্বে লোকে বহুবিবাহ করিতে বা সতীদাহ করিতে কুণ্ঠিত হইত না, এক্ষণে হয়। তিব্বতে দ্রৌপদী এখনও পদস্থ আছে; মহীশুরে ত্রিবাঙ্কুরে আইন দ্বারা দ্রৌপদীগণ অপদস্থ হইলে দুই তিন পুরুষেই তৎপ্রদেশে এক স্ত্রীর বহুস্বামী গ্রহণ পাপ বলিয়াই অনুভূত হইবে। সম্প্রদায়ভেদে খুল্লতাত

কন্যাবিবাহ পাপ বা পুণ্য। বিধবা-বিবাহ কোথাও নিন্দনীয়, কোথাও বা প্রস্তুতান্নের ন্যায় উপাদেয়। শ্যালীকে বিবাহ করা আমাদের দেশে সুপ্রচলিত, কিন্তু তদ্বিষয়ে, বিলাতের Parliament—বলবান্ হইয়াও ভীত ও পশ্চাৎপদ। অতি পূর্ব্বে মিসরাদি দেশে জনক-নন্দিনী বিবাহ চলিত ছিল; এখন সে প্রথা নাই। একই সূর্য্য কমলমণির প্রিয় ও পেচকের পাপ। একই গোবিন্দ রাধার নয়নতারা, কংসের চক্ষুঃশূল। লৌকিক পাপপুণ্যগুলি প্রায়ই সমাজ-ভেদে ও কালভেদে ও পাত্রভেদে পুরুষানুক্রমে পালিত কৃত্রিম সংস্কারমাত্র। কিন্তু কৃত্রিম হইলেও পাপপুণ্য সংস্কারগুলি দৃঢ়, বলবান, ও আমাদের প্রভু। যীশুর বিখ্যাত দশাজ্ঞাও বটে ধাতুগত পাপপুণ্য দেখাইতে পারে না। একই ক্রিয়া দেশ কাল পাত্র ভেদে পাপ বা পুণ্য বলিয়া পরিগণিত হয়। শাস্ত্রে বিচক্ষণগণ প্রতিপ্রসব স্বীকার করেন অর্থাৎ নিষিদ্ধেরও পুনর্বিধান করেন; আপৎকালে অমেধ্য ভোজন; পরম পতিকে পাইলে, পশুপতি ত্যাগ; প্রবাসে বিহিত শৌচাদি ক্রিয়ার শিথিলতা, কর্ত্তব্য বলিয়াই নির্দ্ধারিত হয়। কিন্তু ধাতুগত পাপপুণ্য নাই বা থাকিল। প্রত্যেক ব্যক্তিরই কোনও না কোন বিষয়ে পাপ সংস্কার ত আছেই। তাহা অপরের পক্ষে পুণ্য বা উদাসীনরূপ হউক; কিন্তু যাহার পক্ষে পাপরূপ, তাহার সেই পাপ হইতে রক্ষা ত পাইতে হইবে। পাপবোধটী এই যে, বিষয় বিশেষে অনিষ্ট বোধ আছে অথচ তাহাতে প্রবলরুচি। বিজ্ঞ প্রবীণ প্রসববেদন অসহ্য দুরন্ত জানিয়াও রোগীও কোন খাদ্য বস্তুকে কুপথ্য বলিয়া জানিয়াও তত্র রুচিমান হয়, স্ত্রীলোকে পুত্রমুখ লালসার বশবর্ত্তিনী হয়। মিষ্টান্নলোভী, অপমান ভয়সত্ত্বেও, অনাহুত হইয়াও, শ্রাদ্ধ বাটীতে উপস্থিত হয়। পতঙ্গ হন্তারক দীপের জন্য পাগল হয়। জীব ভিন্ন ইন্দ্রিয় দ্বারা সুখভোগ করিতে চায়। চক্ষুদ্বারা রূপ, শ্রুতিপথে সঙ্গীত, নাশায় গন্ধ, ত্বকে কোমল স্পর্শ, জিহ্বায় রস এবং প্রিয়া-লিঙ্গনে যুগপৎ পঞ্চেন্দ্রিয় সমর্পিত রসানুভব করিতে চাহে। এবং যখন বুঝেও যে তত্তৎ সুখলাভ প্রয়াসে ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই অনিষ্ট হইবে, তখনও তত্র প্রবল আকর্ষন অনুভব করে। জুয়াখেলার ঝোঁক, মদ্যাত্তিতে পিপাসাও উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। পাপ তত পাপ নহে; অনিষ্ট বুঝিয়াও প্রবল প্রবৃত্তিরই বশ্যতাই বলবান্ পাপ। বেদান্ত কেন, সকলেই এই প্রবৃত্তি-প্রাবল্যের বিরুদ্ধে খড়্গাহস্ত এবং দৃঢ় সংযমাদি অভ্যাস করিতে বলেন। প্রথমতঃ তাহা কোনও উৎকৃষ্ট বিষয়ের, পুণ্যের, আচরণ দ্বারা করিতে হয়; পরে পুণ্যও যদি

ক্ষুদ্র ফল স্বর্গাদিতে ইষ্টবুদ্ধি জন্মাইয়া প্রবল প্রবৃত্তির উদ্বোধন করে, তবে পুণ্যেরও ত্যাগ অভ্যাস করিতে হয়। দান প্রবৃত্তি উত্তম বটে, কিন্তু বলিরাজা অতি দানেই বদ্ধ হইয়াছিল। তবে মন্দের ভাল এই যে, যাহার যাহাতে অনিষ্টবোধ অথচ তত্র প্রবল প্রবৃত্তি মনের গোচর হইবে, সে তাহার সম্বন্ধে সংযমী হইবার জন্য যদি অন্য কোন বিশিষ্ট কর্ম্মাভ্যাস উচিত বিবেচনা করে তবে সে নিজ বোধ অনুসারে কোনও পুণ্য কর্ম্মই নির্ব্বাচিত করিয়া লইবে। পুণ্যাভ্যাসের পরে, যখন বেদান্তানুরোধে, ঐহিক সম্মানাদি ও পারলৌকিক স্বর্গাদিক্ষয়িষ্ণু ক্ষুদ্র অভ্যুদয় অপেক্ষা, নিঃশ্রেয়সকে অধিক ইষ্ট বুঝিয়া সাধক পুণ্য কর্ম্মও ত্যাগ করিবে, তখন তাহার দ্বারা যদি হঠাৎ কোনও কর্ম্ম ঘটিয়াই যায়, তাহা পূর্ব্বাভ্যাস বশে কোনও কিছু পুণ্য কর্ম্মই হইবে, অনভিবিষ্টচিত্তে ঘুমাইয়া মশা তাড়ানবৎ। পাপ কর্ম্ম ঘটিবে না, যেহেতু পাপাভ্যাস ত পুণ্যাভ্যাস দ্বারা পূর্ব্বেই বিতাড়িত হইয়াছে। দণ্ডাপসারণে চক্র কিছু কাল ঘুরিতে থাকে, যে মুখে ঘুরিতেছিল সেই মুখেই ঘুরে, অকস্মাৎ বিপরীত মুখে ঘুরে না। পুণ্যদণ্ডে ঘূর্ণায়মান দেহ পুণ্যাপসরণে কিয়ৎকাল বাধিতানুবৃত্তিন্যায়ে কিছু পুণ্যই করিবে; পাপ করিবে না।

অতএব কনিষ্ঠাধিকারে পাপ ত্যাগ হইতে আরম্ভ করিয়া, অভ্যাস দ্বারা দুর্ব্বল চিত্তকে বলবান ও সংযমী করিয়া, ক্রমে ক্রমে উচ্চাধিকার প্রাপ্ত হইয়া, পুণ্যও ত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্মসন্ন্যাস কর, অনুক্ষণ, দিবানিশি, একমাত্র আত্মার ভাবনা উপাসনা, অবিরল অবিচ্ছিন্ন নদী প্রবাহের মত করিতে রহ; তবে যদি অভয় আত্মার অপরোক্ষ জ্ঞান হয়। চিত্তের বিক্ষেপ মাত্র থাকিলে চলিবে না, কি পাপ বিষয়ে, কি পুণ্য বিষয়ে; আত্মা পাইতে হইলে, অর্থাৎ হইতে হইলে মর্ম্মে রাখিতে হইবে যে আত্মা বিশ্বকর্ম্মা নহে, দুষ্কর্ম্মী নহে; আত্মা অকর্ম্মী। উচ্চাধিকারে কর্ত্তব্যকর্ম্ম কিছুই নাই; সকল কর্ত্তব্য ত্যাগই তত্র কর্ত্তব্যং। সেই ত্যাগও কর্ত্তব্যরূপ মনে, সহজ চেষ্টা রহিত, স্বাভাবিক জননীর সন্তান স্নেহের মত, অনভিনিবেশে আমাদের শ্বাস প্রশ্বাসের মত।

কোনও কোনও কপট যোগী বলেন যে বেদান্তে যখন প্রমাণ হইয়াছে যে পাপপুণ্য কিছুই নাই, তখন আমরা সকলে যথেচ্ছাচারী হইতে পারি। তাহাতে কোন দোষ নাই। ইহারা নিম্নাধিকারে থাকিয়া উচ্চাধিকারের লম্বা কথা কহে। ইহারা অসত্যবাদী, ইহাদিগকে চপেটাঘাত করিলে কোন দোষ নাই। ইহারা নিজে অমেধ্যভোজী, ঘোর কামী, স্বার্থ বশতঃ পরদ্রোহে অকুণ্ঠিত, কিন্তু

কি তামাসারই কথা, ইহারাই ইচ্ছা করে না যে নিজের স্ত্রী লম্পট হউক বা পিতা চোর হউক বা পুত্র মাতাল যথেচ্ছাচারী হউক। খবরদার কপট যোগি! অকপট হও, স্বার্থ বশতঃ ন্যায়ের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিও না; ব্যভিচারকে যদি দোষ বুঝ, তবে বুঝিও যে নারীর ব্যভিচারও যেমন পুরুষের ব্যভিচারও তেমনই, চিত্র-গুপ্তের খাতায় তুল্য রূপে বিবেচিত হইবে। নারীর সতীত্ব আছে এবং নরের সতীত্ব বলিয়া কিছু নাই, এমন ভুল বুঝিও না। সামাজিক ব্যবস্থা চালাইবার সময় ন্যায়ের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ব্যবস্থা দিবে। চিত্রগুপ্ত বড়ই শক্ত, সে সমাজের কোনও খাতির রাখে না। কেহ পবিত্র থাক ভালই, ব্যভিচার বা অন্যদোষ ঘটিতে দিও না। যদি ঘটিয়াই যায়, ভীত হইও না। নরনারী অকপটে পরস্পরের চিত্ত দুর্ব্বলতা ক্ষমা করিবে। উন্নতির পথে অন্যোন্য সহায়তা করিবে; অল্প দোষীকে পদদলিত করিয়া অধিক দোষ করিতে বাধ্য করিবে না। ক্ষমা যদি করিতে পার, তবে ত নিজে যখন অপরাধী হইবে তখন ক্ষমা পাইবার অধিকারী হইবে। অপিচ, অনুতপ্ত দোষীকেই নিজ দিব্য শীতল ক্রোড়ে লইবার জন্য কাঙ্গালের ঠাকুর পতিত-উদ্ধারণ গোবিন্দ আগুসার। Lost sheep, Prodigal Son' জগাই মাধাই বৃত্তান্তই ত ভূরিদাতা জগদম্বার বরাভয়-প্রদদক্ষ-মুক্ত-হস্তের পরিচয় দান করে। যীশু মহারাজ অসতী নর বা নারীকে "Sin no more" মহামন্ত্রে চট্ করিয়া সতী করিতে পারিতেন। যতদিন মনের গোচরে পাপ বুদ্ধি থাকিবে ততদিন ইষ্টপ্রার্থী প্রত্যেক ব্যক্তিরই অবনত মস্তকে নিজের কনিষ্ঠাধিকার অঙ্গীকার করিয়া, সংযমাভ্যাসে অপ্রমত্ত, সাবহিত, থাকিতে হইবে। চিত্ত বিক্ষেপ থাকিলে, আভ্যন্তর কোনও বিষয়ে বিন্দুমাত্র চিত্তের প্রবৃত্তি থাকিলে, গ্রন্থোদ্ধৃত উত্তম পরোক্ষ জ্ঞান লাভেও ফল হইবে না—দুর্ল্লভ অভয় আত্মার সাক্ষাৎকার, অর্থাৎ নিজ স্বরূপ সম্বন্ধে অপরোক্ষানুভূতি, কিছুতেই হইবে না। ভক্তের ইষ্ট ভগবান্ বৈদান্তিকের ইষ্ট নিজ স্বরূপ; কিন্তু কি ভক্ত, কি বৈদান্তিক, উভয়েরই জগতে ঔদাসীন্য সম্বন্ধে, ঐক্যমত আছে। গাছের পাড়া, তলার কুড়ান দুইই চলিবে না; কুক্কুটীর অর্দ্ধাংশ সুসিদ্ধ করিয়া খাইবে অপরাংশ ডিম্ব প্রসব করিবার জন্য রাখিবে, তাহা হইবে না। স্রকচন্দন-বনিতা ভোগও চলিবে অথচ অভয় হইবে এরূপ আশা করিও না। Mammon ও God উভয়ের মন রক্ষা করা চলে না। ভবিষ্যৎ ইষ্টের জন্য আপাতঃ মনোহর অনিষ্টকে সম্যক ত্যাগ করিতে হইবে।

কনিষ্ঠ হইতে উচ্চাধিকারের ক্রমপথের দৃষ্টান্ত দিব।

বালকে খড়্গচালনা শিক্ষাকালে কাঠের তরবারি গ্রহণ করে; পরে সুশিক্ষিত হইয়া আসল ক্ষুরধার খড়্গ চালনা করে। কনিষ্ঠের পক্ষে বেদান্ত খড়্গ-সমান। পাপপুণ্য কিছুই নাই ধরিয়া জীবনযাত্রা আরম্ভ করিলে, কাঠের তলোয়ারের পরিবর্ত্তে আসল লইয়া ব্যবহার করা হইবে। শিক্ষানবীশ অপরিপক্ক সাধকের নিজ খড়্গাঘাতে নিজ শরীর ক্ষতবিক্ষত হইয়া যাইবে। মনে করিও না যে, তবে বুঝি পাকা হইয়া বৈদান্তিক পাপপুণ্য জ্ঞাতসারে আচরণ করে; এবং নিপুণভাবে চালিত বলিয়া খড়্গ তাহাদিগকে স্পর্শ বা আঘাত করে না। তাহা নহে, পাকা বৈদান্তিক কর্ম্মসন্ন্যাসী, সে পাপ কি পুণ্য কিছুই করে না। এই স্থলে একটা কথা বুঝাইয়া লইতে হইবে। দৃষ্টান্ত দার্ষ্টান্তিক সহ চৌরস হয় না; হইলে উভয়ে একই বস্তু হইত। দৃষ্টান্তের তাৎপর্য্য লইতে হয়।

পৃথিবী কমলা লেবুর মত বলিলে পৃথিবীকে অম্লরস বুঝিতে হয় না। অন্ধকে যদি বলা যায় দুগ্ধ বকের মত এবং বক কাস্তের মত; তবে স্পর্শপরিচিত কাস্তের মত হওয়ায় দুগ্ধ পাছে গলা কাটিয়া ফেলে এই ভয়ে অন্ধ যদি দুগ্ধ না পান করে, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে অন্ধ দৃষ্টান্তের তাৎপর্য্য লইতে অন্ধ হইয়াছিল; তাৎপর্য্য লইতে পারে নাই এবং অমৃত সমান দুগ্ধ পান হইতে সুতরাং বঞ্চিত হইয়াছিল।

অসহায় অথচ বুদ্ধিমান কোকিল-ডিম্বটা কাকের বাসা আশ্রয় করিয়া কাকবক্ষতাপে ফুটিয়া উঠিয়া কোকিল হয়। তখন সে উড়িতে সমর্থ হইয়া, তবে কাকের বাসা ত্যাগ করে ও কুহুরবে আনন্দে বিভোর হইয়া স্বাধীনভাবে অনন্ত গগনে বিচরণ করে। চতুর কনিষ্ঠাধিকারী এই রক্তমাংস গঠিত তুচ্ছ মানবদেহকে নিজ প্রয়োজনে, কাকের বাসার মত আদর করিয়া আশ্রয় করে, ও পাপত্যাগ, পুণ্যানুষ্ঠান, সাধুসঙ্গাদি উপায়ে ফুটিয়া উঠিয়া অধিক অধিকার অর্জ্জন করিয়া, দেহাভিমান ত্যাগ করিয়া, ত্যক্ত পাপপুণ্য, কর্ম্মমুক্ত, স্বাধীন হইয়া সোহহংগীতে কলাবৎ হইয়া উচ্চাধিকারের ঊর্দ্ধ পদবীতে, স্বমহিমায়, স্বস্থানে, অভয় হইয়া স্বরূপাবস্থিত হয়।

শাশুড়ী সংসারের শ্রমসাধ্য কর্ম্মগুলি করিবার জন্য বধূকে নিয়োগ করিতেন। বিধিনিষেধ ভয়ে হউক, সহজে হউক, বধূ অনলস হইয়া কর্ম্মগুলি সম্পাদন করিতেন। একদিন শাশুড়ী দেখিলেন যে কর্ম্মরতা বধূ অন্তঃসত্ত্বা; তৎক্ষণাৎ শাশুড়ী বলিলেন "বউ মা; তুমি আর কর্ম্ম করিও না, যদি হঠাৎ কিছু কর্ম্ম কর,

দেখিও যেন হাল্কা কর্ম্ম হয়।" ক্ষুদ্র স্বর্গাদিফলপ্রদ বিধি নিষেধ-বদ্ধ কর্ম্ম গুরুতর অভিনিবেশ সহ অর্থাৎ "অহং করোমি" ভাবে আর করিবে না; করিল গর্ভস্থ পরোক্ষজ্ঞানরূপী শিশুর হানি হইবে।

শ্বাশুড়ী আচার্য্য বা অন্তর্য্যামী; বধূ আদৌ কনিষ্ঠাধিকারী, পাপত্যাগী, পুণ্যকৃৎ; বধূই পরে "অহমাত্মা" এই পরোক্ষজ্ঞানবান্ ও কর্ম্মসন্ন্যাসী। যজ্ঞে চিহ্নিত পবিত্রবৃষকে আর লাঙ্গল বহন করিতে হয় না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি "কর্ম্মী" শ্রীরাম পিতৃসত্যপালন, প্রজারঞ্জনাদি বিধিসংস্কার-কৈংকর্য্য ত্যাগ করিবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলেও ত্যাগ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন ও আনন্দময়ী সীতা সতীকে অপরোক্ষানুভব করিতে পারেন নাই। মাতৃ-স্তনের প্রতিনিধি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ লেহনবৎ আসল হারাইয়া নকল স্বর্ণসীতাকে বৃথা আশ্রয় করিয়াছিলেন।

পাপত্যাগ অভ্যাসে দ্বিজত্ব হয়; দ্বিজে প্রদত্ত হইলে তবে দীক্ষা ফলবতী হয়। কাম ক্রোধ ক্ষুধা নিদ্রাদি-পাপজয়ের রহস্য বলিব। প্রথমতঃ বটে, কাম জাগিতেছে কিন্তু বলপূর্ব্বক তাহায় ক্রিয়া হইতে দেওয়া হইতেছে না, এই অভ্যাস করিতে হয়। কিন্তু তখনও অজিত কাম সাক্ষাৎ বর্ত্তমান, যেহেতু মনকে আক্রমণ করিতেছে। তখন কাম ক্রিয়া বটে সংযমিত, নিরুদ্ধ, কিন্তু কামটী জিত নহে। কামের চিত্ত বিক্ষেপকত্বাদি গুরুতর দোষ-দর্শন-অভ্যাস পাকে কাম জয় হয়। তখন কামের কোনও স্বগত নিদর্শন পাওয়া যায় না। যথা পুরুষ, ভগিনী, কন্যা, বা মাতাকে সহজেই কামী হয় না, তদ্বৎ তখন পুরুষ যাবতীয় দেখিয়া নারীকে দেখিয়া কামী হয়ই না; যথা নারী ভ্রাতা পুত্র পিতাকে দেখিয়া সহজেই কামী হয় না; তদ্বৎ নারী তখন যাবতীয় পুরুষকে দেখিয়া সহজেই মোটেই কাম অনুভব করে না। যথা দোকানে গো শূকরাদির মাংস দেখিয়া হিন্দুর তাহা ক্রয় পূর্ব্বক স্বাদ গ্রহণ করিবার ইচ্ছালেশ উদিত হয় না। ইহাই কাম-জয়। দ্বিজত্বটীও এই সঙ্গে বুঝিতে পারা যাইবে। বালক বালিকার কাম নাই, তাঁহাদের পক্ষে কামজয়ও নাই। বালক বালিকার যৌবন হইলে তাহারা কাম বুঝিতে পারে এবং তত্র রত থাকিবার কালেই, ভাগ্যবান্ সুজন হইলে সংযম অভ্যাস করে; ক্রমে উচ্চাধিকারে কামজয় হইয়া যায়; তখন মনে স্বার্থে কাম জাগেই না। ইহাই দ্বিজ হওয়া, ইহা পুনরায় ঠিক বালক বালিকা হওয়া নহে, বালক বালিকার "মত" হওয়া। তাহাদের দ্বিজত্ব প্রাপ্তির পরে স্বগত কাম থাকে না, কিন্তু কাম কি বস্তু তাহা জানা থাকে এবং অন্যান্য ব্যক্তিতে পরস্পর কামের উদ্ভব হইলে

তাহা দেখিয়া চতুর দ্বিজ ব্যাপারটা বেশ বুঝিতে পারে। যীশু নাইকোডিমস্‌কে এইরূপ দ্বিজ হইতে বলিয়াছিলেন। গোস্বামী বলেন যে এতটা ও এইরূপ, কাম-জয়ী হইয়া তবে রাধা-গোবিন্দের অলৌকিক-প্রণয় পবিত্র-নিকুঞ্জ ভবনে নর্ম্মসখী ললিতার প্রবেশানুমতি প্রাপ্তি ঘটিয়াছিল। মেয়ে হিজড়ে পুরুষ খোজা হইয়া তবে কর্ত্তাভজার ব্যবস্থাও দ্বিজত্বেরই কথা। লৌকিক পিতামাতা নিজে স্বগত লোভী নহে, অথচ কামের বা কাম-মিশ্র প্রেমের বা বিশুদ্ধ প্রেমের তত্ত্ব, অল্প বা বিস্তর অবগত থাকিয়া পুত্রবধূ বা কন্যা জামাতার গূঢ় মিলনে পরমানন্দ অনুভব করেন; অলৌকিক বৃন্দাবন-বিলাসের কথা কি আর বলিব; তত্রজিতকামা, রাধা শ্যামেরও মান্যা-ললিতাদি প্রিয় সখীগণ দ্বারা রাধা-গোবিন্দের লীলা সহায়তা হইতে ললিতাদির এবং রাধা-গোবিন্দেরও যে কি আনন্দ হইত, তাহা পরোক্ষ চর্চ্চা করিতে করিতে যাবৎ না ললিতাদি ভগবতীর কৃপায় অপরোক্ষ হয় তাবৎ বুঝিবার উপায় নাই।

উক্তরূপে ক্রোধাদি জয় বুঝিবে। পূর্ব্বে যে সকল কারণে ক্রোধাদি হইত, সেই সেই কারণ বর্ত্তমান, অথচ যদি ক্রোধ হয়ই না এরূপ হইলে তবে বলা যায় যে, ক্রোধাদি জয় হইয়াছে। ইহাও দ্বিজত্ব। ক্রোধ হইতেছে, কিন্তু হঠ পূর্ব্বক ক্রোধের ক্রিয়া হইতে দেওয়া হইতেছে না, এরূপ হইলে ক্রোধ-জয় বলা যায় না। বটে তাহা সাধনাবস্থা, কিন্তু তাহা সিদ্ধাবস্থা নহে।

ক্ষুধার পীড়া চিত্তকে আত্মালোচনা হইতে, প্রবল আকর্ষণ করে। যে "এক" ব্যক্তির দ্বারা আত্মা অপরোক্ষ হইলে সকল জীবের মুক্তি হইবে তাহার ইতঃ-পূর্ব্বেই ক্ষুধা-জয় হইয়া যাইবে। আত্মসৃষ্ট জগৎ, আত্মার ইচ্ছাতেই সেই "এক" ব্যক্তির অনুকূল ভৃত্যবৎ হইবেই। স্নেহময়ী জননী যথা, ক্ষুধায় কাতরতা অনু-ভূত হইয়া ক্রন্দন করিবার পূর্ব্বেই শিশুকে স্তন্য দিয়া থাকেন এবং সুতরাং ক্ষুধার যন্ত্রণা যে কি বস্তু তাহা শিশুকে অনুভবই করিতে হয় না; তদ্বৎ সাধককে জগৎ গত ভ্রাতা, বন্ধু বা যে কোনও সম্বন্ধী যথাসময়ে জঠরে জ্বালা উদয় হইবার পূর্ব্বেই বরাবর কিছু খাওয়াইয়া যাইবে।

নিদ্রাজয়টী উক্তরূপ আশ্চর্য্য কিছু। সাধকের সুষুপ্তি রহিত হইয়া যাইবে এবং কি জাগরে, কি স্বপ্নে, তাহার যে কোন দেহে অভিমান হউক, সাধক সেই দেহের দেহী হইয়া অনবরত আত্মার চর্চ্চাই করিতে থাকিবে। জাগরে আত্ম-চিন্তা, স্বপ্নে ইতর চিন্তা এরূপ হইবে না।

প্রস্তাবাংশের নিষ্কর্ষ এই হইল যে আমাদের উপস্থিত পাপ পুণ্য বোধ, ভিন্ন

ভিন্ন বাক্তির, ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে, আছে, অর্থাৎ আমরা মন্দ জানিয়াও কোনও কোনও কর্ম্ম করিবার জন্য প্রবলরূপে আকৃষ্ট হই। আমাদের সেই চিত্তের দুর্ব্বলতা, দৃঢ় সংযমাভ্যাসে দূর করিতে হইবে। ক্রমে চিত্ত বলবান্, অবিক্ষিপ্ত ও শুদ্ধ হইবে। তখন যদি বুঝা যায় যে পাপ পুণ্য কিছু নাই, আনন্দ স্বরূপ আত্মা হইতে প্রাদুর্ভূত যে কোনও বস্তু, সকলই রসরূপ, কেহই সয়তান নহে, সবই রসের; চিনির জমাট স্বরূপ, কি বাঘ, কি গোলাপ, তখন সুতরাং অবশে রসরূপ জগৎ হইতে, আমি ভক্ত হইলে রসানুভব করিব ও বৈদান্তিক হইলে স্বয়ং রস স্বরূপ হইব।

প্রসঙ্গাগত পাপ পুণ্যের সংক্ষিপ্তালোচনা শেষ হইল। এক্ষণে আত্মার লক্ষণ চিন্তিত হইবে। একই অদ্বিতীয় স্বরূপ লক্ষণের নানা নাম; আত্মা, সৎ, চিৎ, আনন্দ, ব্রহ্ম অহং, ওঁ বম্, প্রণব, সামান্য, কেবল, প্রত্যক্, স্বাস্থ্য, নির্বিশেষ নির্গুণ, নির্বিকল্প, নিরুপাধি, মঙ্গল, রস, মধু, শিব, অভয় ইত্যাদি।

নানা তটস্থ লক্ষণগুলি যথা, জগৎ দ্রষ্টা অর্থাৎ "ঈশ্বর সাক্ষী"; এবং জগৎ স্রষ্টা পাতা সংহর্ত্তা অর্থাৎ "ঈশ্বর কর্ত্তা"।

আমরা বাল্যকাল হইতে শিক্ষা পাইয়াছি যে আত্মা, সৎ, চিৎ ও আনন্দ চারটী পৃথক বস্তু। তাহা ভুলিতে হইবে। বেদান্ত বলে—একই বস্তুর চারটী নাম, আত্মা, সৎ, চিৎ, রস। একটী নামের উল্লেখে অপর গুলিকে অভেদে বুঝিতে হইবে। চারিটী নামই একটী বস্তুর নিত্য সহচর ও সমর্থক।

আমি আছি; আমিই বুঝি যে আমি আছি এবং আমি যে বুঝিতেছি যে আমি আছি, ইহাই আনন্দ। অত্র দেখ, আমি "আত্মা" আছি বলিয়া "সৎ" এবং অহমস্মি "বুঝি" বলিয়া "চিৎ", এবং আমির যে অভাব নাই, আমি যে মৃত নহি, আমি যে অসৎ নহি, "আমি"র যে মৃত্যু নাই, ইহাই ত "আনন্দ"। গীতাদি শাস্ত্রে বারংবার বলা আছে যে আত্মা অজয়, অমর, অক্লেদ্য অচ্ছেদ্যাদি। কিন্তু শ্রোতা বক্তা কেহই তাহা অপরোক্ষ করে নাই সুতরাং সকলেরই মরণভয় আছে। আশা আছে একদিন না একদিন "আমি"র ইহা অপরোক্ষ হইবেই যে, মৃত্যু বলিয়া সদ্প্রতিদ্বন্দ্বী কিছু নাই; থাকিতে পারে না। এক একটী মৃত্যু এক একটী নিরীহ স্বপ্ন ভঙ্গ মাত্র। স্বপ্ন ভঙ্গে, স্বপ্নগত যাবতীয় শত্রু মিত্রাদি সম্বন্ধী ও উদাসীনগণের সহস্থায়ীরূপে বিচ্ছেদ হয়; ইহাই মৃত্যু। স্বপ্নভঙ্গের পরে, মৃত্যুর পরে, অন্য একদল শত্রু মিত্রাদি সম্বন্ধী ও উদাসীনগণের সহ বসবাস ও জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়। ইহা একটী নূতন স্বপ্ন, এই স্বপ্নভঙ্গের নাম

আর একটী মৃত্যু ; এই মৃত্যুতে এই স্বপ্নগত যাবতীয় জীব সহস্থায়ীরূপে বিচ্ছেদ হইয়া যায়। অপর একটী স্বপ্নরাজ্য উপস্থিত পাওয়া যায়। কিন্তু এতগুলি মৃত্যুর ভিতরেও সেই "একই', আমি, আত্মা সদা বর্ত্তমান ; ইহা কি আনন্দের কথা নহে ?

পাওয়া গেল আত্মা, সৎ, চিৎ, রস, পর্য্যায় শব্দ। আমাদের তথাপি বাল্য-কালের শিক্ষা-সংস্কার-দোষে চারিটী শব্দের পৃথক চারিটী অর্থেরই গ্রহণ হয়। সৎ-শব্দার্থটী অতি সহজে উপলব্ধ হয় ; তাহাই ছান্দোগ্য সৎ শব্দের প্রতিপাদ্য সদাত্মার প্রসঙ্গ করিয়াছেন, আমরাও প্রথমে তাহাই করিব ; পরে ক্রমে চিৎ রস শব্দার্থের আলোচনা করিব। কিন্তু বিলম্বে হউক ক্ষতি নাই, চারিটী শব্দই যে এক অভয় সামগ্রীর নাম তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতেই হইবে।

ছান্দোগ্য আত্মাকে সৎ নামে, বৃহদারণ্যক আত্মা নামে, তৈত্তিরীয় আনন্দ নামে, প্রশ্ন ওঁ নামে, মাণ্ডুক্য শিব নামে, Jesus I নামে, মহম্মদ খোদা নামে, তন্ত্র কৈবল্য নামে, তলবকার ব্রহ্ম নামে, কঠ পুরুষ নামে, ঐতরেয় প্রজ্ঞা নামে, গীতা ও দেবী সূক্ত অহং নামে, নির্দ্দেশ করিয়া আত্মার উপাসনা করিয়াছেন অর্থাৎ সন্নিকটে দৃঢ়াসন করিয়াছেন। কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, কেহই তাদাত্ম্য স্থাপন করিতে পারেন নাই। যে কেহ পারিবেন তিনি নিজে মুক্ত হইবেন ও তৎসঙ্গে অন্য সকলেই মুক্ত হইবে। আমরা সমান সৎ হইতে অসমান অর্থাৎ নানা বিশেষাকার সৃষ্টি মানিয়া লইয়াছি। সেই সৃষ্টির কোনও রকমের একটা গল্প রচনা করিব ; গল্প শুনিলে অপুণ্যবান্‌ও পুণ্যবান হইবে। ইহা সাহস করিয়া বলিলাম। অভয়ের কথা লিখিতে যদি সাহস না হইবে, তবে আর হইবে কবে ? পাঠক পাঠিকা এই গল্পটীকে এবং এই গল্পটীকেই ভাষান্তরিত করিয়া, অন্যচ্ছন্দে বদ্ধ করিয়া, নিজ নিজ রুচিকর নানা রকমে সাজাইয়া, পুনঃ পুনঃ পাঠ করিবেন। পুনঃ পুনঃ পাঠের নাম জপ ; প্রাচীন মহামহোপাধ্যায় বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্রে আফলোদয় জপ, অর্থাৎ আবৃত্তির উপদেশ করিয়াছেন।

নিমিত্ত কারণ কুম্ভকার, উপাদান কারণ মাটী সংগ্রহ করিয়া, ঘটকার্য্য উৎ-পাদন করে। কার্য্য ঘটে, উপাদান কারণ মাটীকে অবিকৃত অবস্থায়, কিন্তু একটা বিশেষ সংস্থানে, বিশেষ আকারে, ঘটাকারে পাওয়া যায়। কার্য্য ঘটে কিন্তু নিমিত্ত কারণ কুম্ভকারকে বর্ত্তমান পাওয়া যায় না।

ঊর্ণনাভ নিজেই আপনাকে সূত্ররূপে সংস্থিত করিয়া অর্থাৎ নিজেই নিমিত্ত নিজেই উপাদান হইয়া জালরূপ কার্য্য তৈয়ার করে। কার্য্যে উপাদান কারণ ও

নিশ্চয়ই অনুগত, অন্বিত, অনুবর্ত্তিত, অনুপ্রবিষ্ট, নিত্য সহচর থাকিবেই। অত্র ঊর্ণনাভ উপাদান হওয়ায়, কার্য্য জালে আছেই এবং নিজেই নিমিত্ত হওয়ায় উপাদান সহ নিমিত্ত রূপেও ঊর্ণনাভকে তৎকার্য্য জালে পাওয়া যায়।

জল যখন মেরু প্রদেশস্থ বরফের উপাদান এবং নিমিত্ত উভয়ই, তখন নিমিত্ত জল উপাদান জল সহ, কার্য্য বরফে অবশ্য উপস্থিত থাকে। [পাঠক পাঠিকা স্থূল দৃষ্টান্তের মর্ম্ম মাত্র লইবেন।]

তদ্বৎ অদ্বয় সমান সৎ নিজে নিমিত্ত কারণ ও নিজেই উপাদান কারণ হইয়া নানাকার জগৎ-কার্য্যরূপ ধারণ করিয়াছেন। এই নানা, বিশিষ্ট, আকার গুলিতে উপাদান সৎ ও উপাদান সঙ্গে নিমিত্ত সৎকে অনুপ্রবিষ্ট পাওয়া যায়। এই সদনুগত নানাকার গুলির সমষ্টিই জগৎ; জগৎ গত যাহা কিছু তাহা আমাদের, হয় ইন্দ্রিয়গোচর, না হয় কল্পনাগোচর। ইন্দ্রিয়গোচর কল্পনাগোচর যাহা নহে, তাহার প্রসঙ্গই হইতে পারে না। যাহাদের প্রসঙ্গ হয় তাহারা, ইন্দ্রিয় গোচরই হউক বা কল্পনাগোচরই হউক, তাহারা অস্তি অর্থাৎ সদনুগত ও ইদংরূপে গ্রাহ্য কোনও অন্যতম বিশেষাকার। অসৎ কিছু নাই, যেহেতু থাকিলেই অস্তিত্ববান্ অর্থাৎ সৎ বস্তু হইয়া যায়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সামান্য সৎটা অদ্বন্দ্বিত, absolute; ইহার প্রতিদ্বন্দ্বী, Relative অসৎ কিছু নাই; যদি থাকিত তবে "থাকিয়াই" সৎ হইত ও প্রতিদ্বন্দ্বিত্ব ত্যাগ করিয়া সদ্ভুক্ত হইয়া সতের অদ্বন্দ্বিত্ব বজায় ও জাহির করিয়াই দিত।

স্বপ্নারম্ভের মত, সদাত্মা নিজ নিমিত্তোপাদানে বিসৃষ্ট, বিসর্জ্জিত, নানাকার বিশিষ্ট জগৎ দেখিলেন। যুগপৎ প্রস্তুত জগতে নানা বস্তু, তাহাদের অবকাশ দাতা দেশ; বস্তুগুলির মধ্যে জীর্ণত্ব ও নবীনত্ব সম্পাদক অতীতাদিকাল; অবয়বী ঘটাদি, অনঙ্গ কাম শোকাদি ও নানা জীবের পিতা পুত্র শত্রু মিত্রাদি সম্বন্ধ পাওয়া গেল। সমগ্র জগৎটা সন্নিমিত্ত সদুপাদান, সমান অস্তিত্বের একটা বিশেষরূপ মাত্র, জগৎ রূপ মাত্র। জগৎটা সৎ প্রতিযোগী নহে; অসৎ নহে। যাহা কিছু প্রতিদ্বন্দ্বিত্ব, Relativity, তাহা জগতের নানা অংশাশ্রয়ে আছে। যিনি জগৎ স্রষ্টা তিনি absolute, তিনি Relativity অতিক্রম করিয়া, দ্বন্দ্বাতীত হইয়া বর্ত্তমান; তিনিই জগতের জন্মদাতা সুতরাং তিনি সৃষ্টজগৎগত, নানা জগদংশ, পরস্পর Relative দ্বন্দ্ব গুলির সত্বাদাতা, সুতরাং তাহাদের জন্মেরও পৌর্ব্বকালিক, মহামহিম, তিনি স্বয়ং সিদ্ধ, স্বমহিম্নি প্রতিষ্ঠিত, কোনও কিছুর নিরপেক্ষ। এই নির্দ্দোষ নিরতিশয় শুদ্ধ সমান সৎ, কোটী

কোটী বিরুদ্ধ বস্তুতে অনুপ্রবেশ করিয়া, তত্তৎ বিরুদ্ধ বস্তুকে সত্ত্বাদান করিয়া, তত্র তত্র সন্নিবিষ্ট থাকিয়াও, ষোলআনা, যৎপরোনাস্তি, নিজ শুদ্ধতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন; হাততালি যথা "বাহবা" ও দূ ওও" প্রত্যেকের উপাদান অথচ অবিকৃত হাততালি মাত্র; দশন-বিকাশ যথা নিরীহ হইয়াই সুমধুর হাস্যে ও বিকট বিদ্বেষে অনুগত থাকে; মাটীর ঠাকুর ও মাটীর কুকুরে যথা মাটী নিরপরাধ মাটী মাত্র থাকে, যথা সূর্য্যাবস্থিত জ্বালাকর ও চন্দ্রস্পৃষ্ট মনোহর আলোকরশ্মি, আলোকরশ্মিই মাত্র; পারদ যথা তাপমান যন্ত্রে বিশিষ্ট স্থানাবস্থিত হইয়া জীবন্তের তপ্ত শোণিতবৎ উষ্ণ বা মৃত্যুর মত হতাশ শীতল হইলেও, পারদ নিজে উদাসীনই।

তদ্বৎ জগতে, সর্ব্বত্র, কি ইন্দ্রিয়গোচর, কি কল্পনাগোচর বস্তুতে, উপাদান শুদ্ধসৎকে অনুগত হিসাবে পাওয়া যায়। যদি কখনও সংশয় হয় তখন নিজেই বা আচার্য্য সাহায্যে উপাদান, সমান, উদাসীন, বিশুদ্ধ, অবিকৃতি সৎকে তত্তৎ বিশেষাকারে অসংশয়িতরূপে অনুগত দেখিয়া লইতেই হইবে।

মন্দান্ধকারে বা আমার ইন্দ্রিয়ের অপাটবে যদি অনুগত উদাসীন রজ্জুকে না দেখিতে পাই এবং তত্রস্থলে সর্প, পুষ্পমালা, বংশ, জলধারা, ভূচ্ছিদ্র বা অন্য কোনও সদৃশ বস্তুর উপলব্ধি হয়, তবে আলোক ত আছে, আচার্য্য ত আছে, বিচার দৃষ্টি ত আছে; তৎ সাহায্যে অনুগত রজ্জু নিশ্চয়দৃষ্ট হইবে।

চরম সৎটী চরম বিশেষ্য; ইহা কখনও বিশেষণ হয় না, অন্যান্য বস্তু কখনও বিশেষ্য হয়, কখনও বিশেষণ হয়। তাহারা স্থলবিশেষে ক্ষুদ্র বিশেষ্যই হউক আর বিশেষণই হউক, কিন্তু চরমে তাহারা সকলেই চরম সমান সতের বিশেষণ।

ছোট ঘট, পুরাতন ঘট, ভাঙ্গা ঘট ইত্যাদি। অত্র ঘট বিশেষ্য, ছোটত্ব, পুরাতনত্ব, হীনাঙ্গত্ব ঘটের বিশেষণ।

দীর্ঘ পট, ছিন্ন পট ইত্যাদি। অত্র পট বিশেষ্য; দীর্ঘত্ব, ছিন্নত্ব পটের বিশেষণ।

ঘট অস্তি, পট অস্তি ইত্যাদি, অত্র অস্তিত্ব বিশেষ্য, চরম বিশেষ্য, ঘটত্ব ও পটত্ব অস্তিত্বের বিশেষণ। সমান অস্তিত্বটী ঘটাকারে, ঘট বিশেষণে বিশিষ্ট এবং পটাকারে, পট বিশেষণে বিশিষ্ট।

ছোটত্ব, পুরাতনত্ব, হীনাঙ্গত্ব, দীর্ঘত্ব ছিন্নত্ব ইহারাও প্রত্যেকে অস্তি এবং প্রত্যেকে সমান অস্তিত্বের নানা ভিন্ন আকার। পুরাতনত্ব হীনাঙ্গত্ব দীর্ঘত্ব ছিন্নত্ব প্রত্যেকেই সমান অস্তিত্বের বিশেষণ।

চরমবলবান বিশেষ্য সৎএর নিকট, ছোটত্বাদি বিশেষণের ত কথাই নাই, দুর্ব্বল বিশেষ্যগুলিও অর্থাৎ পটাদিও সকলেই নিজনিজ পাগড়ী নামাইয়া স্পর্দ্ধা ত্যাগ করিয়া, ক্ষুদ্র বিশেষ্যত্বরূপমর্য্যাদা বর্জ্জন করিয়া, চরম সতের বিশেষণত্ব স্বীকার করে।

বড় তামাসা হইয়াছে। সমান সৎটী স্বপ্রচার করিয়া, সদ্বিলাস রূপ জগৎসৃষ্টি করিয়াছেন। আমরা ফাঁকি দিয়া জগতের এবং জগতে প্রতি অংশের একটা না একটা বিশেষাকার বা উপাধির সহ তত্র তত্র নিত্য সহচর নিত্যানুগত সৎকে ইদংরূপে দেখিতে পাইতেছি। অবশ্য উপাধিটী সসীম হওয়ায় আমরা ক্ষুদ্র উপাধি সংলগ্ন সৎকে ক্ষুদ্ররূপে দেখি; ভূমা-রূপে নহে। বিশিষ্ট, উপহিত সৎটী সাক্ষ্য শ্রেণীতে আসিয়া পড়িয়াছে। কখনও আশা হয় যে, যদি হঠ পূর্ব্বক সকল উপাধি গুলিকে ভুলিতে পারি এবং তত্রতত্র অনুগত সৎ যদি পিণ্ডীকৃত, পুঞ্জীভূত হয়, তবে বুঝি বা ভবিষ্যতে সমান সৎকেও দেখিতে পাইব। কিন্তু সে আশা বৃথা। যে আমি দ্রষ্টা হইয়া সমান সৎকে দেখিতে আশা করি সেই দ্রষ্টার "দ্রষ্টৃত্ব" উপাধি লয়ে যে "আমি" নেতি মুখে সমর্পিত হয় সেই আমিই সমান সৎ; সুতরাং দেখিবার সময় দ্রষ্টৃত্ব না থাকায় দেখিতে পাইব না; বর্ত্তমানে বটে বুঝিতে পারি যে, অহংই অস্মিরূপ, অস্তিরূপ। সমান আমি, সমান আমিকে, সুষুপ্ত আমিকে দেখিতে পারি না; কর্ত্তৃকারক, নিজের কর্ত্তৃকারকত্ব বজায় রাখিয়া, বিশিষ্ট, উপহিত, কর্ম্মকারক হইতে পারে না। উপাধিতে যে অনুগত সৎ দেখা যায় তাহা দর্পণ গত প্রতিবিম্ব দেখার মত নকল বস্তু দেখা মাত্র। বৃক্ষ দেখা নহে, বৃক্ষের ছায়া দেখার মত। যাহাই হউক আমরা গোটাকয়েক জগদংশে অবিকৃত, নিষ্কলঙ্কিত সৎএর কৌতুক-কর অনুপ্রবেশ দেখিয়া লইব।

যাহা কিছু ইন্দ্রিয়গোচরে বা কল্পনাগোচরে আছে বলিয়া বোধ হয়, তাহাতেই, তাহা আছে বলিয়াই, সৎ, অনুগত হইয়া, বর্ত্তমান, এবং আছে "বোধ" হয় বলিয়াই তত্র চিৎ বর্ত্তমান এবং উক্ত বোধ আমারই হয় বলিয়া, আমি, আত্মা বর্ত্তমান। সৎটিত অচেতন নহে; ইহা চিৎ। বস্তুর "থাকা" হইলেই তত্র অস্তিত্ব ও থাকার বোধরূপ চিৎ এবং আমার বোধ হিসাবে আত্মা এই তিন, সচ্চিদাত্মা, অনুগত থাকিবেই।

পট একটী অবয়ব বস্তু; পট অস্তি পটাবয়ব অস্তি, অবয়ব অস্তি।

বটে কোনও না কোন বস্তু আশ্রয়েই অবয়ব থাকে; অবয়ব আশ্রয় বস্তু হইতে পৃথক রূপে ইন্দ্রিয়গোচর নহে; কিন্তু ইহা পৃথক রূপে কল্পনা গোচর বটে এবং সুতরাং ইহা অস্তি বটে, অসৎ নহে।

সুখ একটী নিরবয়বী। শোক অপর একটী নিরবয়বী। সুখ অস্তি, শোক অস্তি, নিরবয়বত্বও অস্তি।

অবয়ব নিরবয়ব উভয়ে একটী দ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্বটী অস্তি, দ্বন্দ্বাংশ অবয়ব অস্তি, দ্বন্দ্বাংশ নিরবয়বত্ব অস্তি।

জীবন ও মৃত্যু একটী দ্বন্দ্ব। অত্র দ্বন্দ্বটী ও দ্বন্দ্বাংশ দুইটী প্রত্যেকে অস্তি। অস্তিত্বটী কিন্তু দ্বন্দ্ব অতিক্রম করিয়া, কোনও দ্বন্দ্বের কোনও অংশে অলিপ্ত, অদুষ্ট হইয়া অস্তি; দ্বন্দ্বগুলির সৃষ্টির পৌর্ব্বকালিক অস্তিত্বটি, সমান সৎটী, তৎকালে এবং সৃষ্টির উত্তর কালেও নির্দ্বন্দ্ব, অদ্বন্দ্বিত, জগতের দ্বন্দ্বগুলিতে থাকিয়াও দ্বন্দ্বগত বিরোধে অস্পৃষ্ট, বিশুদ্ধ। ভাল অস্তি, মন্দ অস্তি। দুগ্ধ অস্তি, বিষ অস্তি। দুগ্ধের পুষ্টিকরত্ব অস্তি। বিষের মাকরত্ব অস্তি। যথা মাটীর ঠাকুরে ও মাটীর কুকুরে মাটী মাটী মাত্র, ঠাকুরও নহে কুকুর নহে, তদ্বৎ অস্তিত্ব দুগ্ধে থাকিয়া দুগ্ধও হয় নাই, দুগ্ধের পুষ্টিকরত্বে থাকিয়া পুষ্টিকরও হয় নাই; অস্তিত্ব, বিষে থাকিয়া বিষ হয় নাই, বিষের মাকরত্বে থাকিয়া মারক হয় নাই। দুগ্ধবিষাদি সহস্র সহস্র বিরুদ্ধ বস্তু প্রত্যেকেই সদনুপ্রবিষ্ট, এবং সদনুপ্রবিষ্ট বলিয়াই ত আছে। ইহারা সকলেই সদাশ্রয়ে আছে, অথচ নিজ নিজ দোষগুণে সৎএর ক্ষতিবৃদ্ধি করে না। যথা গাভীস্থ দুগ্ধ গাভীর পুষ্টি করে না; সর্পস্থ বিষ সর্পকে বধ করে না; তদ্বৎ এক অদ্বিতীয় সমান সতের নানা বিরুদ্ধ বিশেষাকার, কি দুগ্ধ কি বিষ, সদবলম্বনেই আছে অথচ সৎকে পুষ্ট বা বিষাক্ত করে না। এবং সুষুপ্তিতে, দুগ্ধবিষাদি দুগ্ধাকার বিষাকার ত্যাগ করিয়া, যথা ঠাকুরঘরে শুদ্ধাচারী ব্যক্তি অপবিত্র বস্ত্রাদি ত্যাগে উলঙ্গ হইয়া প্রবেশ করে, তথা, শুদ্ধ সমান মতে প্রবেশ করে; তত্র পুষ্টিকরত্ব মাকরত্ব লইয়া যায় না। অবয়ব, অবয়বী ঘট, নিরবয়ব, নিরবয়বী সুখ সবই অস্তি; ইহাদের জন্মদাতা, ইহাদের পৌর্ব্বকালিক অস্তিত্বটী, সমান সৎটী, কিন্তু অবয়বী নহে, নিরবয়বীও নহে, সুখও নহে দুঃখও নহে; ইহা বিকল্পনালেশশূন্য, নির্বিকল্প, অভয়ানন্দ।

ভ্রমও অস্তি; কল্পনাও অস্তি; কল্পিত বস্তুও অস্তি; ইহারা ইদংরূপে

বোধগোচর বলিয়া, অস্তিও বটে, চিৎও বটে; সদনুগতও বটে, চিদনুগত ও বটে। আমির গ্রাহ্য বলিয়া আত্মানুগতও বটে।

রজ্জুসর্প দৃষ্ট হইলে বুঝিতে হইবে যে, সর্পই অস্তি; পরে রজ্জুদর্শনের সমকালে ও ভবিষ্যতে, সর্পরূপ ভ্রমটী, স্মৃতিরূপ ও অতীত কাল অবলম্বনে অস্তি; অতীতকালও অস্তি। আশ্চর্য্য দেখ! যাহা "অতীত", তাহা যখন চিন্তার বিষয় হইল তখনই তাহা বর্ত্তমান অস্তিরূপ হইল। তদ্বৎ "ভবিষ্যৎ" কাল বন্ধ্যা পুত্র ভবিষ্যৎ হইয়াও চিন্তাগোচর হওয়ামাত্র বর্ত্তমানে অস্তিরূপ। ইহা এক অঘটন ঘটনা ও লক্ষ্য করিবার যোগ্য।

জবা সান্নিধ্যে স্ফটিকলৌহিত্য অস্তি, প্রতিবিম্ব অস্তি, দ্বিচন্দ্র অস্তি, মনোরাজ্য অস্তি, স্বপ্ন অতীতকালাশ্রয়ে স্মৃতিরূপে বর্ত্তমানে বুদ্ধিরগোচর, অস্তি বটে। দিঙ্মোহ অস্তি। অন্ধকার অস্তি; ইহাকে চক্ষু বুজিয়া দেখিতে হয়, অথবা ইহাকে সূর্য্যোদয়ের বার ঘণ্টা পরে চক্ষু খুলিয়াও ইদংরূপে দেখা যায়। সুষুপ্তি অস্তি, বীজরূপে অস্তি; বীজকে বৃক্ষের মত চক্ষু দ্বারা দেখা যায় না বটে। কিন্তু বিচারদৃষ্টিতে বীজকে, সুষুপ্তিকে দেখা যায়। যে চক্ষুর অগোচর বস্তু হইতে এই বৃক্ষ হইয়াছে তাহাই বীজ; তাহা অস্তিরূপ, তাহা অসৎ নহে। যে আমি সুষুপ্ত ছিলাম সেই আমিই যে গ্রন্থরচনা করিতেছি, এই প্রত্যভিজ্ঞা দ্বারা সুষুপ্তি যে অতীতাবলম্বনে অস্তি তাহা বর্ত্তমানে স্বীকার করিতে বাধ্য আছি। যথা হংস ডিম্ব প্রসব করে; তথাই অশ্ব ডিম্ব প্রসব করে এরূপ কথা শুনিলে অনেক লোক নিঃসংশয়ে অশ্বডিম্ব অস্তি স্বীকার করে। পক্ষীর বা কচ্ছপীর দুগ্ধ, এবং অশ্বডিম্ব কল্পনাগোচর এবং সুতরাং অস্তি। সমান অস্তিত্বের যথা ঘট দ্বিচন্দ্রাদি বিশেষাকার, তদ্বৎ কচ্ছপীর দুগ্ধ, অশ্বডিম্বও সমান সতের বিশেষাকার। তবেই পাওয়া গেল যে, সমান সৎটী অশ্বডিম্বেও অনুপ্রবিষ্ট।

এই যে "নিশ্চয় জানা" যে দ্বিচন্দ্র, প্রতিবিম্ব, দর্পণে দৃষ্টদেশ নাইই, অথচ সাক্ষাৎদৃষ্ট সদনুবর্ত্তিত অস্তিরূপ, ইহা অত্যন্ত বিস্ময়াবহ; নিশ্চয়ই জানা আছে যে দ্বিচন্দ্রাদি নাই। অথচ "না থাকা"র জ্ঞানকে পরাজয় করিয়া বলপূর্ব্বক দ্বিচন্দ্রাদি যে সমক্ষে দণ্ডায়মান থাকিতে পারে ইহা– সমান সৎএর অঘটনঘটনপটুতা, মহিমা।

এক সমান সৎই ব্যবস্থিত নিত্য, নিয়ত। ইহার সকল বিশেষাকারই, বিশেষণই, উপাধিই, অব্যবস্থিত, অনবস্থিত, flux, অনিত্য, অনিয়ত। দেখ

মহাবলবান্ কালকেও ছোট বড় করা যায়। দৃঢ়মনোনিবেশে শকুন্তলা দুষ্যন্ত-চিন্তায় দীর্ঘকালকে ছোট করিয়াছিলেন। স্বপ্নে দুঘণ্টাকে বহুবর্ষদীর্ঘ করা যায়। দেশকেও ছোট বড় ও নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করা যায়। সকলেই জানেন যে, স্বপ্নে ক্ষুদ্রগৃহে বহু-যোজন-বিস্তৃত অবকাশ তৈয়ার হয় এবং জাগ্রতে ও স্বপ্নে দর্পণের ভিতর নূতন দেশ সৃষ্টি করা হয়। কাল দেশ বলবান্ হইলেও আত্মার নিকট তুচ্ছ। তাহারা সৎকর্ত্তৃক দৃষ্টসৃষ্ট; কালদেশ অস্তি হিসাবে কালাকার ও দেশাকার দুইটী, সমান সৎএর বিশেষাকার মাত্র এবং সুষুপ্তিতে, সমান সৎ স্বপ্রচার প্রত্যাহার করিলে কালাকার দেশাকার দুইটী, অন্য যাবতীয় ঘট পটাদি বিশেষাকারের মতই অন্তর্হিত হয়। চন্দ্র সূর্য্য ও "আমির" অধীন। অন্ধকার রাত্রিতে স্বপ্ন সৃষ্টি করিয়া, স্বপ্নে একটা নূতন সূর্য্যকে সৃষ্টি করিয়া লই। যখন সুষুপ্তিতে, দেশকাল বস্তু, চন্দ্রসূর্য্য, সবই আমি উপসংহৃত করিয়া লই, তখন তাহারা সকলেই নিজ নিজ বিশেষাকার ত্যাগ করিয়া সমান হইয়া, সমান সৎএ নিমজ্জিত অবগাহিত, লীন, বাধিত হইয়া যায়। তাহাদের দোষগুণ ত সমান সতের দোষাকার ও গুণাকার মাত্র, অন্যতম বিশেষাকার মাত্র। এই দুই বিশেষাকার ও অন্য যাবতীয় বিশেষাকার সুষুপ্তিতে ত্যক্ত হয় ও দোষগুণ সুষুপ্তিতে পহুঁছায় না; তত্রতত্র অনুগত সৎ, সমান সতে সমান হইয়া যায়। সহস্র বিরোধে অনুপ্রবিষ্ট সমান সৎ যে, বিরোধী দোষগুণে অসংশ্লিষ্ট তাহার এক চমৎকার পৌরানিক চিত্র আছে। তাহা শিবজীর চিত্র।

এই ব্যবস্থিত সমান-সৎ-শিবজীকে কিছুতেই ছোট বড় বা অবয়ব নিরবয়ব বা বীজরূপ কোনও উপাধির ভিতর ধরিয়া জমাট করিয়া রাখা যায় না। ইহা নিরতিশয় স্বাধীন, স্বতন্ত্র; স্বেচ্ছায় অনায়াসে স্বপ্রচার ও প্রচার প্রত্যাহার করিতে সমর্থ ও নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত।

ইনি অবয়ব,নিরবয়ব; সাকার নিরাকার; দোষগুণ; বিষামৃত; কঠিন তরল নরনারী, বধূ ননন্দা; কাম প্রেম; সুখশোকাদি দ্বন্দ্বগুলির, তত্রতত্র অনুপ্রবেশ দ্বারা, সত্ত্বাদাতা সুতরাং তাহাদেরও পৌর্ব্বকালিক, কেবলং শুদ্ধং অভয়ং অকায়ং অব্রণং অস্নাবিরং অপাপপুণ্য-বিদ্ধং, অসহায়, সহায় নিরপেক্ষ, স্বস্থ, স্বমহিম্নি প্রতিষ্ঠিত আছেন। পরে যখন তাহাতে দেখা গেল ঊষার মত ঈষদ্বিকশিতা, একটী সুন্দরী ইচ্ছাশক্তি, অর্দ্ধসমানরূপিনী অর্দ্ধবিশেষরূপিনী, কতকটা অভেদরূপিনী। শিব তখন আর "কেবল" নহেন; শিব তখন ঈশ্বর অর্দ্ধনারীশ্বর। নারী তখন অচঞ্চলা, শিব শরীরে দৃঢ়বদ্ধা, শিবানুগতা।

আরও পরে দেখা গেল যেন, দেবী শিবশরীর হইতে বিসৃষ্টা, চঞ্চলা, অপার-যৌবনা; কিন্তু বিসৃষ্টা হইলে কি হয়, শিবানুগতাই; সদনুপ্রবিষ্টা, সতী; কোনও বস্তু সদনুপ্রবেশ অর্থাৎ শিবানুগতি অতিক্রম করিবে অথচ বিদ্যমান থাকিবে তাহা হয় না। উক্ত দেবী জগন্মাতা, মহামায়া, ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যরূপিনী, নিত্যষোড়শী, আদ্যাশক্তি; তিনি শিবানুগতা সুতরাং ভদ্রকালী, এবং শিবব্রতা বলিয়াই প্রিয়শিব সমক্ষে উদ্গত রোমাঞ্চা। সেই বিচিত্র রোমাঞ্চই ত নানাকার বিশিষ্ট বিচিত্র জগৎ এবং তাহা নিজ প্রেয়সীর রোমাঞ্চ বলিয়াই শিবসুখদাতা।

সেই নানাকারগুলি পরস্পর বাধক, বিরোধী। তাহারা কিন্তু সকলেই শিবানুগতি বশতঃ নিজ নিজ অন্যোন্য বিরোধ সত্ত্বেও, নিজ নিজ বিরোধ ত্যাগ করিয়াই, একযোগে তাহাদের অধিষ্ঠান শিবের সাধক, শিবের সমান সত্ত্বার সাক্ষ্য দিবার জন্যই দণ্ডায়মান।

শিবের গলে সর্প, নিকটেই সর্পভুক ময়ূর; মস্তকে শীতল গঙ্গা, ললাটে প্রজ্বলিত বহ্নি, জীবন স্বরূপ সুশুভ্র রজত কান্তি, কণ্ঠে মরণ চিহ্ন-বিষনীলিমা। খাদ্য বলদ সহ খাদক সিংহ, বোকা লক্ষ্মী, সেয়ানা সরস্বতী; ধনপতি কুবের ভৃত্য অথচ দিগ্‌বসন; দগ্ধ মদন অথচ ঔরস পুত্র কার্ত্তিকেয়; অন্নপূর্ণা গৃহিনী, উপজীবিকা ভিক্ষা।

এবম্প্রকারে শিবাশ্রয়ে সহস্র বিরোধের অনির্ব্বচনীয় নির্বিরোধে সহাবস্থানই ত অঘটন ঘটনা। এই অঘটন ঘটনা শিবের কটাক্ষ মাত্রে হইয়াছে। এত বড় সাক্ষাৎ বিপুল ব্রহ্মাণ্ডটা পরমা শক্তির লীলা-বিলাস। ইহা রস-বিলাসই। যাহা সৎ শিব, তাহাই শক্তিচিৎ, তাহাই রস, আনন্দ, কল্যাণ। রস হইতে বিষ জন্ম লাভ করিতে পারে না। আনন্দ হইতে শিব মহাশয়ের জন্য ভোগাপবর্গই উদ্গত হয়। শিবকল্যাণ হইতে শয়তানের জন্ম হয় নাই, হইতে পারে না বলিয়াই হয় নাই। দেখিতে ভয়ানক হইলেও চিনির বাঘ স্বরূপে মিষ্টই। মাতা, শিশুর সুখের জন্যই তাহাকে উর্দ্ধে পুনঃ পুনঃ নিক্ষেপ করিয়া, পতনমুখে ত্রস্ত সন্তানকে হাস্যবদনে, সদয় হস্তে গ্রহণ করেন। শিশু. শিশুত্ব অর্থাৎ অজ্ঞত্ব বশতঃই সেই সুখের ব্যাপারকে উল্লাসরূপ না বুঝিয়া শয়তানরূপ মনে করে। আইস আমরা বালকত্ব ত্যাগ করিয়া জগৎ বিসৃষ্টিকে রসরূপ, উল্লাসরূপ বুঝিতে চেষ্টা করি।

দেবী নিজে শিবানুগতা; দেবীর বিচিত্র রোমাঞ্চরূপ জগৎ ও সুতরাং শিবানু-গত; জাগতিক বিরোধ গুলি. অন্যোন্য বিষতুল্য হইলেও, যথা অগ্নি গঙ্গা, শিবা-

শ্রয়ে নির্ব্বিরোধে থাকিয়া মনোহর শিবময় জগতের শোভাবিবর্দ্ধন করিতেছে ।

জগৎ প্রচারের পূর্ব্বে এবং জগৎ প্রচার সময়ে ও জগৎসংহারের পরে শিব সদাই নিরাবরণ উলঙ্গ। আমরা নিজের অল্পজ্ঞতা বশতঃ নিজ লজ্জা শিবে আরোপ করিয়া, একখানা বাঘছাল বা হস্তিচর্ম্ম দ্বারা শিবলিঙ্গ আচ্ছাদন করি ; কিন্তু স্বভাবনগ্ন শিব-শরীর হইতে বাঘছাল ও হস্তিচর্ম্ম আপনি খসিয়া পড়ে ; যথা স্বভাব-শুষ্ক পাথরকে জল ঢালিয়া আর্দ্র করা যায় না, জল পাথরে প্রবেশ করিতে না পারিয়া গড়াইয়া পড়িয়া যায়। যুগ যুগান্তর হইতে অসংখ্য নরনারী পিতামাতা কন্যা ভ্রাতা ভগ্নী একযোগে জানত অজানত, ভারতে, ইজিপ্টে, ব্যাবিলনে সর্ব্বত্র উলঙ্গ শিবের মৃন্ময় বা প্রস্তরময় মূর্ত্তিতে, আদিপুরুষের অথবা প্রকৃতিপুরুষের উপাসনা করিয়া আসিতেছে। জগতের নানা আকার শিবাশ্রয়ে শিবাস্থিত হইয়াও শিবকে আবরণ করিতে পারে নাই, স্পর্শই করিতে পারে নাই ; যথা লৌহিত্য স্ফটিকাবস্থিত হইয়াও স্ফটিকে লব্ধপ্রবেশ হয় না, যথা জল কমল-পত্রের উপর মাধ্যাকর্ষণ সহায় হইয়া চাপিয়া বসিয়াও, কমলকে স্পর্শই করিতে পারে না। একদিন শিবজী নেশা করিয়া বিশ্বরূপিণী সতীর, জড় অকিঞ্চিৎকর, উপাধি মাত্র স্বরূপ, মৃত দেহটাকে উপাদেয় সত্য মনে করিয়া, স্কন্ধে ধারণ করিয়া, দুঃখে নৃত্য করিলেন। তাঁহার অনুপাদেয়ে উপাদেয় বোধ হইল ; অতস্মিন্ তদ্বুদ্ধি হইল। ঈশ্বর শিব, জীব হইলেন। শিবানুগত জগতের নানাকারের মধ্যে অন্যতমাকার সুদর্শন চক্র মহাশয় সেই সতীদেহ ছিন্ন ভিন্ন করিলে মুগ্ধশিব মুক্ত হইবেন। জীব শিবোহহং। বুঝিয়া লইয়া পরে শিব হইবেন। অন্যান্য যাবতীয় জীব ঈশ্বর-শিবাশ্রয়ে কিয়ৎকাল থাকিবে ও যথাসময়ে "কেবল"শিবে ডুবিয়া সমান হইবে। সুবিচারিত দর্শনেরই নাম সুদর্শন ; সুদর্শনই জ্ঞান, গুরু, আচার্য্য। একমাত্র সুদর্শনেই অতস্মিন্ তদ্বুদ্ধির বাধ হয়, অন্য দ্বিতীয় উপায় নাই।

সাক্ষাৎ দৃষ্ট সর্পের, নিপুনতর দর্শনে, অর্থাৎ সুদর্শনে, সর্পত্ব বাধিত ও রজ্জুত্ব দৃষ্ট হয়। গুঞ্জাফল রাশিতে অগ্নিবোধটী বাধিত হয়, যথন বিচার সুদর্শনে ধরা পড়ে যে, তাহা অগ্নি নহে ; যেহেতু অগ্নি হইলে তাপ পাওয়া যাইত।

একজন Sign Board লিখিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। সে আপনাকে প্রচার করিবার জন্য একটী Sign Board লিখিল যে "এই বাটীতে Sign Board

লেখককে পাওয়া যায়” এবং সেই Sign Board যে নিজ গৃহদ্বারে লটকাইয়া দিল।

খোদা তদ্বৎ জগৎরূপ Sign Board নিজে লিখিয়া তাহার দ্বারা আপনাকে প্রচার করিয়া রাখিয়াছেন। জগৎরূপ Sign Boardএ লেখা আছে যে “এই জগতে অনুপ্রবিষ্ট আমি আছি; “যাহার “আমিকে” প্রয়োজন হইবে সে এই জগতে অনুসন্ধান করিলেই “আমিকে” পাইবে।”

ঈশ্বরের নাম খোদা। গুজরৎ খোদ ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগে বুঝা যায় যে খোদা শব্দের ধাতু ঘটিত অর্থ “Self” “আত্মা” “আমি।”

অত্র বিশ্রাম লইলাম। বারান্তরে চিদানন্দের প্রচারপ্রসঙ্গ চেষ্টা করিব।

শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

অস্তপারে।

(তা’র) নয়নবিহীন ভুরুর রেখা ঝাপ্‌সা কুয়াশাতে,
ইঙ্গিতে সে ডাক্‌ল মোরে নগ্ন দু’টি হাতে,
এগিয়ে দিল ফুলের তোড়া গরলভরা-ঘ্রাণ,
উঠিনু তা’র কুহক-রথে মূর্চ্ছাহত প্রাণ।
অদূরে কোন্ ভূধর-বীণার নির্ঝরিণীর তারে
নির্জনতার কি সুর বাজে গভীর গুহার পারে!
মেঘ-সাগরে জোয়ার এল ঘূর্ণি হাওয়ায় ভেসে,
ছায়ার চেয়ে কোমল আলো লুকায় সেথা এসে।
হাজার তারার খচিত তা’র তুষার-কাঁচলিতে
আব্‌ছায়ারা পথ হারালো অকূল-অচিহ্নিতে—
কর্ণে এসে পৌঁছিল সে সুপ্ত লোকান্তরে
উঠ্‌ছে মৃদু-গভীর বাণী, ডাক্‌ছে স্নেহের ভরে।
অস্ত গেল ধরার ছবি, ডুব্‌ল চন্দ্রকর,
লিখ্‌ল ঊষা স্বর্ণ-লিপি রহস্য-অক্ষর।
এম্‌নি কি এক তন্দ্রা-ঘোরে বন্দী করে’ হায়,
কে আমারে অস্ত-পারে ভুলিয়ে নিয়ে যায়!
অঙ্গে তাহার শুক্ল-প্রবাল-লাবণ্য উল্লাস,
চন্দনেরি কুঞ্জ-পথে মন্দ-মৃদু-বাস,
অনুরাগের উচ্ছল হাসি, মঞ্জু গোলাপ-বন,
কণ্টকিত ঘোম্‌টা-খসা কান্তি চিরন্তন—

সীমার পরে জাগ্‌ছে সীমা, এলিয়ে প'ল প্রাণ—
রথের চাকায়, বাণের পাথায় হাওয়ায় ওঠে তান।

* * * * *

জীবন এসে গুঞ্জরিল আমার কাণে কাণে—
কোথায় যাবে কোন্ প্রবাসে আলোর অবসানে?
দেউলে ওই ঘণ্টা বাজে অরুণ-আরতির,
মধুমাসের পুষ্প-বেদী ফুল্ল প্রকৃতির,
চামেলি-যূঁই-মল্লী-বেলায় পূর্ণ বরণ-ডালা,
গেঁথেছি আজ তোমার লাগি' অভিষেকের মালা—'

* * *

ভ্রূ কুঞ্চিল মরণ-বধূ—রইনু নিরুত্তর,
অর্পিল মোর শিথিল শিরে তৃপ্তি-শীতল কর।
আবৃত এই বক্ষ-দোলায় স্পন্দন হ'ল সুরু
এগিয়ে এল রুদ্ধ অধর, নয়নবিহীন ভুরু—
যাদুকরীর ফুলের তোড়া মন্দ-বিষে ভরা,
বশীকরণ-মন্ত্র-গীতি সর্ব্বদুখহরা।

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়।

কাঙ্গালের উৎসবে।

সাধারণ কথায় বলে 'যদি পাও রাজ্য দেশ, তবু না যাও বৃহস্পতির শেষ।' রাজ্য দেশে লাভের প্রত্যাশা থাকিলে অবশ্য ভাবনা বা আশঙ্কার কথা ছিল। কিন্তু তত বড় দুরাকাঙ্ক্ষা আমাদের কাহারও হৃদয়ে ছিল না। আমরা জলধর দাদার স্নেহাহ্বানে, সাধক কাঙ্গাল হরিনাথের বাৎসরিক উৎসবে যোগ দিবার জন্য চলিয়াছিলাম। সুতরাং দাদার স্নেহ ও ভালবাসা হইতে কোনও দিন যে বঞ্চিত হইব না এমন ভরসা আমাদের বিলক্ষণ ছিল। অতএব বৃহস্পতির শেষ না মানিয়া বা গণিয়া রাত্রি একটা চব্বিশ মিনিটের গাড়িতে কুমারখালী যাত্রা করি। কেহ কেহ বলিতে পারেন, ইংরাজি মতে তখন শুক্রবার পড়িয়াছিল। আমরা বলি, আমরা বাঙ্গালী, কেন তাহা স্বীকার করিব!

বৃহস্পতিবারের বারবেলা মাথায় করিয়া "মানসী" কার্য্যালয়ে সন্ধ্যার পর একটী ছোটো খাটো কুমারখালী যাত্রা-সভা বসিল। সাহিত্য-পরিষদের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত

হইলেন। তখন তাঁহাকেই সভাপতিপদে বরণ করা হইল। তিনি সম্প্রতি রোগমুক্ত হইয়াছেন। শরীর তত ভাল নয়। সন্ধ্যার অনতিপূর্ব্বেই ঝড় বৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল। তথাপি আমাদের সঙ্গী হইতে তিনি বিশেষ আগ্রহাতিশয্য প্রকাশ করিলেন। তাঁহার ন্যায় সহযাত্রী লাভের আশায় আমরাও অত্যন্ত অনন্দিত হইলাম। 'মানসীর' কার্য্যাধ্যক্ষ সুবোধবাবুর বাড়ীতে সকলে সমবেত হইবেন ও সেখান হইতে একসঙ্গে যাত্রা করা হইবে এইরূপ স্থির হইয়া গেল। কেবল 'মানসীর' অন্যতম সম্পাদক সুবোধবাবু তাঁহার কটন ইস্কুলের ছাত্রাবাসে আমার জন্য অপেক্ষা করিবেন। তারপর উভয়ে সেখান হইতে শিয়ালদহে গিয়া সকলের সহিত মিলিত হইব। 'মানসীর' কবি-সম্পাদক যতীন্দ্র-মোহনকে শিয়ালদহের পথে সুবোধবাবু গাড়িতে তুলিয়া লইবেন।

রাত্রি আন্দাজ বারটার সময় যখন শিয়ালদহ ষ্টেশনে প্রবেশ করিতেছি, তখন দেখি, সাহিত্য-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশবাবুও চলিয়াছেন। আমাদের দেখিয়া বলিলেন "এই যে আপনারাও চলেছেন। আর কেউ আছে না কি?"

আমি বলিলাম হাঁ, আরও অনেকেই অছেন। টিকিট-ঘরের গবাক্ষে অনেক হাঁকাহাঁকি করিলাম; কাঁহারও সাড়া পাওয়া গেল না। অগত্যা প্লাটফরমে বেঞ্চের উপর আশ্রয় গ্রহণ করা হইল। তখন যাত্রী বিরল ষ্টেশন খাঁ খাঁ করিতেছিল। কেবল একজন শ্বেতপুঙ্গব সুরাদেবীর অতিরিক্ত আরাধনা করিয়া সারা প্লাটফরম ঘোড়দৌড় করিতেছিল। টলিতে টলিতে আসিয়া জড়িত কণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করিল "কখন গাড়ী ছাড়িবে?" সুরেশবাবু বলিলেন "এখনও একঘণ্টা বিলম্ব।" সে গাড়ীকে প্রিয় সম্বোধন করিয়া প্রস্থান করিল। অন্যান্য সঙ্গীদের সাক্ষাৎ নাই।

গাড়ী ছাড়িতে অনেক বিলম্ব; সুতরাং সুরেশবাবুর সহিত মাসিক পত্রিকা লইয়া নানা বিষয়ের আলোচনা হইতে লাগিল। কিরূপ অজস্র অর্থব্যয় ও অক্লান্ত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া তিনি এই চব্বিশ বৎসর "সাহিত্য" পরিচালনা করিতেছেন এবং কতপ্রকার অন্তরায় তাঁহাকে অতিক্রম করিতে হইয়াছে, সে সব কথাও যে না হইল, তাহা নয়। সম্পাদকের কর্ত্তব্যের কথা উঠিলে তিনি বলিলেন "দেখুন, কর্ত্তব্যের কথা দূরে থাক নিজের মতটিও আধুনিক সম্পাদকগণ রাখিতে পারেন না, সামান্য স্বার্থে আঘাত লাগিলে, তাঁহারা একেবারে আত্মহারা হইয়া পড়েন ও শত্রুতার সৃষ্টি করিয়া বসেন। শুধু ইহাই নয়, বিনিময় পত্রিকা পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া সম্পাদকের মর্য্যাদা ও ক্ষমতার পরিচয় দিয়া থাকেন। তাঁহাদের নিকট আর কতটুকু সম্পাদকের কর্ত্তব্য আশা করা যায়?"

আমরা বলিলাম "এ অভিজ্ঞতা এই সামান্য চারি বৎসরের মধ্যে বিলক্ষণ লাভ করিয়াছি। আপনার সাহিত্যও এখন পাই নাই।" "কেন! কেন! এখন সাহিত্য না আসিবার কারণ ত কিছু নাই, নিশ্চয় কর্ম্মচারীর ভুল। আমি ফিরিয়াই এ বিষয় অনুসন্ধান করিব।"

তাহার পর মাসিক-সাহিত্য সমালোচনার কথা অবলম্বন করিয়া তিনি একটী পুরাতন কাহিনীর অবতারণা করিলেন। বলিলেন "মাসিক-সাহিত্য সমালোচনা করা প্রথমে আমার মত ছিল না। কারণ, জানিতাম বাঙ্গালা দেশের লেখকের সমালোচনা সহ্য করিবার মত শক্তি নাই। বিরুদ্ধ সমালোচনা হইলেই তাঁহারা শত্রুতা মনে করেন। রবিবাবুই, আমার বেশ মনে আছে, "সাহিত্যে" মাসিক-সাহিত্য সমালোচনা করিবার জন্য প্রথম প্রস্তাব করেন এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সে নিমিত্ত অনুরোধ করিয়া অনেকগুলি পত্র পর্য্যন্ত লেখেন।

সাহিত্যের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য সমালোচনা যে নিতান্ত প্রয়োজন সে কথা অস্বীকার করি না। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে সত্যের সম্মান কয়জন রক্ষা করেন? এখনকার দিনে, যে সকল রচনা প্রকাশিত হইতেছে, আমার মনে হয় তাহার অধিকাংশই সমালোচনা করিয়া তিরস্কার করিবারও অনুপযুক্ত। কেবল অপহরণ ও ভেজাল দোষে পরিপূর্ণ।"

গাড়ী ছাড়িবার অর্দ্ধঘণ্টা থাকিতে, ট্রেণখানি ধীরে ধীরে প্লাটফরমে লাগিল। তখনও কাহারও দেখা নাই। টিকিট কিনিতে গিয়া দেখি, মানসীর কর্ম্মকর্ত্তা সুবোধবাবু এবং অন্যতম সম্পাদক কবি যতীন্দ্রমোহন, সুগায়ক বন্ধুবর জ্ঞান-প্রিয়বাবু, সোদরপ্রতিম শান্তি ও হপ্ সিং কোম্পানীর জনৈক প্রতিনিধি ক্যামেরা প্রভৃতি লইয়া গাড়ী হইতে অবতরণ করিতেছেন। যতীন্দ্রবাবু আসিবেন না, এরূপ আশঙ্কা দেখাইয়া গিয়াছিলেন। কারণ তাঁহার শরীর ভাল ছিল না। তাঁহাকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দ হইল। বন্ধুবর সুকণ্ঠ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু জলধর দাদাকে বলিয়াছিলেন "যদি না মরিয়া যাই তবেই, নতুবা আমার যাওয়া অনিবার্য্য।" সকলেই তাঁহার অনুসন্ধান করিলাম যদি তিনি পূর্ব্বাহ্নে আসিয়া বসিয়া থাকেন। ব্যোমকেশবাবুও আসিয়া জুটিতে পারেন নাই। তাঁহারও সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না।

জগতের নিয়মই এই, যাহা খুব ঠিক, তাহা অনেক সময় খুব বেঠিক হইয়া পড়ে। ব্যোমকেশবাবু ও যতীন্দ্রনাথের জন্য সকলেই সতৃষ্ণ নয়নে প্লাটফরমের দিকে চাহিয়া রহিলাম। গাড়ী আর ছাড়ে না। কাহারও চক্ষে নিদ্রা নাই।

সকলেই আনন্দে উৎফুল্ল। এমন সময় কেহ বলিল, "এখন কি ভাল লাগে বলুন দেখি?" উত্তরে নানা জনে নানা কথা বলিলেন। সুরেশবাবু বলিলেন "সব চেয়ে প্রিয় ও বাঞ্ছনীয় ঐ ঘণ্টার 'আওয়াজ'; এখন উহা অপেক্ষা মধুর আর কিছুই নয়।"

সত্যই দেড়ঘণ্টা অপেক্ষা করিবার পর যখন গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা হইল তখন সকলেই নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম। তখনও ব্যোমকেশবাবু ও যতীন্দ্রনাথের জন্য একবার কণ্ঠ বাড়াইয়া দেখা হইল। দ্বিতীয়ার চন্দ্র অনেকক্ষণ ডুবিয়া গিয়াছে। অন্ধকারে গাড়ী ছুটিয়া চলিল। কখন কোথা দিয়া, কোন্ ষ্টেশন চলিয়া গেল, কেহ তাহার সংবাদ রাখিল না; ইতিমধ্যে সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিবায় যে কয়টী পান ছিল তাহা ট্রেণে চুরি হইয়া গেল। মুখ নাড়িতেই চোর ধরা পড়িল।

পোড়াদহ আসিয়া গাড়ী একঘণ্টার অধিককাল অপেক্ষা করিল। সেখানে মুখ প্রক্ষালন প্রভৃতি প্রাতঃকালীন কার্য্যাদি সমাপন করা হইল। তারপর "চা, চা" শব্দ। বহুকষ্টে চা ত সংগ্রহ হইল। তার উপর বড় বড় রুটি ও একতাল মাখম 'গোপালগণের' প্রাতরাশেই অদৃশ্য হইল। প্লাটফরমের উপর একটী ক্ষুদ্রকায় 'সাহিত্য-সম্মিলন' হইয়া গেল। সম্মিলনের অন্যান্য অনুষ্ঠানগুলি ত্যাগ করিয়া কেবল ভোজনের পালাটাই বিশেষভাবে প্রতিপালিত হইল। সে কি উৎসাহ, কি আনন্দ, তাহা মুখে বলা যায় না। গাড়িতে উঠিয়া ছোট গল্পের সমালোচনা আরম্ভ হইল। নানাদেশের গল্প-লেখকের নাম হইল। তাঁহাদের গল্পের আর্টগুলিকে অবশ্য "আড়ষ্ট" করিয়া না দেখাইয়া গল্পের মধুর ভাব-গুলিই বিশ্লেষণ করিয়া দেখান হইল। সুরেশবাবু বলিলেন "আজ কাল যাহারা রবিবাবুর ভক্ত বলিয়া পরিচয় দিয়া গর্ব্ব করেন, দুঃখের বিষয় যে, তাঁহাদের অনেকেই রবিবাবুর সমস্ত রচনা পড়েন নাই। রবিবাবুর ভক্ত হইলে তাঁহাদের যে, সাহিত্য-জগতে একটু নাম হইতে পারে, এই আশায় তাঁহারা রবিবাবুর দুর্ব্বল রচনাগুলিও তর্কের স্থলে উদ্ধৃত করিতে মোটেই লজ্জিত হন না, অধিকন্তু রবিবাবুকেই ছোট করেন। একজনের সকল রচনাই যে সমান প্রতিভা মণ্ডিত হইতে পারে ইহা কেহই স্বীকার করেন না। কিন্তু এই ভক্তের দল সে কথা বা যুক্তি কিছুই মানিতে রাজি নন।"

যতীন্দ্রবাবু বলিলেন "রবিবাবুর গল্প সম্বন্ধে আপনার কিরূপ ধারণা?" সুরেশ বাবু বলিলেন "যতগুলি বিদেশী গল্পের বই পড়িয়াছি ও বঙ্গভাষায় যতগুলি গল্প

প্রকাশিত হইয়াছে, সেগুলির সহিত তুলনা করিলে আমরা স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি যে, রবিবাবুর অনেকগুলি গল্পজগতের গল্পসাহিত্যে শ্রেষ্ঠ আসন পাইবার যোগ্য। সত্য বলিতে কি সেগুলির তুলনা হয় না। যেমন "মেঘ ও রৌদ্র" "ক্ষুধিত পাষাণ" "কাবুলিওয়ালা" "সমাপ্তি" প্রভৃতি। ছোটগল্পের গৌরব তিনিই যে এদেশে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়।" আমি বলিলাম যে পরিমাণে তাঁহার গল্প শিক্ষিত সমাজে আদর ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে, মনে হয় ততটা কিন্তু সাধারণের ভিতর পায় নাই।"

তিনি বলিলেন "সে হিসাবে প্রভাতবাবুর গল্পের যথেষ্ট আদর। কিন্তু রবিবাবুর কবিত্বময়ী ভাষা ও উপমার তুলনা হয় না। মহাকবি কালিদাসের পর, উপমায় তাঁহার সমকক্ষ কেহই নাই বলিয়া আমার মনে হয়।" সুরেশবাবুর মুখে একথাগুলি বড়ই মধুর ও নূতন মনে হইল।

তারপর রবিবাবুর যৌবনের রচিত কবিতা ও গানের কথা উঠিল। সেগুলিরও সুরেশবাবু বিশেষ পক্ষপাতী দেখিলাম।

তারপর তিনি বলিলেন "আমাদের দেশের মাসিক পত্রিকাগুলির বিশেষ কোন একটী বিষয় লক্ষ্য বা অবলম্বন করিয়া প্রবন্ধাদি প্রকাশের জন্য একবারেই আগ্রহ বা চেষ্টা নাই। কতকগুলি লেখা ও ছবি দিয়া কাগজ পুরাইতে পারিলেই যেন সম্পাদকের কর্ত্তব্য করা হইল। এই সময় গাড়ী কুষ্টিয়া ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলে, স্বর্গীয় সুলেখক নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতি স্মরণ করিয়া অনেক দুঃখ করিলেন। কুষ্টিয়ার পরেই কুমারখালি। সুরেশবাবু বলিলেন "আজ যাত্রা শুভ, শঙ্খচিল দেখা গিয়াছে।' সারারাত্রি জাগরণ নিমিত্ত কিছুমাত্র ক্লান্তি কেহই অনুভব করেন নাই। সাধক, সাহিত্যিক, কাঙ্গালের আশ্রম দেখিব, নদীয়ারই কোলে আজ নগর সংকীর্ত্তনে মাতিব, জলধর দাদার গৃহে আজ অতিথি হইয়া তাঁহার স্নেহ, আদর, যত্ন অজস্র ধারায় লাভ করিব, ভাবিয়া হৃদয় আনন্দে ও হর্ষে মুহুর্ম্মুহু পুলকিত হইতেছিল। কতক্ষণে জলধর দাদার সহিত সাক্ষাৎ করিব, কতক্ষণে কাঙ্গালের সাধনকুটীর দর্শন করিব, কতক্ষণে গিয়া একসঙ্গে সকলে নদীতে স্নান করিব এই কথাই কেবল মনে হইতেছিল।

যথা সময়ে ষ্টেশনে গাড়ি পৌঁছিল। জলধরদাদা, শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় ও শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র সাহা সহাস্য আননে আমাদের অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া চলিলেন। বড় রাস্তা দিয়া না গিয়া একটী সরল সোজা পথে চলিলাম। পথের দুইধারে বাগান ও বাড়ী। পথিপার্শ্বস্থিত একটী বাগানের মধ্যে

মৃত্তিকার স্তূপ দেখাইয়া জলধরদাদা বলিলেন "এটা সিটী-কলেজের প্রিন্সিপাল হেরম্ববাবুর বাড়ী।" যদিও এখন বাড়ীর কোনও রূপ চিহ্ন বিদ্যমান নাই তথাপি নিরাকার বাড়ীর উপর একটী অতীতের মোহ আরোপ করিয়া তখনই সাকারের কল্পনা করিয়া লওয়া হইল, এবং সেই কল্পনার সাহায্যে বাড়ীটির বহুমুখে প্রশংসা হইয়া গেল।

তারপর দাদার বাড়ী জলযোগ, তাহা বর্ণনাতীত। দাদা যেন সেদিন হঠাৎ একসঙ্গে ছেলেমানুষ ও বড়মানুষ হইয়া গেলেন। কেমন করিয়া আমাদের আদর করিবেন, ভাবিয়া আকুল হইলেন। দাদার প্রতিবাসী শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র সাহার বাড়ীতে আমাদের আস্তানা পড়িয়াছিল। বাড়ীর সম্মুখেই একটী বৃহদাকার পুষ্করিণী পানা ও দলে মজিয়া আসিয়াছে। তাহারই একাংশ পরিষ্কার করিয়া কোনমতে কুলবধূগণ ঘাট সরিয়া থাকেন। অতুলবাবু অত্যন্ত বিনয়ী ও ভদ্রলোক। তাঁহার বিনয়নম্র মধুরসম্ভাষণ আমাদের বড়ই মুগ্ধ করিয়াছিল। পার্শ্বে দাদার শান্তিকুটীর হইতে রন্ধনের গন্ধ আসিতেছিল। দাদার বড়ছেলে অজয়, মেজছেলে অজিত এবং সেজ ছেলে অনিল 'চাঁমেহাল' অক্লান্তভাবে আমাদের সেবা ও যত্ন করিয়াছিল। এমন শান্ত সুশীল বালক বড় দেখা যায় না। অভ্যাগতের ও অতিথির প্রতি কিরূপ সমাদর ও সম্মান দেখাইতে হয়, কেমন করিয়া তাহাদের তৃপ্তি সাধন করিতে হয়, তাহা দাদার শিশুসৈন্যগণ বিশেষরূপ অবগত; কেবল অবগত বলিলে অন্যায় বলা হয়, তাহারা দাদার সুশিক্ষার ফলে এই সকল কার্য্যে বেশ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছে। দাদার ছোট ছেলেটীও ধূলাখেলা ত্যাগ করিয়া আমাদের লইয়া ব্যস্ত হইল। এ জল-যোগটী কিন্তু একটু কালকাতার মতেই হইয়াছিল—চা ইত্যাদি। তারপর স্নানাদি কার্য্য। দাদা আমাদের গৃহেই স্নান করিতে অনুরোধ করিলেন। অসম্মতি প্রকাশ করিয়া আমরা পুষ্করিণীতে যাইতে উদ্যত হইলে, দাদাও আমাদের সঙ্গী হইলেন। অজয়, অজিত আমাদের পাশে পাশে চলিল। এই স্নানপর্ব্বের ব্যপদেশে গ্রামের অনেকখানি পরিদর্শন হইয়া গেল। পুষ্করিণীর স্ফটিক-স্বচ্ছ জল, মেঘ ও রৌদ্রে, ছায়া ও আলোকে ঢল ঢল করিতেছিল। তুষার-শীতল জলে অবতরণ করিয়া প্রাণ স্নিগ্ধ হইল। সন্তরণ অনভিজ্ঞ সুরেশবাবু ও সুবোধবাবু জলে অল্প নামিয়াই অকস্মাৎ গতিহীন, মটরগাড়ীর অবস্থার মত অচলগতি লাভ করিলেন। আমরা ছাড়া-ঘোড়ার মত সারা সরোবর ছুটিয়া বেড়াইলাম। কবি যতীন্দ্র-

মোহন মৃতের অপূর্ব্ব অভিনয় করিয়া 'মড়া' ভাসিলেন। দাদা নূতন জলে অসুখ করিবে আশঙ্কা দেখাইলেন; কিন্তু কেহ, বড় সে কথায় কান দিল না। তারপর দ্বিতীয় সংস্করণ জলযোগ-পর্ব্ব। এবার "খাস" পাড়াগাঁয়ের মত, ঠিক বাঙ্গালীর মত, খাঁটী বাঙ্গলা মুলুকের মত। মিছরীর পানাও ঘোলের সরবৎ হইতে আরম্ভ করিয়া বেলের পানা, নানাবিধ ফল পর্য্যন্ত— কিছুরই অভাব ছিল না। আশ্চর্য্যের বিষয় কলিকাতা হইতে আনীত একটীও দ্রব্য তাহার ভিতর ছিল না—সবই গ্রামের। দাদার সেই "পাখী ডাকা ছায়ায় ঢাকা" পল্লীভবনে রেশারিশি করিয়া জলযোগ-সংগ্রাম তুমুলভাবে চলিল। তিন ইঞ্চি চতুষ্কোণ, একইঞ্চি স্থূল ছানার "টাইল" গুলি চক্ষের নিমিষে ভোজ-বাজীর ন্যায় অদৃশ্য হইতে লাগিল। ইহার পর আমরা কাঙ্গালের বাটী দর্শন করিয়া মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য বাসায় ফিরিলাম। মধ্যাহ্ন ভোজনের কথা স্মরণ করিয়া এখন আর লাভ নাই; কেন না, তাহা ত সহজসাধ্য বা অনায়াস-ভোগ্য নয়। সকল প্রকার মৎস্য এই শুভ-সম্মিলনে যোগদান করিয়াছিল। কই, মাগুর হইতে ইলিস্, পোনা, পুঁটি পর্য্যন্ত কেহই বাদ যান নাই। জলের জীব উদরে প্রবেশ করিয়া অবশেষে জল জল করিয়া অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল। এমন ভূরি-ভোজন বহুকাল ভাগ্যে হয় নাই। স্নেহবতী বৌদিদির নিপুণ গৃহিনীপণা সকল দিক হইতে প্রকাশ পাইতেছিল। ইহার উপর "পাল্লা দিয়া আহার"; উদরে এমন স্থান নাই যে একবিন্দু জল প্রবেশ করিতে পারে। এরূপ সঙ্কটাপন্ন অবস্থাতেও পূর্ব্ববর্ণিত মিষ্টান্ন কেহ ত্যাগ করিতে পারিলেন না। বালকবালিকাগুলি আহার দেখিয়া নিশ্চয়ই ভয় পাইয়াছিল। এই রাক্ষুসে অতিথিগুলি দুই দিন অবস্থান করিলেই দাদাকে যে মহাজনের খতে 'মহামহিম পাঠ' লিখিত হইত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভোজনান্তে উপবেশন-শক্তি লোপ, তাকিয়াদির অন্বেষণ ও রণক্ষেত্রে শায়িত সৈন্যের দশাপ্রাপ্ত। কেবল জ্ঞানপ্রিয়বাবু 'হারমোনিয়ম' লইয়া গান ধরিলেন, আর সুরেশবাবু অর্দ্ধ-হেলায়িত অবস্থায় শ্রোতার আসনখানি অলঙ্কৃত করিলেন। আমাদের কানের ভিতর দিয়া জ্ঞানপ্রিয়বাবুর কণ্ঠ-নিস্থত সুরলহরী মরমে পশিতেছিল। সুরেশবাবু কেবল রবিবাবুর গানগুলির প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করিলেন। গানগুলির রচনা-মাধুর্য্যের ভূয়সী প্রশংসা চলিল ও এক একটী গানের চরণ জ্ঞানপ্রিয়বাবুকে স্মরণ করাইয়া সে গুলি গাহিতে বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিলেন; এবং তাহার মধ্যে

কোন্ কোন্ গান তিনি রবিবাবুর মুখে শুনিয়াছেন তাহার উল্লেখ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমরাও বেশ একটু তাঁহাদের সাহিত্যিক জীবনের অতীত ইতিহাস জ্ঞাত হইলাম। তিনি এই গানটী পুনঃ পুনঃ গাহিতে অনুরোধ করিতেছিলেন—"মম যৌবন নিকুঞ্জে গাহে পাখী"—

সেদিন সুরেশবাবুর অনুরোধে আমরা বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়া গানটী বড়ই উপভোগ করিয়াছিলাম।

এই সময় কাঙ্গালের পুত্র শ্রীযুক্ত সতীশবাবু আমাদের সভায় যাইবার জন্য আহ্বান করিতে আসিলেন। তখন উত্থানশক্তি একরূপ রহিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কোন গতিকে সভায় উপস্থিত হওয়া গেল। বাসা হইতে সভা দুই মিনিটের পথ। সভায় দলে দলে নানাস্থান হইতে সংকীর্ত্তনের দল আসিতেছিল। যেমন একদল গান শেষ করিয়া প্রাঙ্গণে গিয়া জলযোগ ও বিশ্রাম করিতেছিল, অমনি আর একদল তাহাদের স্থান অধিকার করিতেছিল। সংকীর্ত্তনের বিশ্রাম নাই। আকাশে বাতাসে সর্ব্বত্রই যেন সংকীর্ত্তনের রোল ভাসিয়া বেড়াইতেছিল। চারিদিকেই আনন্দাশ্রুবিগলিত নয়ন ও হর্ষোৎফুল্ল মুখ। তবে একটী মুখের ভাব বড়ই হৃদয়স্পর্শী, হইয়াছিল, সেখানি একজন অতিবৃদ্ধ মুসলমানের। মস্তকের কেশ শুভ্র হইয়াছে, চক্ষু কোটরগত, মাংশপেশী শিথিল হইয়াছে; সে সভার অল্পদূরে, একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া আগ্রহভরে সহাস্যবদনে সংকীর্ত্তন শুনিতেছিল ও তালে তালে করতালি দিতেছিল। ধন্য কুমারখালী, ধন্য কীর্ত্তন, ধন্য কাঙ্গাল তোমার উৎসব। পুণ্যাহ অক্ষয়তৃতীয়ার দিন এই পবিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। যথার্থ এ উৎসব দর্শন করিলে যে পুণ্য সঞ্চয় হয়, তাহা অক্ষয়। এ পবিত্র দৃশ্য অবলোকন করিলে যে দর্শন হয়, তাহাও যে অক্ষয়, সে কথা মুক্ত-কণ্ঠে বলিতে পারি। পাষণ্ডেরও হৃদয় এই পবিত্র সম্মিলনে ভক্তি-বিগলিত হয়। ইতিপূর্ব্বে 'মানসীতে' কাঙ্গালের যে প্রতিকৃতিখানি প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা কাঙ্গালের শান্ত, সরল, অথচ ভক্তিদীপ্ত মধুর রসোদ্ভাসিত বর্ত্তমান তৈলচিত্রখানির সমকক্ষ নয়। সে মুখখানি দেখিলেই ভক্তি করিতে, পূজা করিতে আপনা হইতে একটী প্রেরণা হৃদয়ের মধ্যে জাগিয়া উঠে। সে মূর্ত্তিতে এমন একটা সার্ব্বজনীন প্রীতি ও প্রফুল্লতা বিরাজ করিতেছে যে, তাহার দিকে তাকাইলে নয়ন আর ফিরাইতে ইচ্ছা করে না। কাঙ্গালের তৈলচিত্রের একখানি আলোকচিত্র গ্রহণ করা হইয়াছিল। কিন্তু অতীব

দুঃখের বিষয় যে, মেঘের নিমিত্ত তাঁহার সে মধুর মোহন-মূর্ত্তি ফটোতে ভাল উঠে নাই।

সভায় জ্ঞানপ্রিয়বাবু দুইটী গান করেন, গান শ্রবণে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। হপ্‌সিং কোম্পানী সভার একটী ছবি গ্রহণ করেন। কাঙ্গালের কুটীরের ও কাঙ্গালের সহধর্ম্মিণীর—দুইখানি ফটো গ্রহণ করা হয়।

সভায় সুলেখক শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় মহাশয় কাঙ্গালের সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। তারপর গতমাসের মানসীতে প্রকাশিত, প্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয়ের প্রবন্ধটি পঠিত হয়। এই সময় বৃষ্টি আসায় সভার কার্য্য কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ থাকে। অতঃপর পুনর্ব্বার সভা আরম্ভ হয় ও সুরেশবাবু সুললিত ভাষায় একটী সুদীর্ঘ মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা করেন। ইহার পর সাধকপ্রবর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব মহাশয় সজল নয়নে কাঙ্গাল সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করেন। তাঁহার প্রাণস্পর্শী কথাগুলি, সকলেই মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় শ্রবণ করিয়াছিল। জলধরদাদা দুই চারি কথা বলিয়া সভা ভঙ্গ করেন। তারপর নগর সংকীর্ত্তন—সে এক অভিনব দৃশ্য। পথের দুইধারে পুরনারিগণ নববস্ত্রে ও অলঙ্কারে শোভিতা হইয়া ও পুত্রকন্যাগণকে অলঙ্কৃতা করিয়া আনন্দোল্লাসিত হৃদয়ে সংকীর্ত্তন শ্রবণ করিলেন। কেহ কেহ বাতাসা ছড়াইতে লাগিলেন। কেহ কেহ কুসুমমাল্যে ও দীপালোকে গৃহদ্বার সুশোভিত করিয়াছিলেন। নিজেরা ভক্তিভরে প্রণাম করিতেছেন, এবং ছোট ছোট জ্ঞানহীন ছেলেমেয়েগুলির মাথা নত করিয়া ধরিতেছেন। আমাদের এ অঞ্চলে দুর্গোৎসবের মধ্যে যে আনন্দ ও উল্লাস পরিদৃষ্ট হয়, যে নবশক্তি ও নবানুরাগ পরিস্ফুট হয়, কাঙ্গালের উৎসবে কুমারখালিতে ঠিক সমানভাবেই, সেইরূপ আনন্দের আয়োজন পরিদৃষ্ট হয়। সকল গ্রামবাসী, দরিদ্র দোকানী পশারী হইতে দিনমজুরেরাও এই উৎসব উপলক্ষে তাহাদের কাজকর্ম্ম বন্ধ দেয় ও আনন্দে নগর সংকীর্ত্তন করিয়া বেড়ায়। সংকীর্ত্তনকারিগণ অনেকরাত্রি পর্য্যন্ত গ্রাম প্রদক্ষিণ করে। তাহাদের অনেকেরই হাতে আলো থাকে। দূর হইতে দেখিলে অনুমান হয়, যেন একটী জমাট অন্ধকার আলোর মালা কণ্ঠে পরিধান করিয়া, উল্লাসে উন্মত্ত হইয়া, গান গাহিয়া দ্বারে দ্বারে ফিরিতেছে। প্রত্যেক গৃহস্থ যেন আগ্রহভরে তাহাকে আহ্বান করিতেছে। মনে হইল যেন, এই সঙ্গীতমুখর বন্ধুটীর সঙ্গে সঙ্গে সারারাত্রি ঘুরিয়া বেড়াই। দূরে খোল বাজিতেছিল—সকল কণ্ঠ মিলিয়া এক হইয়া একটী মধুর সুর বায়ুস্তরে

আমাদের হৃদয়ের স্পন্দনে ঐ একই খোলের 'আওয়াজ' ধ্বনিত হইতেছে, মনের কণ্ঠে ঐ একই গান গীত হইতেছে। সেই রাত্রিতেই দাদার নিকট বিদায় লইয়া কলিকাতা যাত্রা করিলাম। দাদা আসিবার সময় না খাইয়া কিছুতেই আসিতে দিলেন না। অবশ্য এ কথাটা লিখিতে পাঠক পাঠিকাদের নিকট যথেষ্ট লজ্জা অনুভব করিতেছি, কারণ ভবিষ্যতে কোথাও নিমন্ত্রণের বড় বিশেষ আশা রহিল না।

শ্রীফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ভিখারিণী

এসেছিনু ভিখারিণী, ভোর হতে বহির্দ্বারে
একলা আছিনু প্রতীক্ষায়,
এ হৃদয় ভিক্ষাপাত্রে প্রেমে পূর্ণ করিবারে
নীরবে রাখিতে কবু পায়।
শুনিলাম পদধ্বনি, তুলিনু চকিত আঁখি,
ধীরে ধীরে হিয়াখানি পদপ্রান্তে দিনু রাখি;
সম্মুখে পাইলে যাহা মৃদু হেসে তুলে নিলে;—
হেরিলে আনন্দ মোর, তাই ফিরে নাহি দিলে?
তোমারি সে অনুগ্রহ, দরিদ্রের উপহার
তুলে নিলে;—ভুলে গেনু কি করিতে হবে আর!

এসেছিনু ভিখারিণী দীনা,
ভিক্ষাবৃত্তি ছিল না তো জানা,
জানিনি তো এত যে কঠিন
প্রাণ দিয়ে প্রাণ টেনে আনা!

"দাও কিছু"—নারিনু কহিতে,
শিখি নাই চাহিবার ভাষা,
ভাল হ'ল, গিয়ে ভিক্ষা নিতে
যা আছিল সব দিয়ে আসা?

ভাল হল, তুমি জান নাই
এ জনের দরিদ্রতা কত,
ক্ষুধা ঢেকে ঘরে ফিরে যাই
গান গেয়ে সুখীদের মত।

শ্রীমতী কামিনী রায়।

ইংরাজ ও পাঠান।

রাত্রি অন্ধকার। পেশাওয়রের নিকট মর্দ্দান নামক স্থানে সৈন্তশিবির। দূরে অন্ধকারে আকাশপ্রান্তে পর্ব্বতশ্রেণী অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে। শীতকাল। সে দেশে অত্যন্ত শীত, আগুন না জ্বালিয়া রাত্রি কাটান কঠিন। তাহাতে মাঠের মধ্যে তাঁবু পড়িয়াছে, ছোট ছোট তাঁবুর ভিতর আগুন জ্বালিবার হুকুম নাই, কেবল কয়েকটা বড় তাঁবুতে আগুন জ্বলিতেছে।

এই প্রদেশে পল্টন হইতে বন্দুক চুরী যাইবার অত্যন্ত আশঙ্কা। সিপাহী ও গোরাদিগকে যে বন্দুক দেওয়া হয় বাজারে তাহা পাওয়া যায় না। আফ্রিদী প্রভৃতি যে সকল জাতি পেশওয়ারের পশ্চিমে ও উত্তরে বাস করে তাহারা যেমন করিয়াই হউক এই সকল বন্দুক চুরী করে। বন্দুকে তাহাদের লক্ষ্য অব্যর্থ, তাহাদের নিকট বন্দুকের মত আর মূল্যবান সামগ্রী নাই।

এই কথা জানিয়া শিবিরে বিশেষ যত্নপূর্ব্বক বন্দুক রক্ষিত হইয়াছিল। শিবিরের মধ্যস্থলে একটা প্রকাণ্ড তাঁবুর ভিতর স্তূপাকারে বন্দুকরাশি সজ্জিত করিয়া ইংরাজ সৈনিকেরা চারিপাশে শয়ন করিয়াছিল। তাহারা এরূপভাবে শয়ন করিয়াছিল যে কাহারও নিদ্রাভঙ্গ না করিয়া কোন অপর ব্যক্তির বন্দুকের নিকটে যাওয়া অসম্ভব। সজ্জিত বন্দুকের চারি ধার ঘিরিয়া অগ্নি, তাহার পর গোরারা শয়ন করিয়াছে; সকলের মস্তক বন্দুকের দিকে আর পা অন্য দিকে। বন্দুকগুলাকে কেন্দ্র করিয়া গোরারা চক্রাকারে শয়ন করিয়াছে, তাহাদের ভিতর দিয়া কাহারও যাওয়া বা তাহাদিগকে লঙ্ঘন করা অসম্ভব।

তাঁবুর বাহিরেই পাহারা। প্রহরী ভরা বন্দুক লইয়া পাদচারণ করিতেছে। শিবিরের প্রবেশমুখে শিখ সান্ত্রীর পাহারা, শিবিরের ভিতর স্থানে স্থানে গোরার পাহারা, সকলেই সতর্ক. সকলেই তীক্ষ্নদৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিয়া দেখিতেছে।

রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। একে অন্ধকার রাত্রি, তাহার উপর মেঘ আসিয়া চারিধারে ঘিরিয়াছে, অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছে। বিদ্যুৎ বিলসন একেবারেই নাই। সেই শীত বৃষ্টি অন্ধকারে প্রহরীরা একদিক হইতে আর এক দিক পাদচারণ করিতেছিল। নিস্তব্ধ অন্ধকারে মস মস্ করিয়া তাহাদের বুটের শব্দ হইতেছিল।

যে তাঁবুতে বন্দুক সমূহ রক্ষিত ছিল সেখান হইতে শিবিরের প্রবেশদ্বার অনেকটা দূর। মধ্যস্থলে যে প্রহরী ফিরিতেছিল সে সহসা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল।

শিবিরের স্থান সমভূমি নয়, সে প্রদেশে সমভূমি বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। শিবিরের মধ্যে স্থানে স্থানে ছোট ছোট মাটীর স্তূপ, ভূমি উচুনীচু, কিন্তু স্তূপ গুলা এত নীচু যে তাহার পাশে কোন মানুষ লুক্কায়িত থাকা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না।

যে প্রহরী স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল সে গোরা। তাহার মনে হইল যে অল্প দূরে একটা স্তূপের পাশে কি নড়িতেছে। কুকুর না বিড়াল? অনুমানে বোধ হইল একটা ছোট জন্তু হইবে। মানুষের মত নয়। তথাপি প্রহরী বন্দুক তুলিয়া গভীর স্বরে হাঁকিল, "Who comes there?"

কোন উত্তর নাই, জনপ্রাণীর চিহ্ন নাই, মাটীর ঢিবি যেমন পড়িয়াছিল সেই-রূপ পড়িয়া রহিয়াছে। প্রহরী আর একবার হাঁকিয়া গুলি করিবার উপক্রম করিল, কিন্তু শুধু মাটীতে গুলি করিয়া সমস্ত শিবির জাগাইয়া কি ফল? নিশ্চয় প্রহরীর চক্ষের ভ্রম হইয়া থাকিবে; সে বন্দুক নামাইল।

২

শিবিরের মধ্যস্থলে বড় তাঁবুর সম্মুখে প্রহরী ফিরিতেছিল। তাহার টুপি বহিয়া ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টির জল পড়িতেছিল। তাহাতে দেখিবার অসুবিধা হওয়াতে সে মধ্যে মধ্যে হাত দিয়া টুপির জল মুছিয়া ফেলিতেছিল। দেখিবেই বা কি? রাত্রি যেমন গভীর হইতে লাগিল মেঘ তেমনি পুঞ্জীভূত হইতে লাগিল, অন্ধকার গাঢ়তর হইতে লাগিল, বৃষ্টি অপেক্ষাকৃত জোরে পড়িতে লাগিল।

তাঁবুর যে দিকে প্রহরী ছিল তাহার অপর দিকে কি হইতেছিল কোন প্রহরীই কিছু দেখিতে পায় নাই। যদি রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী হইত অথবা আকাশে বিদ্যুৎ চমকিত তাহা হইলে তাহারা দেখিতে পাইত যে, তাঁবুর নিকটে বৃহৎ সরীসৃপের মত কি একটা জীব পড়িয়া আছে। অত্যন্ত ধীরে, অলক্ষ্য ভাবে একটু অগ্রসর হয়, আবার অনেকক্ষণ নিস্পন্দ হইয়া পড়িয়া থাকে। অগ্রসর হইবার সময় কিছুমাত্র শব্দ হয় না। এইরূপে তাঁবুর পাশে আসিল। সেখানে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। তাহার পর অত্যন্ত সন্তর্পণে তাঁবুর এক অংশ সরাইয়া ভিতরে চাহিয়া দেখিল।

সে সময় গোরাদিগের মধ্যে কেহ জাগিয়া থাকিলে দেখিতে পাইত যে এক জোড়া উজ্জ্বল চক্ষু তাঁবুর চারিদিকে তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতেছে। কিন্তু গোরারা গভীর নিদ্রায় অভিভূত, কেহ কিছুই দেখিল না। যে তাঁবুর চারিদিকে দেখিতে-ছিল সে ধীরে ধীরে গড়াইয়া তাঁবুর ভিতর প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়া

মৃতের মত পড়িয়া রহিল। তাহার পরিধানে কৃষ্ণবর্ণ কৌপীন, অঙ্গে আর কোন বস্ত্র নাই। সর্ব্বাঙ্গে তৈল, বসা ও মসী-মর্দ্দিত, আকৃতি ভূতের ন্যায়। দীর্ঘকেশ, ঘন শ্মশ্রু, মসীলিপ্ত কৃষ্ণবর্ণ মুখের মধ্যে চক্ষুদ্বয় অঙ্গারখণ্ডের মত জ্বলিতেছে; কটিতে ভরা পিস্তল, দক্ষিণ হস্তে শাণিত ছোরা। তাঁবুতে প্রবেশ করিয়া সে স্তব্ধ হইয়া অনেকক্ষণ পড়িয়া রহিল। শব্দের মধ্যে নিদ্রিত সৈনিক-দিগের নাসাধ্বনি ও বাহিরে প্রহরীর বুটের শব্দ।

যে ব্যক্তি তাঁবুতে প্রবেশ করিয়াছিল সে পাঠান। গোরাদের সকলে নিদ্রিত দেখিয়া আবার ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। নিদ্রিত গোরাদিগের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া নিঃশব্দে একটা বন্দুক উঠাইয়া লইয়া আবার ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিল। যখন সে তাঁবুর ধারে আসিল তখন সহসা এক জন গোরার নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল। তাহার চক্ষুর সহিত পাঠানের চক্ষু মিলিল। গোরা এত বিস্মিত হইয়াছিল যে তাহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না, একদৃষ্টে পাঠানের উলঙ্গ মূর্ত্তি দেখিতে লাগিল। যখন পাঠান তাঁবুর বাহির হইয়া গেল তখন গোরা "চোর চোর" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

মুহূর্ত্তমধ্যে নিদ্রিত শিবির জাগরিত হইয়া উঠিল। সৈনিকগণ সম্মুখে যে অস্ত্র পাইল লইয়া তাঁবুর বাহির হইল। প্রহরীদিগের বন্দুকের আওয়াজ, সৈন্য-দিগের কোলাহল, ও মশালের আলোকে শিবির-ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল, কিন্তু বন্দুক অপহরণকারী পাঠানের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

৩

যে গোরা পাঠানকে দেখিতে পাইয়াছিল তাহার নাম ম্যাক্‌ডোনাল্ড। হাই-ল্যাণ্ডর পল্টন। তদন্তের সময় সে যাহা দেখিয়াছিল বলিল, তবে পাঠানকে দেখিয়া যে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া ছিল সে কথা প্রকাশ করিল না। সে কহিল যে পাঠানকে দেখিবামাত্র সে চীৎকার করিয়া তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়াছিল, কিন্তু অন্ধকারে তাহাকে দেখিতে পায় নাই। অনেক অনুসন্ধান করিয়াও পাঠানের অথবা অপহৃত বন্দুকের কোন সংবাদ পাওয়া গেল না।

কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল। সেই পল্টন লাহোরের নিকট মিয়ামীর নামক ছাউনিতে আসিল। এক দিন ছাউনির বাজারে কয়েক জন গোরা ও বাজারের লোকের সঙ্গে একটা ছোট রকম দাঙ্গা হয়। সেই অবধি কয়েক দিন পল্টনের পুলিস ভরা বন্দুক লইয়া বাজারে সকল রাস্তা পেট্রল করিত। এক দিন সন্ধ্যার সময় ম্যাক্‌ডোনাল্ড কোন প্রয়োজনে বাজারে যায়। তাহার কোমরে

সঙ্গীন ছিল, হস্তে আর কোন অস্ত্র ছিল না। পথে যাইতে ম্যাকডোনাল্ড দেখিল একজন পাঠান একটা দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে।

তাহাকে দেখিবামাত্র ম্যাক্‌ডোনাল্ড চিনিল। এখন পাঠানের শুভ্রবেশ, মাথায় পাগড়ী, পায়ে পেশাওয়ারী জুতা, তেলকালি মাখা উলঙ্গ বীভৎস মূর্ত্তি নয়। কিন্তু ম্যাক্‌ডোলাল্ড দেখিয়াই চিনিল যে এই ব্যক্তি বন্দুক চুরী করিয়াছিল। তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইয়া পাঠানের হস্ত ধারণ করিল।

ইংরাজের সৈন্যবিভাগের শিক্ষার এই গুণ যে সৈনিকেরা সহজে ধৈর্য্যচ্যুত বা বিচলিত হয় না। গোলযোগ বা অনর্থক চীৎকার করা তাহাদের অভ্যাস নয়। ম্যাক্‌ডোনাল্ড কাহাকেও ডাকিল না, কোন গোল করিল না। পাঠানকে ধীরে কহিল, "তুমি মর্দ্দানে শিবির হইতে বন্দুক চুরা করিয়াছিলে, আমি তোমায় চিনিতে পারিয়াছি। তোমাকে গ্রেপ্তার করিতেছি।"

পাঠান পশ্‌তো ভাষায় ম্যাক্‌ডোনাল্ডকে গালাগালি দিয়া হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিল। ম্যাক্‌ডোনাল্ড দুই হাত দিয়া পাঠানের হাত চাপিয়া ধরিল।

সেই সময় মিলিটারী পুলিস সেই পথে আসিতেছিল। তাহাদের নেতা একজন সার্জেন্ট। সে দেখিল একটা পাঠান একজন সৈনিকের সঙ্গে হাত কাড়াকাড়ি করিতেছে। সে অমনি হুকুম দিল, "Quick march! Double!" সৈনিকেরা সমপদক্ষেপে পথ ধ্বনিত করিয়া ধাবিত হইল।

ধরা পড়িয়াছে জানিয়া পাঠান ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হইল। "কাফের" বলিয়া বল পূর্ব্বক হস্ত ছাড়াইয়া লইয়া পলকের মধ্যে বস্ত্র হইতে ছোরা বাহির করিয়া ম্যাক্‌ডোনাল্ডের পেটে বসাইয়া দিয়া ছোরা ঘুরাইয়া দিল। তাহাতে ম্যাক্‌ডোনাল্ডের পেটের অন্ত্র কাটিয়া গেল। "পাঠান আমাকে মারিল," বলিয়া ম্যাক্‌ডোনাল্ড পথের মধ্যে পড়িয়া গেল। রক্তাক্ত ছোরা হাতে করিয়া পাঠান বেগে পলায়ন করিল।

বাজারের লোক কোলাহল করিয়া উঠিল, "গাজী, গাজী! গজা কিয়া!" নিমেষের মধ্যে পথ পরিষ্কার হইয়া গেল, গাজী পাঠানের ভয়ে যে যেদিক পাইল পলায়ন করিল।

এই ঘটনা দেখিয়া পেট্রলের সৈনিকেরা আরও বেগে দৌড়িল। এক জন কেবল দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়া, স্থির হইয়া, বন্দুক তুলিয়া পলায়নপর পাঠানের প্রতি লক্ষ্য করিল।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

লীমেট্‌ফোর্ড বন্দুকে অধিক আওয়াজ হয় না। ধূমশূন্য বারুদে বেশী ধূঁয়া হয় না। কড়াক্‌, পীং করিয়া একটা তীক্ষ্ণ, তীব্র শব্দ হইল। পাঠান দৌড়িতে দৌড়িতে দুই হাত তুলিয়া শূন্যে লম্ফ দিয়া উঠিল। তাহার পর "দীন" বলিয়া চীৎকার করিয়া পড়িয়া গেল। আর উঠিল না।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

শশাঙ্ক

৮

রোহিতাশ্বদুর্গের ভগ্ন প্রাচীরে বসিয়া কতকগুলা কাক ভীষণ চীৎকার আরম্ভ করিয়াছে, তখনও দুর্গবাসিগণ নিদ্রিত। কাকের চীৎকারে রঘুর নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে উঠিয়াই দেখিল বৃদ্ধা নানিয়া তখনও ঘুমাইতেছে, তখন সে তাহাকে সজোরে ঠেলিয়া দিয়া বলিতে লাগিল, "কাকগুলার চীৎকারে বোধ হয় প্রভুর নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল, তোর কি জ্ঞান নাই, বেলা যে প্রহর হইতে চলিল।" দন্তহীনা বৃদ্ধা চোক মুছিতে মুছিতে উঠিয়া বসিল এবং হাসিয়া বলিল, "তুই যত বুড়া হইতেছিস্‌ ততই যে তোর রসিকতার মাত্রা বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিতে পাই। তুই না উঠিয়া বসিয়াছিলি? তুই কাকগুলা তাড়াইয়া দুর্গস্বামীর উপকার করিতে পারিস নাই।" রঘু একগাল হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "তবে তুই শুইয়া থাক, আমি কাক তাড়াইয়া আসিতেছি।" বৃদ্ধ গৃহ হইতে বাহির হইতে গিয়া একটা বড় থলিয়ায় বাধিয়া পড়িয়া গেল, বৃদ্ধা সত্রাসে "হাঁ হাঁ" করিয়া উঠিল। রঘু ভূপৃষ্ঠ হইতে উঠিবার পূর্ব্বে থলিয়াটা বাকিয়া পড়িল, গৃহকোণে স্তরে স্তরে নূতন মৃৎভাণ্ড সজ্জিত ছিল, সেগুলি সশব্দে বৃদ্ধের মস্তকে পতিত হইল, বৃদ্ধা পুনরায় "হায় হায়" করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। এইবারে রঘুর আঘাত লাগিয়াছিল, বৃদ্ধাবস্থায় আঘাত লাগিলে বেদনা অধিকক্ষণ স্থায়ী হয়, সে মৃৎভাণ্ড সমূহের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে দাঁড়াইয়া নিজের মস্তকে ও পৃষ্ঠদেশে হাত বুলাইতে লাগিল। বৃদ্ধা বলিল, "আহা তোর বড় লাগিয়াছে, না?" বৃদ্ধ প্রথমবার উত্তর করিল না। তখন সহানুভূতি দেখাইবার জন্য বৃদ্ধা দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করিল। বৃদ্ধ রাগিয়া উত্তর করিল, "তোর আর প্রেমে কাজ নাই, আমার মাথাটা বোধ হয় ভাঙ্গিয়া গুঁড়া হইয়া গিয়াছে। তুই এখন বুড়া হইয়াছিস্‌, চোখে মোটেই দেখিতে

পাস্ না, কোথায় কি রাখিস, তাহার ঠিক থাকে না।" বৃদ্ধ বিস্মিত হইল বলিল, "আমি এ ঘরে নূতন ভাণ্ড রাখিতে যাইব কেন? সবই:ত চিরকাল ভাণ্ডারে রাখি, দেখ্ বুড়া, আমিও তাই ভাবিতেছিলাম এঘরে এত নূতন হাঁড়ী ও থলিয়াটা কোথা হইতে আসিল।" বৃদ্ধ অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিল, "তবে দৈত্যরাজ তোর রূপে মোহিত হইয়া তোর জন্য এই সমস্ত রাত্রিকালে রাখিয়া গিয়াছে। তুই এখন বচন ছাড়িয়া একটু জল লইয়া আয়, আমার পিঠ বহিয়া স্রোতের মত রক্ত পড়িতেছে, হায়, হায়, রক্তে দেখিতেছি কাপড়খানি ভিজিয়া গেল।" বৃদ্ধা অগ্রসর হইয়া দেখিল রঘুর মস্তক হইতে শ্বেতবর্ণ তরল পদার্থ নির্গত হইয়া তাহার পৃষ্ঠদেশ বহিয়া তাহার বসন সিক্ত করিতেছে। ঊর্দ্ধে চাহিয়া দেখিল যে সমস্ত মৃৎভাণ্ডগুলি পড়িয়া যায় নাই, তিন চারিটা তখনও গৃহকোণে দণ্ডায়মান আছে, উপরের ভাণ্ডটি ফাটিয়া অবিরাম ধারে শ্বেতবর্ণ তরল পদার্থ নির্গত হইয়া তখনও বৃদ্ধের মস্তকে পতিত হইতেছিল। নানিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিল যে কয়টা ভাণ্ড ভাঙ্গিয়া গিয়াছে তাহার মধ্য হইতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে মোদক ও লড্ডুক নির্গত হইয়া গৃহতলে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। কোন ভাণ্ড হইতে গলিত শর্করাসিক্ত পিষ্টকখণ্ড বাহির হইয়া কর্দ্দমের ন্যায় বৃদ্ধের গায়ে সংলগ্ন রহিয়াছে, শর্করার রস ভূতলে পতিত হইয়া গৃহতল কর্দ্দমাক্ত করিয়া তুলিয়াছে। বৃদ্ধা তাহা দেখিয়া আর হাস্য সংবরণ করিতে পারিল না, দন্তহীন বদন ব্যাদান করিয়া উচ্চহাস্যে জীর্ণগৃহ কম্পিত করিয়া তুলিল। বৃদ্ধ রাগত হইয়া বৃদ্ধাকে গালি দিতে আরম্ভ করিল হাস্যের বেগ মন্দীভূত হইলে নানিয়া বলিল, "তোর গায়ে ও মাথায় কি লাগিয়া রহিয়াছে দেখ্ দেখি? তুই ত ভাবিতেছিস যে তোর মাথা ভাঙ্গিয়া বারখানা হইয়া গিয়াছে।" রঘু সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কৈ?"

বৃদ্ধা। লড্ডুক, মোদক আর পিষ্টক।

রঘু। হাঁরে এসব কোথা হইতে আসিল? হে ঠাকুর, তোমার নাম করিয়া ঠাট্টা করিয়া অপরাধ করিয়াছি, মার্জ্জনা কর, আমি কল্য প্রাতে তোমার বৃক্ষতলে একটি কুক্কুট বলি দিয়া আসিব। দেখ বুড়ি, এসব নিশ্চয়ই [illegible]ক ব্যাপার। দশ বৎসরের মধ্যে দুর্গে কেহ মিষ্টান্ন আনে নাই, আজ হঠাৎ কে আসিয়া মিষ্টান্ন বৃষ্টি করিয়া গেল?

বৃদ্ধা সভয়ে বলিয়া উঠিল "তাই ত!" এমন সময়ে দ্বারপথে মনুষ্যের

ছায়া পতিত হইল, সুবর্ণবণিক ধনসুখ জিজ্ঞাসা করিল "বায়ু উঠিয়াছে কি? হায় হায় হাঁড়ি গুলা ভাঙ্গিয়া ফেলিলে? জপিল গ্রামের মোদকগণ দুর্গস্বামীর জন্য মিষ্টান্ন পাঠাইয়াছিল।" রঘু একগাল হাসিয়া বলিল "তবে ইহা ভৌতিক কাণ্ড নহে! তাহা এতক্ষণ বলিতে হয়।" এই বলিয়া ভূতল হইতে একটী লড্ডু লইয়া বদনে নিক্ষেপ করিল, বলিল "আহা নানিয়া অনেক দিন এমন লড্ডু খাই নাই, তুই একটা খাইয়া দ্যাখ।" এইরূপে একটার উপর আর একটা করিয়া ভূতলস্থিত মিষ্টান্নগুলি উদারসাৎ করিল। তাহার গায়ে যে পিষ্টকখণ্ডগুলি লাগিয়াছিল তাহাও খুঁটিয়া খুঁটিয়া যথাস্থানে প্রেরণ করিল। বৃদ্ধা তাহার কাণ্ড দেখিয়া মুখে কাপড় দিয়া হাসিতেছিল। ধনসুখ গম্ভীর ভাবে দ্বারে দাঁড়াইয়াছিল। সমস্ত শেষ হইয়া যাইলে বৃদ্ধ নানিয়াকে বলিল "উপরের হাঁড়িটায় কি আছে দ্যাখ দেখি! বৃদ্ধা হাসিয়া বলিল "ওটায় আর তোর নজর দিয়া কাজ নাই, উহা প্রভুর জন্য আসিয়াছে, তুই আর খাইলে ফাটিয়া মরিয়া যাইবি, শীঘ্র ওঠ।" ধনসুখ মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল "রঘু! দুর্গপ্রাঙ্গণে বহুলোক দুর্গস্বামীর প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে, তুমি তাঁহাকে সংবাদ দিয়া আইস।" বৃদ্ধ ধীরে ধীরে উঠিয়া দেহ প্রক্ষালন করিল, তাহার পর বহুপ্রাচীন উষ্ণীষ বন্ধন করিয়া দুর্গস্বামীর কক্ষে চলিয়া গেল। তখন নানিয়া ধনসুখকে জিজ্ঞাসা করিল "ধনসুখ, এত মিষ্টান্ন ও অপরাপর দ্রব্যাদি কোথা হইতে আসিল?" ধনসুখ বলিল "রোহিতাশ্বদুর্গের প্রজাগণ আনিয়াছে, এখনও অনেক জিনিষ বাহিরে পড়িয়া আছে। আমরা ভাণ্ডার খুঁজিয়া না পাইয়া কতক কতক তোমাদের ঘরে তুলিয়া দিয়াছি, অবশিষ্ট এখনও বাহিরে পড়িয়া আছে।"

নানিয়া। অপেক্ষা কর, আমি গৃহতল পরিষ্কার করিয়া লই।

বৃদ্ধা সম্মার্জ্জনী লইয়া মৃৎভাণ্ড সমূহের ধ্বংসাবশেষে পরিষ্কার করিতে নিযুক্তা হইল। ধনসুখ গৃহ হইতে নির্গত হইয়া গেল। বৃদ্ধা গৃহের বাহিরে আসিয়া দেখিল, দুর্গের বিস্তৃত প্রাঙ্গণ লোকে ভরিয়া গিয়াছে, সহস্রাধিক লোক একত্র সমবেত হইয়াছে। তাহাদিগের সম্মুখে আহার্য্য দ্রব্যসম্ভার স্তূপীকৃত হইয়াছে। আটা ঘৃত, তণ্ডুল, তৈল ও শর্করার শত শত গলিয়া ও পাত্র প্রাঙ্গণের এক দেশে ক্ষুদ্র প্রাকারের সৃষ্টি করিয়াছে। বৃদ্ধাকে যাহারা চিনিত না, তাহারা তাহাকে দুর্গস্বামিনী ভাবিয়া প্রণাম করিতে

যাইতেছিল, যাহারা তাহাকে চিনিত তাহারা তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া রাখিল। নানিয়া দেখিল যে, তাহার পক্ষে দ্রব্যাদি ভাণ্ডারে লইয়া যাওয়া অসম্ভব, তখন সে গৃহে ফিরিয়া গেল।

দুর্গস্বামী উঠিয়া শয্যায় বসিয়া আছেন, রঘু তাঁহার বস্ত্রাদি লইয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে, এমন সময় হাসিতে হাসিতে আলুলায়িত কেশপাশ উড়াইয়া বিদ্যুৎবরণী গৌরী কক্ষমধ্যে প্রবিষ্টা হইল এবং বলিল, "দাদা, উঠ না, তোমার জন্য কত লোক আসিয়া বাহিরে বসিয়া আছে।" বৃদ্ধ হাসিয়া বলিলেন, "এই যাই।" রঘু প্রভুর হস্তে বস্ত্র দিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

দুর্গপ্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে সুদূর মৎস্যদেশ হইতে আনীত শ্বেতপ্রস্তর-নির্ম্মিত একটি অলিন্দ ছিল, বার্দ্ধক্যবশতঃ এবং সংস্কারের অভাবে তাহা জীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তাহার ছাদের এক অংশ পতিত হইয়াছিল। ছাদের যে অংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে তাহাতে একটি বৃহৎ অশ্বত্থ বৃক্ষ স্থানলাভ করিয়াছে। অলিন্দে শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত গৃহতলে ব্রহ্মশিলানির্ম্মিত দ্বাদশ-কোণ একখানি সিংহাসন স্থাপিত আছে; প্রাচীনত্বে রোহিতাশ্বদুর্গের সমান। দুর্গস্বামিগণ চিরকাল এই অলিন্দের, এই সিংহাসনে বসিয়া প্রজাবৃন্দের আবেদন শ্রবণ ও বিচার করিতেন। ধবলবংশীয় মহাশয়গণ মহামূল্য কারুকার্য্যখচিত শ্বেত ও কৃষ্ণ মর্ম্মর প্রস্তরে অলিন্দের প্রাচীর ও স্তম্ভগাত্র সজ্জিত করিয়াছিলেন। দুর্গস্বামী যখন বিচারে বসিতেন তখন দুর্গরক্ষী সেনাগন প্রাঙ্গণে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইত, অধীনস্থ সেনানায়ক ও ক্ষুদ্র ভূস্বামিগণ মহানায়কের সম্মুখে আসন পাইত, অপরাপর ব্যক্তিগণ নগ্নপদে দণ্ডায়মান থাকিত। কৃষ্ণবর্ণ আসনের উপরে সুবর্ণের দ্বিতীয় সিংহাসন স্থাপিত হইত, তাহার উপর বারানসীর সুবর্ণমণিমুক্তা খচিতা কৌষেয় আস্তরণ বিস্তৃত হইত, রোহিতাশ্বদুর্গের মহাশয়গণ তদুপরি উপবেশন করিতেন। দুর্গ-স্বামিগণের সৌভাগ্যলক্ষ্মীর সহিত সমৃদ্ধির চিহ্নসমূহ বহুপূর্ব্বে অন্তর্হিত হইয়াছে, কেবল সিংহাসনদ্বয় রক্ষিত হইয়াছিল। সুবর্ণের সিংহাসন খানি বহুমূল্য হইলেও দুর্ভিক্ষপীড়িত মহাশয়গণ অভিমানে ও লজ্জায় উহা বিক্রয় করিতে পারেন নাই, তাহা অতি যত্নের সহিত পাষাণনির্ম্মিত আধারে রক্ষিত হইত। পুত্রের মৃত্যুর পূর্ব্বে যশোধবলদের সময়ে সময়ে প্রজাবৃন্দের দর্শন দিতেন এবং কীর্ত্তিধবল প্রতিদিন আবশ্যক কার্য্য নির্ব্বাহার্থ অলিন্দে উপবেশন করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর অলিন্দে আর কেহ উপবেশন করেন নাই,

আটবৎসরের মধ্যে বহুমূল্য প্রস্তরের ছাদ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে এবং ধ্বংসাবশেষের উপরে অশ্বত্থ বৃক্ষ জন্মিয়াছে।

রঘু দুর্গস্বামীর গৃহ হইতে নির্গত হইয়া অলিন্দের দিকে আসিল এবং ধনমুখকে বলিয়া কতকগুলি যুবককে সঙ্গে লইল এবং তাহাদিগের সাহায্যে অলিন্দতল হইতে ভগ্ন প্রস্তরখণ্ডগুলি সরাইয়া ফেলিল। তাহার পর ধনমুখের সাহায্যে প্রস্তরাধারের আবরণ মোচন করিয়া স্বর্ণ সিংহাসনখানি বাহির করিল। উভয়ে মিলিয়া সিংহাসনখানি লইয়া বাহিরে আসিল এবং উহা কৃষ্ণবর্ণ সিংহাসনের উপর স্থাপন করিল। সিংহাসনের কারুকার্য্য অপূর্ব্ব, তাহা দেখিবার জন্য চারিদিক হইতে লোক ঝুঁকিয়া পড়িল। অতিবৃদ্ধগণ ব্যতীত কেহই রোহিতাশ্ব দুর্গস্বামিগণের সিংহাসন দর্শন করে নাই। চারিটি সুবর্ণনির্ম্মিত সিংহপৃষ্ঠে একটি প্রস্ফুটিত স্বর্ণপদ্ম সংস্থাপিত, তাহার উপরে মণিমুক্তাখচিত বহুমূল্য বস্ত্রের সুখাসন। সংস্কার অভাবে আবরণ জীর্ণ হইয়া তুলা বাহির হইয়াছে, সুবর্ণের স্থানে স্থানে কলঙ্ক ধরিয়াছে, তথাপি সিংহাসনখানি দেখিতে অতীব মনোহর। সকলে যখন সিংহাসনখানি দেখিবার জন্য অলিন্দের সম্মুখে গোলযোগ করিতেছে সেই সময় পশ্চাৎ হইতে রঘু চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "দুর্গস্বামী মহানায়ক যুবরাজ ভট্টরাজোপাধীয় যশোধবলদেব আসিতেছেন।" এই কথা শুনিবামাত্র সকলে পিছাইয়া গেল এবং কয়েকজন যোদ্ধৃবেশধারী বৃদ্ধ অগ্রসর হইয়া জনতার সম্মুখে দাঁড়াইল [illegible] পরিধান করিয়া এবং শুভ্র উষ্ণীষে শুভ্র দীর্ঘ কেশপাশ ব[illegible] যশোধবলদেব সিংহাসনে আসিয়া উপবেশন করিলেন। [illegible] একখান জীর্ণ মলিন রক্তবস্ত্র সংগ্রহ করিয়া তাহা মাথা[illegible] সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সর্ব্বপ্রথমে একজন দন্তহীন শু[illegible] সম্মুখে আসিয়া কোষ হইতে তরবারি লইয়া তাহার অগ্রভাগ নিজের উষ্ণীষে ছোঁয়াইল, রঘু চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল "সেনানায়ক হরিদত্ত।" বৃদ্ধ দুর্গস্বামীর পদতলে তরবারি স্থাপন করিয়া বস্ত্রমধ্য হইতে একটী সুবর্ণ মুদ্রা বাহির করিয়া তরবারির উপরে স্থাপন করিল। দুর্গস্বামী তখন তরবারি উঠাইয়া লইয়া বৃদ্ধকে প্রত্যর্পণ করিলেন, বৃদ্ধ পুনরায় অভিবাদন করিয়া পিছু হাটিয়া গেল। তখন জনতার মধ্য হইতে আর একজন দীর্ঘকায় অস্ত্রধারী বৃদ্ধ নির্গত হইয়া দুর্গস্বামীকে অভিবাদন করিল, রঘু চীৎকার করিয়া বলিল "সেনানায়ক সিংহদত্ত।" সে ব্যক্তিও পূর্ব্ববৎ তরবারি ও সুবর্ণ মুদ্রা

দুর্গস্বামীর পদতলে রাখিল, দুর্গস্বামীও তাঁহার তরবারি ফিরাইয়া দিলেন। সিংহদত্ত পশ্চাৎপদ হইলে জনতার মধ্য হইতে একজন অতিবৃদ্ধ ব্যক্তি দুইটী যুবকের সাহায্যে অগ্রসর হইল। দুর্গস্বামী তাহাকে দেখিয়া সিংহাসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন "কেও বিধুসেন"? বৃদ্ধ দুর্গস্বামীর কণ্ঠস্বর শুনিবামাত্র তাঁহার পদতলে লুটাইয়া পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিল। যশোধবলদেব তাহার হাত ধরিয়া উঠাইলেন, তাঁহার ও নয়নদ্বয় আর্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল, তিনি কম্পিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিধুসেন, কীর্ত্তিধবল ত অনেক দিন গিয়াছে, এতদিন আইস নাই কেন?" বৃদ্ধ রোদন করিতে করিতে কহিল "প্রভো! কাহাকে লইয়া আসিব, কি করিয়া মুখ দেখাইব, সমস্তেই যে মেঘনাদের পরপারে রাখিয়া আসিয়াছি। শুধু কীর্ত্তিধবলকে রাখিয়া আসি নাই, আমার দুই পুত্রও রাখিয়া আসিয়াছি। পর্ব্বতের উপত্যকায় কত পুত্র কত পিতা, কত ভ্রাতা যে রাখিয়া আসিয়াছি তাহার সংখ্যা নাই। প্রভো! এই দুইটী বালক ব্যতীত ইহজগতে আমার আপনার বলিতে আর কেহই নাই। জয়-সেনের মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া বধূ শিশুদ্বয় আমার ক্রোড়ে অর্পণ করিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিয়াছে। তাহার পর হইতে রাজকার্য্য ও যুদ্ধব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া আটবৎসরকাল ইহাদিগকে পালন করিয়াছি। বৃদ্ধ অক্ষপটলিক বালকের ন্যায় চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিল। দুর্গস্বামী বহু- ... নিবারণ করিয়া কহিলেন, "বিধুসেন একবার যদি আসিতে ... [illegible]মাকে উদরান্নের জন্য দুর্গস্বামিনীর বলয় বিক্রয় করিতে হইত ... [illegible]। শুনিয়া বিধুসেন পুনরায় দুর্গস্বামীর পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল ... [illegible]কাঁদিতে বলিল "প্রভো, তাহা ধনমুখের মুখে শুনিয়াছি, আমি ... [illegible]নাই যে আমার অভাবে দুর্গস্বামীর অবস্থা এত শোচনীয় হইবে।" বৃদ্ধ পুনরায় চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। দুর্গস্বামী তাহাকে শান্ত করিয়া অলিন্দমধ্যে বসাইলেন। কিঞ্চিৎ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া বৃদ্ধ পৌত্রদ্বয়কে দুর্গস্বামীর সম্মুখে লইয়া আসিল, তাহারাও তরবারি ও সুবর্ণ মুদ্রা দুর্গস্বামীর সম্মুখে রাখিয়া অভিবাদন করিল। তাহার পর একে একে শতাধিক বৃদ্ধ সেনা পুত্র বা পৌত্রগণকে সঙ্গে লইয়া দুর্গস্বামীকে অভিবাদন করিতে আসিল। যথারীতি খড়্গ ও রজত বা তাম্রমুদ্রা সম্মুখে রাখিয়া দুর্গস্বামীকে অভিবাদন করিল। দুর্গস্বামীও তাহাদিগকে প্রত্যভিবাদন করিয়া তাহাদিগের তরবারি-গুলি ফিরাইয়া দিলেন। তাহাদিগের পরে সামান্য ভূস্বামী ও ক্ষেত্রকরগণ নিজ

নিজ সঙ্গতি অনুসারে সুবর্ণ বা রজত মুদ্রা দিয়া দুর্গস্বামীকে প্রণাম করিল, দেখিতে দেখিতে সিংহাসনের সম্মুখে সুবর্ণ ও রজতমুদ্রা স্তূপীকৃত হইয়া ঠিল।

সর্ব্বশেষে একজন যোদ্ধৃ বেশধারী বলিষ্ঠ যুবকত সঙ্গে লইয়া উনমুখ অলিন্দের দিকে অগ্রসর হইল। যুবক যথারীতি অভিবাদন করিলে প্রণাম করিয়া কহিল, "প্রভো, এই যুবক আপনার পুরাতন ভৃত্য হেমেন্দ্র সিংহের পুত্র, ইহার নাম বীরেন্দ্রসিংহ।"

দুর্গস্বামী। পুত্র, তোমার পিতা বহুযুদ্ধে আমার পার্শ্বরক্ষা করিয়াছেন। তোমার পিতার তরবারি তোমাকে ফিরাইয়া দিলাম, আমি বুঝিতে পারিতেছি তুমিই ইহার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিবে।

যুবক তরবারি পাইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। বৃদ্ধ অক্ষপটলিক এতক্ষণ নীরবে অলিন্দতলে উপবিষ্ট ছিলেন, সকলের অভিবাদন শেষ হইলে তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "প্রভো, বঙ্গদেশের যুদ্ধের পর দুর্গস্বামীর প্রজাগণ নিয়মিতরূপে কর প্রদান করে নাই। আমি, বীরেন্দ্রসিংহ ও ধনমুখ তিনজনে গ্রামে গ্রামে লোক পাঠাইয়া মণ্ডলগণকে দেয় কর দিতে বাধ্য করিয়াছি। তাহাদিগের সকলেই এইস্থানে উপস্থিত আছে। আদেশ পাইলে আপনার সম্মুখে উপস্থিত করি। দুর্গস্বামীর সম্মতি পাইয়া বিধুসেন একে একে মণ্ডল ও গ্রামবাসীগণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন, তাহারা সিংহাসনের সম্মুখে আসিয়া বীরেন্দ্রসিংহের কথানুসারে দেয় কর দিয়া যাইতে লাগিল। ধন[illegible] তাম্রমুদ্রা ভাগ করিয়া গণিয়া লইতে লাগিল। এইরূপে [illegible] অতিবাহিত হইল। ধনমুখ গণনা করিয়া বলিল যে, এক হা[illegible] সুবর্ণমুদ্রা, সার্দ্ধ ছয় শত রজত মুদ্রা, শতাধিক তাম্রমুদ্রা সংগৃ[illegible] পর সিংহাসনের সম্মুখে নতজানু হইয়া ধনমুখ বস্ত্রমধ্য হইতে দুর্গস্বামিনীর বলয় বাহির করিল এবং উহা সিংহাসনের সম্মুখে রাখিয়া করজোড়ে কহিল, "প্রভো, এই মহার্ঘ্য বলয়ক্রয় করা আমার পক্ষে অসম্ভব। ইহার মূল্য পঞ্চাশৎ সহস্র সুবর্ণ মুদ্রার অধিক।" দুর্গস্বামী সিংহাসন হইতে উঠিয়া ধনমুখকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "ধনমুখ, তোমার কৌশল বুঝিতে পারিয়াছি। তোমাদিগের অনুগ্রহে এযাত্রা দুর্গস্বামিনীর বলয় বিক্রয় করিতে হইল না বটে, কিন্তু আমি বুঝিতে পারিতেছি যে আমি উহা রক্ষা করিতে অক্ষম। রোহিতাশ্বদুর্গের কোষাধ্যক্ষের পদ বহুদিন শূন্য আছে, দুর্গস্বামিনীর বলয় ও এই অর্থরাশি তুমি রক্ষা কর। তোমার প্রাপ্য অর্থ ইহা হইতে কাটিয়া লইও। মৃতা দুর্গস্বামিনী

বলিয়াছিলেন পৌত্র অথবা পৌত্রীর বিবাহকালে এই বলয় আমার স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ তাহাদিগকে দান করিও। যদি কখনও কীর্ত্তিধবলের কন্যার বিবাহ হয় তাহা হইলে ইহা তাহার পিতামহীর চিহ্নস্বরূপ তাহাকে প্রদান করিও।" দুর্গস্বামীর কণ্ঠস্বর গম্ভীর হইয়া আসিতেছিল, এইস্থানে তাহা রুদ্ধ হইয়া গেল। যশোধবলদেব অক্ষপটলিক্ বিধুসেনকে কহিলেন "বিধুসেন এই সকল ব্যক্তির আহারের কি উপায় হইবে? এই বনমধ্যে অর্থ দিলেও আহার্য্য পাওয়া যাইবে না।"

ধনমুখ। প্রভো, অক্ষপটলিক এবং বীরেন্দ্রসিংহ পূর্ব্ব হইতেই তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

সকলের আহার শেষ হইলে যশোধবলদেব, বিধুসেন, সিংহদত্ত, হরিদত্ত, বীরেন্দ্রসিংহ ও ধনমুখকে নিজের শয়ন কক্ষে অহ্বান করিলেন। সকলে উপবিষ্ট হইলে দুর্গস্বামী কহিলেন যে "দিন কীর্ত্তিধবলের মৃত্যু সংবাদ পাইলাম সেই দিন হইতে কল্য পর্য্যন্ত আমি উন্মাদের ন্যায় কাল যাপন করিয়াছি। কল্য আমার জ্ঞানোন্মেষ হইয়াছে। দুর্গের চতুষ্পার্শ্বে আমার যে ভূসম্পত্তি আছে তাহার লোভে কোন সম্ভ্রান্ত বংশীয় যুবক আমার পৌত্রীকে বিবাহ করিয়া এই অরণ্য-সঙ্কুল প্রদেশে বাস করিবে না, আমি প্রাণ থাকিতে কোন সাধারণ ব্যক্তির হস্তে শ্রীমতীকে সমর্পণ করিতে পারিব না। যে কোন উপায়ে হউক বঙ্গদেশের সম্পত্তি উদ্ধার করিতে হইবে। আমি স্বয়ং পাটলিপুত্রে গিয়া [illegible] সাক্ষাৎ করিব স্থির করিয়াছি। তোমরা সকলে মিলিয়া ইহার [illegible] স্থির হইল, বিধুসেন দুর্গমধ্যে বাস করিবেন, ধনসুখ ধনসম্পত্তির [illegible]বন এবং বীরেন্দ্রসিংহ দুর্গস্বামীর সহিত পাটলিপুত্রে যাইবেন।

[illegible] কালে অস্তাচলগামী রক্তাভ রবিকিরণ যখন দুর্গশীর্ষ রঞ্জিত [illegible]া গ্রামবাসিগণ একে একে দুর্গস্বামীর নিকট বিদায় লইয়া স্ব স্ব গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিল। রঘু নানিয়াকে বলিতেছিল, "রাক্ষসের পাল আসিয়া যথাসর্ব্বস্ব খাইয়া গেল। এতগুলা জিনিস যদি পাঠাইল তবে নিজেরা আসিয়া জুটিল কেন? বাড়ী বসিয়া খাইলেই পারিত।"

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

নিদর্শন।

ভারতবর্ষ।

যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননি! ভারতবর্ষ!
উঠিল বিশ্বে সে কি কলরব, সে কি মা ভক্তি, সে কি মা হর্ষ!
সে দিন তোমার প্রভায় ধরার প্রভাত হইল গভীর রাত্রি;
বলিল সবে, "জয় মা জননি! জগত্তারিণি! জগদ্ধাত্রি!"
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ;
গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনি! জগজ্জননি! ভারতবর্ষ!"
সদ্যঃস্নান-সিক্তবসনা, চিকুর সিন্ধুশীকরলিপ্ত;
ললাটে গরিমা, বিমল হাস্যে অমল কমল-আনন দীপ্ত;
উপরে গগন ঘেরিয়া নৃত্য করিছে তপন তারকা চন্দ্র;
মন্ত্র মুগ্ধ, চরণে ফেনিল জলধি গরজে জলদমন্দ্র।
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ;
গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনি! জগজ্জননি! ভারতবর্ষ!"
শীর্ষে শুভ্র তুষার কিরীট; সাগর-ঊর্ম্মি ঘেরিয়া জঙ্ঘা;
বক্ষে দুলিছে মুক্তার হার—পঞ্চ সিন্ধু যমুনা গঙ্গা।
কখন মা তুমি ভীষণ দীপ্ত তপ্ত মরুর ঊষর দৃশ্যে:
হাসিয়া কখন শ্যামল শস্যে, ছড়ায়ে পড়িছ নিখিল বিশ্বে।
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ;
গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনি! জগজ্জননি! ভা[illegible]
উপরে পবন প্রবল স্বননে শূন্যে গরজি' অবিশ্রান্ত,
লুটায়ে পড়িছে পিক কলরবে, চুম্বি তোমার চরণ-[illegible]
উপরে জলদ হানিয়া বজ্র, করিয়া প্রলয় সলিল বৃ[illegible]
চরণে তোমার কুঞ্জকানন কুসুমগন্ধ করিছে সৃষ্টি!
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ,
গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনি! জগজ্জননি! ভারতবর্ষ!"
জননি! তোমার বক্ষে শান্তি, কণ্ঠে তোমার অভয়-উক্তি,
হস্তে তোমার বিতর অন্ন, চরণে তোমার বিতর মুক্তি;
জননি! তোমার সন্তান তরে কত না বেদনা কত না হর্ষ;
জগৎপালিনি! জগত্তারিণি! জগজ্জননি! ভারতবর্ষ!
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ;
গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনি! জগজ্জননি! ভারতবর্ষ!"

("ভারতবর্ষ", আষাঢ়,
স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়)।

পূর্ব্বকথা।

একবার শ্রীপঞ্চমীর ছুটিতে আমাদের যশোহর ভবনে স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র "লীলাবতী"র নদেরচাঁদের পালা অভিনয় করিয়াছিলেন। কথকতা, যাত্রা, পাঁচালী, হাফ আখড়াই ইত্যাদির সহিত শৈশব হইতেই পরিচিত ছিলাম, কিন্তু ইতঃপূর্ব্বে নাটকাভিনয় কখনও দেখি নাই। লীলাবতীকে সম্বোধন করিয়া নদেরচাঁদ যখন "অয়ি হরিণ-নয়নে তুমি কি পড়ো" বলিতে যাইয়া "আই মা হরিণের সিং তুমি কি পড়" বলিয়া ফেলিল এবং অপসারিত চৌকিতে বসিতে গিয়া ভূপতিত হইয়া যখন "মলামরে মেরে ফেল্লেরে" বলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল, তখন দর্শকমণ্ডলীর অট্টহাস্যে গৃহ প্রকম্পিত হইয়াছিল।......আমার শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণীর দিবসের অধিকাংশ পূজা আহ্নিকে অতিবাহিত হইত। অগ্রহায়ণ পৌষে যখন সুপক্ক ধান্যে তাঁহার প্রাঙ্গন পূর্ণ হইয়া যাইত, তিনি রাত্রি জাগিয়া স্বহস্তে সেই সব ধান্য সিদ্ধ করিয়া স্বহস্তে দেব-দুর্লভ তণ্ডুল প্রস্তুত করিতেন। তাহাতে সম্বৎসর সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ হইত ও অকাতরে অতিথি সেবা চলিত। অনেক দরিদ্র ছাত্রকে তিনি পুত্রবৎ প্রতিপালন করিতেন। দুই চারিটি "ভিক্ষাপুত্র" গৃহে থাকিত। শালগ্রামের মস্তকে লক্ষ তুলসীপত্র দিবার মন্ত্র তিনি বলিয়া দিতেন, বালকগণ তাহা মুখস্থ করিয়া তাঁহার সম্মুখে বসিয়া পূজা করিত। শুনিয়াছিলাম কোন একজন ছাত্র, প্রকৃত মন্ত্র না জানায়, শালগ্রামের ভোগের সময় বলিয়াছিলেন, "My dear Shalgram, accept this vegetable kingdom and oblige," সেইজন্য তিনি দেবারাধনাকালে উপস্থিত থাকিতেন। দরিদ্র প্রজামণ্ডলীর শুভাশুভ ও সুখ দুঃখের প্রতি তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও সহানুভূতি থাকায়, তিনি এক আধাবয়সী ব্যক্তির ইহলোকে সুবিধা ও পরলোকে পিণ্ডপ্রাপ্তির জন্য দ্বিতীয়পক্ষে বিবাহ দিয়াছিলেন। গৃহাভ্যন্তরে তরুণী-বৃদ্ধে কিরূপ বাক্যালাপ হইত অবগত নহি, তবে বাহিরের সম্ভাষণটা অতি কৌতুকাবহ ছিল। সরকারজী সকালে দুগ্ধ চিঁড়া [illegible] ত্রে যাইত এবং গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক নব বধূকে উচ্চৈঃস্বরে " ও বাড়ী, বাড়ী [illegible] কিয়া পাড়া তোলপাড় করিত। তাহার এই অপূর্ব্ব সম্ভাষণ শুনিবার নিমিত্ত [illegible] ক বালিকারা পথে দাঁড়াইয়া থাকিত এবং "ও বাড়ী, বাড়ী আছ"র প্রতিধ্বনি [illegible]

("সুপ্রভাত", জ্যৈষ্ঠ,
শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দেবী)।

বৈজ্ঞানিক তথ্য।

পেক্‌জলী নামক একজন আমেরিকাবাসী চোখের চাহনি হইতে বিবিধ রোগ ও বিষক্রিয়া ধরিবার উপায় আবিষ্কার করিয়া, চক্ষুতারকা ও রোগের সম্পর্কসূচক একটি নক্‌সা তৈয়ারী করিয়াছেন। পাকযন্ত্রের কোনও পীড়া হইলেই চক্ষুতারকার অব্যবহিত চতুর্দ্দিকে তাহার বিকৃতি-লক্ষণ ধরা পড়ে। তাহার পরেই স্নায়ুক্ষেত্র ; অন্যান্য শরীরাংশ চক্ষুর অপরাপর অংশের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। কোনও রোগ ডান চোখে আর কোনও রোগ বাঁ চোখে তাহার প্রভাব বিস্তার করে। এই আবিষ্কারের সূত্রপাত অত্যন্ত কৌতুকাবহ। পেক্‌জলী যখন বালক, তখন

একদিন বাগানে একটা পেঁচা ধরিতে চেষ্টা করেন। পেঁচাটা ধরা পড়িয়া তাঁহাকে এমন খামচাইয়া ধরে, যে তাহার পা ভাঙ্গিয়া তিনি নিস্কৃতি পান। এই সময় বালক ও পেচক চোখোচোখি করিয়া চাহিয়াছিল; বালক দেখিল যে পেঁচার পা ভাঙ্গিবার সময়, চোখের নিচের দিক হইতে একটা কালো রেখা বিস্তৃত হইয়া চক্ষুতারকা স্পর্শ করিল। পেঁচাটার ভাঙ্গা পায়ের চিকিৎসা করিয়া তাহার বেদনা সারিয়া গেল, কিন্তু পাখানি ভাঙ্গিয়াই রহিল। পেক্‌জলী দেখিলেন যে পেঁচার চোখের কালো দাগটি সারিয়া গিয়া, তাহার স্থানে শাদা আঁকাবাঁকা রেখা পড়িয়াছে। ইহা দেখিয়া তাঁহার মনে হইল, যে বেদনার সহিত কালো দাগের এবং ভাঙা পায়ের সহিত বাঁকা রেখার নিশ্চয়ই কোনও সম্পর্ক আছে। তৎপরে সুদীর্ঘকালের পরীক্ষাও পর্য্যবেক্ষণ ফলে তিনি চক্ষু হইতে রোগ নির্ণয়ের নক্‌সা তৈয়ারি করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

*   *   *   *   *   *

ডাক্তার আলেক্‌সিস কারেল মৃত্যুকে একেবারে নূতন ব্যাপার প্রমাণ করিয়াছেন। তিনি জীবশরীরের তন্তু (tissue) লইয়া কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া বোতলে জিয়াইয়া রাখিতেছেন; তারপর আবশ্যকমত তাহা অপর জীব-শরীরে জোড়া লাগাইয়া অভাব পূরণ করিয়া দিতে পারিতেছেন। যাহাকে আমরা মৃত জীব মনে করি, তাহারও শরীরে মৃত্যুর অনেকক্ষণ পর পর্য্যন্ত তন্তুগুলি জীবিত থাকে। তিনি প্রমাণ করিয়াছেন তথা-কথিত মৃত্যুর পরেও হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন ও রক্ত সঞ্চরণ, ফুসফুসের কার্য্য, পাকযন্ত্রের খাদ্য পরিপাক প্রভৃতি ক্রিয়া চলিতে থাকে। মৃত্যুর পরেও এক চেতনা ছাড়া শরীরের সমস্ত ক্রিয়া অব্যাহত রাখা যাইতে পারে এবং চেষ্টা করিলে মৃত জীবের পুনর্জীবন লাভ তিনি অসম্ভব মনে করেন না। ফরাসীদেশে এক ধনী ডিউকের রাত্রি দশটার সময় মৃত্যু হয়। তাঁহার এক নাবালক পুত্র রাত্রি [illegible]টা সময় আইনের চক্ষে সাবালক হইবে। দুই ঘণ্টা আগে মরিয়া পিতা পুত্রকে অকূলে [illegible] ডিউকের উকিলেরা ডিউককে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য ডাক্তারি [illegible] কারেল-প্রণালীতে ত্বকনিম্নে ঔষধ-নিষেক (Hypodermi[illegible] শরীরে উত্তাপ, শ্বাস প্রশ্বাস, হৃৎস্পন্দন ফিরাইয়া আনিয়া, সং[illegible] সাবালক পুত্রকে বিষয় দেওয়াইল।

("প্রবাসী", আষাঢ়,
শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)।

সমাজতন্ত্রবাদ।

হার্বার্ট স্পেন্সার বলিয়াছেন, অসমর্থদিগের বিলাপই সমাজের কল্যাণপ্রদ, তাহাদিগকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিলে সমাজশক্তির অপব্যবহার হয়। কিন্তু কেবলমাত্র প্রতিযোগিতা প্রভাবে সমাজের ক্রমোন্নতি অসম্ভব, প্রতিযোগিতার সহিত সহযোগিতাও সমাজের ক্রমবিকাশ নিয়ন্ত্রিত করে। পাশ্চাত্য সমাজ প্রতিযোগিতাকে সভ্যতা-বিকাশের মূলমন্ত্র বলিয়া বুঝিয়াছে, সামাজিক উন্নতির জন্য সহযোগিতার আবশ্যকতা তাহারা অনুভব করিতে পারে নাই। সুতরাং প্রতিযোগিতা ও তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল অনৈক্যকে পাশ্চাত্য জগৎ স্বাভাবিক বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে। এই অনৈক্যের সহিত যে বিলাস-ভোগের উচ্ছৃঙ্খলতা এবং সমবেদনার অভাব দেখা গিয়াছে, তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এক নূতন সমাজ-

তন্ত্রবাদ সৃষ্টি করিয়াছেন—ইহাই বর্ত্তমানকালের Socialism। তাঁহারা বলেন যে সমাজের শতকরা আশীজন যে দেশোৎপন্ন ধনসম্পদের এক পঞ্চমাংশও ভোগ করিতে পারিতেছে না, তাহার কারণ ধনীরা শ্রমজীবিগণকে তাহাদিগের প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে, শ্রমজীবিদের কর্ম্ম বা বুদ্ধিশক্তির অভাব ইহার হেতু নহে। এইরূপ কৃত্রিম অবৈধ উপায়ে শ্রমজীবিগণকে দরিদ্র করা হইয়াছে বলিয়া, সোশ্যালিজ্‌ম-বাদী পাশ্চাত্যগণ বলেন যে বিলাসোন্মত্ত ধনীদের সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়া দরিদ্র শ্রমজীবিগণের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতে হইবে। ইহাতে যদি তুমুল বিপ্লব উপস্থিত হইবার আশঙ্কা থাকে, তাহা হইলে অধিক হারে ট্যাক্স ধার্য্য করিয়া, সম্পত্তি ধীরে ধীরে ধনীদের হস্ত হইতে দরিদ্রের আয়ত্তে আনিতে হইবে। যতদিন পর্য্যন্ত দেশের সমস্ত সম্পত্তি ও মূলধন সমাজের হস্তগত না হয়, ততদিন তুমুল আন্দোলন চালাইতে হইবে, অবশেষে সমাজ দেশের সমগ্র ধনসম্পত্তির অধিকারী হইয়া প্রত্যেকের অভাবানুযায়ী ধন বিতরণ করিবেন। ইহাতে বিলাসিতা লোপ পাইবে, অথচ দেশের কর্ম্মশক্তি হ্রাস পাইবে না। সমাজের সহিত ব্যক্তির সম্বন্ধ তখন আরও ঘনিষ্ট হইবে এবং প্রত্যেকে আপনার দায়িত্ব বুঝিয়া সমাজের প্রতি স্ব স্ব কর্ত্তব্য সাধন করিতে কুণ্ঠিত হইবে না।

("গৃহস্থ", আষাঢ়,
শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায়)।

বিলাতের পত্র।

এবার আমার নববর্ষের প্রথম দিন এই সমুদ্র যাত্রার মাঝখানে এসে দেখা দিল। প্রত্যেকবার আমার চিরপরিচিত পরিবেষ্টনের মাঝখানে বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে নববর্ষের প্রণাম নিবেদন করেছি—কিন্তু এবার আমার পথিকের নববর্ষ, পারে যাবার নববর্ষ। এবারকার নববর্ষ যেন আমার কূলে থেকে বিদায় নেবার হুকুম নিয়ে এল—আমাকে যাত্রার আশীর্ব্বাদ [illegible]। এবার ডাঙার মায়া একেবারে ছেড়ে দিয়ে কর্ণধারের হাতে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে [illegible]দ্রের মাঝখানে ভেসে পড়তে হবে। সেখানে পথের চিহ্ন চোখে পড়ে না—কিন্তু যিনি [illegible] আছেন, তিনি পথ জানেন এই কথা মনে নিশ্চয় জেনে বেরিয়ে পড়তে হবে।..... [illegible]র নববর্ষের দিন মনকে বারবার বলিয়ে নিলুম, মন, চলতে হবে, এখন থেকে পিছন [illegible]াকাবার অভ্যাস ছাড়তে হবে। যদি সামনের মুখে চলবার দিকেই সমস্ত ঝোঁক দেওয়া যায়, তা হলেই মিথ্যার মায়া কাটানো সহজে হবে—তা হলেই কে কি বল্‌বে, কে কি ভাব্‌বে কিসে কি হবে, এসব কথা ভাবনার একেবারেই দরকার হবে না। কেন না, যখন আমরা মনে করি বসে থাকাটাই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, তখনই আশেপাশে যে কেউ আছে সকলেরই মুখের দিকে তাকাতে হয়, এবং পোঁটলা পুঁটলি, ঘটি বাটি, কাঁথা কম্বল সমস্তই একেবারে ভূতের মত পেয়ে বসে—যে হতভাগা দশের দাসত্ব করে তাকে প্রতিদিন যে আপনাকে ও পরকে কত বঞ্চনা করতে হয়, কত মিথ্যা কৈফিয়ৎ দিতে হয়, তার ঠিকানা নেই—কিন্তু অনন্তের পথে চলতে হবে এই কথাটা ঠিক ভাবে বলতে পারলে জীবন আপনই সত্য হয়ে ওঠে—কেননা, আমাদের জীবনের সত্য স্বরূপটাই হচ্ছে তাই,—অনন্তের পথে চলা, রাস্তার মাটি কামড়ে ধরে উপুড় হয়ে পড়ে থাকা নয়।

("তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা", আষাঢ়,
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)।

আমাদের ইতিহাস।

প্রাচীন হিন্দুজাতির সহিত এখনকার য়ুরোপীয় জাতিসমূহের তুলনা করিয়া দেখিলে, এতদুভয়ের মধ্যে এক বিষয়ের পার্থক্য বিশেষ ভাবে উপলব্ধ হয়। হিন্দুর জাতীয় জীবনের কেন্দ্র সমাজ; য়ুরোপীয় জাতীয় জীবনের কেন্দ্র রাষ্ট্র (state)। প্রাচীনকালে যখন হিন্দুগণ স্বাধীন ছিলেন, তখন সমাজই হিন্দুজাতির মর্ম্মস্থান ছিল। দেশে রাজা ছিলেন বটে, বহিঃশত্রু হইতে দেশরক্ষা দ্বারা সমাজ রক্ষা করাই তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য ছিল। রাজা রাজ্যরক্ষা, রাজ্য শাসন ও বিচার কার্য্য করিতেন; বিদ্যাদান, জলদান প্রভৃতি অবশ্য কর্ত্তব্য গুলি সমাজ নিজেই নির্ব্বাহ করিত। শতাব্দীর পর শতাব্দীতে কত রাজার পর কত রাজা ভারতবর্ষে রাজত্ব করিয়া গেল, বাপে-ছেলে ভায়ে-ভায়ে ভারতের রাজ-সিংহাসন লইয়া কত মারামারি কাটাকাটি হইল, কিন্তু তাহাতে হিন্দুর দৈনিক জীবনের গতি কিছুমাত্রও পরিবর্ত্তিত হয় নাই। এইরূপে সমাজের সহিত রাজার নাড়ীর সম্বন্ধ ছিল না এবং বাহিরের উপদ্রব রাজাকে রাজ্যভ্রষ্ট করিলেও সমাজকে শ্রীভ্রষ্ট করিতে পারিত না। সমাজ সমাজের কার্য্যের জন্য রাজার সাহায্যের অপেক্ষা রাখিত না। বণগুরু ব্রাহ্মণগণ যেমন বিদ্যার্থিগণকে অশন বসন দিতেন এবং বিনা বেতনে বিদ্যাশিক্ষা দিতেন, প্রত্যেক গৃহীর সেইরূপ ব্রাহ্মণ-দিগের ভরণপোষণ অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইত। পানীয়জলের জন্য দীঘিকা খনন ও জলাশয়াদির পঙ্কোদ্ধার সম্পন্ন ব্যক্তির পুণ্যকর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হইত। বিলাতে ইহার ঠিক উল্টা। নিঃস্বকে খাদ্যদান, আতুরকে ঔষধদান, সাধারণকে শিক্ষাদান, প্রভৃতি যে সকল বিষয় ভারতবর্ষে সামাজিক ধর্ম্ম-ব্যবস্থার উপরে প্রতিষ্ঠিত, বিলাতে রাষ্ট্রীয় শক্তির উপর তৎসমুদয়ের নির্ভর। হিন্দুর রাষ্ট্রীয় ইতিহাস না থাকিতে পারে, কিন্তু তাঁহার সামাজিক ইতিহাসের অভাব নাই। যাহারা মনে করেন যে জাতির 'polit[illegible] [illegible] '[illegible]' ও নাই, তাহারা ভ্রান্ত।

("উপাস[illegible]

শ্রীযুক্ত রাধার[illegible]

স্ব-ধর্ম্ম বনাম স্বাধিকার।

অষ্টাবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ফরাসীজীবনের নাট্যশালায় যে বিরাট অভিনয় অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং তাহার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমেরিকা মহাদেশে সাম্য ও স্বাধীনতার জন্য যে সকল চেষ্টার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল—এই দুই ঘটনা দ্বারা পাশ্চাত্য ইতিহাস রূপান্তরিত হইয়া নূতন শ্রী ও সম্পদ ধারণ করিয়াছে। এই দুই উদ্যমের প্রতিষ্ঠা মানবের সাম্য-জনিত অধিকার-তত্ত্বের উপর, এই দুই অনুষ্ঠানের মূল মন্ত্র এই যে সকল মনুষ্য সমান, সকলেরই সুখে তুল্য অধিকার। একজন সুখী, অপরে দুঃখী হইবে কেন! অপরের যেমন সুখসম্পদে অধিকার, আমার ও তেমনই তুল্য অধিকার। সমাজের অত্যাচারে এই অধিকার হইবে চ্যুত হইলে, শাসনতন্ত্রের অবিচার আমার সুখের উপকরণ কাড়িয়া লইলে, আমি সমাজ ও শাসনতন্ত্র ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন করিয়া গড়িব না কেন? ঐ যুগে সমাজ ও শাসন তন্ত্রের সংস্কার যে

আবশ্যক ছিল, ইহা স্বীকার্য্য। কিন্তু আমাদের লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, উক্ত মহা অনুষ্ঠানদ্বয়ের মূলে মানুষের স্ব স্ব অধিকার (rights) স্ব-ধর্ম্ম বা কর্ত্তব্য (duty) নহে। ভারতবর্ষে স্বাধিকার অপেক্ষা স্বধর্ম্ম বরণীয়। হিন্দুগ্রন্থে আমরা স্বধর্ম্ম বা মানবের অবস্থা-সুলভ কর্ত্তব্যানুষ্ঠানের প্রসঙ্গই নাই ; কাহার কি অধিকার (Rights) তাহার উল্লেখ দেখি না। 'Rights' এর প্রতিরূপ শব্দ সংস্কৃতে বিরল, অধিকারের মৌলিক অর্থ তাহা নহে। প্রাচীন সংস্কৃতে অধিকারের অর্থ 'ভার'—যে কর্ম্ম করিতে যে ব্যক্তি কর্ত্তব্যানুরোধে বাধ্য, সেই তাহার অধিকার। কিছু দিন হইতে পাশ্চাত্য দেশে এই ধরণের কথা শোনা যাইতেছে। পাশ্চাত্য শিক্ষকেরাও এখন শিখাইতে আরম্ভ করিতেছেন যে সুখ আত্মপ্রতিষ্ঠায় নহে, আত্মবিসর্জ্জনে। সুখান্বেষণ মানুষের আত্মাদরের ফল, মানুষ ভাবে সুখী হইতে তাহার পূর্ণ অধিকার। মানুষ বুঝে না যে অভাবই দুঃখ—অভাবের নাশে দুঃখের অত্যন্তাভাব অর্থাৎ পূর্ণ সুখ। (Carbyle বলিয়াছেন ' The fraction of life can be increased in value, not so m ch by increasing your numerator as by decreasing your denominator".

("ব্রহ্মবিদ্যা", আষাঢ়,
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত)।

সম্পত্তির স্বামিত্ব।

অসভ্য জাতিগণের দুই প্রকার বাসস্থান দেখা যায়—এক প্রকার ব্যক্তিগত, অন্য প্রকার দল বা সমাজ-গত। পাপুয়ান পুরুষগণ এক একটি এজমালী গৃহে পান, ভোজন ও শয়ন করে। এই ভাব ক্রমে গ্রাম্য সমাজে পরিণত হয়। অসভ্যগণ কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিলে, ক্রমে নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান আশ্রয় করে। প্রথম অবস্থায় গ্রাম এজমালী থাকে অর্থাৎ গ্রামের ভূমি সকলের [illegible] ত্তি-রূপে ব্যবহৃত হয়। প্রাথমিক সমাজে, যাহা নিজ প্রযত্নে সিদ্ধ, তাহা নিজের [illegible] গণ্য হয়, এবং যাহা সকলের প্রযত্নে সিদ্ধ, তাহা সাধারণ সম্পত্তি হয়। প্রস্তরের [illegible] নিজে প্রস্তুত করে বলিয়া তাহা নিজের ; কিন্তু সকলে মিলিয়া মৃগয়া করে বলিয়া [illegible] ংসে সকলেরই অধিকার। বর্ত্তমান সময়ে ব্যক্তিগত স্বত্ব-স্বামিত্বের সহিত সমগ্র [illegible] স্বামিত্বের বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। ইহার ফলে পুনরায় সমাজে প্রাধান্যই প্রতিষ্ঠিত হইবে বলিয়া বোধ হইতেছে। এতদ্দেশে সম্প্রতি যে সকল তাম্রশাসন আবিষ্কৃত, হইয়াছে, তাহার কোন কোন শাসনের লিপি-কৌশল দৃষ্টে অনুমান হয় যে, সুসভ্য সমাজে ও রাজা গ্রামের ভূমি নিজের বলিয়া জ্ঞান করিতে সাহসী হয় নাই, ঐ ভূমিতে গ্রামবাসী জন-সাধারণের স্বত্ব স্বীকৃত হওয়ার আভাস পাওয়া যায়।

("নব্যভারত", আষাঢ়,
শ্রীযুক্ত শশধর রায়)।

শ্রী গৌরহরি সেন।

ফুল-ফোটা

১

আজি তরল জোছনা
স্বপনের কণা
ঝর ঝর ঝর ঝরিছে !
কুঞ্জ-কাননে
মধুর বেদনে
ফুল-বধূ বুঝি ফুটিছে !
মুদিত মাধুরী মরমের দল,
মধুভরে কিবা করে টলমল,
চিত-সঞ্চিত নব পরিমল
দিশি দিশি দিশি ছুটিছে !
তরল জোছনা
স্বপনের কণা
ঝর ঝর ঝর ঝরিছে !

২

ওই ফুটন্ত কলি
পড়ে ঢলি ঢলি
কে জানে কি সুখ-স্বপনে !
অলস আবেশে
চাহে আশেপাশে
আলুথালু দিঠি গগনে !
কণ্টকে গাঁথা পাতার বসন
শিথিলি পড়েছে লাজ-আবরণ,
মরম-মাধুরী উথলে কেমনে
কনক-অঙ্গে গোপনে !
ফুটন্ত কলি
পড়ে ঢলি ঢলি
কে জানে কি সুখ-স্বপনে !

৩

কেন শারদ যামিনী
কুসুম-কামিনী
যাপে একাকিনী কেমনে

আজি যদি তার
প্রেমের পসার
না পারে বিলা'তে চরণে ?
কেঁদে' ফি'রে গেছে যে'গো অভিমানে
আজি চাহে তারে নয়ানে নয়ানে
রাখিতে গোপনে হৃদয়-শিথানে
সোহাগে পিরীতি-যতনে !
হেন শারদ-যামিনী
কুসুম-কামিনী
যাপে একাকিনী কেমনে ?

৪

আজি এস অ-শরীর
মলয়-সমীর !
পরশ মদির বহিয়া ;
পশি' তার বুকে
স্বপনের সুখে
দেহ হৃদি তার ভরিয়া !
অতনু পরশে বন্ধন খসে,
'হাসে চন্দ্রমা সুনীল নভসে
ধৈরয নারে বাধিতে উরসে,
যামিনী যেতেছে বহিয়া !
এস অ-শরীর
মলয় সমীর !
পরশ মদির বহিয়া !

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী

কাঙ্গাল হরিনাথ।

(ব্রহ্মাণ্ড-বেদ)

ব্রহ্মরূপ

ব্রহ্মরূপ বা সাকার নিরাকার সম্বন্ধে কত জন কত কথা বলিয়াছেন, কত আলোচনা করিয়াছেন, কত আলোচনা করিতেছেন এবং ভবিষ্যতেও কত আলোচনা চলিবে। যিনি যে ভাবে সাধনা করিয়াছেন, যিনি যে ভাবে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, যিনি সাধনবলে যতটুকু অগ্রসর হইয়াছেন, তিনি তাহাই বিবৃত করিয়াছেন। আর যাঁহারা সাধন ভজন কিছুরই ধার ধারেন না, তাঁহারা শুষ্ক

তর্কজাল বিস্তার করিয়া বৃথা বাগাড়ম্বরে সময় অতিবাহিত করিতেছেন। কাঙ্গাল হরিনাথ নিজের সাধনবলে ব্রহ্মরূপ সম্বন্ধে যাহা উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহাই তিনি "ব্রহ্মাণ্ড-বেদে" লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ব্রহ্মরূপ সম্বন্ধে তাঁহার সাধনলব্ধ অনুভূতি বিবৃত করিবার পূর্ব্বে তিনি যে গীতটী রচনা করিয়াছিলেন তাহাই আমরা সর্ব্বাগ্রে উদ্ধৃত করিতেছি; তাহার পর তাঁহার বক্তব্য বিষয়ের যথাসাধ্য বর্ণনা করিব। তবে একথা এই স্থলের পাঠকবর্গকে বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে, লেখক এসম্বন্ধে সম্পূর্ণ অন্ধ; তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান একেবারেই নাই। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তিনি যাহা বলিবেন তাহা কাঙ্গাল হরিনাথেরই কথা। গানটী এই; ——

"কে বলে এজগতে দুই আছে।
কেবল চিণ্ময় মানুষ একা,
জগৎ জুড়ে রয়েছে।
যেমন একটী পারাবার, জুড়ে আছে এ সংসার,
তাতেই জল যাচ্ছে, আবার মিশ্‌ছে তায় এসে;
তেমনি তাঁ হ'তে এই জগৎ হয়ে
আবার তাতেই মিশে যেতেছে।
উদ্ভিদ্ চেতন অচেতন, গ্রহতারা অগণন,
পবন কিরণ আদি যত জগতে আছে;
এরা, এক হোয়ে যাইবে শেষে,
যেমন এক হোতে সব হোয়েছে।
কেবল মায়ায় ভুলিয়ে, পরমজ্ঞান হারায়ে,
আমার মন যে ভিন্ন ভিন্ন সকল দেখিছে;
যে জন মায়াবন্ধন ছেদ করেছে
(জগৎ) আত্মময় সে দেখিছে।
ফকির ফিকিরচাঁদ বলে, ভেসে নয়নের জলে,
মায়াপাশ ছেদিতে আমার কি সাধ্য আছে;
আমায় দীনদয়াল দয়া করে,
দিলে, আত্ম-জ্ঞান যাই বেঁচে"।

ব্রহ্মাণ্ড-বেদে কাঙ্গাল হরিনাথ বলিয়াছেন, এক সংখ্যা যেমন কোটী কোটী সংখ্যায় পরিণত হয়, তদ্রূপ এক ব্রহ্মই অনন্তরূপে আপনাকে বিস্তৃত করিয়াছেন। এই সমুদয় রূপের যেমন অবয়ব আছে, সীমা আছে, তদ্রূপ ব্রহ্মেরও অবয়ব

আছে, কিন্তু সীমা নাই। ব্রহ্ম যখন কোন অবয়ব-বিশিষ্ট রূপ প্রকাশ করেন, তখন তাঁহাকে সীমাবদ্ধ বলিয়া বোধ হয়; বাস্তবিক তাহা অসীম ও অনন্ত। কেন না জগতের প্রত্যেক আধারে প্রত্যেক রূপের অবয়ব, সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড যেমন অনন্ত, তদ্রূপ ব্রহ্মের একাধারে ঐ সমুদয় প্রবিষ্ট আছে বলিয়া তিনি রূপে ও অবয়বে অনন্ত।

এখন একবার নিজের বুদ্ধি, জ্ঞান, বিবেকের সহিত সংযুক্ত পূর্ব্বক চিন্তা করিয়া দেখ, অতি পরিস্কাররূপে ইহাই প্রতীতি হইবে যে, ব্রহ্মের যখন সৃষ্টির ইচ্ছা প্রকাশ না হয়, তখনই তিনি নির্গুণ। কিন্তু নাস্তিকের "নাস্তি"র মত এই নির্গুণ যে কিছুই নহে, এরূপ মনে করিও না। মাকড়সা যেমন বিস্তৃত জাল গুটাইয়া উদরস্থ করে, মহাপ্রলয়কালে ব্রহ্ম তদ্রূপ এই পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ড-জাল গুটাইয়া আপনাতে লিপ্ত করেন। নিরাকার-সাকার, ভৌতিক-সাকার, সূক্ষ্ম-স্থূল যে কোন মহিমা বা গুণ ব্রহ্মাণ্ডে আছে-তৎসমুদায়ই ব্রহ্মে লীন হইয়া থাকে। কেবল ব্রহ্মের ইচ্ছা প্রকাশ থাকে না, এই কারণে তৎসমুদায়েরও প্রকাশ ও বিস্তৃতি হয় না। অতএব ব্রহ্মের ইচ্ছা যখন অপ্রকাশ থাকে, তখনই তিনি নির্গুণ। নতুবা যিনি নির্গুণের অর্থ "কিছু নহে" মনে করেন, তিনি নিতান্ত ভ্রমে পতিত হন।

ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ অর্থাৎ তিনি আপনার ইচ্ছা আপনিই প্রকাশ করেন; তাঁহার ইচ্ছা প্রকাশের অন্য কারণ নাই কারণ আর কোথায় থাকিবে; সকল কারণের কারণ যে তাহাতেই লিপ্ত রহিয়াছে; তিনি ভিন্ন তখন আর কিছুই নাই। ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছু নাই কেন? যে মায়ার নিমিত্ত জগৎ ব্রহ্ম হইতে বিভিন্ন বোধ হয়, সেই মায়া যদি না থাকে তাহা হইলে এখনও ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছু নাই, পরেও আর কিছু থাকিবে না। ঐন্দ্রজালিকের ঐন্দ্রজাল-ক্রীড়া সাঙ্গ হইলে সে যেমন তেমনই থাকে, কেবল ক্রীড়াই থাকে না, সেইরূপ পরেও ব্রহ্মই থাকেন, আর কিছু থাকে না।

এই নির্গুণ ব্রহ্ম যখন আপনাকে বিস্তৃত করিতে অর্থাৎ তিনি এক ছিলেন, আপনাকে অসীম অনন্তরূপে প্রকাশ করিতে, ইচ্ছা করেন; সেই ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার গুণেরও প্রকাশ হয়। অতএব ইচ্ছা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই নির্গুণ, সগুণ হইয়া থাকে। অর্থাৎ যখন তাঁহার ইচ্ছা প্রকাশ হয় না, তখনই তিনি নির্গুণ; যখন ইচ্ছার প্রকাশ হয়, তখনই তিনি সগুণ। এস্থলে এ কথা বলিলে আরও সহজ হয়, ইচ্ছা অপ্রকাশের নাম নির্গুণ, আর ইচ্ছা প্রকাশের নামই সগুণ।

এই সগুণ আবার দুই প্রকার—নিরাকার ও সাকার। যখন কেবল ভাবময় জ্যোতির্মাত্র, তখনই নিরাকার; যখন সেই নিরাকার জ্যোতিঃ কোন অবয়ব-বিশিষ্ট হয়, তখনই নিরাকার-সাকার। সাধনসিদ্ধির সময় সাধনের ধন ভগবানচন্দ্র জ্যোতিম্ময় নিরাকার-সাকাররূপেই সাধকের হৃদয়-মন্দিরে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। যাঁহারা ঐ প্রকারে ভগবানকে দর্শন করিয়াছেন, কেবল তাঁহারাই বলিয়া থাকেন—"প্রাপ্তির ঘরে জ্যোতির্ম্ময়, যারা যায় যে এ নিরাকার" ইহা কেবল গ্রন্থলিখিত উপদেশ-বাক্য নহে, সাধকের আত্মপ্রত্যক্ষ ও সত্য।

অতএব সাকার আবার দুই প্রকার—নিরাকার-সাকার ও ভৌতিক-সাকার। নিরাকার-সাকারে যেমন অবয়ব-বিশিষ্ট, তদ্রূপ মুক্ত, জ্যোতির্ম্ময়, অসীম ও অনন্ত—কেবল আত্ম-প্রত্যক্ষ। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাহা দেখা যায় না, কেবল আত্মাতেই তাহা প্রকাশ হইয়া থাকে, এবং তাহার জন্ম মৃত্যু নাই—প্রকাশ অপ্রকাশ আছে। আবার ভৌতিক-সাকারও অবয়ব বিশিষ্ট; কিন্তু নিরাকার-সাকারের ন্যায় মুক্ত নহে। ইহা আবদ্ধ এবং ইহার জন্মমৃত্যু আছে। অর্থাৎ নিরাকার-সাকার যেমন ইচ্ছানুসারে সর্ব্বত্র ভ্রমণ ও আপনাকে প্রকাশ ও অপ্রকাশ করিতে পারে, ভৌতিক-সাকার তাহা পারে না। শঙ্খ, শম্বুক প্রভৃতি জন্তু যেমন এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করিতে ইচ্ছা করিলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার উপরের ঘরস্বরূপ আবরণও চলে, তদ্রূপ ভৌতিক-সাকারের অবয়বরূপ ঘর অর্থাৎ শরীরও চলিয়া থাকে; এবং সে ইচ্ছা করিলে আপনাকে প্রকাশ ও অপ্রকাশ করিতে পারে না। প্রকাশ হইতে হইলে জন্ম এবং অপ্রকাশ হইতে হইলে মৃত্যুর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। নিরাকার-সাকার ও ভৌতিক-সাকারে এইরূপ অনেক পার্থক্য আছে।

নির্গুণ ব্রহ্ম সগুণ হইবামাত্র অর্থাৎ ইচ্ছা প্রকাশ করিবামাত্র, অগ্রে নিরাকার-সাকারে আপনাকে বিস্তার করিয়া পরে ভৌতিক সাকারে বিস্তৃত হইয়াছেন। অতএব এই ব্রহ্মাণ্ডে দুই প্রকার জগৎ বিদ্যমান আছে—আধ্যাত্মিক জগৎ ও ভৌতিক জগৎ। আধ্যাত্মিক জগৎ অর্থাৎ যে জগৎ কেবল আত্মা দ্বারা প্রত্যক্ষ হয়—ইন্দ্রিয় দ্বারে প্রত্যক্ষ হয় না। ভৌতিক জগৎ অর্থাৎ যে জগৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ হয়—আত্মা যতদিন ত্রিগুণ অর্থাৎ ভূতে আবদ্ধ থাকে, ততদিন ঐ প্রকারে দর্শন করে, মুক্ত হইলে ইন্দ্রিয়-দ্বার ব্যতীতও প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয়। এই আধ্যাত্মিক ও ভৌতিক জগৎ কেবল নির্গুণ ব্রহ্মার বিস্তৃতি ব্যতীত

আর কিছুই নহে ; সুতরাং কি আধ্যাত্মিক, কি ভৌতিক জগৎ সকলই ব্রহ্মময়। এই ব্রহ্মাণ্ডের সকলই ব্রহ্মময়—এইরূপ জ্ঞানের নামই ব্রহ্মজ্ঞান।

এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার পূর্ব্বে কাঙ্গাল হরিনাথকে কত কি করিতে হইয়াছিল, তাহার আভাস তাঁহার নিম্নলিখিত গীতটীতে স্পষ্ট পাওয়া যায় :—

"ও আমার জ্ঞান হোল না, ধ্যান হবে কি বল না।
তুমি, জগৎ মাঝে, জগৎ আছে
কোরে তোমার ধারণা।
তুমি আমার একা নও, বাহির অন্তরেতে রও,
জগৎ তোমার পুত্র-কন্যা, জগতের মা হও ;
তোমার যত সন্তান সকল সমান,
আপন বৈ কেউ পর না।
তোমার জ্ঞান হ'লে মনে, তবে তোমার সন্তানে,
পর ভাবিত এমন কেবা আছে ভুবনে ;
আমার জ্ঞান হয় নাই, পর ভাবি তাই,
ভাই ভগ্নির দিই যন্ত্রণা।
তুমি জগতের মাত, যদি সে জ্ঞান হোত,
তবে কাঙ্গাল ধ্যানে তোমায় দেখিতে পেত ;
কাঙ্গাল অজ্ঞান-ঘোরে ধ্যান কোরে,
অন্ধকার আর দেখ্‌ত না।"

উপরে যে প্রসঙ্গের আলোচনা করা হইল তাহা আরও বিস্তৃত ভাবে বুঝাইবার জন্য কাঙ্গাল হরিনাথ বলিতেছেন. "ব্রহ্মের ইচ্ছা অপ্রকাশের নাম যে, নির্গুণ এবং ইচ্ছা প্রকাশের নামই যে সগুণ, ভৌতিক জগতের প্রকৃতি আলোচনা করিলেও তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। লোকে শিশু সন্তানকে নির্গুণ বলে। তাহার অর্থ ও তাৎপর্য্য এই যে, শিশুদিগের ইচ্ছা আছে. কিন্তু তাহার বিকাশ নাই। এই জন্য যাহারা নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসক, তাহারা শিশুতে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবদিগের মধ্যে যাঁহারা নির্গুণ উপাসক, তাঁহারা গোপাল মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েন। শিশুদিগের ইচ্ছা ও তৎসঙ্গে গুণের যতই বিকাশ হয়, তাহারা ততই যেমন সগুণ, তদ্রূপ নির্গুণ ব্রহ্মের ইচ্ছা সহকারে গুণের যতই বিকাশ, তিনিও ততই সগুণ। অতএব, নির্গুণই সগুণ, সগুণই নির্গুণ ; নিরাকারই সাকার, সাকারই নিরাকার।

বালকবালিকার স্বভাব একবার আলোচনা করিয়া দেখ, তাহাদিগের খেলিবার ইচ্ছা হইলেই আর আর বালক বালিকাদিগকে ডাকিয়া একত্র হয় এবং সকলে মিলিয়া ইচ্ছামত খেলা করে। মাতা যদি নিষেধ করেন, "কোথায় গিয়ে কাজ নাই, ঘরে বসিয়া একাকী খেলা কর" তাঁহারা মাতার ভয়ে এ, ও, তা লইয়া ঘরে বসিয়া ক্ষণেক খেলা করিলেও, আর তাহা ভাল লাগে না; ছুটিয়া সঙ্গীদিগের নিকট যায়। ইহাতে বোধ হয় একাকী খেলা করা সম্ভব নহে। বালক-জগৎ যে স্বভাব হইতে এই স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই স্বভাবের যে এই স্বভাব, তাহাতে আর সন্দেহ কি আছে? অতএব, সেই স্বভাবের, ব্রহ্মের খেলিবার ইচ্ছা হইলেই জগতেরও প্রকাশ হইয়া থাকে। ব্রহ্ম এক, অদ্বিতীয়, তাঁহার ত আর দ্বিতীয় নাই; তিনি আর কাহার সহিত খেলা করিবেন? অতএব আপনার ইচ্ছানুসারে আপনাকেই প্রকাশ ও বিস্তার করিয়া আপনি খেলা করেন। তাঁহার এই খেলার নিমিত্তই আধ্যাত্মিক, ভৌতিক জগতের প্রকাশ হইয়াছে। যখন তাঁহার খেলিবার ইচ্ছা থাকিবে না, তখন এই জগৎও লয় প্রাপ্ত অর্থাৎ তাঁহাতেই লীন হইবে। নির্গুণ-ব্রহ্মের সগুণ হইবার কারণ অতি সহজে বুঝাইবার নিমিত্ত, আমি বালকের স্বভাব দৃষ্টান্তস্থলে উপস্থিত করিয়া তোমাদিগকে যে কথা বলিলাম, তপোনিধি মৈত্রেয় ভক্তপ্রধান বিদুরের প্রশ্নোত্তরে বিস্তাররূপে তাহাই বলিয়াছিলেন।"

পরবর্ত্তী সংখ্যায়ও আমরা ব্রহ্মরূপ সম্বন্ধে আরও কিছু বলিয়া কাঙ্গালের বক্তব্য বিশদ করিতে চেষ্টা করিব। এবারে আর দুইটী গান দিয়াই এই প্রস্তাব শেষ করিব। ইহার একটী গান পরলোকগত প্রফুল্লচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় রচিত, দ্বিতীয়টী কাঙ্গাল হরিনাথের গান। প্রফুল্লচন্দ্র কাঙ্গালের ভাবে কতদূর অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন এই গানে তাহা বুঝিতে পারা যায়।—

১। "এ আবার কিরূপ দেখি স্বরূপ মাখা অরূপীর গায়।
ওরূপ ধরে না ব্রহ্মাণ্ড মাঝে,
　　　উথলিয়ে ভাসিয়ে যায়। (অরূপীর রূপ)

রূপটী ঠিক মদনমোহন, শ্যামা ব'লে ভুল যে হয়,
সকল অঙ্গে তারার অলঙ্কার শোভা পায়;
আবার পিছনে ঠিক নব-ভানু-ছটা আনি কে দিল হায়।

　　　শ্যামের মাথে)

কি চঞ্চল রূপখানি মার, থর থর কাঁপিছে হায়,
ধরি ধরি মনে করি ধরা না যায় ;
(ওরূপ) আবার, রাঙ্গা মাখা নুপূর পায়ে
ঝুণু ঝুণু নেচে বেড়ায়। (শ্যাম শ্যামা)
সম্বর ও রূপ মা, ক্ষুদ্র হৃদে আর ধরে না,
রূপে যে বিশ্ব অম্বর ভাসিয়ে যায়,
বুঝ্‌লাম, এই জন্য আনন্দময়ী, দিগম্বরী সাধকে কয়।
(অম্বর বেড়ে না পায়)
রূপে বিশ্ব ডুবে গেল, বল্‌ দেখি মা থাক্‌ব কোথায়,
রূপসাগরে ডুবে থাকা ভাল ত নয় ;
ফিকির, এই করে প্রার্থনা মা গো, মাঝে মাঝে দেখাটী পায়।
(হৃদয় মাঝে, দিনে রেতে)

২। এ রসের রত্নাকরে, ভাস্‌লে পরে,
কখন রতন পাবে না।
সাগরে আছে রতন, মনের মতন
যতন বিনে তা মেলে না ;
ওরে মন ডুবে জলে, গিয়ে তলে, পরশ-পাথর তুলে নে না।
ওরে মন ভাবাবেশে, বেড়াও ভেসে,
প্রেমরসে ডুবে দেখ না ;
ওরে সে পরশ-রতন, পরশে মন, অমনি রে তুই হবি সোণা।
কাঁদিয়ে কাঙ্গাল আকুল, সোনার পুতুল,
ডোবালেও এ মন ডোবে না ;
ওরে সে, আপন বশে, আপনি ভাসে, মন যেন ঠিক টোপাপানা॥”

শ্রীজলধর সেন।

পুনর্ব্বরণ।

(১)

সকালবেলা ফুল তুলিতে আসিয়া বৃদ্ধা সুলোচনা যখন দেখিতেন, বালিকা উমারাণী একমনে শিবপূজা করিতেছে, রাঙ্গা-চেলীর অভ্যন্তর হইতে তাহার চাঁপা-ফুলের মত রংটি ফুটিয়া বাহির হইয়াছে, সিক্ত কেশরাশি মৃত্তিকাবিলুণ্ঠিত হইতেছে, ললাটের মধ্যভাগে সিন্দূরের টিপ্‌টি নবারুণের মত অপরূপ সৌন্দর্য্যে আলোকিত হইয়াছে, তখন সুলোচনা সেফালিফুলের গাছের নিকট নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইতেন। কুসুমচয়ন ক্ষণকালের জন্য বন্ধ হইয়া যাইত। এত রূপ যে তিনি কাহারও দেখেন নাই—মানুষের এত রূপ কি হয়? বালিকার রূপলাবণ্যে যেন কুসুমসৌন্দর্য্য মলিন ও নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে। একাগ্রচিত্তে এ কি সাধনা। জানুর উপর ভর দিয়া, করজোড়ে, নিমীলিতনেত্রে বালিকা হৃদয়ের অকলঙ্ক ভক্তিধারায় যাঁহার চরণ-কমল ধৌত করিতেছিল, সে তিনি যেমন দেবতাই হন না কেন, বালিকার অভীষ্ট সিদ্ধ না করিয়া পারেন না। সুলোচনা, উমারাণীর মা সুরবালাকে সেদিকে আসিতে দেখিয়া সাগ্রহে বলিলেন "দেখ বৌ যেন সাক্ষাৎ উমা, একবারে তন্ময় হয়ে শিবপূজা করে।"

"আশীর্ব্বাদ করি ভগবান যেন তার শিবের মত বর জুটিয়ে দেন।"

"তাই বল মা, তাই বল। যে অবস্থা, তাতে যে ওকে সৎপাত্রে দিতে পারব এমন আশা ত নেই—"

"কিছু ভাবিস্‌নি, দেখ্‌বি তখন আমার কথা; বর আপনি খুঁজে এসে যেচে নিয়ে যাবে; এমন সোনার মেয়ের জন্য কি আবার ভাবতে হয়?"

"যে দিনকাল পড়েছে, টাকা নইলে কি বিয়ে হয়? কষ্টে সৃষ্টে কোনও রকমে দিন গুজরাণ হচ্ছে, তা ত দেখ্‌ছ? দুমাস অসুখে ভুগ্‌লেন। একটী পয়সা মাইনে পান নাই। ধারধোর করে চল্‌চে, তার উপর উমারও বিয়ের সময় হয়েচে, অমন বয়সে অনেক মেয়ে শ্বশুরঘর করে। কি যে হবে ভেবে পাই না!" বলিয়া তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। সুলোচনা ফুল তুলিতে তুলিতে বলিলেন—

"অত ভাবিস্‌নি! আমার উমার মত সুন্দরী মেয়ে সাত খান গাঁ ঘুরলেও পাওয়া যাবে না। আমার বাপেদেরও অবস্থা খুব মন্দ ছিল, কিন্তু পাড়ার সবাই বল্‌ত, অমন মেয়ের আবার বিয়ের ভাবনা? ঠিক তাই হ'ল। যারা দেখ্‌তে

এলেন একবারে পছন্দ করে গেলেন। তোমার ঠাকুরদাদা আজও আমায় খোঁটা দিয়ে বলেন অত সুন্দর হতে হয় যে, একটা পয়সাও দাবী করা গেল না।"

সুলোচনা এইরূপে আত্মপ্রশংসার লোভটা ত্যাগ করিতে পারিলেন না। বলিতে বলিতে তাঁহার বিশীর্ণ শিথিলচর্ম্ম বদনমণ্ডল অল্প রক্তাভ হইল। কোটরগত নয়নদ্বয় উজ্জ্বল দেখাইল।

এই সময় উমারাণী পূজা শেষ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। দেখিল মা ও সুলোচনা ঠাকুরাণী দুইজনে কথোপকথন করিতেছেন। তাঁহাদের কোনও কথাই এতক্ষণ তাহার কর্ণে প্রবেশ করে নাই। সে ভক্তিভরে উভয়কে প্রণাম করিল। উমা প্রতিদিন পূজা শেষ করিয়া মায়ের পদধূলি গ্রহণ করিত

সুলোচনা আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন "মনের মত বর মিলুক, হাতের নোয়া অক্ষয় হোক্।"

উমা রান্নাঘরে গিয়া ঢুকিল। সুলোচনা এত বক্তৃতার পর যে কেবল ফুল লইয়া ফিরিয়াছিলেন তাহা নয়, তাঁহাদের উঠানে যে লাউ গাছ হইয়াছিল, তাহার দুইটা কচি ডগাও লইয়া গেলেন।

(২)

উমারাণীর বিবাহের জন্য সুরবালা অত্যন্ত চিন্তিতা হইয়া পড়িলেন। বারংবার স্বামীকে পাত্র অন্বেষণ করিবার জন্য উত্যক্ত করিতে লাগিলেন। বলিলেন "আর বিবাহ না দিলে ভাল দেখায় না।"

সূর্য্যকান্ত সহধর্ম্মিণীর কথায় সত্য সত্যই সে দিন চিন্তিত হইলেন। কিন্তু উপায় কি, মুখে বলিলে বা ধর্ম্মের দোহাই দিলেই ত বিবাহ হইয়া যাইবে না! তাহার উপর আর্থিক অবস্থা একেবারেই ভাল নয়। কেমন করিয়া তিনি উমারাণীকে সৎপাত্রে অর্পণ করিবেন, কেমন করিয়াই বা অর্থসংগ্রহ হইবে?

কিছু ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না, তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল। রান্নাঘরের বারান্দায় বসিয়া উমারাণী তরকারী কুটিতেছিল। সে দিকে তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইলেই তিনি চক্ষু ফিরাইয়া লইলেন। দুর্ভাবনায় ও সমাজের আশঙ্কায় তাঁহার মুখ বিশীর্ণ হইয়া গেল। সূর্য্যকান্ত ধীরে ধীরে বলিলেন—

"অর্থের বল নাই যে এখনি একটী পাত্র সংগ্রহ করে বিবাহ দি। এমন বিষয় সম্পত্তিও নাই যে বিক্রয় করিলে টাকা যোগাড় হতে পারে। ভগবান যদি মুখ তুলে চান তবেই, নতুবা আর কিছু উপায় দেখ্‌চি না।"

সুরবালা বলিলেন "ভগবান ভিন্ন আমাদের কোনও ভরসা নাই জানি;

কিন্তু তিনিও কি বিমুখ হলেন? তুমি চার দিকে খবর দাও, পাত্রের সন্ধান কর, চেষ্টা কর, তা হলে তাঁর দয়া হবে।"

এই সময় গ্রামের ঠাকুরদাদা হারাণ বাঁড়ুয্যে উঠানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া উমারাণী শশব্যস্তে বারান্দায় পিঁড়ি পাতিয়া দিল। বলিল "বাবাকে ডাকিয়া দিব কি?"

"হাঁ রে শালী হাঁ—তোরা ত আর আজকাল বুড়া ঠাকুরদাদাকে ধমকাস্ না। টেরি কাটা, চশমা আঁটা, ছোকরা বর না হলে মুখ ভার করে বসে থাকিস্। পাকা চুল দেখ্‌লেই একবারে 'আঁত্‌কে' উঠিস। মনে করিস বুড়াগুলোর নামে 'ওয়ারেণ্ট' জারি হয়েছে, কোন্ দিন কখন ধরা পড়বে, আর চলে যাবে। আলাপ করে কোন লাভ নেই। কেমন কি না বল?"

"কেন ঠাকুরদাদা, একথা বলছ? কবে বল তোমার মান্য করি নাই?"

"তুই শালী করিস্ বলেই ত তোর জন্য এত মাথাব্যথা। বেশ মনে আছে, ছেলেবেলায় তুই আমাকেই তোর বর পছন্দ করেছিলি। তখন কি আর ভেবেছিলি, যে, যখন তোর বের বয়স হবে, তখন ঠাকুরদাদার মাথার চুল বরফের মত শাদা হয়ে যাবে, দাঁত পড়ে যাবে, লাঠি নইলে এক পা চলতে পারবে না।"

উমারাণীর মুখ লজ্জারুণ হইয়া উঠিল। সে তার শৈশবকে মনে মনে এরূপ অন্যায় প্রতিশ্রুতি দিবার জন্য অপরাধী করিল।

"কি রে? শালী চুপ করে রইলি যে?"

এই সময় সূর্য্যকান্ত বাহিরে আসিয়া বলিলেন "এই যে হারাণ খুড়ো—আপনার কাছে যাব মনে কর্‌ছিলাম, তা, আপনিই এসে হাজির হয়েছেন। বেশ ভালই হয়েছে। উমা, তোর ঠাকুরদাদার জন্য এক ছিলিম তামাক সেজে নিয়ে আয়।"

একথা সে কথার পর তামাক খাইতে খাইতে হারাণ বাবু বলিলেন "আমি যার কথা বলচি, সে ছেলেটি বেশ। লেখাপড়া যেমন, বিষয়সম্পত্তিও তেমনই। আমি যখন পশ্চিমে কর্ম্ম কর্ত্তাম্ তখন ছেলেটির পিতার সহিত বিশেষ বন্ধুত্ব হয়। চিঠিপত্র লেখালেখি বরাবরই আছে। তবে কি জান, এখন ছুটোছুটি করে গিয়া দেখাসাক্ষাৎ করার মত্ শক্তি নেই বলেই, আসা যাওয়া বন্ধ। তাঁর পুত্রের জন্য আমাকে একটী সুন্দরী মেয়ের কথা লিখেছেন—খুব বড় লোক—বেশ বাড়ী ঘরদোর; কিছুরই অভাব নাই, ছেলেটিও এম, এ, পাস করেছে। আমাদের উমারাণীর চেয়ে সুন্দরী মেয়ে সহজে মিলবে বোলে বোধ হয় না। কি বল?"

কপাটের আড়ালে ঈষৎ অবগুণ্ঠন দিয়া সুরবালা মনোযোগ সহকারে কথোপকথন শুনিতেছিলেন। এই প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া দুরাশা মনে হইলেও, আনন্দে তাঁহার বক্ষ স্পন্দিত হইয়া উঠিল। শিকল নাড়িয়া তিনি তাঁহার সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

সূর্য্যকান্ত মৃদু হাসিয়া উত্তর করিলেন "তাঁহারা কি আমাদের ঘরের মেয়ে নেবেন? তাঁদের সঙ্গে কুটুম্বিতা করবার মত আমার শক্তি কই বলুন?"

"কেন শক্তি নেই বল? তাঁরা চান সুন্দরী মেয়ে। সে ক্ষেত্রে উমারাণীর সমকক্ষ একটা মেয়ে পাওয়া বড় ভাগ্যির কথা।—কোথা গেল শালী? এখন আর আমাকে মনে ধরে না।—সেই জন্যই এত ভাবনা, নইলে কি এমন মেয়ে বাড়ীর বাইরে যেতে দি। ছেলেবেলায় দুবেলা শালী আমাকে বে করত—আমার বর বলে পথ চল্‌তে দিত না।"

"তাঁরা কি রাজি হবেন, এম, এ পাশ করা ছেলে! বড় লোক, অনেক টাকা হাঁকবেন তখন!"

"তখন সে ভার আমার। তোমাদের ভাবতে হবে না। তোমরা ত রাজি!"

"আপনার ভার আপনিই গ্রহণ করুন। আমাদের আর অমত কি?"

এই সময় উমারাণী কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে, সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। ফুৎকারের পরিশ্রমে মুখে রক্ত জমিয়াছিল, উদ্দীপ্ত অগ্নির আভা লাগিয়া মুখখানি গলিত স্বর্ণের ন্যায় আরক্তিম দেখাইল। ঠাকুর-দাদা সেই মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন "দেরে শালী দে, আর ফুঁ দিতে হবে না। মুখখানি যে একবারে সিঁদুরের মত রাঙ্গা হয়ে উঠেছে।" উমারাণী লজ্জানতনয়নে ধীরে ধীরে সেখান হইতে পলাইল। সূর্য্যকান্ত হাসিতে লাগিলেন।

(৩)

অনেক সমৃদ্ধিশালী বংশ টাকার পরিবর্ত্তে সুন্দর মেয়েরই অনুসন্ধান করেন। এক্ষেত্রে তাহাই হইল, যথারীতি কন্যা দেখা হইয়া গেল। উমারাণীর সৌন্দর্য্যে সকলেই বিমোহিত হইলেন। শুভদিনে বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। এই আশাতীত সংঘটনে সূর্য্যকান্ত ও সুরবালার আনন্দের অবধি রহিল না। তাঁহাদের যাহা কিছু সঞ্চিত অর্থ ও অলঙ্কারাদি ছিল—

এই আনন্দ উৎসবে তাহার সমস্তই নিঃশেষিত হইল। হর্ষবিভোর পিতা মাতা দরিদ্রের গৃহে সম্ভাবিত সকল ত্রুটীগুলি, কাঙ্গালের পূজার অর্ঘের মত তাঁহাদের অনাবিল অজস্র স্নেহ ও ভালবাসা দিয়া পূরণ করিয়া দিলেন। সুলোচনা ঠান্‌দিদি বহুদিন পরে তাঁর পুরাতন বেণারসী শাড়ীখানি ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া অলঙ্কারগুলি মাজিয়া ঘসিয়া পরিয়া আসিয়াছিলেন এবং বাসরে বিস্তর রসিকতা করিতে ছাড়েন নাই; কিন্তু ইংরাজি-বিদ্যাপারদর্শী, বক্তৃতাবিজয়ী, ইংরাজি-রসরসিক, সে দিন দুইটী ঠোঁট বড় এক করিতে পারেন নাই।

ঠান্‌দিদি সে দিন সুরবালাকে সতীবাক্যের তেজটা হাতে হাতে দেখাইয়া বলিলেন "বর যে আপনি এসে জুটিল।" সুরবালা সে কথার কোনও প্রতিবাদ না করিয়া তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া মস্তকে দিলেন। বাসরের দরজায় লাঠি ঠক্ ঠক্ করিতে করিতে হারাণ ঠাকুরদাদা উঁকি মারিলেন। বুড়ার স্বল্পদন্ত মুখে হাসি ধরে না। এক ছড়া ফুলের মালা হাতে করিয়া আনিয়াছিলেন; বলিলেন "কই রে শালী, একবারে যে বরের কোলটির ভেতর গিয়া লুকিয়েচিস্। পালালে ছাড়ব না কি! সেই এক বছরের বেলাথেকে আশা দিয়ে আসচিস্। আর আজ যুবা পাসকরা বর পে'য়েই বরখাস্ত কর্‌লে চলবে না—আয় শালী, আজ মালাটা বদল করে দখলী স্বত্ব বজায় রাখি।" উমারাণী লাল চেলীখানি দ্বারা আপাদমস্তক আবৃত করিয়া এক পাশে পড়িয়া ছিল, লজ্জায় যেন সে আরও সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। সকলে হাসিয়া উঠিল, বর কনে উভয়েই তখন তাঁহাকে প্রণাম করিল। ঠাকুরদাদা তখন মালাছড়াটি উমারাণীর কণ্ঠে দিয়া বলিলেন "দে শালী আমার সামনে তোর বরের গলায় পরিয়ে দে। উমারাণীর বিশেষ লজ্জা করিতে লাগিল। কিন্তু সকলের পীড়াপিড়িতে সে ধীরে ধীরে মালাটি লজ্জাপীড়িত নত নয়নে ও অনুরাগভরকম্পিত হস্তে স্বামী শরৎচন্দ্রের কণ্ঠে পরাইয়া দিতে যাইলে তাহা মৃত্তিকায় পড়িয়া গেল। সে আশঙ্কায় যেন জড়সড় হইয়া উঠিল।

(৪)

তারপর দুই বৎসর অতীত হইয়াছে। শরৎচন্দ্র বহু সাধ্যসাধনায় মাত্র বার দুই শ্বশুরালয়ে আসিয়াছিল। তাঁহারা বড় লোক; কিন্তু শ্বশুর অবস্থাপন্ন লোক নন। তাঁহারা যশঃ সম্মান ও ঐশ্বর্য্যেরই মর্য্যাদা বোঝেন।

বাহ্যিক চাকচিক্যের মোহে আচ্ছন্ন। সরল আন্তরিকতা,—প্রাণস্পর্শী স্নেহ ও ভালবাসার বড় একটা ধার ধারেন না। দরিদ্র সূর্য্যকান্তের পর্ণকুটীরে যে কোহিনূরসদৃশ অমূল্য প্রীতি, অকলঙ্ক ভালবাসা ও সহানুভূতি বিরাজিত শত মণিমাণিক্যের উজ্জ্বলতা যে, সেখানে নিষ্প্রভ তাহা শরৎ-চন্দ্র মোটেই অনুভব করিতে পারিলেন না। দরিদ্রের গৃহে পুনঃ পুনঃ আসিতে, যেন তাঁহার মস্তক সরমে সঙ্কোচে নত হইয়া যাইত।

শরৎচন্দ্র অন্বেষণ করিয়াছিলেন সুন্দরী স্ত্রী, তাহা ত পাইয়াছেন। এখন তাঁহার শ্বশুরালয়ের সহিত সম্পর্ক রাখিবার বিশেষ কোন প্রয়োজন দেখিলেন না।

শ্বশুরশাশুড়ীর প্রতি যে একটা কর্ত্তব্য আছে, তাঁহারা যে, জামাতাকে পুত্র অপেক্ষা স্নেহ করেন, জামাতার ঐশ্বর্য্য ও বিদ্যাবুদ্ধির প্রশংসায় যে তাঁহারা গৌরব অনুভব করিয়া সুখ ও সন্তোষ লাভ করেন, তাহা এই ধনী পরিবার মোটেই বুঝিতে পারিত না। তাঁহাদের ন্যায় বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর না হইলেও, যে ভগবান এই দরিদ্র পরিবারকে সমান অন্তঃকরণ ও স্নেহমমতা দয়াধর্ম্ম বুঝিবার মত প্রাণ দিয়াছেন, এবং তাঁহারা যে ভগবানের করুণা লাভে বঞ্চিত নন, এতটা কথা ভাবিবার বোধ হয় শরৎচন্দ্রের অবসর ছিল না। এই শ্রেণীর জীবগুলি মনে করেন, যে জগতে কোনও গতিকে বাঁচিয়া থাকিতে পাইলেই যথেষ্ট। ইঁহারা পৃথিবীর কোনও একটী বিশেষ কাজে মোটেই স্থান পান না—কেবল সংসারে দুঃখের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। এমন একটা ব্যর্থ জীবন যাহারা ক্রমাগত অনর্থক টানিতে থাকে, তাহাদের অপেক্ষা মূঢ় বোধ হয় আর কেহই নাই। সূর্য্যকান্ত যখন জামাতাকে তাঁহাদের পর্ণকুটীরে আহ্বান করিতে আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিতেন, তখন সব চেয়ে যেন তাহাদের অবস্থাটি শরৎচন্দ্রের চক্ষে হাস্যকর বলিয়া প্রতীয়মান হইত। এইরূপ অকরুণ ব্যবহার তাঁহাদের মনে সীমাহীন অশান্তি সৃষ্টি করিত। কন্যা উর্ম্মিরাণীর নিকট ঘুণাক্ষরে এ সকল কথা বা এমন কোন ভাবই তাঁহারা কোন দিন প্রকাশ করিতেন না, যাহাতে উমারাণী মনে কষ্ট পায়। সমুদ্রের সহিত নদীর মিলনের মত, কেবল নদীই ছুটিয়া তাহাতে আত্মবিসর্জ্জন করিল, সাগর তাহার অসীমত্ব লইয়া কোন দিন ফিরিয়াও চাহিল না। এই সকল ধনী পরিবারের সহিত সূর্য্যকান্তের কুটুম্বিতার পরিণাম ঠিক এইরূপই হইল।

আষাঢ়ের দিনে বৃষ্টিহীন মেঘগুলি কেবল কৃষককে উপহাস করিয়া উড়িয়া গেল। কৃষক কেবল নিরুপায়ভাবে শূন্য দৃষ্টিতে মেঘের প্রতি চাহিয়াই রহিল।

(৫)

উমারাণী কিছুতেই এই ধনী-পরিবারের মধ্যে আপনাকে খাপ খাওয়াইতে পারিল না। তাহার সকরুণ সদ্ব্যবহারগুলি ইঁহাদের চক্ষে মোটেই ভাল লাগিত না। উমারাণীর লজ্জানম্র প্রকৃতি বড়লোকের সংসারে তাহার দীনতাই প্রকাশ করিত। সে জন্য বেচারী বড়ই কোণঠাসা হইয়া পড়িল। শরৎচন্দ্র একদিন একখানি 'ফাষ্ট´বুক কিনিয়া আনিলেন এবং উমাকে ডাকিয়া বলিলেন "দেখ এতটা বয়স তোমার বৃথা নষ্ট হইয়াছে। তুমি লেখাপড়া কিছুই শেখ নাই। এখন হইতে তোমাকে পড়াশুনা করিতে হইবে।" উমারাণীর মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। মনে হইল সমস্ত প্রকৃতিই বুঝি তাহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছে। সে কি উত্তর দিবে, ভাবিয়া পাইল না। শরৎচন্দ্র ভাবিয়াছিল উমা নিশ্চয়ই এ প্রস্তাবে নিজের অভাবের বিষয় অনুভব করিয়া খুব একটা উৎসাহ প্রকাশ করিবে। কিন্তু সে যখন ইংরাজি বইখানি কম্পিতহস্তে তুলিয়া দুই একবার পাতা উল্টা-ইয়া নতনয়নে নিরুত্তর হইয়া রহিল, তখন শরৎচন্দ্র বিরক্ত হইলেন; বলিলেন, "আজ দুপুর বেলা তোমাকে পড়াইব?"

উমা ভয়পীড়িতনয়নে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল "আমি দিনের বেলা বসিয়া পড়িতে পারিব না"—

"কেন? দিনের বেলা আসিলে কি খাইয়া ফেলিব।"

"সকলে কি মনে করিবেন?"

"কি মনে করিবে? স্বামীর নিকট লেখাপড়া শিখিতেছ, ভাল কথাই ত!"

উমারাণী নির্ব্বাক হইয়া রহিল।

শরৎচন্দ্র খুব গম্ভীর হইয়া বলিলেন "তোমার বাপের বাড়ীর মত এখানে কিছু রান্না বা অন্য কোন কাজ করিতে হয় না। শুধু ইংরাজি শিখ্‌লেই হবে না, হারমোনিয়ম, পিওনো প্রভৃতি বাজাইতে শিখিতে হইবে। ঐ পাড়াগেঁয়ে ধরণের কাপড়াগুলা আমার চক্ষের শূল। ও সব তোমার বাপের বাড়ী গিয়া পরো।"

এবার বাপের বাড়ী কথাটির উপর শরৎচন্দ্র খুব জোর দিয়া বলিল।

বাপের বাড়ীর তুলনায় উমারাণীর আত্মসম্মানে বড় আঘাত লাগিল। সে

কোন দিন প্রতিবাদ করিতে শেখে নাই, সুতরাং সেদিনও করিল না। মুখ ফিরাইয়া অঞ্চলে চখের জল মুছিল।

শরৎচন্দ্র বলিলেন "দেখ আমাদের কুটুম্বসাক্ষাত সব বড়লোক। তাঁহাদের বাড়ীর মেয়েছেলেরা কেমন শিক্ষিত, সুসভ্য। এসব না শিখিলে কেমন করিয়া তাঁহাদের সহিত আলাপ পরিচয় ও মেলেমেশা করিতে পারিবে?" স্বর একটু মিষ্ট করিয়া বলিলেন "দিনের বেলায় যদি লজ্জা করে, না হয় রাত্রে পড়িবে, কেমন?"

উমারাণী কাতরতাপীড়িত স্বরে কহিল "ইংরাজী না শিখিলে কি চলিবে না, বাজনা আমি বাজাইতে পারিব না। আমাকে এ সব থেকে রক্ষা কর?"

যদি আমার নিকট পড়তে লজ্জা করে, তবে একজন মেম সাহেব না হয় রেখে দেব, তা হ'লে তোমার আপত্তি হবে না কেমন?" মেমসাহেবের নামে উমা শিহরিয়া উঠিল। সম্মুখে বাঘ দেখিলেও বোধ হয় সে এতটা ভীত হইত না।

অনেকক্ষণ নিরুত্তর থাকিয়া উমারাণী ধীরে ধীরে বলিল "তোমার ছুটি পায়ে পড়ি, আমি ওসব শিখ্‌তে পারব না।"

"তবে কি পারবে?

"আমি তোমার জন্য রোজ-রোজ নূতন খাবার তৈরি করব। রান্না করব। আর যা বল সব করতে রাজি আছি।" শুনিয়া শরৎচন্দ্র কক্ষ হইতে নিস্ক্রান্ত হইয়া গেলেন। উমারাণীর মুখ শুকাইয়া গেল। অনেকক্ষণ ধরিয়া অন্যমনস্ক ভাবে ফার্ষ্টবুক খানির পাতা উল্টাইয়া যাইতে লাগিল। তাহার মনের মধ্যে নানা চিন্তার স্রোত বহিতেছিল। কি করি? আমি ত তাঁহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসি, তবু তিনি আমাকে বুঝিতে পারেন না? ইংরাজি পড়তে পারিলেই কি ভালবাসা হয়? পিওনো বাজাইতে পারিলেই কি ভদ্রসমাজে মিশিতে পারে?"

তারপর তার পিতামাতার মুখ মনে পড়িল, তাঁহাদের প্রতি ইঁহাদের ব্যবহারের কথা স্মরণ করিতে উমার বড় অপমান বোধ হইল। তাঁহাদের উপেক্ষার দৃষ্টি যেন তাঁহার সর্ব্বশরীর জর্জরিত করিয়া ফেলিল! অভিমানে বালিকার হৃদয় ভরিয়া গেল। সে নিজে নিজেই বলিল "কিছুতেই আমি শিখিব না। যাহা আমার ভাল লাগে না, প্রতারণা করিয়া তাহা ভাল লাগে কোন দিনই স্বীকার করিব না।" তার পর ধীরে ধীরে যেখানে দাসদাসী আহারাদি করিতেছিল সেখানে গিয়া উপবেশন করিল, ও তাহাদের সুখদুঃখের অনেক

গল্প শুনিল। তখন বেলা অনেক হইয়া গিয়াছিল। আকাশে দুইএকখানি মেঘ ভাসিয়া বেড়াইতেছিল। মাঝে মাঝে ফেরিওয়ালা চীৎকার করিয়া ফিরিতে-ছিল। কলতলায় দুর্ব্বল শেওলাগুলি রৌদ্রে শুষ্ক হইয়া মাথা তুলিবার অবকাশ লাভ করিয়াছিল। ছোট ছোট ছেলেগুলি যাহারা এখনও ইস্কুলে যাইবার মত বড় হয় নাই, কয়েকটি লোহার চাকা লইয়া খেলিতেছিল এবং কুথার অবাধ্যতার জন্য নিদারুন ভাবে সেগুলিকে লাঠি দ্বারা পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতেছিল। কখনও কখনও চাকাগুলি আকিয়া বাঁকিয়া ছুটিতেছিল, শিশুগুলি উল্লাসে করতালি দিয়া নাচিতেছিল। উমা দেখিল, তাহাদের এই খেলার ভিতর কেহ বাধা দিতেছে না—তাহা দের আনন্দের সীমাও নাই—বড় লোকের ছেলের খেলা ও গরীবের ছেলের খেলার বিশেষ কোন বিভিন্নতা নাই!

(৬)

উমারাণীর পিতা কন্যাকে দেখিতে প্রথম প্রথম কয়েকবার আসিয়াছিলেন, কিন্তু অকরুণ আচরণ ও অনাদর অবলোকন করিয়া কুটুম্ববাড়ী অধুনা বড় আসিতেন না। ইঁহারাও মেয়েকে বড় পাঠাইতেন না। উমারাণী বুদ্ধিমতী, এ সব যে বুঝিতেন না তাহা নয়। ইঁহাদের সংস্কারে আপনাকে সে কিছুতেই মিশাইয়া দিতে পারিতেছিল না। সরু সেলাইয়ের সঙ্গে অশিক্ষিত হাতের মোটা সেলাইয়ের মত সে সকলের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করিত। শরৎচন্দ্রকে সে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভক্তি করিত। গৃহকর্ম্ম সমস্তই নিজ হাতে করিত, কিন্তু শরৎচন্দ্র ও তাহার মধ্যে অদৃশ্য ব্যবধান দিন দিন মাথা তুলিয়া উঠিল। শরৎচন্দ্র আজকাল বড় ভাল করিয়া উমার সহিত কথা বলিতেন না, অনেক সময় গম্ভীর হইয়া পুস্তকাদি অধ্যয়ন করিতেন। উমারাণী মনে করিত এরূপ আচরণ, হয়ত বড়মানুষের খুব স্বাভাবিক। এখন নিকটে যাইলে বোধ হয় রাগ করিতে পারেন। গৃহের মধ্যে অনিমিত্ত কারণে এটা সেটা নাড়িয়া ভয়ে ভয়ে সন্তর্পণে পানের ডিবাটি স্বামীর নিকট রাখিয়া নীরবে ফিরিয়া যাইত। কোন দিন হয়ত খাবারের রেকাবীখানি হাতে করিয়া অনেক-ক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া, যখন দেখিত শরৎচন্দ্র তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিল না তখন সে রেকাবীখানি সেখানে রাখিয়া অভিমানে চলিয়া যাইত। অঞ্চলে চক্ষের জল মুছিত। শরৎচন্দ্র মনে করিত, এরূপ করিয়া থাকিলে উমা ক্রমে বাধ্য হইয়া লেখা পড়া শিখিতে সম্মত হইবে। পাড়াগাঁয়ের ভাবগুলিও পরিত্যাগ করিবে। কোন কোন দিন বা মুখখানি বিষণ্ণ

করিয়া সাহসে ভর করিয়া সে স্বামীর নিকট স্ত্রীর মর্য্যাদা লইবার জন্য অগ্রসর হইতে আসিত, কিন্তু শরৎচন্দ্র যখন তাহার দিকে চাহিয়া পুনরায় গম্ভীর হইয়া পড়িতেন, তখন উমার আত্মমর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ ও বিদ্রোহী হইয়া উঠিত, তাহার আর অগ্রসর হওয়া হইত না। সে ব্যাকুল হইয়া উঠিত। সে পূজার আয়োজন করিত কিন্তু দেবতার মূর্ত্তি দেখিয়া তাহার পূজা করা হইত না। স্বামীকে সন্তুষ্ট করাই তাহার হৃদয়ের এক মাত্র বাসনা। আপনার অধিকারে বঞ্চিত হইয়া সে যখন নিজে কাঙ্গালের মত কাঁদিয়া ফিরিয়া যাইত, তখন ইংরাজী বিদ্যাপারদর্শী, ঐশ্বর্য্য-মদমত্ত শরৎচন্দ্র যে কিছু অনুভব করিতে পারিত তাহা বোধ হয় না। উমার নিষ্কলঙ্ক হৃদয় ও পবিত্র মূর্ত্তি সে দেখিতে পাইত না। উমা বড় কথা বলিত না। কথা বলিতে তাহার শঙ্কা হইত, সরমও হইত। দুই তিন বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল, তথাপি ব্যবধান দূর হইল না।

(৭)

আজ দুইমাস হইল উমারাণী পিত্রালয়ে গিয়াছে। খেলার ইঞ্জিন ও মোটর গাড়ীগুলিকে দম দিয়া দিলে সে গুলি যেমন অনবরত চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে থাকে, সে দিন সকাল হইতে দাসদাসা গুলি মনিবের আদেশে অনাদেশে কেবল ছুটাছুটি করিতেছিল। বৈঠকখানা গৃহটি সাধারণ সাজসজ্জার উপর কিছু বিশেষত্ব লাভ করিয়াছিল; রন্ধনাদির বিশেষ আয়োজন চলিতেছিল। সকলেই চুপি চুপি কাণে কাণে কথা বলাবলি করিতেছিল। শরৎবাবুর আবার বিবাহ, দাসদাসীগুলি গণ্ডস্থলে হস্তার্পন করিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিতেছিল। এরূপ আচরণটা যে অন্যায় সে কথা তাহারা প্রকাশ করিতে সাহস না পাইলেও মনে মনে কিছুতেই অনুমোদন করিতে পারিতেছিল না। একজন বলিল, মাঠাকরুণ কর্ত্তাবাবুকে জিজ্ঞাসা করছিল যে মেয়েটি কত বড়—তা কর্ত্তাবাবু বল্লেন দুটো পাস করা। আঠারো বছর বয়স। বেস গানটান গায়িতে পারে। শরত যেমন চায়, ঠিক মনের মত হবে।" একজন বলিল "বলিস কিরে?" আর একজন বলিল "বলবার আর কিছু নেই রে, বড়মানুষদের এমন নাকি আজকাল হয়।"

"এঁ্যা, হয়?—

ইহারপর যথাসময় পাত্র দেখা হইয়া গেল। পাত্রপক্ষ কন্যা দেখিয়া আসিলেন। এবার কুটুম্ব বড়লোক হইবেন। যাহাদের সহিত বিবাহের সম্বন্ধ চলিতেছিল তাহারা চির দিনই পশ্চিমে থাকিতেন। পূর্ব্বের বিবাহের বিষয় বোধ হয় তাঁহাদের নিকট গোপন রাখা হইয়াছিল। সূর্য্যকান্ত এ সংবাদ পাইলেন।

ভাবিয়া কোন উপায় দেখিলেন না। হারাণখুড়ার নিকট গিয়া পড়িলেন। বৃদ্ধ বলিলেন "আমি সব খবর রাখি। তুমি ভাবিও না।" বিবাহের দুই চারি দিন থাকিতে, হারাণ খুড়া হাসিতে হাসিতে আসিয়া সংবাদ দিলেন, বড় মজা হইয়া গিয়াছে। যে মেয়েটির সহিত শরতের বিবাহ ঠিক হইয়া গিয়াছিল, তাহার সঙ্গে বিবাহ গিয়াছে। সুরেন্দ্র বাবুর বড় ছেলে অনিল যখন বিলাতে সিভিল সারভিস অধ্যয়ন করিতে যায়, তখন এই মেয়েটিরই পিতার সহিত তাঁহার পুত্রের বিবাহ দিবার কথা হয়। এখন ছেলেটিই পাস করিয়া গত পরশ্ব তারিখে কলিকাতা আসিয়াছে। তারপর মেয়েটির পিতা কোন রূপে শরতের পূর্ব্ব বিবাহের কথা অবগত হইয়াছেন। তিনি এই অন্যায় আচরণে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়াছেন। সিভিল-সারভিস পাস করা ছেলেটির সহিত বিবাহ স্থির হইয়াছে। এই দেখ, নিমন্ত্রণ চিঠি আসিয়াছে। এঁরা শরতদের অপেক্ষা খুব বড় লোক। তাহার উপর শরতের সহিত অনিলের তুলনা কোন দিক থেকে হয় না। মেয়েটি শিক্ষিত, সেও অনিলের সহিত আপনার বিবাহের মত দিয়াছে। সুরবালা আকাশের দিকে চাহিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

সেই সময় উমারাণীর শ্বশুরালয় হইতে ঝি আসিয়া দাঁড়াইল। উমারাণীকে লইবার জন্য শরতের পিতা তাঁহাকে পত্র পাঠাইয়াছেন। ঝি মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতেছিল।

শ্রীফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

তারাচরিত।

(১)

নদীয়া জেলার অধীন, দেবগ্রামের প্রসিদ্ধ বন্দ্যোপাধ্যায় বংশে, প্রাতঃস্মরণীয় দয়ার সাগর ৺গিরীশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা ৺রামলোচন বন্দ্যোপাধ্যায়। পিতার কনিষ্ঠ পুত্র গিরীশচন্দ্র, শৈশবকালে শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন রীতিমত বিদ্যাভ্যাস করিতে না [illegible] স্নেহশীল পিতা জমীদারীর ছয় অংশ তাঁহাকে [illegible] পুত্রদিগকে দেন। গিরীশচন্দ্র আশৈশব দানে মুক্তহস্ত [illegible] নদীয়া জেলায় খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।

"বিশ্বব্যাপী তাঁর দয়া জাহ্নবীর মত
সমস্ত নদেয় করে সুধাবরিষণ!"

গিরীশের হৃদয় পরদুঃখে সতত দ্রবীভূত ছিল, কাহারো কোন শোক দুঃখের কথা শুনিবা মাত্র অশ্রুভরে তাঁহার গণ্ডস্থল ভাসিয়া যাইত ও উপবাসী থাকিয়া নিজের অন্ন ব্যঞ্জন ভিখারীকে দিতেন। কখন কখন দারুণ শীতে পরিধেয় বস্ত্র পথে দান করিয়া উত্তরীয় পরিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে গৃহে ফিরিতেন।

সিপাহীবিদ্রোহের সময় ইংরাজ সৈনিকের রসদ দিয়া সাহায্য করায় তিনি প্রশংসাপূর্ণ এক সনন্দ পান ও তাহাতে লিখিত ছিল যে গিরীশবাবুর পরিবারের উপকারার্থে সরকারবাহাদুর সতত অগ্রসর রহিবেন এবং তাঁহার বংশের যে কেহ বিপদগ্রস্ত হইয়া আসিবেন তিনিই সাহায্য পাইবেন।" সেই সনন্দ যদিও তাঁহার পুত্রগণের নিকট এখনও আছে ; কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহা দ্বারা কেহ কোন কার্য্য বা উপকার পান নাই। দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষের সময় গিরীশচন্দ্র অন্নসত্র খুলিয়া কত প্রাণীর জীবনরক্ষা করিয়াছিলেন। নিজ হাতে গরীব দুঃখীকে অন্ন বিতরণ করিতেন, তাহাতে সরকার হইতে আর একখানি সম্মান-সূচক সনন্দ পান এবং তখন তিনি ইচ্ছাকরিলে রায়বাহাদুর কি রাজাবাহাদুর উপাধি লাভ করিতে পারিতেন। কিন্তু দুঃখীজনের দুঃখ দূর করাই তাঁহার জীবনে সার ব্রত ছিল; কোনরূপ উপাধির চাকৃচিক্যের মর্য্যাদা তিনি বুঝিতে পারেন নাই এবং তাঁহার কেশবিরল গৌরবান্বিত মস্তকে বাহাদুরের কিরীট ধারণ করিয়া জীবন সার্থক করিয়াও যান নাই।

গিরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অনেকগুলি ধর্ম্মপুত্র ও ধর্ম্মকন্যা ছিল। তিনি নিজব্যয়ে ব্রাহ্মণপুত্রদিগকে উপনয়ন দিয়া লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ ও অন্যজাতির অনাথা কন্যাগণকে বিবাহ দিয়া ঘরকন্না পাতিয়া দিয়া অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিয়া দিয়াছেন। প্রতি বৎসর শীতকালে পৌষতত্ত্ব, জামাইষষ্ঠী ও শারদীয় পূজার সময় কাপড় মিষ্টান্ন পাঠাইয়া দিতেন। ভৃত্যের মৃত্যু হইলে তাহার বিধবা পত্নীর মাসহারা দিয়াও শিশু-সন্তানকে নিজের কাছে আনিয়া নিজপুত্রবৎ প্রতিপালন করিতেন।

গিরীশের দুই বিবাহ, প্রথমার এক পুত্র ও এক কন্যা। প্রথম স্ত্রী অতি অল্পবয়সেই পরলোকগমন করেন। তাহার পর অনেক দিন তিনি আর [illegible] ছোট ভ্রাতার সংসার চলে না দেখিয়া বড় [illegible] হইয়া বিবাহযোগ্য কন্যা অনুসন্ধান করিতে [illegible] দেন ও এক দিন গিরীশের ভ্রাতস্পুত্র তাঁহারই

সমবয়স্ক এবং বন্ধু তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া নবদ্বীপে গঙ্গাস্নানে লইয়া যান ; গঙ্গাস্নান-কালীন সেখানে কন্যা দেখাইলেন। আগুল্ফ বিলম্বিত দীর্ঘ কেশরাশি। বিবাহযোগ্যা সুন্দরী পাত্রী দেখিয়া গিরীশচন্দ্র বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন। ভ্রাতস্পুত্র পিতৃব্যের ইচ্ছানুসারে নবদ্বীপের পণ্ডিতপ্রবর ৺ আনন্দচন্দ্র শিরোমণির কন্যা সত্যবতীর সহিত বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিয়া সেইস্থানে দুইচারিদিন থাকিয়া বিবাহ দিলেন। "এক ঢোল এক কাঁড়া বিয়ে-হল থাড়া থাড়া।" গঙ্গাস্নানের সেই নৌকাযোগেই নববধু সহ গিরীশচন্দ্র দেবগ্রামের গৃহে আসিয়া পৌঁছিলেন। গিরীশবাবু গঙ্গাস্নানে যাইয়া সুন্দরী নববধু লইয়া আসিয়াছেন এই সংবাদ গ্রাম মধ্যে প্রচার হইবা মাত্র দলে দলে আত্মীয় কুটুম্ব প্রতিবাসী দাস দাসী ও প্রজাগণ আসিয়া গৃহপূর্ণ করিয়া ফেলিল। সকলেরই মুখে আনন্দ কেবল গিরীশের জ্যেষ্ঠা ভগিনী অতিশয় নিরানন্দভাবে ভ্রাতার পূর্ব্বপক্ষের পুত্র কন্যার হস্ত-ধারণপূর্ব্বক ভ্রাতৃভবন ত্যাগ করিয়া নিজালয়ে চলিয়া গেলেন। বিমাতা গৃহে আসিলেন, ছেলেমেয়ের অযত্ন হইবে এই তাঁহার দুঃখের কারণ ; কিন্তু লক্ষ্মী-স্বরূপা সত্যবতী আজীবন স্বামী সেবা ব্রত যাগ যজ্ঞ ধর্ম্ম কর্ম্ম করিয়া বন্দ্যো-পাধ্যায় বংশ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। তিনি শিরোমণি আনন্দচন্দ্রের কন্যা অতিশয় নিষ্ঠাবতী এবং হিন্দুরমণীর আদর্শ ছিলেন।

তাঁহার পাঁচ পুত্র ও এক কন্যা। ত্রিশ বৎসর বয়স পূর্ণ হইতে না হইতে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের হৃদয় মন ও গৃহ শূন্য করিয়া অনাথ পুত্রগণ এবং এক মাত্র কন্যাকে স্বামী হস্তে সমর্পণ করিয়া সতী মাতা স্বর্গে চলিয়া গেলেন। গিরীশ আবার শূন্য প্রাণে সন্তানদিগকে লালনপালন করিতে লাগিলেন। সন্তানগতপ্রাণ গিরীশ একদিন পৌষের রাত্রি জাগিয়া নিদাঘের রৌদ্রতাপে ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইয়া অকাতরে সকল ক্লেশ সহ্য করিয়া আত্মজীবনের সর্ব্ব সুখ ত্যাগ করিলেন। যদিও তিনি সেকালের লোক তথাপি উচ্চশিক্ষার প্রতি তাঁহার আন্তরিক যত্ন ছিল। তিনি গৃহে শিক্ষক রাখিয়াও গ্রামের বিদ্যালয়ে পুত্রদিগকে পাঠাইয়া [illegible] শিক্ষা দিতে যত্নশীল হইলেন। এই সদাশয় [illegible] তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। তারাদাস শৈশবে অতি দুরন্ত [illegible] চড়িয়া বসিতেন। বালক তারাদাস কাহারও [illegible] না। [illegible] খেলায় তিনি গ্রামের মধ্যে অদ্বিতীয় ও দল[illegible]। [illegible]

সর্ব্বদাই ভয় পাইতেন যে পুত্র তারাদাস কখন কোথায় পড়িয়া কি আঘা পাইয়া প্রাণ হারান।

দুরন্ত বালক তারাদাসের অসাধারণ মেধাশক্তি ও প্রখর বুদ্ধি ছিল। তিনি যতই কেন খেলা করুন না, বিদ্যালয়ে পাঠকালীন কোনরূপ চাঞ্চল্য দেখাইতেন না ও সর্ব্বোচ্চ থাকিয়া, খ্যাতির সহিত বৎসরান্তে পরীক্ষায় প্রথম হইয়া অনেক পুস্তক পুরস্কার লইয়া আসিতেন। বালকের কোমল হৃদয় ভালবাসায় সতত দ্রবীভূত ছিল, সহপাঠীদিগকে বড় ভালবাসিতেন, কেহ কাহারও উপর অযথা অত্যাচার করিলে, তারাদাস অমনি দুর্ব্বলের পক্ষ লইয়া অত্যাচারীকে প্রতিফল দিতেন। সেজন্য অনেক সময় পিতাঠাকুর তাঁহাকে ভৎর্সনা করিতেন ও কলহ করিতে বাধা দিতেন, তথাপি ন্যায়পরায়ণ বালক তারাদাস সে সব মানিতেন না। এই সব কারণে শৈশবে তিনি অতীব রাগী ও অশান্ত বলিয়া সাধারণের পরিচিত ছিলেন।

দেবগ্রাম স্কুল হইতে ছাত্রবৃত্তি পাস করিয়া জলপানী লইয়া বালক তারাদাস কৃষ্ণনগরে কলেজে যাইয়া ভর্ত্তি হইলেন। গিরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ধনবান, জমাদারী, রেশমের কুঠি ইত্যাদির আয়ে, মা লক্ষ্মীর অজস্রকৃপায় তাঁহার সন্তানবর্গ, ধনাপুত্রের ন্যায় বিলাসিতায় গোয়াড়ীর বাসা বাটীতে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। সেখান হইতে তারাদাস ভ্রাতৃগণের সঙ্গে থাকিয়া কলেজে নিয়মিত অধ্যয়ন করিয়া ক্রমে ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে লাগিলেন। মাতৃহীন তারাদাস নিজ ভ্রাতাদিগকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন বিশেষতঃ তাঁহার সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান উমাদাসকে এইক্ষণে Dr. U Banerjiকে নিজ প্রাণাপেক্ষা অধিকতর প্রিয়জ্ঞানে তাঁহার জন্য আশৈশব সর্ব্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। বালক তারাদাস ভ্রাতৃগণের সহিত একত্র আহার, একত্র খেলা, একত্র শয়ন ও একত্র ভ্রমণ করিয়া সুখী হইতেন। ভ্রাতায় ভ্রাতায় এমন প্রীতি, এমন ভালবাসা, এমন বন্ধুত্ব সচরাচর দেখা যায় না। পিতামাতা যেমন একমাত্র পুত্রের জন্য, ভগিনী যেমন একমাত্র ভ্রাতার জন্য এবং অনুরাগিণী সাধ্বী পত্নী যেমন পতির জন্য কারণ অকারণে সর্ব্বত্যাগী হইতে পারেন, এ ভ্রাতৃভালবাসাও তদ্রূপ ছিল। প্রণয়ী যেমন প্রণয়িনীর প্রেমে সতত আত্মবিস্মৃত হইয়া তাহাকে সুখী করিতে, সকল সমর্পণ [illegible] তারাদাস সেই প্রকার ভ্রাতৃগণের সুখের জন্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এক মুহূর্ত্ত [illegible] করিতে পারিতেন। ভাই ভাই অভিন্নহৃদয় ছিলেন ও নিজ নিজ

'দোষঘটে' ভুল ভ্রান্তি অকপটে আপনাদের মধ্যে প্রকাশ করিয়া শান্তিলাভ করিতেন। এই ভ্রাতৃপ্রেম, জ্যেষ্ঠ কণিষ্ঠে একাত্মা, একমনপ্রাণ ও জন্মাবধি কেহ কাহারো ত্রুটি যেন দেখিতে পাইতেন না। বাল্যের সখ্য, যৌবনের গাঢ় প্রণয় বয়োবৃদ্ধিসহকারে অকৃত্রিম বন্ধুত্বের চরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিল।

এই বালকের স্বজনপ্রীতির বাল্যজীবনের প্রতিদিনের স্নেহময় ব্যবহার ও ত্যাগস্বীকার কাহিনী শুনিলে এখনও নয়ন অশ্রুসিক্ত হইয়া যায়। কমলা চির চঞ্চলা, কাহারও গৃহে স্থায়ীভাবে অবস্থিতি করেন না, সুতরাং গিরীশের ভাগ্যও ভাঙিল। তাঁহার অপরিমেয় দয়াতেই তিনি সর্ব্বস্বান্ত হইলেন। দেবগ্রামের সীমা হইতে আরম্ভ করিয়া মুর্শিদাবাদ পর্য্যন্ত যে সব রেশমের কুঠি, সৌষ্ঠবময় দরিদ্র গ্রাম ও প্রজায় পরিপূর্ণ জমিদারী ছিল একে একে সমুদায় উড়িয়া গেল। ধনবানের পুত্র, ধনী গিরীশ এই দুর্ভাগ্যে ও দারিদ্র্যে একেবারে ভগ্নহৃদয় হইয়া পড়িলেন।

শ্রীপ্রসন্নময়ী দেবী।

দ্বিজেন্দ্র-বিয়োগে

সমুদ্রমন্থনদিনে দেবাসুরে নিল ভাগ করি'
সিন্ধুর যা-কিছু রত্ন ; বেলাভূমে ছিল সেথা পড়ি'
একখানি শুক্তি শুধু ; বিধাতা দিলেন তাহা নরে—
হাসি-অশ্রু যুগ্ম-মুক্তা গাঁথা যার গোপন গহ্বরে।
ছল-ছল স্বচ্ছশোভা অশ্রুমুক্তা স্বভাব-কোমল
মানবের চক্ষে-চক্ষে ফিরিতে লাগিল ভূমণ্ডল ;
হাস্য ছিল সঙ্গোপনে—ঢল-ঢল লাবণ্যসম্ভার !
তুমি কবি, আহরিয়া সুদুর্ল্লভ সেই উপহার,
সমর্পিলে মহাহর্ষে মর্ত্ত্যবাসী আর্ত্তজন লাগি'—
হাসিল তমসাতীরে অকলুষা ঊষা যেন জাগি' ;
সাহিত্যের কুঞ্জে কুঞ্জে কণ্টকে ফুটিল পুষ্পরাশি,
বঙ্গবাসী প্রাণ পেল হাসি' সেই রঙ্গভরা হাসি !

কিন্তু হায় ! কে মুছিবে নিয়তির [illegible] [illegible]—
কাঙালী বাঙালী-ভাগ্যে আনন্দ [illegible] ঐশ্বর্য্য-স্বপন !
তাই আজি বঙ্গাকাশে সহসা নি[illegible] [illegible],
আনন্দের পূর্ণচন্দ্র অকস্মাৎ হ'ল জ্যো[illegible]হারা ;

বসন্তে জাগায়ে দিয়া কোকিল কোথায় গেল চলি',
'গৃহস্থের খোকা হোক্' কাঁদিল সে 'চোখ গেল' বলি' !
এ যেন কৌতুক-নাট্যে প্রথমাঙ্কে যবনিকা টানি'
নিবাইল দীপালোক, শুনাইল অন্তিমের বাণী !
রঙ্গরসে সারা বঙ্গ মাতাইয়া যেন অন্ধপথে
বঙ্গ-বৃন্দাবন-চন্দ্র আরোহিলা অক্রূরের রথে !
যে দিয়াছে এত সুখ, সেও এত দুঃখ দিতে জানে—
হায়রে দুর্ভাগা দেশ, আনন্দ কি সহে তোর প্রাণে !

ঐ শোন লক্ষ কণ্ঠ তোমারে ডাকিছে ফিরে' আজি—
ঐ দেখ লক্ষ চক্ষু বরষিছে তপ্ত অশ্রুরাজি !
আপনি স্বদেশ-লক্ষ্মী হের আজি শূন্য কোল নিয়া
কবিবর, তোমা পানে অশ্রুনেত্রে আছেন চাহিয়া !
এরি মাঝে মর্ত্ত্যে তব কর্ত্তব্যের হইল কি শেষ ?
'সকল দেশের রাণী' আজিও যে চিনিলনা দেশ !
'স্বর্গ আমার' বলি' গর্ব্বভরে ডাকে কয় জন.—
'মানুষ হ'বার লাগি' গৃহে-গৃহে কৈ আয়োজন ?
'শিখিয়া বিলাতি বুলি, বাঙলা ভুলি'তে আজো সাধ,
গণ্ডমূর্খ 'চণ্ডী' করে লণ্ডভণ্ড হিন্দুধর্ম্মবাদ !
এখনো এ দগ্ধদেশে ছদ্মবেশে ফিরে 'নন্দলাল'—
ফিরে' এস, ফিরে' এস—সাহিত্যের আনন্দ-দুলাল।

শতাব্দির দুঃখদৈন্যে জর্জ্জরিত যাহার হৃদয়,
হাস্য যে অমৃত তার—অবসন্ন আত্মার অভয় !
তুমি সেই অমৃতের কবি, ঋষি, মহাপ্রচারক,
দেশভক্ত মহাকর্ম্মী, জননীর অক্লান্ত সাধক ;
তুমি শুধু কবি নহ, কবিরাজ তুমি ধন্বন্তরি—
মুমূর্ষু বাঙালীদেহে তুমি দিলে জীবনী সঞ্চরি'
সঞ্জীবনী হাস্যমন্ত্রে ; পাংশুমুখে ফুটি' উঠে হাসি,
উঠি' বসে শীর্ণ রোগী—গৃহে বাজে আনন্দের বাঁশী !
কিন্তু কবি, অসমাপ্ত রয়ে গেল সমারব্ধ কাজ—
'এমন চাঁদের আলো, মরি যদি'—তাই সত্য আজ !
[illegible] কবিবর, 'সুরধামে', 'মহাসিন্ধুপারে' ;
[illegible] সঙ্গীতি শান্তি দিক আজি সবাকারে।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

গৌড়ের পুরাকীর্ত্তি

"হিতং মনোহারীচ দুর্লভং বচঃ" মহাকবির এই শ্লোকার্দ্ধের যাথার্থ্য সর্ব্ববাদী-সম্মত হইলেও, স্থানে স্থানে ইহার ব্যভিচার লক্ষিত হইয়া থাকে। যে বিষয়ের আলোচনার জন্য আজ আমাদের এই সান্ধ্য-সম্মিলন, তাহা সেই ব্যতিক্রমের একতম উদাহরণস্থল। প্রাচীন গৌড়ের শেষ হিন্দুনরপতি লক্ষ্মণসেনের রাজ্য-চ্যুতি সম্বন্ধে আমরা এক লজ্জাস্কর ইতিহাসই জানি। যদিও তাহার ক্ষীণ প্রতিবাদ কেহ কেহ কখন কখন অস্ফুটস্বরে কদাচিৎ করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের মনোযোগ দিবার অবসর এতকাল হয় নাই, এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী শত সহস্র বৎসরের মহাগৌরবময় গৌড়ীয় ইতিহাসের সমুজ্জ্বল বৃত্তান্তসমূহ আমাদের নিকট অখ্যাত ও অজ্ঞাতই রহিয়া গিয়াছে। স্বদেশীয় ও বিদেশী সকলের নিকট হইতেই শুনিয়া আসিতেছি যে, আমাদের, অর্থাৎ ভারতবাসীর কোন ইতিহাস নাই, যদিও বা কিছু থাকে, তাহা জানিবার বা জানাইবার কোন আবশ্যকই নাই, কারণ তাহা খ্যাতি, প্রতিপত্তি বা গৌরবের ইতিহাস নহে। যে দেশেই লোকনিবাস ছিল বা আছে, তাহারই ভাল মন্দ যাহা হউক একটা ইতিহাস থাকিবার কথা, কারণ কর্ম্মহীন জীবন যাপন অসম্ভব। যাঁহারাই জগতে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন, হয় সেই ভাগ্যবান কর্ম্মী বা তাঁহাদের পার্শ্বচর বা অনুচর কেহ না কেহ সেই অনুষ্ঠিত কর্ম্মের অন্ততঃপক্ষে একটা রোজনামচা লিখিয়া গিয়াছেন; যেখানে তাহা নাই, বা পাওয়া যায় নাই, সেখানেই কৃতকর্ম্মের একটা পূর্ণ অপূর্ণ যাহা হয় একটা নিদর্শন মন্দিরে, মসজিদে, গির্জ্জায়, পান্থনিবাসে, অতিথিশালায়, শিলালিপিতে, জলাশয় বা নামাঙ্কিত মুদ্রায়, চেষ্টা করিলে পাওয়া যায় ও পাওয়া গিয়াছে। ভূপৃষ্ঠের সমগ্র মহাদেশ বা অন্তর্দ্দেশের সমস্ত জাতিরই কৃতকর্ম্মের যদি কোন কোন ইতিহাস থাকিয়া থাকে, তবে প্রখ্যাত প্রাচীন কর্ম্মভূমি আমাদের দুর্ভাগ্য ভারতবর্ষই একমাত্র দেশ, যাহার ইতিহাস নাই, একথা সহসা বিশ্বাস করিয়া উঠা একটু কঠিন হয়। যে দেশে বৈদিককালোচিত বেদ-বিহিত ক্রিয়া হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত অনেক কার্য্য ও [illegible] অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে, যে দেশে বহু ধর্ম্মের উত্থান-পতন ও সমন্বয় সম্পন্ন হইয়াছে, যে দেশের [illegible] নির্ব্বাণপ্রদ মহাধর্ম্ম ধরণীর প্রায় সমগ্র অধিবাসীকে [illegible] ছিল, যে দেশের ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার, [illegible]

অভিধান, পুরাণ, উপপুরাণ, উপনিষদ এবং ষড়দর্শন সম্ভব হইয়াছে ; যে দেশের রাজসূয় অনুষ্ঠানের অনুকরণ জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট কর্ত্তৃক আজ অনুষ্ঠিত হইতেছে, সে দেশ ইতিহাস-বর্জ্জিত বর্ব্বরের দেশ, একথা বিশ্বাস করিলেও পাপ হয়। "ন কেবলং যো মহতোপভাষতে শৃণোতি তস্মাদপি যঃ স পাপভাক" মহাকবির এই মহাবাক্য যেন আমরা কদাচ বিস্মৃত না হই। ইহা ত গেল সমগ্র ভারতবর্ষের কথা, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের শস্যশ্যামলা জন্মভূমি বঙ্গভূমির ইতিহাস কেবল লক্ষ্মণসেনের কলঙ্কেরই ইতিহাস মাত্র ; তৎপূর্ব্বে বা তৎপরে কিছুই ছিল না বা কিছুই হয় নাই, যদিও বা কিছু হইয়া থাকে, তাহা আমাদের লজ্জা ও কলঙ্কই ঘোষণা করে, ইহাই এতকাল শুনিয়া ও বিশ্বাস করিয়া আসিতেছি। ভুবনবিখ্যাত মোগল বাদশাহ আকবর শাহের রাজত্বকালের বিখ্যাত ঐতিহাসিক আবুলফজল বঙ্গদেশবাসীর যে বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে আমাদের উপর যদি কাহারও শ্রদ্ধা আকর্ষিত না হয়, তবে তাহাকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। "পরিসরবিহীন বস্ত্রখণ্ড আমরা পরিধান করি, ভাত খাই, নৌকায় চড়িয়া একস্থান হইতে অন্যস্থানে গমনাগমন করি, কারণ বঙ্গদেশ জলমগ্ন," এই গেল আবুলফজল লিখিত বঙ্গদেশ ও তদ্দেশবাসীর চূড়ান্ত ইতিহাস। বিধাতার ইচ্ছায় পরবর্ত্তী কালে যাঁহারা আমাদের দেশে আসিয়া ইতিহাস রচনা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাঁহারা পূর্ব্ববর্ত্তী মুসলমান ঐতিহাসিক রচিত পুস্তকাদিকেই মূল ধরিয়া, অনেক স্থলে তাহারই ভাষান্তরিত কেতাবকে ঐতিহাসিক কেতাব বলিয়া চালান করিয়া দিয়াছেন। এস্থলে প্রাচীন গৌড়ীর ইতিহাসের উজ্জ্বল মহিমা যে লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া যাইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি ?

দেড়শত বৎসরের সিরাজদ্দৌল্লা বা মীরকাশিমের ইতিহাসই যখন অন্ধকারাবৃত ছিল, তখন বহু শতাব্দীর গৌড়ের নাম আজও একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই, ইহাই বঙ্গবাসীর পরম সৌভাগ্যের কথা। মহানন্দা ও করতোয়া, মধ্যবর্ত্তী বরেন্দ্রভূমি একসময়ে প্রাচীন গৌড়ীয় মহাসাম্রাজ্যের অংশভূত থাকিয়া, অনেক কীর্ত্তিকলাপের লীলাভূমি হইয়াছিল, দুর্ভাগ্যক্রমে সে ইতিহাস আমরা এতদিন জানিতে পারি নাই। বিগত কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমার পরম স্নেহাস্পদ [illegible] [illegible] রাজকুমার শ্রীমান্ শরৎ কুমার রায়ের যত্নে "বরেন্দ্র [illegible]" নামক একটি সমিতি গঠিত হয়। এই সমিতির [illegible] অর্থব্যয়ে এবং অসীম পরিশ্রমে বরেন্দ্রভূমির নানাস্থান হইতে

গৌড়ীয় প্রাচীন শিল্পকলার ভগ্নাবশেষ, তাম্রশাসন, শিলালিপি প্রভৃতি যাহা পাওয়া গিয়াছে, এবং যে সমস্ত হস্ত-লিখিত প্রাচীন পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছে, সে সমুদয় গৌরবান্বিত প্রাচীন গৌড় সাম্রাজ্যের ও বরেন্দ্রভূমির বিনষ্টপ্রায় ইতিহাসের পুনরুদ্ধারকল্পে অমূল্য উপাদান। যাঁহারা বঙ্গের ধারাবাহিক ইতিহাস রচনার জন্য প্রভূত যত্ন ও চেষ্টায় এই সমস্ত উপকরণগুলি সংগ্রহ করিয়া রক্ষার প্রয়াস পাইতেছেন, তাঁহারা বঙ্গবাসীমাত্রেরই কি উপকারী বন্ধু, তাহা কথায় বলিয়া শেষ করা যায় না। এই চেষ্টার ফলে যখন গৌড়ের ও গৌড়বাসীর একটি সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত প্রস্তুত হইয়া বঙ্গবাসীর মনে জাতীয় গৌরব-স্মৃতি জাগাইয়া তুলিবে এবং তাহার ফলে আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান হইয়া কাম্যবস্তুর আকাঙ্খায় যখন আমরা অগ্রসর হইব, তখন বুঝিব "বরেন্দ্র Research Society" আমাদিগের জাতীয় জীবন গঠনকল্পে অযাচিত ভাবে কি পরম সাহায্য প্রদান করিয়া গিয়াছেন। আমি স্বাস্থ্যানুসন্ধানে ভারতভূমির নানাস্থান পর্য্যটন করিয়াছি, অজন্তা ও ইলোরা, খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি, সাঁচি ও সারনাথ প্রভৃতি ভারতের প্রাচীন প্রস্তর-কীর্ত্তির মহাশ্মশানগুলি একে একে সবই পরিভ্রমণ করিয়া দেখিয়াছি, কিন্তু বরেন্দ্রের প্রাচীন শিল্পকলা কাহারও অপেক্ষা হীন, ইহা আমি কোনক্রমেই কল্পনায় আনিতে পারি নাই। যে সমস্ত নিদর্শনগুলি সংগ্রহ করা গিয়াছে, তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় এখানে দেওয়া অসম্ভব, এবং উহাদের সাহায্যে প্রাচীন ইতিহাসের পথ কতদূর পরিষ্কার হইয়াছে, তাহাও পূর্ণভাবে জ্ঞাপন করা সাধ্যায়ত্ত হইবে না; যাহা হউক, তাহারও কিঞ্চিৎ আভাস দিবার জন্য শ্রীমান্ শরৎকুমার ও শ্রদ্ধাভাজন রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত আছেন। আশা করি তাঁহারা আপনাদের চিত্তবিনোদনে কৃতকার্য্য হইবেন, সেই জন্য প্রথমেই বলিয়া লইয়াছি "হিতং মনোহারীচ দুর্লভং বচঃ" এই মহাবাক্যের ব্যভিচার কখন কখন হইতেও পারে।

শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়

বর্ষা-সঙ্গীত

এসেছে বরষা ভুবন-পাবন রাণী
মহা উৎসবে জাগায়ে নিখিল খানি!

---

* দার্জিলিংএ বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির বিশেষ এক অধিবেশনে নাটোরাধিপতি মহারাজা কর্ত্তৃক পঠিত।

দিকে দিকে বাজে জয়মঙ্গল গাথা
মেঘমল্লার বাণী ;
তরু পল্লব অবনত করি' মাথা
জাগে যোড় করি' পাণি !
গরজে কম্বু বজ্রনিনাদে
ধরা ফুলবাসমাখা ;
তড়িৎ ত্বরিতে দীপারতি করে,
পবন দুলায় পাখা।

হেমভৃঙ্গার ভরিয়া
শান্তিসলিল হরিয়া
মেঘস্যান্দনে চড়িয়া
এনেছে ভরসা বাণী,
এসেছে আজিকে বরষা
ভুবন-পাবন রাণী।

ভরা তড়াগের মঙ্গল ঘট পাতা
ফলধরা নব শাখা দোলে চূত-গাঁথা ;
আলিপনা দিয়ে তটিনীরা মহী ফিরে,
উপলে নূপুর বাজে ;
গৈরিকরাঙা বসনে তনুটি ঘিরে'
রূপতরঙ্গ রাজে ;
আছে মেঘ সদা ছত্র ধরিয়া
না লাগে রৌদ্র মুখে,
ফিরোজা রঙের অঞ্চল লুটে
তৃণ-শাদ্বলবুকে।

মাঠে মাঠে সোণা ফলা'তে
ঘরে হাসি-দীপ জ্বলা'তে
সব দুখব্যথা গলা'তে
নিয়োজিয়া নিজ পাণি—
এসেছে আজিকে বরষা
ভুবন-পাবন রাণী।

[illegible] নজল আলো করি'
[illegible] উন্মুখ মহী ভরি,
[illegible] কোমল বাহু-উপাধান রচি'
তড়াগ দাঁড়ায়ে আছে ;

হরিচন্দন নবীন উশীর-রুচি
আসা-পথে পাতিয়াছে !
আর্ত্ত চাতক কাঙ্গালির দল
সারাপথ খানি জুড়ি'
সকরুণ নাদে ভিক্ষা মাগিছে
চারিদিকে উড়ি-উড়ি ।
দীঘিভরা জল-পত্র,
ক্ষেতেতে অন্নসত্র,
নাই ভেদ জাতি-গোত্র—
আয় আয় সব প্রাণী—
এসেছে আজিকে বরষা
ভুবন-পাবন রাণী ।

গিয়াছে মরাল কণ্ঠেতে কলগান
বিমান হইতে বহা'তে মেঘের দান
যূথিকা-মুকুলে বকুলে দুকূল খচে'
দাঁড়াইয়া বনবালা,
আলোকে ছন্দে গীতে ও গন্ধে রচে
প্রকৃতি অর্ঘ্যডালা ।
তিমির-তমাল-কুঞ্জ-ভবনে
দাদুরী ডাকিয়া সারা ;
রঞ্জন-চারু পুচ্ছ মেলিয়া
ময়ূর পাগল পারা !
ফুটেছে নয়ন ভঙ্গে
কুসুম শিলার অঙ্গে
লক্ষ্মী—বরষা সঙ্গে
দেখ্‌রে ধন্য মানি'—
এসেছে আজিকে বরষা
ভুবন-পাবন রাণী ।

কেলিকদম্ব পুলকাঞ্চনে শিহরে
মদালস মৃগ মৃগী সনে বনে বিহরে
ইন্দ্রধনুর রঙ্গীন তোরণ দ্ব
দিক্‌বালা করে খে
বিলাস নৃত্যে হরিছে চি
মিলায়ে বর্ণ-মেলা ।

কুন্দ কেতকী মালতী শিরীষ
ভরিছে শুভ্র সাজি ;
ইঙ্গুদী জ্বালে পূজাদীপ, গাঁথে
গুঞ্জা মাল্য-রাজি।

লক্ষ্মী এ যে গো বরষা—
ধরণী করিতে সরসা
এসেছে জীবন ভরসা
শস্য ফলান' বাণী—
এসেছে আজিকে বরষা
ভুবন-পাবন রাণী।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

শেষকথা।

সম্পাদক মহাশয়, আপনার জ্যৈষ্ঠ মাসের "মানসী"তে আমার লিখিত "প্রতিবাদ" এবং পাচাকড়ি বাবুর লিখিত প্রতিবাদের "প্রতিবাদ" পাঠ করিলাম। পাঁচকড়ি বাবুর লেখাটি পড়িয়া হাসিও আসিল, দুঃখও হইল। হাসির কারণ এই যে, পাঁচকড়িবাবু এবারও অদ্ভুত কাব্যদৃষ্টান্ত দ্বারা আসল বিষয়টি ঢাকা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আর দুঃখের কারণ এই যে, প্রথমতঃ তিনি রাগিয়া আত্মহারা হইয়াছেন, এবং রাগের মাথায় লেখনীতে যাহা আসিয়াছে তাহাই লিখিয়া গিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি এবারও কয়েকটী অমূলক কথার উল্লেখ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য আমি পাঁচকড়িবাবুর সহিত বিবাদ করিতে ইচ্ছুক নহি। তিনি একটু স্থির ও ধীর ভাবে সকল কথা স্মরণ করিলে ও সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলেই এবং কল্পনা ও আত্মশ্লাঘার মাত্রা একটু কমাইলে, তর্কবুদ্ধির কোনও সম্ভাবনা থাকিবে না। এই জন্য আমি তাঁহাকে একটু স্থির ও ধীর হইতে বলি। তাঁহার সহিত আমার কথনও অসদ্ভাব ছিল না, এবং এখনও নাই। তিনি মূল প্রবন্ধে কয়েকটি অমূলক কথার অবতারণা না করিলে আমি এই আলোচনায় আদৌ [illegible] হইতাম না। "প্রতিবাদের প্রতিবাদে" তিনি আবার কয়েকটী অমূলক কথা বলায় আমাকে পুনর্ব্বার লেখনী ধারণ করিতে হইয়াছে। আপনি [illegible] যে, [illegible] সম্বন্ধে আর কোনও প্রতিবাদ প্রকাশিত [illegible] আমার প্রতি অবিচার করা হইবে। "প্রতি- [illegible] কয়েকটি কথা বলিয়াছেন, যৎসম্বন্ধে আমার

বক্তব্য না শুনিলে, আপনার পাঠকবর্গের মনে হয়ত একটী ভ্রান্তধারণ থাকিয়া যাইবে। আপনি আমার বক্তব্যগুলি পাঠ করিয়া যদি তৎসমুদায় প্রকাশিত করা উচিত মনে করেন, তাহা হইলে প্রকাশিত করিয়া আমাকে বাধিত করিবেন। আর যদি অনুচিত মনে করেন, তাহা হইলে এই লেখাটি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে ফেরৎ পাঠাইবেন। আমি যেরূপে হউক আমার বক্তব্য প্রকাশিত করিব।

পাঁচকড়িবাবুর এবারকার নূতম কথাগুলি এইঃ—

(ক) তিনি ১৮৮৭ খৃঃ অব্দে বি, এ, পাশ করিয়া কলিকাতায় আসিলে ৺ভূধর চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীতে প্রায়ই তাঁহার সহিত আমার দেখা হইত। সেই সময়ে "সীতার পাণ্ডুলিপি আমি তাঁহাকে দেখাইয়াছিলাম এবং তাহাতে তাহার কলমও ছিল। এমন কি, যাহারা তাঁহার ভাষার সহিত পরিচিত— যথা আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়, নিখিলবাবু, সুরেশবাবু—তাঁহারা মন দিয়া "সীতা" পড়িলে, তাঁহার লেখা বাছিয়া বাহির করিতে পারিবেন, আর তিনি জোর করিয়া বলিতে পারিবেন যে, তাহা তাঁহার লেখা।

(খ) তিনি কিম্বা ভূধরবাবু ৺কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ৺নরেন্দ্রনাথ সেনের সহিত আমার পরিচয় করিয়া দিয়াছিলেন।

(গ) প্রবাসীর দল" অর্থাৎ ব্রাহ্মের দল "সীতা"র ভাল সমালোচনা করেন নাই বা করিবেন না বলিয়া ভূধরবাবু এবং পাঁচকড়িবাবু "বঙ্গবাসী"তে ও "বেদব্যাসে" "সীতা"র প্রশংসা সূচক সমালোচনা করিয়াছিলেন।

(ঘ) বাঁকিপুরের খড়্গবিলাস প্রেসের কর্ত্তা রামদীন সিংহের সহিত আমার পরিচয় থাকা, রামচরিত নামধেয় একটী হিন্দী কেতাবের সহিত পরিচয় থাকা এবং পণ্ডিত অম্বিকাদত্ত ব্যাস মহাশয়ের সীতাচরিত্রের উপর বক্তৃতা শ্রবণ করা ইত্যাদি।

(ঙ) কলিকাতায় থাকাকালে "সীতা"র ভাল সমালোচনার জন্য পাঁচকড়িবাবুর নিকট আমার হাঁটাহাটি, ছুটাছুটি, অনুরোধ উপরোধ ইত্যাদি। এ ছাড়া আরও অনেক নূতন কথা আছে, [illegible] উল্লেখ করিলাম না।

এক্ষণে উক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য [illegible]—

(চ) পাঁচকড়িবাবু ১৮৮৭ খৃঃ অব্দে কলি[illegible]
আমি পাটনা কলেজেই পড়িতেছিলাম। ১৮৮[illegible] খৃ[illegible]

জুলাই মাসে আমি কলিকাতায় আসি। আসিয়া এম্, এ পড়িতে প্রবৃত্ত হই। তখন আমি বাঙ্গালা সাহিত্যের বড় একটা চর্চ্চা করিতাম না। দুই একটী মাসিক পত্রে কখনও কখনও দুই একটী প্রবন্ধ বা কবিতা লিখিতাম। কিন্তু ইংরাজী সংবাদপত্রে প্রায়ই প্রবন্ধ লিখিতাম। ১৮৮৯ খৃঃ অব্দের নভেম্বর মাসে এম্, এ পরীক্ষা দিই। ১৮৯০ খৃঃ অব্দে বি, এল ক্লাসের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িবার সময় "সীতা" লিখিবার সঙ্কল্প হয় এবং দুই মাসের মধ্যে তাহা লিখিয়া ফেলি। সুতরাং ১৮৮৭ খৃঃ অব্দের পর হইতেই ভূধরবাবুর বাটীতে পাঁচকড়িবাবুর সহিত আমার সাক্ষাৎ হওয়ার কথা একেবারেই অলীক। "সীতা" মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবার পর তাঁহাদের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সে কথা পরে বলিতেছি।

প্রসিদ্ধ বক্তা ও লেখক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় আমাকে বাঙ্গলাভাষায় "সীতা" লিখিতে উৎসাহিত করেন। তাঁহার সহিত সীতাচরিত্র সম্বন্ধে প্রায়ই আলোচনা করিতাম। তাঁহার কথায় আমি "সীতা" লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া "সীতা"র প্রথম দুই অধ্যায় তাঁহাকে দেখাই। তিনি তাহা পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট হন এবং আমাকে যথোচিত উৎসাহ প্রদান করেন। আমি কতিপয় অধ্যায় লিখিয়াই প্রেসে "কাপি" দিয়াছিলাম এবং নূতন অধ্যায়গুলি যেমন যেমন রচিত হইত, পাণ্ডুলিপি হইতে নকল করিয়া প্রেসের জন্য তেমনই তেমনই "কাপি" প্রস্তুত করিয়া দিতাম। "সীতা" যখন মুদ্রিত হয়, তখন রামানন্দবাবু ও আমি এক মেসেই থাকিতাম। তিনি আমার এই উক্তির সমর্থন করিবেন।

"সীতা"র পাণ্ডুলিপি এক দেবেন্দ্রবাবু ব্যতীত আর কাহাকেও আমি দেখাই নাই। রামানন্দবাবুকে মাঝে মাঝে কোনও কোনও অংশ পড়িয়া শুনাইতাম। পাঁচকড়িবাবু লিখিয়াছেন, "সীতার পাণ্ডুলিপিতে তাঁহার কলম ছিল। এই কথা পাঠ করিয়া না হাসিয়া থামিতে পারিলাম না। পাণ্ডুলিপিতে তাঁহার কলম থাকিলে আমি সর্ব্বাগ্রে তাহা স্বীকার করিতাম। তাহাতে আমার কোনও লজ্জা বা অভিমান ছিল না, এবং এখনও নাই। একমাত্র সত্যের অনুরোধে বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি যে, "সীতা"র পাণ্ডুলিপি [illegible] এবং তাহাতে তাঁহার কলমের আঁচড়টি পর্য্যন্ত নাই [illegible] সকলের বিশ্বাস্য না হইতে পারে। কিন্তু [illegible] পাণ্ডুলিপি এখনও সুরক্ষিত আছে। পাঁচকড়িবাবু

যদি বলেন, আমি আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের কাছে তাহা শীল-মোহর করিয়া পাঠয়া দিতে প্রস্তুত আছি। অক্ষয়বাবু, সুরেশ বাবু, নিখিল বাবু এবং স্বয়ং পাঁচকড়িবাবু "সীতা" পড়িয়া তাঁহার লেখা বাছিয়া বাহির করুন; তার পর শীলমোহর ভাঙ্গিয়া পাণ্ডুলিপিতে সেই স্থলে বা অন্য কোথাও তাঁহার কলমের আঁচড় আছে কিনা, তাহাও অনুসন্ধান করিয়া দেখুন; তাহা হইলেই, কাহার কথা ঠিক, তাহা জানা যাইবে। বাস্তবিক, পাঁচকড়িবাবুর এই অদ্ভুত কল্পনা ও উৎকট আত্মশ্লাঘা দেখিয়া আমি বিস্ময়ে অবাক্ হইয়াছি। তিনি আমার ক্ষুদ্র অহঙ্কারের উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার অহং বা আমিত্বের এতদূর প্রসার হইয়াছে যে, তিনি সকল লেখককে আপনার মধ্যে এবং আপনাকে সকল লেখকে মধ্যে দেখিতে পাইতেছেন! তিনি দলাদলির মধ্যে পড়িয়া এবং আত্মশ্লাঘা ও জেদের বশবর্ত্তী হইয়া যে এতদূর আত্মবিস্মৃত হইতে পারেন এবং এরূপ জুগুপ্সিত পথ অবলম্বন করিতে পারেন, ইহা আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

"সীতা" মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবার অনেক দিন পরে একদা সহসা কলেজষ্ট্রীটের ফুটপাথের উপর পাঁচকড়িবাবুর সহিত আমার দেখা হয়। সম্ভাষণ অভিবাদনাদির পর আমি কি করিতেছি, তাহা তিনি জিজ্ঞাসা করিলে আমি তাঁহাকে বলি যে আমি "সীতা" নামক একখানি পুস্তক লিখিয়াছি, তাহা তাঁহাকে উপহার দিতে ইচ্ছা করি, এবং তাহা পাঠ করিয়া তিনি যদি সন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে তিনি যেন সংবাদ পত্রে তাহার সমালোচনা করেন। পাঁচকড়িবাবুর নাম সাহিত্যজগতে তখন তেমন ফুটিয়া না উঠিলেও তিনি যে সংবাদপত্রে ও মাসিকপত্রে প্রবন্ধ লিখিতেন, তাহা আমি জানিতাম। "সীতা" প্রকাশের অনেকদিন পরে অর্থাৎ ১৮৯১ খৃঃ অব্দে সম্মতি আইনে আন্দোলন হয়, তাহা পাঁচকড়িবাবু অনুসন্ধান করিলেই জানিতে পারিবেন। পাঁচকড়িবাবু আমাকে ভাগলপুরের ঠিকানা বলিয়া দিলে, আমি সেই ঠিকানায় তাঁহাকে একখণ্ড "সীতা" পাঠাই এবং Indian Messenger প্রভৃতিতে যে সমালোচনা হইয়াছিল তাহারও উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে পত্র লিখি ইহা তিন [illegible] ছিলেন। "বঙ্গবাসী"তে সমালোচনার জন্য পুস্তক পাঠাইলেও [illegible] কোনও সমালোচনা বাহির হয় নাই। [illegible] সমালোচনা

বাহির হয় তজ্জন্য আমি পাঁচকড়িবাবুকে, এবং দেবেন্দ্রবাবুর দ্বারা পরিচিত হইয়া ভূধরবাবুকেও বলিয়াছিলাম। এই উপলক্ষে আমি ভূধরবাবুর বাটীতে একবার কি দুইবার গিয়াছিলাম। এতদ্ব্যতীত আর কখনও আমি সেখানে যাই নাই। "বঙ্গবাসী"তে প্রথমে যে সমালোচনা বহির হয় তাহাতে "সীতা"র তেমন বিশেষ প্রশংসা ছিল না। অনেকদিন পরে "পলাশবনে"র সমালেচনার সঙ্গে সঙ্গে "সীতা"রও যথেষ্ট প্রশংসা বাহির হইয়াছিল। "বেদব্যাসে" পাঁচকড়িবাবু যে সমালোচনা করিয়াছিলেন তাহা আমি আজ পর্য্যন্ত দেখি নাই। কিন্তু তিনি সমালোচনা করিয়া থাকিলে আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

(খ) "বঙ্গবাসী"র সম্পাদক ৺ কৃষ্ণবাবুর সহিত আমি কখনও পরিচিত হই নাই। পাঁচকড়িবাবু বা ভূধরবাবু কেহই আমাকে ৺ নরেন্দ্রবাবুর সহিত পরিচিত করিয়া দেন নাই। ১৮৯৪ খৃঃ অব্দে দেবেন্দ্র বাবু আমাকে তাঁহার সহিত প্রথম পরিচিত করিয়া দেন। সেই অবধি "মিরারের" সহিত আমার সম্বন্ধ হয়।

(গ) "প্রবাসীর দল" বলিলে যদি ব্রাহ্মদল বুঝায়, তাহা হইলে ব্রাহ্মদল "সীতা"র প্রশংসা করিয়াছিলেন। "সীতার" সহিত তাহার যে সমালোচনা মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলেই দেখিতে পাইবেন যে "সঞ্জীবনী", "ইণ্ডিয়ান্ মেসেঞ্জার" "নব্যভারত" "ইউনিটি ও মিনিষ্টার" এবং "ভারতী"তে "সীতার" বিলক্ষণ প্রশংসা বাহির হইয়াছিল। সুতরাং ব্রাহ্মদলের নিকট "সীতার" সমাদর হয় নাই বলিয়া পাঁচকড়িবাবু যে উক্তি করিয়াছেন, তাহার মূলে কোনও সত্য নাই। এই সকল সংবাদপত্র ও মাসিক পত্রের কোনও সম্পাদকের নিকট আমাকে হাঁটাহাঁটি বা ছুটাছুটী করিতে হয় নাই। কেবল "বঙ্গবাসী"তে বহুদিন পর্য্যন্ত কোনও সমালোচনা না হওয়ায় আমি পাঁচকড়িবাবু ও ভূধরবাবুকে অনুরোধ করিয়াছিলাম।

(ঘ) বাকীপুরের খড়্গবিলাস প্রেসে কখনও যাই নাই, অথবা প্রেসের সত্বাধিকারী বা কর্ত্তা রামদীন সিংহের সহিত কখনও পরিচিত হই নাই। রামচরিত নামে [illegible] হিন্দী [illegible] কখনও দেখি নাই। পণ্ডিত অম্বিকা দত্ত ব্যাসের [illegible] শুনিয়াছি বটে; কিন্তু "সীতাচরিত্র" সম্বন্ধে তাঁহার [illegible] শুনিয়াছি কি না স্মরণ হয় না। হিন্দী বক্তৃতা অনেক সময় [illegible] পারিতাম না। আমি "বেদব্যাসের" গ্রাহক ছিলাম

না। কখনও কখনও তাহা চক্ষে পড়িলে পাঠ করিতাম। ৺নীলকণ্ঠবাবুর রামায়ণসম্বন্ধীয় প্রবন্ধাবলী আমি দেখি নাই। ন্যাশ্‌নাল স্কুল কোথায় ছিল, তাহা জানি না। এই সমস্ত ইঙ্গিতের অর্থ দুর্ব্বোধ্য।

(৬) "সীতা" প্রকাশিত হইলে পাঁচকড়িবাবুকে ভাগলপুরে পত্রলেখা এবং ভূধরবাবুর বাটীতে একবার কি দুইবার যাওয়া ব্যতীত, আর কোথাও হাঁটাহাঁটি, ছুটাছুটি করি নাই বা কাহাকেও অনুরোধ উপরোধ করে নাই। পাঁচকড়িবাবু লিখিয়াছেন, তিনি "সীতা"র জন্য "ফড়িয়াগিরি" করিয়াছিলেন। তজ্জন্য আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ।

"প্রবাসী"তে "কুমারী" কেন সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয় নাই, তাহার কৈফিয়ৎ উক্ত পত্রেই প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার পর হইতে রামানন্দবাবুর সহিত কোনও মনোমালিন্য নাই। তিনি আমার বাল্যবন্ধু। বাল্যকালের বন্ধুত্ব সামান্য কারণে নষ্ট হয় না এবং হইতে পারে না।

আর বেশী লিখিয়া কাগজ বাড়াইব না। নামের শেষে উপাধিটি কেন যোগ করিয়াছিলাম, তাহা পাঁচকড়িবাবুকে বলি। এখানে "অবিনাশ-চন্দ্র দাস" আরও আছেন। পল্লীগ্রামে একনামের একাধিক ব্যক্তি থাকিলে, চিঠিপত্র বিলি করিবার সময় পিয়নমহাশয় বড়ই গোলমাল করিয়া থাকেন। শিরোনামে নামের শেষে উপাধিটিও সংযুক্ত করিয়া দিলে আর গোল হয় না। এই কারণে, "মানসীর" সম্পাদকমহাশয়কে নাম ও ঠিকানা দিবার সময় উপাধিও লাগাইয়া দিয়াছিলাম। ইহাতে যদি দোষ হইয়া থাকে তো হউক।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস।

শেষ কথার শেষ।

আমি জানিতাম না, অবিনাশচন্দ্র এমন কোন্দল প্যাকাইতে পারেন। তিনি গত জ্যৈষ্ঠের "মানসীর" ৩৫ পৃষ্ঠায় ছাপাইয়াছেন—

---

* প্রবন্ধটি গত মাসেই হস্তগত হইয়াছিল, কিন্তু স্থা[illegible] প্রকা[illegible] [illegible] পূর্ব্বে আমরা লিখিয়াছিলাম যে আমরা এই বাদ-প্রতিবাদ সং[illegible] আর [illegible] ইচ্ছুক নহি; কিন্তু বিশেষ কারণ বশতঃ "শেষকথা" ছা[illegible] শেষ করিব বলিয়া পাঁচকড়িবাবুকেও আমরা জানাইয়াছি[illegible] [illegible] প্রকাশিত হইল। অতঃপর এবিষয়ে আর কোনও [illegible] হইবে না। মাঃ সঃ

"পাঁচকড়িবাবু বি, এ, পাশ করিয়া কোথায় যান ও কি করেন, তাহা আমার স্মরণ নাই। বহুদিন পরে কলিকাতায় তাহার সহিত সাক্ষাৎ হয়। সম্ভবতঃ তখন তিনি কলিকাতায় কোনও সাপ্তাহিক বাঙ্গালা সংবাদপত্রের সম্পাদকতা করিতেছিলেন।"

এখন এই পত্রের একস্থানে তিনি লিখিয়াছেন "সীতা" মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবার পর তাঁহাদের (ভূধর ও পাঁচকড়ির) সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল।"

অন্যত্র লিখিয়াছেন—

"সীতা" মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবার অনেকদিন পরে একদা সহসা কলেজষ্ট্রীটের ফুটপাথের উপর পাঁচকড়িবাবুর সহিত আমার দেখা হয়।"

"পাঁচকড়িবাবু আমাকে ভাগলপুরের ঠিকানা বলিয়া দিলে আমি সেই ঠিকানায় তাঁহার একখণ্ড সীতা" পাঠাই।"

এখন জিজ্ঞাসা করি অবিনাশচন্দ্রের কোন কথাটা সত্য? গোড়ার কথা না এই চিঠির দুইটা কথা? আমি ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গবাসীর সম্পাদক হই; তাহার পূর্ব্বে কোন সাপ্তাহিক সমাচার পত্রের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ ছিল না। কাজেই বলিতে হয় অবিনাশ চন্দ্রের প্রথম পত্রের কথাটা সত্য হইলে পরের দুইটি কথাই সত্য হয় না। এখন পাঠকগণ বলুন, অবিনাশচন্দ্রের কোন কথাটা কল্পনামূলক, কোন্‌টা বা খাটি সত্য?

"সে পাণ্ডুলিপিতে আমারও কলম ছিল" এ কথা বলায় আমি এমন বুঝাই নাই যে, যে পাণ্ডুলিপি অবিনাশচন্দ্র বাহির করিবেন তাহাতে আমার লেখা আছে বা ছিল। হয়ত তিনি আমাকে "সীতার" অংশবিশেষ পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন আমি রদবদল করিতে বলিয়াছিলাম, অথবা প্রুফে কিছু-কিছু যোগ করিয়া দিয়া থাকিতে পারি। "সীতার স্থানে" স্থানে যে আমার ভাষার টুক্‌রা একটু আধটু ছিল বা আছে, তাহা আমি এখনও বলিব। অবিনাশচন্দ্র যে পাণ্ডুলিপি এখন বাহির করিতে চাহেন, তাহা যে আদি ও আসল পাণ্ডুলিপি তাহা বুঝিব কেমন করিয়া? আমার লিখিবার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, যাঁহারা আমার লিখনপদ্ধতির সহিত সুপরিচিত, তাঁহারা 'সীতা' খানা আগাগোড়া পড়িলে আমা[illegible] লেখার ছাঁদ উহার অনেক স্থানে দেখিতে পাইবেন। এ কথাটা আমি এখং [illegible] করি[illegible] [illegible]তেছি।

[illegible] বাবু [illegible] [illegible] মানসীতে যে প্রতিবাদপত্র ছাপান, তাহার ভাষা ও [illegible]র বক্তব্য [illegible] হইতে অনেক তফাৎ। গোড়ায় তিনি আমাকে একেবারে

মুছিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবার একটু স্বীকার করিয়াছেন। আমার পক্ষে ইহাই পরম লাভ। আমি "প্রতিবাদের প্রতিবাদ" শীর্ষক প্রবন্ধে যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহার কোন কথারই উত্তর অবিনাশচন্দ্র দেন নাই; বোধহয় জ্বালায় অধীর হইয়া তিনি আমার লেখাটা বেশ তলাইয়া পড়িবার ও বুঝিবার অবসর পান নাই। তিনি না বলিলে আমিত তাঁহাকে জোর করিয়া হাঁ বলাইতে পারি না; তবে তিনি কৃপা করিয়া যতটুকু হাঁ বলেন ততটুকুই আমার লাভ। যাঁহারা এই বিবাদটা রসাইয়া-মজাইয়া বুঝিতে চাহেন তাঁহারা দয়া করিয়া জ্যৈষ্ঠের সংখ্যায় আমার লিখিত "প্রতিবাদের প্রতিবাদ" প্রবন্ধটা ভাল করিয়া পড়িয়া দেখুন; ইহাই আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ।

এই অনুরোধের একটু হেতু আছে। আমি যাহা বলি নাই, অবিনাশচন্দ্র আমার মুখে তাহাই গুঁজিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার পর "আকাশে পাতিয়া ফাঁদ দিতে পারি হাতে চাঁদ"—এই কথার স্বার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন। আমার কথা এই—"১৮৮৭ খৃঃ অব্দ হইতে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আমি কলিকাতায় আসিতাম-যাইতাম, সাহিত্য চর্চ্চা করিতাম—ইত্যাদি।" সাক্ষী শ্রীযুত নিখিলনাথ রায়, শ্রীযুত শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুত রামদয়াল মজুমদার, শ্রীযুত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত প্রভৃতি। শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে যে আমি চিনিনা, এমন কথা বলিতে পারি না। একবার তাহার সহিত মোকাবেলা করাইয়া দিতে পার? তাহা হইলে অনেক পুরাতন ধূলা ঝাড়িয়া নূতন কথা বাহির হইতে পারে। অবিনাশচন্দ্র নিজেই বলিতেছেন যে, যে পাণ্ডুলিপি তিনি বাহির করিতে চাহেন, তাহা হইতে তিনি কাপি প্রস্তুত করিয়া ছাপাখানায় দিতেন। হরি হরি! তাহা হইলে তাঁহার খস্ড়ায় আমার কলমের আঁচড় থাকিবে কেমন করিয়া? "প্রুফ" বাহির করিতে পারেন?

এই ব্যাপার লইয়া আমি আর বিতণ্ডা বাড়াইতে চাহি না। অতঃপর এ বিষয়ে আমি নীরব রহিলাম। মনের অগোচরও পাপ নাই—অবিনাশচন্দ্র বেশ বুঝিতেছেন কিসে কি হইল। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি অবিনাশ বা জলধর লইয়া আমি মাথা ঘামাইতে প্রস্তুত নহি; দৃষ্টান্ত হিসাবে উহাদের কথা তুলিয়া দেখাইয়াছিলাম। আমার আসল যাহা অবিনাশচন্দ্রের আসল তাহা নহে। ফলে কেবল লেখালেখি করিলে ই[illegible] [illegible] [illegible] তবে অবিনাশচন্দ্রের প্রথম ও দ্বিতীয় প্র[illegible] [illegible] [illegible] সেই সঙ্গে আমার প্রতিবাদের প্রতিব[illegible] [illegible] বেশি রগড়াইলে এ মজা থাকিবে না। তাই [illegible] [illegible]।

রত্নদীপ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অভাগিনী।

এক সপ্তাহ অতীত হইয়াছে।

অপরাহ্নে, অন্তঃপুরলগ্ন উদ্যানে একটি বকুলগাছের ছায়ায় মর্ম্মরবেদিকার উপর পূর্ব্বকথিত স্ত্রীলোকটি উপবিষ্ট রহিয়াছে। এ কয়দিন জ্বরভোগের পর আজ সে একটু সুস্থকায়—তাই বউরাণী তাহাকে বাগানে বায়ুসেবনার্থ পাঠাইয়াছেন।

স্ত্রীলোকটির বয়স অনুমান বিংশতি বর্ষ। তাহার বিশীর্ণ পাণ্ডুর মুখখানিতে বিষাদের ঘনছায়া পরিব্যাপ্ত; চক্ষু দুইটি সর্ব্বদা আনত ও সজল। দেখিলে মনে হয় বুঝি অনেক কষ্টে রোদন সম্বরণ করিয়া রহিয়াছে। পরিধানে শাদা সেমিজের উপর একখানি লালপাড় শাড়ী। ইহা বউরাণী দিয়াছেন প্রকোষ্ঠযুগলে স্বর্ণবলয়—বামহস্তে সধবার চিত্রও বর্ত্তমান। এগুলি পূর্ব্ব হইতেই ছিল।

ঝুরু ঝুরু করিয়া বাতাসে দুই চারিটি করিয়া বকুলের ফুল ঝরিয়া এই যুবতীর গাত্রে, চারিপাশে পতিত হইতেছে। সে মাঝে মাঝে একটি ফুল তুলিয়া লইতেছে—আবার, ভাবিতে ভাবিতে অন্যমনে তাহা ভূতলে নিক্ষেপ করিতেছে।

বসিয়া বসিয়া, যুবতী কিয়ৎক্ষণ পরে সেই বেদিকার উপর শয়ন করিল। কিয়ৎপরে আবার উঠিয়া বসিয়া, করতলে কপোলরক্ষা করিয়া চিন্তা করিতে লাগিল। মাঝে মাঝে বক্ষ কাঁপাইয়া একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িতে লাগিল। আহা, এ রমণী বড় দুঃখিনী।

অন্তঃপুর হইতে একজন দাসী বাহির হইয়া আসিল। তাহার বাম কক্ষতলে একখানি শতরঞ্চ ও একটি বালিস, দক্ষিন হস্তে কাঁসার গেলাসে ভরা কতকটা গরম দুধ। কাছে আসিয়া বিছানা নামাইয়া রাখিয়া দাসী বলিল—"দুধ খাও।"

রমণী বলিল—"এখন দুধ কেন ঝি।"

"[illegible] বলেন অনেক কুইনান খেয়েছে, একটু বেশী [illegible] তুমি দুধটুকু ততক্ষণ খাও, আমি বিছানাটা [illegible] দিই।"

রমণী ঝির হাত হইতে দুধের গেলাস লইয়া বলিল—"আহা কেন আবার কষ্ট করে বিছানা আনতে গেলে? আমি এই শানের উপরেই শুতাম এখন—খাসা ঠাণ্ডা।"

"বউরাণী বল্লেন যে, বসে থাকতে বোধ হয় কষ্ট হচ্ছে, একটা বিছানা টিছানা পেতে দিয়ে এস—আমি একটু পরেই আসছি।"

দুগ্ধ পান করিতে করিতে রমণী বলিল—"তোমাদের বউরাণী মানুষ নন ঝি—উনি দেবতা।"

ঝি তখন এদিক ওদিক চাহিয়া চুপে চুপে জিজ্ঞাসা করিল—"দিদি-ঠাকুরুণ তোমাদের বাড়ী কোথা গো?"

এই কথাটি জিজ্ঞাসা করিয়া ঝি তাহার কর্ত্রীর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিল। সে দিন গঙ্গাতীর হইতে উঠাইয়া আনিবার পর, ডাক্তার অনেক কষ্টে এই রমণীর চেতনা সম্পাদন করিয়াছিলেন; কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই সে প্রবল জ্বরে অভিভূত হইয়া পড়ে। জ্বরের কিঞ্চিৎ উপশম হইলে পরদিন বউরাণী তাহার নাম কি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। দুই তিন বার জিজ্ঞাসা করার পর, যেন অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, রমণী বলিয়াছিল—"আমার নাম সুরবালা।" কি জাতি জিজ্ঞাসা করায় অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া রমণী বলিয়াছিল—"আমরা কায়স্থ।"—বাপের বাড়ী কোথা, শ্বশুরালয় কোথা, এ সব পরিচয় জিজ্ঞাসায় রমণী কাঁদিতে আরম্ভ করে—কোনও উত্তর দেয় নাই। তৎপর দিন বউরাণীর অনুপস্থিতিতে তাঁহার শ্বশ্রূঠাকুরাণীও পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় উক্তরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল। এ কথা বউরাণীর কাণে যায়; ইহাতে তিনি বিবেচনা করিলেন, উহার পিত্রালয় বা শ্বশুরালয়ের স্মৃতির সঙ্গে কোনও মহাদুঃখ জড়িত আছে। এ দিকে, এই গঙ্গায় ভাসিয়া-আসা স্ত্রীলোকটির পরিচয় জানিবার জন্য বাটীর দাসদাসী সকলেই অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছিল—কিছুতেই তাহারা কৌতূহল দমন করিয়া রাখিতে পারিতেছিল না। তাই বউরাণী সকলকে বিশেষ করিয়া সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন, কেহ যেন এই রমণীর পরিচয়সূচক কোনও প্রশ্ন তাহাকে না জিজ্ঞাসা করে। তাই সাবধানে চারিদিক চাহিয়া দে [illegible] ঝি এ প্রশ্ন [illegible]

প্রশ্ন শুনিয়া সুরবালা একটু বিরক্তি [illegible]

উত্তরটা শুনিয়া ঝি চমকিয়া উঠিল। [illegible]

পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। মুখের পা[illegible]

একটু নামিয়া যাওয়াতে সে স্থানটায় রৌদ্র আসিয়া পতিত হইল। ঝি তখন বলিল—"না দিদিঠাকরুণ, তুমি তা নও।"

সুরবালা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আমি কি নই?

"তুমি তা নও। এই যে তোমার ছায়া পড়েছে দিদিঠাকরুণ।"

বড় দুঃখের সময়ও সুরবালার মুখে হাসি আসিল। বলিল—"না, আমি তা নই। আমি তোমাদেরই মত মাটীর মানুষ।

ঝি তখন সুরবালাকে বিছানায় শয়ন করাইয়া বলিল—"বউরাণী কি করছেন দেখিগে।"—বলিয়া সে প্রস্থান করিল।

কিয়ৎপরে সুরবালা দেখিল, বউরাণী বাগানের দিকে আসিতেছেন। তিনি নিকটবর্ত্তী হইলে সে উঠিয়া বসিল। বউরাণী বলিল—"তুমি শোও শোও—উঠ না।"

সুরবালা বলিল—"না, আমি বেশ বসতে পারব। এতক্ষণ ত বসেই ছিলাম। এইমাত্র শুয়েছি।"

বউরাণী বলিলেন—"তুমি কাহিল মানুষ, শুয়ে থাক। আমি তোমার কাছে বসছি। বেশীক্ষণ বসে থাকলে তোমার কষ্ট হবে।"—বলিয়া তিনি শতরঞ্চের একপ্রান্তে উপবেশন করিলেন। হাসিতে হাসিতে, সুরবালার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া তাহাকে শোয়াইয়া দিলেন।

সুরবালা আকুলনয়নে বউরাণীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। বলিল—"আপনি বসে রইলেন, আমি শুলাম, এটা ত ভাল হ'ল না।"

"কেন, দোষ কি? তুমি রোগী—আমি ত রোগী নই। আর দেখ—আমি তোমায় তুমি বলি, তুমি আমায় আপনি বল কেন?"

একথা শুনিয়া সুরবালার সেই ছলছল চক্ষু আরও যেন ভারি হইল। রুদ্ধ-কণ্ঠে বলিল—"আপনি স্নেহ করেন বলেই ওকথা বলছেন। আপনারা রাজাতুল্য লোক—আমি আপনার দাসীরও যোগ্য নাই। তা সত্ত্বেও, সে সব কিছু মনে না করে, আমার অসুখের সময় আপনি যে সেবাটা নিজে হাতে আমায় করেছেন, লোকের মা বোনেও সে রকম পারে না। তবে—

[illegible]

[illegible] য়াছিলেন। আজ প্রথম নহে—এ কয়দিনই [illegible] উঠিয়াছে বলিয়া এই রমণী যেন নিজ অদৃষ্টকে [illegible] পারিলে ত জানিতে পারেনই নাই—ইহার কিসের

এত দুঃখ, তাহাও কিছুমাত্র নির্ণয় করিতে পারেন নাই। এ কয়দিন সুরবালার সহিত বিশ্রম্ভালাপের সুযোগও তিনি পান নাই। আজ প্রথম দুইজনে নিরালায় কথোপকথন। অথচ এ অভাগিনীর দুঃখের কারণ অবগত হইবার জন্য, যদি সম্ভব হয়, সে দুঃখভার কিয়দংশও লাঘব করিবার জন্য, বউরাণীর পুষ্পকোমল হৃদয়খানি উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। তাহার মুখে এ কথা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমায় বাঁচাতে চেষ্টা করে কি ভাল করিনি ?"

সুরবালা বলিল—"আমার মত হতভাগিনীর পক্ষে মৃত্যুই ছিল ভাল।"

অনুযোগের স্বরে বউরাণী বলিলেন—"ছি, ও কথা কি বলতে আছে ? নিজের মরণ কামনা কি করতে আছে ? ভগবান যে জীবন দিয়েছেন, সে তাঁর মহাদান। সে জীবনে তাচ্ছিল্য করা—তাঁরই অপমান করা।"

সুরবালা বলিল—"জীবন দিয়েছিলেন বেশ করেছিলেন। কিন্তু জীবনের সঙ্গে সঙ্গে এত দুঃখ দিলেন কেন ?"

"তিনি যা ভাল বুঝেছেন তাই তিনি করেছেন। তাঁর কাযে দোষ দেখা, ছল ধরা কি আমাদের সাজে? তিনি দুঃখ যা দিয়েছেন, তাও আমাদের মাথা পেতে নিতে হবে।"

সুরবালা অন্যদিকে চাহিয়া নীরব হইয়া রহিল। সূর্য্য অনেকক্ষণ অস্ত গিয়াছেন। দিবালোক অত্যন্ত ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছে। বাগানের যত পাখী গঙ্গার বেলাভূমিতে চরিতে গিয়াছিল, তাহারা ফিরিয়া কলকোলাহলে আকাশ পূর্ণ করিয়া ফেলিতেছে। একটু পরে বউরাণী বলিলেন "তোমার কি দুঃখ, আমায় তুমি বলবে ?"—বলিয়া সস্নেহে তিনি সুরবালার একখানি হাত, নিজের হাতের মধ্যে লইলেন।

সুরবালা কিন্তু কোনও উত্তর করিল না। ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া তাহার চক্ষুযুগল হইতে অবিরল ধারায় অশ্রু বন্যা প্রবাহিত হইল।

বউরাণী বলিলেন—"থাক—থাক—কেঁদনা—কেঁদনা। সে কথা মনে করতেও যদি তোমার এত দুঃখ—তবে [illegible]
এ প্রসঙ্গ তুলব না। শুধু একটি শেষকথা জিজ্ঞ[illegible]

সুরবালা তাহার অশ্রুসিক্ত চক্ষু দুইটি বউরা[illegible]

বউরাণী নিজ বস্ত্রাঞ্চল দিয়া সযত্নে তাহা[illegible]
দিয়া বলিলেন—"তোমার আত্মীয় স্বজন কে[illegible]

আমরা কিছুই জানিনে—তুমি কিছুই বলনি। তুমি আজ আটদিন এখানে রয়েছ। তোমার খবর না পেয়ে তাঁরা হয়ত কত ভাবছেন—তাঁদের কোনও খবর দেওয়া উচিত নয় কি? তাঁরা জানতে পারলে হয়ত এসে তোমায় নিয়ে যেতে পারতেন।"

সুরবালা ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল। বলিল—"বউরাণী—এ পৃথিবীতে আমার আর এমন কেউ নেই, যে আমার খবর না পেয়ে ভাবিত হবে—কিম্বা খবর পেলে খুসী হবে--কিম্বা এসে আমায় নিয়ে যাবে। আমার দুর্ভাগ্যের সীমা নেই। তাই আমার নিজের কোনও পরিচয় আপনার কাছে বলিনি। সামান্য যা বলেছি তাও কাল্পনিক—যথার্থ নয়। এটুকু আপনাকে জানিয়ে রাখলাম কারণ আপনার সঙ্গে এ চাতুরীটুকু করে আমি ভারি অন্যায় করেছি—অকৃতজ্ঞের কাজ করেছি। আপনি যদি আমায় জীবন দিলেন, তবে আপনার কাছে আমার আর একটি প্রার্থনা আছে।"—বলিয়া সুরবালা, বউরাণীর পদযুগল ধারণ করিল।

"ওকি কর—ওকি কর ভাই"—বলিয়া বউরাণী তাহার হাত দুইটি সবলে টানিয়া লইলেন।

সুরবালা কাতরস্বরে বলিতে লাগিল—"আমার প্রার্থনা এই। আপনাদের এ সংসার ত রাজসংসার। ভগবানের কৃপায় আপনাদের কোনও বিষয়ের অভাব ত নেই। আমি যতদিন বাঁচি—এই সংসারে আমাকে আশ্রয় দিয়ে রাখুন। কত দাসদাসীকে আপনি ত প্রতিপালন করছেন—সেই রকম আমাকেও প্রতিপালন করুন। আমায় ত্যাগ করিবেন না।"

এই মর্ম্মভেদী কথাগুলি শুনিয়া বউরাণী কয়েকমুহূর্ত্ত স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। নিজ বস্ত্রাঞ্চল দিয়া আবার সুরবালার চক্ষু মুছাইয়া বলিলেন—"এই কথা?—তা, এর জন্য তুমি এত কাতর হয়েছ কেন ভাই? তোমায় ত্যাগ করব, এমন কথা ত আমি বলিনি। আমি তোমায় এই খানেই রাখব—কোথাও যেতে দেব না। কেমন? এখন শান্ত হও, চুপ কর—আর কেঁদ না।"

কিন্তু সুরবালার চক্ষু বারণ মানে না। অনেক করিয়া বউরাণী তাহাকে [illegible] শ[illegible]লেন।

[illegible] [illegible] উঠিয়া অন্তঃপুর অভিমুখে চলিলেন। পথে [illegible] [illegible] সুরবালা একটা কাষ্ঠাসনে বসিয়া পড়িল।

বউরাণীও বসিলেন। আকাশে তখন দুই একটি করিয়া নক্ষত্র দেখা দিতে লাগিল। দুইজনে কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল।

বউরাণী বলিলেন—"দেখ ভাই, আমি একলাটি থাকি, কোনও সমবয়সী সঙ্গী সাথী নেই, দিন আমার কাটে না, তাই আমার দেওয়ান—তাঁকে আমি কাকা বলি—আমার একজন সহচরীর জন্যে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। আমি ভাবছি কি—বাইরে থেকে অন্যলোক এনে আর কি হবে—তুমিই আমার সহচরী হয়ে থাক। আমি কাকাকে বল্‌ব,—কি বল ?"

সুরবালা মৃদুস্বরে বলিল—"আপনার দয়া আমি কখনও ভুলব না।"

অতঃপর দুইজনে উঠিয়া অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

"মা তুমি দয়াময়ী"

পরদিন প্রভাতে গঙ্গাস্নান ও পূজার্চ্চনা শেষ করিয়া বউরাণী দেওয়ানজিকে ডাকিয়া পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন, এমন সময় সংবাদ আসিল, দেওয়ান স্বয়ং দর্শনপ্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মজুমদার মহাশয় এই জমিদারবংশের পুরুষানুক্রমিক দেওয়ান। তাঁহার বয়স ষষ্ঠিবৎসরের উপর হইয়াছে কিন্তু তথাপি এখনও বেশ কার্য্যক্ষম আছেন। খর্ব্বায়ত শ্যামবর্ণ বৃদ্ধ, দেহখানিও দেওয়ানোচিত হৃষ্টপুষ্ট। স্বর্গীয় কর্ত্তা মহাশয় ইঁহাকে যথেষ্ট স্নেহ ও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন। জাতিতে বৈদ্য হইলেও ইনি পরিবারস্থ সকলের নিকট আত্মীয়বৎ। বউরাণী ইঁহাকে পিতৃব্য সম্বোধন করিয়া থাকেন তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

অন্তঃপুরের মধ্যে একটি কক্ষ, বউরাণীর আপিসকক্ষ-স্বরূপ সজ্জিত ছিল। চেয়ার টেবিল আলমারি প্রভৃতি, টানাপাখা, এই কক্ষে ছিল। বউরাণীকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিতে অথবা কোনও কাগজপত্রে তাঁহার দস্তখত লইবার জন্য দেওয়ানজি যখন অন্তঃপুরে আগমন করিতেন তখন এই কক্ষ খানিতেই তাঁহাকে বসান [illegible] পুরমহিলাসুলভ লজ্জাবশতঃ দেওয়ানজির [illegible] উপবেশন করেন নাই—পরিচারিকাসহ অ[illegible] আসনের কিয়দ্দূরে দাঁড়াইয়া থাকিতেন। অন্য

দেওয়ানজি পূর্ব্বে হইতেই সেই কক্ষে বসিয়া ছিলেন, বউরাণী প্রবেশ করিবামাত্র তিনি সসম্মানে দণ্ডায়মান হইলেন। "কাকা—বসুন"—বলিয়া বউরাণী তাঁহার যথাস্থানে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

"মা, তোমার শরীর বেশ ভাল আছে?"

"হ্যাঁ কাকা—আমি ভাল আছি। আপনি ভাল আছেন ত?"

"হ্যাঁ মা - বেশ আছি। আচ্ছা, তুমি যে গঙ্গার ঘাটে সেদিন সেই মেয়েটিকে কুড়িয়ে পেয়েছিলে, তার পরিচয় কিছু জানতে পেরেছ?"

"না কাকা—সে কিছু বলে না – কিছু বলবে, এমন আশাও নেই।"

"পুলিসে ত একটা খবর দেওয়া উচিত? কোথা থেকে কে এল, শেষকালে ওকে নিয়ে কোনও বিপদ আপদ না উপস্থিত হয়।"

"এর জন্যে আর থানা পুলিশ কেন কাকা? একজন অনাথা স্ত্রীলোক, বোধ হয় নৌকো থেকে জলে পড়ে গিয়েছিল, ভেসে এসেছে—তাকে আমরা আশ্রয় দিয়ে রেখেছি—এর জন্যে আর বিপদ আপদ কি? পুলিশে জানালেই তারা এসে বেচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে—আমি তা চাইনে।"

দেওয়ানজি একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন—"সে জন্যে নয়। তবে শুনেছিলাম তার গলায় একটা দড়ির দাগ আছে—হয়ত কেউ তাকে মেরে ফেলবার চেষ্টা করেছিল, নয়ত সে আপনি আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল—উভয় অবস্থাতেই ব্যাপারটা পুলিসের তদন্তযোগ্য। কিন্তু তোমার যখন অমত—তখন খবর দেব না,—থাক। গলার সে চিহ্নটা কি এখনও আছে?"

"অতি সামান্য। আর দুচারদিনেই মিলিয়ে যাবে।"

"তা বেশ। আজ আমি এসেছিলাম, তোমার সহচরীর জন্যে কাগজে যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল, তার উত্তরে এই কতকগুলো আবেদন এসেছে।"—বলিয়া দেওয়ানজি হস্তস্থিত ডাকের চিঠিগুলি গণনা করিয়া বলিলেন—"পাঁচখানা।"

কুড়ান স্ত্রীলোকটিকেই নিজ সহচরী নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব বউরাণীর ওষ্ঠযুগলের নিকট পর্য্যন্ত আসিল—কিন্তু লজ্জা ও সঙ্কোচবশতঃ বলি-বলি করিয়া তিনি বলিতে পারিলেন না। ভাবিলেন আবেদনপত্রগুলির কথা প্রথমে শুনিয়া লই [illegible] তাহার পর সে প্রস্তাবটি উপস্থিত করিব।

দেও[illegible] [illegible]রিভাগে চক্ষু রাখিয়া বলিলেন—"এর মধ্যে চারি-[illegible] [illegible]কজনের আবেদন পড়ে মনে হচ্ছে—তার দ্বারা [illegible] [illegible] সব আবেদনগুলি পড়ে শোনাব কি?"

বউরাণী বলিলেন—"বেশ ত।"

দেওয়ানজি তখন প্রথমখানি খুলিয়া পাঠ করিলেন। কলিকাতা [illegible]বাজারের একজন বর্ষীয়সী বিধবার আবেদন—তিনি রামায়ণ মহাভারত পাঠ করিয়া শুনাইতে সক্ষম, লিখিয়াছেন। সঙ্গীতাদির বিষয়ে তাদৃশ ক্ষমতা নাই। সন্তানাদি নাই—ভাসুরপোর আশ্রয়ে বাস করেন। সে ভাসুরপো অত্যন্ত স্ত্রৈণ—ইঁহাকে গ্রাহ্যই করে না। কাশী বা বৃন্দাবনে গিয়া বাস করিবার মৎলবই ছিল, এ কার্য্যটি যদি মিলে তবে তীর্থযাত্রা আপাততঃ স্থগিত রাখিতে প্রস্তুত আছেন।—পত্রপাঠ শেষ করিয়া দেওয়ানজি বলিলেন—"আমরা যে রকমটি খুঁজছি—এটি সে রকম বলে মনে হয় কি? তোমার একজন সমবয়সীর মত হয়, যার সঙ্গে গল্প গুজব আমোদ প্রমোদ করে তোমার মনটি বেশ প্রফুল্ল থাকে, এই রকমটিই আবশ্যক। কেমন মা, তাই না?"

বউরাণী সঙ্কোচের সহিত বলিলেন "হ্যাঁ কাকা।"

অতঃপর দেওয়ানজি দ্বিতীয় পত্রখানি পাঠ করিলেন। এই আবেদনকারিণী লেখা পড়া জানেন না, তবে মুখে মুখে দাশুরায়ের ছড়া অনেকগুলি আবৃত্তি করিতে পারেন। ইঁহারও বয়স হইয়াছে—রন্ধনবিদ্যা ও অন্যান্য গৃহকার্য্যে অত্যন্ত পটীয়সী বলিয়া নিজেকে বর্ণনা করিয়াছেন। এ আবেদনও দেওয়ানজি অমনোনীত করিলেন।

তৃতীয় ও চতুর্থ পত্রও ঐ জাতীয় কারণে অগ্রাহ্য হইল। তখন দেওয়ানজি শেষ পত্রখানি খুলিয়া, চশমাটি চোখে ভাল করিয়া লাগাইয়া স্মিতমুখে বলিলেন—"এই স্ত্রীলোকটি যে ভাল রকম লেখা পড়া জানে,—তা এর হাতের হরপ দেখলেই বোঝা যায়। রচনাও দিব্য।" —বলিয়া পাঠ আরম্ভ করিলেন—

কলিকাতা।
৬ই চৈত্র।

মান্যবর শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মজুমদার
বাশুলিপাড়া এষ্টেটের ম্যানেজার মহাশয়
সমীপেষু।

মহাশয়,

আপনি ৫ই চৈত্র তারিখের "দেশবন্ধু" সংবা[illegible]
প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া আমার এ[illegible]
সকাশে পাঠাইতে সাহসিনী হইতেছি। কৃপাবলে[illegible]
কৃতার্থা হইব।

আমার পিতার নাম ৺যোগজীবন বসু—নিবাস বহরমপুরে ছিল। আমি বাঙ্গালা সাহিত্য রীতিমত অধ্যয়ন করিয়াছি। রামায়ণ মহাভারত হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান কালের জীবিত কবি, নাট্যকার ও ঔপন্যাসিকগণের গ্রন্থাবলীর সহিত সম্যক ভাবে পরিচিতা। আমি স্বয়ং একখানি নাটক রচনা করিয়াছি কিন্তু অর্থাভাবে এতাবৎ কালাবধি তাহা মুদ্রিত করিতে পা... এক সময় আমি সঙ্গীত বিদ্যারও যথেষ্ট চর্চ্চা করিয়াছিলাম—নিপুণ ওস্তাদের নিকট আমার শিক্ষা। তাহার পর হইতে আমি স্বয়ং চর্চ্চা করিয়া ... সফলতাও লাভ করিয়াছি। যন্ত্রাদির মধ্যে পিয়ানো, হার্ম্মোনিয়ম এবং ... বাজাইতে শিখিয়াছিলাম। অধুনা দারিদ্র্যবশতঃ ঐ সকল যন্ত্রাভাবে ... সে অর্জ্জিত বিদ্যা নিশ্চয়ই নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে—কিছু দিন অভ্যাসের ... পাইলেই পুনর্ব্বার তাহা আমার করায়ত্ত হইবে সন্দেহ নাই। আমি ... জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম—গোড়া হিন্দু পরিবারে আমার দাম্পত্য জীবন অতি... হইয়াছিল—এখন এই কলিকাতা সহরে একজন অবলা রমণীর পক্ষে হিন্দু ... পালন যতদূর সম্ভব—তাহা করিতেছি। "যতদূর সম্ভব" বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, এখানে বাধ্য হইয়া আমাকে কলের জল পান করিতে হয়—এমন সঙ্গতি নাই যে ভৃত্য নিযুক্ত করিয়া গঙ্গা হইতে প্রত্যহ পানীয় জল আনয়ন করি।

আমি অন্তঃপুরবাসিনী হিন্দুরমণী হইয়াও উক্ত বিদ্যাগুলি কি রূপে ... করিলাম, তাহা বুঝাইতে হইলে, সংক্ষেপে আমার জীবনকাহিনী মহ... গোচর করিতে হয়। সুতরাং নিম্নে তাহা নিবেদন করিতেছি।

বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে, বহরমপুরে, আমার জন্ম। আমার পিতামহ মহাশয় কিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি রাখিয়া যান, আমার পিতা ও দুই জন পিতৃব্য তাহা ... অংশে ভাগ করিয়া লইয়া ভোগ দখল করিতেন—কিন্তু সকলেই একান্নে ছি... আমি যখন সাত বৎসরের, তখন আমাকে এবং আমার পঞ্চদশ বর্ষীয় ... সহোদরকে রাখিয়া আমার মাতৃদেবী স্বর্গারোহণ করেন। মাতার মৃত্যু... পিতৃদেব গৃহে বড় থাকিতেন না—অধিকাংশ সময়ই কলিকাতায় যাপন করি... কয়েক মাস পরে, ৩০০৲ বেতনে তিনি কোনও ইংরাজি হউসের খা... কর্ম্মে নিযুক্ত হন। এই কর্ম্মটি পাইবার জন্য তাঁহার যাহা কিছু পৈত্রিক সম্পত্তি ছিল, সম... জামিন স্বরূপ রাখিতে হইয়াছিল। চাকরি গ্রহণ করিয়া ... আমাদের দুই ভাইবোনকে লইয়া আসেন এবং ... আসেন।

-কলিকাতায় বাসকালীন পিতৃদেবের ধর্ম্ম ও সামাজিক মতাদির কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল (যদিও তিনি কথনও ধর্ম্মান্তরে দীক্ষিত হন নাই—আজীবন হিন্দুসমাজভুক্তই ছিলেন)। দাদা বিদ্যালয়ে পাঠ অভ্যাস করিতে লাগিলেন—এবং আমাকে লেখা পড়া, শিল্পকর্ম্ম ও গীতবাদ্য শিক্ষা দিবার জন্য পিতৃদেব উপযুক্ত শিক্ষক প্রভৃতি নিযুক্ত করিয়া দিলেন। আমি যখন দশ এগারো বৎসরের হইলাম তখন আমাদের দেশের আত্মীয়গণ এবং কলিকাতার পিসিমাতা ঠাকুরাণী, আমার বিবাহ দিবার জন্য পিতৃদেবকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি বলিলেন—"অত ছোট মেয়ের বিবাহ দিবনা। ও এখন লেখাপড়া শিখুক। যখন ষোল বৎসরের হইবে তখন বিবাহ দিব।" সুতরাং আমার লেখা পড়া, গীতবাদ্য চর্চ্চা পূর্ব্বমতই চলিতে লাগিল। এইরূপে যখন আমার বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ বৎসর হইল তখন পিতৃদেবের এক মহাবিপদ উপস্থিত হইল। তাঁহার কোনও অধস্তন কর্ম্মচারীর দোষে হউসের তহবিল হইতে অনেক টাকা তস্রূপ হইয়া যায়—তজ্জন্য পিতাঠাকুরকেই সম্পূর্ণ দায়ী হইতে হইল। তাঁহার চাকরি গেল—বিষয় সম্পত্তি সমস্তই বিক্রয় হইয়া গেল। ইহার ছয়মাস পরেই আমাদিগকে অকূল শোকসাগরে ভাসাইয়া তিনি স্বর্গারোহণ করিলেন। দেশ হইতে আমার পিতৃব্যগণ আসিয়া আমাকে লইয়া গেলেন এবং অনেক চেষ্টা করিয়া আমার বিবাহ দিলেন। বিবাহোচিত বয়স আমি অতিক্রম করিয়াছিলাম বলিয়া, আমার বিবাহে তাঁহাদিগকে বিলক্ষণ বেগ পাইতে হইয়াছিল। আমি যে ঘরে পাড়লাম, তাঁহারা সৎকুলজাত হইলেও হীনাবস্থ। ধনী পিতার আদরের কন্যারূপে আবাল্য প্রতিপালিত হইলেও, তাঁহাদের সংসারে গিয়া আমি কায়মনোবাক্যে পতি ও অন্যান্য গুরুজনসেবা করিতে লাগিলাম, যে আমি পিতৃভবনে নিজের কাপড় কখনও নিজে কাচি নাই—সেই আমি শ্বশুরালয়ে হাস্যমুখে বড় বড় তোলহাঁড়ি করিয়া ধানসিদ্ধ করিতে লাগিলাম কিন্তু পূর্ব্বজন্মে আমি মহাপাপিনী ছিলাম—তাই আমার সৌভাগ্যশশী অকালে অস্তমিত হইল। কাল বিসূচিকা রোগ আসিয়া আমার সীমন্তের সিন্দূর মুছিয়া লইল, আমি বিধবা হইলাম। ইহা তিন বৎসরের কথা।

আমার শ্বশুরকুল দরিদ্র তাহা পূর্ব্বে [illegible] ব সেখান হইতে আমায় চলিয়া আসিতে হ [illegible] গা সহরে তখন একটি ৪০৲ বেতনের মাষ্টা [illegible] ত ছিলেন। সেই ৪০৲টি টাকার উপর নির্ভ [illegible] শ্রাদ্ধ [illegible] ।-

ক্লেশে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলাম। গত পৌষসংক্রান্তির দিন আমার পিসিমাতাও [illegible] লাভ করিলেন। দাদা এইবৎসর আইন পাস হইয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা, পশ্চিমের কোনও ভাল জেলায় গিয়া ওকালতী ব্যবসায় আরম্ভ করেন। কিন্তু আমাকে তিনি এখানে ফেলিয়াও যাইতে পারেন না—সঙ্গে করিয়া পশ্চিমে লইয়া যাওয়াও একান্ত অসুবিধাজনক। দাদা অবিবাহিত। আমি সেই বিদেশে গিয়া দাদার বাসায় একাকী থাকিব কেমন করিয়া? এই সকল কারণে তিনি নড়িতে পারিতেছেন না। আমি তাঁহার জীবনের—উন্নতির—বিঘ্নস্বরূপিণী হইয়া রহিয়াছি। এমন সময় মহাশয়ের প্রদত্ত বিজ্ঞাপনটি পাঠ করিয়া মনে হইল, বুঝি ভগবান দয়া করিয়া এই অকূলে কূল দিলেন।

আপনি যদি এই কর্ম্মটিতে আমাকে নিযুক্ত করেন তবে একজন অনাথা কায়স্থকন্যার অশেষ উপকার করা হয়। আমি সর্ব্বদা শ্রীযুক্তা বধূরাণী মহোদয়ার চিত্ত বিনোদনে সচেষ্ট থাকিব। তিনি যদি দয়া করিয়া আমায় স্মরণ করেন তবে দাদামহাশয়কে সঙ্গে লইয়া অচিরাৎ বাশুলিপাড়া যাত্রা করিব। উত্তরের আশায় রহিলাম।

বিনীতা নিবেদিকা
শ্রীমতী কনকলতা দাসী।

পাঠ শেষ করিয়া দেওয়ানজি বলিলেন—"আমার ভারি ইচ্ছে এই মেয়েটিকেই নিযুক্ত করি। তুমি কি বল মা?"

এই দুঃখকাহিনী শ্রবণ করিতে করিতে বউরাণীর হৃদয়খানি করুণায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি বিবেচনা করিলন—"বেশ ত—এ আসুক। এও আসুক, সুরবালাও থাকুক। ঈশ্বরের ইচ্ছায়, আমার ত কোনও অভাব নেই।"—প্রকাশ্যে বলিলেন—"বেশ। আপনি যা ভাল বিবেচনা করবেন—তাই হবে কাকা। ওঁকেই নিযুক্ত করুন।"

দেওয়ানজি বলিলেন—"তবে আজই চিঠি লিখে দিই।"

বউরাণী একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন—"আচ্ছা কাকা, এদের রাহা-খরচ কিছু পাঠান আবশ্যক ত?"

দেওয়ানজি বলিলেন—"রাহাখরচ? প্রথম কর্ম্মে যে প্রবৃত্ত হয় সে নিজের খরচে

—"কিন্তু ইনি স্ত্রীলোক যে,—আর

অবস্থা